নব্যভারত

ঊনচত্বারিংশ খণ্ড—১৩২৮।

৬৪। পোলাও

৬৫। প্রাপ্ত (প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)

৬৬।

মার শৌচে

৬৮ ভারতবর্ষে

...ক্ষেত্র,
...তি বিচিত্র।
তোমার ভুবনে ব্যক্ত,
ছুটিল তপ্ত ধমনি-রক্ত।
...াধিকা,—ত্যজিলে তাহারে মহৎ কার্য্যে,
...নী, মুগ্ধ ভারত তোমার শৌর্য্যে।
...ন, আবার এস হে ভারতবর্ষে,
...গাইয়া বিপুল পুলকে অন্বিত হর্ষে।

ঊনচত্বারিংশ খণ্ড—১৩২৮।

আবাহন।

ব্রজ-অঙ্গনা-আঙ্গিনালঙ্ঘি গোপী-সঙ্কুল হইয়া মুক্ত,
ধ্বংস করিয়া কংশ অসুরে যেদিন মহিমা করিলে ব্যক্ত,
রুদ্ধ জননী উদ্ধার লাগি বাহুযোধী সনে করিলে যুদ্ধ,
হস্তে লইলে সুদর্শন হে, ছাড়িয়া মোহন মুরলী বাদ্য ;
সেই দিন হতে ভারত-গাথায় গ্রথিত হইল নবীন সূক্ত,
সুপ্ত ভারতে লুপ্ত পাদপে নব পল্লব হইল যুক্ত।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদি, আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

জরাসন্ধ ও কাল-যবনের দারুণ দম্ভ না করি গ্রাহ্য,
রৈবত-শিরে অম্বুধি-তীরে তব প্রতিষ্ঠা নবীন রাজ্য।
রাজসূয়-যাগে পাণ্ডব জাগি পাইল তোমার অভয় বাক্য,
দিগ্বিজয়ী সে বাহিনী ফিরিল সকল ভারত করিয়া ঐক্য।
সমরে অটল বীর-বিক্রমী নারায়ণী সেনা তোমার সৃষ্টি,
তোমার কুহকে ক্ষত্রিয় যত জাগিয়া চাহিল মেলিয়া দৃষ্টি।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদি, আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

তব ইঙ্গিতে ভারত-যুদ্ধ, তোমার মহিমা সে কুরুক্ষেত্র,
করি একত্র ক্ষত্রিয় যত রচিলে রাজ্য অতি বিচিত্র।
ধন্য তুমি হে মান্য সারথী, শক্তি তোমার ভুবনে ব্যক্ত,
তোমার তূর্য্যে আর্য্য-জাতির ছুটিল তপ্ত ধমনি-রক্ত।
প্রিয়া প্রাণাধিকা দুখিনী রাধিকা,—ত্যজিলে তাহারে মহৎ কার্য্যে,
ধন্য তব হে পুণ্য কাহিনী, মুগ্ধ ভারত তোমার শৌর্য্যে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদি, আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

সুপ্ত ভারতে গুপ্ত বিভূতি দীপ্ত, পাইয়া তোমার সঙ্গ,
চিত্রক-তুলি কাব্য-কাকলি বৃথা কহে তুমি চারু-ত্রিভঙ্গ।
শুনেছি শ্রবণে বৃন্দা-বিপিনে মুরলীর গান ললিত ছন্দে,
প্রণয়-বিভোলা ব্রজ-কুলবালা দেখেছি ছুটিতে পরমানন্দে।
চঞ্চলা নারী অঞ্চল'পরি রচিত হেরিয়া তোমার শয্যা,
লাঞ্ছিত মোরা বঞ্চিত আজি বুঝিতে তোমার মহতি-চর্য্যা।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদি, আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

যে একচ্ছত্র রচনা লাগিয়া করিয়াছ তুমি বিপুল চেষ্টা,
আজি এতদিনে ভারত-ভবনে সে মহারাজ্য হ'ল প্রতিষ্ঠা।
নতেক বর্ণ জাতি ও ধর্ম্ম, স্বরাজ পুণ্য পতাকা লক্ষ্যে,
বিমল সৌখ্যে, দুঃখ ভুলিয়া, ঐক্য হয়েছে ভারত-বক্ষে।
তবু ভাঙিছেনা মোহ ঘুম ঘোর! জাগিছে না সবে সত্য-ধর্ম্মে!
ভারতের যত অজ্ঞান-ধাঁধা শেল সম মম বিঁধিছে মর্ম্মে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদি, আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

হে পুরুষ, ওহে চতুর সারথী, চেয়ে দেখ মেলি, কমল-নেত্র,
নিকষ-নিবিড়-তিমির-জড়িত নিদ্রা-মগ্ন ভারত-ক্ষেত্র।
আবার ভারতে বাজাও শঙ্খ, রাজ্যে ধর্ম্ম কর প্রতিষ্ঠা,
শিখাও সকলে তোমার কর্ম্ম, তোমার ঐক্য, তোমার নিষ্ঠা।
কুরু-প্রাঙ্গণে বস্ত্র-হরণে যে পাপ-কালিমা হইল যুক্ত,
এত অপমানে, দৈন্য-দাহনে, সে কলঙ্ক কি হয় নি মুক্ত?
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদি, আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

শ্রীদরবেশ।

স্বরাজ।

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। মানুষ তখন সমাজ গড়িয়া তোলে নাই। তখন রাজা প্রজা ছিল না, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানও ফুটিয়া উঠে নাই। গুহা গহ্বরে ছোট ছোট দলে মানুষ বাস করিত। পেটে ক্ষুধা ছিল, বাহুতে বল ছিল। ক্ষুধার তাড়নায় ও সবল দেহের স্ফূর্ত্তিতে দিনের বেলা শিকার করিয়া বন্য প্রাণী আনিত বা বিনা শিকারে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ফলমূল সংগ্রহ করিত, তাহাতেই ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইত। তখন ক্ষুধা পাইলে মানুষ খাইত কিন্তু তাহাকে খাদ্য কিনিতে হইত না। বিক্রয় করিবারও কেহ ছিল না। মানুষের অস্ত্র তখন ছিল পাথর, সে তখনও লোহা ব্যবহার করিতে শেখে নাই।

ক্রমে মানুষের হিংসায় রুচি কমিল। বর্ব্বরতা কমিয়া সভ্যতা দেখা দিতে লাগিল। তখনও মানুষ প্রায় বর্ব্বর ছিল। দল বাঁধিয়া বাস করিত। মাঝে মাঝে শিকার করিত। কিন্তু মানুষ দেখিল যে শিকার করিয়া পশু হত্যার অনিশ্চিত উপায় অপেক্ষা, কতকগুলি নিরীহ পশুপালন করিয়া, তাহাদিগকে সঙ্গে রাখিয়া, সেই পশুদল হইতে স্বীয় অভিরুচি ও প্রয়োজন মত আহার্য্য বা পানীয় সংগ্রহ করা, সহজ ও নিশ্চিত। ক্ষুধা পাইলে মানুষ পশুর মাংস খাইত বা পশু-দুগ্ধ পান করিত। ক্রয় বিক্রয় তখনও আরম্ভ হয় নাই। কোনও দল বা প্রধানতঃ গো-পালন করিত, কোনও দল বা প্রধানতঃ মেষ-পালন করিত। আমরা সেই গো-পালক মানুষের বংশধর। তখন সম্পত্তি বলিতে সোনা রূপা বুঝাইত না। প্রধানতঃ, পশুদলই ছিল মানুষের সম্পত্তি।

পশুপালক মানুষ পরে আরও সভ্য হইল। দল বাঁধিয়া এক জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, কিছুটা জমি চাষের উপযোগী করিয়া নিত। চাষের পর, অপেক্ষা করিয়া, ফসল সংগ্রহ করিত। শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে, ক্ষুধার সময় প্রয়োজন মত খাদ্য পাওয়া যাইত। মানুষ তখন লোহা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। পশু-পালক মানুষ এবার সভ্য চাষী মানুষ হইয়াছে।

চাষ করিতে শিখিবার পরে, মানুষ যে তাহার পরিষ্কৃত আবাদী ভূমিখণ্ডের নিকট বৎসরের পর বৎসর বাসই করিত, এমন নয়। কয়েক মাস একটা জমি হইতে ফসল তুলিয়া নিয়া, হয়ত বা সেই আবাদি জমি ছাড়িয়া দিয়া, সেই মানুষ-দল অন্যত্র চলিয়া যাইত। তখন জমির অভাব ছিল না। পালিত পশু ও সঞ্চিত শস্য সঙ্গে করিয়া সে দলের অন্যত্র যাওয়া তখন তেমন দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল না। আজও ভারতবর্ষে জঙ্গলে এমন মানুষের দল আছে, যাহারা উপর্য্যুপরি দুইবৎসর একই জমি চাষ করে না। একখণ্ড ভূমি পরিষ্কার করিয়া, চাষআবাদ করিয়া, ফসল নিয়া, দলকে দল সে ভূমিখণ্ড ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।

কৃষিকর্ম্ম শিখিবামাত্রই যে মানুষের সমাজ (society) বা রাষ্ট্র (state) পূর্ণাবয়বে গড়িয়া উঠিল, তাহা নয়। যখন দলকে দল মানুষ প্রায়ই একস্থান ছাড়িয়া স্থানান্তরে বাস করিতে যাইত, তখন দলপতি ছিল ; রাষ্ট্রপতি ছিল না। মানুষ যখন আবাদী জমির নিকট বসবাস

করিতে লাগিল, ঘুরিয়া ফিরিয়া একই জমি বার বার আবাদ করিতে লাগিল, তখন গ্রাম্য-সমাজ আপনিই গড়িয়া উঠিল। তখন এই ভূমিখণ্ড রামের, অপর খণ্ড শ্যামের, এরূপ ছিল না। সমগ্র পল্লী বা গ্রামের অধিবাসীদের ছিল, সব জমি। চাষের ফসলও ছিল, সকল অধিবাসীর। প্রয়োজন মত যে যাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে ও গ্রাম্য-দলপতির আদেশ মানিয়া সাধ্যমত কাজ করিতেছে। কোনও একজন মানুষের পৃথক সম্পত্তি (private property) ছিল না। এক পল্লীসমাজে কয়েকটী পরিবার একত্র বাস করিত, তাহাদের সকলের এক দলপতি ছিলেন। আর, প্রতি পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন, পিতা। স্ত্রী-নায়ক সমাজের (matriarchal society) কথা বলিতেছি না। ভারতবর্ষে সে রূপ সমাজের লোক কমই। পিতৃনায়ক-সমাজে (patriarchal society) পরিবারের কর্ত্তা, পিতা। সেই আদিম পল্লীসমাজে, সম্পত্তি একজন পুরুষের ছিল না, ছিল সমাজের বা পরিবারের। পরিবারের সকল লোকই তাহা ভোগ করিত। সকলকেই পিতার কথা মানিয়া চলিতে হইত। না মানিলে, পিতা, পুত্রের বা মাতার, শাসন বিধান করিতেন, প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত। আজ সভ্যজগতে পিতা প্রাণদণ্ড বিধান করিতে পারেন না। সে অধিকার শুধু রাষ্ট্রপতির।

একগ্রামে চাষের পরে সময়ে সময়ে ফসল এত হইত যে, দলপতি ও নায়ক-পিতৃগণ স্বীয় পোষ্যবর্গের ক্ষুধানিবৃত্তি করিবার পরে, সঞ্চিত শস্য উদ্বৃত্ত থাকিত। উদ্বৃত্ত শস্যের বিনিময়ে, প্রয়োজনীয় অপর জিনিষ, যথা—বস্ত্র, চাষের সরঞ্জাম, ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্র প্রভৃতি—অপর গ্রাম হইতে বা স্বীয় গ্রামেরই কোনও কর্ত্তার নিকট হইতে নেওয়া হইত। এইবার বাণিজ্য আরম্ভ হইল। কেহ শস্য উৎপন্ন করিতেছে, কেহ বা মাটীর ভাঁড় তৈয়ার করিতেছে। এখন সম্পত্তি বলিতে, শুধু পশু বুঝায় না। শস্য ত সম্পত্তি বটেই ; যে ভূমির পূর্ব্বে আদর ছিল না, এখন সে ভূমিও সম্পত্তি। এমন কি, যে সকল অসভ্য আদিম অধিবাসীকে দলপতি নায়ক-পিতৃগণের সাহায্যে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া কৃষিক্ষেত্রে খাটাইয়া নিয়াছেন, সে সব শ্রমকারী মানুষও সম্পত্তি। তাহারা আর দস্যু বলিয়া নিহত হয় না। তাহারা এখন মূল্যবান্ সম্পত্তি—তাহারা দাস (slaves)।

সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের (rights) আবির্ভাব। কিন্তু সে অধিকার কাহার? দাসের কোনও অধিকার নাই। দাসের প্রধান লক্ষণ, দাস, মনুষ্য হইয়াও, অপর মনুষ্যের সম্পত্তি। সে নিজে সম্পত্তি লাভ করিবার বা রাখিবার অধিকারী নহে : সে নিজেই পরের সম্পত্তি। ভৃত্য ও দাস উভয়েই শ্রম করে অপরের জন্য, কিন্তু ভৃত্য অপর মনুষ্যের সম্পত্তি নহে। ভৃত্যের সম্পত্তি পাইবার ও রাখিবার অধিকার আছে। তাহার সম্পত্তির পরিমাণ যতই কম হউক তাহাতে তাহার অধিকার আছে। দাসের নাই। শ্রম করিতে স্বীকৃত হইবার পূর্ব্বে, স্বীকার করা বা না করা ভৃত্যের ইচ্ছাধীন। কার্য্যতঃ পরিমাণে যতই ক্ষুদ্র হউক, ভৃত্যের এইটুকু স্বাধীনতা আছে। দাসের নাই।

পল্লীসমাজের কথা বলিতেছিলাম। প্রথমে দলপতি সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। ক্রমে পল্লী-সমাজের আয়তন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দলপতির অধিকার কমিতে লাগিল। নায়ক

পিতৃগণের অধিকার বাড়িতে লাগিল। বাহিরের শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম, নায়ক-পিতৃগণের সাহায্য ব্যতীত, দলপতি চালাইতে পারেন না। সমাজের ভিতরেও দুরাচারীর শাসন প্রয়োজন; সে ব্যাপারেও নায়ক-পিতৃগণের সাহায্য প্রয়োজন। দলপতি, কর্ত্তা রহিলেন; কিন্তু, নায়ক-পিতৃগণ ক্রমশঃ অধিকতর শক্তিমান্ হইতে লাগিলেন। নায়ক-পিতৃগণের নিজেদের মধ্যে, একদল দলপতির স্বপক্ষে, অপর একদল দলপতির বিরুদ্ধে। তখন, স্বীয় দলের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য, নায়ক-পিতৃগন কর্ম্মক্ষম দাসদের ও সমাজবহির্ভূত বহু লোকের আদর যত্ন আরম্ভ করিলেন। তাহারা নায়ক-পিতৃগণের আদেশ পালন করিলে, নায়ক-পিতৃগণের দল শক্তিমান্ হয়। এইরূপে দলপতির প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল, নায়ক-পিতৃগণের প্রতিপত্তি বাড়িতে চলিল। দাসশূদ্রগণ অধিকারের পথে অগ্রসর হইতে চলিল।

পল্লীসমাজে দলপতির যেমন, পরিবারে তেমনই পিতার অধিকার কমিতে লাগিল। পরিবারস্থ পুরুষ ও রমণীর অধিকার বাড়িয়া চলিল। পূর্ব্বে, পুত্রে উপার্জ্জন করিলেও, যাহা পিতার সম্পত্তি হইত, তাহা ক্রমশঃ পুত্রের পৃথক সম্পত্তি গণ্য হইল। পুত্র শ্রম করিয়া যাহা লাভ করিত, তাহা ক্রমে আর সমগ্র পরিবারের ভোগ্য রহিল না। জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের, পুরুষ স্ত্রীর, পিতা-পুত্রের সর্ব্ববিধ অধিকারের বৈষম্য দূর করিবার নিয়ত চেষ্টা, সভ্যতার শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত সমান চলিয়াছে। অধিকাংশ লোকই, পৃথক সম্পত্তি (private property) সমাজে বজায় রাখিয়া সাম্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। একদল বলেন যে, সকল বৈষম্যের মূলে, পৃথক্ সম্পত্তি। মূলে কুঠারাঘাত কর, তবে সাম্য সম্ভব হইবে। বহু পল্লীসমাজ, এক ভাষায়, সদৃশভাবে, সদৃশ আচারে জমাট বাঁধিয়া এক রাষ্ট্র হইল। রাষ্ট্রপতির শত্রু, রাষ্ট্রের ভিতরে ও বাহিরে। এক রাষ্ট্রপতি অপর রাষ্ট্রপতির সহিত সংগ্রামে মাতিয়াছে। চেষ্টা, পররাষ্ট্রের সম্পত্তি লাভ করিবার। পররাষ্ট্রের রমণীর প্রতি লোভ। পররাষ্ট্রের পুরুষদিগকে পরাজিত করিয়া দাস রাখিবার চেষ্টা। দুই রাষ্ট্রপতিতে ঘোর সংগ্রাম চলিল। বর্ব্বর মানুষের শিকার প্রবৃত্তির এই নূতন রূপ। আবার স্বীয় রাষ্ট্রের ভিতরেও রাষ্ট্রপতির শত্রু আছে। একজন অপর জনের সম্পত্তি নিতে চায়। রাষ্ট্রের ভিতরে মানুষের নিজ নিজ সম্পত্তি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতির কর্ত্তব্য। সুতরাং, রাষ্ট্রপতির সৈন্যের প্রয়োজন। তখন সৈন্যগণ, রাষ্ট্রপতির আদেশে, বাহিরের শত্রু ভিতরের শত্রু, উভয়ই দমন করিত। আজকালকার ভাষায় বলিতে গেলে, সৈন্যগণ পুরাকালে পুলিসেরও কাজ করিত।

সেনা নিয়োগের বহুপূর্ব্বে দলপতি দেখিয়াছেন যে যখন নায়ক-পিতৃগণ সকলে তাহাকে মানিয়া চলিয়াছে, যখন সকল দাস তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াছে, তখনও তাঁহার ইচ্ছামত সকল ব্যাপার ঘটে নাই। মানুষ যাহাদিগকে মানুষ বলিয়া জানে তাহারা ছাড়া অপর এক বা অধিক পুরুষের ধারণা মানব মনে আসিয়াছে। সে পুরুষের শক্তি দলপতির শক্তিকে পরাস্ত করে। তাঁহার সৌন্দর্য্য, তাঁহার মঙ্গল স্বভাব, যে কোনও মানুষের চেয়ে বেশী। সেই শক্তিমান্ শিব সুন্দর দেবতাকে মানুষ স্বতঃই ভয়ে ও ভক্তিতে প্রণাম করিয়াছে। দেবতার ভয়ে বা আদর্শে মানুষ নিজের হিংসা, ক্রোধ, লোভ—এক কথায় সমগ্র মানব-মনকে—সংযত করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান জাগিয়াছে,

সমগ্র মানবজীবন ধর্ম্মের বাঁধনে পড়িয়াছে। সেই সঙ্গে ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মসংরক্ষণ উদ্দেশ্যে, সমাজে একশ্রেণী লোক দেখা দিল, তাহারা প্রধানতঃ ধর্ম্ম লইয়াই থাকিত। তাহারা পুরোহিত ব্রাহ্মণ। ধর্ম্ম সে সময় সমগ্র জীবনের উপর আধিপত্য করিত। রাজ্যশাসন, পরিবার পরিচালন, বাণিজ্য, দেশজয়—সবই ধর্ম্মের অন্তর্গত। সুতরাং রাষ্ট্রপতি যতই শক্তিমান্ হউন, ব্রাহ্মণের সম্মান সর্ব্বত্রই। পুরোহিত ধর্ম্মরক্ষকের নিকট রাষ্ট্রপতিরও মাথা হেঁট হইত—যেমন ভারতবর্ষে, তেমনই ম্লেচ্ছ দেশে।

কৃষি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের বিকাশ। শিল্পের উন্নতি হইতে লাগিল। বাণিজ্য তখন আর গ্রামে আবদ্ধ রহিল না; গ্রামের সহিত গ্রামের বাণিজ্য, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের বাণিজ্য। দক্ষিণ ভারতের আদিম দ্রাবিড় অধিবাসীগণ, সমুদ্র পার হইয়া পররাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য করিতে লাগিল। শ্রমসাধ্য শিল্পের বিস্তারের সঙ্গে শ্রমজীবির সংখ্যা বাড়িতে চলিল। মানব সমাজে সম্পত্তির বৈষম্যও বাড়িতে চলিল। ধনীর ধনবৃদ্ধি, দরিদ্রের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ফল, বৈষম্য। কিন্তু, মানুষের মনে, সাম্যের আদর্শ একবার যে জাগিয়াছে, তাহা সুখলিপ্সা বা স্বার্থপরতা আসিয়া মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই, পারিবেও না। সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বটে, কিন্তু সেই বর্ব্বর, হিংসুক, ক্রোধী, লোভী মানুষ, আজও বৈষম্যে সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে ও সাম্যের মহান্ উদার আদর্শে তাহা পুনর্গঠিত করিতে কখনও কখনও নিজের সর্ব্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত, হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিতেছে।

(২)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা ছাড়িয়া এখনকার ইতিহাসের কথা বলি। ভারতের অতীত ঐতিহাসিক গৌরবের কথা কে না জানে? জানি আর নাই জানি, নিজেরা এখন দরিদ্র বলিয়া, ধনী পূর্ব্বপুরুষের ধনদৌলতের গর্ব্ব, সময়ে অসময়ে, সুযোগ পাইলেই আমরা করিয়া থাকি। অতীতের গর্ব্ব করিবার জন্য নয়, অতীত বুঝিয়া বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ নিয়মিত করিবার জন্য, অতীতের দুই চারিটী কথা বলিব। যে ক্ষীণ জলস্রোত হরিদ্বার হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বত্র সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে। পথে শত বন ভাসাইয়া নিয়া, শত পাহাড় পাশ কাটাইয়া, সে জলস্রোত আজও সাগরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। পথে আবার শত জলস্রোত আসিয়া মিশিয়া, তাহার সাগরাভিমুখী গতি বাড়াইয়াছে। কোথায়ও বা দুই এক যায়গায়, পথহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট জলধারা, সাগরের দিকে না গিয়া, ধরিত্রীতেই শুকাইয়া গিয়াছে বা বিলে মিশাইয়াছে। কিন্তু, তখনও দুই পার্শ্বের ভূমি, সেই পথহারা জলধারার সংস্পর্শে সুশীতল ও উর্ব্বর হইয়া, ধরিত্রীর কি অপূর্ব্ব শোভারই সৃষ্টি করিয়াছে। মানব ইতিহাসের ঘটনাস্রোত তেমনই, সাম্য ও ন্যায়ের অনন্ত আদর্শে মিশিবার জন্য, সুদূর অতীত হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। ভারতের ইতিহাসের ঘটনাস্রোতের গতি কোন্ দিকে, তাহা বুঝিবার জন্য, পথে কোন্ কোন্ স্রোত আসিয়া তাহার গতি দ্রুততর করিয়াছে, কোথায়ই বা পথহারা হইয়া স্রোত বিলে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য অতীতের দুই চারিটী কথা বলিব।

বর্ব্বর, শিকারী মানুষের মাসিডোনীয় বংশধর, ভুবনবিজয়ী সেকান্দর যখন স্বীয় শক্তির

মোহে উন্মত্ত ও বর্ব্বর যুগের নির্ম্মম হিংসা ও সভ্যযুগের যশোলিপ্সায় প্রণোদিত হইয়া, ভারতের উত্তর-পশ্চিম খণ্ড জয় করিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে আসিলেন, তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, ভারতবাসী সেনানায়ক ও সৈনিকগণ যুদ্ধে সুনিপুণ। শুধু সংহার ব্যাপারে নয়, সংরক্ষণ ও সংগঠনেও ভারতবাসী কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। পঞ্চনদকূলে বেদগান করিয়া, আর্য্যসভ্যতা যখন গঙ্গারধারা অনুসরণ করিতে করিতে, ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন কি অলৌকিক রামায়ণ মহাভারত, কত উপনিষদ, কত ধর্ম্মসূত্র, কত নাট্যকাব্য রূপকথা, কত নীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, কত ব্যাকরণ ও অভিধান, কত গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ণ ও আয়ুর্ব্বেদ রচনা করিয়া পৃথিবীর সম্পদ্ বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। সমগ্র পৃথিবীর অর্দ্ধেক নরনারী বর্ব্বর-সুলভ হিংসা দমন করিতে অশক্ত হইয়া, ভক্তিভরে যাঁহার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া, বাসনার নিবৃত্তি ও মৈত্রী-ধর্ম্মপালনের জন্ম মনে বল চাহিতেছে, তিনি সেই নিবৃত্তি-সাধক সর্ব্বত্যাগী অহিংসা-মূলমন্ত্র-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শাক্যসিংহ। ধর্ম্মের প্রভাবে, শিল্পসৌন্দর্য্য রচনায়, ভারত কি কৃতিত্বই না দেখাইয়াছে! পাথর দিয়া সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ও ধর্ম্মের গৌরব-ঘোষণা দেখিতে চাও? ঐ দেখ—মার্ত্তণ্ড, মথুরা, ভাচ্ছুৎ, সাঞ্চী, ভুবনেশ্বর, কনারক, অমরাবতী, এলোরা, অজন্টা, মামল্লপুরম্, মাদুরা, তাঞ্জোর, রামেশ্বরম্ কি শিল্প-সম্পৎ দেখাইতেছে। রেখা ও রং দিয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টি দেখিতে চাও? ঐ দেখ—অজন্টার গুহামন্দির আজও পৃথিবীকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। অর্ণবপোতে সাগর পার হইয়া, বাণিজ্য বা ধর্ম্মপ্রচার করিতে ভারতবাসী কত না দেশবিদেশে গিয়াছে। তাহার সভ্যতা আজ সিংহলে, তাহার মন্দির আজ বোরোবুদুরে। ভারতীয় সুনিপুণ শিল্পীর প্রস্তুত নিত্যব্যবহার্য্য কত সামগ্রী লইয়া দেশবিদেশে বাণিজ্য করিয়া ভারতবাসী এসিয়া ও ইউরোপে, ভারতের লুপ্ত-প্রায় যশ বিদেশীয় ভাষার অভিধানে চিরমুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। আজও ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিতগণ ধাতু-তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার সময়, দিল্লীর নিকটস্থ দেড় হাজার বৎসরের পুরাতন, প্রায় ষোলহাত উচ্চ লৌহস্তম্ভের ছবি ছাত্রদিগকে দেখাইয়া, ভারতীয় কর্ম্মকারের ধাতুতত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্মকৌশলের প্রশংসা করিতেছেন। ভারতবাসী রাষ্ট্রশাসননীতিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ব্রাহ্মণমন্ত্রী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী নমস্ত সম্রাট দেশ-সুশাসন করিয়া অমর হইয়াছেন, ভারতসম্রাট্ অশোক তাঁহাদের মধ্যে একজন। শুধু সম্রাট অমাত্যসাহায্যে সাম্রাজ্য শাসন সংরক্ষণ করিতেন এমন নয়, প্রজাগণও প্রজাতন্ত্র নিয়মে সময়ে সময়ে রাষ্ট্রশাসন করিয়াছেন। কিন্তু সে প্রজা কাহারা? সে প্রজাতন্ত্রে সমাজের নিম্নস্তরের জনগণের কতটুকু স্থান ছিল? এই যে বিশাল বিস্ময়কর আর্য্যসভ্যতার কথা বলিলাম, ইহা ত শুধু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের চেষ্টায় গড়িয়া উঠে নাই; ইহার জন্ম লক্ষ লক্ষ শূদ্র ও দাস, দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর, শ্রম করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাহাদের স্থান ছিল কোথায়? আর্য্য ও দ্রাবিড়ের বহুশতাব্দীব্যাপী প্রাণপণ বিরোধের পর, বিজেতা আর্য্যগণ ক্রমে মানব-স্বভাব-সুলভ অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। সাম্যবাদী বৌদ্ধ

শ্রমণের প্রভাবে অবশেষে পরাজিত আদিম অধিবাসীদের বংশধরগণের সহিত মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইল। আর্য্য ও দ্রাবিড় অলক্ষিতে অনেকটা মিশিয়া গেল। ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে আবার মঙ্গোলও সেই সঙ্গে মিশিয়া গেল। বহুশতাব্দার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হিন্দু, এই আর্য্য সভ্যতার উত্তরাধিকারী। কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা করি, এই বিশাল বিস্ময়কর সভ্যতায় হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের অসংখ্য জনগণ কতটুকু স্থান পাইয়াছে? আজই বা তাহাদের অধিকার কতটুকু?

(৩)

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পৃথিবীতে প্রথম মুসলমানের অভ্যুদয়। সর্ব্ব প্রথমে, সপ্তম শতাব্দীতে, মুসলমানগণ ভারতের মাটিতে পা দেন। কিন্তু ভারতে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হয়, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। সুতরাং, ভারতে মুসলমান আধিপত্য বহুকালের নয়, মাত্র ছয়শত বৎসর কাল ছিল।

ভারতের অনেক মুসলমানই,—বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ মুসলমান,—কেবলমাত্র আচারে ও ধর্ম্মে হিন্দুদিগের হইতে পৃথক্। মুসলমান হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বংশে বা জাতিতে হিন্দু হইতে বিভিন্ন ছিলেন না। সুতরাং, অধিকাংশ ভারতবাসী মুসলমান কিয়ৎপরিমাণে আর্য্যসভ্যতার উত্তরাধিকারী।

যুদ্ধের পর যুদ্ধ, ধ্বংসের পর ধ্বংস, ধ্বংশাবশিষ্টেরও নাশ বা রূপান্তর। ছয়শত বৎসর এইরূপে কাটিয়াছে। মাঝে মাঝে যখন শান্তির প্রসন্ন আননে দেশবাসী আনন্দিত হইয়াছে তখন সে আনন্দে যোগ দিয়া, মুসলমান বাদশাহগণ ভারতের সম্পদ বাড়াইয়াছেন। পৃথিবীতে অতুলনীয় তাজমহল, মুসলমান-কীর্ত্তি। আগ্রার মতি মসজিদ, দিল্লীর কুতব মিনার ও জুম্মা মসজিদ, বিজাপুরের বোলি গুম্বজ, ফতেপুর শিকরি ও শেকান্দ্রা—পৃথিবীর যে কোন দেশের গৌরব বাড়াইত। মুসলমানদের সৃষ্টি, উর্দ্দু ভাষা ও সাহিত্য। মুসলমান লেখকগণ ভারতের তৎকালীন ইতিবৃত্ত লিখিয়া এক নূতন চিন্তা-রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। পৃথিবীর অমর সমস্ত সম্রাটদের মধ্যে আকবর একজন। দেশ ও দেশবাসীর সংরক্ষণ শাসন ও পোষণ জন্য মুসলমান বাদশাহ, তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে এক নিয়মে এক পদ্ধতিতে বিধিব্যবস্থা করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রসমূহে এক রাষ্ট্রবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। সে শাসনপদ্ধতির কিছুটা আজও ভারতবর্ষে প্রচলিত। বাদশাহী আমলে শিল্পের কত উন্নতি, বাণিজ্যের কত বিস্তার হইয়াছিল! কিন্তু এমন প্রবল সাম্যবাদী মুসলমান ধর্ম্মই বা সে শাসন বিধিব্যবস্থাতে, সে বিস্তৃত বাণিজ্যের ফলভোগে, নিম্নস্তরের অসংখ্য জনগণকে কতটুকু অধিকার দিয়াছিল? উচ্চশ্রেণীর জনকয়েকের কথা বলিতেছি না। কি হিন্দু, কি মুসলমান, নিম্নশ্রেণীর অসংখ্য জনসাধারণ কতটুকু অধিকার পাইয়াছিল?

ইসলাম প্রবল সাম্যবাদী বটে, কিন্তু তাহাতে স্ত্রীজাতির অধীনতা ও পৃথক সম্পত্তি (private property) উভয়ই মানিয়া নেওয়া আছে। স্ত্রীকে আদর ও যত্নের সহিত পালন করিবার আদেশ ইস্‌লাম-বিশ্বাসী স্বামী শিরোধার্য্য করে। কিন্তু, স্ত্রী অবরুদ্ধা বন্দিনী; শাসনের প্রয়োজন হইলে, স্বামী তাহাকে প্রহার করিবার অধিকারী। নর-নারীর সমান অধিকার

ইস্‌লাম মানেন না। পৃথক্ সম্পত্তি মানিলে, ধনমানের বৈষম্য স্বীকার করিতেই হইবে। ইস্‌লাম আদেশ দিলেন যে প্রভু যাহা আহার করিবে, প্রভু যাহা পরিধান করিবে, সেই আহার্য্য, সেই পরিধেয় প্রভু দাসকে দিতে বাধ্য। দাসের দোষ অমার্জ্জনীয় হইলে, দাসের উৎপীড়ন বা নির্য্যাতন প্রভুর পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রভুর পক্ষে দাস বিক্রয়ের অনুমতি রহিল। সেই জন্য দাস দাসই রহিল। ইস্‌লাম বিশ্বাসীর মধ্যে একজনের প্রাণহানি বা সম্পত্তিহরণ অপরের পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু ইস্‌লাম-বিশ্বাসী যেখানে বিজেতা, ও অবিশ্বাসী যেখানে পরাজিত, সেখানে পরাজিতের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার নূতন কোনও ব্যবস্থা, মানবসমাজ ইসলামের নিকট পাইল না। সেই জন্য বলিতেছিলাম যে এমন প্রবল সাম্যবাদী ইসলামের প্রভাবেও, ভারতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল না। নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ ভারতে ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, রাজধর্ম্মের সুবিধা কিছুটা ভোগ করিয়াছিল বটে। কিন্তু সে অধিকার কতটুকু? সে অধিকার নিম্নশ্রেণীর কয়জন পাইয়াছিল?

হাজার বৎসরের অধিক কাল ভারতের স্থানে স্থানে যীশু প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। সে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র কি? জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে পৃথিবীর সব মানুষ, ভাই। পাপী বা পুণ্যবান, সব মানুষ এক প্রেমময় পিতার সন্তান। ধরায় স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ প্রায়। সে স্বর্গরাজ্য, মানবহৃদয়ে। স্বর্গরাজ্যের প্রথম সোপান, অনুতাপ। চিত্তশুদ্ধি, চিন্তায় বাক্যে ও কর্ম্মে পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত না হইলে, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব। পরিবার, দল, সমাজ —সকল পুরাতন গণ্ডী ভাঙ্গিয়া, বিশ্বমানবের নবজন্ম হইবে, তবে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইবে। যীশুর স্বর্গরাজ্যে পৃথক্ সম্পত্তি (private property) নাই, দাসত্ব নাই। তাহা মৈত্রী ও সাম্যের রাজ্য।

খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্ম ঠিক যীশু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম নয়। পৌলের সহিত যীশুর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। পৌল যীশুপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা খ্রীষ্টীয়ান-ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। পৌল পৃথক্ সম্পত্তি মানবসমাজ হইতে দূর করিয়া দিতে চান নাই। দাসদিগকে পৌল উপদেশ দিলেন—দাসগণ, তোমাদের প্রভুদিগকে মানিয়া চলিবে। পৌল-প্রচারিত খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মে বৈষম্য স্থান পাইল। ইউরোপে যীশু-প্রবর্ত্তিত-ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পৌল-প্রচারিত খ্রীষ্টীয়ান-ধর্ম্ম অধিক আদর পাইয়াছে। কিন্তু পৌল-প্রচারিত ধর্ম্মও ষোল আনা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সবল সতেজ বর্ব্বর-প্রায় ইউরোপীয় জীবের ছিল না। সুতরাং, তাহারা পৌল-প্রচারিত ধর্ম্ম ও সবল সতেজ জীব-ধর্ম্ম, এই দুইয়ের একটা সামঞ্জস্য করিয়া খ্রীষ্টীয়ান-ধর্ম্ম গড়িয়া তুলিয়া, তাহাই ভারতে খ্রীষ্টীয়ান-ধর্ম্ম নাম দিয়া প্রচার করিয়াছে। ইউরোপীয় জাতিসমূহ যীশু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ত মানেই নাই, পৌলপ্রচারিত ধর্ম্মও মানে নাই। ইউরোপীয় খ্রীষ্টিয়ান বণিকগণ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, লোভ ও হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া, খ্রীষ্টিয়ানে খ্রীষ্টিয়ানে, খ্রীষ্টিয়ানে হিন্দুতে, খ্রীষ্টিয়ানে মুসলমানে, ও হিন্দু-মুসলমানে ষড়যন্ত্র, মারামারি, কাটাকাটি চালাইয়াছে। ৪০০ বৎসর বাণিজ্য চলিয়াছে। তাহার পর, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টিয়ান বণিকের রাজত্ব সুরু হয়। ১৮৫৭ সাল হইতে খ্রীষ্টিয়ান সম্রাটের ভারতে একাধিপত্য।

ভারতে যখন মুসলমান প্রভাব, তখন ভারতের বাহিরে তিনটী অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। তাহাতে পৃথিবীর ইতিহাস বদলাইয়া যায়। প্রথম ব্যাপার, যুদ্ধে বারুদের ব্যবহার। ভারতবর্ষে এই বিনাশকারী দ্রব্যের বহুল প্রচলন হয়, খ্রীষ্টীয় প্রভাবকালে। পূর্ব্বে যুদ্ধে হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতিক সৈন্যের সাহস ও বল, ইহাই সেনানায়কের আশা ভরসা ছিল। বারুদের প্রচলনের পর হইতে, সেনাশক্তির পরিমাণ গণনাতে বিপ্লব উপস্থিত হইল। বারুদ শয়তানের আবিষ্কার বলিয়া অভিহিত হইল। ইউরোপীয় বীরগণ বলিতে লাগিলেন, বারুদ আসাতে শৌর্য্যবীর্য্য পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইল। ইউরোপীয় সমর কুশল নেতাগণ, দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধে বারুদ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যুদ্ধজয় সহজ হইল। দ্বিতীয় ব্যাপার, মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন। ভারতের এই আবিষ্কারের সম্যকপ্রচলন হয় খ্রীষ্টিয়, শাসনকালে। বৈষম্য দূর করিবার পথ ইহাতে যেমন প্রশস্ত হইয়াছে, এমন আর কিছুতে হয় নাই। ইহার সাহায্যে মানবসমাজে বৈষম্য-বোধ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় অদ্ভুত ব্যাপার বাষ্পীয় চালকযন্ত্রের প্রচলন। পূর্ব্বে ১০০ লোক যে কাজ করিত, এখন বাষ্পীয় চালকযন্ত্রের সাহায্যে মাত্র ১০ জনে তাহার অধিক কাজ করিতেছে। ইহার সাহায্যে, লৌহপথের বা সমুদ্রের উপর দিয়া, একমাসের পথ একদিনে যাওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই তিন আবিষ্কারের অপব্যবহার হয় নাই কে বলিবে? কিন্তু যতই গালি দেও, ইহাদের ব্যবহার বর্জ্জন করিতে চাহিলেও কয়েকশত বৎসরকাল মানুষ তাহা পারিবে না। ইহাদের নূতন নূতন উন্নতি হইতেছে ও হইবে। যাঁহারা ইহাদের অপব্যবহারের নিন্দা করেন, তাঁহারাই আবার ইহাদের প্রচলনের সহায়তা করিতেছেন।

(৫)

আজ ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শান্তি। মধ্যএশিয়া বা ইউরোপ হইতে কোনও রাষ্ট্রপতি আজ ভারতে আসিয়া সেনানা-সাহায্যে ভারতরমণীকে বা ভারতবাসীর সম্পত্তি বলপূর্ব্বক হরণ করিতে সাহস পায় না। রাষ্ট্রমধ্যে আজ তুমি, অলঙ্কারভূষিতা তোমার যুবতী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেছ। এই শান্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবের কথা।

যদি কোনও রাষ্ট্রপতি না থাকিত, রাষ্ট্রীয় শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা কিছুই না থাকিত, স্বদেশী বিদেশী সকল মানুষ স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মের আদেশ মানিয়া চলিত, নিরীশ্বরবাদী ধর্ম্ম না মানুক, যদি শুধু নীতি মানিয়া চলিত, তাহা হইলে এই শান্তি-সংস্থাপনের জন্য রাষ্ট্রীয়-শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন হইত না। রাষ্ট্রেরই (state) প্রয়োজন হইত না। কিন্তু, ধর্ম্ম বা নীতি, আজও শিকারী মানুষকে সম্পূর্ণ বশ করিতে পারে নাই। প্রজা শিকারীর স্বভাব দূর করিতে পারে নাই, রাজাও পারে নাই, এমন কি পুরোহিতও পারে নাই। কিন্তু, শিকারপ্রবৃত্তি মানুষের ভিতরে যেমন আছে, সংযম-প্রবৃত্তিও তেমনই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। যেমন বিনাশের ইচ্ছা স্বাভাবিক, তেমনই সংগঠন ও সংরক্ষণের ইচ্ছা মানুষের স্বভাব-গত। এক রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া গেলে, অপর রাষ্ট্র আপনা আপনিই গড়িয়া উঠিতেছে। এমন কি, রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা না থাকিলেও যে পৃথিবী হইতে শান্তি অন্তর্হিত হইত, তাহা মনে হয় না।

মানুষ সময়ে সময়ে একে অন্যকে সংহার করিতে চাহে, ইহা যেমন সত্য, আবার মানুষ মানুষকে ভালবাসে, তাহাও তেমনি সত্য।

ইতিহাস রচনার পূর্ব্ব হইতে পৃথক্ সম্পত্তির (private property) আবির্ভাব। আজও সর্ব্বত্র পৃথক্ সম্পত্তি। আজ মানুষ বনে জঙ্গলে বাস করে না। সম্পত্তি লাভ না করিলে, ক্ষুধা দূর করিতে পারে না। ক্ষুধা আজও মানুষের সঙ্গী। আজ ধন-বৈষম্যের ফলে তুমি সুখে বিজলি বাতি ও পাখার বাতাস ও মোটর গাড়ী উপভোগ করিতেছ, সুস্বাদু খাদ্য ও রুচিকর পানীয় দ্বারা আনন্দ লাভ করিতেছ। আর ঐ দেখ, লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসী একমুষ্টি অন্নের অভাবে, সেই চির-সহচর ক্ষুধার তাড়নায় মানব-স্বভাব হারাইয়া, পশুরও অধম হইতে চলিয়াছে। একবার হিসাব করিয়া দেখিও, অভাব-নিষ্পেষিত লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষে শতকরা কতটী।

শান্তি-স্থাপন যদি রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হয়, তাহার পরেই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য যে, দেশবাসী শ্রম করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা-বিধান। পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্র আজ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা ভাল করিয়া করিতে পারে নাই। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য এ বিষয়ে আদৌ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হয় নাই।

তারপর প্রশ্ন উঠে, দেশ বাসের যোগ্য কি না। ক্ষুধার যদিই বা নিবৃত্তি হয়, দেশবাসী দেশে সুস্থ থাকে কি না। স্বাস্থ্যোপযোগী পানীয় জল দেশে পাওয়া যায় কি? ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া লোক অস্থিচর্ম্মসার হইতেছে কি? যদি হয় তবে রোগ-নিবারণ, ও রোগ হইলে, তাহার উপশমের ব্যবস্থা বিধান, রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। দেশকে স্বাস্থ্যোপযোগী ও বাসযোগ্য রাখা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য কতটুকু কৃতিত্ব দেখাইয়াছে? কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে প্রদীপমালার ক্ষীণালোকে রাজপথ ঈষৎ আলোকিত করিলেই, সে রাষ্ট্র সভ্যরাষ্ট্র হয় না।

আধুনিক রাষ্ট্রের আর এক প্রধান কর্ত্তব্য, লোকশিক্ষা বিস্তার। অল্পবয়স্ক যত বালক ও যত বালিকা, প্রত্যেককে কিছুটা শিক্ষাদান করা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে ধর্ম্ম-মণ্ডলী এই কাজ করিত। আজও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধভিক্ষুগণ এই কাজ করেন। এখন কিন্তু এ দায়িত্ব প্রধানতঃ রাষ্ট্রের। শিশুগণ যথাসময়ে শিক্ষালাভ করিলে, তাহারা যখন যুবক বা যুবতী হইবে, তখন তাহারা শান্তিরক্ষা করিবে, নিজের ও সন্তানসন্ততির ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিবে ও স্বাস্থ্য-রক্ষা করিবে। রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইয়া রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যসাধনে সহায়তা করিবে।

রাষ্ট্রের আর এক কর্ত্তব্য, সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার সহায়তা করা। দেশবাসীর ভিতরে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানে উৎসাহ জাগাইতে হইবে! ভারতবাসী স্বীয় সাহিত্যের ও শিল্পের চর্চ্চা করিয়া জগতের সাহিত্য ও শিল্প-সম্পৎ বৃদ্ধি করিবে। এ বিষয়ে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কৃতিত্ব কত কম! পূর্ব্বে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্প-সম্পদের কিছু আভাস দিয়াছি। তাহার তুলনায় ভারতবাসীর শিল্প-চর্চ্চা আজ কতটুকু? দেশের লক্ষলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইল। ভারতবাসীর তাহাতে গৌরব করিবার কিছু আছে কি? হিন্দু মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান কেহ কি ঐ স্মৃতি-মন্দিরটীকে ভারতবাসীর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রয়াস বলিয়া মনে করিতে পারেন?

এরূপ হয় কেন? ক্ষুধায় উৎপীড়িত, ম্যালেরিয়ায় কঙ্কালসার, পানীয় জলের অভাবে রোগগ্রস্ত, শতকরা ৯০ জনের অধিক নিরক্ষর, সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চ্চায় দেশবাসী নিরুৎসাহ! এরূপ কেন হয়? নিজের রাষ্ট্র যাহারা নিজেরা চালায় না, তাহাদের দুর্দ্দশা এইরূপই হয়। ইহার প্রতিকার কি? প্রতিকার—স্বরাজ।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

প্রভাতী

(১)

ভারতের শান্ত তপোবনে
তরুণ তাপস দল!
জাগ জাগ আজ।
লক্ষ্যহারা নিখিল ভুবনে
তোমাদের পুণ্যোজ্জ্বল
আছে আছে কাজ!
বালার্কের স্বর্ণরশ্মি তোমাদের করে অভিষেক
পাখী গাহে উদ্বোধনী-গান;
প্রতীক্ষা-ব্যাকুল চিত্তে সারা বিশ্ব আছে অনিমেষ
দেবশিশু, হও আগুয়ান!
ভবিষ্যৎ-জগতের দীক্ষা-গুরু সত্যই তোমরা,
ন্যায়-ধর্ম্ম-সত্য-প্রেমে সাজাইবে প্রাণের পশরা,
সাম্য-মৈত্র-স্বাধীনতা তোমাদের জপ-মন্ত্র হবে,
নিশ্চিন্ত নির্ভীক চিত্তে দাঁড়াইবে তোমরা গৌরবে
উচ্চে তুলি শির,
শত ঝঞ্ঝা অবহেলি' তুঙ্গ শৃঙ্গ যথা হিমাদ্রির!

(২)

হিংসা-দ্বেষে পূর্ণ চারিধার
স্বার্থে স্বার্থে অবিরাম
আত্মঘাতী রণ,
শুধু তমঃ শুধু হাহাকার
মানবের পীঠধাম
করিছে মন্থন!

বরষিয়া শান্তিধারা, হে নিষ্কাম কর্ম্মযোগীগণ!
অগ্রসর হও আজি সবে;
আশা-আশ্বাসের বাণী প্রীতিভরে কর উচ্চারণ
ধ্রুব জ্যোতিঃ জ্বালিয়া নীরবে!
নবীন ঋত্বিকবৃন্দ! করি হর্ষে আত্মাহুতি দান
তোমরা করিবে আজ অভিনব যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
তোমরা এ মহাযোগে নব ঋক করিবে রচনা,
উদার প্রাণদ পূত মূর্ত্তিমতী উদগ্র সাধনা
বীজ-মন্ত্র যার;
বিনাশি' বিশ্বের গ্লানি মন্দাকিনী বহিবে আবার!

(৩)

আত্ম-হারা উদ্ভ্রান্ত জগৎ
দুস্তর মৃত্যুর পথে
ছুটিয়াছে আজ;
করি সার অসত্য অসৎ
জীবনের শুভব্রতে
লুটে ধূলি মাঝ!
অমৃতের পুত্রগণ! হাত ধরি উঠায়ে তাহারে
বাঁধ আজি গাঢ় আলিঙ্গনে;
তৃষিত তাপিত আত্মা সিক্ত হোক্ অমৃত-পাথারে
পূত হোক গায়ত্রী-মিলনে!
সম্মুখে উজ্জ্বল আলো পাছে ফিরে চাহিও না আর,
দৃপ্ত তেজে ধেয়ে এস, সুনিশ্চিত বিজয় এবার!
বালব্রহ্মচারীদল! তোমরাই সত্য শক্তিধর
যুগ-প্রবর্ত্তন-নেমি চালাইতে সরল সুন্দর
মঙ্গল-অঙ্গনে;
যুগ-স্রষ্টা ঋষি জাগে তোমাদেরি দিব্য আবাহনে!

(৪)

জগতের মাঝখানে আজি
ভারতের সিংহাসন
প্রতিষ্ঠিতে হবে;
পাঞ্চজন্য উঠিয়াছে বাজি'

যুগাচার্য্য নারায়ণ
ডাকিছেন সবে!
সকল দৌর্ব্বল্য-কুণ্ঠা পরিহরি' চিরদিন তরে
জাগ, জাগ, ঋষি সুতগণ!
বৈরাগ্যের অন্তরালে কি ঐশ্বর্য্য অনুক্ষণ ক্ষরে
দাও আজি তা'রি নিদর্শন।
অনন্তের পান্থ যারা দু'দণ্ডের ক্ষুদ্র খেলা-ঘরে
কেমনে রাখিবে বল, আপনারে তারা আজি ধরে,
অসীম আকাশ ঊর্দ্ধে, নিম্নে ধরা দিগন্ত বিস্তার
অফুরন্ত ধারে নিত্য ঝরিতেছে কৃপা বিধাতার
কে রবে বঞ্চিত;
তরুণ সাধকবৃন্দ! এস, এস, সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সমাজ সংস্কার।

[বরিশালে বঙ্গীয়-প্রাদেশিক-সামাজিক-সম্মিলনে (১০ চৈত্র, ১৩২৭ সন) সভাপতির অভিভাষণের সারমর্ম]

শাস্ত্র বড় না দেশাচার বড়?

সমাজ-সংস্কারের ভিত্তি কি পরিমাণে শাস্ত্রের অনুশাসনের উপর দাঁড় করান যাইতে পারে, গত অধিবেশনের সভাপতি, পণ্ডিত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহা দেখাইয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রের অস্ত্রাগার হইতে বাছা বাছা অস্ত্র বাহির করিয়া, দেশাচার-দুর্গ আক্রমণে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন, জাতিগত-সংস্কার-বর্জ্জিত জগন্মিত্র রাজা রামমোহন রায়। তাহার পর, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর। আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞান-বলে যে নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, উপনিষদে বা বেদান্তে কীর্ত্তিত সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার কল্পে, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় আত্মীয় সভা স্থাপন করেন। কিন্তু "দেশাচারই সার ধর্ম্ম" এই বুদ্ধি-নাশ করিতে পারেন নাই। "উপনিষদে মোক্ষলাভ রূপ পরম মঙ্গল নিহিত আছে" শঙ্করাচার্য্যের এই আশ্বাসবাণী কয়জনের আত্মতত্ত্ব লাভের সহায় হইয়াছে? এই সময়ে রাজা সতীদাহ নিবারণের আন্দোলন ও আরম্ভ করেন এবং প্রায় দশবৎসর আন্দোলনের ফলে উহা নিবারিত হয়। আজ কাল স্কুলের ছেলেরাও যে প্রথাকে বর্ব্বরোচিত বলিয়া মনে করে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, দেশাচার-রক্ষকগণ তাহার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় আন্দোলন উপস্থিত করিতে ত্রুটি করেন নাই! কথিত আছে যে, বিদ্যাসাগর-জননী এক বালিকার বৈধব্যে বিচলিত হইয়া, শাস্ত্রবিশারদ পুত্রকে বলিয়াছিলেন,—"তোদের শাস্ত্রে কি বিধবা বিবাহের বিধি নাই।"

পুত্র এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু সেই দিন হইতে, শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া, বিধবা বিবাহের অনুকূলে ব্যবস্থা আছে কি না জানিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, শাস্ত্রীয়-প্রমাণ দেখাইতে পারিলে, দেশবাসী তাহা মানিয়া লইবে। গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমেডিস (Archimedis) যেমন জলের ওজনে স্বর্ণের ভারিত্ব পরীক্ষার উপায় আবিষ্কার করিয়া, "পাইয়াছি, পাইয়াছি" রবে চিৎকার করিতে করিতে, উলঙ্গাবস্থায়, প্রকাশ্য রাজপথে ছুটিয়াছিলেন, সমাজ-সংস্কারক এই মহাপুরুষও স্মৃতি-শাস্ত্র হইতে বিধবা-বিবাহ-সমর্থক বচন-সংগ্রহ করিয়া, আনন্দে অধীর হইয়া, লোক-সমাজে প্রচার করিয়া কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষ বিচারে, এই ব্যবস্থা অখণ্ডনীয় হইলেও, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলেই বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতিবাদীগণের মত-খণ্ডন করিয়া, স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেও, হিন্দুসমাজের লোকের ধর্ম্ম-বুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—"ধন্যরে দেশাচার"। অতীতের স্তূপ খুঁড়িয়া রত্ন বাহির করিবার সাধ্য না থাকিলেও, অগ্রগামী মনীষীগণের চিন্তাস্রোতে যে সমস্ত স্বর্ণ-কণা সকল ভাসিয়া আসিয়াছে, বর্ত্তমানের কূলে দাঁড়াইয়া, ভবিষ্যতের আশায় উহা সংগ্রহ করা, সামাজিক জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই অতীতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারিতেছি না।

মানবের বয়স কত ?

• হিন্দু সভ্যতার প্রাচীনত্ব লইয়া আমরা অনেক সময় গর্ব্ব করিয়া থাকি। Count Biornstjern (কাউণ্ট-বিয়র্ণষ্টিয়ার্ণ) প্রভৃতির দোহাই দিয়া বলি যে, জগতের অন্য কোন জাতি সভ্যতার প্রাচীনত্ব লইয়া হিন্দুদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে আর্য্য-নিবাস সংস্থাপিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের মতে, আদিতে পৃথিবী ছিল না, রাত্রি দিনের প্রভেদ ছিল না, অতিদূর বিস্তৃত আকাশও ছিল না ; কেবল একমাত্র বস্তু, বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে, আত্মামাত্র অবলম্বনে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। মনুসংহিতা পাঠে জানা যায় যে, যিনি মনোমাত্রগ্রাহ্য সূক্ষ্মতম অব্যক্ত সনাতন, সেই সর্ব্বভূতময় অচিন্ত্য পুরুষ স্বয়ংই শরীরাকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সৃষ্টি-কার্য্য অনবরত চলিতেছে। উহার আদিও নাই, অন্তও নাই। আর্য্য দর্শনশাস্ত্র সমূহে সৃষ্টি-কার্য্য অনবরত চলিতেছে। উহার আদিও নাই, অন্তও নাই। আর্য্য দর্শনশাস্ত্র সমূহে সৃষ্টিতত্ত্ব বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাংখ্য মতে, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি হইয়াছে। পুরুষ কর্ত্তৃক প্রকৃতির যে ভোগ এবং পুরুষের যে মুক্তি, এই উভয়ের জন্য, পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ-বশতঃ, সৃষ্টি হইয়া থাকে। সাংখ্য মতে ব্রহ্ম স্বীকৃত না হইলেও এবং অন্যান্য দর্শনে সামান্য মতদ্বৈধ দেখা গেলেও, এক পরম ব্রহ্ম হইতেই যে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতে আর বিশেষ মতভেদ নাই। উপনিষদের মতে, প্রথমে এক ব্রহ্মই ছিলেন। তাঁহার বহু হইবার ইচ্ছা হইল, "একোঽহং বহু স্যাং"। এই ইচ্ছাতে জগতের সৃষ্টি হইল। প্রথমে পৃথিবী, তাহার পর চরাচর

সৃষ্টি হইল। জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রাচীন ব্যাবিলনে যে মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার সহিত ইহুদী ধর্ম্মমতের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। এই মতানুসারে, ভগবানের আদেশেই ক্রমে ক্রমে জগতের বিভিন্ন অংশের উৎপত্তি এবং সেই সকল অংশের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলেন—"আলোক হউক", অমনি আলোকের উৎপত্তি হইল। অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছায় "নাস্তি" হইতে "অস্তি" হইয়াছে। গ্রীসের প্রাচীন যুগের দার্শনিকগণের মতে, জগতের রূপ ও স্থিতি-কাল উভয়ই অনাদি ও অনন্ত। আমরা যে অবস্থায় জগৎ দেখিতেছি. সেই অবস্থায় ইহা আছে ও থাকিবে। এরিসটোটলের (Aristotle) মতে যাহার কারণ অনাদি ও অনন্ত, তাহা নিজেও অনাদি অনন্ত। এ পর্য্যন্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীন মতানুসারে নিষ্ক্রিয় পরমাণু ক্রিয়াশীল হওয়ায় সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। আধুনিক গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, অনন্ত ও অসীম শক্তির বিকাশ মাত্র—"all things proceed from infinite and eternal energy"। এই মতানুসারে আদিতে সূর্য্য এবং গ্রহ সকল ঘূর্ণীয়মান জ্বলন্ত-বাষ্পীয় অবস্থায় (nebular state) ছিল। পরে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া অন্তরীক্ষে ঘুরিতে লাগিল। এই প্রকারে নবগ্রহের বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর যে জ্যোতির্ম্ময় গোলক অবশিষ্ট রহিল, ইহাই "সৌর-জগৎ-প্রসবিতা সূর্য্য"। সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর হইতেই, পৃথিবী ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হওয়ায় তাহার বহিরাবরণ (crust) গঠন হইতে লাগিল। পদার্থ-তত্ব, ভূ-তত্ব এবং প্রাণী-তত্ত্ববিদগণ, ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে, পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখনও শেষ মীমাংসা হয় নাই। তবে ন্যূনকল্পে পৃথিবীর বয়স সাড়ে সাত কোটি বৎসর ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ের বিস্তৃত ভাবে গবেষণা করিবার স্থান এ নহে।

তথাপি কিছু না বলিলে আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলিতে পারিব না বলিয়া সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলিতে হইতেছে। প্রাণীগণের আবির্ভাবের প্রথম হইতে ভূতত্ববিদগণ পৃথিবীকে চারিস্তরে বিভক্ত করিয়াছেন যথা :—(1) Primary Period, (2) Secondary Period, (3) Tartiary Period and (4) Recent Period। অর্থাৎ প্রথম যুগে মেরুদণ্ডহীন জীব এবং মৎস্যের আবির্ভাব, পরে সরীসৃপের এবং তৃতীয় যুগে স্তন্যপায়ী-জীবজন্তুর আবির্ভাব। মানব-জন্মের যুগ, সর্ব্বশেষে। ক্রমবিকাশের ফলে, আদ্য জীবাণু (portist ancestors) হইতে মানুষ আদিম অবস্থায় পৌছিতে, ২।৩ লক্ষ বৎসর লাগিয়া থাকিবে। অন্ততঃ ২০,০০০ বৎসর হইতে পূর্ণাবয়বের মানুষ যে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যাবতীয় জীব ও জড় পদার্থ আদিম অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নততর অবস্থায় বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, এই দার্শনিক মত মানিলে বলিতে পারা যায় যে, ইতর জীব হইতে উদ্ভূত মানুষ, দেহ ও মনে, উহাদেরই উত্তরাধিকারী।

রসেটা প্রস্তর (Rosetta stone) ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। উহার সাহায্যে মিশরের প্রাচীন ঐতিহ্য লোকসমাজে প্রচারিত হইবার পর, অনেকে মনে করেন যে সভ্যতার প্রথম জ্যোতিঃ, ১০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে, মিশরেই দেখা গিয়াছিল। নিউইয়র্ক (New York)

নগরের রক্ষিত হফ্‌ম্যান ট্যাবলেট Hoffman Tablet) ৭,০০০ বৎসর পূর্ব্বের অক্ষরে লেখা। ইহা হইতে অনেকেই মনে করেন যে আর্য্য সভ্যতা ৭,০০০ বৎসর অপেক্ষা পুরাতন নহে।

নূতন ভাবে সমাজ গঠন।

মনুসংহিতার মতে পরমেশ্বর আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম ব্রাহ্মণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পশুরক্ষণ, দান, অধ্যয়ন, ভোগশক্তির পরিবর্জ্জন, এই কয়েকটি কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের জন্য নিরূপিত আছে। পশুরক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্যবৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ এবং কৃষিকর্ম্ম বৈশ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উপরোক্ত তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্রের প্রধান কর্ত্তব্য। আবার গীতার মতে গুণকর্ম্মের বিভাগে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা হইতেছে কিনা সন্দেহের বিষয়। জন্মগত অধিকার রক্ষা উচ্চশ্রেণীর লক্ষ্য হইলেও, অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা, গুণকর্ম্মের বিভাগ অনুসারে সমাজে নিজ নিজ স্থান অধিকারের জন্য অধৈর্য্য হইয়া ছুটিয়াছে। পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির ফলে মানব সমাজ তোলপাড় হইয়াছে। যাহা কিছু বাকী ছিল, গত যুদ্ধের ফলে তাহাও সংঘটিত হইয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে অমর কবি হেমচন্দ্র তাঁহার দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে, তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
গগণের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে,
বায়ু, উল্‌কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও ; যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।"

এই বাণী বঙ্গীয় যুবকদলের কর্ণে পৌঁছিয়াছিল বলিয়া বঙ্গমাতা জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, ব্যোমকেশ প্রভৃতিকে ক্রোড়ে স্থান দিয়া গৌরবান্বিতা হইয়াছেন।

আর্থিক অবস্থা মন্দা হওয়ায়, পেটের দায়ে জন্মগত ব্যবসায়ের ধার কেহ ধারিতেছেন না। জাতের গোঁড়ামী নাই বলিলেই চলে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষাপ্রয়াসী ব্যক্তিগণও জাতীয় বৃত্তি রক্ষা অলঙ্ঘ্য কর্ত্তব্যস্বরূপ মনে করিতেছেন না। কর্ম্ম সমুদায়ের দোষগুণ বিবেচনা রহিত হওয়ায় চারি বর্ণই আচার ভ্রষ্ট হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ-সন্তান গায়ত্রী-জপাদির অনুষ্ঠান না করিয়াও দ্বিজ-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতেছেন না। "ব্রহ্মাবর্ত্ত" "ব্রহ্মর্ষি" বা "মধ্য দেশের" আচার "সদাচার" বলিয়া বাঙ্গালীরা মানিতেছেন না। একমাত্র সেবা ধর্ম্মই যেন সকল বর্ণের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম্মে কর্ম্মে পরমত-সহিষ্ণুতা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। "ঠগ্‌ বাছিতে গাঁ উজাড়" হওয়ার ভয়ে অখাদ্য ভোজন ওজুহাতে দলাদলি বা "একঘরে" করার চেষ্টা সহরে ত নাইই, পল্লীতেও দিন দিন কমিয়া আসিতেছে! মনু বলিয়াছেন পরমাত্মা হইতে সর্ব্বাগ্রে জল প্রসূত। কিন্তু বিজ্ঞানাগারে সর্ব্বজাতির ছাত্রেরা দেখিতেছে যে, দুইটী বাষ্পের (Oxygen and Hydrogen) মিশ্রণে জল উৎপাদিত হয় এবং সেই জল কোন

নীচ জাতীয় ছাত্রের হাতে অশুদ্ধ অবস্থায় পরিণত হয় না। পরন্তু নানা জাতীয় লোকের হস্তস্পর্শে কলুষিত ও জলশোধক যন্ত্র দ্বারা পরিষ্কৃত জলপানের ফল দেখিয়া ত্রিসন্ধ্যাকারী ব্রাহ্মণও গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া, কলের জলপানে স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রকার পরোক্ষভাবে "জলচল" আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা জাতীয় উন্নতির প্রবেশদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিও সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। এ সময়ে পূর্ব্বসংস্কারে এবং কুসংস্কারের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া নূতন ভাবে জাতিগঠনের দরকার পড়িয়াছে। সমাজ নূতন করিয়া গড়িবার জন্য সকল দেশের লোক ব্যগ্র হইয়াছে, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, বিরোধ ঘুচাইয়া বিশ্বমানব এক হইতে চাহিতেছে। ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু যে প্রকার পূর্ব্বাভাস দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এখন

"একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা ধ্বজা।"

যে মহাপুরুষ ভারতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রাণপাত করিতেছেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন untouchability must go (অর্থাৎ, সংস্পর্শ দোষ দূর করিতেই হইবে); অতএব, এ সম্বন্ধে যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগের আর দরকার মনে করি না।

সংহতি কার্য্য-সাধিকা।

আর্য্য অনার্য্যের সংঘর্ষের ফলে ভারতে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। যতদিন আর্য্যদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল, ততদিন সুশীতল বর্ণাশ্রমের ছায়ায় জ্ঞান প্রাধান্যের দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কেন না "সর্ব্বপ্রাণীহিতেরতঃ" ব্রাহ্মণগণ সমাজ-শরীরব্যাধি মুক্ত রাখিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন এবং তাহাতে সফলকামও হইতেন। অনার্য্য-দিগকে ক্রমে ক্রমে আর্য্যসভ্যতার অঙ্গীভূত করিতেও চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। যাঁহারা "Totemism" (জন্তু বা বৃক্ষাদিতে বংশ-চিহ্ন-জ্ঞান) বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, কারণ-জলে শক্তিবীজ সঞ্চারে অণ্ডে পরিণতি এবং সেই অণ্ডে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তি প্রভৃতি totemismএর রূপান্তর মাত্র। জ্ঞানানুশীলনের ফলে, আর্য্য অনার্য্যের ব্যবধান ক্রমে দূর হইতেছিল। তাহা না হইলে, ধীবর কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও, ব্যাসদেব পূজার্হ হইতেন না। এই ভাবে লিঙ্গার্চ্চনা (Phallic worship) তন্ত্রোক্ত উপাসনায় পরিণত হইয়াছিল। এখন ভারতের বিভিন্ন জাতির শিক্ষা দীক্ষা, এমন কি, আর্থিক অবস্থা উন্নত করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা, একই ভাবে উচ্চ এবং নীচ সকল বর্ণের মধ্যেই দেখা যাইতেছে। সকলেরই আদর্শ—স্বতন্ত্রতা (self-determination)। দ্বন্দ্ব-প্রবণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকণা একত্রে মিশিয়া সমাজ-শরীর গঠন না করিলে তাহাতে জাতীয়-জীবন সঞ্চার হইবার আশা নাই। দেশ-নায়কদের কর্ত্তব্য বাঙ্গলার লোকের নবজাতি-

গঠনের মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া। যে এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারই সর্ব্বপ্রকার সুখ সমৃদ্ধি ভোগ করিবার অধিকার আছে, এ কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে। দুই কোটীর অধিক লোক, ২৫ লক্ষ লোকের নিকট "অচল" হইয়া থাকিতে পারে না, থাকিবেও না। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের আশায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের সারথী হইয়াছিলেন। আমরা চাহিতেছি—"স্বরাজ"। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথে রথের ন্যায় স্বরাজ-রথে "মানব-শক্তি" বসাইয়া, সকল জাতির হাতে রথরজ্জু দিলে, তবে এ রথ চলিবে। যতদিন কেবল উচ্চ জাতির উপর রথ চালনার ভার থাকিবে, ততদিন এ রথ নড়িবে না। এখন আমরা ইংরাজের প্রজা, ব্রীটিস-ইণ্ডিয়ায় বাস করি। আইন-কানুনে জাতিবিশেষের কোন খাতির নাই। যা কিছু খাতির, বিবাহ-সম্বন্ধ নির্ণয়ে এবং পংক্তি-ভোজনে; আর এ দুই বিষয় লইয়াই আমাদের জাত্যাভিমান। আপনাদিগকে চিন্তা করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির গণ্ডি পার হইয়া মহাজাতিতে পরিণত হইতে চাহেন, কিম্বা ভেদনীতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, বিশ্বের মাঝে নগণ্য এবং লাঞ্ছিত রহিতে ইচ্ছা করেন। যাহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের সাড়া পড়িয়াছে মনে করিয়া বৃদ্ধ বয়সে আশান্বিত হইতেছি, বাঙ্গলার সেই যুবকবৃন্দকে এই সামাজিক-সমস্যা মীমাংসা করিতে আহ্বান করিতেছি। জাতীয় জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে যুবকগণ যদি সৎসাহসের পরিচয় দিয়া শুক্রজনন-শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর না হন, তাহা হইলে দেশের দুর্দ্দিন ঘুচিবার বহু বিলম্ব আছে মনে করিতে হইবে। বিবাহ করিয়া পিতৃ-মাতৃ-ঋণ শোধের দিন আর নাই।

স্ত্রী স্বাধীনতা।

গ্রাম্য স্কুলে পড়িবার সময় কবিবর হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী আমার হাতে পড়ে। বয়স তখন ১২ বৎসরের বেশী ছিল না, কিন্তু কবিতাগুলি এত ভাল লাগিয়াছিল যে, সকল কথার মানে না বুঝিলেও, অনেক কবিতাই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম—

ওরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া সদাচার।
হয়ে আর্য্যবংশ—অবনীর সার—
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে!"

এই কয়েক পংক্তি যে কতবার আওড়াইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। কিছুকাল পরে কাশীতে গেলাম। সেখানে মাতৃদেবী "কুমারী পূজা" করিলেন, দেখিয়া মনে খটকা বাধিল। যাহারা বালিকার চরণপূজা করে, তাহাদের মধ্যে দয়া সদাচার নাই, এ কেমন কথা! দেশে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, আমাদের পার্শ্বের বাড়ীর একটি বালিকা বিধবা হইয়াছে। গ্রামে অনেক বিধবা আছে, আমাদের বাড়ীতেও বিধবার অভাব ছিল না, সুতরাং এ ঘটনায় বিচলিত হইবার কিছুই ছিল না। গ্রীষ্মকালে রাত্রে একদিন বিধবা বালিকার কাতর ক্রন্দনের রব কাণে আসিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, আমাপেক্ষা বয়সে ছোট সেই বালিকাটি নিরম্বু উপবাসের তাড়নায় অস্থির হইয়াছে দেখিয়া

তাহার মা কাঁদিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েও কাঁদিতেছে। বুঝিলাম, মর্ম্মভেদী দুঃখের তীব্রতা নিবারণের জন্য কবি গাহিয়াছিলেন—

"হায় রে নিষ্ঠুর পষাণ-হৃদয়,
দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয় ;
বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,
নারী বধ ক'রে তুষ্ট করে দেশাচার
এই যদি এ দেশের শাস্ত্রের লিখন
এ দেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ ?"

ইউরোপে ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রমণীর পদমর্য্যাদা বড় বেশী ছিল না। আইনের চক্ষে তাহাদের অধিকার কিছুই ছিল না বলিলেই চলে। স্বামীর, স্ত্রীর উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল, কন্যাকালে সম্পূর্ণরূপে পিতামাতার কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে হইত। অথচ মাতৃমূর্ত্তির পূজা এবং যোনি-পূজা প্রায় সর্ব্বদেশেই প্রচলিত ছিল এবং অনেক দেশে এখনও আছে। তান্ত্রিক-যুগে এই পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল এবং "কন্যাকেও যত্নে পালন করিবে" এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। আমরা এই উক্তির দোহাই দিয়া, আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করিতেছি। মনুর বিধান মতে, ভর্ত্তা প্রভৃতি স্বজনেরা দিবারাত্রি মধ্যে কদাপি স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনাবস্থায় অবস্থান করিতে দিবে না, তাহাদিগকে সদা স্ববশে রাখিবে। স্ত্রীজাতি কৌমারাবস্থায় পিতা কর্তৃক, যৌবনে ভর্ত্তা কর্ত্তৃক এবং স্থবির অবস্থায় পুত্র কর্তৃক রক্ষণীয়া। কেবল ভারতে নহে, অনেক দেশেই রমণী অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইতেন। তাহা না হইলে, "স্ত্রী পণ" করিয়া পাশা খেলা চলিতে পারিত না ; মৃতপতির কবরে বা সহমরণে যাওয়ার প্রথা প্রচলিত হইত না। একদিকে র‍্যাফেল (Raphæl) এবং লরেনজেটি (Lorenzetti) অঙ্কিত ম্যাডনা-মূর্ত্তির (Madonna) আদর, অপরদিকে জীবন্ত মূর্ত্তির প্রতি অনাদর—কারণ ত বুঝিয়া পাওয়া যায় না! অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী-দার্শনিক Auguste Compte তাঁহার Religion of Humanity বা "মানবত্ব-ধর্ম্ম" প্রচার করেন। তিনি বলিয়াছেন—

"Humanity is but an abstraction and forbids the glow of adoration with which service is touched in all religions which offer a personified object for adoration. As an aid to their faith, nearly all religions recognize sacred symbols, not indeed to be confounded by clearer minds with the original object of adoration, but worthy of reverence in its place as its special representative and reminder In precisely this sense, the sacred emblem of Humanity is Woman. In woman, Humanity is enshrined and made concrete for the homage of man."

Auguste Comte নারী জাতির যে আদর্শ জনসমাজের সম্মুখে ধরিয়াছেন, উহাতে তাঁহার সময়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না। অষ্টাদশ-শতাব্দীতে, ইউরোপে নারীজাতির অবস্থা, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থাপেক্ষা, বিশেষ উন্নত ছিল না। যাঁহারা মনুসংহিতার

স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধ-মত শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের তুষ্টির জন্য Shakespeare হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"I will be master of what is mine own.
She is my goods, my chattels ; she is my house,
My house-hold stuff, my field, my barn,
My horse, my ox, my ass, my anything ;
And here she stands, touch her whoever dare."

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে, ইউরোপে নারী জাতি বিষয়ক ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে সে দেশের রমণীও পরাধীনা এবং পুরুষের দাসী ভাবে দিন কাটাইতেন। বিবাহিতা রমণীর নিজের কোন civil rights ছিল না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে, ইংলণ্ডে "স্ত্রী-ধন" বিষয়ক কোন আইনও ছিল না। কয়েকদিন পূর্ব্বে English-man কাগজে "গুরুপ্রসাদী" প্রথার আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহারা কি জানেন যে Jus Primae Noctos নামক কুপ্রথাই ফরাসী-বিপ্লব সূচনার একটী প্রধান কারণ? Napoleanic Code অনুসারে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি এবং সমগ্র স্ত্রীজাতি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির মধ্যে গণ্য। রুস দেশে (Russia) এখনও "স্ত্রী ঠেঙ্গান" প্রথা প্রচলিত আছে এবং অনেক স্ত্রী বেত না খাইলে স্বামীসোহাগিনী মনে করেন না। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, জার্ম্মানীতে (Germany) স্বামী, ভৃত্য-বর্গের সম্মুখে, স্বীয় স্ত্রীর বিবস্ত্র নিতম্বে বেত্রাঘাত করিতে আইনতঃ অধিকারী ছিলেন। মধ্য-যুগে জার্ম্মানীতেও "Chastity-Belt"এর প্রচলন ছিল। আমাদের দেশে কিন্তু বহু শতাব্দী হইতে রমণী "দেবী" বলিয়া আদৃত হইয়া আসিতেছেন। যে পরিবারে রমণীর আদর নাই, দেবতা তথায় বাস করেন না, ইহা অতি প্রাচীন কথা। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের দেশের রমণী পদমর্য্যাদায় তাঁহার ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশের ভগ্নী অপেক্ষা হীন ছিলেন না, ইহা দেখান হইল।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানে রমণীর নিকট উচ্চ-শিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক ; তাই, অর্দ্ধশতাব্দির মধ্যে স্বাধীন দেশে যাহা সম্ভবপর, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরতন্ত্রতার মধ্যে এ দেশে তাহা অসম্ভব। যুদ্ধের চারি মাস পূর্ব্বে, প্যারি (Paris) নগরে একজন ফরাসী বিদুষী রমণীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলি যে, ফরাসীরা ম্যালথাসের (Malthus) মতানুবর্ত্তী হওয়ায়, দেশের জনবল যেমন বাড়া উচিত, তেমন বাড়িতেছে না, যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিলে হটিয়া যাইতে হইবে। রমণী হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের ত লোকের অভাব নাই, তবে আপনাদের এমন দুর্দ্দশা কেন? আমরা অকর্ম্মণ্য লোকের সংখ্যা বাড়া দরকার মনে করি না, আমরা কেবল যোগ্য-লোক (fit men) চাই।" স্ত্রী-স্বাধীনতা (emancipation of women) সম্বন্ধে আলোচনায় বুঝা গেল যে, তাঁহার মতে স্ত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ ইংলণ্ডেই ঠিক ভাবে বিকাশ লাভ করিতেছে ; এবং ইহার প্রধান কারণ, সে দেশের চরিত্রবান পুরুষের সংখ্যা বেশী। ফরাসীদেশে অভিভাবিকা সঙ্গে না থাকিলে, অবিবাহিতা রমণী প্রকাশ্য ভাবে

চলাফেরা করিতে পারেন না, আর ইংরাজ রমণীরা অকুতোভয়ে ও অশঙ্কিতচিত্তে যথা ইচ্ছা গমনাগমন করেন। তুরস্ক যে "sick man" আখ্যা পাইয়াছে, অবরোধ-প্রথাই তাহার অন্যতম কারণ। ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "যে দেশের যুবকেরা পরিবার প্রতিপালনে ক্ষমতা না থাকিলেও বিবাহ করিয়া বসে, যৌবনাগমের পূর্ব্বেই বালিকাকে পাত্রস্থ করা যে দেশের শাস্ত্রের ব্যবস্থা, সে দেশ বর্ত্তমান সভ্য জগতে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। সে দেশের লোক চিরকালই পদানত থাকিবে। Let your country have a population of strong and comfortable citizens and let us stand by small number and slow increase of manly men and womanly women." গত যুদ্ধের ফলাফল দেখিয়া এই বিদুষী ফরাসী রমণীর কথা যেন ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া বোধ হইতেছে। মিত্র-শক্তি রমণী-সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া যে যুদ্ধজয়ী হইয়াছেন, ইহা এখন সর্ব্ববাদী-সম্মত। বঙ্গীয়-সমাজ-সংস্কার-সমিতির প্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য—রমণীর উচ্চশিক্ষা। ইহা কি ভাবে দেওয়া হইবে, দেশ-নায়কেরা সে চিন্তা করিবেন। অবরোধ-প্রথা, নারী-শিক্ষা এবং জাতিগঠনের অন্তরায়। ক্রমে ক্রমে ইহার মূলচ্ছেদন আবশ্যক। যে দেশের রমণী ১০,১২ বৎসরে বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া, "অন্তঃপুরবাসিনী" বলিয়া গৌরব বোধ করেন, সে দেশে রমণীর উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করা যে কত কঠিন, যাঁহারা নারীশিক্ষার উন্নতি কল্পে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাই ইহা অবগত আছেন। কলিকাতা সহরে অনেক হিন্দুঘরের মেয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিবার উপযুক্ত এবং সামান্য বেতনে কাজ করিতেও প্রস্তুত আছেন, কিন্তু গাড়ীভাড়ার খরচা এত বেশী পড়ে যে, তাঁহাদের নিযুক্ত করা সম্ভবপর হয় না। ১৫৲ টাকা যাঁহার মাহিনা, তাঁহার গাড়ীভাড়া দিতে হয় ৩০।৩৫ টাকা। এত বাজে খরচ করিয়া নারীশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা অসম্ভব। বোম্বাই প্রদেশে অবরোধ প্রথার বাড়াবাড়ি নাই, এবং সে দেশে রমণীরা হাঁটিয়া বা ট্রামে যাতায়াত করিতে পারেন। কাজেই নারীশিক্ষা-ক্ষেত্র তথায় দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। আর আমরা,

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না

কবির এই প্রাণের কথায় কান দিতেছি না। এ সম্বন্ধ আমার কথা আমি শেষ করিলাম। কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন —

"এ হেন প্রকাণ্ড মহীখণ্ড মাঝে
নাহি কিরে কোন বীরাত্মা বিরাজে,
এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড,
সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড
স্বজাতি উজ্জ্বল করিয়া তবে?"

"বীরত্মার" সন্ধান পাইয়াছি এবং আশা করি তাঁহারা হাতিয়ার ঠিক করিয়া সমাজ-সংস্কার-যুদ্ধে অদম্য উৎসাহে অগ্রসর হইবেন।

শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী।

গীতায় বিজ্ঞানতত্ত্ব।

বিজ্ঞান আলোকিত এই বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চর্চ্চা বোধ হয় কাহারও অপ্রীতিকর হইবে না। কেননা, এই বিজ্ঞানের ও যুক্তি-বাদের যুগে, লোকে বিজ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ বাক্যাতিরিক্ত কোন কথা শুনিতে চান না। তাই আজ—"গীতায় বিজ্ঞানতত্ব"—এই সুসংবাদ উপস্থিত করিতেছি। আমরা হিন্দু; ধর্ম্মই হিন্দুদের প্রাণ; ধর্ম্ম-শিক্ষা আমাদের মজ্জাগত,—আহারে, বিহারে শয়নে, ভোজনে, গমনে আমাদের জীবনের সর্ব্ব কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের কিছু না কিছু সম্বন্ধ আছে। তাই, আজ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্য দিয়া, বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। গীতা-গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার কাহারও নিকট পরিচয় প্রদান আবশ্যক করে না। কারণ, হিন্দু মাত্রেই ইহার নাম শুনিয়াছেন, ও যাহার সৌভাগ্য আছে, তিনি পাঠ করিয়াছেন। গীতা সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে—"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কি-মন্যৈ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ, যা পদ্মমুখ নাভস্য মুখপদ্ম বিনিস্থতা" "সর্ব্বোপ নিষদ গাব"। গীতা পাঠে আমরা কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য (science) শিক্ষা করিতে পারি কিনা, আজ তাহারই কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

২। গীতা যে ভগবৎ উক্তি, ইহাই আমার বিশ্বাস। গীতা যে কেবল হিন্দুর নহে—সমুদায় জাতির—কি হিন্দু কি অহিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ সমুদায় মানব-জাতির সাধারণ-সম্পত্তি, তাহাও আমার বিশ্বাস আছে। যাঁহারা গীতা-গ্রন্থকে ভগবৎ-উক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের ইহা মনে রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে, ঈশ্বর যখন স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থের সাধারণ স্রষ্টা, তখন তাঁহার শিক্ষায় কখন ঐকদেশিকতা থাকিতে পারে না; কেননা, তিনি সকলের; কাজে কাজেই তাঁহার শিক্ষা, কোন বিশেষ জাতির নিজস্ব নহে; ইহার শিক্ষা, সকল মানব জাতির শিক্ষনীয় ও আশ্রয়নীয়। যাহা হউক, ধর্ম্ম-জগতে গীতার স্থান নির্দ্দেশ এ স্বল্প-বুদ্ধি লেখকের আজ প্রতিপাদ্য বিষয় নহে; আজ আমার প্রতিপাদ্য বিষয়, আবার বলি, গীতা-পাঠে আমরা কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যে উপনীত হইতে পারি কি না। আমি কোন বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ (scholar) বা অধ্যাপক নহি যে, আপনারা আমার নিকট হইতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ সমীক্ষতা আকাঙ্ক্ষা রাখিতে পারেন। তবে গীতা-পাঠে যে কথঞ্চিত সত্য-তথ্য অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাই আজ এই পাশ্চাত্য শিক্ষান্বিত মহোদয়গণের নিকট মিষ্টান্ন-রূপে অর্পণ করিতে বাসনা হওয়ায় উপস্থিত হইয়াছি। ভরসা করি, আপনারা যদি কিয়ৎকাল একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া, এ বন্ধু স্থানীয় লেখকের কথা মনোযোগ পূর্ব্বক প্রণিধান করেন ত, বড়ই বাধিত হইব।

৩। আমার ধারণা ও বিশ্বাস যে-ধর্ম্মে ও বিজ্ঞানে কোন বিসম্বাদ থাকিতে পারে না। যে ধর্ম্মের মূলে বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট নহে, উহা ধর্ম্ম-পদ-বাচ্য নহে; কারণ, যাহা আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক এই উভয়বিধ উন্নতির পথ প্রদর্শক, উহাই ধর্ম্ম-পদ-বাচ্য; "যতো নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" যদি ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের কোনরূপ শত্রুতা থাকিত, তাহা হইলে গীতায়

ব্রাহ্মণের গুণলক্ষণের মধ্যে—"জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিকাং ব্রহ্ম কর্ম্ম স্বভাবজং"—একথা উক্ত হইত না। বিজ্ঞান অর্থে, যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে কোন বিষয়ের বিশেষ বা তৎতৎ প্রকৃতি-গত জ্ঞান জন্মে; ইংরাজিতে বলে—'systematised knowledge'। জল আছে, জল খাইলে তৃষ্ণার নিবারণ হয়,—মানুষের এই যে জ্ঞান, উহার নাম সাধারণ-জ্ঞান। কিন্তু, আমরা যদি জানিতে চেষ্টা করি, এই জল কি কি উপাদানে উৎপন্ন, তখন আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত সাধারণ-জ্ঞান-পথ হইতে কিছু অগ্রগামী হইতে হইবে; এবং, যখন যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিব যে, এই যে জল, উহা দুইটী বায়বীয় পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন, যথা একভাগ অম্ল-জান (Oxygen) ও দুই ভাগ জল-জান (Hydrogen), তখন আমাদের জল সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হইবে,—উহারই নাম বিজ্ঞান। এরূপ প্রণালীতে সমুদায় স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থের যে বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়, উহার বিশেষ বিশেষ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; যেমন উদ্ভিদ সম্বন্ধে যে বিশেষ জ্ঞান-লাভ, উহার নাম উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বা Botany; স্বর্ণাদি ধাতু সম্বন্ধে যে বিশেষ জ্ঞান, উহার নাম ধাতব-বিজ্ঞান বা Mineralogy, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিজ্ঞানের নানা শাখা আছে। ঐ শাখা প্রশাখার এক এক বিশেষ সংজ্ঞা বা নাম আছে।

৪। এখন আমরা দেখিব, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহিত গীতার কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে কি না। আপনারা পড়িয়া থাকিবেন বা শুনিয়া থাকিবেন যে, আমাদের যে এই পরিদৃশ্যমান জড়-জগৎ, উহা কতকগুলি মূল ভৌতিক পদার্থের সমবায়ে সৃষ্ট। এই মূল-ভূতের ইংরাজি নাম elements। এই সৃষ্ট-পদার্থ, স্থাবর ও অস্থাবর ভেদে, দ্বিবিধ। আরও শুনিয়া থাকিবেন যে, পদার্থের ধ্বংস নাই, ইহা পরিবর্ত্তন-শীল মাত্র। ইংরাজি বিজ্ঞানে বলে—matter is indestructible। আমাদের বিজ্ঞানে, ইহাদের নাম—ক্ষিত্যপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম; অর্থাৎ, earth, water, heat, air and ether এই পাঁচটী মূল-ভূত। এই পঞ্চভূতের পরস্পর সংযোগে বা পরিবর্ত্তনে এই দৃশ্যমান জড়-জগতের সৃষ্টি। আমাদের এই পঞ্চ ভূতের নামে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বিদ্ পণ্ডিত-মণ্ডলী নাসিকা কুঞ্চিত করেন, বা করিতেন এবং বলিয়া আসিতেছিলেন বা এখনও বলেন যে, ভারতবাসী বিজ্ঞানে অজ্ঞ; ভারতবাসী যে পাঁচটী মূল-ভূতের (elements) কথা বলেন, উহারা সকলে মূল-ভূত নহে। যদিও সাধারণ-সমাজে, এই পাঁচটি মূল-ভূত বলিয়া ভারতের বিজ্ঞান-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এই পাঁচটীর কোনটাই যে মূল-ভূত নহে, তাহা পণ্ডিত বা ঋষি-সমাজে জানা ছিল। এ কথা যে সত্য, তাহা আপনাদের নিকট আমি ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিব। সাধারণ লোকের বোধগম্যের জন্য, আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়-গোচর এই পঞ্চ-পদার্থকে মূল-ভূত (বা elements) বলিয়া গিয়াছেন ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলী এই পঞ্চভূতের নিগূঢ়ার্থ জানিতে না পারায়, নানা কথা বলিয়া আসিতেছেন। জানি না, আপনারা এই পঞ্চ-ভূতের অন্তার্থ জানেন কি না। যাহা হউক, আমার এখানে ঐ সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করা সমীচীন বিধায় আপনাদিগকে কিছু বলিব। প্রথমতঃ, ক্ষিত্যপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম, স্বরূপতঃ* কেহ মূল-ভূত নহে—ইহা এক মহা-ভূতের বিকারমাত্র। জড়-জগতে উহাদের উপাধি থাকিলেও, সূক্ষ্ম বা

কারণ-জগতে উহাদের মৌলিকতা নাই। আর, এই যে বাক্যবিন্যাস, ইহা কেবল আমাদের শস্যশ্যামলা ধরণীর উৎপত্তি-জ্ঞাপক বাক্যাবলী মাত্র। তাহা উপনিষদের উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তৈত্তীরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—"আকাশ বৈ ব্রহ্ম তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ, আকাশাৎ বায়ু, বায়োরগ্নি, অগ্নেরাপ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" অর্থাৎ আদি ব্রহ্ম বা আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমান nebular theory বা নীহারিকা-বাদের বা ether-বাদের মূল-ভিত্তি যে আমাদের উপনিষদ্, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন। জগৎ সৃষ্টির এই মত এখন সর্ব্ববাদী সম্মত; কাজেই, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মত, আমাদের ভারতের ঋষিদিগের মতেরই পুনরুক্তি মাত্র। এখন আপনারাও বোধ হয় বুঝিলেন যে, এই ক্ষিত্যপ তেজ মরুৎ ব্যোমাত্মক যে পঞ্চভূতের নামে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নাসিকা কুঞ্চন, তাহা আমাদের শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ গ্রহণে, তাঁহাদের অসমর্থতাই একমাত্র কারণ। আসুন আমরা দেখিব, পূর্ব্বতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী যে পঞ্চভূতের নাম শুনিয়া এতাবৎ নাসিকা কুঞ্চন করিতেছেন, উঁহাদের বিজ্ঞানের দৌড় কতদূর। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে ৭০টী মূল ভূত বা (elements) এবং এই জড়-জগৎ উক্ত ৭০টী পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে সৃষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ইহাই অভ্রান্ত ধারণা ছিল। কিন্তু অল্পদিন হইল, বিজ্ঞান ধুরন্ধর Sir William Crooks সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, রসায়ণ শাস্ত্রে যে ৭০টী মূল ভূত বা elements ছিল, উহারা কেহই প্রকৃতপক্ষে ভূত নহে। উহারা Protyle নামক চরম-ভূতের বিকার মাত্র। এই (Protyle) প্রোটাইল জগতের নির্ব্বিশেষ বা homogeneous উপাদান; ইহারই সংযোগে জড়-জগতের উৎপত্তি ও বিশ্লেষণে জগতের ধ্বংস। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, যাহা ৭০টী মূলভূত বলিয়া লোকের ধারণা ছিল, তাহা অখণ্ড পরমাণু বা atom নহে; উহারা কেহ স্বাধীন নহে, যেমন খড়ের আঁটিতে একটা গাদা তৈয়ার হয়, ইহাও তদ্রূপ। হায়! Crook সাহেব তুমি কি করিলে। অভ্রান্ত-ধারণাকে আবার ভ্রান্তিতে পরিণত করিলে! মনীষী Crooks এর এ সিদ্ধান্ত আমাদের শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। যদিও তাঁহার এ প্রোটাইল (Protyle) সংস্কৃত-বিজ্ঞানের প্রকৃতির ঠিক প্রতিশব্দ নহে, তথাপি উহাকে একাভিধানিক শব্দ বলিতে পারা যায়। যাহা হউক, প্রকৃতি বা Protyle যে জড়-জগতের মূল উপাদান, তাহা সাংখ্য-সূত্র হইতে আমরা জানিতে পারি। যথা—"প্রকৃতে সর্ব্বোপদানত্বা মূলে মূলাভাবাৎ অমূলংমূলং।" বিজ্ঞান-শাস্ত্র বলে যে, এই প্রকৃতির (matter) হ্রাস বৃদ্ধি বা ধ্বংশ নাই; তাই সাংখ্য-সূত্রকার বলিয়াছেন—নাসদৎ উৎপদ্যতে নসদ্ বিনিস্যতি। এখন আপনারা আসুন আমরা দেখিব, গীতায় এ সম্বন্ধে কি উক্ত হইয়াছে। আমরা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখি যে ভগবান্ আত্মা সম্বন্ধে বলিতেছেন—

অচ্ছেদ্যোহয়ং অদাহ্যোহয়ঃ অক্লেদ্য অশোষ্য এব চ।
নিত্য সর্ব্বগত স্থান অচলোহয়ং সনাতন
অব্যক্তোহয়ং অচিন্ত্যোহয়ং অবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে।

অর্থাৎ, স্থায় (আত্মা) অথবা সাংখ্যোক্ত পরমাণু (যাহাকে ইংরেজিতে bi-sexual atom

বলে) ইহাই জগতের মূল কারণ; উহা নিত্য ও সৎ। অন্যত্র গীতায় উক্ত হইয়াছে—"অণোরণীয়াং মহতোমহীয়াং" অর্থাৎ ভগবান অমুর অণু বা সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ও বৃহৎ হইতে বৃহত্তম। এই জড়-পরমাণু ছাড়া অন্য একটি পদার্থ আছে, উহার বৈজ্ঞানিক নাম force, energy বা power। আমরা যদি জাগতিক-শক্তিকে বিশ্লেষণ করি ত দেখিব, ঐ শক্তি বা force, নিম্নলিখিত ছয় ভাগের কোন একটা না একটার অন্তর্গত। ঐ ছয় অংশের ইংরাজি নাম motion, light, heat, electricity, magnatism and chemical affinity। যদিও এই ষড়্বিধ শক্তি ব্যবহারিক-জগতে বিভিন্ন, কিন্তু বস্তুতঃ এক। সেই জন্য, Professor Love has asserted that these are identical; Dr. Buchner also affirms that these imponderable bodies, such as, light, heat etc, are neither more or less than modification of the aggregated conditions of matter। এই যে ছয়টি শক্তি আছে, ইহা ছাড়া আরও দুইটী শক্তি আছে; উহাদের একের নাম প্রাণ-শক্তি বা vital force ও অপরের নাম জীবনশক্তি বা psychic force। অতএব সর্ব্বশুদ্ধ ইউরোপীয় বিজ্ঞান মতে আটটা শক্তি আছে। বহুকাল ধরিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ধারণা ছিল, ইহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র বা independent and separate। কিন্তু কয়েক বৎসর গত হইল, Prof. Sir William Grove পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত ষড়্বিধ ভৌতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। অর্থাৎ heat (উত্তাপ) electricity (বিদ্যুৎ) light (আলোক) ইত্যাদিকে এক পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে। এই যে প্রক্রিয়া বা process ইহার নাম correlation of physical forces। পরে, অধ্যাপক হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, শুধু যে এই ভৌতিক-শক্তিকে সমাবর্দ্ধন (conservation of energy) করা যায় তাহা নহে, প্রাণ-বা জীব-শক্তিকেও এ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রোফেসর ডল্‌বিয়া (Dolbear) ইহাও বলিয়াছেন—"Each force is transferable directly or indiretly into matter. They differ from each other chiefly in the character of motion involved in the Phenomena।" তাহা হইলেই মোটের উপর দাঁড়াইল, একশক্তি; যাহার পরিবর্ত্তনে বা বিবর্ত্তনে এই পরিদৃশ্যমান জড়জগতের সৃষ্টি। এই যে মহাশক্তির কথা আমরা পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান হইতে জানিতে পারি, এ সম্বন্ধে আমাদের গীতায় কিছু আছে কি না, দেখা যাউক। আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের স্থূল দৃষ্টিতে, দুই পদার্থের সমবায়ে যে এই জড়-জগতের উৎপত্তি, তাহা দেখিলাম। অর্থাৎ matter বা protyle এবং দ্বিতীয়, force বা power। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন—

ভূমেরাপোনল বায়ু খং বুদ্ধি মনরেবচ
অহংকারঃ ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।

অর্থাৎ, ক্ষিত্যপ্‌তেজ মরুৎব্যোম মন বুদ্ধি ও অহংকার এই অষ্ট-জড়, প্রকৃতির উপাদান। এই অষ্টপ্রকার উপাদানের নাম গীতায় "অপরা বা inferior প্রকৃতি দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ভগবানের আর এক প্রকৃতির উল্লেখ আছে, যাহার নাম পরা-প্রকৃতি বা

higher self। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" অর্থাৎ, তাঁহার যে higher (পরা) প্রকৃতি আছে, উহারই দ্বারা জগৎ ধৃত বা রক্ষিত হয়। The universe is upheld by this vital force। আপনারা আমাদের সৃষ্টি-তত্ত্ব বিষয়ক শাস্ত্রাদি পড়িলে দেখিতে পাইবেন যে, এই যে ভূতের বা elementsএর নাম করা হইল, ইহারা সেই এক মহা-শক্তির বা জগদীশ্বরের সিসৃক্ষাশক্তির ক্রম-পরিণতির অবস্থা-মাত্র। ক্ষিত্যপ্তেজ মরুৎব্যোম ইহাদের বহির্জ্জগতে বিভিন্ন নাম থাকিলেও, উপাধি-গত ভেদ থাকিলেও, উহারা স্বরূপতঃ এক। উহারা পূর্ব্বোক্ত protyle প্রোটাইল বা এক জড়-প্রকৃতির বিকার মাত্র। Heat, light, ইত্যাদি সকলেই সমাবর্ত্তনীয় বা interchangable। জড়-জগতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর জ্ঞান বিশেষরূপে উন্নত হইলেও, আধ্যাত্ম-জগতে উঁহাদের জ্ঞান ভারতীয় ঋষিদের জ্ঞানের সোপানের অনেক নিম্নস্তরে অবস্থিত; কারণ, এখন পর্য্যন্ত লর্ড কেলভিন্ (Lord Kelvin)এর মত মনীষী ধারণা করিতেই পারেন না যে, এই জড়-জগৎ ব্যতিরিক্ত, আর এক সূক্ষ্ম-ও কারণ-জগৎ আছে। যাহা হউক, এখানে আমাদের শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভগবানের (বা সাংখ্যোক্ত চরম প্রকৃতির) সাম্যাবস্থার (সত্ত্ব রজ তমঃ) homogeneous conditionএর ব্যতিক্রম ঘটিলেই, (যখনই তাঁহার সিসৃক্ষা হয় তখনই এরূপ ঘটে) তাঁহার যে পরিণাম ঘটে, উহার নাম "মহত্তত্ত্ব"। এই মহত্তত্ত্বের বিকারের নাম, অহংকার-তত্ত্ব (egoism); তাহার ফলে, ক্ষিত্যপ্ তেজ্ মরুৎব্যোম ইত্যাদির সূক্ষ্ম তন্মাত্রের, যথা—শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্রের আবির্ভাব হয়। তাহা হইতে এই জড়জগতের সৃষ্টি। এখন আমরা দেখিলাম ইংরাজী বিজ্ঞানমতে যেমন দুই পদার্থের—matter ও forceএর—রাসায়নিক সংযোগে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, গীতার মতেও ভগবানের পরা ও অপরা দুই শক্তির সংযোগে জগতের সৃষ্টি। যদি আর একটু অনুধাবন করেন ত দেখিবেন যে, matter আর force পুরুষ প্রকৃতি; উহারা inseparable বা অভিন্ন। অর্থাৎ যেখানে matter বা জড়-প্রকৃতি, সেইখানেই force বা পুরুষ। শক্তি পুরুষেরই, জড়ের নহে। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলে—"শক্তি শক্তিমতোর-ভেদ"। ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বর্ত্তমান বিজ্ঞান বলিতেছেন—No matter without force, no force without matter—matter and force are co-existent and inseparable। ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক রূপকের শিব-শক্তি বা রাধা-কৃষ্ণ মূর্ত্তি। পূর্ব্বোক্ত অষ্টাপ্রকৃতি ভগবানে আশ্রয় করিয়া যে নিত্যস্পন্দনে বা vibrationএ এ জগৎ সৃষ্টি করিতেছে, ইহাই রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিযুগল বিশ্ব-কদম্ব-বৃক্ষের-মূলে সদা নিত্যলীলায় বিরাজমান। আর উঁহাদের পাদদেশ দিয়া প্রেমযমুনা নানা লীলা তরঙ্গে প্রবাহমানা। যে তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য, একদিন ভগবান এই ভারতবাসীর প্রতি অসীম কৃপাপরবশ হইয়া যমুনাপুলিনে স্বশরীরী হইয়া রাসলীলায় জগৎবাসীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এ পৃথিবীর মধ্যে, এ সৌভাগ্য আমাদের একবারমাত্র ঘটিয়াছে; তাই বলি, ভারতবাসী তোমরা ধন্য! একমাত্র তোমরাই জাগতিক লীলার এ অপার্থিব ছবি ভক্তিপ্লুত মনে হৃদয়ে

অঙ্কিত করিয়া জীবন সার্থক করিতে পার। যাহা হউক, বিজ্ঞান-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া হঠাৎ অন্যপথে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, ক্ষমা করিবেন। এখন আমরা আমাদের গন্তব্য পথে পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত হই! এই যে প্রকৃতির বিকাশ, উহা ভগবানের বিভব মাত্র। এই দুই ভাবকে different modes of manifestation বলে। গীতায় অন্যত্র এই দুই ভাব ক্ষর-ও অক্ষর-পুরুষ নাম অভিহিত হইয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

এতৎ যোনিনি ভূতানি সর্ব্বাণিতুপ ধারয়।
দ্বাবিমৌ পুরুষে লোকে ক্ষরচাক্ষর এব চ।
ক্ষর সর্ব্বাণি ভূতানি কুটোস্থোঽক্ষর উচ্যতে।

ভগবান এই "ক্ষর" 'অক্ষরের" (অর্থাৎ, matter ও force বা পুরুষ প্রকৃতির) অতীত ; তাই, তাঁহার নাম "পুরুষোত্তম"।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহংঅক্ষরাদপি চোত্তমঃ
অতোহ লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

প্রলয়ে এই পুরুষ প্রকৃতি (matter and force) পরমেশ্বরে লীন হয়, তখন তিনি "একমেবা দ্বিতীয়ং।" তাই উপনিষদ্ বলিতেছেন—অক্ষরং তমসিলীয়তে তমঃ পরে দেবে একী ভবতী। এ ভাব কেমন জানেন, যেমন লৌহের অবস্থা ; উহাতে চুম্বক-শক্তি magnetism—positive ও negative এ উভয় ভাব প্রচ্ছন্নভাবে বা basic conditionএ থাকে। ইহাও তদ্রূপ-অবস্থাপন্ন। এই অবস্থাকে ভগবানের যোগনিদ্রা বলে। এই যে পুরুষ প্রকৃতির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি ব্যাপার বর্ণিত হইল, গীতার অপর ভাষায় "ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ" বলে, আর তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি ; "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।"

এই সমুদায় ভগবৎ-উক্তি হইতে ইহাই কি প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, কি স্থাবর কি জঙ্গম কি উদ্ভিদ কি ধাতব সমুদায় সৃষ্টি পদার্থের মধ্যে ভগবান্ অনুস্যূত রহিয়াছেন। ভগবানের এই যে চৈতন্য-শক্তি, ইহার ভিন্ন ভিন্ন উপাধি আছে, যথা—জীবাত্মা, খনিজাত্মা উদ্ভিদাত্মা। তাই ভগবান বলিয়া গিয়াছেন—

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবর জঙ্গমং।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎতদ্বিদ্ধিভরতর্ষভ ॥

এই জন্য, যে সকল পণ্ডিতেরা স্থাবর পদার্থকে অচেতন বলেন ,তাঁহারা ভ্রান্ত। যেহেতু, এই সমুদায় পদার্থের অন্তরে পুরুষ বা ভগবৎ-শক্তি রহিয়াছে। যদি না থাকিত, তাহা হইলে কি আমরা উহাদের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ (attraction ও repulsion) শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাইতাম ? এই ভগবৎ-বাক্যে প্রতিধ্বনি করিয়া আজ মাননীয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ইউরোপ-ক্ষেত্রে যে জয়ধ্বনি পাইতেছেন, তাহা আমাদের কম গৌরবের কথা নহে। তবে তাঁহার যে এই আবিষ্কার ইউরোপ-খণ্ডে নূতন হইলেও, ভারতে নূতন নহে। তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। ভগবৎ-উক্তি ত পরের কথা, আমাদের বাঙ্গালার বৈদ্যকুলচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত চরক-সংহিতার আয়ুর্ব্বেদ-দীপিকা নামক টীকায় উদ্ভিদের যে মানুষের ন্যায় দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদি আছে, তাহা জগতবাসীকে

ভেরীনাদে জানাইয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ-দীপিকা' হইতে দেখি, তিনি কি সত্য-তথ্য জগৎকে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি উদ্ভিদের চেতনত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অন্তঃসংজ্ঞা সমস্তেতে সুখদুঃখ সমন্বিতা"

অত্র—সেন্দ্রিয়ত্বেন বৃক্ষাদীনাং অপি চেতনত্বং বোধব্যং

তথাহি, সূর্য্যভাক্তায়া যথা যথা সূর্য্য ভ্রমতি, তথা তথা ক্রমাৎ দিব্যং অনুমীয়তে। ইহাই কি আমাদের দেশের সূর্য্যমুখী ফুলের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সপ্রমাণ করিতেছে না? দ্বিতীয় শ্লোকে তথা তবলী মেঘস্তনিত শ্রবণাৎ ফলবতী স্যাৎ" ইহা কি উদ্ভিদের (নোড়বৃক্ষের) শ্রবণশক্তির বর্ত্তমানতা সপ্রমাণিত করিতেছে না, তৃতীয় শ্লোকে, বীজপুরকমপি শৃগালাদি রসাগন্ধে নাতীব ফলবৎ ভবতি" ইহা দ্বারা কি সপ্রমাণিত হইতেছে না যে, বাতাবি লেবু গাছের গন্ধ-গ্রহণ করিবার শক্তি আছে। অপর বাক্যে, "চূতানাং মৎস রসাসেকাৎ ফলাঢ্যত্বো রসনমনুমীয়তে"—অর্থাৎ ইহা দ্বারা আমবৃক্ষের রসনেন্দ্রিয়তার প্রমাণ দিতেছে। চক্রপাণি দত্ত বিনাপরীক্ষায় এ সব তথ্য, পুস্তকে স্থান দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। তবে যে সব যন্ত্রাদির সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত তথ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ কালকবলিত হইয়াছে। এইরূপ কত বিষয় যে বিদেশীয় আক্রমণে ও কীটদষ্ট কালের কুক্ষিগত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? তবে মনীষী জগদীশবাবু যে নানা যন্ত্রাদি সাহায্যে ও নিজ বিপুল প্রতিভা ও অধ্যবসায়ে এই সব সত্যের পুনরুদ্ধার করিয়া, পাশ্চাত্য-জগতে ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি ভারতবাসীর আন্তরিক ধন্যবাদার্হ। প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া অধঃপতিত ভারতের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।

এখন আমরা দেখিব, গীতাপাঠে আর কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য জানিতে পারি কি না। আপনাদের, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য-জগতের বিজ্ঞানবিদ্‌গণের ধারণা এই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি আছে—উহা Sir Isaac Newton (সার আইজাক নিউটন)এর আবিষ্কৃত। পাশ্চাত্য-জগতে, মহাত্মা Newton (নিউটন) যে এ তথ্য আবিষ্কার করেন, তাহা সত্য। তজ্জন্য ইউরোপবাসী তাঁহার নিকট চিরঋণী। কিন্তু তৎসঙ্গে যে আমার ভারতবাসী ভ্রাতারা সেই সুরে সুর মিলাইয়া ধন্য ধন্য করিয়া সুখ্যাতি-প্রচারে উৎগ্রীব, তাহাই দুঃখের বিষয়। অবশ্য আমি একথা বলিতেছি না যে, গুণীর গুণ-গ্রহণ, জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলেরই স্বীকার্য্য নয়। তবে, আমি জোর করিয়া বলিতেছি যে, ইউরোপ-খণ্ডে যে সকল সত্য-তথ্য, কিবা বৈজ্ঞানিক, কিবা দার্শনিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ভারতে অবিদিত ছিল না। তাহার অধিকাংশই এই দুর্দ্দশা গ্রস্ত ভারত হইতেই গৃহীত,—তবে উহা কেবল মাজা ঘসা ও সংস্কৃত মাত্র। যে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কারের জন্য নিউটনের ধন্য ধন্য ধ্বনি কর্ণকুহর বধির করে, তাহা কি গীতায় স্পষ্ট উক্ত হয় নাই? ভগবান গীতায় বলেন নাই কি যে—"গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্য মহোজস" অর্থাৎ, আমি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-রূপে সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাদি ধারণ করিয়া আছি। তাই বলি, আপনারা আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবেন না। তাই বলি, আমরা আমাদের

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করি, একবার জাগরিত হই ও দেখি যে আমরা জগৎ-পূজ্য ঋষিদের সন্তানসন্ততি ভিন্ন আর কেহ নাই। এখন ইংরাজ বাহাদুরের কৃপায় সংস্কৃত শিক্ষার দ্বার—যাহা সংকীর্ণতার যুগে বদ্ধ ছিল,—আজ তাহা আশূদ্র সকলের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। আপনারা সকলে সংস্কৃত পড়ুন, উপনিষদ ও গীতাদি সত্যশাস্ত্র পড়ুন ও অধঃস্তন সন্তান সন্ততিদিগকে পড়ান। সংস্কৃত-শিক্ষা, দেশের ভাষা শিক্ষা ভিন্ন আমাদের কেবল মাত্র বিদেশীয় ভাষা শিক্ষায় উন্নতি নাই। হায়! আমাদের অশিক্ষার কারণ, আমরা ভিক্ষান্নের জন্য অন্যত্র দণ্ডায়মান। ইহা কি কম ক্ষোভের ও আক্ষেপের বিষয়। আমাদের ভাণ্ডারে অসংখ্য রত্ন থাকিতেও, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আয়াসাভাবে পরদ্বারে একমুষ্টি ভিক্ষার জন্য লালায়িত। তাই আবার বলি, এস, ভারতবাসী আমরা আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিগাথা স্মরণ করিয়া, ভগবদ্‌পদে মতি রাখিয়া, প্রকৃতশাস্ত্রের আলোচনা করি। এ আলোচনা করিতে হইলে কেবল বিদেশীয় ভাষা শিক্ষায় হইবে না;—এ আলোচনা করিতে হইলে সেই এক মহাত্মার কথা—"A man's knowledge is incomplete unless he reads his classical language" স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাই আমাদের গীতা-উপনিষদাদি গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে। আর এক নিবেদন করিয়া, অদ্যকার প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। এ অনুনয় আমার ভ্রাতৃস্থানীয় যুবকমণ্ডলীর প্রতি। আমার একান্ত অনুনয় যে তোমরা বাজে নাটক নভেল পড়িয়া বৃথা কালক্ষেপ করিও না; এখন ইংরাজ-বাহাদুরের অনুগ্রহে ভারতের অভ্যুদয়ের ও জাগরণের সময় আসিয়াছে; মিথ্যা গল্পের বই পড়িয়া, মিথ্যা কল্পনা-রাজ্যে বাস করিও না। যে সকল গ্রন্থপাঠে প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চা হয়, সত্যের আলোচনা হয়, কুসংস্কার দূরীকৃত হয়, এরূপ বিজ্ঞানানুমোদিত পুস্তক পাঠ কর; যে সকল পুস্তকপাঠে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়, ইহাই অনুশীলন কর।

শ্রীরাজকিশোর রায়।

আশার বাণী

"পুরাণ চলিয়া যায়—
অশ্রু সজল মৌন পরাণ নূতনের পথ চায়"

জগতের গতিই এই। এক যাইতেছে আর এক আসিতেছে। কাল স্রোত কখনও স্থির থাকে না—অবিরাম গতিশীল। ইহার মধ্যে যে তাহাকে যতটা নিজের কাজে লাগাইতে পারে, তাহার কাছেই সে ধরা দেয়। পুরাতন বৎসর সুখ দুঃখ, বিষাদ আনন্দ আশা ও নিরাশার স্মৃতি বক্ষে লইয়া কালের অঙ্কে মিলাইয়া গেল। নূতন বৎসর সসঙ্কোচে ধীরে ধীরে পাদক্ষেপ করিতেছে। অতীতের স্মৃতি বুকে লইয়া, আমরা তাহার দিকে তাকাইয়া আছি। এবৎসর কি ভাবে জীবন-স্রোত চালাইব, আজ মনে এই প্রশ্নই জাগিতেছে।

বুকে আশা বাঁধিয়া, কত লোক আম্র-পল্লব মঙ্গলঘট দিয়া নূতন বৎসরকে বরণ করিয়া লইতেছেন; কেহ বা, নিরাশ নিরুদ্যম বিমর্ষ হইয়া রহিয়াছেন। আমাদের আন্তরিক আগ্রহ উদ্যমে সজীবতা ও সরসতা না থাকিলে, শুধু আম্র-পল্লব ও মঙ্গলঘটে কি কোন সার্থকতা হইবে? কিন্তু কি করিয়াই বা নূতন উৎসাহে নূতন উদ্যমে আমরা প্রদীপ্ত হইব? আমাদের যে

"উৎসাহ নাহি আর, জীবন গুরুভার
কেবলই হাহাকার হৃদয় বিমর্ষ।"

আমাদের যে ঘরে অন্ন নাই, পরিধানে কাপড় নাই, হৃদয়ে প্রাণ নাই। তদুপরি দেশ জননীর যে ললাট-তিলক-সদৃশ কতগুলি সন্তান উপর্যুপরি তাঁহার ক্রোড় শূন্য করিয়াছেন। দেশমাতা এই যে এক একটী সাগরসেঁচা রত্ন হারাইয়াছেন তাহা আর কবে পূর্ণ হইবে কে জানে?

আবার, শত দুঃখেও মানুষ ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধিয়া বাঁচিয়া থাকে। এই যে দেশে, যে বন্যার স্রোত দুকূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে ইহাই জননীর আশা। মৃতপ্রায় দেশে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই তাহাতে একটু না একটু যোগ দিয়াছেন, ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন—ইহা তুচ্ছ কথা নয়। পৃথিবীতে কোন জিনিসই বৃথায় যায় না। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে যে বন্যা বাঙ্গলা দেশকে ভাসাইয়া নিয়াছিল, আজ আবার এতদিন পর তাহা ভারতের দুই কূল ছাপাইয়া ছুটিয়াছে। অবশ্য জোয়ারের পর ভাঁটা আসিবেই, কিন্তু জোয়ারের বা বন্যার জলে কূল ছাপাইয়া যে পলি ফেলিয়া যাইবে তাহাতে জমি উর্ব্বরা হইবেই।

এখন আমাদের ভাবিতে হইবে এই জমিতে কোন্ বীজ বপন করিলে ভাল ফসল পাওয়া যাইবে, স্থায়ী ফল হইবে।

প্রেম ও চরিত্র মানুষকে প্রকৃত মানুষ তৈয়ার করে। সকলেই জানেন একজন বহু ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রমশালী লোক অপেক্ষা একজন খাঁটি প্রেমিক লোকের সম্মান কত বেশী ও তাঁহার নিকট মানুষ কত সহজে অবনত হয়, এমন কি আত্ম বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহার প্রমাণের জন্য আজ আর বেশীদূর যাইতে হইবে না। মহাত্মা গান্ধিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিসের জোরে, দেশশুদ্ধ লোক তাঁহার কথায় প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত—তাঁহার মনুষ্যত্বে, ত্যাগে ও নিঃস্বার্থ প্রেমে।

আমাদের আশার বাণী এই যে, আজকাল লোকের প্রেমের ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। পরিচিত লোকের তো কথাই নাই, অচেনা অজানা লোক ও বিপন্ন হইলে মানুষ আজকাল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রায়ই তাহার সাহায্য করিতে ছুটিয়া থাকে। এই যে লোকের সহানুভূতি ও সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি ইহা সামান্য জিনিস নহে। অবশ্য উৎপীড়ন ও যে নাই তাহা নয়, তবে ক্রমশঃই মানুষ, গৃহের বাহিরে ও তাহার ভালবাসার পাত্র আছে, ভাই ভগিনী আছে, কিছু করিবার আছে তাহা বুঝিতে ও তাহাদের জন্য ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। তারতম্যানুসারে বিচার করিলে আশার বাণীই শোনা যায়। একবার দেশের ভাইকে

ভাই বলিয়া চিনিতে ও বুঝিতে পারিলে আর ভয় নাই, ভাবনা নাই। প্রেম যে জীবনের উৎস।

আর চাই আত্ম-প্রত্যয়, নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস ও নিজের প্রতি শ্রদ্ধা। আমরা যদি আপনাদের শ্রদ্ধা করিতে শিখি, আমাদের দ্বারা কোন হীন কাজ, কোন প্রকার অপরকে ফাঁকি বা নিজের বিবেককে ফাঁকি দেওয়া কখনও সম্ভব হয় না। অতি সামান্য অন্যায় কাজ করিতে ও মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। এ কথায় ইহা বুঝাইবে না যে আমরা অহঙ্কারী হইব বা অন্যাপেক্ষা নিজেকে বড় মনে করিয়া গর্ব্ব করিব। আত্ম-অভিমান ও আত্মপ্রত্যয় এক কথা নয়। ইহা শুধু নিজের প্রতি নিজের দায়িত্ব জ্ঞান বাড়ান। হৃদয়ে যদি সকলের প্রতি প্রেম ও নিজের প্রতি দায়িত্বজ্ঞান ও সমালোচনা এক সঙ্গে থাকে তবে অহঙ্কার আসিতে পারে না। আমরা সকলে মিলিয়া প্রত্যেকেই মাতৃপূজার এক একটী উপকরণ হইয়া মাতৃপূজা যজ্ঞ সফল করিব। প্রত্যেকেই আপনাকে দরকারী বলিয়া মনে করিব। সাধারণতঃ দেখা যায়, যেখানে মিলিত শক্তির দরকার আমরা সেখানে আপনাকে পিছনে রাখিতে চাই। এত লোক আছে, আমি না হইলে ও চলে, আমার সাহায্যের তেমন প্রয়োজনীয়তা নাই বা না হইলে বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, এরূপ ভাবিয়া থাকি। উপমাচ্ছলে, রাজার দুধের পুষ্করিণীর কথা বলা যাইতে পারে। এইরূপ মনে করার জন্যই ত রাজার সাধের দুধের পুষ্করিণী দুধের পরিবর্ত্তে জলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রত্যেকেই মনে ভাবিয়াছে, সকলেই তো দুধ আনিবে, আমি একজন জল দিলে কেহই বুঝিতে পারিবে না বা কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু এই আত্ম-প্রতারণা বা নিজেকে নগণ্য মনে করা যে কতদূর ক্ষতিকারক, তাহা, যখন ঐরূপ সম্মিলিত শক্তির দরকার হয়, তখনই বোঝা যায়। ইহাতেই মানুষ নিজেকেও ফাঁকি দেয়, অন্যকেও ফাঁকি দেয়।

রাবণ-গৃহে বন্দিনী সীতাদেবীকে উদ্ধার করিবার সময় রামচন্দ্র ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীর সাহায্যে, সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে যে, রামচন্দ্র বিষ্ণুর অংশ ছিলেন, কাজেই তিনি ইচ্ছা করিলে একাই সব করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহাতো তিনি করেন নাই বা পারেন নাই। অতি তুচ্ছ কাঠবিড়ালী ও বানর হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকেই তিনি তাঁহার অতি প্রয়োজনীয় ও সাহায্যকারী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারাও যথাশক্তি তাঁহাকে সাহায্য করিয়া আপনাদিগকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছিল। আমাদের আপনাদের বা আমাদের ভাই ভগিনী কাহাকেও তুচ্ছ বা সামান্য মনে করিলে বা তাহার সাহায্য অপ্রয়োজনীয় বা না হইলে ও চলিতে পারে, মনে করিলে চলিবে না। আমাদের পরপদানতা দুঃখিনী দেশমাতার যদি মঙ্গল সাধন করিতে চাই, তাঁহার দুঃখ যদি ঘুচাইতে চাই, অশ্রু যদি মুছাইতে চাই, তবে আমাদের প্রকৃত খাঁটি মানুষের সম্মিলিত শক্তির দরকার। এ শক্তি অর্জ্জন করিব কি করিয়া? প্রেমে। প্রেমই জীবন। প্রেম ভিন্ন কেহ কাহাকেও পাইব না। ক্ষুদ্র হউক, সামান্য হউক দেশের একটী প্রয়োজনীয় সন্তান বলিয়া নিজেকে যদি মনে করিতে পারি, দেশের ভাই ভগিনীর প্রতি নিজের মনে যদি অকপট প্রেম জাগাইতে পারি তাহা হইলেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে, বাসনা

কামনা পুর্ণ হইবে। খবরের কাগজে বা লোকমুখে নাম চাহিব না, কিন্তু গোপনে খাঁটি প্রেমিক, খাঁটি মানুষ হইব। আমরা শুনিয়া থাকি ও বলিয়া থাকি আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তেত্রিশ কোটী দেবতার পরিচয় বা সন্ধান কেহই পাই নাই। ভারতের তেত্রিশকোটী নরনারীকে যদি আমরা প্রত্যেকে, আমাদের তেত্রিশকোটী দেবতা বলিয়া মানিয়া লইতে পারি ও সেই হিসাবে যতটুকু সাধ্যায়ত্ত, তাহার সেবা করিতে পারি—তবে দেশজননীর শোকের অশ্রু কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারিব।

যে জাগরণ দেশে আসিয়াছে, তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। তাহাকে নিস্ফল হইতে দিলে চলিবে না। ইহা হইতেই, ধীরে ধীরে আমাদের মনুষ্যত্বের বীজের সুফল ফলিবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেদিন উত্তমর্ণের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়া, দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে স্বপ্নে শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহার স্বর্গীয়া জননী দেবী তাহাকে বলিতেছেন "বৎস, কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা !"

আমরাও দেশমাতার নিকট হইতে এই সুমধুর আশীর্ব্বাদ বাণী শুনিতে চাই। যাহাতে ঐরূপ হইতে পারি, আমরা আজ নূতন বৎসরে এই ব্রত গ্রহণ করিব ও প্রত্যেকে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে তিলে তিলে চেষ্টা করিতে থাকিব। যেন জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রের অবসানে শুনিতে পাই, দেশমাতা আশীর্ব্বাদবাণী উচ্চারণ করিতেছেন—

বৎস, কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।

শ্রীনলিনী দেবী।

পারমার্থিক সত্য ও ব্যবহারিক সত্য।

অনেক সময়ে দেখা যায়, কোন বিষয় বিচার কালে, যাহা পারমার্থিক সত্য ও যেটা ব্যবহারিক সত্য তাহার পরস্পর বিভিন্নতা স্মরণ না রাখিয়া সিদ্ধান্ত করায়, তাহা ভ্রম-পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। যে সকল বিষয়ের ব্যবহারিক সত্তামাত্র লক্ষ্য, তথায় পারমার্থিক সত্যের যে উদ্দেশ্য তাহা যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, তাহা মনে রাখা উচিত। ব্যবহারিক সত্যের প্রয়োজন, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যাপারে। দুই চারিটী দৃষ্টান্ত এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলে, বিষয়টী বিশদ হইবে। মনে করুন, যে আমরা সময়ের বা কালের পরিমাণ করিতে চাই। তাহা হইলে, বিবেচ্য এই যে, কি বিশেষ উদ্দেশ্যে সেই পরিমাণটা দরকার। যদি ঐ পরিমাণের উদ্দেশ্য কেবল কোন নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হওয়া এবং তথায় কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তাহা হইলে, সে পরিমাণ, তখনকার উদ্দেশ্য অনুসারেই, করিয়া থাকি। যথা,—দশ ঘটিকার সময় আমার কোন চাকুরী উপলক্ষে কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। ওই দশ ঘটিকার সময় নির্ব্বাচনের জন্য আমরা সচরাচর একটি ঘটিকাযন্ত্র দেখিয়া, সময়মত উপস্থিত হইবার আয়োজন করি। কিন্তু, কোন দুইটী ঘটিকাযন্ত্র অনুপল, পল অথবা মিনিট সেকেণ্ড ধরিলে সমভাবে চলে না। কিন্তু মোটামুটি

সময় নিরূপণের বাধাও দেয় না। কর্ম্মস্থানে দুই চার সেকেণ্ড আগে কিম্বা পরে উপস্থিত হইলে কর্ম্মের কোন ব্যাঘাত হয় না। এ স্থলে ব্যবহারিক সত্য, অর্থাৎ সময়নিরূপণ মোটামুটি করাই ক্রিয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু, যদি সময় নিরূপণ উদ্দেশ্য এই হয় যে, মহাসমুদ্রে বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া দেশদেশান্তরে যাওয়া, এবং কোন্ বিশেষ দিনে পৃথিবীর কোন্ স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি তাহাই নিরূপণ করা হয়, তাহা হইলে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা এই স্থান নিরূপণ করিব, তাহার একটী প্রধান অঙ্গ হইতেছে, ঘটিকাযন্ত্রে তদানীন্তন সময় সূচনা। তদুদ্দেশ্যে কিন্তু আমরা সচরাচর যে ঘটিকাযন্ত্র ব্যবহার করি, তাহা সর্ব্বৈব অনুপযুক্ত। সেই গণনার জন্য বিশিষ্ট কাল-মান-যন্ত্র (chronometer), যাহার দুই সেকেণ্ড ভুল হইলে, হয় ত পাঁচ মাইলের স্থানের (ব্যতিক্রম) ঘটিতে পারে, সেই প্রকার যন্ত্রই, উদ্দেশ্য অনুসারে, প্রযুজ্য।

আর একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। বাটী হইতে শিয়ালদহ ষ্টেষণে, ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য। গাড়ীর ভাড়া মাইল হিসাবে দিতে হইবে। মোটামুটি আমার বাড়ী হইতে শিয়ালদহ ষ্টেসন প্রায় দুই মাইল। কিন্তু উদ্দেশ্য অনুসারে, সেই দুই মাইল, মোটামুটি, দুই মাইলের দশ-বিশ-হাত কমও হইতে পারে অধিকও হইতে পারে। উদ্দেশ্য অনুসারে এই ন্যূনাধিক্য বিচার করা অনাবশ্যক। কিন্তু, যদি উদ্দেশ্য, স্থাপত্য-মান শাস্ত্রের (Trigonometry) দ্বারা কোন দূরত্ব পরিমাণ করা, হয় তাহা হইলে, এক ইঞ্চির তফাৎ হইলেও উদ্দেশ্য প্রকৃতভাবে সফল হয় না। অতএব দেখা গেল, যে উদ্দেশ্যে দূরত্বের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে, সেই উদ্দেশ্য অনুসারে দূরত্বের বিচার করা প্রয়োজন।

আরও একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। আমরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি, ঘটনামাত্রেরই একটা কারণ আছে। যখন একথা বলি, তখনও আমাদের তদানীন্তন ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের জন্য ঐ প্রকার কথাটী ব্যবহার করি। একটি লোক খানিকটা বারুদে অগ্নি-প্রদান করিল। অগ্নিপ্রদান মাত্র বারুদ শব্দ-সহকারে প্রজ্জলিত হইল এবং নিকটস্থ একটী বালককে ঝলসাইয়া দিল। এখানে সচরাচর কারণ নির্দ্দেশ জন্য, যে ব্যক্তি অগ্নি দান করিয়াছে, তাহাকেই, আমরা ছেলেটির দুর্ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, শাস্তির ব্যবস্থা করি। একটু ভাবিয়া দেখিলে, আমরা কিন্তু স্পষ্টই বুঝিতে পারি, অগ্নিদানকে প্রকৃত কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যদি বারুদ ভিজা থাকে, অগ্নি প্রয়োগেও তাহা শব্দ সহকারে সহসা জ্বলিয়া উঠে না। বারুদের দাহিকা-শক্তির কারণ কি? সেই কারণ বিচার করিতে গেলে রসায়ন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তাহাতে কি কি দ্রব্য আছে তাহার বিচার ও ঐ দ্রব্যের কি জন্য কি পরিণতি হয় তাহা জানিতে পারা যায়। কিন্তু অগ্নি-দাতাকে শাস্তি দিবার জন্য এই সকল গবেষণার কোন প্রয়োজন হয় না এবং আমরা করি ও না। অতএব সিদ্ধান্ত এই হইল, আমাদের পারিবারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কোন বিষয়ে কোন প্রকার নির্দ্ধারণ উদ্দেশ্য হইলে, সেই উদ্দেশ্য অনুসারে, কোন্ বিষয়ে কি ব্যবহারিক সত্য আছে, তাহা আমরা বিচার করি। ততোধিক বিচার করিবার প্রয়োজন না থাকায়, করি না। ব্যবহারিক সত্য মাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা ক্রিয়া ও ব্যবহার সাধন করি;

প্রকৃত নিগূঢ় সত্যের বিচার অপ্রয়োজন। এই ভাবেই আমরা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি।

এখন দেখা যাউক, পারমার্থিক সত্য কি প্রকার এবং তাহার সত্তা কি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। পারমার্থিক সত্য কি? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, সে সত্য দেশতঃ, কালতঃ, বস্তুতঃ বিভিন্ন নহে। সে সত্য চিরন্তন সত্য। ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান সময়ে সে একই প্রকার নিত্য। সে সত্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বলোকে একই সনাতন সত্য। সে সত্য অক্ষুণ্ণ; সে সত্য অন্য কোন বস্তুর দ্বারা প্রতিহত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

এই বিষয়ের আরো কিছু আলোচনা করা যাক্। প্রথমতঃ আমাদের শরীরের কোন পারমার্থিক সত্তা আছে কি? সে শরীর পরিবর্ত্তনশীল, পরিণামশীল; তাহার উপচয়, অপচয় আছে; তাহার জন্মে আবির্ভাব, মৃত্যুতে তিরোভাব; সে শরীর কখনও শিশু-শরীর, কখনও বালক-শরীর, কখনও যুবক-শরীর, কখনও প্রৌঢ়-শরীর, কখনও বৃদ্ধ-শরীর। এই শরীরের অবশ্য ব্যবহারিক সত্তা আছে। ইহা কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নহে। এই শরীর যে উপাদানে গঠিত, সে উপাদান পাঁচ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবর্ত্তিত হইয়া, পুষ্টিকর বস্তু গ্রহণ দ্বারা, সেই প্রকারের কিন্তু অন্য উপাদানের দ্বারা গঠিত হইয়া, প্রতীয়মান হয়। এই স্থলে বক্তব্য, শরীর বিষয়ে বিচার করিতে হইলে, কেবল তাহার ব্যবহারিক সত্তা বিচারের অবসর আছে মাত্র। এই জন্যই ভগবান ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন—

> দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
> তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

আরো, সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহ-কার বলিয়াছেন, যে সকল বস্তু আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করি, তাহারই ব্যবহারিক সত্তা, অথবা ব্যবহারিক ভাব আছে, সে সকল বস্তুর আবির্ভাব এবং তিরোভাব আছে, সে সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর ও ক্ষণবিধ্বংসী; তাহার ক্ষণে ক্ষণে পরিণতি হইতেছে; সেই সকল বস্তু দেশতঃ, কালতঃ এবং বস্তুতঃ বিভিন্ন; তাহারা ব্যবহারিক সত্তার অধিকার ভুক্ত এবং ব্যবহারিক সত্তার বিষয়। আর, যে চিরন্তন বস্তুতে, এই ব্যবহারিক সত্তার কোন ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয় না,—যে সত্তা দেশতঃ কালতঃ বস্তুতঃ বিভিন্ন নয়,—সেই সত্তাই পারমার্থিক সত্তা। তিনি বলিয়াছেন,—সন্তঃ অসীভাবাঃ অর্থাৎ, ব্যবহারিক সত্তার বিষয়। তদ্ভাবঃ—পারমার্থিক সত্তা।

এই জগতে, এই সংসারে, এমন কি বস্তু আছে, যাহাকে পারমার্থিক সত্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি। এই জগতে যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান, সবই তো ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণবিধ্বংসী, পরিণামশীল, পরিচ্ছিন্ন। এমন কি বস্তু আছে, যাহাকে আমরা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিতে পারি,—এই বস্তুটি পরিচ্ছিন্ন নয়, ইহার পরিণতি নাই, ইহার আবির্ভাব তিরোভাব নাই, ইহা সনাতন বস্তু, চিরন্তন বস্তু—ইহার জন্ম নাই মৃত্যু নাই; ইহা স্বপ্রকাশ; ইহা পরতন্ত্র নয়; ইহার স্বভাবের ব্যতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, এই বস্তুটি—সম্বিদ্। আপনারা ক্ষমা করিলে, ইংরাজী ভাষায় ইহাকে

Being, Feeling, Blissful Consciousness বলা যায়। সংস্কৃত ভাষায়, সচ্চিদানন্দং চিদরূপম্। আর পঞ্চদশীকারের কথায়,

নো দেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদে স্বয়ম্প্রভা।

আমরা এখন এরূপ স্থানে উপনীত হইলাম যে, আমাদের দেহাত্মবাদের বিরোধী হইতে হইতেছে। এ বড় কঠিন সমস্যা। চিরজীবন ধন জন যৌবনের জন্য লালায়িত আছি। পুত্র কলত্র, বন্ধু বান্ধব লইয়া কখনও উৎফুল্ল হইতেছি, কখনও বা বিষণ্ণ হইতে হইতেছে। চিরকাল যে জগতের, যে সংসারের, সার্থকতা বরণ করিয়াছি, যে জাগতিক বস্তুকে আরাধ্য দেবতা করিয়া হৃদয়-মন্দিরে অর্চনা করিয়াছি, সেই মন্দির ও সেই আরাধ্য দেবতাকে, হয়ত কেবলমাত্র ব্যবহারিক সত্য বলিয়া, তাহাকে ভাঙ্গিয়া, পুনরায় পারমার্থিক সত্যের অভিমুখে কি উপায়ে অগ্রসর হই? দ্বৈত ভাব, ইংরাজী কথায়, Dual Consciousness, Empirical Experience, যাহার রাজত্বে চিরকাল বাস করিয়াছি, যাহার শাসনে পরতন্ত্র আছি, তাহার শাসন অতিক্রম করিয়া কোথায় পৌঁছিলাম? যতক্ষণ শরীরধারী, যতক্ষণ মনোবুদ্ধি অহঙ্কার আছে, যতক্ষণ 'জ্ঞাতাজ্ঞেয়ং জ্ঞানং' ছাড়িয়া একপাও অগ্রসর হইতে পারি না, সে অবস্থায় কিরূপে উপনীত হই? এ বিষম সমস্যা। কঠিন হইলেও, বহুচিন্তার ফলে, সামান্য কিছু আরাধনায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, আপনাদের নিকট কথঞ্চিত নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা বলিবার পূর্বে কিন্তু আপনাদিগকে সতর্ক করা আমার কর্তব্য। এই পারমার্থিক সত্বা 'স সম্বদ' বস্তু। স্বীয় অনুভূতির বিষয়। ইহার কথঞ্চিৎ নির্দ্দেশ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ইহা কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে, পন্থা দেখান ভিন্ন, আর বড় একটা কিছু করিতে পারেন না। তবে, আমার যতটুকু সামান্য অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে আছে, তাহাতে এই বলিতে পারি যে It is an Experimental Science। যথোচিত সাধনা করিলে, ইহার অকাট্য সত্য উপলব্ধি হইবে। সে সাধনা কি, পরে বলিব। কিন্তু এক্ষণে, যতদূর সম্ভব, দেখা যাউক, বিচারে কি ফল পাওয়া যায়।

যে জগতের কথা বলিয়াছি, আমার পক্ষে, সেই জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি প্রমাণ আছে? আমি তো দেখিতেছি, যতক্ষণ পর্যান্ত আমার, তাহার অস্তিত্ব জ্ঞানের উপলব্ধি হইতেছে, ততক্ষণই আমি জগত আছে, এ কথা বলি। The universe exists for me, because I am conscious of it, আমি যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তখন ত জগতের কোন অস্তিত্ব আমার পক্ষে নাই। কিন্তু, যে ব্যক্তি জাগ্রত, তাহার পক্ষে জগত প্রতীয়মান। কেহ যখন মূর্চ্ছিত হয়, তখন তাহার মূর্চ্ছিতাবস্থায় তাহার পক্ষে জগত থাকে না; আর সকলের পক্ষে কিন্তু প্রতীয়মান। অতএব, জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান, সেই ব্যক্তিগত জ্ঞানই জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ। আমি জ্ঞান কথাটা ব্যবহার করিয়াছি। ইহা দ্বারা কিন্তু আমার মনোগতভাব প্রকৃতরূপে প্রকটিত হইতেছে না। পরে, আমি সম্বিদ, চিৎশক্তি অথবা Self-consciousness এই কথা ব্যবহার করিতে চাই। এখন একটী প্রশ্ন হইতে পারে এই সম্বিদ, এই চিৎশক্তি, এই

Self-consciousness কোথা হইতে আসিল? কে প্রদান করিল? কি উপায়ে তাহাকে পাইলাম? এ সম্বন্ধে বহুকাল হইতে অনেক দার্শনিকের নানা রকম গবেষণা হইয়া গিয়াছে। সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা নাই। ফলতঃ, আমার মনে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বেদান্ত শাস্ত্র যাহা বলিয়াছে এবং তদধীন সাধনা-শাস্ত্র যাহা নিরূপিত করিয়াছে, তাহাই গ্রাহ্য। এই সম্বিদের আবির্ভাব, তিরোভাব নাই; ইহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ; ইহা স্বতঃসিদ্ধ স্বপ্রকাশ চিরন্তনের অপরিণামী বস্তু; এক সূর্য্য কিরণে যে প্রকার সকল বস্তুর বিকাশ হয়, এই সম্বিদ, এই চিৎ-শক্তিও সেই প্রকার সকল বস্তুজগতের বিকাশক; ঐ যে সূর্য্য বলিয়াছি, তাহারও বিকাশক। সেই জন্যই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—

নো দেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদে স্বয়ম্প্রভা।

এখন এ সম্বন্ধে অনেকে তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন, যদি এই সম্বিদ একমাত্র সৎবস্তু হয়,—যদি ইহাই একমাত্র পারমার্থিক সত্য হয়,—যদি ইহারই একমাত্র পারমার্থিক সত্ত্বা থাকে এবং অপর কোন জাগতিক বস্তুরই, ব্যবহারিক সত্ত্বা ভিন্ন, পারমার্থিক সত্ত্বা না থাকে, তাহা হইলে, বহু-নাম-রূপ-সঙ্কুল জগৎ দ্বৈতের আধার হইয়া,—বহুত্বের আধার হইয়া,—কি প্রকারে বিকাশ পাইল? এবং এই বহুত্বেরই বা কারণ কি? যদি একত্বই পারমার্থিক সত্য হয়, তাহা হইলে বহুত্ব-মূলক জগৎ কি প্রকারে প্রকটিত হইল? আর আমাদের সচরাচর সেই বহুত্ব জ্ঞানেরই বা কি কারণ? দোষ গ্রহণ না করিলে, এই ভাবটা ইংরাজী ভাষায়ও আপনাদিগের নিকট আমার বক্তব্য। If the Absolute, if the absolute consciousness, if the being feeling blissful consciousness, if the *Sambit*, if the *Chit-sakti* is the sole ultimate reality, how do you explain the manifold ness of the Universe, of nature, with its Dual Consciousness, empirical experience? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সমস্যা বড় জটিল। বিচার করিয়া আরো একটু দেখা যাক্। আমি যে বাহ্যজগতের অস্তিত্ব গ্রহণ করিতেছি, বাহ্যজগত যে আমার সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে, সে উপলব্ধি আমারই। সেই জগৎ আমার মনোবুদ্ধি অহঙ্কারের সহিত মনোরাজ্যে বিকশিত হইতেছে। তবে, আমার ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের জন্য, তাহাকে আমা হইতে ভিন্ন বাহ্যবস্তু হিসাবে, দেখিতেছি। কিন্তু, সে আমার মনোরাজ্যের আভ্যন্তরিক ক্রিয়ার বাহ্য নাম রূপ গ্রহণ করিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ইংরাজীতে বলিতে গেলে—The consciousness of the externality of the Universe is, after all, a mental state of the perceiver. আরো একটু অগ্রসর হই। আমার কাছে, জগত এবং জাগতিক বস্তু যে ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে, আমার বন্ধু হীরেন্দ্রবাবুর কাছে, ঠিক সেইভাবে প্রতীয়মান হইতেছে না। আমার একটী নবমবর্ষীয় বালক, তাহার নিকট এই জগত, আমার মনে যে প্রকার প্রকটিত হইতেছে, তাহা হইতেছে না। আমার বাড়ীর সহিস, সে জগতকে অন্য ভাবে দেখিতেছে। আমার বাড়ীতে একটী বিড়াল আছে, তাহার কাছে জগৎ অন্যভাবে প্রকাশ পাইতেছে। আমার বাড়ীর কীটপতঙ্গের জগত,

অপরের জগত হইতে, সম্পূর্ণ না হউক, বহু অংশে ভিন্ন প্রকারে প্রকটিত হইতেছে। বলাবাহুল্য যে, প্রত্যেক জ্ঞাতার জগৎ তাঁহারই জগত, অন্য কাহারও নহে। ইংরাজী কথায়—The Universe as it appears, never appears the same even to two observers, with the result that there are as many universes as there are perceivers। অতএব জগতের যত জ্ঞাতা আছে, প্রত্যেক জ্ঞাতার বিভিন্ন জগৎ। এই জগত,—যাহার অর্চ্চনা আজীবন করিতেছি,—সে কি প্রকারে সৎ বস্তু হইল? সত্য যে বস্তু, সে ত সকলের পক্ষেই সমভাবে প্রতীয়মান হইবে। অতএব, জগতের যখন পারমার্থিক সত্ত্বা নাই, যখন তৎসম্বন্ধে যে সম্বিদ্ তাহার একমাত্র কারণ, তখন সে সম্বিদ্ জাগতিক ক্রিয়ার কার্য্য (effect) কখনই হইতে পারে না। কিন্তু, সম্বিদ্ Self Consciousness যদিও জগৎকে নানারূপে প্রতীয়মান করিতেছে, কিন্তু তাহার অস্তিত্বের জ্ঞান (Consciousness of its existance—that is, the self-consciousness with regard to it, is the same for all) সকলের সাম্য।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় বিষয়টী বিশদ হইবে। মনে করুন, একটি নব-প্রসূতা যুবতী; তাঁহার নব-প্রসূত বালক তাঁহাকে একভাবে দেখিতেছে; তাঁহার স্বামী তাঁহাকে একভাবে দেখিতেছেন; তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে একভাবে দেখিতেছেন; তাঁহার ভ্রাতা ভগিনী বন্ধুবর্গ তাঁহাকে একভাবে দেখিতেছেন; সন্ন্যাসী তাঁহাকে একভাবে দেখিতেছেন। কিন্তু সেই ভাব,—প্রত্যেক অন্তঃকরণের ভাব,—প্রত্যেকের সম্বিদের প্রভায় প্রত্যেক ভাব উদ্ভাসিত হইতেছে। সেই সম্বিদের স্বভাব এক, কিন্তু বাহ্যবস্তু যুবতী স্ত্রী প্রত্যেকের পক্ষে নানা ভাবে পরিদৃষ্টা হইতেছেন। আবার মনে করুন, মেঘ শূন্য সন্ধ্যায় রবি অস্তমিত হইতেছেন; পশ্চিম গগন নানা বর্ণে শোভা পাইতেছে। সেই সময়ে চিত্রকর গগনের শোভায় মুগ্ধ হইয়া, সেই শোভা চিত্রিত করিতেছেন। চোর রাত্রি আসিতেছে বলিয়া, তাহার চৌর্য্যকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বেদমাতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। স্বৈরিণী তাহার ব্যভিচারের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু, প্রত্যেকের পক্ষে সম্বিদ্—সূর্য্যাস্ত হইতেছে, সন্ধ্যা উপনীত। সে জ্ঞান সকলের পক্ষেই এক, কিন্তু ব্যবহারিক উদ্দেশ্য অনুসারে তাহাকে রূপান্তরে দেখিতেছে।

অদ্য এই প্রসঙ্গের আলোচনায় নিরত হইতেছি। বারান্তরে এই প্রসঙ্গ উপলক্ষে আরো অনেক বক্তব্য রহিল।

শ্রীব্যোমকেশ শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী।

তিনটী স্বাধীন রাজ্য

১৯'২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কোচবেহার, ত্রিপুরা ও ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি উড়িষ্যার গড়জাত রাজ্যসমূহ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে বেহার ও উড়িষ্যাপ্রদেশ হওয়াতে গড়জাত সমূহ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। গড়জাতের মধ্যে ময়ূরভঞ্জ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উন্নত রাজ্য। এই রাজ্য মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলার সংলগ্ন। এজন্য উভয় দেশের লোকই এখানে দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ অধিবাসী কোল সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতি। নিম্নে ময়ূরভঞ্জের সহিত কোচবেহার ও ত্রিপুরার সম্বন্ধে একটী তালিকা প্রদান করিলাম। কোচবিহারে পতিত জমি নাই ও জঙ্গল পাহাড় নাই। ময়ূরভঞ্জ ও ত্রিপুরায় যথেষ্ট পর্ব্বত, জঙ্গল ও পতিত জমি আছে। এইজন্য উভয় রাজ্যই অতি দ্রুত বেগে উন্নতি লাভ করিবে। ত্রিপুরায়, এ পর্য্যন্ত কোনও খনিজ দ্রব্য আবিষ্কৃত হয় নাই। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা চেষ্টা করিলে পেট্রলিয়ম প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইতে পারে। ময়ূরভঞ্জে যে সমস্ত লোহার খনি বা পর্ব্বত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অনুমান হয় যে ১০ বৎসরের মধ্যেই খনিজদ্রব্যের আয় দশ লক্ষ টাকা হইবে। লৌহ ভিন্ন এখানে স্থানে স্থানে সোনা পাওয়া যায় এবং আরো অনুসন্ধান চলিতেছে। এতদ্ভিন্ন অভ্রও অল্প পরিমাণে স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। অনেক যায়গায় পটষ্টোন বা থালা বাটি প্রস্তুতের পাথর পাওয়া যায় এতদ্ভিন্ন এখানে কেওলিন বা সাদামাটি, হরিদ্রাবর্ণ ও লালবর্ণ গিরিমাটি ও চূণ প্রস্তুতের ঘুটিং প্রচুর পাওয়া যায়। অরণ্যে উৎকৃষ্ট লাক্ষা ও তসরের গুটির চাষ হয়। ত্রিপুরায় চা বাগান হইতেছে। কিন্তু কোচবেহারে অন্য কোনওপ্রকারের আয়ের পথ নাই। প্রজার আয় বৃদ্ধি দ্বারা তাহার অংশ গ্রহণই একমাত্র ভরসা। উক্ত উভয় রাজ্য অপেক্ষা কোচবেহারে কৃষি দ্বারা অতি মূল্যবান ফসল প্রস্তুত হয়। কোচবেহারের তামাক অতি উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে চুরুট প্রস্তুত জন্য বঙ্গদেশে রপ্তানি হইত, পাট ও আলু প্রচুর জন্মে কিন্তু ইক্ষু চাষের কোনও উন্নতি দেখা যায় না। ইক্ষুর চাষের কোনও বিস্তৃত চাষও সম্ভব নহে কারণ চাষের উপযুক্ত পতিত জমি নাই। কোচবেহারের অধিকাংশ প্রজা ভাল কৃষক ও অসভ্য জাতি অল্প সংখ্যক। চতুর্দ্দিকে রেলপথ হইয়া ব্যবসায়ের অনেক সুবিধা হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জেও রেলপথ হইতেছে। ত্রিপুরায় রেলপথ কম। বর্ত্তমানকালে রেলগাড়ী, গরুর-গাড়ীর ন্যায় হইবে ও মোটর জেপেলিন প্রভৃতি উন্নত শ্রেণীর মনে হইবে। রেলপথ প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতির আবশ্যক ও সে অনুমতি সহজে পাওয়া যায় না, এজন্য উচিত যে, সমস্ত রাজ্যই প্রচুর পরিমাণে মোটর, রাস্তা প্রস্তুত করেন ও সমস্ত ক্ষুদ্র নদী সেতু দ্বারা বদ্ধ করেন। মোটর লরি ও যাত্রী-মটর স্বচ্ছন্দে নানাদিকে যাইয়া ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবে। বর্ত্তমান সময়ে এই তিন দেশেরই রাজা অল্প বয়স্ক। তাঁহারা পৃথিবীর উন্নতির সময়ে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আশা হয়, যে সমস্ত দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারতীয় রাজ্যের অবশেষে উন্নতি হইবে। ময়ূরভঞ্জের রাজগণ সূর্য্যবংশধর

খ্যাতি, ত্রিপুরার রাজগণ চন্দ্রবংশ এবং কোচরাজবংশীগণ আপনাদিগকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলেন। কোচবেহারের কুমার ভবেন্দ্রনারায়ণ ত্রিপুরার এক রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছেন। কোচবেহারের মৃত মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ ৺কেশবচন্দ্রের দুই কন্যা বিবাহ করেন ও ময়ূরভঞ্জের মৃত মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও দ্বিতীয় বারে উক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা বিবাহ করেন। আবার ত্রিপুরার এক রাজকুমার নেপালের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এইরূপে পরস্পরের কিঞ্চিৎ সম্পর্কও আছে। ময়ূরভঞ্জের রাজগণ রাজ্যের উন্নতির জন্য উড়িষ্যার অনেক ব্রাহ্মণকে গ্রাম ও জমি দান করিয়া রাজ্যের স্থানে স্থানে বাসস্থান করিয়া দিয়াছেন। ত্রিপুররাজ কল্যাণমাণিক্য খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার যাজপুর বা জাহাজপুর হইতে বহু ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়া শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলায় ও ত্রিপুরা রাজ্যে স্থাপন করেন। ইহাদেরই বংশধর চৈতন্যমহাপ্রভু। ইহাঁর পিতামহ শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে বাস করেন ও চৈতন্যের নবদ্বীপে জন্ম হয়। তিনি বাঙ্গালা কথা জানিতেন না এবং পরে শ্রীক্ষেত্রে বাস করিয়া স্বর্গলাভ করেন। এদিকে কোচবেহার রাজগণ এই শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মণগণের কয়েকঘর কোচবেহারে বাস করান। আবার ত্রিপুরার রাজকুমার বসন্তমাণিক্য ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে কতককাল ছিলেন। ময়ূরভঞ্জের সদরের অধীন সরহিতা গ্রামে ইহার একখণ্ড প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে। লিপির সময় ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ। ইনি ত্রিপুরার রাজা বিজয়মাণিক্যের পুত্র। বিজয়মাণিক্য ১৫৩৫ হইতে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্য প্রতি প্রাচীন, ইহারা ৫৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজত্ব করেন, ইহাদের বংশ বিবরণে প্রকাশ। কিন্তু ১২৫১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একখানি তাম্রপট্টে ইহাদের রাজা ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আরও ৯ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। মোট খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে যে বর্ত্তমান রাজবংশ রাজত্ব করেন তাহার সন্দেহ নাই। ত্রিপুরার রাজগণ কলির প্রারম্ভ হইতে রাজত্ব করেন। য়ুয়াঙ্গ চুয়াঙ্গ ইহাদের নাম করেন নাই। সম্ভবতঃ ইহারা মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে রাজত্ব করেন। যদি ত্রিপুরার শক হইতে রাজত্ব গণনা করা যায়,—তাহা হইলে ৫৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজত্ব আরম্ভ হয়, কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে এইটী বাঙ্গলা সন বলিয়াই বোধ হয়। ত্রিপুরার রাজগণের উপাধি মাণিক্য ও মুসলমান রাজগণের প্রদত্ত। কোচবেহারের বর্ত্তমান রাজবংশ ৪১১ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব আরম্ভ করেন সুতরাং এই রাজ্য বয়স হিসাবে সর্ব্ব কনিষ্ঠ। কোচবেহার আয়তনে ও অপর দুইটীর অপেক্ষা অল্প কিন্তু লোকসংখ্যা ময়ূরভঞ্জের অপেক্ষা অল্প, ত্রিপুরার অপেক্ষা বেশী। শিক্ষা হিসাবে, কোচবেহার, ত্রিপুরা ময়ূরভঞ্জ অপেক্ষা অনেক উন্নত। ময়ূরভঞ্জে প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয় ও ইহাই প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। কোচবেহার ও ময়ূরভঞ্জে ব্যবসা অধিকাংশই মারওয়ারিগণের হস্তে কিন্তু ত্রিপুরায় নহে। পূর্ব্ব বঙ্গে মারওয়ারি অনেক কম, ঢাকা জেলায় নাই বলিলেই চলে। এই তিন রাজ্যের সর্ব্ববিষয়ে তুলনা করা কিম্বা বেহারের বিস্তৃত ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে। সমস্ত বিষয়ের কিঞ্চিত আভাষ দেওয়ার ইচ্ছা। বর্ত্তমান সময়ে তিন রাজ্যেরই ক্ষমতা সমান। ত্রিপুরা কোনও রূপ কর প্রদান করেন না। ময়ূরভঞ্জ মাত্র ১০৬৭৲ কর দেন কিন্তু কোচ-

বেহারের কর অত্যন্ত অধিক। ময়ূরভঞ্জের জমীদারীর অল্প আয়, মাত্র ৭০ কি ৮০ হাজার টাকা। কিন্তু, ত্রিপুরার জমিদারী অতি বৃহৎ এবং প্রায় রাজ্যের সমান আয়; কোচবেহারের জমিদারীও বেশ বৃহৎ। কোচবেহারে একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ ও চারিটী উচ্চ ইংরাজী স্কুল আছে। ত্রিপুরায়ও চারিটী ইংরাজী স্কুল আছে কিন্তু ময়ূরভঞ্জে মাত্র একটী উচ্চ ইংরাজী স্কুল আছে। আবকারী আয় দেশের অবনতির চিহ্ন। কিন্তু ষ্ট্যাম্প ও কোর্টফির আয় আর্থিক উন্নতির চিহ্ন। এই তিন রাজ্যেই ইনকম্ ট্যাক্স আদায় হয় না। লোক সংখ্যার তুলনায়, কোচবেহার অপেক্ষা ত্রিপুরায় স্কুল-শিক্ষা-প্রাপ্ত বালক বেশী। কোচবেহার এবং ময়ূরভঞ্জ রাজ্য মধ্যে ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত করিয়া লন। কোচবেহার ও ত্রিপুরায় ইলেক্ট্রিক লাইট আছে, কিন্তু ময়ূরভঞ্জে নাই। কোচবেহারের রাজগণের উপাধি ভূপ বাহাদুর। যুবরাজকে পূর্ব্বে বাকাচুয়া বলিত। ভুটান রাজ কোচবেহার রাজাকে পত্র দ্বারায় এইরূপ সম্বোধন করিতেন—"স্বস্তি প্রাতরুদীয়মান দিনমণি মণ্ডল নিজ ভুজবল প্রতাপ তাপিত শত্রু সমূহ পুঞ্জিতাখিল বেহারেশ্বর শ্রী শ্রী মহারাজা জিউ বিষম সমর পঞ্চাননেষু।" রাজবংশীয় অন্যান্য লোককে কুমার বলে, এখন প্রিন্স। রাজার পিতামহীদিগের মধ্যে প্রধানা মহিষীকে তাঁহারা আই দেবতী ও দ্বিতীয়াকে বড় আই দেবতী কহে। রাজার প্রথমা স্ত্রী পাটরাণী, দ্বিতীয়া দেও আই দেবতী ও তৃতীয়া মধ্যম আই ঘরণী। ময়ূরভঞ্জের রাজারা ভঞ্জ সিংহ দেও। যুবরাজকে টীকায়েত বলে, দ্বিতীয় ছোট রায়, তৃতীয় রাউত রায়। রাজা মহিষী পাট সামন্ত ও রাজ-কন্যা জমা সামন্ত। রাজবংশের অন্যান্য পুত্র, লাল বা লালু ও কন্যাগণ মণি। ত্রিপুরার রাজার উপাধি "বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত দেব বর্ম্মন মাণিক্য বাহাদুর"। যুবরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত দেব বর্ম্মন যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর। অপরাপর, ঠাকুর নামধেয়। এই রাজ্যত্রয়ের তুলনা-মূলক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বিষয়	কোচবেহার	ময়ূরভঞ্জ	ত্রিপুরা
১ পরিমাণ-ফল	১৩০৭	৪২৪৩	৪০৮৬
২ লোক-সংখ্যা	৫৬৬৯৭৪	৭২৯২০০	১৭৩৩২৫
৩ মোট আয়	২৬৫০০০০	২২ লক্ষ	২০ লক্ষ
৪ বন-বিভাগের আয়	০	৪ লক্ষ	৪ লক্ষ
৫ জমিদারীর আয়	৫ লক্ষ	৭২ হাজার	৯ লক্ষ
৬ পুলিশসংখ্যা	৩০০	৩৭০	৩৪২
৭ সৈন্য-সংখ্যা	০	০	২৬৭
৮ শিক্ষা-প্রাপ্ত বালক-বালিকা	১২০০০	১০০০০	৬০০০
৯ ডিস্পেন্সরী	১০	৮	১৬
১০ স্যালুট তোপ	১৩	৯	১৩
১১ আবকারী আয়	১৪০০০০	১২০০০০	২৪০০০
১২ কোর্ট-ফি ও ষ্ট্যাম্প আয়	১৮৫০০০	৪৫০০০	৬৫০০০
১৩ রাজ্যের বয়ঃক্রম	৪১১ বৎসর	১৩২৩ বৎসর	১৩৩৩বৎসর

ভারতবর্ষের করদ ও মিত্র রাজগণকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দুই প্রকারে উপদেশ দিয়া

থাকেন, গবর্ণর জেনেরলের এজেন্ট দ্বারা ও রেসিডেন্ট দ্বারা। অনেকগুলি রাজ্য একত্রে এজেন্টগণের অধীন থাকে। যেমন, উড়িষ্যার রাজ্য-সমূহ। রেসিডেন্ট অনেক রাজ্যে আছেন। বঙ্গ-দেশে ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমান সময়ে রেসিডেন্ট আছেন। কোচবেহারে এ দুই প্রকারের এক প্রকারও নাই। কোচবেহারে স্বর্গীয় মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সময় হইতে একজন গবর্ণমেণ্টের পেনশন প্রাপ্ত অথবা ধার দেওয়া সিবিলিয়ান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে রাজ্য-শাসন করেন। অন্য কোনও রেসিডেন্ট নাই। যদি এই প্রথায় কার্য্য ভাল চলে অন্যত্র, এই প্রথা অবলম্বন আবশ্যক।

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বসু।

মহাভারত মঞ্জরী।

সভাপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়। ইন্দ্রপ্রস্থ নির্ম্মাণ।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সকলেই এখন জানিতে পারিয়াছেন, পাণ্ডবেরা জতুগৃহ-দাহে দগ্ধ হন নাই, উপরন্তু দ্রুপদরাজ-নন্দিনীকে বিবাহ করিয়া প্রবলের আশ্রয় পাইয়াছেন। তাই তাঁহারা আবার শত্রুনাশের সহজ ও নিরাপদ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। দুষ্ট দুর্য্যোধন আবার বন্ধুভাব দেখাইয়া অতীতের অভিনয় করিতে চাহিলেন। কর্ণ বলিলেন,—"পাণ্ডবেরা যখন ছোট ছিল, তখন তুমি সকলই করিয়া দেখিয়াছ, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। এখন তাহারা বড় হইয়াছে। "এখন প্রকাশ্য ভাবে আক্রমণ করিয়া নিহত করা ভিন্ন আর উপায় নাই।" রাজা ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "তোমাদের যে মত, আমারও সেই মত। তবে বিদুর পাছে আমার মনের ভাব জানিতে পারে, এইজন্য সময় সময় পাণ্ডব পক্ষে দুই এক কথা বলিয়া থাকি।" (১)

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভা করিয়া বসিয়াছেন। ভীষ্মদেব তাঁহাকে বলিলেন, "রাজন্, পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধেক রাজ্য দেওয়া উচিত। নতুবা কাহারও মঙ্গল হইবে না। আমার নিকট উভয় পক্ষই সমান। পরে দুর্য্যোধনের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "জতুগৃহদাহে তোমার ভয়ঙ্কর অযশ হইয়াছে"। এখন ধর্ম্মকার্য্য কর যে কীর্ত্তি থাকে।" অন্ধ-রাজ ভাবিলেন, ভীষ্মদেব তাঁহাকে একথা বলিলেন।

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, "ন্যায় অনুসারে পরামর্শ দেওয়াই অমাত্যগণের উচিত: এজন্য বলিতেছি, ভীষ্মদেব যাহা বলিবেন, তাহা করাই আপনার উচিত।"

কর্ণ বলিলেন, "রাজেন্দ্র, ভীষ্মদেব ও আচার্য্য আপনার অন্নেই পুষ্ট। কিন্তু তাঁহারা আপনার যাহাতে ক্ষতি হয়, সতত এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন। তাঁহারা মুখে আপনার পক্ষপাতী, কার্য্যত পাণ্ডবগণের হিতৈষী।"

(১) আদিপর্ব্ব ২০২—১।১

তাহা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, "কর্ণ, তোমার এরূপ বলা উচিত হয় নাই। তুমি পাণ্ডবগণের সতত হিংসা কর, কাযেই এই রূপ বলিলে। আমি সত্য কথা বলিতেছি, আমরা যাহা বলিলাম, তাহা না শুনিলে নিশ্চয়ই কৌরবগণ বিনষ্ট হইবে।"

তখন বিদুর দণ্ডায়মান হইয়া অতি তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন, "রাজন, ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য অপেক্ষাও কি আর কেহ আপনার অধিক হিতৈষী? তাঁহাদের ন্যায় বুদ্ধিমান ও পুরুষসিংহ কে? তাঁহাদের মতে পাণ্ডবগণ অজেয়। বস্তুত যাঁহাদিগের মধ্যে একদিকে পরাক্রম, অন্যদিকে দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও সত্য নিত্য প্রতিষ্ঠিত, কে তাঁহাদিগের অতিক্রম করিতে পারে? জতুগৃহদাহে আমাদের ভয়ঙ্কর কলঙ্ক হইয়াছে। এখন তাহা দূর করুন।"

অন্ধরাজ ভাবিলেন, তবেত সকলেই পাণ্ডব পক্ষে, একা কর্ণ কি করিবেন? তখন তিনি মধুর স্বরে উত্তর করিলেন, "বিদুর, তোমরা যাহা বলিলে, আমি তাহাই করিব। তুমি যাও, পাণ্ডবগণকে বহু ধন রত্ন ও অলঙ্কার দিয়া, সৎকার করিয়া, এখানে লইয়া আইস। আমার পরম সৌভাগ্য যে তাহারা আকস্মিক গৃহদাহে দগ্ধ হয় নাই।"

তাহা শুনিয়া বিদুর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখনই পাঞ্চাল নগরে গমন করিলেন। পাণ্ডবগণকে রাজার পক্ষ হইতে বহু ধন রত্ন ও অলঙ্কার উপহার দিলেন। পরে দ্রুপদ, কৃষ্ণ ও বলরামের অনুমতি লইয়া পঞ্চ পাণ্ডব, কুন্তী ও দ্রৌপদীকে অতি সম্মান সৎকারে হস্তিনায় আনিলেন। সমুদয় প্রজারা তাঁহাদিগকে দেখিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "তোমাদিগকে অর্দ্ধরাজ্য দিলাম। এখন খাণ্ডব-প্রস্থে গিয়া বাস কর, যেন দুর্য্যোধনের সহিত আর বিবাদ না হয়।

খাণ্ডব-প্রস্থ যমুনা নদীতীরে এক মহাবন। পাণ্ডবেরা সেখানে গিয়া তাহা পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, বলরামের সাহায্যে তথায় এক মনোহর নগর নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্র সহস্র লোক প্রত্যহ কার্য্য করিতে লাগিল। প্রশস্ত রাজপথ, কত হর্ম্ম্যমালা, বিহার উদ্যান, চিত্রশালা, জলাশয় প্রভৃতি প্রস্তুত হইল। নগরী পরিখা ও প্রাচীর পরিবেষ্টিত হইল। পাণ্ডবেরা তথায় বহু অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্র স্থাপন করিলেন। (২) নানা দেশ হইতে বহু বণিক, শিল্পী ও অধিবাসী আনিয়া নগরীপূর্ণ করিলেন। এইরূপে সেই বিজন বন ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও অকাতর পরিশ্রমে শীঘ্রই এক মহানগরীতে পরিণত হইল। সেই খাণ্ডব-প্রস্থের নাম এখন অতি গৌরবের ইন্দ্রপ্রস্থ হইল। (৩) কত শতাব্দী হইল, ইন্দ্রপ্রস্থ অদৃশ্য হইয়াছে, শুধু ধূলায় পরিণত হইয়াছে, তথাপি প্রদর্শক পুরাতন দিল্লীর মধ্যস্থলে একস্থানকে সেই ইন্দ্রপ্রস্থ বলিয়া দেখাইয়া দিয়া আজও পর্য্যটকের প্রাণ আকুল করিয়া তুলে!

পাণ্ডবেরা এখন বহু দেশ জয় করিলেন, বাহুবলে শীঘ্রই এক বৃহৎ স্বরাজ্য স্থাপন করিলেন। তাহা সমুদয় পঞ্চ-নদ প্রদেশে বিস্তৃত হইল। তাহা তাঁহাদের অতি গৌরবের পৈত্রিক হস্তিনা-পুর রাজ্যকেও সর্ব্ববিষয়ে অতিক্রম করিল। এখন আর সে রাজ্যেরপ্রতি পাণ্ডবগণের বিন্দুমাত্র লোভ রহিল না। তাঁহারা এই নূতন রাজ্যের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি সকল

(২) আদিপর্ব্ব ২০৭—৩৪।৩৫। (৩) আদিপর্ব্ব ২০৭ অধ্যায়।

বিষয়েরই উন্নতি করিলেন। একমাত্র প্রজার কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রাজ্য-শাসন করিতেছিলেন। প্রজাগণ তাঁহাদের কীর্ত্তি-কথা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তাঁহার জীবনই ধন্য, যাঁহার যশোগাথায় দিক্ সকল মুখরিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়। অর্জ্জুন-সুভদ্রা পরিণয়।

পঞ্চ পাণ্ডব ইন্দ্রপ্রস্থে এই নিয়ম করিয়াছেন যে, এক ভ্রাতা দ্রৌপদীর নিকট নির্জ্জনে থাকা সময়ে অন্য ভ্রাতা তথায় গমন করিবেন না; করিলে তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে। একদিন একদল দস্যু আসিয়া এক ব্রাহ্মণের গাভী হরণ করিতেছিল। ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকে সংবাদ দিলেন। তখন অস্ত্রাগারে রাজা যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী ছিলেন। অর্জ্জুন অনন্যোপায় হইয়া তথায় গমন করিলেন এবং অগ্রজকে অভিবাদন করিয়া অস্ত্র শস্ত্র লইয়া নির্গত হইলেন। গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। শেষে ভ্রাতৃগণের নিষেধ সত্ত্বেও সত্য পালনার্থ দ্বাদশ বর্ষের জন্য গমন করিলেন।

তিনি নানা তীর্থ-পর্য্যটন করিলেন। গঙ্গাদ্বারে গিয়া অনার্য্য নাগ-রাজের বিধবা-কন্যা উলুপীকে বিবাহ করিলেন। পূর্ব্বে এদেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। (৪) পরে মণিপুরে গিয়া তথাকার রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করিলেন। ইনিও অনার্য্য কন্যা। পূর্ব্বে সকল জাতিই সকল জাতির কন্যা বিবাহ করিত। (৫) অনন্তর তিনি পশ্চিম সমুদ্রে যে সকল তীর্থ ও দেশ আছে, তথায় ভ্রমণ করিয়া (৬) দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তখন রৈবতক পর্ব্বতে উৎসব হইতেছিল; কত নরনারী তথায় অবাধে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সঙ্গে কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী, অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী সুভদ্রাও ছিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। অমনি উভয়ে উভয়ের রূপে মুগ্ধ হইলেন। চারি চক্ষু এক হইল। বিনা তারে প্রাণের কথা প্রেরিত হইল। চতুর কৃষ্ণ তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। কি উপায়ে মনোরথ পূর্ণ হইবে তাহাও প্রিয়সখাকে বলিয়া দিলেন।

অর্জ্জুন কৃষ্ণের রথে মৃগয়ার ব্যপদেশে দ্বারকা হইতে নির্গত হইলেন। সেই সময় সুভদ্রা রৈবতক পর্ব্বতের উৎসব দেখিয়া গৃহে আসিতেছিলেন। অর্জ্জুন সাভিলাষা (৭) সুভদ্রাকে পথে পাইয়া রথে তুলিয়া লইলেন। আর অমনি অতি দ্রুতবেগে স্বদেশ অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

তখনই সে সংবাদ দ্বারকায় পঁহুছিল। অমনি যদুবংশ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। তাহা দেখিয়া বলরাম বলিলেন, "তোমরা ত যুদ্ধ করিতে চলিয়াছ, কিন্তু কৃষ্ণ যে নীরবে বসিয়া আছেন! অগ্রে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা কর।" তখন সকলে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা

৪। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৩য় অধ্যায়ে 'বিধবা-বিবাহ' দ্রষ্টব্য।

৫। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে 'বিবাহ' দ্রষ্টব্য।

৬। আদিপর্ব্ব ২১৮—২

৭। মূলে ভামিনী শব্দ আছে। বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদে তৎপরিবর্ত্তে হাসিভাষী লিখিত আছে। আদিপর্ব্ব ২—১২১।

করিলেন। তিনি বলিলেন, "অর্জ্জুন জানেন, আমরা লোভী নহি, এজন্য তিনি অর্থ দিয়া বিবাহ করিতে চেষ্টা করেন নাই। কন্যাদানও ক্ষত্রিয়গণের প্রশস্ত নহে। স্বয়ম্বরেও কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন। এই সকল বিবেচনা করিয়াই হয় ত তিনি কন্যা-হরণ করিয়াছেন। তাহাতে আমাদের অপমান হয় নাই, বরং সম্মান-বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি একেত রাজপুত্র, তাহাতে মহাবীর, ক্ষত্রিয় কুলের অলঙ্কার। সর্ব্বাংশেই সুভদ্রার অনুরূপ পাত্র। আমার মত, তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়া উভয়ের বিবাহ দাও।" কৃষ্ণের মত কে উপেক্ষা করিবে? তখন তাহাই হইল। এইরূপে অর্জ্জুন আপন মাতুল কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। (৮) পরে প্রতিজ্ঞাত দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, সুভদ্রাকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। সুভদ্রা দ্রৌপদীর উপর হাসিভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, আর বলিলেন, "আমি তোমার দাসী হইয়া আসিয়াছি।" হয় ত ইহাতেও কৃষ্ণ-মন্ত্র ছিল।

দ্রৌপদী হাসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, আর আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমার পতি নিঃসপত্ন হউন।"

কৃষ্ণ বলরাম বহু ধনরত্ন যৌতুক লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া পাণ্ডবগণের আনন্দের সীমা রহিল না। কৃষ্ণ তথায় থাকিলেন, বলরাম স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকেও বহু ধনরত্ন প্রীতিউপহার প্রদান করিলেন।

এই শুভ সম্মিলনে সকলেই যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। কেবল একজন অর্জ্জুনের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রহিলেন। অর্জ্জুনও ঝড়ের বেগ দেখিয়া অন্যান্য অপরাধের কথা আর তুলিলেন না। যুদ্ধটা অনেক দিন খুব চলিল, শেষে অর্জ্জুন হাত পায় ধরিয়া সন্ধি করিলেন। হাতপায় ধরার প্রথাটা এদেশে অতি প্রাচীন। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘাড়ম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহেচৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া (৯)॥

তৃতীয় অধ্যায়—খাণ্ডব-দাহ।

আমরা মহাভারতের মনোহর উদ্যানে বিচরণ করিতে করিতে এখন এক ভীষণ বন ও কণ্টকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। তাহার মধ্যে স্থিত উচ্চবৃক্ষের অনৈসর্গিক পারিজাত প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বেল, যূই প্রভৃতি প্রকৃতির যে সুন্দর ফুল আশে পাশে ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহাই তুলিতেছি।

৮। আদিপর্ব্ব ২১৯—১৮।

৯। পাঁঠার সহিত পাঁঠার যুদ্ধে, ঋষির শ্রাদ্ধে, প্রভাতের মেঘ-আড়ম্বরে এবং পতিপত্নীর কলহে আরম্ভটা খুব ধুমধামে হয় সত্য কিন্তু শেষে কার্য্যটা খুব সামান্যই হয়। পাঁঠার সহিত পাঁঠার যুদ্ধে আক্রমণের সময় খুব বিক্রম দেখায় কিন্তু এমন ভাবে আঘাত করে যে কেহই দুঃখ না পায়। ঋষিদের শ্রাদ্ধে বহু ঋষির নিমন্ত্রণ করা হয় কিন্তু সকলে আসিলে প্রত্যেককে একএকটী হরিতকী মাত্র দেওয়া হয়। প্রভাতে খুব মেঘ হইলেও বৃষ্টি সামান্য হয়। আর দম্পতির কলহ, ইহা আমি কেন? সকলেই জানেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খাণ্ডব এক মহাবন। তাহার কিয়দংশ পরিষ্কৃত ও তথায় ইন্দ্রপ্রস্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ মহাবনই ছিল। তথায় সর্ব্বপ্রকারের অসংখ্য বন্য পশু বাস করিত। একদিন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যমুনাতীরে বসিয়া আছেন, এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ তাঁহাদের নিকট আসিয়া এই বন দগ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন। (১০) তাঁহারা সম্মত হইলেন। মহাভারতে আছে, পূর্ব্বেও অনেকে এই বন দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু অতিবৃষ্টি বশতঃ কৃতকার্য্য হয় নাই (১১)। আর এক স্থানে আছে, দেশের হিতসাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এই খাণ্ডব-বন দগ্ধ করিয়াছিলেন। (১২) তবেই মনে হয়, এই মহাবনের অসংখ্য বন্যপশু রজনীতে নির্গত হইয়া চতুষ্পার্শ্বের শস্যক্ষেত্র সকল নষ্ট করিত, গবাদি বিনষ্ট করিত, অধিবাসীগণের প্রাণ হরণ ও বহু ক্ষতি করিত। তাহা নিবারণ করিতে পারিলে, দেশের হিত সাধিত হইত। আবার এই বনপ্রদেশ পরিষ্কৃত হইয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইলেও দেশের মঙ্গল হইত। আবার ইন্দ্রপ্রস্থের ন্যায় রাজধানীর নিকটে এতবড় বন থাকাও বাঞ্ছনীয় নহে। সম্ভবত, এই সকল কারণেই এই বনদাহের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা হইয়াছিল। যাঁহারা কখনও পশ্চিম প্রদেশে মহাবন দগ্ধ করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, গ্রীষ্মকালে যখন প্রবল বায়ু পশ্চিম দিক হইতে ঝটিকার ন্যায় বহিতে থাকে, এক সেই সময় ভিন্ন মহাবন আর কখনও দগ্ধ করা যায় না। আবার সেই সময় সতত বৃষ্টি হয়। এইজন্য মহাবন দগ্ধ করা অতিশয় কঠিন কার্য্য।

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন খাণ্ডব-বন দগ্ধ করিতে সম্মত হইলে, সেই ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব নামক এক অতুলনীয় অতি বৃহৎ ধনু ও দুইটী অতি বৃহৎ তূণ ও রথ এবং কৃষ্ণকে গদা ও চক্র প্রদান করিলেন। এই চক্র নিক্ষিপ্ত হইলে, বৃত্তাকারে গমন করিয়া শত্রু সংহার করিয়া নিক্ষেপকের হস্তে পুনরায় ফিরিয়া আসিত। (১৩)

এই মহাবনের একদিকে অগ্নি দিলে, অন্য দিক দিয়া অসংখ্য বন্য পশু পলায়ন করিত ও উদ্দেশ্য পণ্ড হইত। এই জন্যই বোধ হয়, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এই বিস্তৃত বনের চতুষ্পার্শ্বে সমকালে ভীষণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন। তথাপি কত পশু পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অতি দ্রুতবেগে সেই বনের চতুষ্পার্শ্বে রথ পরিচালন করিতে লাগিলেন, আর পলায়ন-পর পশুদিগকে নিহত করিয়া, সেই অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই বন্য-পশুগণ পলায়ন সময়ে অর্দ্ধদগ্ধ হইলে, পরে মরিয়া, পচিয়া দুর্গন্ধ বিস্তার করিত। নিকটবর্ত্তী

১০। আদিপর্ব্ব ২২২—৩০ শ্লোক ৩৩।

১১। আদিপর্ব্ব ২২৩—৮.৯।

১২। আদিপর্ব্ব ২৩৪—৫।

১৩। আদিপর্ব্ব ২২৫—২৭। অনুমান ২৮।২৯ বৎসর হইল মৃত বন্ধুবর রেভারেণ্ড পঞ্চানন বিশ্বাস আমাদিগকে বলেন যে তিনি অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে গিয়াছিলেন। তথাকার আদিম অসভ্য অধিবাসীরা এখনও এরূপ চক্র ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহা নিক্ষেপের কৌশলে বৃত্তাকারে গমন করিয়া, শত্রুর মস্তক ছেদন করিয়া নিক্ষেপকের হস্তে ফিরিয়া আইসে। তিনি তথা হইতে এরূপ কয়েক খানি অস্ত্র আনিয়াছিলেন কিন্তু সাহেবেরা তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়াছিলেন।

গ্রামের জলবায়ু দূষিত করিত। গ্রীষ্মকালে মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত বৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বনের সর্ব্বত্র এমন ভীষণ অনল প্রজ্জ্বলিত করিলেন যে কিছুতেই তাহা নির্ব্বাপিত হইল না। এইরূপে তাঁহারা পঞ্চদশ দিবস ধরিয়া দিন ও রাত্রি, রাত্রি ও দিন অবিরাম ও অকাতরে পরিশ্রম করিয়া এই মহাবন দগ্ধ করিলেন। এই দেশোপকারে সকলে তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিল। দেশোপকারে যে যশ হয়, তাহা আর কিছুতেই হয় না।

ক্রমশঃ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

মহাজাগরণ।

আজ্‌কে শুভ শঙ্খরবে এমন ক'রে ডাক্‌লো কে ?
আকুলকরা, উদারস্বরে পড়্‌লো সাড়া নাকলোকে।
স্বাধীনতার বার্ত্তা এল, মত্তো সুরনিম্নগা,
অবাধগতি, অযুতভীম নক্র-মীন-পন্নগা।
জহ্নু তারে শুষল মিছা মন্থভরে, নিঃশেষে,
প্রতীপ হ'ল ঐরাবত, পলকে গেল ঐ ভেসে।
দলিয়ে বাধা, টলিয়ে গিরি, গলিয়ে শুষ্ক হিমশিলা,
সরস করি ঊষর মরু, করিয়া তরুর মূল ঢিলা,
ধরিত্রীর আঁচলে করি সবুজ জরি-শিল্পকাজ,
শান্তিশুভ শক্তিময়ী, মুক্তিরূপা নাম্‌ল আজ।
শুষ্ক শত শীর্ণখালে হঠাৎ আজি ডাক্‌ল বান।
অসাড়, জড় ভস্মরাশে হঠাৎ আজি জাগ্‌ল প্রাণ।
স্পন্দ এল হিমশরীরে, অন্ধআঁখি রূপ দেখে,
অধীর হ'ল রক্তধারা তীব্র চেতন মদ চেখে।
উঠ্‌ল কোটিকণ্ঠে আজি জয়ধ্বনি দেশমাতার,
অগ্নিগিরির ফুল্‌কি লেগে উঠ্‌বে জেগে চীন্ তাতার।
জাগ্‌ল ওরে, জাগ্‌ল এবার নয়ন মেলি নির্ণিমেষ,
বক্তিয়ারের আমল থেকে সুপ্তিহত বাংলা দেশ।

বক্তিয়ারের আমল থেকে রক্তআঁখির ক্রীতদাস
আজ্‌কে সবে কলরবে, উঠ্‌ল মেতে, কি উল্লাস!
বল্লে সবে সমস্বরে সমুন্নত মস্তকে,—
"চরণ-সেবা-বৃত্তি থেকে রেহাই দিনু হস্তকে।

দাসত্বের ঐ সজ্জা প'রে লজ্জা ত আর ঢাক্‌বো না।
হোক্ না কেন রত্নে গড়া, শিকল পায়ে রাখ্‌বো না।
ডাইনে বাঁয়ে সেলাম-ঠোকা, জাত-গোলামের হীনপেশা
বিসর্জ্জিনু কোকেন্ হেন সুদুর্জ্জয় এই নেশা।
মানুষ মোরা, অমর মোরা, করবো না ক মৃত্যুভয়।
আত্মা মোদের অজয়, মোদের চিত্ত কারো ভৃত্য নয়।
দেশের পাশ মুক্তি দিতে শক্তি যদি নাও থাকে,
নিজের মান রাখ্‌ব মোরা, রাখব স্বাধীন আপনাকে।
করবো না আর চাকরী কারো, অন্ন যদি নাই জুটে।
মরবো না আর অর্দ্ধশত আর্দালীদের পায় লুটে।
করবো স্বাধীন ব্যবসা কারুর মানবো না ক কুশাসন,
এখন যারা তুচ্ছ করে, তারাই দেবে উচ্চাসন।"

"মিঠা মোদের মাটি, মোদের মিঠার মাঝে ঘরকরা,
পুষ্পফলে মধু মোদের, কন্দমূলে শর্করা;
মোদের ইক্ষু-যষ্টিগুলি মিষ্টরসে টস্‌টসে,
হাজার ধারে তাল-খেজুরের অঙ্গে মিঠা জল গলে।
এই দেশেতে, কেমন পোড়া অদৃষ্টের এ শয়তানী,—
চায়ের সাথে খাবার চিনি দাস্তা থেকে আমদানী!
ঘুচাও এ কলঙ্ক, কর চিনির বড় কারখানা,
কিংবা গ্রামে গ্রামে বসাও ছোট কল হাজার খানা।"
"মস্তবড় কারখানা? সে অনেক টাকার মামলা যে;
ছোট্ট কলে লাভ বেশী নেই, করিই বা তা কোন্ লাজে?"

"গোধনগুলি হচ্চে উজাড়, ছাগের আকার ষাঁড়গুলা,
গোশাল থেকে কিনচে কসাই চামড়া এবং হাড়গুলা।
ছটাকখানি দুধ মেলা তার আটটা গরুর বাঁট ক'ষে,
মাথা কুটেও জুটছে না আর ঘৃতের ছিটা চাট চ'ষে।
শুকিয়ে গেল বৃদ্ধ, শিশু দুগ্ধাভাবে, ধুঁকচে দেশ,
রুগ্ন-লোকের শুষ্ক উদর পীহায় শুধু ভরচে বেশ
দশজনেতে চেষ্টা ক'রে দেশের এ হীন দিন ঘুচাও,
Breed কর সব আচ্ছা গরু, বাচ্ছাগুলোর প্রাণবাঁচাও,
স্নিগ্ধ কর দগ্ধ এ দেশ; দুগ্ধ-ঘৃত-ক্ষীর-ছানায়"—
"পারবো যদি না হয় কভু ঢুক্‌তে গোয়াল ঘরখানায়।"

"পার্শে-ইলিশ টিনে ভ'রে, একটা ভাল দিন দেখে,
চালান কর দেশ বিদেশে।"
"পাগল নাকি ? কিন্‌বে কে ?"
"দেশের পাটে, দেশের কুলি খাটিয়ে, যত Jute millএ
লুটচে টাকা বৈদেশিক বণিক্‌গুলা জোট মিলে"—
"চেষ্টা ক'রে মোরাও পারি করতে দুটো চটের কল ;
কিন্তু তাদের চিন্‌বে কেটা, সিন্ধুমাঝে ঘটের জল !
পাটের কথা ভোলাই ভাল। পাটের চাষে কম ক্ষতি ?
এর বদলে ধানের আবাদ করলে বেশী সঙ্গতি।"
"ধানের চাষই কর, গজাও একের স্থানে তিনটা শীষ,"
"রক্ষে কর, লক্ষ্মী করুন রিক্ত হবার সত্যাশীষ।
পারবো না ভাই পাকুই নিয়ে ভুগ্‌তে খালি পায় হেঁটে।'
"আড়ৎদারী ?"
"তাও ত দেখি মাড়োয়ারীর একচেটে।"

"দোকান করা,"
"গ্রীষ্ম শীতে ভোর না হ'তে ঝাঁপ তুলে
মিনিট গোণা, অলক্ষিত খদ্দেরের বাপ তুলে ;
সাঙ্গ দুটো শ্যালীর সঙ্গে গল্প, হাসি, মশকরা,
দু-পাঁচজন বন্ধুকে বা তাসপাশাতে বশকরা,
চুলোয় গেল নভেল পড়া, কুলোয় না ক' ফুর্‌সতে,
Football বা Bioscopeএর খবর রাখা দূর হতে,
গদে ঘুরে, অস্তমিত দুপুর বেলা নাকডাকা,
আধ পয়সার হিসাব ক'ষে স্বপ্ন শুধু লাখ টাকা !
চাই না মোরা, বয়স ভোর এ কাঁচ্চা ভরির দামধরা,
ভদ্রলোকের চাম্‌ড়া নিয়ে দাম্‌ড়া গরুর কাম করা।"

বছর কত এম্‌নি ধারা চল্ল বহু জল্পনা।
পছন্দসই ব্যবসা বাছা, ঝক্কি বড় অল্প না।
কৃষির কাজ বে-ইজ্জতী, বাণিজ্যে না মন জমে,
মিস্ত্রী-মজুর হবার কথা ভাব্‌লেও যে প্রাণ দমে।
তাহোক্—তবু বঙ্গবাসী কল্লে পালন ঘোর শপথ,
নিলেন বেছে সবাই যে যার মনের মত স্বাধীন পথ—
নকুল মুখো উকিল হ'ল, উকিল হ'ল মাখন লাল,
উকিল হ'ল ফকির চাঁদ, আর উকিল হ'ল অখিল পাল,

উকিল হ'লেন নারাণ ভট্ট, হারাণ চট্টো, বীরেন বোস্,
উকিল হ'লেন অরুণ গুপ্ত, হিরণ দত্ত, কিরণ ঘোষ,
উকিল হ'লেন রমেশমৈত্র, টমাস্ মিত্র, এল্, বি, সেন,
সেখমহম্মদ, মুন্সীআমেদ, সৈয়দ্ হামীদ্, দিলহুসেন।
আর বাকী সব রৈল যারা, ঢুকল Law এর ক্লাস ধরে,
উকিল হ'য়ে ঘুরবে আশা বেরিয়ে বি, এল, পাশ ক'রে।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গণিকা।

শুভ-নববর্ষে। যাঁহার অনন্ত বিধানে কালচক্র ঘুরিতেছে, যাঁহার অজস্র করুণায় "নব্য-ভারত," আটত্রিশ বৎসর নানা বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম করিয়া আজ ঊনচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল, সর্ব্বপ্রথমে সেই বিশ্বনিয়ন্তাকে স্মরণ করি; ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভরে প্রণাম করি। তাহার পর, ইহার গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠক সকলকে অভিবাদন করি। যাঁহার অক্লান্ত "নব্যভারতের" জন্ম, যাঁহার হৃদয়ঢালা ঐকান্তিক সেবায় "নব্যভারত" এতদিন সংসার পথে চলিতে পারিয়াছে,—যিনি ছিলেন ইহার প্রাণ, তাঁহার কথা মনে হইয়া, আজ হৃদয় মন ভারাক্রান্ত; অবসন্ন, উৎসাহ উদ্যম; নয়ন, অশ্রুসিক্ত। তাঁহার অবর্ত্তমানে, "নব্যভারত" কি ভাবে চলিবে, বর্দ্ধিত হইবে, সকলের কতদূর মনোরঞ্জন করিতে পারিবে, এ জটিল প্রশ্নের সমাধান বিধাতাই করিতে পারেন। অসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অনাথের নাথ সেই স্বয়ম্ভূ শ্রীহরির নির্দ্দেশেই আজ কত সহৃদয় মহাপ্রাণে নিঃস্বার্থ ভাবে "নব্যভারতের" অঙ্গ-পুষ্টি ও সৌষ্ঠব-বৃদ্ধির জন্ম অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন; অযাচিত, অপ্রত্যাশিত অনন্ত-সাধারণ এই সাহচর্য্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়া, কৃতজ্ঞতা-ভরে হৃদয় নত হইয়া পড়িয়াছে; গাঢ় অবসাদ-রজনীতে এই শুভ আশার আলো লাভ করিয়া প্রবোধিত হইতেছি।

"নব্যভারত" যে সেবাব্রত লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠকবর্গের স্নেহ-সিঞ্চনে তাহা উদ্‌যাপনের অশেষ সহায়তা হইয়াছে। ভবিষ্যতে সেই দয়া, অনুগ্রহ, সহানুভূতি হইতে "নব্যভারত" বঞ্চিত হইবে না, সেই আশায় বুক বাঁধিয়া আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি।

* * *

৺সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বৎসরটা বাঙ্গলাদেশকে আরো একটী রত্নহীন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। দরিদ্রের বন্ধু লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক সুরেশচন্দ্র, বিগত ১৭চৈত্র, ইংরাজী ৩০শে মার্চ্চ, বুধবার, পূর্ব্বাহ্নে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ভগবান পরলোক-গত আত্মাকে শান্তি ও তদীয় পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা বিধান করুন।

* * *

স্বাগত লর্ড রেডিং। বিগত ২০শে চৈত্র, ইংরাজী ২রা এপ্রিল, ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড

চেমসফোর্ড, পাঁচ বৎসর কাল, ভারতের শাসন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি মহামান্য সার রুফাস ড্যানিয়েল আইসাক, পি-সি, জি-সি-বি, জি-সি-এস-আই, জি-সি-আই-ই, কে-সি-ভি-ও, রেডিংয়ের আরল্ মহোদয়ের হস্তে সেই ভার অর্পণ করিয়া বিদায় লইয়াছেন। ভারতে পদার্পণ করার পরে, বোম্বাই মিউনিসিপালিটি হইতে নূতন বড়লাট বাহাদুরকে অভিনন্দিত করা হয়। সেইকালে, তাঁহার উক্তি হইতে বিচার করিতে হইলে, আশা করা যাইতে পারে, নব-লাটের অধীনে শাসন-কার্য্য নূতন-ভাবে পরিচালিত হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন—

* * * I shall set out cheered and encouraged by your welcome with hopefulness in my heart, and mainly because all my experience of human beings and human affairs has convinced me that justice and sympathy never fail to evoke responsive chords in the hearts of men of whatever race, creed or class. They are two brightest gems in any diadem. Without them, there is no lustre in a crown. With them, there is a radiance that never fails to attach loyalty and affection. You draw attention to the close approximation of the views expressed by that great Indian —Dadabhoy Naroji—whom I had the honour to know, with love enunciated by me from my seat as Lord Chief Justice, when taking leave of the Bench and Bar. It is true that as Viceroy, I shall be privileged to practise justice in larger fields than in the Courts of Law, but the justice now in my charge is not confined within statutes or law reports. It is justice that is unfettered and has regard to all conditions and circumstances and should be pursued in close alliance with sympathy and understanding. Above all, it must be regardless of distinctions and rigorously impartial. The British reputation for justice must never be impaired during my tenure of office and I am convinced that all who are associated in the Government and administration of Indian affairs will strive their utmost to maintain this reputation at its highest standard. এভাবের উক্তির বিরুদ্ধে কাহার কিছুই বলিবার থাকিতে পারে না। এই ভাষায় না হউক, পূর্ব্বেও, এই প্রকার সাধু সঙ্কল্পের সু সমাচার (gospel) ভারত পাইয়াছে। কাজে কতটা দাঁড়ায়, তাহাই দেখা দরকার। ভারতের দুর্ভাগ্য [illegible],—'যে বনে, সেই হয় বন বিড়াল'। তবে লর্ড রেডিং স্বয়ং সকল বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়া নিজে সকল ব্যাপারের 'আসল হাল' বুঝিয়া মতামত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য প্রকাশ বা নির্দ্ধারণ করিবেন, বলিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, অনাবিল ভাবে পরিচালিত হইলে,—নানা প্রকারের বৈষম্যপূর্ণ বিষয় আসিয়া তাঁহার নির্ম্মলতাকে ক্ষুণ্ণ না করিলে,—শাসন-স্রোত নির্ব্বিবাদে অগ্রসর হইয়া দেশের সর্ব্ব-প্রকার মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। ভারতবাসীর অতীতের অভিজ্ঞতা কিন্তু এতদূর আশা রাখে না। মহামান্য বড়লাট কিন্তু ভারতে পদার্পণের অব্যবহিত পরেই, দারুণ অত্যাচার-প্রপীড়িত পাঞ্জাব-প্রদেশ পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন, শুভ লক্ষণ। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে নবলাট বাহাদুরকে সসম্ভ্রমে সম্বর্দ্ধনা ও অভিবাদন করি। তাঁহার সৎ সঙ্কল্প শুভফল-প্রসূ হোক; দেশের ও দশের দুঃখ দারিদ্র্য বিমোচিত হউক, সর্ব্বোপরি প্রাণের গভীর ক্ষোভ, নিদারুণ মর্ম্মবেদনা, বহুকাল-ব্যাপী ভীষণ অত্যাচার-পীড়া নিরাকৃত হোক। তাঁহার জয় জয়কার হোক।

* * *

ডাকমাশুল। 'যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না'—নর মানবের পক্ষে বড় কম সৌভাগ্যের কথা

নয়। হেনি সাহেবের ইচ্ছানুরূপ ডাক-মাশুল বর্দ্ধিত হইলে, দেশে সাহিত্য চর্চ্চার মূলে কুঠারা-ঘাত হইত। 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং' হইয়াছে ; কেবল এক তোলা ওজনের চিঠি তিন পয়সায় কমে যাইবে না। ভালোয় ভালোয় এ 'ফাঁড়া'টা যে অন্নের উপর দিয়া কাটিয়াছে, কপা-লের ভাগ্য।

* * *

লোকগণনা। আদম-সুমারির গণনা-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এখন স্থূলভাবে লোক-সংখ্যার হিসাব পাওয়া গিয়াছে। বিবিধ অনুপাতে বিচার করিয়া ইহা হইতে বহু বিচিত্রতার সন্ধান পাওয়া যাইবে। তাহার ফল প্রকাশিত হইতে এখনও কিছুকাল লাগিবে। কিন্তু বঙ্গ দেশের বিভিন্ন জেলার হিসাব মোটের উপর সন্তোষ-জনক বলা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় জেলার গণনা-ফল দিয়ে দিতেছি—

	১৯১১ হিসাব	১৯২১ হিসাব
বীরভূমি	৯,৩৫,৬৬৫,	৮,৪৭,[illegible]০৮
ফরিদপুর	২১,৪৫,৮৫২	১২,৪৮,৮০৬
নদীয়া	১৬,১৭,৫৭২	১৪,৮৬,১১১
মুর্শিদাবাদ	১৩,৭২,২৭৪	১২,৬৪,২০৭
মেদিনীপুর	২৮,২১,২০১	২৬,৬১,৬৬২
মালদহ	১০,০৪,১৫৯	৯,৮৯,০৯৫
দারজিলিং	২,৬৫,৫৫০	২,৮২,৫৫৫

সমগ্র ভারতের লোক-গণনার ফলে দেখা যায়—১৯২১ খৃষ্টাব্দে মোট জন-সংখ্যা ৩১৯,০৭৫,১৩২ ; তাহার মধ্যে পুরুষ ১৬৪,০৫৬,১৯১ ; স্ত্রীলোক ১৫৫,০১৮,৯৪১। এই সংখ্যা, পূর্ব্ব-সুমারির সহিত তুলনা করিয়া বুঝা যায়, ১৯০১ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে শতকরা ৭'১ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু, ১৯১১ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে কেবল মাত্র শতকরা ১'২ জন বৃদ্ধি হইয়াছে। এই প্রকার হিসাবে, ভারতের সমগ্র প্রাদেশিক জন-গণনায় পূর্ব্ব দশ বৎসরের শতকরা বৃদ্ধির হার দেখা যায় ৫'৫, বর্ত্তমান দশ বৎসরে কিন্তু কেবল, ১'৩। এই লোক সংখ্যা হ্রাস-গতির কারণ কি, বিবেচনার বিষয়। অপর অপর দেশের অনুপাতে, ইহা ভয়াবহ। আদম সুমারির ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য, মোট ২৪,৬৫,০০৯৲ টাকা ভারত গভর্ণমেণ্ট নির্দ্ধারণ করেন।

* * * * * *

চিত্রগুপ্তের খাতা। আদম সুমারির ফলে যাহা বিবেচনার জন্য উক্ত হইল, তাহা আরো সুস্পষ্ট হইবে, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের মিউনিসিপ্যাল বিভাগ হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯১৯ সনের জন্ম-মৃত্যুর তালিকা পাঠে। ইহাতে প্রকাশ, মোট জন্ম-সংখ্যা হইতে ঐ বৎসর মৃত্যু-সংখ্যা, ৩,৯০,০০০ বেশী ; কলেরায়, ১,২৫,০০০ ; বসন্তে, ৩৭০০০ ; জ্বরে, ১২,২৯,০০০। বৎসর বৎসর এই হারে যদি আমদানি (জন্ম) কম, ও রপ্তানি (মৃত্যু) বেশী হইতে থাকে, পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, দেউলিয়ার পূর্ণ-লোপ।

বঙ্গে পুলীশ-ব্যয়। লোক আগে বাঁচুক, তবে ত তাহাকে রক্ষার আয়োজন; তাহাই বিচক্ষণতার কাজ। লোক-ই যদি না থাকে, কোথায় থাকিবে রাজ্য, রাজ্য-শাসন, শান্তি-রক্ষা। এইজন্য, সর্ব্বপ্রথমে যে সকল কারণে লোক-সংখ্যা উত্তর উত্তর হ্রাস পাইতেছে, তাহা নিরাকরণ করিবার সুব্যবস্থা করাই প্রকৃত স্বার্থ। বঙ্গীয়-শাসন-প্রণালী কিন্তু অন্যরূপে পরিচালিত। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের জন্য ১৮২১-২২ খৃষ্টাব্দে বরাদ্দ আছে—

	প্রজার ইচ্ছাসাপেক্ষ	তদবহির্ভূত	মোট	পূর্ব্ববৎসর হইতে বৃদ্ধি
চিকিৎসা—	৪৫,১২,০০০	৭,১২,০০০	৫২,২৪,০০০	+১৫ ০০০
সাধারণ স্বাস্থ্য—	১৮,৫০,০০০	৯৬,০০০	১৯,৪৬ ০০০	+১০,৫০,০০০
মোট টাকা—	৬৩,৬২,০০০	৮,০৮,০০০	৭১,৭০,০০০	+২৫,৪০,০০০

ইহার মধ্যে হইতেই যাবতীয় হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, ডাক্তার ও লোকজন সকলের ব্যয়-নির্ব্বাহ হয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অথবা মিউনিসিপালিটির ডাক্তার-খানার ব্যয় অবশ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়। পুলিশ-বিভাগের ব্যয়ের বরাদ্দের বহর, এই ব্যয়ের তুলনায়, কত বৃহৎ দেখুন—

	প্রজার ইচ্ছাধীন	তদবহির্ভূত	মোট	পূর্ব্ববৎসর হইতে বৃদ্ধি
সদর পুলীশ—	৩১,৪১,০০০	৯৬,০০০	৩২,৩৭,০০০	+১০,২৭,০০০
ওয়ারধান—	২,৬২,০০০	১,৩৭,০০০	৩,৯৯,০০০	+১৩,০০০
জেলা পুলীশ—	১,২০,১৭,০০০	১০,৭১,০০০	১,৩০,৮৮,০০০	+১৭,৮২,০০০
বিশেষ পুলীশ—	৪,০০,০০০	১,৭১,০০০	৫,৭১,০০০	+১,৪৭,০০০
রেল পুলীশ—	৬,৭৭,০০০	৩৬,০০০	৭,১৩,০০০	+৭০০০
গোয়েন্দা পুলীশ—	৬,২০,০০০	৫২,০০০	৬,৭২,০০০	+২১,০০০
ঘোড়দৌড়—	০	৩০০	৩০০	+৩০০
প্রত্যর্পণ—	০	৪,৭০০	৪,৭০০	—৩০০
মোট টাকা	১,৭৫,০০,৭০০	১৫,৪৮,৩০০	১,৯০,৮৫,০০০	+২৭,৬০,০০০

ইহার মধ্যে কিন্তু বিবাহিত-পুলীশ-সার্জেণ্টের ইমারতের জন্য জমি ক্রয়ের খরচ নাই। চিকিৎসা ও সাধারণ স্বাস্থ্যের বিভাগ প্রজা-তন্ত্রের শাসনাধীন; পুলীশ-বিভাগ কিন্তু তাহা নয়। সে বিভাগে আমলা-তন্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য। প্রজার এই বিভাগের ব্যয়-সংক্ষেপ করিবার প্রস্তাব মাত্র করিবার ক্ষমতা আছে। ব্যয় কমাইয়া দিলে, গভর্ণর, সে ক্ষমতার বলে, কোন রক্ষিত-বিষয়ে (reserved subject) কোন বিভাগের পরিচালনের জন্য (অবশ্য-প্রয়োজন বিবেচনা করিলে,) সেই ব্যয় প্রত্যর্পণ (restore) করিতে পারেন। প্রজা-তন্ত্রের উপরে ন্যস্ত শাসন-বিভাগের আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা-বিষয়ে প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তার পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা নাই; সে বিষয়ে, প্রজার প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য-মণ্ডলীর অধিকাংশের মতই চরম। পুলীশ-বিভাগের এই ব্যয়বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক-সভায়, বে-সরকারী সদস্যগণ তুমুল আন্দোলন করিয়া ব্যয় হ্রাস করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, পরম সৌভাগ্যের বিষয়। যতটুকু ক্ষমতা আছে, তাহার প্রয়োগে, যতটুকু পারা যায়, অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতে প্রয়াসী হওয়াই বিধেয়। ফলে কিছু না দাঁড়ায়, তাও ভাল; চেষ্টার ত্রুটী না হয়, তাহাই দেখা উচিত। ঘোরতর আন্দোলনের ফলে, বে-সরকারী সভ্যমণ্ডলী মোটমাট ২৩৩৪,০০০ টাকা পুলীশ-বজেট হইতে কমাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর, আমলা-তন্ত্রের মধ্যে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়; কি উপায়ে এই প্রকার বে-সরকারী সদস্য-মণ্ডলীর বে-আদবীর প্রতিকার করা যায়, নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। বে-

সরকারী সদস্য-মণ্ডলীর মধ্যেও প্রজাগণের প্রতিনিধি এমন লোকের অভাব নাই, যাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা, আমলা-তন্ত্রের পৃষ্ঠ-পোষণ। এই নীতি অবলম্বনে, তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষতি ত কিছুই নাই, বরঞ্চ লাভের আশা আছে, বিস্তর। সে যাহা হউক, এই প্রকার ব্যয়-হ্রাসের প্রস্তাব গৃহীত হইবার পরেই, আমলা-তন্ত্রের পৃষ্ঠ-পোষক কোন কোন সদস্য, লাট-বাহাদুরের নিকটে নিবেদন করিলেন, এই প্রকার ব্যয়-সংক্ষেপ করিয়া গর্হিত-কর্ম্ম করিয়াছেন, অবসর পাইলেই পুনর্বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে রাজী আছেন। উপায় উদ্ভাবিত হইল; প্রশ্নটী পুনরায় বিবেচিত হইবে, নির্দ্ধারিত হইল। সে ঘটনা জটিল, প্রহেলিকা-পূর্ণ। বাহুল্য-ভয়ে সে আলোচনা আজ স্থগিত রাখিতে হইল।

এই প্রকারে কার্য্য-প্রণালী সম্পন্ন হইবার পর, বঙ্গের লাট বাহাদুর ব্যবস্থাপক সভার মুলতুবি করিবার প্রসঙ্গে, বিগত ৮ই এপ্রিল, ১৯২১ তারিখে, সভাস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া,—গুরু যেমন পোড়োদের তিরস্কার করিয়া থাকেন,—সেই প্রকার এক প্রস্থ তাড়না করেন। তাহাতে, শাসন-নীতি ও তন্ত্রের বিধি-ব্যবস্থার শাস্ত্রার্থ-মূলক বহুল কূট-তর্কের প্রবর্ত্তন করেন। বিশেষ ইচ্ছাসত্বেও, স্থানাভাবে, তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

তাহার পর পুলিশ বজেট সম্বন্ধে তিনি বলেন—If I have rightly understood them (proceedings), it is your desire to give further consideration to the question of the amount which you may deem necessary for the proper maintenance of an adequate police-force in the light of any further information which Government may be able to give you. * * * I shall certainly take steps to accede to *the request made to me* in the course of the debate on Friday last (1st April 1921) to provide you with *the opportunity for which you ask*, further to discuss the matter। এই 'সুযোগ' দেওয়া হইয়াছিল বিগত ২০শে ও ২১শে এপ্রিল তারিখে। সেই দিন, এই বিভাগের ব্যয়ের জন্য মোট ২২,৯৭,৭০০ টাকা চাওয়া হয়; পূর্ব্বে বলিয়াছি, কমান হইয়াছিল, ২২,৩৮,০০০ টাকা; বাকী মোট ৬৬,৩০০৲ ফাজিল যোগের ভুল হইয়াছিল, প্রকাশ পায়; তাই সংশোধিত দাবী-টুকু হয় নাই। খুব কম্‌কাইয়া গিয়াছে! লাটবাহাদুর যাহার কথা বলিয়াছিলেন, সেই প্রতিশ্রুত তথ্য, ১৮ই এপ্রিল প্রস্তুত হয় এবং কোন কোন বে-সরকারী সভ্যের নিকটে সভার নির্দ্ধারিত দিনের (২০শে এপ্রিলের) প্রাতে নয়টার সময় পৌছে। আমাদের ধারণা, দয়া-পরবশ হইয়া, আমলা-তন্ত্র এই যে তথ্য দিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই দাবী না-মঞ্জুর করিলে যে বিভাগটী একেবারে অচল হইয়া পড়ে, সে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ব্যবস্থাপক-সভার মত যে এই তথ্য প্রকাশের জন্যই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সে বিশ্বাস আমাদের মোটেই নাই। ইহা প্রকাশ না হইলেও যাহা হইত, প্রকাশিত হইবার পরেও তাহাই হইয়াছে। আমাদের মতে, প্রথমতঃ ভারত-শাসন-বিধির ব্যবস্থা অনুসারে এই, প্রকারে, সংশোধিত ব্যয়ের দাবী হইতে পারে কি না, সন্দেহের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবস্থাপক সভা একবার কোন রক্ষিত বিষয়ের আয় ব্যয় সম্বন্ধে বিচার করিলে পর, আবার পুনর্বিবেচনা করিবার ক্ষমতা পাইতে পারেন কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। তৃতীয়তঃ, ব্যবস্থাপক সভার মতামত প্রকাশ করার পরে, সেই বিষয়ে দায়ীত্ব সম্পূর্ণরূপে লাট বাহাদুরের উপরে পড়ে; তিনি হয়, তাঁহার স্বায়ত্বাধীন বিভাগ, যতটাকা মঞ্জুর হইয়াছে, তাহা দ্বারা কায়ক্লেশে পরিচালন করিতে পারেন; না হয়, অমঙ্গলান হইলে, স্বীয় ক্ষমতার ব্যবহার দ্বারা, প্রয়োজন-মত না-মঞ্জুর টাকার ব্যয় মঞ্জুর করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চেষ্টা না করিয়াই, লাট বাহাদুর নামঞ্জুর ব্যয়ের পুনর্বিবেচনার জন্য, পুনরায় ব্যবস্থাপক-সভার

উপস্থাপিত করিতে পারেন কি না, আরো সন্দেহের বিষয়। দায়ীত্ব সম্পূর্ণ এবং কেবল যদি তাঁহারই হয়, তবে ব্যবস্থাপক-সভার নিকট একই ব্যয়-প্রশ্ন বা দাবী বারম্বার কোন অছিলায় উত্থাপিত হইতে পারে, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বহির্ভূত। এই প্রসঙ্গে, একটা প্রশ্ন হইয়াছে যে মূল দাবী হইতে মোটামুটী ভাবে "থান্‌কো" (lump) কোন হ্রাস করিবার ক্ষমতা, বে-সরকারী সদস্যদের নাই। আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না; বিধানটি হইতেছে—The Council may assent, or refuse its assent, to a demand, or may *reduce* the amount therein referred to either by a *reduction of whole grant* or by the omission or *reduction of any items* of expenditure of which the grant is composed। উদ্ধৃত অংশের "reduction of the whole grant অর্থে নিশ্চয় "থানকো" হ্রাসই সূচিত হয়, সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য বা নামঞ্জুর (refusal) নহে। যাক্, ইংরাজীতে যেমন বলে পর্ব্বত মুষিক প্রসব করিয়াছে; আমাদের দেশে, পুনর্ম্মূষিক ভবঃ। আমলা-তন্ত্র যে ১২,৯৭,৭০০৲ টাকা চাহিয়াছিলেন, একটী কাণা কড়িও তাহা হইতে কমে নাই; সমস্তটাই পুনর্বিবেচনায় মঞ্জুর হইয়াছে। আশা করি, সকলে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অর্থ অনুধাবন করিয়াছেন; আশা করি, সকলে মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের সুবিবেচনায় পুলীশ বিভাগের দাবী প্রকৃত এবং এক কপর্দ্দকও হ্রাস করিলে তাহা চলিতে পারে না। যে দায়ীত্ব ছিল লাট সাহেবের, আশা করি তাহা স্বয়ং বরণ করিয়া লইয়া বে-সরকারী সদস্যগণ তৃপ্ত আছেন। একেই বলে স্বায়ত্ত-শাসন। সকল সদস্য বলা ভুল হইয়াছে। দেশ একবার আটাশ বীরের গৌরবে মহীয়ান হইয়াছিলেন, আজ আমরা বলি—'সাবাস সাতাশ'। সপ্তবিংশতি সদস্য যে নির্ভিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার জন্ত আমরা তাঁহাদের শত শ্লাঘা করিতেছি। আর সকলকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি, বাইবেলের 'প্রবাদ'-গ্রন্থের, ২৬শ অধ্যায়ে, একাদশ শ্লোকে উক্ত আছে—

As a dog returneth to his vomit *so* a fool returneth to his folly.
— 26 Prov.,ii.

* * *

সম্রাট খুল্লতাতের ভারত-ভ্রমণের ব্যয়। মহামহিমান্বিত ডিউক অব কনটের ভারতভ্রমণ সূত্রে প্রকাশ, ভারতকোষ হইতে মোট ব্যয় হইয়াছে, মোট ৩৫,১২,৭৭৪ টাকা। অলমতি বিস্তরেণ।

প্রাপ্ত-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। স্বনাম-প্রসিদ্ধ, 'ভূপ্রদক্ষিণ'-প্রণেতা, নব্যভারতের পুরাতন লেখক ৺চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় 'কর্ম্মপ্রসঙ্গ বা মানব-জীবন-রহস্য-শীর্ষক গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশিত করিবার অব্যবহিত পরেই ইহলীলা সম্বরণ করেন। গ্রন্থখানি 'জন্মমরণ সঙ্কুল সংসারপথের অবসন্ন পান্থগণকে, উৎসর্গীকৃত'। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র। শুনিলাম, গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্ত, সেন মহাশয়কে ঋণ-গ্রস্থ অবস্থায়ই পরপারের যাত্রী হইতে হইয়াছিল। গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। এই গ্রন্থ সকল ঘরে স্থানলাভ করিলে,—রথ দেখা, কলা বেচা,—সুখপাঠ্য গবেষণাপূর্ণ সন্দর্ভ পাঠ এবং পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, দুই-ই হইবে। আর, মধ্য হইতে, তদীয় পুত্র শ্রীমান নিমাইচন্দ্র সেন (৪৪ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা) পিতৃ-ঋণ শোধ করিবার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

* * *

২। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন-চরিত। তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীহেমলতা দেবী প্রণীত। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। ছাপা, কাগজ বেশ ভাল।

আমরা গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত একাধিকবার পাঠ করিয়াছি। ভক্তিভাজন শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবন-চরিত ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই অতীব আদরের জিনিষ। ধর্ম্মের জন্য তাঁহার প্রাণের কি গভীর আকাঙ্ক্ষা, কি কঠোর আত্ম-সংযম ও আত্ম-নিগ্রহ, কি স্বার্থত্যাগ, কতই ব্রত-গ্রহণ আর পালন, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। "আশৈশব সকল কার্য্যেই তিনি ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করিতে ভাল বাসিতেন।" এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই তিনি এরূপ উন্নত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থখানির ভাষা বেশ সরল ও হৃদয়-গ্রাহিনী। আর শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবনের ইতিহাস এরূপ অপূর্ব্ব ঘটনাবলীতে পূর্ণ যে, গ্রন্থখানি পাঠ করিবার সময় মনে হয় যেন একখানি গল্পের পুস্তক পড়িতেছি। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেই এই গ্রন্থপাঠে নিঃসন্দেহ উপকৃত হইবেন। গ্রন্থকর্ত্রী এই অমূল্য জীবন-কাহিনী সম্পাদিত করিয়া দেশের লোকের মহদুপকার সাধন করিলেন।

৩। 'হিন্দু-মুসলমান'। নিউ ইরা পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। পুস্তকখানি অতি ক্ষুদ্র হইলেও ভাব ও উদ্দেশ্য অতি মহৎ। হিন্দু-মুসলমানে কিরূপ একতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্ম ও সমাজগত স্থল পার্থক্যের অন্তরালে বস্তুতঃ যে কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রভেদ নাই, পুস্তকখানি পাঠে তাহা জানা যায়। ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে এই মতের স্বপক্ষে নানা উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। সময়োপযোগী পুস্তক; ছাপাও বাঁধান চমৎকার; উপহার দিবার যোগ্য। পুস্তকের আদর বাড়া উচিত।

৪। শ্রাদ্ধতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর সঙ্কলিত; অখিল ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ-রক্ষা মহা-সভার পক্ষে প্রকাশিত; মূল্য তিন আনা। পুস্তকখানিতে, শ্রাদ্ধ কি, কি ভাবে কোন সময় হইতে এদেশের ব্রাহ্মণ-সমাজে শ্রাদ্ধ-প্রথার প্রবর্ত্তন ও সম্প্রসারণ হইয়াছে, অন্যান্য দেশবাসীগণ মধ্যে শ্রাদ্ধের ভাব ও অনুকল্প বিস্তার কি ভাবে কতকাল হইতে সংঘটিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কতদূর নিগূঢ় ও ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ রহিয়াছে, বেদ পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে কত প্রকার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রভৃতি নানা জটিল প্রশ্নের সমাধা গবেষণার সহিত করা হইয়াছে। পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। ছাপা কাগজ আরো কিছু ভাল হইলে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত, রাজা বাহাদুরের উপযুক্ত হইত। বোধ হয়, বহুতর প্রচার হয়, এই আশায় মূল্য কম রাখিতে গিয়া, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পুস্তকখানি সকল হিন্দুঘরে প্রচার হওয়া উচিত।

৫। যুগাবতার মহাত্মাগান্ধী ও স্বরাজ্য। শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও ময়মনসিংহ মডেল লাইব্রেরীতে প্রাপব্য, মূল্য দুই আনা। ডিমাই, ৮ম, ২৪ পৃষ্ঠা। পুস্তকখানি পাঠে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত আদর্শের মর্ম্মার্থ জানা যায়। সরল, তরল ভাষায় তাঁহার মত, আদর্শ এবং তাহা জীবন-গত করিবার অনুষ্ঠিত উপায়গুলির এপ্রকার যুক্তিযুক্তপূর্ণ সমর্থন অনেক নাই। এই সময়ে, এ শ্রেণীর প্রবন্ধের সমাদর হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

৬। কুল-সঙ্গীত। স্বর্গীয় কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত, শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ সঙ্কলিত, ত্রয়োদশটী ভক্তের ভক্তি-বিহ্বল পারমার্থিক সঙ্গীত সম্বলিত, উপাদেয় পুস্তক। রচয়িতা 'নব্যভারতের' সুপরিচিত শ্রীদরবেশের পিতৃদেব; ভূমিকায় এই তান্ত্রিক সাধকের একটী মনোরম জীবনালেখ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠে পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। পুস্তকখানি ছাপা ও কাগজ ভাল, মূল্য দুই আনা মাত্র। ভক্ত মাত্রেই এই পুস্তিকাখানি পাঠে তৃপ্ত হইতে পারিবেন, আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।
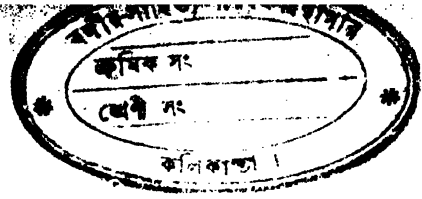
মহাত্মা গান্ধীর মতের দার্শনিক অভিব্যক্তি।

গত শতাব্দীর ৬০ হইতে ৮০ সাল অবধি, ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরাজের অনুকরণে চলিতেই ভাল বাসিতেন। ইংরাজীতে কথা, ইংরাজের চাল চলন, হাসি কাশির অনুকরণ, শিক্ষিত ব্যক্তি গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। তখন মিল স্পেন্সারের ছাঁচে দেশীয় সমাজ গঠিত হইতেছিল। তাঁহাদের মতের প্রভাব ইউরোপেও যথেষ্ট ছিল। তাহা ছাড়া জীবের ক্রমাভিব্যক্তি এবং ইতর জীব হইতে মানবের উৎপত্তি প্রভৃতি মত তখন ইউরোপকে তোলপাড় করিতেছিল। মানব-জ্ঞান কোন জাতিরই নিজস্ব নহে, ইহা সার্ব্বজনীন; সকল জাতিরই ইহাতে সমান অধিকার। কোনও নূতন মত মনের মত হইলে, ঠিক যেন ঔষধের মত ধরে এবং আমাদের দেশেও উহার সেই ফল হইল।

ইউরোপের কথায় আমাদের কাজ নাই। আমাদের দেশের সম্বন্ধে দু'কথা বলাই প্রয়োজন। পাশ্চাত্য লেখকদের কথাই তখন আপ্ত-বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নীতির সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই; আমরাও তাহাই বুঝিলাম। মিল বলিলেন, দারিদ্রাই মহাপাপ এবং মানুষ মাত্রেই সমান; আমরাও কথাটা ঐ ভাবেই বুঝিলাম। দেশের কথা, শাস্ত্রের কথা, তখন লোকে বিষ মনে করিত। কেহ খ্রীষ্টান হয়, কেহ নূতন-গড়া সমাজে যায়, কেহ তর্ক করে, কেহ কুসংস্কার ছাড়িতে বলে। প্রাচীন আচার ব্যবহার একেবারে যেন আর থাকে না। একটা যেন নূতন শক্তি, একটা তরুণ ভাব, দেশকে মাতাইয়া তুলিল। তথা-কথিত স্বাধীন-চিন্তা ও স্বাধীন-ক্রিয়া শিক্ষিত-বৃন্দের মূল অবলম্বন। ছেলে বাপের কথা শোনে না; তার সঙ্গে মত না মিলিলে, তর্ক করে। এদেশে ইহা নূতন নহে। কত চিন্তা-স্রোত, নব কলরবে দেশকে পূর্ব্বে ছাইয়া ফেলিয়াছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহার কোনও ইতিহাস নাই। কাজেই, ইহা কে বুঝিবে?

মেকলে পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, সব সংস্কৃত বই একত্র করিলে, এক থাক ইংরাজী বইয়ের সমান হইবে না; এবং হিন্দুর পুরাণের ভূগোল পড়িলে, ইংরেজ বালিকাও না হাসিয়া থাকিতে পারে না। আমরাও সেই কথা মাথায় পাতিয়া লইলাম, এবং মনে করিলাম, পিতৃপুরুষগুলা কত কুসংস্কারই আমাদের ঢালিয়া দিয়াছেন। দুর্দ্দান্ত খ্রীষ্টিয়ান কৃষ্ণ বন্দ্যো জয়ের হাসি হাসিয়া, পুরাণ হইতে অশ্লীল আখ্যায়িকা তুলিলেন ও তাহাতেই হিন্দুধর্ম্মের লেবেল মারিয়া দিলেন। প্রাচীনেরা ভাবিতে লাগিলেন, এ হ'ল কি? দেশ একাকার ম্লেচ্ছ হয়ে গেল। কেহ ভাবিলেন, এই বুঝি কলির শেষ; তাই সব একাকারে হয়ে যাচ্ছে।

তারপর কি জানি কেন রুষিয়ার এক বিদুষী রমণী মাথা তুলিলেন। তখন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কাহার সাধ্য দাঁড়ায়? যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, যাহা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ সিদ্ধ নহে, তাহা মানুষের গ্রাহ্য নহে। মাদাম ব্লাভাতস্কি ক্লেয়ারভয়েনস্ ও ক্লেয়ার অডিয়েন্সের দাবী করিলেন। অর্থাৎ, মানুষের দিব্য-দৃষ্টি ও দিব্য-শ্রুতি আছে এবং ইহার দ্বারা দেবলোক,

প্রেতলোক প্রভৃতির সংবাদ পাওয়া যায়। ব্লাভাতস্কির মতের মূলে, হিন্দুর যোগ ও সেই সঙ্গে হিন্দুর তন্ত্র ও কিছু কিছু পৌরাণিক সৃষ্টি-প্রকরণ। বোধ হয় ১৮৭৫ সালে, এই খাটি দেশী জিনিস, ইউরোপীয় মস্তিষ্কে পরিষ্কৃত হইয়া, আবার এদেশেই ফিরিয়া আসিল। আমেরিকায় এই মতের বেশ বিস্তার হইল, এবং অল্পে অল্পে ইউরোপেও দেখা দিল। গোঁড়া বৈজ্ঞানিকেরা, ইহা জাল জুয়াচুরী বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কেহ কেহ গালি দিতে লাগিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা, শুক্‌না কাঠে রং করিয়া, বিশ্বের যে মূর্ত্তি দেখাইতেছিলেন, লোকে সে মূর্ত্তিতে আর ভোলে না। টেট্ ও বালফোর ষ্টুয়াট তাঁহাদের "অদৃশ্য-বিশ্ব" (১) নামক গ্রন্থে দেখাইলেন যে, বিজ্ঞান বিশ্ব-রহস্যের কেবলমাত্র বহিরাবরণ মাত্র ভেদ করিয়াছে; ইহার পরে আরও অনেক জানিবার ও বুঝিবার ব্যাপার আছে।

দেশে থিওসফি আসায়, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-মূলক জ্ঞানের উপর সন্দিহান হইতে লাগিলেন। আবার ধীরে ধীরে প্রাচীন আচার ব্যবহার দেশে শিক্ষিতের মধ্যে দেখা দিল। জপ, তপ, হোম, যাগ, তীর্থ-দর্শন আবার ফিরিতে লাগিল। ইহার মধ্যে আবার ম্যাক্স-মলর হিন্দুর দিকে হইয়া, ইউরোপে উচ্চ হিন্দুমত প্রচার করিতে লাগিলেন। সপেনহর উপনিষদে তাঁহার জীবনের শান্তি পাইলেন। গেটে, শকুন্তলার মধ্যে, বসন্ত মঞ্জরিত আগেই দেখাইয়াছিলেন এবং জোনস্ ও কোলব্রুক অনেক আগে হিন্দুর বীজগণিত, জ্যোতিষ ও এমন কি সঙ্গীত অবধি ভাল দেখিয়াছিলেন। আবার স্রোতটা যেন অন্য দিকে ফিরিল। ম্যাক্‌স-মলর আবার ভাষা-তত্ত্বের দিক হইতে ভারতবর্ষে আর্য্য-নিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়া, গ্রীক, জার্ম্মন ও ইংরাজদের সহিত, ভারতবর্ষের জ্ঞাতিত্ব স্থাপন করিলেন! সে কোলাহল, সে উৎসাহ, যে না শুনিয়াছে ও না দেখিয়াছে, তাহার জন্মই বৃথা। তখন ইংরাজীর উপর ঝোঁক কমিল; আর ইংরাজ লেখকেরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর সে প্রভাব রাখিতে পারিলেন না। সে সময়ে কথায় কথায় সংস্কৃত কোটেশন। অন্ততঃ, দুই তিনটি শ্লোক না তুলিলে, মাসিক পত্রের প্রবন্ধ বেশ রুচিকর হইত না। শিক্ষিতেরা অনেকে মদ ছাড়িলেন; জপে তপে মন দিলেন। বঙ্কিমবাবু নভেল ছাড়িয়া, কৃষ্ণ-চরিত্র; ও স্পেন্‌সারের ভাঁজে ও হিন্দুর ছাঁচে, ধর্ম্ম-কথা লিখিতে লাগিলেন। এই সঙ্গে একটা সুফল ফলিল। দেশে একটা জাতীয়তার ভাব আসিল। পূর্ব্বে যেন লোকে ইংরাজী শিখিয়া, হিন্দু-ইংরাজ গোছ হইয়াছিল; কিন্তু এখন আবার তাহারা দেশের লোক হইল। দেশের সুখে, দেশের ভাবে, দেশের অভাবে, সকলের দৃষ্টি পড়িল। এই জাতীয় ভাবটা, দুই একটা কারণে আরও দৃঢ় হইতে লাগিল। ইহার প্রধান কারণ, ইউরোপীয় লেখক-দের ভারতের প্রতি দ্বেষ। জার্ম্মান প্রত্নতত্ত্ববিৎ ওয়েবার হিন্দুর কিছুই ভাল দেখিতেন না। এমন কি, হিন্দুর সাধের গীতার ভক্তি-বাদটাও, তাঁর মতে খ্রীষ্টানদের কাছে ধার-করা জিনিস। কনিংহাম প্রভৃতি লেখকেরা হিন্দুর স্থপতি ভাস্কর্য্য প্রভৃতি, শিল্পে ও কলায়, গ্রীকদের অনুকরণ দেখিলেন। কোন স্কচ-দার্শনিক, সংস্কৃত ভাষাটা গ্রীক-ভাষার জাল, তাহা বহু পূর্ব্বে বলিয়াছেন। আধুনিক লেখকেরা, সংস্কৃত, নাটক, সাহিত্য ও অভিনয়ে,

(১) Unseen Universe

গ্রীক জাতির ছাপ দেখিলেন। তারপর, এখন ত আর আর্য্যদের বাসভূমি মধ্য এসিয়া নহে; এখন উহা পশ্চিম-জার্ম্মান উপকূলে। এইরূপে, ইউরোপীয় লেখকেরা এসিয়া বাসীদের, বিশেষতঃ ভারতবাসীকে, ছোট করিতে লাগিলেন। ইউরোপীয় লেখকেরা নিজেদের দেশকে যত বড় করিতে লাগিলেন, শিক্ষিত-ভারত, প্রতিক্রিয়া বশে, ইউরোপীয় সভ্যতাকে ততই হীন চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু বলিতে সাহস হইল না।

ইতিমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম আবার জাগিয়া উঠিল। ভারতে তত না হউক, ইউরোপ ও আমেরিকায় বৌদ্ধদের "নির্ব্বাণ", "ক্ষণিক ক্ষণিক" করিয়া "শূন্যে" জ্বলিয়া উঠিল। সে হাওয়া এখনও বেশ জোরে বহিতেছে। দগ্ধ-কপাল ভারত, বিদেশীয় একটু আধটু প্রশংসা পাইয়া, আনন্দ বোধ করে। আবার এদিকে, বিবেকানন্দ ওই একটা বেদান্তের পরিভাষা আমেরিকায় ছাড়িয়া দেওয়ায়, বেদান্ত ও উপনিষদের নামটাও পশ্চিম-রাজ্যে বেশ স্বরগড় হইয়া পড়িল। আমার নামটা কর, আমাকে ভাল বল, অন্ততঃ আমার পিতৃপুরুষদের ভালবাস—ইহাতেই আমাদের কানের একটা বেশ আরাম।

এই ভাবের প্রতিক্রিয়া এখন পুরা ভাবে চলিতেছে। হাভেল সাহেব হিন্দুর স্থপতি-বিদ্যা ও ভাস্কর্য্যের মৌলিকত্ব বজায় রাখিয়াছেন। এই জন্য আমরা তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করি। দেশ-প্রেমিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও অতি-জ্ঞানী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হিন্দুদের প্রাচীন কালের বৈজ্ঞানিক উদ্যমটা, অনেক পরিশ্রমের পর প্রচার করিয়া, জনসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। এখন সকলেরই স্বদেশের দিকে ঝোঁক। তাই বাঙ্গালায় এত ইতিহাসের চর্চ্চা। পরের মুখে আর দেশের কথা শুনিতে ভাল লাগে না। এই জাগরণটা, এই নিজে দেখিয়া শিক্ষা করার চেষ্টাটা, দেশের একটা শুভ লক্ষণ। তবে ইহার পরে আবার কি আস্‌বে, কে জানে।

যে ভারত এককালে কেবল বিদেশীর মুখের কথা লইয়া চলিত, তাহাদের এরকম ভাব পরিবর্ত্তন কেন হইল? আমরা ইহাকে যুগ-ধর্ম্ম বলি। পাশ্চাত্যেরা "সাইনস্ অব দি টাইমস্" বলে। ইহার মূলে কিন্তু জীবতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ব আছে। "মিউটেসনে" যেমন এক জাতীয় জীবের এক সঙ্গে কতকগুলা পরিবর্ত্তন আসিয়া জোটে, সম্ভবতঃ অধ্যাত্ম-জগতেও সেইরূপ একটা কিছু আছে। বোধ হয় সেই জন্য, সকলের এক সঙ্গে, এইরূপ মানসিক ভাবের ও আদর্শের একটা বিপ্লব উপস্থিত হয়।

এই প্রতি-ক্রিয়াটা এখন কতকটা চরমে উঠিয়াছে। আমরা এখন পাশ্চাত্য-সভ্যতার খুঁত ধরিতে শিখিয়াছি। খুঁতটা অনেকে আবছায়া গোছ দেখিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু ইহার মূর্ত্তি কেহ সাধারণে দিতে পারেন নাই। মহাত্মা-জি বোধ হয় ইহার দ্রষ্টা। নূতন ভাবের সঙ্গে, নূতন দ্রষ্টা থাকা আবশ্যক; তবেই না ভাবের জোর। মহাত্মা জি পাশ্চাত্য সভ্যতাটাকে ভুয়ো বলে মনে করেন। যে সভ্যতায় মানুষের লক্ষ্য কেবল বিলাস, আর আমোদ, আর রেষারেষি, আর টাকা—সে সভ্যতাটা সভ্যতা কি না, এ সন্দেহ সকলেরই হতে পারে। ষ্ট্রগল্ ফর এক্‌সিস্‌টেন্স (struggle for existence) আর কমপিটিসন্ (competition), মানব সভ্যতার মূল নীতি কি না, ইহা অনেক পাশ্চাত্য লেখকের এখন সংশয়ের বিষয়

হইয়াছে। নব্য-সভ্যতার আর একটা দিক আছে, সেটা একটা কুলক্ষণ। বণিক-বৃত্তি দ্বারা ধনী ব্যক্তি আরও ক্ষমতাশালী হইতেছে এবং নির্ধন একবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের ধন প্রাণ ক্যাপিটালিষ্টদের হাতে। তোমার মুখের দিকে আমি দৃষ্টিপাত করিব না এবং তোমাকে যত পারি খাটাইয়া আমি পয়সা করিয়া লইব। আগে শ্রমজীবীরা নিজের যত্নে নিজে বা পরিবারবর্গের দ্বারা কাজ করাইয়া লইত। তাহার শ্রমের ফল সে নিজে উপভোগ করিতে পারিত। কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। কিন্তু শ্রমজীবী তাহার সে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়াছে। সে এখন বেতনভোগী চাকর। তাহার এই প্রকারের ইন্‌ডিভিডুয়ালিসম্ (individualism) চলিয়া গিয়াছে। আমেরিকায় কলের অধিকারীরা এবং বড় ব্যবসাদারেরাই রাজত্ব চালাইতেছে। তাহাদের দেশেও এজন্য অসন্তুষ্টি। আমাদের দেশেও ধর্ম্মঘট, বেতন বৃদ্ধির চেষ্টা, বেশী অধিকার প্রভৃতি যে সকল দাবি শ্রমজীবীরা করিতেছে, তাহারও মূলে ঐ একই কারণ। সোস্যালিস্‌ম্ (socialism) বা গণ-তন্ত্র বা এক কথায়, শ্রমজীবীর অধিকতর অধিকার পাইবার চেষ্টা, পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অর্থের জন্য কত অনর্থ ঘটিয়াছে।

মহাত্মা-জি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, বোধ হয়, পাশ্চাত্য জাতির গিল্‌টি-করা সভ্যতাটা ধরিতে পারিয়াছেন। স্পেনসার প্রভৃতির মতে, প্রকৃতিকে স্ব-বশে আনাই সভ্যতা। কিন্তু সে প্রকৃতি কেবল কি বাহিরের প্রকৃতি, না মানুষের অন্তরের প্রকৃতিটাও উহার সঙ্গে ধরিতে হইবে? তড়িৎ-শক্তি বা বাষ্প-শক্তি, মানুষের কাজে লাগাইলেই যে সভ্যতা হয়, তাহা নহে। শাক্যসিংহ ও সক্রেটিস, এই দুই শক্তি ব্যবহার না করিয়াও, সভ্য ছিলেন ও সমবুদ্ধ হইয়াছিলেন। বাহিরের প্রকৃতিটা মানুষ, দরকার মত, স্ব-বশে আনিতে পারে। যে জাতি কেবল শিকার করিয়া খায়, তাহারা এক প্রকারের অসভ্য। আর যাহারা সবে কৃষি-কার্য্য শিখিয়াছে, তাহাদেরও আমরা অসভ্য বলি; তবে উন্নত অসভ্য। তাহার কারণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর অসভ্যেরা, প্রকৃতিকে একটু বশ করিয়াছে। কিন্তু মানুষের চরিত্র হিসাবে, কোন্ জাতি কতটা সভ্য, তাহা ধরা বড় শক্ত। যদি মানুষের মন না তৈয়ারী হইল, যদি সে নিজের স্বার্থের কতকটা ত্যাগ না করিতে পারিল, যদি তাহারা বণিক-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, শ্বাপদ জন্তুর মত, কামড়া-কামড়ি করিল এবং নিরীহ-জাতির উপর অকারণ আধিপত্য চালাইল, এরূপ মানুষ বা মানুষের সমষ্টিকে সভ্য বলা যাইতে পারে না। মানুষের আদিম অবস্থায়, এইরূপ পশুভাবে, দুই জাতির সংঘর্ষে ও সাংকর্য্যে, একটু একটু করিয়া, আদিম মানুষ মনুষ্যত্বের সোপানে উঠিয়াছে। সে কিন্তু অন্য কারণে। এবং মানুষকে মানুষ বা সভ্য হইতে হইলে, ঠিক এ ভাবটা চলে না। বাহিরের প্রকৃতির গুপ্ত-রহস্য ভেদ করিয়া, তাহা নিজের আয়ত্ত করা, আবার এদিকে অন্তরের প্রকৃতিকেও ঐরূপে আয়ত্ত করা, সভ্যতার কাজ। আদর্শ-পুরুষেরা আমাদের কতকগুলা মানসিক-বৃত্তি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। খ্রীষ্ট, জরথুষ্ট্র, কন্‌ফিউসস্ সকলে একবাক্যে ক্রোধটাকে দমন করিতে বলিয়াছেন। এই ক্রোধই কিন্তু আবার আদিম-মানবের জয়-বিজয়ের সহায় ছিল। একই প্রতিভা প্রকৃতির অন্তরের ও বাহিরের রহস্য বাহির করিয়াছে। মানব-জাতির উন্নতিকল্পে, দুইয়েরই আবশ্যকতা

আছে। যে সভ্যতায় অন্তরের দমন নাই, তাহা সভ্যতা নহে। মহাত্মা-জি ইহা উত্তমরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। একদিকে বিলাস ও আমোদ যেমন সভ্যতা ক্ষয় করে, অপরদিকে কেবলমাত্র স্বার্থ-অন্বেষণও মানব-জীবনে ভয়ানক অনিষ্ট করে। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই দুইটা কুলক্ষণ দেখিয়া, গান্ধী-মহারাজ বোধ হয় উহার উপর বীতস্পৃহ হইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে, আমাদের দেশেও পাশ্চাত্য-সভ্যতার কু-অভ্যাসগুলা ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমাদের মত বিচ্ছিন্ন ও পরবশ-জাতির মধ্যে, ঐ ভাবটা সংক্রামিত হইলে, আর রক্ষা নাই। তাহা হইলে ভারতবাসী লোপ পাইবে।

গান্ধীর অন্তর্দৃষ্টি আছে; কিন্তু, দার্শনিক শক্তির সহিত, ঐ দৃষ্টির কতটা সমন্বয় তাহা বলা যায় না। তিনি প্রতিকার-কল্পে, যে সকল উপদেশ দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাহা কি পরিমাণে কার্য্যকরী হইবে, এইটুকুই বিবেচ্য। তিনি দেখিলেন, ভারত বৈরাগ্যের ও দরিদ্রের দেশ। এই জাতি সহরের আবর্ত্তে পড়িয়া, বিলাসে ভাল করিয়া গা' ভাসাইয়া দিয়াছে। তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি? তিনি দেখিতেছেন, কেবলমাত্র চাকুরী অবলম্বন করিয়া, অথবা উকিল ডাক্তার হইয়া, শিক্ষিত-সমাজ প্রজার অর্থ অন্যায়ভাবে নষ্ট করিতেছে। এই সকল বৃত্তি ছাড়িয়া, তাহারা কি করিয়া খাইবে? যাহারা জীবিকা-উপায়ের জন্য, তাঁহার উপদেশ চাহে, তাহাকে বনে যাইতে বলেন, নীচ-কর্ম্ম করিতে বলেন। এ বিষয় তিনি প্রাচীন জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন কি? আগে, জীবনের শেষভাগে বনে বাস করার একটা ব্যবস্থা ছিল। সেই সংস্কারটাই বোধ হয় তাঁর মনে আসিয়াছে। অথবা, তিনি বুঝিয়াছেন যে, মানুষ যত স্বাভাবিক অবস্থায় বাস করিতে পারে, ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। তিনি একা নহেন, অনেক পাশ্চাত্য-লেখক, তাঁহাদের নব্য-জীবনে হতশ্রদ্ধ হইয়া, সরল স্বাভাবিক ভাবে দিনপাত করার পক্ষপাতী। সেই স্বাভাবিক জীবনটুকু কি? একবারে প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্ত্তন অথবা আদিম মনুষ্য-জীবনের ও নব্য-সভ্যতার মাঝামাঝি কোন একটা অবস্থা লইয়া চলা। আমাদের দেশে ধর্ম্ম-জীবনের চরম অবস্থায় উঠিলে—অর্থাৎ পরমহংস অবস্থায়—মানুষ আবার নিয়মের (কন্‌ভেন্‌সনের) বাহিরে আসিয়া পড়ে ও তখন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক-ভাবে মানুষ থাকিতে পারে। তখন জাতি-বিচার থাকে না, ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিষেধ থাকে না, বস্ত্র-ব্যবহারের আবশ্যক থাকে না, ইত্যাদি। গান্ধী-মহারাজ কি এই প্রকারের কোন একটা আদর্শ আমাদের সম্মুখে আনিয়া দিতেছেন।

গান্ধী মহারাজ কল কারখানার পক্ষপাতী নহেন। রেল, ট্রাম, মোটর, ইলেক্‌ট্রিক লাইট ও ফ্যান প্রভৃতি যে সকল ব্যবস্থা নব্য-জীবনের অত্যাবশ্যকীয় সহায় হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মহারাজ আদৌ পছন্দ করেন না; কেননা, উহা মানুষকে একেবারে জীবনের গোলাম করিয়া তুলিতেছে। আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক নিয়মের সাহায্যে, যে সকল নূতন ব্যাপার নব্য-মানব-সমাজে আসিয়াছে, তাহার মধ্যে সকলই যে মানুষের পক্ষে কল্যাণকর, তাহা আমরা বলি না। আমরা কোন যন্ত্রের ক্রিয়া বা গতির সম্বন্ধে অঙ্ক পাতিয়া বলিতে পারি। কিন্তু জীব-অভিব্যক্তি অথবা সেই হেতু মানবের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না। নীটসের অতি-মানব এবং বিবর্ত্তন-বাদীর পূর্ণাভিব্যক্ত-মানুষ কিরূপ হইবে, তাহা আমাদের জ্ঞানরাজ্যের

অতীত। ইহার ব্যাপ্য-ব্যাপক-সম্বন্ধ সহ-বায় (co-existance), বা ন্যায় দর্শনের মতে, অনুমানের যাহা কিছু সহায় আছে, তাহার দ্বারা মানুষে কিছুই ধরিতে পারে না। কি, কল্পনা বলে, কাঠবিড়ালী-জাতীয় জীবের পরিণাম যে মানুষ হইবে, তাহা ধরা যাইতে পারে না। পরিণামের কোনও নিয়ম নাই ; অন্ততঃ এখনও কিছু জানা যায় নাই। নব্য-ডার্বিনী বা নব্য-লামার্কী মতের কোনটাতেই অভিব্যক্তির মূল কারণ ধরিবার উপায় নাই। যাহা হউক, দেশটা সম্ভবতঃ একটা বাঁকা পথে যাইতেছিল, এবং গান্ধী মহারাজের প্রভাবে যদি উহা বাঁকা হইতে সোজা পথ পায়, তাহা হইলেও দেশের একটা কল্যাণ। বিলাস, মানুষের শরীরে এক রকম ঘুণ। শরীরটা নিজের কায়দায় না রাখিতে পারিলে, সমাজের পক্ষে অমঙ্গল।

অনেক পাশ্চাত্য লেখক, সভ্যতার ভিতরে জাতি-নাশের বীজ দেখিয়াছেন। ইহার অর্থ এই, মানুষের জীবনে যেমন বার্দ্ধক্য দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, ইহার শেষ হইয়া আসিয়াছে—সেইরূপ জাতীয়-জীবনে, সভ্যতাটাও ঐ প্রকারের একটা কিছু হইতে পারে। আমাদের যে নূতন জাতীয়-জীবন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সভ্যতা-রূপ জাতীয়-বার্দ্ধক্য প্রবেশ করান, উন্মাদের চিহ্ন বলিতে হইবে। ইউরোপ প্রায় একশত বৎসর হইল, তপশ্চর্য্যা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং উহা সন্ন্যাসের (monasticism) পশু-অবশেষ বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছে। মানুষের কষ্ট-সহিষ্ণু হওয়া চাই ; তাহা না হইলে মনুষ্যত্বের হানি হয়। গান্ধী কেবল কথায় নয়, কার্য্যেও তাহাই দেখাইতেছেন। গান্ধীর কথায় হয়ত অনেক অসঙ্গতি থাকিতে পারে, তাঁহার প্রসঙ্গ বিচারেও দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু গান্ধী-মন্ত্রের স্থান খুব উচ্চ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার মূল লক্ষ্য জাতি নির্ম্মাণে ; এবং জাতি-নির্ম্মাণে, জাতীয়-শরীরে যে সকল অসুস্থতার চিহ্ন দেখিতেছেন, তাহার প্রতিকার-কল্পে তিনি যে সকল মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে স্বস্তির বীজ থাকিতে পারে। বিলাস ও সুখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে হইয়া থাকে ; তাহার মূল্য মনুষ্য-জীবনে কতটুকু ? মানুষ চায়, একটা কিছু যেটা সুখ নহে, বিলাস নহে—শান্তি, আনন্দ। তৃপ্তিতে শান্তি নাই ; শারীরিক অভাব ত অনেক আছে, সে অভাবের পূরণ হইলে, একটা দৈহিক সুখ হয় ; কিন্তু উহা মানব-সন্ততির (race) পক্ষে কল্যাণকর নহে। রেসের কল্যাণের জন্য স্বতন্ত্র-ব্যবস্থা ; ইহার নীতি, সাধারণ-নীতি হইতে পারে না।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

বাসনা।

আমি চাই ফুল্ল ফুলটীর মত
পবিত্র, সুরভি হ'তে,
আমি চাহি শুধু আপনা ভুলিয়ে
সুবাস বিলায়ে দিতে।
(চাই) নিভৃতে ফুটিয়া, সাধনা সাধিয়া,
নীরবে ঝরিয়া যেতে
কুমুদের মত, প্রতিদান ভুলে,
প্রেমে আত্মহারা হ'তে।
তটিনীর মত স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া
অনন্তে মিশিতে চাই
নীল নভোস্থলে ধ্রুবতারা মত
স্থিরলক্ষ্য হয়ে রই।
জ্যোছনার মত স্নিগ্ধ নির্ম্মল
সমুজ্জ্বল হতে সাধ;
ভুলে যেতে চাই জগতের তুচ্ছ
অভিমান বিসম্বাদ।
জুড়াইতে চাই তপ্ত ধরা বক্ষ
সলিলের শৈত্য লয়ে,
অন্যের মালিন্য ধুয়ে দিতে সাধ
নিজ অশ্রুধারা নিয়ে।
আকাশের মত প্রশস্ত প্রশান্ত
যেন এ হৃদয় হয়
সত্য, ধর্ম্ম, প্রেম, তিতিক্ষা বিশ্বাসে
যেন সদা উজলয়।
তোমারি কাজেতে, ওহে জগদীশ,
আপনা সঁপিতে চাই;
(আমি) আর সব ভুলি; শুধু তুমি নাথ
বিরাজ এ হৃদি ঠাঁই।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

কোচবেহার।

[৩১ পৃষ্ঠায়, 'তিনটী স্বাধীন রাজ্য' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

৪১১ বৎসর পূর্ব্বে, কোচবেহারের বর্ত্তমান রাজবংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। কোচবেহারের সঙ্গে ত্রিপুরা ও ময়ূরভঞ্জের সম্পর্ক আছে। বর্ত্তমান মহারাজা বরোদার রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছেন। জলপাইগুড়ীর রায়কত, পাঙ্গরে জমিদার, গোয়ালপাড়া জেলার পর্ব্বত জোয়ার, রূপসী, লক্ষীপুর, বিজনী ও আসামের দরঙ্গ ও বৌলতলির জমিদারগণ এই একই জাতিভুক্ত।

বক্তিয়ারের পুত্র মহম্মদের কামরূপ আক্রমণ কালে, কোচবেহার রাজ্য আসামের অধীনে ছিল। পরে ১৪০০ হইতে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, কোচবেহারের দীনহাটা মহকুমার কামতাপুর, বর্ত্তমান গোসাইমারী নামক স্থানের রাজধানীতে, খ্যেন বংশীয় তিনজন রাজা অতি প্রবল পরাক্রমের সহিত কোচবেহার ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে রাজত্ব করেন। প্রথম রাজার নাম নীলধ্বজ, দ্বিতীয় চক্রধ্বজ ও তৃতীয় নীলাম্বর। গৌড়েশ্বর আলাউদ্দিন হোসেন সাহা শেরিক মকি, দ্বাদশ বর্ষের মহাযুদ্ধের পরে, অবরোধিত কামতাপুর ও রাজা প্রজা ধ্বংশ করিয়া রাজ্যের

লোপ করেন। এখন ধল্লা বা শিংমারী নদীর তীরে, ২০ মাইল পরিধি বিশিষ্ট ভগ্নাবশেষ আছে। শুনা যায়, কোচবেহারের কোন ব্রাহ্মণ নৌকারোহণে কামতাপুরের নিকটবর্ত্তী ধল্লানদী বাহিয়া যাওয়ার সময় দেখিতে পান যে, একটী ঘর ভাঙ্গিয়া স্বর্ণমোহর নদীতে পড়িতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে নৌকা লাগাইয়া, মোহরে নৌকা পূর্ণ করেন। তিনি পরে কোচবেহারের একজন প্রধান জমিদার হইয়াছিলেন। কমতেশ্বরগণের শাসন সময়ে, কামরূপের চিকনা পাহাড়ে হাজো নামে এক কোচ সর্দ্দার বাস করিত। হাড়িয়া নামক এক কোচের সহিত হাজোর-কন্যা হারা ও জীরার বিবাহ হয়। জীরার পুত্র মদন ও চন্দন ও হীরার পুত্র শিশু ও বিশুসিংহ। প্রবাদ আছে যে, এই সকল পুত্রগণ মহাদেব প্রভুর ঔরসজাত; কোচবেহারের রাজবংশের সৃষ্টির জন্য,৪১১ বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং মহাদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কোচবেহার রাজবংশের সভা-পণ্ডিত কোনও ব্রাহ্মণ-রচিত যোগিনী-তন্ত্র নামক তন্ত্রে এই সমস্ত বর্ণিত আছে ও ইহা হইতেই বঙ্গদেশে মহাদেবের কোচনীপাড়ায় লীলার সৃষ্টি হইয়াছে। চিকনা পাহাড়ের ভূম্যাধিকারির সঙ্গে যুদ্ধে মদন নিহত হন ও চন্দন ১৫১০ খৃষ্টাব্দে চিকনা পাহাড়ে প্রথম কোচ রাজা হইলেন। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পরে, বিশু সিংহ রাজা হইলেন। ১৫৫৪ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন। ইনি সমস্ত গোয়ালপাড়া ও রঙ্গপুর, কোচবেহার এবং জলপাইগুড়ি অধিকার করেন। শিশু সিংহ মন্ত্রি হইলেন। ইনি বৈকুণ্ঠপুরে রাজধানী স্থাপন করেন ও জলপাইগুড়ির রায়কতগণ ইঁহারই বংশধর। বিশ্বসিংহের দুই পুত্র, মহারাজা নরনারায়ণ অপর নাম মল্ল এবং শুক্লধ্বজ বা চিলা রায়। চিলের ন্যায় শত্রুর উপরে বেগে পতন হেতু নাম চিলা রায়। মহারাজা নরনারায়ণ কোচবেহারের প্রথম রাজা ও ইনিই কোচবেহার নগর নির্ম্মাণ করেন। ইহার পূর্ব্বে, গোয়ালপাড়া জেলার পর্ব্বত জোয়ারের বনে আঠারকোঠায় ইহাদের রাজধানী ছিল। ইনি টাকশাল স্থাপন করেন ও সোনার ও রূপার নারাণী টাকা প্রথম প্রচলিত করেন। এই মুদ্রা বহুকাল পর্য্যন্ত উত্তর বঙ্গ ও আসামের মুদ্রা ছিল। শুক্লধ্বজ মহাবীর ছিলেন; তাঁহার সাহায্যে নরনারায়ণ কাছার পর্য্যন্ত অধিকার করেন ও ভুটানের দুয়ার দখল করেন। ইনি কামরূপে কামাখ্যার নষ্ট-মন্দির উদ্ধার করিয়া নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করেন ও মন্দির গাত্রে শিলালিপি রক্ষা করেন। তাঁহাদের দুই ভ্রাতার ও স্থপতির মূর্ত্তি, মন্দির-গাত্রে খোদিত করেন। শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেব নারায়ণ, হাবড়া ঘাট ও খুণ্টা ঘাট অর্থাৎ বিজনীর প্রথম রাজা এবং তাঁহার বংশধরগণই আসামের দরং ও বেলতলির রাজা ছিলেন। মহারাজা নরনারায়ণের সভা-পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ, ঐ অঞ্চলের পাঠ্য রত্নমালা নামক বিখ্যাত ব্যাকরণ রচনা করেন। শঙ্করদেব ও দামোদর দেব মহাপুরুষগণের প্রভাবে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-রাজ্য আলোকিত করে। ১৫৫৫ হইতে ১৫৮৭ পর্য্যন্ত, মহারাজা নরনারায়ণ রাজত্ব করেন। এই সময়ে কালা পাহাড় কামাখ্যা পর্য্যন্ত মন্দির ধ্বংস করেন। নরনারায়ণের মৃত্যুর পরে, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মী নারায়ণ রাজা হন।

১৫৮৭ হইতে ১৬২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ রাজত্ব করেন। ষ্টুয়ার্ট রচিত বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ইহার রাজ্য বহুবিস্তৃত ছিল। ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রনদ, দক্ষিণে,

ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে ত্রিহুত, ও উত্তরে তিব্বতের (ভোট) পর্ব্বত ও আসাম। এই রাজার একলক্ষ পদাতিক, চারি সহস্র অশ্বারোহী, ৭০০ হস্তী ও এক সহস্র যুদ্ধ-নৌকা ছিল। ইঁহার রাজত্বের প্রথমাংশে, সুবিখ্যাত রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন ও লক্ষ্মীনারায়ণ আকবর বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহাতে রাজার আত্মীয়গণ ও প্রজাগণ রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে ও বাধ্য হইয়া তিনি দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোগল সেনাপতি জেহাজ খাঁ আসিয়া বিদ্রোহী দমন ও লুট-পাঠ করিয়া ফিরিয়া যান। জাহাঙ্গির বাদসাহের সময় কিছুকাল যুদ্ধের পরে, রাজা দিল্লী গমন করিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। ইঁহার ১৮ পুত্র ছিল; তন্মধ্যে বীরনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন ও মহীনারায়ণ নাজির হইয়াছিলেন। নাজির সেনাপতি ছিলেন ও দেওয়ান মন্ত্রী।

১৬২১ খৃষ্টাব্দে, বীরনারায়ণ রাজা হন, ও ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে, মানব লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার সময়ে ভুটিয়ারা প্রবল হয় ও রায়কতগণ রাজস্ব বন্ধ করেন।

অতঃপর, তৎপুত্র প্রাণনারায়ণ ১৬২৫ হইতে ১৬৬৫ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকার নবাব ইছলাম খাঁ কোচবেহার আক্রমণ করেন। পুনরায় ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে, সুবিখ্যাত মীরজুম্লা কোচবেহার অধিকার করেন। রাজা ভোটানে পলাইলেন। প্রাণ-নারায়ণের পুত্র বিষ্ণুনারায়ণ মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও মোগলদিগের সাহায্য করেন। মীরজুম্লার মৃত্যুর পরে, প্রাণনারায়ণ কোচবেহার পুনরায় অধিকার করেন। প্রাণনারায়ণ সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। তিনি জল্পেশ্বর ও বানেশ্বর মহাদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু এই সকল মন্দিরের ভাস্কর্য্য প্রশংসনীয় নহে। মোদ নারায়ণ প্রাণনারায়ণের পরে রাজা হইলেন।

মোদনারায়ণ ১৬৬৫ হইতে ১৬৮০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার রাজত্ব কালে, মহী-নারায়ণ স্বয়ং রাজ্য লাভের চেষ্টা করেন কিন্তু পরাজিত ও নিহত হন। তাহার পুত্রগণ ও ভুটিয়াগণের সাহায্যে রাজ্য দখলের চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হন।

মোদনারায়ণের মৃত্যুর পরে, তাহার ভ্রাতা বাসুদেব রাজা হইলেন। ১৬৮০ হইতে ১৬৮২ পর্য্যন্ত ২ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইঁহার সময়ে নাজীর মহীনারায়ণের পুত্রগণ ভুটিয়াদিগের সাহায্যে পুনরায় কোচবেহার আক্রমণ করেন। এবং ভুটিয়াগণ বিশ্বসিংহের সিংহাসন তরবারি প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। জলপাইগুড়ী হইতে রায়কতগণ আসিয়া ভুটীয়াদিগকে দূর করেন। মহীনারায়ণের পুত্রগণ পুনর্ব্বার আক্রমণ করিয়া বাসুদেবকে বধ করেন।

অতঃপর, প্রাণনারায়ণের পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণ, ১৬৮২ হইতে ১৬৯২ পর্য্যন্ত, রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজত্ব সময়ে, রঙ্গপুর-জেলাস্থিত, চাকলা ফতেপুর ও কাজিরহাট ও কাকিনা; মুসলমান-গণ অধিকার করেন ও পাজাপরগণার ও জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরের জমিদারগণ কোচ-বেহারের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া মোগলদিগকে রাজস্ব দেন। টেপা মধুপুর, মন্থনার জমীদারগণ ও মোগলগণকে রাজস্ব দেন। কাজির হাট ও কাকিনা বর্ত্তমান কাকিনা রাজ্যের জমিদারি। মোগলগণ চাকলা বোদা, পাট-গ্রাম ও পূর্ব্ব-ভাগ অধিকারের

চেষ্টা করেন। এই সমস্ত পরগণা বর্ত্তমান সময়ে কোচবেহারের জমিদারী, গবর্ণমেণ্টকে কর দিতে হয়। মহীনারায়ণের পুত্র শান্তনারায়ণ ছত্র-নাজীর হইলেন। ছত্র-নাজির সেনাপতি এবং অভিষেক সময়ে রাজার মস্তকোপরি ছত্র ধরেন।

মহেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর, শান্তনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র, রূপনারায়ণ, ১৬৯৩ হইতে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, রাজত্ব করেন। এবং তাহার ভ্রাতা সত্যনারায়ণ নাজির হইলেন। অর্থাৎ মহীনারায়ণের বংশের একজন রাজা, একজন মন্ত্রী ও তৃতীয় সেনাপতি হইলেন। এই সময়ে, নাজির শান্তনারায়ণ, বলরামপুর স্থাপন করেন ও তথায় বলরাম-বিগ্রহ স্থাপিত করেন। এই বলরামপুর পঞ্চক্রোশ খ্যাত, এবং কোচবেহারের মধ্যে হইলেও, রাজ-শাসন বহির্ভূত ছিল। মহারাজ রূপনারায়ণ সুবিখ্যাত মদনমোহন বিগ্রহ স্থাপন করেন।

অতঃপর, মহেন্দ্রনারায়ণের পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণই ১১৭৪ হইতে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময় হইতে কোচবেহার ক্রমশঃ ভুটিয়াগণের অধীন হইয়া পড়ে। মোগলগণ কোচবেহার লুণ্ঠন করে কিন্তু ভুটিয়ারা আসিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়।

উপেন্দ্রনারায়ণের পুত্র দেবেন্দ্রনারায়ণ, ১৭৬৩ হইতে ১৭৬৫ পর্য্যন্ত, নাবালক অবস্থায় রাজত্ব করিয়া কাল প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ভুটিয়াগণ কতক সৈন্যসহ কোচবেহার শাসন করেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন ও চাকলা বোদা প্রভৃতির রাজস্ব কোম্পানী গ্রহণ করেন। রতিশর্ম্মা নামক একব্যক্তি এই রাজাকে হত্যা করে।

অতঃপর ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ, ১৭৬৫ হইতে ১৭৮৩ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার রাজত্ব সময়ে ভুটিয়ারা সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া রাজা ও দেওয়ানকে ভুটানে ধরিয়া লইয়া যায় ও ভুটানের দেবরাজার ভাগিনেয় জীমেপ ২০,০০০ সৈন্যসহ কোচবেহারে আগমন করিয়া ধীরেন্দ্র-নারায়ণকে রাজা করেন। নাজীর দেওকে ইহারা তাড়াইয়া দেয়। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শরণাপন্ন হইলে, ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে, ধীরেন্দ্রনারায়ণ মহারাজার সহিত কোম্পানীর এক সন্ধি হয়। তৎকালের রাজস্বের অর্দ্ধাংশ চিরস্থায়ী কর ধার্য্য হয়। কোম্পানীর সৈন্য আসিয়া ভুটিয়াদিগকে তাড়াইয়া দেয় কিন্তু এই অবধি কোচবেহার রাজ্য ইংরেজ ও ভুটিয়া উভয়ের অধীনে হইল। ১৮৬৪ সালে, ভুটিয়াগণ দুয়ার হইতে বিতাড়িত হইলে, কোচবেহার তাহাদের পাশ ছিন্ন করে। ভুটিয়াগণ কোচবেহারের রাজগণকে বাপরাজা বলিত ও কোম্পানীর সহিত তাহাদের সন্ধি হওয়াতে তাহারা রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রকে ছাড়িয়া দেয়। যেখানে তিনি প্রথম ভাত খান, সেই স্থানের নাম-রাজা-ভাত-খাওয়া। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণের জন্ম উপলক্ষে, দেবরাজা রাজা-ভাত-খাওয়া অন্নপ্রাশন জন্য দান করেন। ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের জীবদ্দশায় ধরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পরে হরেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়া, ১৭৮৩ হইতে ১৮২৯ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

ভুটিয়াগণ বিশেষ বলিষ্ঠ। তাহাদের অক্ষর সংস্কৃতমূলক ও ক, খ, প্রভৃতিই ব্যবহার। অক্ষরের আকৃতি অনুরূপ। তাহাদের ভাষা তিব্বতের ভাষার অনুরূপ। ভুটানের রাজধানী পুনাখা ও তাসিস্সুদন। পুনাখা দেবরাজার রাজধানী এবং তাসিস্সুদন ধর্ম্মরাজার রাজধানী।

ধর্ম্মরাজা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় দেখেন। ভুটিয়ারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী কিন্তু মহাকাল অর্থাৎ শিবকেও মানে। অনেকে জল্পেশে পূজা দেয়। ইহারা প্রায় সমস্ত মাংসই খায়। শীত কালে, ইহারা ভোট কম্বল, কস্তুরী, টাঙ্গন ঘোড়া, সোহাগা পশুলোম, ভোট-ছোরা প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয়ার্থ ইংরেজ এলাকায় আনে এবং বিনিময়ে লবণ প্রভৃতি নেয়।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ—

এই সময়ে সুবিখ্যাত গুডল্যাড অর্থাৎ ভাল-বালক সাহেব কোচবেহারের বিধাতা ছিলেন। গুডল্যাড ভাল বালকই ছিলেন। নলডাঙ্গার কাশীকান্ত লাহিড়ী খাসনবীশ পূর্ব্বোক্ত সন্ধির মূল কারণ ও তিনিই কোচবেহারের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময়ে নাজির দেও গোলমাল করেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ, ডগলাশ সাহেব কোচবেহারে কমিশনর হইয়া নাবালক রাজার শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। এই সময়ে কোচবেহারে ব্রিটিশ শাসননীতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হয়; কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে কোম্পানী কোচবেহারে নারায়ণী টাকার মুদ্রন বন্ধ করিয়া দেন। ইঁহার রাজত্বে কোচবেহারে ফাঁসি প্রচলিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান একমাত্র হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহার কারণ এই যে, কোচবিহারের মুসলমানগণ হিন্দু-বংশ-জাত ও সকলেই নস্য উপাধিবিশিষ্ট। নস্য অর্থ নষ্ট। বিচারবিভাগ, পুলিশ ও আবকারী ও ডাকবিভাগের সৃষ্টি হয়। সাগরদীঘি নামক সুবৃহৎ দীঘি ১৮০৭ খৃঃ কোচবেহারে খনন করা হয়। এই দীঘি বর্ত্তমান সময়ে ৮৯০ ফিট দীর্ঘ ও ৬১০ ফিট প্রশস্ত। কাশীধামে মহারাজার মৃত্যু হয় ও এই সময় হইতে কোচবেহার রাজবংশীয়গণের কাশী-বাস আরম্ভ হয়।

হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ অতঃপর রাজা হইয়া, ১৮৩৯ হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভুটিয়াগণ বরাবর কোচবেহার সীমান্তে উপদ্রব করিতে থাকে। এই সময়ে নলডাঙ্গার কালীচন্দ্র লাহিড়ী প্রথমে জজ ও পরে দেওয়ান হন। ইনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন ও স্বপাক খাইতেন। কথিত আছে যে, একদিন ইনি রন্ধন করিয়া খাইতে বসিবেন, এমন সময়ে রাজার ভৃত্য ডাকিতে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করে। লাহিড়ী মহাশয়ের আহার হইল না, কারণ রাজবংশি অনাচরণীয় জাতি। তিনি আবার রন্ধন করিলেন। রাজা এই কথা শুনিয়া স্বজাতীয় একজন উচ্চ কর্ম্মচারি প্রেরণ করিলেন। ইনি গৃহে প্রবেশ করাতে পুনরায় অন্ন নষ্ট হইল ও আবার রন্ধন হইল। এইবার স্বয়ং রাজা আসিলেন। অন্ন প্রস্তুত, লাহিড়ী মহাশয় ভাবিলেন রাজা দেবতা ও শিব-সন্তান। ইনি ঘরে আসাতে দোষ নাই। গণ্ডুষ করিয়া যেই আহারে প্রস্তুত, অমনি উপর হইতে চালের কালঝুল পড়িয়া সমস্ত অন্ন নষ্ট হইল। তখন তাঁহার জ্ঞান হইল। শিবেন্দ্র নারায়ণ সু-কবি ছিলেন; তাহার রচিত অনেক ধর্ম্ম-সঙ্গীত এখনও প্রচলিত আছে। ইনিও কাশী-প্রাপ্ত হন। ইহার সন্তান না থাকায়, নাজির দেও বংশ হইতে নরেন্দ্র নারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করেন। বেনারস কালীবাড়ী ও ছত্র ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইনি নির্ম্মাণ শেষ করেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ ১৮৪৭ হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। নাবালক কালে মুর নামে এক সাহেব ইহার শিক্ষক ছিলেন। পরে ইনি কৃষ্ণনগরে ও কলিকাতায়, বিখ্যাত

ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করেন। ভুটিয়াগণ আবার উপদ্রব আরম্ভ করে। রঙ্গপুরের সহিত সীমানার গোলমাল হইয়া নিষ্পত্তি হয়। ১৮৬১ সালে কাপ্তান জেঙ্কিন্সের নামানুসারে জেঙ্কিন্স স্কুল নামে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬২ সালে দত্তকের সনদ প্রাপ্ত হন। মাত্র ২২ বৎসরে ইহার মৃত্যু হয়। ১৮৬৩ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত, ভূপেন্দ্রনারায়ণ রাজত্ব করেন।

নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর সময় ভূপেন্দ্রনারায়ণ শিশু ছিলেন। মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণ ২ পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কতক লোকে যতীন্দ্রনারায়ণকে রাজা করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ডাঙ্গর আই ও দেওয়ান নীলকমল সান্যাল, নৃপেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করেন। কর্ণেল হটন কোচবেহারের কমিশনর হইলেন। নীলকমল সান্যালের মৃত্যুর পর, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কালিকাদাস দত্ত কোচবেহারের দেওয়ান হইলেন। ইনি বি, এল ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইনি অতি বুদ্ধিমান ও যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। নাবালক মহারাজার বিদ্যাশিক্ষার ভার নেলার সাহেব ও বাবু ব্রজেন্দ্র মোহন দাসের প্রতি অর্পিত হয়। বাবু প্রিয়নাথ ঘোষও মহারাজার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। মহারাজার রাজ্য-ভার প্রাপ্তির পরে, ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি কোচবেহারে চাকুরি স্বীকার করেন। ব্রজেন্দ্রবাবু ও নেলার সাহেব চাকুরি গ্রহণ করেন নাই। নেলার বিলাত চলিয়া যান ও ব্রজেন্দ্র বাবু পাটনায় ওকালতি করেন। ইহার বেশ পসার হইয়াছিল। ইনি বিশেষ ধার্ম্মিক ও বদান্য ব্যক্তি, এক্ষণে বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তীর্থ-বাস করিতেছেন। ইহার পুত্র সুরেন্দ্রমোহন, পাটনা হাইকোর্টের উকীল। কর্ণেল হটন কোচবেহারের কমিশনর হওয়ার পরেই, ভুটান-যুদ্ধ হয়। কর্ণেল রসদ ও ভারবাহী পশুর ও কুলির ব্যবস্থা করেন এ জন্য নন্দকুমার রচয়িতা বিভারিজ সাহেব ডেপুটি কমিশনর হইলেন। কাবুল যুদ্ধে কর্ণেল সাহেবের এক হাত কাটা যায় ও নায়ক হেদাতালী তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। এজন্য ভুটান-যুদ্ধের সময় কর্ণেল সাহেব হেদাতালীকে ৬০০ কোচবেহার সৈন্যের অধিনায়ক ও কাপ্তান করিয়া যুদ্ধে পাঠান। তৎপরে হেদাতালী ৫০০ টাকা মাসিক বেতনে কোচবেহারের সুবাদার হইয়াছিলেন, ইহার নিবাস পাটনার নিকটবর্ত্তী দানাপুর এবং ইহার নামানুসারে ভুটানের দুয়ারে আলিপুর স্থাপিত হয়। ইহা এক্ষণে একটী সবডিভিজন। আলিপুর জলপাই-গুড়ী জেলায়। কর্ণেল হটনের সময় কোচবিহার রাজ্যের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর সূত্রপাত হয় এবং পরে কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর ও সুপারিন্টেণ্ডেন্টগণ সমস্ত বিষয়ই শৃঙ্খলা বদ্ধ করেন, ও যতদূর সম্ভব ব্রিটিশ শাসননীতির অনুকরণে কার্য্য হয়। উপযুক্ত আইনজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ বিচারকার্য্য পরিচালনা করেন; এজন্য বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে একমাত্র কোচবেহার ডিক্রী গবর্ণমেণ্টের আদালত সমূহে জারী হইয়া থাকে। নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর রাজ্য-গ্রহণ করার পরে, কর্ণেল গর্ডন, উই, লাউইস ডি, আর, লাল প্রভৃতি অবসর-প্রাপ্ত কমিশনর ও ডেণ্টিন মিলিগান প্রভৃতি সিবিলিয়ানগণ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাজ করিয়াছেন। মহারাজা কিছুকাল কলিকাতায় শিক্ষালাভ করেন। এই সময়ে, বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ শিক্ষক ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ মহারাজার পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট ও পরে দেওয়ান

হইয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, ৺নৃপেন্দ্রনারায়ণ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন ও ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে, ইনি সাবালক হইয়া রাজ-সিংহাসনাধিকার করেন। নৃপেন্দ্রনারায়ণ মহারাজার রাজত্বকালে কোচবিহারে কাউন্সিল স্থাপিত হয়। অডিট বা সুমার, আবকারী, শিক্ষা-বিভাগ, দেওয়ানি, ফৌজদারী, পুলিশ, পূর্ত্ত প্রভৃতি সমস্ত বিভাগের সৃষ্টি হইয়া উপযুক্ত কর্ম্মচারি নিযুক্ত হয়। কোচবেহারে পূর্ব্বে রাজ-বাড়ীতে খড়ের ঘর ছিল, কিন্তু এই মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্ব সময়ে বিশাল প্রাসাদ, বাজার প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। মহারাজা ইংরেজ-সৈন্যের কর্ণেল ছিলেন। ইনি টীরা যুদ্ধের সামানা রসদ লুটের সময় যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন ও C. B. উপাধি লাভ করেন। মহারাজা G. C. S. I. উপাধি লাভ করেন। মহারাজা একজন প্রধান ফ্রি ম্যাসন ছিলেন ও কোচবেহারে একটী লজ স্থাপন করেন। রাজার প্রাসাদ নির্ম্মাণে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় ও সুশোভিত করিতে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, মহারাজা কলিকাতায় প্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়া ক্লাব স্থাপন করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, তিনি দার্জিলিঙ্গে লাউইস জুবিলি সেনিটরিয়ম স্থাপন জন্য ভূমি ও অট্টালিকা দান করেন। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কোচবেহারে ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন। এই কলেজে প্রথম হইতেই M-A ও ল পর্য্যন্ত পড়া হইত ও বেতন গৃহীত হইত না। বর্ত্তমান সময়ে, ল ক্লাস উঠিয়া গিয়াছে ও বেতন গৃহীত হয়। প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন—জে, সি, গডলি সাহেব। ইনি এক্ষণে, পঞ্জাবের ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনসষ্ট্রাকসন হইয়াছেন। তৎপরে সুবিখ্যাত আর্ডের উক্ত সাহেব প্রিন্সিপাল ছিলেন। ইনি পরে, কলিকাতার লা মার্টিনিয়ার কলেজের প্রিন্সিপাল ও বেঙ্গল কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন। তৎপরে ডি লা ফস সাহেব, ইনি এলাহাবাদের ডাইরেক্টর অব্ পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন। তৎপরে, সুবিখ্যাত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও ভাসবানী প্রভৃতি লোক প্রিন্সিপাল হন। বহুদরিদ্র ছাত্র শিক্ষা-প্রাপ্ত হয়। অনেক ছাত্রের পরীক্ষার ফিস সরকার হইতে দেওয়া হইত। বদান্যতার জন্য মহারাজা চির-প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৯১১ সালে ইঁহার মৃত্যুর পরে, রাজেন্দ্র-নারায়ণ রাজা হন।

৺প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয় অতি বিচক্ষণতার সহিত দেওয়ানের কার্য্য করেন। ইনি অতি অমায়িক লোক ছিলেন। তৎপরে, নরেন্দ্রনাথ সেন বি-এল, বার-অ্যাট-ল মহাশয় দেওয়ান হইয়াছিলেন। ইনি কলিকাতার সুধী ও নিধি সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন; এজন্য ইণ্ডিয়ান-মিরর-সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহিত গোলমাল বশতঃ ইঁহাকে কলিকাতায় 'নন্দীবাবু' বলিত। ইনি ইংরাজী ও আইনে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন ও বৃদ্ধ-বয়সে মহারাজা বাহাদুরের সঙ্গে বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। ইঁহারই চেষ্টায়, ধ্বংসোন্মুখ কলেজ রক্ষা পায়।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ মহারাজা অতি উদার চরিত্র, স্বজন-পরিজন-পোষক ও সুশিক্ষিত ছিলেন। শিকার, পলো প্রভৃতি বীরোচিত ক্রীড়ায় ইনি অতি বিচক্ষণ ছিলেন। ইনি অতি বলশালী ও মল্লযুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। ইঁহার চার পুত্র ও তিন কন্যা। মৃত্যুর পরে, প্রথমপুত্র রাজা রাজেন্দ্র-

নারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু অবিবাহিত অবস্থায়, অল্প বয়সে ইঁহার মৃত্যু হওয়ায়, দ্বিতীয় পুত্র, জীতেন্দ্রনারায়ণ রাজা হইয়াছেন। ইনি বারোদার বর্ত্তমান গুইকোয়ার দুহিতা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। বিবাহের কিছু পরেই বহুমূল্য অলঙ্কার চুরি হইয়া রাজ্যমধ্যে বিলক্ষণ গোলযোগ হয়; কিন্তু হৃত-দ্রব্যের অধিকাংশ পাওয়া গিয়াছিল। নৃপেন্দ্রনারায়ণের পুত্রগণের মধ্যে এখন মাত্র মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ও প্রিন্সভিক্টর নৃত্যেন্দ্র-নারায়ণ জীবিত আছেন। ভিক্টর বেশ বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত। ইঁহাদের বিষয় অধিকাংশ লোকেই জানেন, সুতরাং আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বসু।

স্বরাজ।

[তৃতীয় পৃষ্ঠায় আরব্ধ প্রসঙ্গের অনুবৃত্তি।]

(৬)

স্বরাজের কথা বলিবার পূর্ব্বে, রাজ্য সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা পরিষ্কার করিয়া নেওয়া দরকার। সেই প্রসঙ্গে, রাষ্ট্র-ও অরাজক-সমাজ এ উভয়ের কিছু আলোচনা করিতে চাই। সভ্যতার কেবল শৈশবে, এক শ্রেণীর লোক স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। এক স্থানেতে মানুষের উপযোগী আহার্য্য ও পানীয় পালিত পশুর উপযোগী খাদ্য, ও বাসগৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী উপকরণ পাওয়া গেলেও, সেই শ্রেণীর মানুষ সেই স্থানেতে আবদ্ধ না থাকিয়া, স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। আবার অপর শ্রেণীর মানুষ, স্থান বিশেষ পছন্দ করিয়া নিয়া, তথায় গৃহস্থ হইয়া বাস করিত। যাযাবর মানুষে ও গৃহস্থ মানুষে সংগ্রাম লাগিত। কিন্তু, কি যাযাবর কি গৃহস্থ, কোনও দলেরই নিকট তখন ভূমি দুষ্প্রাপ্য ছিল না। মাটির জন্য তখন তেমন কাড়াকাড়ি ছিল না। আজকাল এদেশে চা-বাগানের সাহেবদের যেমন, তখন তেমনই মানুষের বেশী লোভ ছিল মানুষের উপর, মাটির উপর তত নয়। তখন মাটির চেয়ে মূল্যবান ছিল, মানুষ ও মানুষের শ্রম। দলবদ্ধ হইয়া মানুষ বাস করিত। কাজেই, আগে গড়িল দল (tribe)। দল যখন কোনও দেশে স্থায়ী অধিবাসী হইল, তখন গড়িল রাষ্ট্র (state)। সভ্যতার ইতিহাসে, পূর্ব্বে দলপতি, পরে রাষ্ট্রপতি।

এক রাষ্ট্রে সদৃশ ভাষা, সদৃশ ধর্ম্ম, সদৃশ আচার ব্যবহার, সদৃশ রীতিনীতি হইলে, তবে সে রাষ্ট্রের লোক এক জাতি বা "নেশান্" (nation) বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এক রাষ্ট্রের লোকের মধ্যে যদি ভাষায় ধর্ম্মে বা রীতিনীতিতে বিভিন্নতা অতিমাত্রার অধিক হয়, তবে সে রাষ্ট্রের লোককে একজাতি বা "নেশান" বলিবার সার্থকতা কিছুই থাকে না। সে রাষ্ট্রের

লোকেরা, তেমন জমাট বাঁধিয়া এক জাতি বা "নেশান" না হওয়া পর্য্যন্ত, নিজেরা নিজেরা সামান্য কারণে দল পাকাইয়া কলহ দ্বন্দ্ব করিবে। ইউরোপীয় মহাসমরের পূর্ব্বে, অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারী এইরূপ এক রাষ্ট্র ছিল। তথায় রাষ্ট্রপতি এক ছিল বটে; কিন্তু, লোকেরা ছিল, অন্ততঃ তিনটি নেশান্ বা জাতি। সেই জন্যই যুদ্ধে পদে পদে অষ্ট্রীয়া হাঙ্গারীর এত দুর্গতি হইয়াছিল। গত শতবর্ষ ধরিয়া বিশাল তুরস্ক সাম্রাজ্যে এত অশান্তি, এত রক্তপাত,—আজ এ কোণ খসিয়া পড়িতেছে, কাল অপর কোণ ধসিয়া পড়িতেছে,—তাহাও এই কারণে। আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সদৃশ ভাষা, সদৃশ ধর্ম্ম, সদৃশ রীতিনীতি লইয়া লোকদের এক জাতি গড়িবার সুযোগ থাকিলেও, তাহারা যদি বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্ভূত হয়, তাহারা এক জাতি বা 'নেশান্' হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত, প্রাচীন গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোকেরা। আধুনিক ইতিহাসে তাহার এক দৃষ্টান্ত, জার্ম্মানির ও অষ্ট্রীয়ার জার্ম্মান লোকগণ।

ভাষায় মিল না থাকিলে, ভাবের বিনিময়, পরস্পরে আদান প্রদান, কঠিন হইয়া পড়ে। সাধারণ মানুষ, একের অধিক ভাষা বড় একটা শেখে না। চেষ্টা করিয়াও, একটী বই দুইটী ভাষা সম্যক্ আয়ত্ত করিয়াছে, এমন মানুষ খুব বেশী দেখা যায় না। একাধিক ভাষা আয়ত্ত করা থাকিলেও, শরীর বা মন যখন অসুস্থ ও স্ফুর্ত্তিহীন হয়, তখন, মাতৃভাষা ছাড়া অপর ভাষার কথা বলিতে পারিলেও, মানুষ বলিতে চায় না। আমার মনে আছে, ১৯০৮ সালে, যখন মহাত্মা গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে লণ্ডনে অসুস্থ ছিলেন, তখন তাঁহার এক পরম বন্ধু বাঙ্গালীকে তিনি বলিয়াছিলেন—"কেহ যদি আমার সহিত এখন মারাঠীতে কথা বলিতে পারিত, আমি কি আনন্দ পাইতাম; এ শরীরে এখন আর ইংরাজী কথা শুনিতে বা বলিতে মন যায় না। আমার সহিত মারাঠীতে কথা বল।" চেষ্টা করিয়া দেশবাসী সকলে বহু-ভাষাবিৎ হইবে, এরূপ আশা করা বৃথা। চেষ্টা করিলেও, ৺হরি নাথ দের ন্যায় বহু-ভাষাবিৎ পৃথিবীতে অতি অল্পই হইতে পারে। সেই জন্য মনে রাখিতে হইবে, জাতি-গঠন ব্যাপারে ভাষার একতা, একটা বড় কথা। আরও, শতকরা অন্ততঃ ৯০ জন বাঙ্গালী, দেখা হইলে, শতকরা ৯০ জন মান্দ্রাজীর সহিত ভাব-বিনিময় করিতে গিয়া, মুস্কিলে পড়িবে। বিন্ধ্যাচলের উত্তরে আর্য্যাবর্ত্তে অনেক স্থানেই শিক্ষিত বাঙ্গালী কোন প্রকারে ভাঙ্গা হিন্দি বলিয়া কাজ চালাইতে পারে। কিন্তু, দাক্ষিণাত্যে,—তেলেগু, তামিল ও কাণেড়ী ভাষার দেশে,—ভাঙ্গা-হিন্দীতে সাধারণ কাজও চালান যায় না। খাওয়া, পরা, ও সাধারণ মানুষের দৈনিক জীবনের জন্য, একজন অপরের সহিত, মাত্র সামান্য কয়েক শত শব্দের সাহায্যে কথা বলে। সেই কয়েক শত শব্দ দুই জনে বুঝিলেই, দৈনিক জীবনের সাধারণ কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু, ধর্ম্ম-নীতি বা রাষ্ট্রশাসন-নীতি ব্যাপারে বা স্বদেশ-সেবার কার্য্য চালাইতে হইলে, শুধু ঐ কয়েকশত শব্দে কুলায় না।

সকল মানুষের প্রকৃতিতে, দেবভাব ও পশুভাব উভয়ই আছে। যে মানুষ এক সময়ে দেবভাব পূর্ণ হইয়া সত্য, ন্যায়, দয়া, প্রীতি, পবিত্রতা, স্বার্থত্যাগ ও ক্ষমার আদর ও সাধনা করিতেছে, সেই মানুষই আবার সময়ে প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা

ও ঈর্ষ্যাদ্বেষে পূর্ণ হইয়া পশুর মত চলিতেছে। পশু-ভাব সংযত করিয়া, ধর্ম্ম কখনও বা মানুষকে শাসন দ্বারা মানুষ-নামের যোগ্য করিয়া তুলিতেছে। আবার কখনও বা, ধর্ম্ম, মানুষের দেব-ভাব পোষণ করিয়া, মানুষকে দেবতুল্য করিতেছে। ধর্ম্মের প্রধানতঃ এই দুই কাজ—নিবর্ত্তনা, প্রবর্ত্তনা। সাধারণ মানুষের দৈনিক জীবনে, নিবর্ত্তনাই ধর্ম্মের প্রধান কাজ। সচরাচর আমরা মানুষ দেখিতে পাই, দেবতা দেখিতে পাই কচিৎ। ব্যক্তিগত জীবনে, দেব-প্রকৃতির পোষণ অপেক্ষা পশুপ্রকৃতির শাসন, চোখে পড়ে বেশী। ধর্ম্ম-সমাজ লোকের আচার ব্যবহার রীতিনীতি বাঁধিয়া দিয়া, ধর্ম্মের এই নিবর্ত্তনার কাজ ব্যক্তিগত জীবনে সুসিদ্ধ করিবার প্রয়াস পায়। শাসন দ্বারা, নিবর্ত্তন দ্বারা, ধর্ম্মসমাজ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব্ব করে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, জাতিগত জীবনেও, প্রবল জাতির ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সমাজ, দুর্ব্বল জাতির স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পায়। ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-সমাজ সংক্রান্ত বিরোধে, এইজন্য, জাতিতে জাতিতে রক্তারক্তি সংগ্রাম বাঁধিয়াছে। সেইজন্য বলিতেছিলাম যে, রাষ্ট্রের লোকেদের ধর্ম্ম-সমাজে ধর্ম্ম-সমাজে মিল না থাকিলে, সে রাষ্ট্র অশান্তি-পূর্ণ ও হীন-শক্তি হয়।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা বলিলাম, তাহা বহির্মুখীন ধর্ম্মের কথা। অন্তর্মুখীন ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার বা ধর্ম্ম-সমাজ নিয়া তেমন ব্যস্ত নহে। মানবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ নিকট হইতে নিকটতর করিবার জন্য, অন্তর্মুখীন ধর্ম্ম, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের পথ দিয়া, সাধনার দিকে মানুষকে আহ্বান করে। ইতিহাসে দেখা যায়, রাষ্ট্র এই অন্তর্মুখীন ধর্ম্মকে রাষ্ট্রের ইচ্ছানুযায়ী নিয়মিত ও পরিচালিত করিতে তেমন প্রয়াস পায় না। ধর্ম্ম যতক্ষণ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতি দ্বারা মানবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ নিকটতর করিতে চেষ্টা পায়,—কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সমাজ বা আচার ব্যবহার নিয়া তোলপাড় করে না,—ততক্ষণ রাষ্ট্র কোনও ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-সমাজকে পরাভূত করিতে তেমন যত্নবান হয় না। ইউরোপীয় ইতিহাসে, ধর্ম্মের নামে নর-শোণিতে ইউরোপ যে রঞ্জিত হইয়াছে, প্রায়ই তাহার মূলকারণ ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ছিল না; ছিল, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-সমাজ (church)-সংক্রান্ত। ভারতবর্ষের হিন্দু-ধর্ম্মের নামে রক্তপাত ততটা হয় নাই; কারণ, হিন্দু-ধর্ম্ম-সমাজে প্রবেশ করিতে হইলে, শুধু হিন্দু-ধর্ম্মের মত-গ্রহণ করিলেই হয় না, একপুরুষ হিন্দু আচার ব্যবহার মানিয়া চলিলেও হয় না। সে ধর্ম্ম-সমাজে প্রবেশের ব্যবস্থা, খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান সমাজে প্রবেশের ব্যবস্থা হইতে ভিন্ন।

(৭)

আজ পর্য্যন্ত যত রাষ্ট্র দেখা গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকের মূলভিত্তি বল বা শক্তি (force)। যে সব লোক রাষ্ট্রপতির বা রাষ্ট্রীয় লোকের অমঙ্গল করে বা করিতে চেষ্টা করে, তাহাদিগকে শাসন করা হয়, শক্তির সাহায্যে। কোন্ ক্ষেত্রে কতটা বল প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা কে স্থির করিবে? কতটা অশুভ করিলে, রাষ্ট্র-শক্তি দ্বারা অশুভকারীর প্রাণনাশ করা হইবে, কতটা অশুভ করিলে অশুভকারীর শুধু

কিছুকালের জন্য স্বাধীনতা হরণ করা হইবে, বা শুধু কিছু অর্থক্ষতি করা হইবে, তাহা কে স্থির করিবে ? এক সময়ে, দলপতি বা রাষ্ট্রপতি নিজে তাহা স্থির করিয়া দিতেন। রাষ্ট্রের বা দলের অপর লোক তাহা মানিত। ক্রমে, নায়ক-পিতৃগণের পরামর্শে তাহা স্থির করা হইত। কিন্তু স্থির হইয়া গেলে, অশুভকারীর প্রাণনাশ বা স্বাধীনতা হানি বা অর্থ-ক্ষতি করা হইত, রাষ্ট্রপতির দোহাই দিয়া, রাষ্ট্রপতির নামে। রাষ্ট্রশক্তির পাছে অসংযত প্রয়োগ হয়,—পাছে রাষ্ট্রপতি বা তাহার অমাত্যবর্গ যথেচ্ছ ব্যবহারে লোকের প্রাণ, স্বাধীনতা বা অর্থের ক্ষতি করিয়া বসে,—তাহার প্রতিবিধান হইল, সেই রাষ্ট্রের নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারে বা আইনে। প্রথমে যাহা ছিল আচার (custom), তাহাই পরে হইল রাষ্ট্রপতির আইন (law)। ব্যবহার অনুযায়ী বিচার করিবার ভার হইল, বিচার-পতির উপর। বিচারপতি বা আদালত যাহা বিচারে স্থির করিবে, তাহা রাষ্ট্রশক্তিদ্বারা কার্য্যে পরিণত করা হইবে। বিচারফল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য, রাষ্ট্রশক্তি সাহায্য করিবে। প্রমাণ—পেয়াদা; প্রয়োজন হইলে পুলিস; তাহাতেও না কুলাইলে, সেনা আসিয়া বিচার ফল কার্য্যে পরিণত করাইবে, রাষ্ট্রপতির নামে।

রাষ্ট্রের বাহিরের শত্রুর কথাও বলিয়াছি। এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের স্ত্রী-হরণ করিতে চায়; সম্পত্তি গ্রাস করিতে চায়। কোনও রাষ্ট্রপতি বা পৃথিবীর ইতিহাসে নাম রাখিয়া যাইবার ইচ্ছায়, বিজয়-গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য, অপর রাষ্ট্রকে পরাভূত করিতে চায়। তখন, রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার উপায়, সেই রাষ্ট্রের শক্তি। আবার, এক রাষ্ট্রের পর-রাষ্ট্র দমনের উপায়ও, শক্তি। সেইজন্য বলিতেছিলাম, রাষ্ট্রের মূলভিত্তি, **শক্তি**।

আধ্যাত্মিক বলের গর্ব্ব করিবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া, আমরা সময়ে সময়ে বলিয়া থাকি, রাষ্ট্রশক্তি পাশব-শক্তি (brute force)। কিন্তু, এই শক্তি শুধু জড়শক্তি ও নহে, শুধু পাশব-শক্তিও নহে। জড়শক্তি, যেমন প্রবল বন্যা, ভীষণ ঝড়, বা বাষ্প-চালিত এঞ্জিনের পিস্‌টন্ লৌহদণ্ডের ভীষণ অগ্র-পশ্চাৎ গতি। বন্যার মুখে যে পড়িয়াছে, সে ভাসিয়া যাইবেই; বন্যা তাহাকে পাশ কাটাইয়া যাইবে না। ঝড়েরপথে প্রকাণ্ড বটগাছ থাকিলে, ঝড় তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বা সমূলে উপাটিত করিবার জন্য বুদ্ধি খেলাইবে না। চলন্ত এঞ্জিনের পিস্‌টন্ লৌহদণ্ডের গায়ে অতর্কিতে যদি তোমার শরীরের কোন অংশ আসিয়া লাগিয়াছে, তোমার নিস্তার নাই। পাশব-শক্তি প্রয়োগের বেলা কিছুটা বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। জঙ্গলে বাঘে হাতিতে যখন লড়াই হয়, বাঘ গিয়া হাতীর পায়ে কামড়ায় না; একেবারে সোজা ঘাড়ে চড়িয়া এমন যায়গায় কামড়ায়, যেন হাতি আর শুঁড় দিয়া বাঘকে ধরিতে না পারে।

মানুষ রাষ্ট্রের জন্য যে শক্তি সঞ্চিত করে, তাহা জড়-শক্তি, পাশব-শক্তি ও তাহার উপরে আরও কিছু। মানুষ মানুষকে মারিবার জন্য, অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া, সেনাদিগকে বহুকাল ধরিয়া শিক্ষা দেয়। অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া, বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, মানুষ একের পর অন্য বিনাশ-যন্ত্র আবিষ্কার করিতেছে। কেমন করিয়া বিনাশের-যন্ত্র ভীষণ হইতে ভীষণতর হইবে, কেমন করিয়া শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা সুনিশ্চিত হইবে, তাহার জন্য যুগ-ব্যাপী সাধনা

চলিয়াছে। যুদ্ধে বারুদের ব্যবহার প্রচলিত হইবার পরে, রাষ্ট্রের বিনাশ-শক্তি কি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা ইউরোপীয় মহাসমরে মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে। শুধু বিনাশক যন্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে, এমন নয়। সভ্যতার মূলমন্ত্র যে বহুজনের সমবেত সুনিয়ন্ত্রিত উদ্যোগের ব্যবস্থা (organisation), তাহাও সংহার সাধনায় প্রয়োগ করা হইয়াছে। সংহার ব্যাপারে সহস্র সহস্র মানুষ নায়কের ইঙ্গিত মাত্রে, কেমন করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সমবেত চেষ্টা করিবে, তাহা সেনাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। দশজনে, একের পর একে, দশবার বল-প্রয়োগ করিলে যাহা বিনষ্ট হয় না, তাহা দশজনে একযোগে, এক মুহূর্ত্তে আক্রমণ করিয়া সহজে বিনাশ করিতে শিক্ষা পাইতেছে। সংহার ও আত্মরক্ষার শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য, গণিত, রসায়ণ-শাস্ত্র, পদার্থ-বিদ্যা প্রভৃতি জড়-বিজ্ঞানের যত শাখা প্রশাখা আছে, সবই মানুষ কাজে লাগাইতেছে। জড়ের শক্তির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। পশুকে বশ করিয়া, পাশবশক্তির সাহায্য নেওয়া হইয়াছে। ফলে, সংহার-কার্য্যে রাষ্ট্র-শক্তি, পাশবশক্তি অপেক্ষা, সহস্রগুণে অধিক ক্ষমতাশালী হইয়াছে। হিংস্র পশুদল, মানুষকে, ভূমি ছাড়িয়া দিয়া অন্ধকারে, গিরিগুহায় বা জঙ্গলে পালাইয়াছে, তবেই সভ্যতার বিস্তার সম্ভব হইয়াছে।

সংহার-শক্তি সঞ্চিত হইলে, মানুষ শুধু হিংস্র পশু নাশ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। মানুষ শত্রু-মানুষকে বধ করিতে আনন্দ পাইয়াছে! মানুষের শিকার-প্রবৃত্তির প্রেরণায় রাষ্ট্রীয় সংহার-শক্তি সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে, পশু ও মানুষ উভয়ের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে; শত্রু-রাষ্ট্রপতি ও তাহার প্রজাবৃন্দকে শিকার করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে, এমন নয়। স্বীয় রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সংহার-শক্তি, সময়ে সময়ে, কি ভীষণ পৈশাচিক লীলা দেখাইয়াছে! এই সংহার-শক্তি থাকিবে, প্রয়োজনমত প্রযুক্ত হইবে ও সম্বরণ করিতে হইবে, এই উদ্দেশ্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতিবিৎগণ এক নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন যে, সংহার-শক্তির নিয়ন্তা সমর-বিভাগের (military) কর্ত্তা, শান্তি-বিভাগের (civil) কর্ত্তার আজ্ঞাধীন থাকিবেন। প্রাণ-বিনাশ যাহার প্রধান কার্য্য, সে প্রাণ-রক্ষকের আজ্ঞাধীন থাকিবে।

(৮)

বর্ব্বর মানুষ, বল বা শক্তি সহজেই বুঝিত ও মানিত। তখন ছিল, 'জোর যার মল্লুক তার'। বর্ব্বর মানুষের সমাজের ও রাষ্ট্রের মূল কথা ছিল, বল বা শক্তি। আর, বিংশ শতাব্দীতে আজও মানুষের, সমাজের না হোক্, রাষ্ট্রের মূল কথা, শক্তি। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, শক্তির প্রতিপত্তির হ্রাস ও ব্যবহার বা আইনের প্রতিপত্তির বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে যে বিবাদের মীমাংসা হইত, শক্তির সাহায্যে, সভ্য রাষ্ট্রে, ব্যবহার বা আইন তাহার মীমাংসা করিতেছে। আর ব্যবহার বা আইন যেন প্রজারা মানে, তাহার জন্য সেনা ও শক্তি পশ্চাতে রহিয়াছে। কিন্তু এ কথা যেন মনে থাকে যে, ব্যবহার বা আইন সভ্যতার শেষ সিদ্ধান্ত নয়। বল বা শক্তির প্রয়োগ কমিয়াছে। ব্যবহার বা আইন আসিয়া তাহার স্থানে বসিয়াছে। বুদ্ধ ও যীশু প্রচারিত প্রেম ও অহিংসাকে, ব্যবহার বা আইনের স্থানে বসাইবার জন্য নিয়তই চেষ্টা চলিতেছে। সাধারণ মানুষ কিন্তু তাহার দৈনন্দিন জীবনে, আজও বল ও ব্যবহার কে সরাইয়া দিয়া, প্রেমের প্রতিষ্ঠায় সফল-প্রয়াস হয় নাই।

বাসনার নিবৃত্তি-সাধন যতদিন সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়ায় নাই, প্রেমের একচ্ছত্র রাজত্ব যতদিন সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ততদিন পৃথক সম্পত্তি (private property) মানব-সমাজে রাখিতে হইলে, বল বা শক্তি অপেক্ষা, ব্যবহার বা আইন শ্রেয়ঃ, ইহা মানিতে হইবে। রামের সম্পত্তি রামই ভোগ করিবে, শ্যাম তাহাতে লোভ করিয়া চুরি বা ডাকাতি করিতে পারিবে না ; করিতে গেলে, ব্যবহার বা আইন আসিয়া, প্রয়োজন হইলে শক্তির সাহায্যে, তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিবে। নিবারণ করিতে না পারিলে, শ্যামকে শাসন করিবে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতিকেও এই ব্যবহার মানিয়া চলিতে হইবে। রাষ্ট্রপতির জন্য পৃথক আইন থাকিতে পারে, কিন্তু সেই পৃথক আইন রাষ্ট্রপতিকে মানিয়া চলিতেই হইবে— রাষ্ট্রপতি নিজের খেয়াল মত চলিতে পারিবেন না। এখানেও, শক্তির পরিবর্ত্তে আঃ। অনিয়মে, রাজ্য নাহি রয়।

শুধু সম্পত্তি রক্ষার জন্য আইন নয়। সব চেয়ে বেশী মূল্যবান্, মানুষের জীবন। এক প্রজা অপর প্রজার জীবন-নাশ করিতে পারিবে না। নিজের খেয়ালে স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও কোনও অশুভ কারী প্রজার জীবন-নাশ করিতে পারিবেন না। সমাজে যদি প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা থাকে, আইনের ব্যবস্থা অনুসারে সে দণ্ডবিধান করিতে হইবে, রাষ্ট্রপতির খেয়াল অনুসারে নয়।

শুধু প্রাণ হরণ ব্যাপারে আইনের ব্যবস্থা নয়। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরের মূল্য বাড়িতে লাগিল। এক প্রজা, অপর প্রজাকে নির্য্যাতন করিতে পারিবে না ; শরীরে আঘাত দিতে পারিবে না। পুরোহিতগণ বলিয়া দিলেন,—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"। স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও প্রজার অঙ্গে যথেচ্ছা আঘাত করিতে পারিবেন না।

শুধু শরীর নয়। মানুষের স্বাধীন গতিবিধি মানুষ মূল্যবান্ মনে করিতে শিখিয়াছে। এক প্রজা, অপর প্রজাকে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কোনও স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না ; এমন কি রাজ প্রসাদেও নয়। স্ব-ইচ্ছায় স্বচ্ছন্দে চলাফেরা, দৈহিক স্বাধীনতা, মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির স্বাস্থ্য ও বিকাশের জন্য নিতান্ত দরকারী। গত কয়েক বৎসর, বাঙ্গালার কয়েক শত যুবককে যখন চলাফেরার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া অন্তরীণ করা হইয়াছিল, তখন কেহবা উন্মাদ, কেহবা সংজ্ঞাশূন্য অর্দ্ধমৃত হইয়াছিল ; কেহবা স্বাধীনতা হারাইয়া, আত্মহত্যা করিয়াছিল। তাহার এক কারণ এই যে, যাহারা মানসিক বৃত্তির পরিচালনা করিয়া অভ্যস্ত, কেবলমাত্র উপযুক্ত বিশুদ্ধ আহার্য্য, পানীয়, আলোক, বাতাস ও পরিধেয় বস্ত্র পাইলেই তাহাদের শরীর সুস্থ থাকে না। মনের স্বাস্থ্যের জন্য, মানসিক বৃত্তির পরিচালনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় ; কর্ম্ম করিবার সুযোগেরও প্রয়োজন। তাহা না পাইলে, মন অসুস্থ হইয়া পড়ে, ও অসুস্থ মন নিয়া, দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়। আমার মনে আছে, একদিন এক উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীর সহিত কথোপকথনে জানিলাম যে, বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের এক ইংরাজ সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে, অন্তরীণে আবদ্ধ ছেলেরা তাহাদের বাড়ীতে যতটা আরামে ও আয়াসে থাকিতে অভ্যস্ত ছিল, খাওয়া পরা ও থাকা সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিক আরামে সরকার তাহাদিগকে রাখিয়াছেন ; তবুও ছেলেদের অভিযোগ থামে না। উত্তরে আমি বলি যে, ঐ সেক্রেটারীকে চাঁদা তুলিয়া, মাসে ৪০০০৲ টাকা বেতন দিয়া, কলিকাতায় তেতালা

সুসজ্জিত প্রাসাদে একাকী রাখিয়া, বিজলি বাতি ও পাখার বন্দোবস্ত করিয়া, চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় যোগাইতে আমি রাজি আছি। আরামের সব আয়োজন থাকিবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে করার কবুল থাকিবে যে—(১) বাড়ীর বাগানের বাহিরে যাইতে পারিবেন না ; (২) পৃথিবীতে ঐ বাগানের বাহিরে কি হইতেছে বা হইয়াছে তাহা বাহিরের কাহাকেও জানাইতে পারিবেন না ; আর, (৩) আমার খুসী হয় ত, ৪ বৎসর পরে তার মুক্তি, তাহাও আমার মর্জ্জির উপর নির্ভর করিবে। সেক্রেটারী সাহেব কি এই সর্ত্তে ৪০০০৲ টাকার এই রকম চাকুরী নিতে রাজি আছেন ? তখন সেই রাজ-কর্ম্মচারী আমাকে বলিলেন যে, এ অবস্থায় পড়িলে সে পাগল হইয়া যাইত। এই জন্য বলিতেছিলাম যে, কোনও প্রজা ত নয়ই, স্বয়ং রাষ্ট্রপতিও নিজের খেয়ালে রাষ্ট্রে কাহারও স্বচ্ছন্দে গতিবিধি নিবারণ করিতে পারিবেন না। দৈহিক-স্বাধীনতা মানুষের এক প্রধান অধিকার। আর এক অধিকারের কথা বলিব—স্বাধীন-চিন্তার অধিকার। স্বাধীন-চিন্তা ও তাহার সফলতার জন্য বাক্যের স্বাধীনতা—এ বড় মূল্যবান্ অধিকার। প্রাচীন ভারতে, নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে, চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতা সম্মানের সহিত রক্ষিত হইত। সে স্বাধীনতা ভোগের অধিকার সকলের ছিল না বটে ; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে, সে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। সীমা নির্দ্দেশের প্রয়োজন তখনও ছিল, আজও আছে। মানুষ স্বাধীন-চিন্তাকে যেমন ভয় করে, মৃত্যু বা নির্য্যাতনকেও তেমন ভয় করে না। স্বাধীন-চিন্তা বিপ্লব আনিয়া সমাজকে ও রাষ্ট্রকে ওলট পালট করিয়া দেয়। সমাজ, শ্রেণী বিশেষের মান মর্য্যাদা মানিয়া লইয়া, অপর সকল শ্রেণীকে বলিতেছে, উহার নিকট নতশির হও। স্বাধীন-চিন্তা সাম্যবাদ প্রচার করিয়া বলিতেছে—মানুষ সব ভাই ভাই ; এক মানুষ অপরের নিকট বংশ পরম্পরায় মাথা হেঁট করিবে কেন ? রাষ্ট্র বলিতেছে, কৃষক শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া রাষ্ট্রপতির ও তাহার পার্শ্বচর ধনী পদস্থ লোকের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া, অতীত বহুশতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞানের সমাদর করিয়াছে, আজও তাহাই করা উচিত। স্বাধীন-চিন্তা প্রচার করিতেছে, সকল মানুষকে শ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে হইবে ; যথাসম্ভব, সমান করিয়া পারিশ্রমিক বাটিয়া নিতে হইবে, সমাজ ও রাষ্ট্র রক্ষার জন্য যতটুকু বৈষম্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, মাত্র ততটুক বৈষম্য মানা যাইবে। স্বাধীন-চিন্তা মৃত্যুর পরপারে স্বর্গের অস্তিত্ব আছে কিনা জানিতে চায়, নরকের বিভীষিকারও বিচার নির্ভীকভাবে করিতে চায়। মানবের মহত্ব পরিচায়ক, এই স্বাধীন-চিন্তা। সে গণ্ডী মানে না, দল মানে না, সমাজ মানে না, রাষ্ট্রও মানে না ; আর মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের পর, তাহার প্রতিপত্তি ও শক্তি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং, রাষ্ট্র আত্ম-রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া, চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। সীমা অতিক্রম করিলেই, রাষ্ট্র তাহার শক্তির সাহায্য লইয়া, চিন্তা ও বাক্যের স্বাধীনতাকে পুনরায় নির্দ্দিষ্ট সীমার ভিতরে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পায়। এখানেও সভ্য-রাষ্ট্র, শক্তির পরিবর্ত্তে, আইনের ব্যবস্থা করিয়াছে।

শক্তির শাসনের (reign of force) পরিবর্ত্তে এই যে আইনের শাসন (reign of law) সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, প্রত্যেকের স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে পরিস্ফুট বোধ থাকা চাই। আর, পরের অধিকারের সম্মান করিতে

নিজে ষোল আনা রাজি হওয়া চাই। শুধু নিজের অধিকার (right) বুঝিলে চলিবে না। নিজের দায়িত্ব (duty) বোধ সম্যক্ পরিস্ফুট হওয়া নিতান্ত দরকার। নতুবা, শুধু আইনের শাসনে, সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

(৯)

এই যে ব্যবহার বা আইনের কথা, প্রজার অধিকারের কথা বলিতেছিলাম, এ অধিকার কে নির্দ্দেশ করিয়া দিবে? ব্যবস্থাপক কে? অতি প্রাচীন কালে, কোনও কোনও দেশে, পুরোহিত ছিলেন, রাষ্ট্রপতি। কিম্বদন্তি হইতে জানা যায় যে, সেই পুরোহিত রাষ্ট্রপতি, ব্যবহার বা আইন নির্ণয় করিয়া করিয়া প্রচলিত করিয়াছিলেন। সবদেশে এরূপ হয় নাই। অনেক স্থলে, সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকদের সুবিধা ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের সুবিধা ও সমগ্র সমাজের ধর্ম্ম ও ন্যায় বোধ ও সমাজ ও রাষ্ট্র সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, এই সকলের কিছুটা সামঞ্জস্য রাখিয়া, অলক্ষিতে সদাচার (custom) গড়িয়া উঠিত। সেই সদাচার, রাষ্ট্রপতির নামে, সকলকে মানিতে হইত। তাহাই হইল, ব্যবহার বা আইন। রাষ্ট্রপতি ও পিতৃনায়কগণ বা পুরোহিতগণ, একযোগে ক্রমশঃ, সময় ও সুবিধা বুঝিয়া,, সেই সদাচারের কালোপযোগী পরিবর্ত্তন করিত ও সমাজ তাহা মানিত। রাষ্ট্র যখন ছোট ছিল, পিতৃনায়ক বা পুরোহিতের সংখ্যা যখন বেশী ছিলনা, তখন সকলে একত্র হইয়া, পরামর্শ করিয়া ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করা সম্ভব-পর ছিল। এ পরিবর্ত্তনে, নিম্নশ্রেণীর বা স্ত্রীলোকদিগের সাক্ষাৎভাবে পরামর্শ দিবার সুযোগ বড় একটা ছিলনা। পরিবর্ত্তিত ব্যবহার, তাহাদের পক্ষে দুঃসহ না হইলেই, তাহারা তাহা মানিয়া চলিত। কিন্তু, রাষ্ট্রের পরিসর বৃদ্ধি হইলে, সকল পিতৃ-নায়ক বা পুরোহিতের একত্র হইয়া পরামর্শ করা সহজ হইত না। তখন, হয় যশস্বী খ্যাতনামা কোন ব্যবহার-বিৎ নূতন পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা দিতেন, সমাজ ক্রমে ক্রমে তাহা গ্রহণ করিত, নতুবা, বহুসংখ্যক পিতৃনায়ক বা পুরোহিত, অল্প সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া দিত। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ একত্র পরামর্শ করিয়া, নূতন পরিবর্ত্তনের বিধান করিত। প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন বা ব্যবহার-পরিবর্ত্তন ব্যাপারে সর্ব্ব-সাধারণের প্রত্যক্ষভাবে হাত দিবার অধিকার ছিল না।

ব্যবহার বা আইন স্থিরীকৃত হইলেই, সকলে তাহা মানিয়া চলিবে, এরূপ আশা করিবার সময় আজ পর্য্যন্ত মানবের ইতিহাসে আসে নাই। এক গ্রামের এক খণ্ড জমি যখন রাম ও শ্যাম উভয়ে দাবী করে, তখন তাহাদের বিবাদের মীমাংসার জন্য, আইনের ব্যাখ্যা করিয়া, রাম বা শ্যামের অধিকার নির্ণয় করিবে কে? এ কাজ ব্যবস্থাপকের নয়, ইহা বিচারকের কাজ। রাষ্ট্রপতি একেলা সকল বিরোধের মীমাংসা করিবার অবসর পান না। এত প্রজার, এত বিরোধ, একজন মীমাংসা করিতে পারে না। এবার আসিল, বিচারকের দল। বিচারক ও বিচারালয়, শুধু রাজধানীতে থাকিলে চলিবে না। সকল প্রজা রাজধানীতে বা বড় নগরে বাস করে না। সকল প্রজা যদি ধর্ম্ম ও ন্যায়ের অবতার না হয়, ও সেই জন্য প্রজার অধিকার রক্ষা করা যদি রাষ্ট্রপতির কর্ত্তব্য হয়, তবে প্রজার অধিকার রক্ষা করিতে, বিচারালয় প্রজার

বাসভূমির অনতিদূরে স্থাপিত করিতে হইবে। ন্যায়-বিচারের জন্য, প্রজাকে সাতদিনের পথ রাজধানীতে যাইতে হইবে না। ন্যায়-বিচার প্রজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

মনে কর, রাষ্ট্রপতি তাহার এক অমাত্যের উপর নারাজ। রাষ্ট্রপতির এক অনুগত অনুচর অভিযোগ আনিল যে, ঐ অমাত্য এক দরিদ্র দুর্ব্বল প্রজার প্রাণনাশ করিয়াছে। অভিযুক্ত অমাত্য বলিল, উহা মিথ্যা অভিযোগ,—রাষ্ট্রপতির মন যোগাইতে, মিথ্যাবাদী অনুচর ষড়যন্ত্র করিয়া, অমাত্যের সর্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টায়, এই অভিযোগ আনিয়াছে। ইহার সত্যাসত্য কে নির্ণয় করিবে? বিনা বিচারে রাষ্ট্রপতি সেই অমাত্যের প্রাণদণ্ড বিধান করিলে, সমাজের নিন্দাভাজন হইবেন। অমাত্যের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া, তাহাকে চির-জীবন অবরুদ্ধ রাখিতে পারিলেও হয়ত রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অমাত্য বলিল, সে নির্দ্দোষী; সে ন্যায়-বিচার চায়। ব্যবহার আইন বলিয়া দিয়াছে, ন্যায়-বিচার পাইবার অধিকার, সকলের আছে। বিচার কে করিবে? এমন বিচারক চাই যে রাষ্ট্রপতিরও গুপ্ত-আদেশ মানিবে না; রাষ্ট্রপতির অনুরাগ বা বিরাগ উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের আদেশ মানিবে। বিচারক মানুষ; তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি আছে: আবার, লোভ আছে, ভয়ও আছে। সুতরাং, রাষ্ট্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, বিচারকের নিয়োগ, পদোন্নতি বা পদচ্যুতি সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির খেয়াল খাটিবে না। রাষ্ট্রপতির খেয়ালকে এমন আইনের বাঁধনে বাঁধিতে হইবে যে, বিচারক, আইন মানিয়া, বিচারকার্য্য স্বীয় ধর্ম্মবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে, ও রাষ্ট্রপতির গুপ্ত-ইচ্ছার খাতির না করিলেও, বিচারকের কোনও আর্থিক ক্ষতি হইবে না। এক কথায়, বিচারকের ধর্ম্মপথে থাকা সহজ করিয়া দিতে হইবে।

ধনী দরিদ্রে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, উচ্চ-পদস্থ লোকে ও সহায়-সম্পদ্‌হীন লোকে যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন যেন দরিদ্রতম নগণ্য প্রজার মনে বিশ্বাস থাকে যে, সে ন্যায়ের ও ধর্ম্মের রাজত্বে বাস করিতেছে। চাই এমন আইন, এমন বিচার-পদ্ধতি, এমন বিচারক যে, ন্যায় ও সাম্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। শক্তির অত্যাচার দূর হইলেই হইল না। আইনের অত্যাচার দূর করিতে হইবে। ধনী ধনের সাহায্যে, আইন বাঁচাইয়া, দরিদ্রের উপর অত্যাচার করিতে পরিবে না। মোকদ্দমা করিয়া, দরিদ্রকে জেরবার করিতে পারিবে না। তবে ত সুরাষ্ট্র।

আবার যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি বিদেশীয় ভিন্ন জাতির লোক, সেখানে আবার এক নূতন কারণে বৈষম্যের আবির্ভাব হয়। সেখানে রাষ্ট্রপতির স্বজাতিগণ অনেক ব্যাপারেই সে দেশের ধনী বা পদস্থ অধিবাসীদিগের অপেক্ষাও উচ্চ অধিকার পাইবার প্রত্যাশা করে। তাহার ফলে, সে রাষ্ট্রে, হয়তবা স্বদেশীর জন্য এক আইন, আর রাষ্ট্রপতির বিদেশীয় স্বজাতিবর্গের জন্য ভিন্ন আইন হয়। আর যদিই বা উভয়ের জন্য একই আইন হইল,—মনে কর আইনে বৈষম্য নাই,—রাষ্ট্রপতির স্বজাতি বিদেশী বণিকে ও সে দেশের স্বদেশী বণিকে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার মীমাংসা করিবে, বিচারক। ভয়েই হোক্, প্রলোভনেই হোক্, রাষ্ট্রপতির বা তাহার স্বজাতি

বর্গের নিকট সুনাম পাইবার প্রত্যাশায়ই হোক্, বিচারক রাষ্ট্রপতির স্বজাতির দিকে টানিয়া বিচার করিয়া বসিবে। এই ব্যাধির প্রতীকার সবচেয়ে কঠিন। স্বদেশীর জন্য এক আইন ও বিদেশী রাষ্ট্রপতির স্বজাতিবর্গের জন্য অপর আইন, ইহার প্রতিকার বরং সহজ। কিন্তু, আইনে যখন বৈষম্য নাই, তখন বিচারককে ধর্ম্মের পথে রাখিবার একমাত্র উপায়, বিচারকের দৃঢ় চরিত্র, ধর্ম্ম-জ্ঞান ও ন্যায়-বোধ। বিচারকের চরিত্রে ধর্ম্মজ্ঞান ও ন্যায়-বোধের অভাব হইলে, আর বিচারকের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও আইন জ্ঞান প্রখর হইলে, বিচারক যে বৈষম্যের অবতারণা করিতে পারেন, তাহার প্রতিকার আইনের সাধ্যাতীত।

আবার বলিতেছি, বল বা শক্তির মীমাংসা অপেক্ষা, ব্যবহার বা আইনের মীমাংসা ভাল। কিন্তু, ব্যবহার বা আইন, সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ বা শেষ বিধান নয়। আর, মানব-সমাজ হইতে যতদিন বল বা শক্তির অপব্যবহার দূর না হইবে, ততদিন দুর্ব্বলকে শক্তি-সাধনা করিয়া, সবল হইবার চেষ্টাও করিতে হইবে। কথায় কথায়, ছোট ব্যাপারে, আইন আদালতের আশ্রয় নেওয়া সম্ভব নয়। সবল যাহাতে শক্তির অপব্যবহার করিতে সাহস না পায়, সেই জন্য শক্তি-সাধনার প্রয়োজন আছে। নিজের অধিকার বুঝিতে হইবে। পরের অধিকারের সম্মান করিতে হইবে। শক্তি-সাধনা একেবারে বাদ দিলে চলিবে না।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

চিন্তা ও কাজ।

মানুষ মাত্রেই কিছু না কিছু চিন্তা করে। তবে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার ধারা প্রবাহিত। সৎ ও অসৎ নানারকম চিন্তার মধ্যে, আদর্শের একটা চিন্তা যে আমাদের মনের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া থাকে, একথা অস্বীকার করিতে পারি না। এই আদর্শের কথা কেহ বা বেশী ভাবেন, কেহ বা আর দশটা আবর্জ্জনার স্তূপের নীচে সেটা চাপা দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। যিনি অধিক পরিমাণে ভাবেন, অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, তিনি কেবল চিন্তা করিয়াই নীরব থাকিতে পারেন না; তিনি সেটাকে কথায় প্রকাশ করেন ও কাজে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। অনেকে আবার এমন আছেন, যাহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীটির মত কত মহৎ চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু হয় ত ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা তাঁর নাই; কিংবা ভাষা থাকিলেও, উদ্যম নাই; অথবা সমাজ-আবেষ্টনের একটা বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়িয়া, আত্ম-প্রকাশের সুযোগ নাই। আমি এই কথাটি বলিতে চাই যে, সাংসারিক ও সামাজিক হিসাবের ছোট বড় বিচার না রাখিয়া, যেখানে যা ভাল চিন্তা লাভ করিব, তাহাকে বিকশিত করিবার অবকাশ ও সুযোগ যেন আমরা দিতে পারি; আর ভাবের রাজ্যেই যেন চিন্তার পরিসমাপ্তি না ঘটে,—যেন মহৎ চিন্তার গতির সহিত কাজের গতির মিলন হয়, এইটাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত।

একথা নির্ভুল যে দুঃখীর দুঃখে আমাদের প্রাণ কাঁদে, অধঃপতিতকে তুলিয়া ধরিতে আমাদের ইচ্ছা হয়, দেশের ও দশের কল্যাণে আপনাকে নিয়োগ করিতেও সাধ যায়। এত ইচ্ছা সত্ত্বেও করি না কেন, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। তাহার প্রধান উত্তর এই যে, সাধারণতঃ উপরের ভাসা ভাসা তরল ভাবুকতার উপর তরঙ্গ তুলিয়া, এই চিন্তাগুলি বুদ্‌বুদের ন্যায় মিলাইয়া যায়। জীবনের ভিত্তি শুদ্ধ প্রবলভাবে নাড়া দেয় না বলিয়াই, কাজ করিবার ব্যাকুল ইচ্ছা জাগ্রত হয় না। মহাপুরুষদের সহিত আমাদের প্রভেদ এই খানে। আমরা যেখানে জরা-মৃত্যু-শোক-বিচ্ছেদ দর্শনে দু'ফোটা অশ্রু ফেলিয়া, তারপর সব ভুলিয়া যাই—ঠিক সেই জায়গায়, বুদ্ধের মত মহাপুরুষ শুধু একটু করুণ অনুভূতির রাজ্যে বিরাজ করেন না। সমগ্র জীবন দ্বারা দুঃখীর অশ্রু মুছাইবার উপায় করেন। অনেকে তর্কের খাতিরে হয় ত বলিবেন, সবায়ের যখন বুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়, তখন আর সাধারণ লোকের অক্ষমতাকে দোষ দেওয়া কেন? তার উত্তরে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, আমরা সকলে মহাপুরুষ না হইতে পারি; কিন্তু, প্রত্যেকেই কি মানুষ নই? শক্তি হয় ত কম বেশী আছে; কিন্তু, শক্তিরূপে ভগবান প্রত্যেকের মধ্যে জাগ্রত আছেন, এ আমি বিশ্বাস করি। অনেকে আত্ম অবিশ্বাসে ভ্রান্ত হইয়া, নিজেকে ছোট মনে করেন; সে অবিশ্বাস তাঁহাদের ভাঙ্গিতে হইবে। তবেই তাঁহাদের কাজের শক্তি বিকাশ লাভ করিবে। চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত করিবার প্রধান শত্রু—আত্ম-অবিশ্বাস, অপ্রেম ও লোকমতের ভাত

আত্ম অবিশ্বাস প্রত্যেকে যদি নিজেরা না দূর করিতে পারি, তবে অন্য দশজন বন্ধুর উচিত নয় কি, তাহার ভ্রান্তিদূর করিতে চেষ্টা করা? যখন তাঁহারা সে প্রয়াস করেন না, তখনই প্রেমের অভাব উপলব্ধি করি। তখনই বুঝি, অপ্রেম সহানুভূতিকে দমন করিয়া রাখিয়াছে। কাজের কথা বলিলেই, লোকের নীরসতার কথা হয়ত মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সব কাজ কি নীরস? হৃদয়ের যোগ-শূন্য কাজ ত বিফল ও নীরস হইবেই। হৃদয়ের প্রেমই সব কাজে সরসতা আনে। এখন দেখি, সত্যই আমাদের মধ্যে প্রেমের অভাব আছে কি না। সম-ব্যথী যে সব সময় জুটে না, তার মূল কারণ সংসারের হৃদয়-হীনতা এই আমরা কল্পনা করিয়া লই; কিন্তু আমার মনে হয় যে, অতি সভ্য সমাজের কৃত্রিম-বন্ধন ও অবস্থার প্রতিকূলতাই সহানুভূতির আসল প্রতিবন্ধক। একজন হয়ত আর একজনের সব ব্যথার ব্যথী হইতে পারিত; কিন্তু অবস্থার চক্রে, তাহারা এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন যে, তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। অধিকাংশ সময় হয় কি, নিজের ব্যথা আমরা গোপন রাখি; প্রকাশ করিলে হয়ত, সমবেদনার পরিবর্ত্তে উপহাস পাইবার সম্ভাবনাই অধিক ভাবিয়া নীরব থাকি। এ অবস্থায় ঠিক দরদীর কাছেও মনটি খোলা হয় না। আবার অন্যদিকে এমনও হয়—আর একজনের দুঃখবেদনা সব মনে মনে উপলব্ধি করিয়া প্রাণ সমবেদনায় পূর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাকে জানাইতে পারিলাম না, "আমি তোমার ব্যথার ব্যথী"। সেখানেও সঙ্কোচ—সে আমার সমবেদনা চায় কি না,—এই ভাবিয়া। নিতান্ত আপনার লোকের কাছেও যে বেশি সময় নিজেকে আমরা গোপন করি, তাহা আবার তুচ্ছ অভিমান লইয়াই হয়ত করি। এমনই করিয়া বাধার পর বাধা সৃষ্ট হইয়া, একটা মনকে আর একটা মন হইতে আড়াল করিয়া ফেলে। যেরূপেই হউক, বাহির হইতে দেখিলে, অপ্রেমই চোখে

পড়ে সেটা সত্যই হউক, আর কাল্পনিকই হউক। কাল্পনিক যদি হয়,—সত্যই যদি আমাদের প্রাণে প্রেম থাকে—তবে এস আমরা প্রেম-ব্রত গ্রহণ করি। আপনাকে আর লুকাইয়া রাখিব না। যাহারা নিজের প্রতি অবিশ্বাসে টলমল, তাহাদের নিকটে গিয়া প্রেম দিয়া, তাহাদের সুপ্ত-শক্তিকে জাগ্রত করিব।

লোক-মতকে ভয় করিয়া চলার জন্যও অনেকের কাজে অপূর্ণ থাকিয়া যায়, বিশেষভাবে নারীজাতির। কবি যে বলিয়াছেন—

> করিতে পারি না কাজ
> সদা ভয় সদা লাজ,
> সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
> পাছে লোকে কিছু বলে।

এ কথাটা মেয়েদের পক্ষে বড় বেশী খাটে। কত চিন্তাশীলা রমণী ঘরের কোণে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া আছেন। চিন্তাকে ব্যক্ত করিবার সাহস তাঁহাদের নাই। কত কর্ম্মশীলা নারী লোক লজ্জার বাঁধনে কল্যাণ-পটু হাত দুই খানি বাঁধিয়া মঙ্গলকার্য্য হইতে বিরত আছেন, তার খবর কি কেহ রাখেন? 'পাছে লোকে কিছু বলে', এই ভয় আমাদের কত সর্ব্বনাশই করিতেছে। ইহাকেও দমন করিতে হইবে, শুধু প্রেমে। কাজের মধ্যের ভুলচুক-গুলি আমরা সহানুভূতির চক্ষেই দেখিব জানিলে, প্রত্যেক কর্ম্মী প্রাণে উৎসাহ ও আশ্বাস পাইবেন। যুগে যুগে ভগবান মানুষের ভিতরেই সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। অতিক্ষুদ্র মানুষের দ্বারা অতিবৃহৎ কাজের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সম্ভব, তুমি আমি মহাপুরুষ নহি; সে শক্তি আমাদের নাই, কিন্তু যতক্ষণ মানুষ বলিয়া মনুষ্যত্বের দাবী করিতেছি, ততক্ষণ কোন কাজই কি আমরা পারি না? হউক ক্ষুদ্র, হউক সামান্য, তাহারি সমষ্টিতে বৃহত্তের প্রতিষ্ঠা হইবে। এক আমার চেষ্টায় ও শক্তিতে সব রকম ভাল কাজ না হইতে পারে, কিন্তু দশজনের সম্মিলনে কত কাজই না হয়। একাই সবটুকু করিয়া খ্যাতিলাভ না-ই করিলাম। দশজনে ভালবাসায় এক হইয়া একটি কাজ সম্পূর্ণ করিয়াছি, ইহাতে কি আনন্দ নাই? বিশ্ব-সেবার মন্দির একা কে গড়িতে পারে? অনেকের হাতের স্পর্শেই সে শোভন-সুন্দর হইয়া গড়িয়া উঠিবে।

এই কর্ম্মময় যুগের স্পন্দন আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিতেছে, চিন্তা জাগ্রত হইয়াছে, প্রাণ সাড়া দিয়াছে। তবে আর নীরব থাকি কেন? ভগবান ত সকলেরই প্রাণে জাগ্রত, তবে কেহ তাঁর ডাক শুনিতেছে, আর কেহ বা বধির। যে সাহসী, সে সত্য যাহা বুঝিয়াছে তাহা প্রাণপণে সাধন করিবেই; তাহারই মস্তকে তিনি জয়মাল্য পরাইয়া দিবেন। লোকের বিদ্রুপের মূল্য কি? আজ পর্য্যন্ত মহৎ কার্য্যে সৎসাহসে বুক বাঁধিয়া যে কেহ অগ্রণী হইয়াছে, কূপ-মণ্ডুক মানুষ কি তাহাকেই অভিশাপ দেয় নাই? তবু সে সম্মুখে ছুটিয়া গিয়াছে, প্রাণের অদম্য বেগে। তাহার প্রাণের একটা গতি আছে বলিয়াই, কেহ তাহার পথ-রোধ করিতে পারে নাই। আমাদের চিন্তার ও কাজের মূল্যের তখনই যাচাই হইবে, যখন দেখিব আমাদের গতিরোধ করিতে সবই

অসমর্থ, সত্যই আমরা "ছুটেছি উন্নতি-পথে আনন্দে বিহ্বল।" আপনাকে যেদিন বিশ্বাস করিব, সকলকে যখন প্রেমে হৃদয়ে টানিয়া লইব, আর লোকনিন্দার ভয়ে যখন অসত্যের আশ্রয় খুঁজিব না, সে দিন আমাদের সব কাজ সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠিবে। আশা, বিশ্বাস, উদ্যম লইয়া চল, অগ্রসর হই। উৎপীড়িত, অভিশপ্ত ভাই-বোনদের নূতন বার্ত্তা শুনাইয়া, বলি—"তোমরা এমন ভাবে আর ধূলায় লুটাইও না, যে যেখানে আছ, নিজের আত্মাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। মনকে মুক্তি দাও। মিথ্যার বাঁধন কাটো। যাহা চিন্তায় স্থান পাইয়াছে, তাহাকে কার্য্যে পরিণত কর।

এই রূপে আমরা চিন্তা ও কাজের ধারা মিলাইয়া লইবার শক্তি লাভ করিলে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ হইবে না।

আঁধারের কুহেলিকা ছিন্ন করে দিয়ে
চাইব আমি সত্য-সূর্য্য পানে,—
সেই হবে মোর সকল প্রাণের চাওয়া।
দুঃখ-শোক-ব্যথা-ভয়-জয়ী প্রাণ নিয়ে
গাইব আমি আনন্দের গান,—
সেই ত আমার মুক্ত-কণ্ঠে গাওয়া।

শ্রীসুনীতি দেবী।
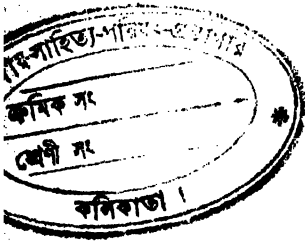
অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী।

আট বছরের মেয়ে,
খেল্‌তেছিল রান্নাবাড়া
ধূলোমাটি নিয়ে।

যা' কিছু তা'র আছে জানা—
একটা ছোট বিড়াল ছানা,
ঝাঁপির পুতুলগুলি,
এসব নিয়ে আনন্দেতে
দিন যেতেছে চলি'।

ভেঙ্গে তা'র সে সোণার খেলা
পরাণ-ভরা সুখের মেলা,
খাঁচায় পুরে', হায়!
স্বভাব-সুরে গাইত পাখী
পড়াতে চাও তায়।

আজ্‌কে খুকী নয়; খুকী যে
দশ জনার-ই এক জনা সে,
আজকে সে যে বউ,
ছেলেমেয়ের দলেতে আর
নয়কো ত সে কেউ!

সে আজ বড় গভীর জ্ঞানী,
সব-জান্তা গুণের খনি—
বুঝা চাই তার সব;
তা' না হলে গ্রামটা সুদ্ধ
কতই কলরব!

শিশুরা খায়, রয় সে চেয়ে,
শেষটা তাদের দিয়ে থুয়ে

থাকলে তবে পায় ;
যদিও হয় তাদের ছোট
সে যে গো বউ, হায় !

দুঃখ থাকে বক্ষে করে',
আনন্দে না হাস্‌তে পারে,
দোষের অভাব নাই ;
পানটি থেকে চুণটি গেলে
মুখ ভরে দেয় ছাই ।

ওগো,
দিয়েছ তা'র পাখা কেটে
থাক্‌তে হবে হাত পা গুটে'।
পাষাণ দেছ বুকে
এমনি সুখের, শৈশবেরে !
প্রাণ কাঁদেনা দুঃখে ?

আট বছরের মেয়ে
খেল্‌তে ছিল রান্নাবাড়া
ধূলোমাটি নিয়ে ।
স্বামীর চেয়ে পুতুল যাহার
অধিকতর কাছে,
তারই নাকি বিয়ে দিয়ে
পুণ্যি বেশী আছে !

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী

পোষ্ট-গ্রাজুয়েট্‌-শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ।

স্কুল ও কলেজ পরিত্যাগ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তৎ-সম্বন্ধে ছাত্রবর্গের প্রতি আমার বক্তব্য, গত প্রবন্ধগুলিতে বলিয়াছি। কিন্তু এই সম্পর্কে, ছাত্র-বর্গের যাঁহারা অভিভাবক, তাহাদের নিকটেও আমি কয়েকটী বক্তব্য নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। আশা আছে যে, তাঁহারা আমার এই সসম্মান নিবেদনটী উপেক্ষা করিবেন না।

বিগত ১৯১৬ সালের শেষভাগে "পোষ্ট-গ্রাজুয়েট" বিভাগটী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হয়। অতি অল্পদিন হইল এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতির ভার বিশ্ববিদ্যালয় আপন হস্তে লইয়াছেন। পূর্ব্বে যে প্রণালীতে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা প্রদত্ত হইত, এই নূতন প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতি যে তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ, উভয় প্রণালীর মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ,—এই বিষয়টা এখন পর্য্যন্ত দেশের লোক তেমন করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেই, বিগত বর্ষে এই কলিকাতা নগরীতে প্রকাশ্য সভা করিয়া, এই "পোষ্ট-গ্রাজুয়েট" বিভাগের বিরুদ্ধে, নানা-রূপ নিন্দা উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল! কোন কোন দেশীয় সংবাদ-পত্রেও অনেক নিন্দা বাহির হইয়াছিল। ইহার কারণ কি ? এই নিন্দা-উদ্‌ঘোষণের প্রধান কারণ—এতৎ সম্বন্ধে অন-ভিজ্ঞতা। যদি দেশের লোকে, প্রকৃত অনুসন্ধিৎসার সহিত, এই নূতন-প্রবর্ত্তিত বিভাগে কি কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, এবং কি কি বিষয়ে কিরূপে শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া নিজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইতেন এবং ভাল করিয়া দেখি-বার কষ্ট গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কখনই ঐ প্রকার নিন্দা ঘোষিত হইতে পারিত না। কেন হইতে পারিত না, তাহা বলিতেছি।

ছাত্রবর্গের যাঁহারা অভিভাবক, তাঁহাদিগকে, আমাদের দেশে, দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লইতে পারা যায়। যাঁহারা ইংরাজী-শিক্ষিত, সেই প্রকার অভিভাবক এক শ্রেণীর; যাঁহারা দেশের প্রাচীন-কল্প লোক, আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই, তাঁহারা এক শ্রেণীর অভিভাবক। ইংরাজী-শিক্ষিত অভিভাবকগণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। যাঁহারা ইংরাজীশিক্ষার সঙ্গে তাদৃশ সম্পর্কে আইসেন নাই, এই প্রকার অভিভাবকগণের সংখ্যাই দেশব্যাপী। ইঁহাদের সন্তানেরাই স্কুল-কলেজে অধিক সংখ্যক শিক্ষালাভ করিয়া থাকে।

আমাদের দেশের ঔদাসীন্য বিশ্ববিখ্যাত। এই ঔদাসীন্যের ফলে, যে সকল অভিভাবক ইংরাজী-শিক্ষিত তাঁহারাও, এই নূতন প্রবর্ত্তিত পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে কি প্রকার শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, সেই প্রণালীটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এইটুকুমাত্রই তাঁহারা জানিয়াছিলেন এবং স্ব স্ব ছাত্রগণের মুখেও মোটামুটিভাবে কেবলমাত্র একটা পরিবর্ত্তনের সমাচার শুনিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। বিশেষ করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজ-পত্র অনুসন্ধান করিবার জন্য, তাদৃশ যত্ন লয়েন নাই। আর যে সকল অভিভাবক প্রাচীন-কল্পের, তাঁহারা ত কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার বিশেষ তথ্যই জানিতেন না। আমরা এই প্রকারেই প্রায় সকল বিষয়েই ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকি। দেশে একটা কোন নূতন বিষয় প্রবর্ত্তিত হইলে, তদ্বিষয়ে প্রায়ই আমরা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করি না। এই আলস্য আমাদের মধ্যে একরূপ মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে!

কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়েরও দোষ আছে। "পোষ্ট-গ্রাজুয়েট" শিক্ষা-পদ্ধতির সম্বন্ধে যে সকল বার্ষিক রিপোর্ট বা বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে, সে গুলি সমস্তই ইংরাজীতে লিখিত হয়। সার্ আশুতোষ, এই বিভাগের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে সেনেট-সভায় যে সকল বক্তৃতা মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকেন, তাহাও ইংরাজীভাষায় প্রদত্ত হইয়া থাকে। দেশের অধিকাংশ লোকই ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ। সুতরাং, এই নূতন শিক্ষাপ্রণালীতে কি কি পরিবর্ত্তন করা হইল, কি প্রকার নূতন ব্যবস্থাই বা অবলম্বিত হইল, বাঙ্গলা-দেশের জন-সাধারণ তাহা আদৌ জানিতে পারিলেন না। যাহারা ইংরাজী-অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহারাও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ঐ সকল রিপোর্টের পুস্তক পড়িয়া দেখিবার কষ্ট-স্বীকার করিলেন না। তারপর, কয়জনের নিকটেই বা ঐ সকল পুস্তক প্রেরিত হইয়া থাকে? ঐ সকল রিপোর্টের প্রচার নিতান্ত সঙ্কীর্ণস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই নিমিত্তই, বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের পরিবর্ত্তনগুলি এবং নূতন-প্রবর্ত্তিত কার্য্য-পদ্ধতির কোন সংবাদ, বাঙ্গলাদেশের মধ্যে তাদৃশ প্রচারলাভ করিতে পারিল না। কেবলমাত্র দুই-চারিটা ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা লোক-মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িল মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রথম হইতেই, "পোষ্ট-গ্রাজুয়েট"-বিভাগের কার্য্য-প্রণালীর বিবরণ ইংরেজীভাষায় লিপিবদ্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে, বাঙ্গলা-ভাষায় বিস্তৃত-ভাবে ঐ সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন এবং বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র ঐ বিবরণ-গুলি প্রচার করিয়া দিতেন, তাহা হইলে দেশের সকলেই বুঝিতে পারিত যে, তাহাদের

সন্তান-সন্ততির উচ্চ-শিক্ষার নিমিত্ত কি চমৎকার প্রণালী প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। নিন্দা ত দূরের কথা, তখন দেশের লোক সহস্র-কণ্ঠে এই নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রসংশা করিত, আমাদের মনে ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। নূতন একটা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিতে হইলেই, প্রথম প্রথম উহার কার্য্যপ্রণালীর বহুল-প্রচার নিতান্তই আবশ্যক। নতুবা, উহার সকল কথা প্রকাশিত হইতে অনেক কাল-বিলম্ব ঘটিয়া থাকে।

আমাদের দেশের ছাত্রবর্গ "জাতীয় শিক্ষা" পাইবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতেছে; সেইজন্য আমি এই প্রবন্ধে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "পোষ্ট-গ্রাজুয়েট" শিক্ষা পদ্ধতিতে, সংস্কৃত বিভাগে, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহাসিক বিভাগে ও আর দুই একটা বিভাগে, কি কি নূতন পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, কেবল তৎ-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। মাসিক-পত্রিকায় এ প্রকার প্রবন্ধে, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট-পদ্ধতির সকল বিভাগের অন্ততঃ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াও সম্ভব নহে।

একটা-ছাত্রকে সংস্কৃত এম্-এ পরীক্ষায় উপাধি লইতে হইলে, কি কি বিষয়ে কি প্রকার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয় এবং এই নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইবার পূর্ব্বেই বা কি করিতে হইত, পাঠক সেইটা পরীক্ষা করিয়া দেখুন। সংস্কৃত সাহিত্য বলিতে একটা বিপুল সাহিত্য বুঝায়। ইহার মধ্যে, নানাপ্রকার বিভাগে বিভক্ত নানা শ্রেণীর শিক্ষনীয় বিষয় আছে। একটা বিভাগ বাদ দিলেই ইহা অসম্পূর্ণ হইয়া উঠে। "পোষ্ট-গ্রাজুয়েট" শিক্ষা-পদ্ধতি, অতীব সাবধানতার সহিত, এই সংস্কৃত-সাহিত্যের বিভাগগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কোন প্রয়োজনীয় বিভাগই উপেক্ষিত হয় নাই। অথচ, পরীক্ষার্থী ছাত্রকে বিভাগের গুরুতর চাপেও নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিবার কোন চেষ্টা করাও হয় নাই।

সংস্কৃতে এম্-এ পরীক্ষার্থীকে আটটা পৃথক্ পৃথক্ প্রশ্ন-পত্রের উত্তর দিতে হইবে। এই আটটা প্রশ্ন-পত্রের মধ্যে চারিটা প্রশ্ন-পত্র সকল পরীক্ষার্থীর পক্ষেই সমান। কিন্তু অপর চারিটী প্রশ্ন-পত্রের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ রচিত করা হইয়াছে। যে বিশেষ বিষয়ে ছাত্র, 'বিশেষ অভিজ্ঞতা' লাভ করিতে ইচ্ছুক, কেবল সেই বিশেষ বিষয়ের জন্যই, এই চারিটী প্রশ্ন-পত্র নির্দ্দেশিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা পরিষ্কার করিতেছি। যে চারিটী প্রশ্ন-পত্র সকল ছাত্রকেই লইতে হইবে, সেই চারিটী প্রশ্নপত্রের মধ্যে—

প্রথম প্রশ্ন-পত্র।—সায়নের টীকাসহ ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক এবং সায়ন-লিখিত ঋগ্বেদের ভূমিকাটী।

দ্বিতীয় প্রশ্ন-পত্র।—সমগ্র পাণিনীয় সিদ্ধান্ত-কৌমুদী ব্যাকরণ।

তৃতীয় প্রশ্ন পত্র।—ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology)। আর্য্য ও প্রাকৃত ভাষার ক্রম-বিকাশ-তত্ত্ব। —এই বিষয়টীতে সাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য প্রায় দশখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অনুমোদিত আছে। তন্মধ্যে "শব্দ-শক্তি-প্রকাশিকা" ও Whitney-সংকলিত সংস্কৃত-ব্যাকরণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

চতুর্থ প্রশ্ন-পত্র।—দুইটা রচনা-লিখন। প্রথমটা "সংস্কৃত-সাহিত্যের" ইতিহাস সম্বন্ধে। দ্বিতীয়টী, যে ছাত্র যে বিশেষ বিষয়ে বিশেষ-শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া অপর চারিখানি প্রশ্নপত্র লইবে, সেই বিশেষ বিষয়টীর ইতিহাস সম্বন্ধে।

সংস্কৃত বিদ্যার্থী মাত্রেরই ব্যাকারণাদি এই চারিটী বিষয়ে সাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকা নিতান্তই আবশ্যক। এই সাধারণ বিষয়ে, ভাষা ও ভাষার ব্যাকরণ এবং ভাষার ইতিহাস—এই হইতেছে

শিক্ষনীয় বিষয়। এই বিষয়ে সকলেই পরিপক্কতা লাভ করিতেই হইবে। তৎপরে যে ছাত্র যে বিষয়টী ভালবাসে, সেই বিষয়টী লইবার সে অধিকারী। এই বিশেষ বিষয়ে নিম্নলিখিত বিভাগ কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে—

(১) সংস্কৃত পদ্য বা কাব্যগ্রন্থগুলি। সংস্কৃত নাটকগুলি। সংস্কৃত গদ্য-গ্রন্থগুলি। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্র ও অলঙ্কার-শাস্ত্র। এই বিভাগটীর প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে সংস্কৃত হইতে ইংরাজী অনুবাদ এবং ইংরাজী হইতে সংস্কৃত অনুবাদ কর্ত্তব্য বলিয়া নিদ্ধারিত আছে।

(২) বেদ। এই বিভাগে নিরুক্তগ্রন্থ, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ, গৃহ্যসূত্র ও উপনিষদ এবং আরণ্যক—এই কয়েকটী শ্রেণী-ভেদ আছে। ইহাতেও অনুবাদ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত।

(৩) মীমাংসা ও স্মৃতি-শাস্ত্র। এই বিভাগে, মীমাংসাগ্রন্থ, ধর্ম্মসূত্র ও সংহিতাগুলি এবং গৃহ্যসূত্র—এই শ্রেণীভেদ আছে।

(৪) বেদান্ত দর্শন।—এই বিভাগে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—উভয়ই সন্নিবেশিত আছে। তদ্ব্যতীত, প্রধান প্রধান উপনিষদ্‌গুলি এবং ভগবদগীতা, প্রভৃতি শ্রেণী-ভেদ আছে।

(৫) সাংখ্যদর্শন।—এই বিভাগে সাংখ্য ও যোগদর্শনের জ্ঞাতব্য গ্রন্থ প্রতিপাদ্যবিষয়, সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ ও যোগবাশিষ্ট গ্রন্থের তত্ত্বগুলি নির্দ্দিষ্ট আছে।

(৬) ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন। এই বিভাগে প্রাচীন ও নব্যন্যায়ের এবং কুসুমাঞ্জলির প্রতিপাদ্যবিষয়ের বিশেষ অভিজ্ঞতা নির্দ্ধারিত আছে।

(৭) সাধারণ দর্শন বিভাগ।—যে সকল ছাত্র সকল দর্শনেরই মোটামোটী ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে চায়, তাহাদের জন্য এই বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে। এই বিভাগে হিন্দুদর্শনের সকল বিষয়ই নির্দ্দিষ্ট আছে। ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, গীতা ও উপনিষদ—এই সকলই স্থান পাইয়াছে।

এই সাতটী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে, যে ছাত্রের যে বিষয়টী ভাল লাগে, যে বিষয়টীতে যে ছাত্র বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন হইতে ইচ্ছা করে,—সেই ছাত্রকে কেবল সেই একটীমাত্র বিষয় লইতে হইবে। কিন্তু এই একটী মাত্র বিষয়ে তাহাকে চারিটী প্রশ্ন পত্রের উত্তর দিতে হইবে। পাঠক দেখিবেন, এই চারিটী প্রশ্ন-পত্রেই ছাত্রটীর সেই বিষয়-বিশেষে বিশেষ-ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাইবার কেমন সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়-গুলিকে সেই ছাত্র ইংরাজী-ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে কিনা, তজ্জন্য অনুবাদের প্রণালীও অবলম্বিত রহিয়াছে। এই প্রকারে সংস্কৃতে, সাধারণ-ভাবে ও বিশেষভাবে ব্যুৎপন্ন করাইবার জন্য, যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা শিক্ষার্থীর পক্ষে কতদূর উপযোগী হইয়াছে, পাঠক তাহার বিচার করিয়া দেখুন।

"পোষ্ট-গ্রাজুয়েট"-বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করিতে পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি। তখন সংস্কৃতে এম্-এ উপাধি-প্রার্থী ছাত্রকে কেবলমাত্র কয়েক খানি পদ্যগ্রন্থ, সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর কারক-সমাস, কয়েকখানি নাটক, দুইখানি অলঙ্কার, পিটার্‌সনের সংকলিত ঋগ্বেদের কয়েকটীমাত্র মন্ত্র এবং মুইরের "সংস্কৃত টেক্‌স্‌ট" হইতে একটী রচনা লিখিলেই, এম্-এ উপাধি প্রদত্ত হইত! সেই শিক্ষাপদ্ধতি হইতে, নব-প্রবর্ত্তিত এই পদ্ধতি কতদূর উৎকৃষ্টতর এবং বিশেষ ব্যুৎপত্তি-জনক, তাহা পাঠক স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন।

এতদ্ব্যতিত, এই বিভাগে, যাহাতে মাসে মাসে এক খানি করিয়া মাসিক-পত্রিকা

বাহির হইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই পত্রিকায়, বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক-গণের চিন্তার ফল-স্বরূপ, নবাবিষ্কৃত তথ্য যাহাতে প্রকাশিত হইতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। এই মাসিক পত্রিকার প্রত্যেক খণ্ডে, অন্ততঃ চারিশত পৃষ্ঠা যাহাতে থাকে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই চারিখানা বৃহৎ গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। এই গ্রন্থে নানাবিষয়ক গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। এই পত্রিকাও ছাত্রবর্গের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে।

যদি কোন অধ্যাপক কোন বিষয়-বিশেষে কোন ভাল গ্রন্থ লিখিতে পারেন, সেই-রূপ গ্রন্থ যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নানা স্থান হইতে বিশেষজ্ঞগণকে আনিয়া, "রীডার" নিযুক্ত করিয়া এবং বক্তৃতা দেওয়াইয়া, উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-রচনা করিয়া লওয়াও হইতেছে।

এই সকল ব্যবস্থার জন্য কত অর্থের প্রয়োজন, পাঠক ভাবিয়া দেখিবেন। কোন প্রাইভেট্ কলেজে, যুগপৎ এতগুলি অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হওয়া কি সম্ভব? অথচ এগুলি না হইলেও, শিক্ষাকার্য্য সুসম্পন্ন ও সর্ব্বাঙ্গ-শুদ্ধ হইতে পারে না।

এই যে আমরা উপরে কেবল এক সংস্কৃত শিক্ষার জন্যই, সাধারণ বিভাগ ব্যতিতও সাতটী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের উল্লেখ করিয়া আসিলাম, ইহাদের মধ্য হইতে কোন একটী বিভাগও বাদ্ দেওয়া যাইতে পারে না। যে কোন একটী বিভাগ বাদ্ গেলেই, শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে। মনে করুন, বেদের বিভাগটী পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু একটী ছাত্র যদি প্রাচীন বেদে অভিজ্ঞতা লাভের আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হয়, তখন বিশ্ব-বিদ্যালয় তাহাকে কি বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেন? কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন? সকল বিভাগ-সম্বন্ধেই এই কথা বলা যাইতে পারে। অথচ, পাঠক আর একটী বিষয় ভাবিয়া দেখুন্। এই সাতটী বিভাগের কোনটাই পরিত্যাগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে, এই বিভাগ-গুলির প্রত্যেকটার জন্যই ত উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ অধ্যাপকের আবশ্যক। পূর্ব্ব-লিখিত প্রবন্ধের একস্থানে আমি দেখাইয়া দিয়াছিলাম যে, প্রতি বিষয়ের জন্য একটী করিয়া প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতির অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং একটী বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রণালীর অভিজ্ঞ ইংরাজী-শিক্ষায় সুশিক্ষিত অধ্যাপক—এই ভাবে অধ্যাপক লওয়া হইয়াছে। কেন এভাবে অধ্যাপক লওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহা প্রথম প্রবন্ধে বিশেষ করিয়া বলিয়া আসিয়াছি। এখানে তাহার আর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেক বিভাগের জন্য যে সংখ্যক অধ্যাপকের প্রয়োজন, তদপেক্ষা বর্ত্তমানে অধ্যাপকের সংখ্যা কমই রহিয়াছে। একজন অধ্যাপককে দিয়া, তিন চারিটী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত নানা শ্রেণীর গ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অর্থের তাদৃশ স্বচ্ছলতা নাই বলিয়াই, এইরূপ করা হইতেছে। কিন্তু তথাপি, গতবর্ষে এরূপ সমালোচনা উঠিয়াছিল যে, গুটীকতক ছাত্রের জন্য অসংখ্য অধ্যাপক লওয়া হইয়াছে! ভিতরে প্রবেশ করিয়া, সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া, তবে সমালোচনা করিতে হয়। না জানিয়া শুনিয়া, বাহির হইতে এ প্রকার আলোচনা করা নিতান্তই অসঙ্গত।

যে সকল বিভাগে, নানা শ্রেণীর বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, সেই সকল বিষয়ে

অধ্যাপকগণ যে সকল lecture দিবেন, সেই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া, প্রত্যেক বিভাগে ইতিমধ্যেই গ্রন্থ (syllabus) রচিত হইয়া মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে এবং ছাত্রবর্গের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তিকার মধ্যে সন্নিবিষ্ট বিষয়-গুলি সংক্ষিপ্ত হইলেও, একত্র একসঙ্গে গ্রথিত থাকায় ছাত্রবর্গের পক্ষে, তত্তদ্বিষয়ের একটী একটী বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকায়, বিষয়-বিশেষ গ্রহণ করিবার পক্ষে, কত সুবিধা হইয়াছে। কোন প্রাইভেট্ কলেজে এ প্রকার গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়া কি সম্ভব হইত? বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের ছাপাখানা থাকায়, এই কার্য্য এত সহজ-সাধ্য হইতে পারিয়াছে। এই সকল syllabus-গ্রন্থ, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগেরও উপকার সাধন করিতেছে। অনেকে ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন। পাঠকবর্গ নিজে যদি এই পুস্তিকার একখানাও দেখেন, তবে এগুলির উপযোগিতা * বুঝিতে পারিবেন।

এই সম্পর্কে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত গ্রন্থ-সমূহের লাইব্রেরীর কথাও উল্লেখ-যোগ্য। কত অর্থ ব্যয় করিয়া, এই পোষ্ট-গ্রাজুয়েট-বিভাগে নানা বিষয়ের কত অমূল্য গ্রন্থ-রত্ন সংগ্রহ করা হইয়াছে। অপর কোন প্রাইভেট্ কলেজে বা 'জাতীয় বিদ্যালয়ে' এত গ্রন্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইত না। এই বিভাগের ছাত্রবর্গ অনায়াসে, যখন যাহা আবশ্যক, তাদৃশ গ্রন্থ লইয়া, জ্ঞানার্জ্জন করিবার কত সুবিধা পাইতেছে। স্বদেশ-নিষ্ঠ, স্বজাতি-প্রেমিক সার্ আশুতোষের অসাধারণ চিন্তাশক্তির প্রভাবে এবং বিশেষ একনিষ্ঠ উদ্যোগে, এই "পোষ্ট-গ্রাজুয়েট" শিক্ষা-পদ্ধতি সংস্থাপিত হইয়া, বাঙ্গলার ছাত্রবর্গের প্রভূত কল্যাণ-সাধন করিতেছে। এই সকল ভিতরের কোন তথ্য না জানার জন্যই, লোকে এই বিভাগের নিন্দা করিতে অগ্রসর হয়।

আমি এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র সংস্কৃত-শিক্ষার বিভাগে কি কি প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহারই একটু সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদান করিলাম। ইহাতেই প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘ হইয়া পড়িল। ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক বিভাগের কথা ও অন্যান্য অসংখ্য প্রয়োজনীয় বিভাগের কথা এই প্রবন্ধে কিছুই বলিতে পারিলাম না। প্রত্যেক বিভাগেই, সংস্কৃত-বিভাগের অনুরূপ, সাধারণ ও বিশেষ—এই দুইটী অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাধারণ-অংশের জন্য চারিটী ও বিশেষ-অংশের জন্য চারিটী—সর্ব্বশুদ্ধ এই আটটী প্রশ্ন-পত্রের উত্তর দেওয়া, প্রত্যেক বিভাগস্থ ছাত্রের পক্ষে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। শিক্ষাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সর্ব্বতোমুখী করিবার উদ্দেশ্যে যত্নের কোন ত্রুটি করা হয় নাই। ভারতের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ প্রকারে বিষয়-সন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয় না। বারাণসীস্থ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও এতাদৃশ সর্ব্বাঙ্গ-পূর্ণ ব্যবস্থা অদ্যাপি অবলম্বিত হয় নাই।

দেশে জমীদার এবং অর্থশালী ব্যক্তির অভাব নাই। যাঁহারা একটা নিস্ফল মিছিলে

* মৎপ্রণীত 'Outlines of the Vedanta Philosophy as set forth by Sankara' পুস্তিকায় শঙ্কর-মতের একত্রনিবদ্ধ সমুদয় তত্ত্বই গ্রথিত আছে। ছাত্রেরা বলিয়াছে শঙ্করের বিপ্রকীর্ণ মতগুলি একত্র পাইবার জন্য, এ পুস্তিকা উপকারে আসিয়াছে।

তিন ঘণ্টায় চল্লিশ হাজার মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, এরূপ জমীদারের বঙ্গদেশে ত অভাব নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বাঙ্গলার ছাত্রবর্গের উচ্চশিক্ষার জন্য এই যে অশেষ কল্যাণকারিনী প্রণালী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত হইয়াছে, ইহার সাহায্যের জন্য, ইহার উন্নতির জন্য, কয়টী অর্থশালী ব্যক্তি অগ্রসর হইয়াছেন? হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্রে পারদর্শী ছাত্রের জন্য, বৃত্তি বা মেডেল কয়টী প্রদত্ত হইয়াছে? ইউরোপ হইলে, মধ্যবিত্ত গৃহস্থবর্গ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কতপ্রকারে আর্থিক সাহায্য করিয়া, প্রতিষ্ঠাতৃগণের ও ছাত্রগণের কত উৎসাহবর্দ্ধন করিতেন! কিন্তু বাঙ্গলাদেশের গৃহের দ্বারে এত বড় একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কত চিন্তার ফলে, কত ক্লেশের বিনিময়ে, কত হিতেচ্ছার প্রেরণায়, কত বিঘ্নের অপনোদনে রচিত হইয়াছে; কিন্তু কয়জন ইহাতে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন? সাহায্য * ত দূরের কথা; ভিতরের কোন খবর না জানিয়া, গত বৎসর, এই প্রতিষ্ঠানটীকে লোক-চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশে, সভা আহ্বান করিয়া বৃথা-নিন্দা ঘোষণা করা হইল? এখনও কোন কোন সংবাদ-পত্রে দোষ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে? হায় রে দেশ! যদি-ই বা দুই-একটা অবান্তর অন্য-সংঘটিত দোষ বা ত্রুটি লক্ষিত-ই হয়, সেই ত্রুটিকেই কি, 'তিলকে তাল করার মত', অমন করিয়া গাইয়া বেড়াইতে হয়? ইহাই কি সংশোধনের নীতি? ইহাই কি হিতেচ্ছার প্রেরণা? যিনি কত শ্রম-স্বীকার করিয়া, কত বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া, এই শিক্ষা-পদ্ধতিটীকে ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিতে এত যত্ন করিতেছেন, সেই মহাপুরুষ সার্ আশুতোষকে কি অমন করিয়া অবমাননার উদ্‌যোগ করিতে হয়?

এই প্রবন্ধে, science-বিভাগের কোন কথা আমি বলিতে পারিলাম না। কেবল, arts-বিভাগের একটামাত্র বিষয়ের বিবরণ দিয়াছি। ইহা হইতেই পাঠক কার্য্যের নূতনত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন, আশা করি। এ হেন বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া, দেশে ইহার সমকক্ষ আর কোথায় কোন্ শিক্ষা-পদ্ধতি আছে, যাহাতে আপনারা আপনাদিগের সন্তান-সন্ততিকে সুশিক্ষিত করিতে পারিবেন? তাই বলিতেছিলাম যে, বাঙ্গলার ছাত্রবর্গের পক্ষে, এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করা আত্ম-হত্যার ন্যায় পাপ-জনক হইবে!

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

---

* বেদান্ত-সম্বন্ধে lecture দিবার জন্য ও গ্রন্থ রচনার জন্য, কয়েকবৎসর পূর্ব্বে "শ্রীগোপাল বসু-মল্লিক" নামধেয় একটা Lecturerএর ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাহার ফল-স্বরূপ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত চারিখণ্ড নানাবিষয় প্রতিপাদক বৈদান্তিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ হাইকোর্টে মোকদ্দমা করিয়া এই সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বেদান্তের নূতন গ্রন্থ প্রকাশের আশাও বন্ধ হইয়া গেল। হায় রে দেশ!

আমরা কি চাই ?

[স্বরাজ বনাম স্ব-সংকল্প বা Self-determination]

প্রশ্নটা আপাতত একটু অদ্ভুত শোনায়। বহুদিন হইতেই আমরা একটা কিছুর জন্য চীৎকার করিয়া আসিতেছি। আর সে কিছুটা যে কি, তাহাও বারম্বার শুনিয়াছি ও বলিয়াছি। এত দিন পরে আবার এ কথা তোলা কেন ?

বাল্যকালে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, পড়িয়াছিলাম—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে।
দাসত্ব শৃঙ্খল কেবা সাধে পরে পায় রে॥

পয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, এই কলিকাতা সহরে, সতীর্থদিগের সঙ্গে দল বাঁধিয়া গাহিতাম—

কত কাল পরে, বল ভারত রে,
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে।

বৈঠকে বৈঠকে আবৃত্তি করিতাম—

চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

এইটাকে গদ্যে-পদ্যে, গানে-ছন্দে, জ্ঞানে-ধ্যানে অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া ত এই বস্তু—এই স্বাধীনতাই-চাহিয়া আসিয়াছি ; সংবাদ-পত্রে, বক্তৃতা-মঞ্চে, সভা সমিতিতে, দেশে বিদেশে এই দীর্ঘকাল এই বস্তুর সাধনাইত করিয়া আসিয়াছি ; এত দিন পরে, আজ—"আমরা কি চাই ?"—এ প্রশ্ন আবার তোলা কেন ?

তুলিতে হইল এইজন্য যে, এতাবৎকাল, আমরা কেবল কথাই কহিয়া আসিয়াছি, কথাই শুনিয়া আসিয়াছি, শব্দেরই আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিয়াছি ; বস্তু-নির্ণয়ের চেষ্টা করি নাই। ইহাতে দোষেরও কিছু নাই। কারণ, সাধনের প্রথমে, শোনাই চাই। সাধনের সূচনা, শ্রবণে। আর বাক্যই শ্রবণের বিষয়।

আর এই বাক্য যেমন বস্তুকে নির্দ্দেশ করে, সেইরূপ ভাবেরও ব্যঞ্জনা করিয়া থাকে। আমরা এতকাল যে কথা কহিয়া আসিয়াছি, তাহা প্রায়ই কেবল আমাদের ভাবের ব্যঞ্জনামাত্র করিয়াছে ; প্রকৃত বস্তু-নির্দ্দেশ করে নাই। এইজন্য আমরা এপর্য্যন্ত ভাবের স্রোতেই বেশিটা ভাসিয়া আসিয়াছি ; বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া, বস্তুকে এখনও অনুভবেতেও আঁকড়াইয়া ধরিতে পারি নাই।

এই ভাবও আমাদের অনেকটা অভাব-মূলক ছিল। দুনিয়ার অনেকের যা' আছে, আমাদের তাহা নাই—এই ভাবটাই আমাদিগকে এপর্য্যন্ত চালাইয়া আনিয়াছে।

চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
ভারত শুধুই ঘুমা'য়ে রয়—

এই যে অভাব-বোধ, ইহাই এপর্য্যন্ত আমাদের ভাবের প্রেরণা হইয়াছিল। তারা স্বাধীন, আমরা স্বাধীন নই, এই যে অবমান-বোধ—ইহা হইতেই আমাদের দেশহিতৈষার প্রেরণা আসিয়াছিল। চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, আমরা এইজন্য, ইংরাজের মতন, মার্কিণীয়দের মতন, ফরাশীয়দের মতন হইতে চাহিয়াছিলাম। বিলাতে যে ভাবের স্বাধীনতা আছে, আমরাও সেইরূপ স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমরা এই স্বাধীনতারই সাধনা করিতেছিলাম।

পনর বৎসর পূর্ব্বে, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কন্‌গ্রেসে, ৺দাদাভাই নওরজী মহাশয় যখন "স্বরাজের" কথা প্রথম কহেন,—"স্বরাজই" ভারতের জাতীয় মহাসমিতির সাধ্য ও লক্ষ্য, এই বাণী প্রচার করিলেন,—তখন তিনিও "স্বরাজ" বলিতে এই বস্তুটাই বুঝিয়াছিলেন। তিনি কহেন, ভারতের জাতীয় মহাসমিতির সাধ্য—

Self-government, as in the United Kingdom or the Colonies, in one word,—Swaraj.

সেদিন হইতে, এই পনর বৎসর ধরিয়া, আমরা সকলে এই "স্বরাজ" কথাটারই আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিয়াছি। আর আমাদের কথাবার্ত্তায় এপর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, আমরা অনেকেই এখনও এই কল্পনা করিতেছি যে, ইংরাজ-রাজ চলিয়া গেলেই, আমাদের স্বরাজ-লাভ হইবে। অর্থাৎ, ইংরাজ-রাজের অভাবটাই এখনও আমাদের অনেকের নিকটে "স্বরাজ" বলিয়া গৃহীত হইতেছে।

কথাটা আমার কল্পনা নয়। কন্‌গ্রেসের নূতন নিয়মাবলীতে "ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠাই কন্‌গ্রেসের লক্ষ্য," ইহা বলা হইয়াছে। নাগপুরে যখন এই নিয়মের আলোচনা হয়, তখন আমরা কেহ কেহ এই "স্বরাজ" শব্দটাকে "গণ-তন্ত্র" বা democratic-বিশেষণ দিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহিয়াছিলাম। এই বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইয়া, একটি বন্ধু বলেন—"রণজিৎ সিংহের মতন কোনও বীরপুরুষ যদি আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া, দেশকে উদ্ধার করেন, তাহা হইলে আমরা কি তাঁহাকে আমাদের স্বরাজের অধিনায়ক বলিয়া বরণ করিয়া লইব না?' সুতরাং, "স্বরাজ" যে গণ-তন্ত্রই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। ভারতের "স্বরাজ" রাজ-তন্ত্র হইতে পারে, আত্ম-তন্ত্র হইতে পারে, প্রজা-তন্ত্র হইতে পারে। যা' হবার তা' হ'বে, আগে হইতে আমরা এই স্বরাজকে কোনও নির্দ্দিষ্ট আকার বা আয়তন দিতে যাই কেন?"

এই সে-দিন বরিশালে, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দা'স মহাশয়ও এই কথাই কহিয়াছেন—

"স্বরাজ মানে কি? অনেকে বলেন, এই স্বরাজ democratic (গণ-তন্ত্র মূলক) স্বরাজ। কিন্তু যখনই আমরা এই স্বরাজকে একটা বিশেষণ দিয়ে বর্ণনা করিতে যাই, তখনই আর স্বরাজ থাকে না। স্বরাজ—স্বরাজ। ইহা আবার democratic, autocratic কি?........স্বরাজ democratic, কি monarchical, কি republic, কোনটাই মোটেই নয়।........ইংরাজ বলে—right of self-determination। কিন্তু আমাদের বেলায়, এই self-determinationএর অধিকার স্বীকার করে না। যেদিন আমরা আমাদের এই অধিকার উপলব্ধি করব, সেইদিনই আমাদের স্বরাজ লাভ হবে।"—জনশক্তি, ১৩ই বৈশাখ, ২পৃষ্ঠা।

৺দাদাভাই নাওরজী স্বরাজ বলিতে self-government as in the United Kingdom or the Colonies, বুঝিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন বাবু এখন স্বরাজ বলিতে, মনে

হয়, উইলসন সাহেবের self-determination বুঝেন। দাদাভাই নাওরজীর আদর্শ গ্রহণ করি বা না করি, কথাটা বুঝিতে পারি। স্বরাজের ঐরূপ একটা অর্থ হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু বাক্যের সঙ্গে অর্থের যদি কোনও নিত্য সম্বন্ধ থাকে—

বাগর্থামিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে

মহাকবির এই উক্তির যদি কোনও সার্থকতা থাকে, তাহা হইলে, স্বরাজ যে কি করিয়া self-determination বুঝায়, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা, অন্ততঃ আমার মত লোকের পক্ষে, অসাধ্য।

স্ব এবং রাজ এই দুইটি কথার যোগে "স্বরাজ" শব্দের উৎপত্তি। 'স্ব'র একটা অর্থ আছে। ইংরাজিতে এই 'স্ব'কে self বলা যায়। 'স্ব' অর্থ আমি, নিজে, আত্মা। Self অর্থও তাই। কিন্তু "রাজ" শব্দের অর্থ কি করিয়া determination হয়, এপর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। হয় না, বা হইতে পারে না, এমন কথা বলার সাহস আমার নাই। পণ্ডিতেরা সব করিতে পারেন। বিশেষতঃ এমন কোনও শব্দ বা ধ্বনি নাই, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও শব্দকোষের সাহায্যে যাহার একটা অর্থ করা যায় না।

যৌবনে এরূপ গল্প মাঝে মাঝে শুনিয়াছি। একজন পাদ্রি-সাহেব একবার শ্রীকৃষ্ণকে rascal বলিয়াছিলেন। দেবতার অবমাননা করিতেছেন বলিয়া, ইহার প্রতিবাদ হইলে, তিনি তাঁর স্কুলের পণ্ডিতের শরণাপন্ন হন। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, আপনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বচ্ছন্দে "রাসকেল" কহিতে পারেন। সংস্কৃতে "রাস কেল" শব্দে কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়; রাসে যিনি কেলী করেন, তিনিইত শ্রীকৃষ্ণ।

এইরূপে পাদ্রিরা যিশুখৃষ্টকে একবারে নারায়ণ বলিতে আরম্ভ করেন। একটি ইংরাজ মহিলা ৺ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে একথা বলেন। শাস্ত্রী মহাশয় শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মহিলাটি কহিলেন, 'আপনি উপহাস কচ্ছেন কেন ? নরের সমষ্টি নার, এই নারের অয়ন বা আশ্রয় যিনি তিনিইত নারায়ণ। আমাদের যিশু ত তাহাই।' শাস্ত্রী মহাশয় কহিলেন,—'আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণের এমনি অদ্ভুত শক্তি আছে যে, আমরা তাহার দ্বারা দুনিয়ার সকল শব্দেরই একটা অর্থ করিয়া লইতে পারি।' মহিলাটি কহিলেন,—'আমার নামের একটা সংস্কৃত অর্থ করতে পারেন ?' শাস্ত্রী মহাশয় কহিলেন,—'পারি বই কি! আপনার নাম বলুন্। এমি বারবারা; এমি অর্থ যাইতেছি; বারবারা অর্থ জল খাবার শ্রেষ্ঠ আশ্রয় বা উপাদান।' মহিলাটি হো, হো, করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—'তবে আপনাদের সংস্কৃতে আমাকে একটা জলবরী করে। শাস্ত্রী মহাশয়—'আমাদের ব্যাকরণ সব করতে পারে।'

সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্যে স্বরাজ শব্দ যে self-determination হইতে কখনও পারে না, অমন কথা কহিবার আমার সাহস নাই। কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিন হইতে, এই ১৯২১ সালের মার্চ্চ মাসের শেষে বরিশালে যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কেবল আমি নই, কিন্তু এদেশে যখন যিনি এই স্বরাজ কথা ব্যবহার করিয়াছেন, বা ইহা লইয়া যুক্তি বিচার, আন্দোলন আলোচনা করিয়াছেন, তাঁরা সকলে স্বরাজের যে অর্থ এতাবৎ

কাল করিয়াছেন, তাহা যে এই self-determination নয়, একথা সাহস করিয়াই বলিতে পারা যায়।

আর আজ যে চিত্তরঞ্জন বাবু স্বরাজের এই নূতন অর্থ করিলেন, ইহা দ্বারাই বুঝা যায় যে, এতকাল আমরা কেবল স্বরাজ শব্দেরই কথা শুনিয়া ও কহিয়া আসিয়াছি ; ইহা যে কি বস্তু, তাহা অনুভবে প্রত্যক্ষ করি নাই। যে শব্দের বস্তুজ্ঞান আছে, তাহার একটা অভিনব অর্থ হঠাৎ কেহ করিতে যায় না।

স্বরাজের অর্থ যদি সত্যই self-determination হয়, তাহা হইলেও একটা গোল উঠে। উইলসন সাহেব, এই গত জার্ম্মান যুদ্ধের মাঝখানে, এই কথাটা প্রচার করেন। আমরা ত তার পূর্ব্বে এ প্রসঙ্গে একথা শুনি নাই এবং কখনও প্রয়োগ করি নাই। এই self-determination কথাটাতে যে অর্থ জ্ঞাপন করে, সে অর্থবোধও ত ইহার পূর্ব্বে আমাদের হয় নাই। সে ভাব ত আমাদের অন্তরে ইহার পূর্ব্বে জাগে নাই। ভাব জাগিলে, তাহার ভাষাও থাকিত। আমাদের নিজেদের ভাষা থাকিলে, আজ চিত্ত বাবুকেও ত এই ইংরাজি কথাটা লইয়া মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইতে না। কিন্তু এই self-determination কথা প্রচারিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই আমরা "স্বরাজ" শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। তখন আমরা "স্বরাজ" বলিতে কি এই অজ্ঞাত-অর্থ, অশ্রুত-ধ্বনি, self-determination শব্দই বুঝিতাম ? আর তখন যদি দেশের জনসাধারণে স্বরাজ বলিতে একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থের ব্যঞ্জনা বুঝিতেন, তাহা হইলে আজ চিত্ত বাবুর পক্ষে এরূপভাবে "স্বরাজ—স্বরাজ," "স্বরাজ,—self-determination" এসকল কথা বলার কোনই অবসর থাকিত না। চিত্ত বাবু নিজেই কহিয়াছেন—

> আমরা কেবল গত তিন-চার মাস যাবৎ স্বরাজের কথা বলছি না। আমরা অনেক দিন যাবৎই বঙ্গদেশে স্বরাজের কথা বলছি—স্বরাজ চেয়ে আসছি। বঙ্গদেশে স্বরাজের কথা নূতন নহে। কিন্তু কথাটির সারমর্ম্ম আমরা এখন পর্য্যন্ত সকলে গ্রহণ করতে পারি নাই।"

কিন্তু আমরা কি ইহার কোনও মর্ম্মই বুঝি নাই ? ৺দাদাভাই ইহার কি অর্থ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এই পনর বৎসর কালই শুনিয়া আসিয়াছি। ইংরাজের নিজের দেশে কিম্বা ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহে যে প্রণালীর শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, দাদাভাই তাহাকেই স্বরাজ বলিয়াছিলেন। আমাদের মধ্যে একদল লোক তখনই এই ঔপনিবেশিক বা colonial আত্ম-শাসনের আদর্শ প্রকাশ্যভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া, স্বরাজের অন্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। দাদাভাইএর ব্যাখ্যাতে একটু গোলও ছিল। যে আকারের আত্ম-শাসন বা self-government ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেও তিনি স্বরাজ কহিয়াছিলেন। আবার, ইংরাজের উপনিবেশে—অর্থাৎ ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, বা দক্ষিণ আফ্রিকায়—যে শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেও তিনি এই স্বরাজেরই রূপ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু উপনিবেশ সমূহ, কাজে না হউক, অন্ততঃ লেখাপড়ায়, আইন-কানুনে, ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। পনর বৎসর পূর্ব্বে, অন্ততঃ এ সকল উপনিবেশের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয় নাই। আজ তারা একরূপ ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে ; ইংরাজ আজ তাহাদিগকে আপনার মন্ত্রী-

সমাজে ডাকিয়া আনিয়া, সাম্রাজ্য-নীতির পরিচালনায়, নিজের মন্ত্রীদিগের সমান আসন দিয়াছেন। পনর বৎসর পূর্ব্বে ইহা হয় নাই। সুতরাং, এই ঔপনিবেশিক বা colonial-শাসনকে, ঠিক স্ব-রাজ বলা যাইত না। তারপর, এ সকল উপনিবেশের লোকেরা ইংরাজের স-গোত্র, স-বর্ণ। ইহাদের সঙ্গে ইংরাজ যে ভাবে যতটা সম্মিলিত হইয়া, এক যোগে সাম্রাজ্য-শাসন করিতে পারে, ভিন্ন গোত্রের, ভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ও অনেক সময় পরস্পর বিরোধী যাহাদের স্বার্থ ও সাধনা, তাহাদিগকে সেরূপভাবে আপনার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারে না। এ সকল কারণে, আমাদের মধ্যে একদল লোকে, ৺দাদাভাই নাওরোজীর এই স্বরাজের ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

ইহাঁরা স্বরাজ বলিতে, ভারতের নিজের রাজ, অর্থাৎ ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই বুঝিয়াছিলেন। এই বিষয়ে লোকের মনে বিশেষ গোল ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তখনও ইহাঁরা স্বরাজের চারিটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—

প্রথম—দেশের লোকে নিজেরা দেশের শাসন-সংরক্ষণের জন্য প্রতি বৎসর কত পরিমাণ রাজস্বের প্রয়োজন, ইহা ঠিক করিবে; এবং কিরূপে এই রাজস্ব ব্যয় হইবে, ইহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

দ্বিতীয়—দেশের লোকে নিজেরা দেশের আইন-কানুন বিধিবদ্ধ করিবে।

তৃতীয়—দেশের লোকে নিজেরা এই সকল আইন-কানুন অনুযায়ী দেশের শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও তত্ত্বাবধান করিবে।

চতুর্থ—দেশের লোকে নিজেরা দেশের শান্তির ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

এ সকল বিষয়ে অন্য কোনও দেশের লোকের কোনও হাত বা অধিকার থাকিবে না।

পনর বৎসর পূর্ব্বে, স্বরাজ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে সকল আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হয়, তাহা হইতে, স্বরাজের এই কয়টা লক্ষণ পাওয়া যায়। আর এ সম্বন্ধে ৺দাদাভাই স্বরাজের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে এই অর্থের কোনও বিরোধ বা অসঙ্গতিও ছিল না। কারণ, বিলাতে যে আত্ম-শাসন বা self-government প্রতিষ্ঠিত, আর ইংরাজের উপনিবেশ সমূহে যে প্রকারের শাসন-ব্যবস্থা আছে, এই উভয় ক্ষেত্রেই, আত্ম-শাসনের এই চারিটি মুখ্য অঙ্গ পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়াছে।

অতএব, স্বরাজ বলিতে আমরা এতাবৎকাল আর যাহাই বুঝি না কেন—কথাটির সারমর্ম্ম আমরা গ্রহণ করিতে পারি বা না পারি—ইহা ঠিক যে, স্বরাজ যে self-determination, চিত্ত বাবুর বরিশালের বক্তৃতার পূর্ব্বে, এ অর্থ এদেশে আর কেহ করেন নাই।

এ পর্য্যন্ত স্বরাজ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র একটা বিষয়েই গোল ছিল,—নিজেদের মনেও ছিল, পরস্পরের মধ্যেও ছিল। সে বিষয়টি—ভারতের স্বরাজ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, না বহির্ভূত হইবে? একদল বলিতেছিলেন, ইহা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। আর একপক্ষ বলিতেছিলেন, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য ত পররাষ্ট্র, অপরের রাজ্য, অন্যের, ব্রিটিশের আয়ত্তাধীনে। পরের আয়ত্তাধীনে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হয়, কিরূপে? ভারতের আত্ম-শাসনে বা স্বরাজে, ভারতের নিজের অধিকার কোন্‌খানে গিয়া ঠেকিবে, আর কোন্ খানেই ইংরাজ-রাজের অধিকার আসিয়া বসিবে? পনর বৎসর পূর্ব্বে, এ সকল তর্ক উঠে; মীমাংসার পথ ভাল করিয়া দেখা যায় নাই। কিন্তু মোটের উপরে, দেশের মধ্যে যাহারা এ সকল বিষয়ের

বিচার-আলোচনা করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই স্বরাজ বলিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বুঝিয়াছিলেন। এই স্বাধীনতার সঙ্গে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সম্বন্ধ কতটা, কিরূপ দাঁড়াইবে,—সম্বন্ধ আদৌ থাকিবে কি না,—এ কথার মীমাংসা করিবার কোনও চেষ্টাই হয় নাই। আর এই পনর বৎসর পরে, আমরা আজও যে এ বিষয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা করিতে পারিয়াছি, এমন বলা যায় না। কারণ, এই সে-দিন, নাগপুরে যখন কন্‌গ্রেসের বৈঠক হয়, তখনও মহাত্মা গান্ধি পর্য্যন্ত একজন ইংরাজ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন যে, হয় আমরা ইংরাজের কল্যাণে স্বরাজ-পাইব, না হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে এই স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে—"Either through the good offices (কল্যাণে) of the British, or outside the British Empire."

Self-determination কথাটারই বা ইতিহাস কি ? জর্ম্মাণ-যুদ্ধে যোগ দিবার সময়, যুদ্ধের শেষে, যুযুৎসু রাষ্ট্রশক্তি সকলের অধীনে যে সকল পররাষ্ট্র বা অধীন জাতি ছিল, তাহাদের ভবিষ্যৎ শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা কিরূপে হইবে, ইহার মীমাংসার সূত্র বা নীতি স্বরূপেই উইলসন সাহেব এই self-determination কথাটা তুলেন। Self মানে, স্ব বা নিজে ; আর determination অর্থ সংকল্প। এই নীতির অর্থ, এই যে, এ সকল পরাধীন বা পররাষ্ট্রান্তর্গত জাতি, যুদ্ধের অবসানে, আত্ম-সংকল্পের দ্বারা, ভবিষ্যতে তাহারা কিরূপ শাসনাধীনে বাস করিবে, ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আর্ম্মেনীয়ার কথা বলা যাইতে পারে। জর্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বে, আর্ম্মেনীয়া তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অধীনে ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুদ্ধের পরে, আর্ম্মেনীরা তুর্কীর অধীনেই থাকিবে, না, ইংরাজের বা ফরাসীদের বা অন্য কাহারো শাসনাধীনে যাইবে, কিম্বা নিজে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইয়া নিজের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লইবে, আর্ম্মেনীয়ার অধিবাসীরা নিজেরাই ইহা ঠিক করিয়া লইবে। তাহারা নিজেরা এ বিষয়ে যে সংকল্প বা determine করিবে, তাহাই অপর সকলকে মানিয়া লইতে হইবে। উইলসন সাহেবের 'self-determination'এর অর্থ ইহাই।

আর উইলসন যে অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, সে-অর্থে এই self-determination বা আত্ম-সংকল্পকে "স্বরাজ" বলা যায় কি ? জর্ম্মান-যুদ্ধের সময় আর্ম্মেনীয়ার স্বরাজ ছিল না। কারণ, আর্ম্মেনীয়া তখন পরকীয়া রাষ্ট্র-শক্তির অধীনে ছিল। আর এই যুদ্ধের পরেও, আর্ম্মেনীয়া যদি নিজের ইচ্ছায় তুর্কীর অধীনেই থাকিতে চাহিত, কিম্বা ইংরাজের বা ফরাসীদের শাসনাধীনে নিজকে স্বেচ্ছায় স্থাপন করিত,—তাহা হইলে সে self-determination'এর অধিকারটা জাহির করিত বটে ; কিন্তু স্বরাজ-লাভ করিয়াছে, এমন কথা কেহ কহিত কি ?

চিত্ত বাবু এ কথাটা যে জানেন না, বা বুঝেন না, বা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এমন নয়। কারণ তিনি স্পষ্টই কহিয়াছেন—স্বরাজ আবার democratic, autocratic কি ? স্বরাজ democratic, কি monarchical, কি republic, মোটেই নয়। অর্থাৎ, স্বরাজ democratic'ও হ'তে পারে, monarchical'ও হ'তে পারে, republic'ও হ'তে পারে। দেশের

লোকে যা ইচ্ছা করবে, তাই হবে; আর তাই স্বরাজ। সুতরাং, আর্মেনীয়া যদি স্বেচ্ছায় তুর্কীর বা আর কারো শাসন-শৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া লইত, তাহা হইলে চিত্ত বাবুর অভিধানে, সেই বন্ধনকেই মুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইত।

দেশের লোকে যা' ইচ্ছা করবে, তাই হওয়া তাহাদের জন্ম-গত-স্বাধীনতা-সঙ্গত, ইহা সত্য। আর-এই স্বাধীনতার উপরে হাত দিবার অধিকার কাহারও নাই, এ কথাও মাথা পাতিয়া মানিয়া লই। কিন্তু, দেশের লোকে যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনার পায়ে বা গলায়, আপনার হাতে, মৃত্যুর শৃঙ্খল আঁটিয়া দেয়—তাহাকে কি জীবনের পথ বলিব, না মৃত্যুর পথই বলিব?

শ্রেয় আর প্রেয়, যাহা কল্যাণকর আর যাহা প্রীতিকর, এই দুই-ই জীবের সম্মুখে আছে। জীব স্বাধীন। স্বেচ্ছায় সে শ্রেয়কেও অবলম্বন করিতে পারে, প্রেয়কেও অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু, এই স্বাধীনতা আছে বলিয়া, জীব যখন স্বেচ্ছায় শ্রেয়কে বর্জ্জন করিয়া, প্রেয়কে অবলম্বন করে, তখন সেই স্বেচ্ছাবলম্বিত প্রেয় কখনও শ্রেয় হইয়া যায় না। জীবের আত্ম-সংকল্প বা self-determination প্রয়োগের পূর্ব্বে যেমন, পরেও সেইরূপ; সে অবলম্বন করুক আর নাই করুক, শ্রেয় শ্রেয়ই থাকিয়া যায়, প্রেয় প্রেয়ই থাকিয়া যায়।

দেশের লোকে যাহা চাহিবে, তাহাই হইবে—তাহাই হওয়া স্বাধীনতার মূলনীতি-সঙ্গত। কিন্তু তাই বলিয়া, দেশের লোকে যদি ইংরাজ-রাজের অধীনেই চিরদিন বাস করিতে চাহে, তাহা যে ভারতের স্বরাজ হইবে, স্বরাজ-শব্দের উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি, পুরাতন ব্যবহার ও ইতিহাস—এ সকলকে একান্ত নির্ম্মূল না করিলে, এমন কথা বলা যায় কি?

চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যদি এই বাঙ্গালা দেশের জনসাধারণকে ডাকিয়া, তাঁহারা ইংরাজ-রাজের অধীনে থাকিতে চান কি না, এই প্রশ্ন করা যাইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহারা তখন প্রায় একবাক্যে কহিতেন,—'হাঁ, ইংরাজ-রাজ্যেই আমরা থাকিতে চাই—কোম্পানী বাহাদুরের জয় হউক।' সে অবস্থায় এই বর্ত্তমান ইংরাজ-শাসনই ত বাঙ্গালার আত্ম-সংকল্পের বা self-determinationএর উপরে প্রতিষ্ঠিত হইত। তখন কি ইংরাজ-রাজই বাঙ্গলার স্বরাজ হইত?

এই যে দেড় বৎসর পূর্ব্বে, অমৃতসরের কন্‌গ্রেসে, গান্ধি মহারাজ ভারত-শাসনের নূতন সংস্কার যাহাতে আপনার ঈপ্সীত লক্ষ্য-লাভ করে, তাহার জন্য ইংরাজ আমলা-তন্ত্রের সঙ্গে সাহচর্য্য করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন; এই বিষয়ে যাহাতে কন্‌গ্রেস, ইংরাজকে loyal co-operation অর্পণ করে, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং কন্‌গ্রেস তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে নারাজ হইলে, তিনি আর একটা কর্ম্মক্ষেত্র (another platform) অন্বেষণ করিবেন, এই ভয় দেখাইয়াছিলেন; কন্‌গ্রেস যদি গান্ধি মহারাজের মতই গ্রহণ করিত, তাহা হইলে, "মণ্টেগু-মাকালই" কি ভারতের "স্বরাজ" হইয়া যাইত? সে-অবস্থায় এইমাত্র বুঝা যাইত যে, কন্‌গ্রেস বর্ত্তমান ব্রিটিশ-রাজের অধীনে থাকিতেই রাজী আছে। কিন্তু, কোনও জাতি, অন্য জাতির শাসন-সংরক্ষণাধীনে থাকিতে রাজী হইলেই, পরাধীনতা স্বাধীনতা হইয়া যায় না।

আপাতত মনে হয়, দেশের অনেক লোক বর্ত্তমান শাসনাধীনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আজ যদি ইংরাজ, দেশের সাধারণ প্রকৃতি-পুঞ্জকে সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া, গ্রামে গ্রামে

সভা ডাকিয়া বলেন—"তোমরা বড় দুঃখে আছ, জানি। তোমাদের পেটে অন্ন নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই। তোমাদের গ্রামে বৎসরে ছয় মাস ঠাণ্ডা, পরিষ্কার জল মিলে না। গ্রামান্তরে যাইবার পথঘাট নাই। রোগে তোমরা ঔষধ পাও না, রোগও তোমাদের ছাড়ে না। আমাদের কর্ম্মচারীরা তোমাদের উপরে বড় জুলুম করে। এতদিন আমরা এ সকল ভাল করিয়া জানি নাই। তোমাদের দুঃখ দারিদ্র বুঝি নাই। আমরা তোমাদের মা-বাপ; পুত্রের ন্যায় তোমাদের প্রতিপালন করা আমাদের কর্ত্তব্য ছিল। আমরা করি নাই, তার জন্য অনুতপ্ত। এখন হইতে তোমরা তিন টাকা মনে চাউল পাইবে, বাজারে একটাকা জোড়ায় কাপড় কিনিতে পারিবে, তোমাদের পাড়ায় পাড়ায় ভাল পুষ্করিণী কাটিয়া দেওয়া হইবে, ম্যালেরিয়া ওলাওঠা প্রভৃতি যাহাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা যাইবে, আমাদের দাতব্য ঔষধালয়ে তোমরা ব্যবস্থা ও ঔষধ পাইবে, অজন্মা হইলে আমাদের ধর্ম্মগোলা হইতে অল্প মূল্যে বা বিনা মূল্যে চাল পাইবে।" এই বলিয়া, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগের কমিসনার ও অপরাপর উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীরা যাইয়া যদি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, প্রজার অভাব অনাটন দুঃখ দারিদ্র প্রভৃতি তাঁরা মা-বাপের মতন দূর করিতে চেষ্টা করিবেন, প্রজারা অবাধে তাঁহাদের নিকট যাইয়া নিজেদের অভাব-অভিযোগ ও জানাইতে পারিবে। আর এই প্রতিজ্ঞার পরে যদি দেশের জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তাঁহারা এ অবস্থায় ইংরাজ-শাসনের অধীনে থাকিতে চান কি না? আমার বিশ্বাস, দেশে এখনও এমন মোহ আছে যে, অধিকাংশ লোকে হাত তুলিয়া ইংরাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, ইংরাজের রাজ্যে বাস করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে। এ অবস্থায় এই ইংরাজ-রাজই ভারতের প্রকৃতি-পুঞ্জের আত্ম-সংকল্পের বা self-determinationএর উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। আর চিত্ত বাবু স্বরাজের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাই যদি ইহার সত্য অর্থ হয়, তাহা হইলে, এই বর্ত্তমান ইংরাজ-রাজত্ব ত আমাদের স্বরাজ হইতে পারে! এই ইংরাজ-রাজ democratic বা গণ-তন্ত্র নয়; ইহা autocratic বা আত্ম-তন্ত্র বা ইহা bureaucratic বা আমলা-তন্ত্র। যাই হউক না কেন, তাহাতে ত আসিয়া যায় না! কারণ, "স্বরাজ আবার democratic, autocratic, bureaucraticই বা কি?"

কিন্তু স্বরাজ "কথাটির সারমর্ম্ম আমরা এখন পর্য্যন্ত সকলে গ্রহণ করতে" পারিয়া থাকি বা না থাকি, ইহা ঠিক ও সর্ব্ববাদী সম্মত যে, ইংরাজ-রাজ যতদিন আছেন, আমাদের স্বরাজ ততদিন হইবে না, এতাবৎকাল এই ধারণাই ছিল। কিন্তু, চিত্ত বাবু স্বরাজের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ স্বরাজ অর্থ যদি self-determinationই হয়, তাহা হইলে, এই স্বরাজের সঙ্গে ইংরাজ-রাজের কোনও অপরিহার্য্য বিরোধ ত হয় না।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মির্জাফর, জগৎশেঠ, কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, রায়দুর্ল্লভ প্রভৃতি বাঙ্গালার জননায়কেরা ইচ্ছা করিয়া, ইংরাজকে ডাকিয়া আনিয়া, বাঙ্গালার মসনদে বসাইয়া দিলেন। অতএব, বাঙ্গালার লোকের self-determinationএর কিম্বা আত্ম-সংকল্পের বলেই ইংরাজ আমাদের রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং, যতদিন না বাঙ্গালার লোকেরা বা লোকনায়কেরা অন্য সংকল্প করিতেছেন, ততদিন ইংরাজ-রাজকেই আমাদের "স্বরাজ" বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

আর আজ যদি দেশের লোকে বা লোকনায়কেরা, লোকমতের অনুকূলে, ইংরাজের সঙ্গে একটা রফা করিয়া, আত্ম-সংকল্পের বা self-determinationএর দ্বারাই, ইংরাজের অধীনে থাকিতে রাজি হয়েন, তাহা হইলে, বর্ত্তমান "শয়তানী" ব্রিটিশ রাজই, চিত্ত বাবুর ব্যাখ্যা অনুসারে, আমাদের স্বরাজ হইয়া যাইতে পারে।

এরূপ রফা হওয়ার যে কোনও সম্ভাবনা নাই, এমনও ত বলা যায় না। ইংরাজ রাজ-পুরুষেরা যে এরূপ আশা পোষণ করেন না, তাহাও নয়। সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া, বাঙ্গালার লাট বাহাদুর পর্য্যন্ত যে "স্বরাজ"-ঘোষণা করিতেছেন, তাহাই ইহার প্রমাণ।

গান্ধি মহারাজও যে রফা হওয়া অসম্ভব মনে করেন, তাহাই বা বলি কিরূপে? কারণ, এই সে-দিন, নাগপুরে যখন কংগ্রেসের বৈঠক বসে, তখনও তিনি একজন ইংরাজ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে কহিয়াছিলেন যে, ভারতে হয় ব্রিটিশের কল্যাণে—(through the good offices of the British) অন্যথা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের বাহিরে (outside the British Empire) তাঁহার ঈপ্সীত "স্বরাজ"-লাভ হইবে।

ফলতঃ, স্বরাজ আর self-determination বা আত্ম-সংকল্প যদি একই বস্তু হয়, তবে স্বেচ্ছা-কৃত বন্ধনকেও মুক্তি বলিতে হইবে। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

জগাই-উদ্ধার।

একি মাধাই কর্লে, ওরে, আমায় কিনা টানলে বুকে?
জড়িয়ে ধরে কাঁদলে গোরা কতই যেন তৃপ্তি সুখে!
নবদ্বীপের সবাই যাকে কর্ত্ত ঘৃণা ক্রিমির মত;
ছিলাম যেন কুষ্ঠ রোগীর দুষ্ট অতি গলিত ক্ষত;
রাক্ষসেরি মতন যাকে দেখত নারী সভয় ত্রাসে,
দানব সম ভীষণ অতি ছিলাম যেন আপন বাসে।
স্বজন কেহ চাইত নাক, নাইকো আমি মানুষ যেন,
হয়তো, মাধাই, জগৎ মাঝে পায়নি ঘৃণা কেহই হেন!
তার উপরে ভীষণ কত অত্যাচারে গোরায় দহি,
মানুষ যাহা সইতে নারে নিমাই, ওরে, সে সব সহি—
জড়িয়ে মোরে বক্ষে নিলে, আমিই যেন বন্ধু মিতে;
আমিই যেন প্রিয়ের প্রিয়, এমনি ধারা বাধলে হৃদে!
জুড়িয়ে দিলে, ভরিয়ে দিলে, প্রাণটা যেন অগাধ স্নেহে,
সাত সাগরের সুধার ধারা উথ্‌লে ওঠে সকল দেহে।
মানুষ এমন মিষ্টি, মাধাই, এমন ভাল বাস্‌তে পারে?
জন্মটা যে বদলে গেল গোরার শীতল অশ্রু ধারে!

শ্রীবলাই দেব-শর্ম্মা।

তান্ত্রিক শিব-শক্তি ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান।

বাহ্য জগতের বৈচিত্র আমরা সকলেই গ্রহণ করিতেছি। যদি সৎবস্তু একই হয়, তাহা হইলে, জগতের বহুত্ব কোথা হইতে আসে, আর কেনই বা প্রতীয়মান হয়, এই বহু-নাম রূপের কারণ কি, কেনই বা অনুভূত হয়, এটা একটা গূঢ় সমস্যা। এ সমস্যা চিরকালই আছে, চিরকালই থাকিবে। তবে, কখনও কখনও পূর্ণজ্ঞানী, পূর্ণবিবেকী পূর্ব্বেও আবির্ভূত হইয়াছেন, এবং ভবিষ্যতেও হইবেন। তাঁহারা এ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন ও করিবেন।

অদ্যকার বিবেচ্য বিষয়টা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের পথানুসারে আলোচনা করা যাউক। যখন আমি প্রথম ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry), পরে ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে পদার্থ বিজ্ঞান-শাস্ত্র (Physics) এবং তদানুসঙ্গিক অঙ্ক-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলাম, তখন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গবেষণায় যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে বাহ্যজগতের প্রকৃত মূল-কারণ (absolute cause) অজ্ঞাত (unknown) এবং অবোধ্য (unknowable) এই বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইত। রসায়নশাস্ত্রানুসারে প্রথমত চৌষট্টিটি, পরে সত্তরটী, পরে ক্রমে আরো বেশী, দিন দিন পচাত্তরটি ছিয়াত্তরটী মৌলিক পদার্থ (elements) এবং ঐ মৌলিক পদার্থের সংযোগ-বিয়োগে বাহ্যজগতের বহুপ্রকার নামরূপধারী বস্তুকে দুই অথবা ততোধিক মৌলিক পদার্থের সংহাত (compounds) বলিয়াই, রসায়ন-শাস্ত্র এক প্রকার নীরব ছিলেন। যদিও আমি তখন অনেকটা অপরিণাম-দর্শী যুবকমাত্র ছিলাম, তথাপি আমার মনে খট্‌কা উপস্থিত হয়—মৌলিক পদার্থ ৬৪টি ৭০টি কি ৭৫টি কেন হইবে, এবং কিরূপে হইতে পারে? এক হইতে পারে যে, সেগুলি অসংখ্য ; অথবা অপর পক্ষে হইতে পারে যে, তাহারা কেবল এক বস্তুরই—এক মৌলিক পদার্থেরই রূপান্তর মাত্র ; এক সৎবস্তুই নানা প্রকার নামরূপ ধারণ করিয়া জগতের বৈচিত্র ঘটাইতেছেন। একথা মনে উদয় হওয়ার একটা প্রধান কারণ ছিল। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ও স্বর্গীয়া মাতৃদেবী তন্ত্র-শাস্ত্রানুসারে তান্ত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত ছিলেন ; সেই তন্ত্র-শাস্ত্রে অনুশাসিত হইয়া, সর্ব্বদাই পূজা অর্চ্চনা করিতেন ; আমার গর্ভাদষ্টম বর্ষে, আমাদিগের বংশনিয়মানুসারে, যজ্ঞোপবীত দিয়াছিলেন ; এবং তাহার এক বৎসর মধ্যে, যখন আমার বিদেশে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইবে স্থির হইল, তখন পিতামাতা উভয়ে যুক্তি করিয়া, আমাকে আগমানুযায়ী নিয়মে দীক্ষিত করিলেন। পিতা মন্ত্র-বিচার করিলেন ; মাতা হইলেন, মন্ত্রদাত্রী গুরু। সেই সময় হইতেই, আমার জ্ঞানগম্য উপায়ে, মোটামুটি, শিব-শক্তির পরিচয় তাঁহারা দিয়াছিলেন। তখন হইতেই, মনে একটা সংস্কার, একটা ধারণা হইয়াছিল, যে বাহ্য-জগতের নাম-রূপ, সেই শিব-শক্তির বিকাশ-মাত্র। সেই শিব-শক্তি সৃষ্টির ব্যাপারে দ্বিধা, এবং পরে বহুধা হইলেও, তাহারা পরম শিব-রূপে এক, এবং সেই একই সৎবস্তু। অতএব, আমার মনে যে খট্‌কাটা হইয়াছিল বলিলাম, হওয়াটা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

যাহা হউক, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়েই আরো কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, Sir William Crookes নামক একজন রসায়নশাস্ত্রাধ্যাপক—যিনি রেডিওমিটার (Radio-meter) নামক যন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন,—তিনি প্রথমে আভাষ দিলেন যে, যাহাকে আমরা জড়-পদার্থ (matter) বলি, সেটা এক এবং তদানিন্তনের রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ সকল সেই এক জড়

বস্তুরই রূপান্তর মাত্র। ক্রমে বিজ্ঞানশাস্ত্রের গবেষণা চলিতে লাগিল। তাহার ফলে—সেই গবেষণায়—এখন এইটা নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, যাহাকে আমরা জড়পদার্থ বলিয়া থাকি, সেটা সর্ব্বব্যাপী আকাশের (ether) আকুঞ্চণ মাত্র। অর্থাৎ, সর্ব্বব্যাপী আকাশ, প্রাণবায়ু দ্বারা প্রকম্পিত হইলে, ক্রমে বাহ্যজগতের, বস্তুজগতের, নামরূপ ধারণ করে। আরও জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে যাহাকে আমরা পরমাণু (atom) বলিয়া অভেদ্য মনে করিতাম, সে পরমাণুও এক একটা ক্ষুদ্র জগত; কতকটা সৌর জগতের ন্যায়। যেমন সৌর জগতের কেন্দ্রস্থানে সূর্য্য থাকিয়া গ্রহমণ্ডলকে অনুশাসিত এবং গতিশীল করিতেছেন, সেই প্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্রিয়া-বিহীন অথচ ক্রিয়ার অনুশাসক তড়িৎ-বিন্দু (nucleus of positive electricity), কেন্দ্রে থাকিয়া, ক্রিয়া-শীল এবং গতি-শীল তড়িৎ-বিন্দু (ions or charges of negative electricity) সমূহকে গতিশীল এবং ক্রিয়াশীল করিতেছে। যতক্ষণ, এই কেন্দ্রস্থ তড়িৎ-বিন্দু দ্বারা তাহারা অনুশাসিত হইয়া, সেই বৃত্তস্থিত তড়িৎ-বিন্দু সমূহ অতি বেগে ধাবিত হইতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই পরমাণুর পরমাণুত্ব। ঐ পরমাণু দ্বারা ক্রমে স্থূল স্থূল বস্তু জড় জগতের নাম-রূপ ধারণ করে। কয়েক বৎসর হইল, Radium বলিয়া একটা রাসায়নিক বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার স্বভাব, কিন্তু, উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহার বিপরীত। সে তাহার স্থূলত্ব অতিবেগে কেন্দ্র হইতে ছড়াইয়া দিতেছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যদি সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি নষ্ট হইয়া, বিক্ষেপণী শক্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে, সৌর-জগত ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। অতএব, পরমাণু সমষ্টির সংহাতে বাহ্যজগতের সৃষ্টি, এবং পরমাণুর বিক্ষেপণায় বাহ্য জড় বস্তুর নাশ—প্রলয়।

এখন দেখা যাইতেছে, সূক্ষ্ম আকাশ হইতে ক্রমশ স্থূল, স্থূলতর, হইয়া জগতের সৃষ্টি, এবং পুনরায় এই স্থূল বস্তুর বিক্ষেপণা হইলে, ক্রমে ক্রমে আবার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া আকাশে পরিণত।

এই স্থানে আর একটা বিচার্য্য বিষয় আছে। এই যে, কেন্দ্রস্থ মৌলিক তড়িৎ-বিন্দু—যাহা পরমাণু মণ্ডলের অনুশাস্তা এবং যাহাকে পরে আমরা 'মৌলিক তড়িৎ-বিন্দু' (positive) বলিব, এবং গতিশীল বৃত্তস্থ তড়িৎ-বিন্দু—যাহা 'অনুশাসিত তড়িৎ-বিন্দু' (negative) বলিতেছি ও বলিব, —এই দুইটা না থাকিলে পরমাণুর বিকাশ অসম্ভব। কিন্তু যদি, কোন কারণে, 'মৌলিক তড়িৎ-বিন্দু', 'অনুশাসিত তড়িৎ বিন্দু'র সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কোন প্রকার বাহ্য-বিকাশ সম্ভব হয় না। অতএব, এই তড়িৎ-বিন্দু-দ্বয় দ্বিধা হইলেই সৃষ্টি, আর একধা হইলেই প্রলয়। আরো বলা আবশ্যক, এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্রের গবেষণায় এই পরস্পর সম্বন্ধ দুই প্রকার তড়িৎ-বিন্দু ব্যতিত, অপর আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। আরো, 'অনুশাসিত তড়িৎ বিন্দু'র ক্রিয়া আছে; অতএব ইহার বিকাশ আছে; ইহা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু, 'মৌলিক তড়িৎবিন্দু'র অস্তিত্ব আছে; ক্রিয়ার কর্ত্তা হইয়াও, কিন্তু ক্রিয়া বিহীন বলিয়া, তাহাকে প্রতীয়মান করা সম্ভবপর হয় না। সেটি কেবল জ্ঞানগম্য। এই তড়িৎ বিন্দুদ্বয়ের দ্বিধা প্রক্রিয়া যদি জগতের বিকাশের কারণ হয়, এবং তাহাদের উভয়ের মিলন যদি জগতের প্রলয়ের কারণ হয়; এই দুইটি যদি পরস্পর সম্বন্ধ থাকে—অথচ দ্বিধা থাকে—তাহা হইলে

জগত সৃষ্টির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া যায়, তবে একবার তান্ত্রিক শিব-শক্তি সম্বন্ধে দুইএকটি কথা বলার অবসর হইল।

তাহা এই। তন্ত্র-শাস্ত্র বলেন যে, যখন শিব ও শক্তি পরস্পর মিলিত থাকেন,—অন্য কথায় মহেশ্বর এবং মহামায়া পূর্ণমিলনে অধিষ্ঠিত থাকেন, তখন কোন বিকাশই সম্ভব হয় না। কিন্তু, ইহার মধ্যে রহস্য এই যে, যদিও শিব-শক্তি দ্বিধা হন, তথাপি উভয়েই সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া জগতের নাম-রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহারা মিলিত হইলেই প্রলয়, পরস্পর সম্বন্ধ থাকিয়া দ্বিধা হইলে, সৃষ্টি।

আমার বক্তব্য আরো পরিস্ফুট হইবে, মহামায়া কালীর—যাঁহাকে আমরা আদ্যাশক্তি বলি,—তাঁহার যে প্রতিমা পূজা করা হয়, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বিচার করিলে। সেই আদ্যাশক্তির মূর্ত্তি আপনারা সকলেই জানেন; সেই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিয়া অদ্যকার প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। প্রথমতঃ তিনি শব-রূপী শিবের বক্ষে নৃত্যময়ী হইয়া দণ্ডায়মানা; সেটায় এই বুঝিতে হইবে যে, শিব শব-রূপী, অর্থাৎ অক্রিয়। তিনি মহা কালরূপে একভাবে তুরীয়াবস্থ এবং সেইজন্য তাহাকে শায়িত দেখান হইতেছে। তাৎপর্য্য এই, তিনি একভাবে অনন্তকাল এক অবস্থায় আছেন। কিন্তু সৃষ্টি আরম্ভ হইলে, মহামায়া আদ্যাশক্তি, তাঁহা হইতে দ্বিধা হইলেও, তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইবার কোন ক্ষমতা নাই। তখনও মহামায়াকে শিব-বক্ষে দাঁড়াইয়া, শিবের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া সৃষ্টি-কার্য্য সাধন করিতে হইয়াছে। তবে তিনি নৃত্যময়ী কেন? তিনি নৃত্যময়ী এই কারণে যে মহাকাশে প্রাণন ব্যতীত, কম্পন ব্যতীত,—অর্থাৎ মহাকাশকে আকুঞ্চিত না করিলে,—জগতের আধার-ভুত বস্তু সৃষ্টির সম্ভাবনা হয় না। Pulsation is life। গতিবিহীন হইলে, pulsation না থাকিলে, কোন বস্তু থাকিতে পারে না। তাঁহার মহামেঘ-প্রভা কালবরণ কেন? তিনি ব্রহ্মময়ী হইয়াও, তিনি ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তির আধার হইয়াও, তিনি সৃষ্টির কারণ,—সৃষ্টির মাতা। যখন মাতা প্রসবিনী হন,—প্রসব করেন,—তখন তিনি তমঃগুণে আবৃত; তমঃগুণকে আমাদের শাস্ত্রে কাল রং দিয়া থাকে। তাঁহার চুল আলুলায়িত কেন? তাহার উদ্দেশ্য এই যে, মহাকাশের সকল দিক দিগন্তে তিনি শক্তি বিতরণ করিতেছেন এবং তাঁহারই শক্তিতে সকল বস্তু-নিচয় প্রাণিত ও অনুশাসিত হইতেছে এবং তাঁহার নিকট হইতে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই শক্তি-ত্রয় আসিতেছে। তাহার ত্রি-নেত্র ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নির্দ্দেশ করে; অর্থাৎ তাঁহার নিকট কিছু ভুতও নয়, কিছু ভবিষ্যৎও নয়, কিছু বর্ত্তমান নয়, কোন প্রভেদ নাই; চির বর্ত্তমান (eternal now)। তাঁহার রক্তাক্ত মুখ ও জিহ্বা কেন? জগতে দেখা যায় যে, একটা প্রাণী প্রাণ না দিলে আর একটা প্রাণীর প্রাণ রক্ষা হয় না। এই-ই জগতের নিয়ম। ইহা ছাড়া পুষ্টি হইবার অন্য উপায় নাই। কিন্তু মা তো জগন্ময়ী; তিনি ছাড়া তো জগতে কিছু নাই; সেই জন্য তিনি দেখাইতেছেন যে, জগতের পোষণের জন্য, তিনি নিজের রক্ত নিজেই পান করিতেছেন। তিনি খড়্গ-মুণ্ড-বরাভয় ধারিনী কেন? সেটা এই জন্য—তিনি সকল জীবকে দেখাইতেছেন যে তাঁহার জগতের নিয়ম, ধর্ম্ম (law) যদি অবহেলা কর, এই খড়্গে তোমার মস্তক ছিন্ন করিব এবং সেই ছিন্ন মস্তক এই ভাবে ধারণ করিয়া সকলকে দেখাইব যে আমার অনু-

শাসনের বাধায় ফল কি। কিন্তু মা স্নেহময়ী, রসময়ী (love itself); অতএব তিনি বলিতেছেন, —'বৎস, তুমি ধর্ম্মাচরণ কর, আমার নিয়মে শাসিত হও, তাহাতে তোমার পরম মঙ্গল, এবং আমার নিয়মে অনুচালিত হইয়া ক্রিয়া করিলে তোমার অপ্রাপ্য কিছু নাই; তোমায় আমি সব দিতে প্রস্তুত; তোমাকে আমি ব্রহ্মাণ্ড দিতে প্রস্তুত এবং তুমি আমার শক্তিতে শক্তিমান হইলে, তোমার কোন প্রকার ভয় নাই। তোমার কে ভয়দাতা, যে আমার শক্তির বিরুদ্ধে সে তোমার বিপদদায়ক হইতে পারে।' মহামায়ার মুণ্ড-মালা গলায় কেন? ঐ মুণ্ডমালাটা আমাদের পঞ্চাশৎ মাতৃকা, সংস্কৃত-শাস্ত্রের বর্ণমালা। এই বর্ণমালার, এই শব্দশক্তির দ্বারা মহামায়া নাম-রূপের সৃষ্টি করেন। শ্রীব্যোমকেশ শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী।

পঞ্চক।

(১)

কল্কি অবতার।—ইউরোপে বলশেবিক মূর্ত্তিতে কল্কি অবতার দেখা দিয়াছেন। তিনি একাকার করিতে চান; রাজায়-প্রজায়, ধনী-দরিদ্রে, কুলীন-অকুলীনে ভেদ ভাঙ্গিয়া সকলকে এক অবস্থায় ফেলিতে চান। বহুদিন পূর্ব্বে কল্কির আবির্ভাবের সূচনা হইয়াছিল; ঠাকুরের অগ্রবর্ত্তী চরেরা দেশে দেশে একাকারের উপকারিতা বুঝাইতেছিলেন, ও ঘোঁট করিয়া আপনাদের দল বাঁধিতেছিলেন; কিন্তু সাঁটি যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধে নাই। যাহাতে একদিকে রাজ-শক্তির প্রভাবে পিষিয়া মরিতে না হয়, ও অন্য দিকে দলপতির হুকুম মানাইয়া লোকদিগকে একটা বাধ্য জমাট-দলে পরিণত করা যায়, কল্কির চরেরা তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একদিকে ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, দলের লোকেরা রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে না, অথচ রাজার আজ্ঞাও পালন করিবে না; সম্পূর্ণরূপে রাজ্যশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য থাকিয়া, ঐ শাসনের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া দিবে। অন্যদিকে দলের লোকদিগকে দলপতির আদেশ মানিতে অভ্যস্ত করিবার জন্য এই কৌশল করা হইয়াছিল যে, প্রয়োজনে অথবা অপ্রয়োজনে, দলপতি মধ্যে মধ্যে একটা আদেশ প্রচার করিবেন, ও দলের লোকেরা তাহার সার্থকতা না বুঝিয়াই, আদেশ পালন করিতে থাকিবে; এই উদ্দেশ্যে কখনও বা দলের লোকদিগকে উপবাস করিতে ও কখনও বা কাজ-কর্ম্ম ও দোকান-পাট বন্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইত। ধর্ম্মঘট করাইয়া কখনও কখনও বা শ্রমজীবিদিগকে মুনিবের শাসন ও খাতির অগ্রাহ্য করিতে শিখান হইত। ইউরোপে, লোক সাধারণের পক্ষে, স্বাধীন-পন্থায় চলিলে কঠোর দণ্ড-বিধির ভয় নাই; তবুও, প্রায় একশত বৎসরের পরীক্ষায়, কল্কির চরেরা বুঝিতে পারিলেন, নির্বিরোধী হইয়া আড়ি করিয়া চলিলে রাজ্যশাসনকে দুর্ব্বল করা যায় না; দুই একটা ছোট খাট বিষয়ে ফল-লাভ হইতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হয় না; এবারে বলশেবিক-রূপী কল্কি, আড়ি ছাড়িয়া যুদ্ধে, নামিয়াছেন।

কল্কিঠাকুর ধর্ম্মক্ষেত্রে গুরু-পুরোহিতের শাসন উড়াইতেছেন, সমাজে ধনীর গৌরব ধ্বংস করিতেছেন ও অরাজকতা আনিয়া ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনীতির সূচনা করিতে চেষ্টা করিতে চান।

গোলামি-বুদ্ধি (slave mentality) সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া, ইহাঁরা সকল রকমের কর্ত্তাগিরি উড়াইবেন, বলিতেছেন। একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যাঁহারা চির-সঞ্চিত গোলামি-বুদ্ধি উড়াইতে চাহেন, তাঁহারা নিজে পরের স্বাধীন মতের প্রতি যেরূপ অসহিষ্ণু, ও যেরূপ জোর-জুলুমে পরের টুঁটি টিপিয়া নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে চাহেন, তেমনটা প্রাচীন গোলামি-বুদ্ধিতে ছিল না। প্রাচীন গোলামি-বুদ্ধির রাজনীতির উদারতায়, কল্কির চরেরা যেরূপ ঘোঁট করিতে ও ধর্ম্মঘট করিতে পারিয়াছেন, কল্কির প্রভাব বাড়িলে, কোন লোক নিজের স্বাধীন-বুদ্ধি বজায় রাখিয়া তাহার শতাংশের এক অংশও করিতে পারিবেন না। যাহাই হোক, ইউরোপে কল্কির দেখা দিয়াছে। ভারতবর্ষের কল্কিঠাকুর কবে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিবেন, তাহা আমাদের নূতন পাঁজিতে খুঁজিয়া পাইলাম না। পাঠকেরা কোন খবর রাখেন কি?

(২)

উপাধির বালাই।—এ দেশের মোক্ষ-শাস্ত্রে লেখে যে, নিরুপাধি না হইলে মুক্তি-লাভ হয় না। আমরা সে উপাধির কথা বলিতেছি না; রাজ-দত্ত উপাধির কথা বলিব। এ কালের আড়ির দলের নেতাদের যে কয়েকটি কথার সহিত আমার মিল আছে, তাহার মধ্যে একটি এই যে, উপাধির বালাই যতই দূর হয়, ততই দেশের মঙ্গল। এই বালাই নাই বলিয়া, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে মেকি দেশহিতৈষী বড় একটা মাথা তুলিতে পারে নাই। যিনি দেশের অগ্রণী ও নেতা, তাঁহার নাম করিতেও কিছু বিশেষণ জুড়িতে হয় না,—তিনি দেশের অতি সাধারণ লোকের মত 'মিষ্টার অমুক' মাত্র। কাহার মাহাত্ম্য আছে বা নাই, তাহার পরিচয় কাজে; বিশেষণ জুড়িলে গুণ বাড়ে না। আশ্চর্য্য এই, এদেশে যাহারা উপাধির উপর চটা, তাঁহারাই তাঁহাদের নেতাদিগকে সাদা নামে অভিহিত করিলে ধৈর্য্য হারাইয়া থাকেন।

আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যদি আমাদের রাজ-সরকার ব্যবস্থা করেন যে, যাঁহারা মিউনিসিপালিটিগুলিতে নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহারা ঐ পদের সূত্রে বেসরকারী অন্য লোকের অপেক্ষা কোন বিশেষ সম্মান পাইবেন না, ও তাঁহারা কাজে শত নাম করিলেও, কোন উপাধি পাইবেন না, তাহা হইলে যাঁহারা মান বাড়াইবার লোভে, খাঁটি কাজের লোককে ঠেলিয়া ভোট কুড়াইয়া কর্ত্তাগিরি করিতে ছোটেন, তাঁহারা আর দেশহিতৈষণার ছল করিবেন না। আর যাঁহারা যথার্থ কাজের লোক, তাঁহারাই প্রাণের টানে কাজ করিতে জুটিবে। ক্ষমতা চালাইবার প্রলোভনও একটা বড় প্রলোভন বটে, তবে মনের গোড়ায় উপাধির ছাই না পড়িলে, অনেক দোষ দূর হইবে।

আড়ির দলের লোকেরা সাবধান হউন; তাঁহারা যেন নেতাদের নামে বিশেষণ জুড়িবার বাতিক ছাড়েন, ও কোন নেতাকেই অবতার করিয়া খাড়া করিয়া দেশের গোলামি-বুদ্ধিকে হাজার গুণে বাড়াইয়া না তুলেন।

(৩)

অপবিত্র অর্থ।—আমার "আড়ি" প্রবন্ধের সমালোচক অরবিন্দ বাবু লিখিয়াছিলেন যে, রাজ-সরকারের তহবিলের টাকা আমাদের দেওয়া টাকা হইলেও, ঐ টাকা রাজা ছুঁইয়াছেন বলিয়া, উহা অসতী স্ত্রীলোকের মত অপবিত্র ও অস্পৃশ্য হইয়াছে; সেইজন্য ঐ টাকায় যে সকল

শিক্ষাশালা গড়িয়াছে, সেখানে কাহারও যাওয়া উচিত না। রাজ-সরকার ত আমাদের টাকাতেই দেশের রাস্তা তৈরি করিয়াছেন; সে রাস্তাগুলিতেও তাহা হইলে চলা ফেরা বন্ধ করিয়া চাঁদা তুলিয়া নূতন রাস্তা গড়িতে হয়। দেশটাকেও যে রাজ-সরকার আপনাদের অধীনে আনিয়াছেন ও উহার উন্নতির হউক বা অধোগতির হউক, সকল ব্যবস্থা করিতেছেন; এই অপবিত্র দেশ ছাড়িয়া নূতন উপনিবেশ খুঁজিতে হইবে কি? অন্য একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। দুশ্চরিত্র চোর-ডাকাতেরা যাহা আত্মসাৎ করে, তাহা ফিরাইয়া পাইলে যদি ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা হয়, তবে কেহ আর চোর ধরিতে বড় আগ্রহ করিবে না; চোরেরা সুখে ব্যবসা চালাইতে পারিবে।

রাজ-সরকারের হাতে যে টাকা পড়ে, তাহা যে অস্পৃশ্য বা "হারাম" হয়, একথা গুজরাট প্রদেশের আড়ির দলের লোকের মুখেও শুনিয়াছি; কাজেই অরবিন্দ বাবুর "অসতীর টাকা" কথাটা তাঁহার মন-গড়া নয়।

(৪)

স্বরাজ।—আড়ির দলের নেতারা বলেন যে, স্বরাজের প্রকৃতি কি হইবে তাহা এখন বলা চলে না। কিন্তু তাঁহাদের মতে একথা ঠিক যে, যত দিন মানুষ গোলামি-বুদ্ধিতে অপরের পা'চাটিতে থাকিবে, ততদিন স্বরাজ দেখা দিবে না। তবে কথা এই, লোকে যদি সাদা পা ছাড়িয়া, কাল পা চাটিতে আরম্ভ করে, তবে কি তাহাদের গোলামি-বুদ্ধি গিয়াছে বুঝিব? যাহারা অজানা আতঙ্কে ও চির-পুষ্ট গোলামি-বুদ্ধিতে জুজুর ভয়ে কাজ করে, কিন্তু কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্ররোচনায় কাজ করে না, তাহারা যদি এক জুজুর পরিবর্ত্তে অপর এক জুজু বা অবতারের পা'চাটিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে ত তাজা গোলামি-বুদ্ধি বাঁচিয়াই রহিল! জুজুর পরে জুজু খাড়া করিয়া, মানুষের পা'চাটার প্রবৃত্তি প্রবল রাখিয়া, গোলামি-বুদ্ধি তাড়াইবার উদ্যোগটি কি উপহাসের জিনিষ নয়? স্বরাজের প্রকৃতি বুঝিবার দিন হয় ত আসে নাই; কিন্তু এই বিকৃতে যাহা জন্মিবে, তাহা স্বরাজ নয়,—তাহা ক্ষণস্থায়ী কল্কির ভেলকি।

(৫)

নূতন দুর্দ্দৈব।—কেবল চিত্তরঞ্জন কথায় লোকের পেট ভরিবে কি না সন্দেহ করিয়া, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ব্যবস্থা করিতেছেন,—যাহারা অধিক লেখা পড়া শিখিতে পারিবে না, তাহারাও কিছু উপার্জ্জন করিবার পথ পায়। এ ব্যবস্থায় একদল লোক ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, দেখিতেছি। কারণ এই যে, ইহাতে তাঁহাদের কণ্ঠ-স্বরের কুস্তি করিবার আসর সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। যাহাদের লইয়া নাচ গান, তাহারা পেটের ভাবনা ভাবিলে চলিবে কেন? অতিবুদ্ধি থাকিলে যখন ক্ষুদ্র লুঙ্গিতেও দড়ি বাঁধিয়া কাছা করা চলে, তখন বুদ্ধিমানেরা আসর জাঁকাইবার নূতন উপায় আবিষ্কার করুন; নূতন উপায়ে এলম্-খানাকে গোলাম-খানা বলিয়া প্রতিপন্ন করুন!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পরপুষ্ট জীব।

[Parasites]

সংজ্ঞা। যাহারা অপর জীবের দেহ হইতে স্বীয় আহার সংগ্রহ করে, তাহাদিগকে পরপুষ্ট বলা যায়। কিন্তু প্রায় সকল জীবই ত অপর জীবের দেহ হইতে নিজ আহার গ্রহণ করে। আমরাও গাছপালা জীবজন্তু খাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পরপুষ্ট সংজ্ঞা আরও সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যে জীব অপর জীবিত প্রাণীর দেহকে স্থায়ী অথবা অস্থায়ী-রূপে আশ্রয় করিয়া, তাহার দেহ হইতে স্বীয় আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করেও ও তাহার অনিষ্ট সাধন করে, তাহাকেই আমরা এস্থলে পরপুষ্ট বলিব। পরপুষ্ট জীব উদ্ভিদও হইতে পারে, জন্তুও হইতে পারে। সে যাহাকে আশ্রয় করিয়া আহার সংগ্রহ করে, সেও উভয় শ্রেণীরই হইতে পারে। পরপুষ্টেরা যেমন আশ্রয়ের অনিষ্ট সাধন করে, তেমনই নিজেরও অনিষ্ট করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা চিরজীবন অপরের দেহে বাস করে, তাহাদিগের নিজেরও অবশেষে গুরুতর অনিষ্ট হয়। ইহাদিগকে স্থায়ী-পরপুষ্ট বলিব। আর, যাহারা জীবনের কিয়দংশমাত্র অপরের দেহ হইতে আহার সংগ্রহ করে এবং অবশিষ্ট অংশ স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদিগের তাদৃশ অনিষ্ট না হইলেও, নূন্যাধিক অনিষ্ট প্রায় সকলেরই হইয়া থাকে। ইহাদিগকে অস্থায়ী-পরপুষ্ট বলা যায়।

আবাস। পরপুষ্টেরা, উদ্ভিদই হউক জন্তুই হউক, আশ্রয়দাতার দেহ মধ্যেও থাকে, দেহের বহিরাবরণেও থাকে। কৃমি আমাদিগের দেহমধ্যে বাস করে, কিন্তু উকুন দেহের বাহিরের ত্বকে সংলগ্ন থাকে। কোন কোন পরপুষ্ট জীব প্রথমতঃ স্বাধীন ভাবে থাকিয়া, পরে ভিন্ন ভিন্ন বয়সে এক অথবা ততোধিক প্রাণীর দেহে আশ্রয় লইয়া, জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া দেয়; এই স্থানেই ইহারা বংশবৃদ্ধিও করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ম্যালেরিয়ার কীটা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা ডিম্বাবস্থায় স্বাধীন জীবন যাপন করিয়া, কিঞ্চিৎ বয়স হইলে, মশক বিশেষের দেহমধ্যে আশ্রয় লয়; সেখানে কিছুদিন কাটাইয়া, মশক-দষ্ট মানুষের দেহে প্রবেশ করে ও তথায় বংশবৃদ্ধি করে। অন্য পরপুষ্ট জীব হয়ত প্রথম বয়স অথবা মধ্যবয়স পর্য্যন্তও অন্যের আশ্রয় লইয়া পরে স্বাধীন জীবন যাপন করে। পাচড়ার কীট যে শ্রেণীর সেই শ্রেণীর একপ্রকার পরপুষ্টেরা (১) মধ্যবয়সে পরপুষ্ট ভাব ধারণ করে। আর একপ্রকার পরপুষ্ট জীব আছে তাহারা কখনই স্বাধীনভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে না। ফিতার মত কৃমি চির-জীবনই পরপুষ্ট। অন্য কৃমিও প্রায় তদ্রূপই। পরপুষ্ট অবস্থার স্থায়ীত্বের ঈদৃশ প্রভেদ বশতঃ, স্থায়ী অস্থায়ী (২) —এই দুই ভাগে পরপুষ্ট জীব সকলকে বিভক্ত করা হয়।

যাহারা পরপুষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের স্ব-গণস্থ (৩) কিম্বা স্ব-জাতীয় (৪) অন্যজীব

(১) Pycnogonids.
(২) অস্থায়ী অর্থে জীবিতকালের ভগ্নাংশ বুঝিতে হইবে।
(৩) Genus. (৪) Species.

১৪—৭

স্বাধীন থাকিতে পারে। এক প্রকার জীবও (৫) কেহ পরপুষ্ট, কেহ স্বাধীন আছে। এক-জীবও কোন দেশে স্বাধীন, অন্য দেশে পরপুষ্ট আছে। বয়স ভেদেও স্বাধীন অথবা পরপুষ্ট অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা বলিয়াছি।

হেতু। পরপুষ্ট অবস্থা উপরোক্ত নানা কারণে উৎপন্ন হওয়াই বিবেচনা করিতে হয়। এক জীব অকস্মাৎ অন্য জীবকে খাইয়া ফেলা কিছুই অসম্ভব নহে; ইহা ইচ্ছা-পূর্ব্বক হউক অথবা অজ্ঞাতে হউক, সর্ব্বদাই হইতেছে। তেমনই, একজীব দৈবাৎ অন্যজীবের দেহের সংলগ্ন হওয়া, কিম্বা সেই আবরণ ছিন্ন অথবা খণ্ডিত থাকিলে, দেহমধ্যে প্রবেশ-লাভ করা ত কিছুই অসম্ভব নহে। যদি এইরূপ ঘটে এবং তাহাতে ঐ জীব সাময়িক উপকার প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ খাদ্যের এবং বাসস্থানের সুবিধা বোধ করে, কিম্বা নিজকে নিরাপদ মনে করে; তবে ঐ আকস্মিক ঘটনা হইতেই একটা স্থায়ী অথবা অস্থায়ী অভ্যাস জন্মিতে পারে। ইহা হইতেই ঐ জীব পরপুষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু যাহার দেহে আশ্রয় লয়, তাহার দেহের সকল স্থান ঐ জীবের পক্ষে সমান সুবিধাজনক হওয়া অসম্ভব। স্থান বিশেষ উহার পক্ষে অধিক উপযোগী হইতে পারে। এ নিমিত্ত দেখা যায়, কোনও পরপুষ্ট জীব আশ্রয়দাতার দেহের একস্থানে, অন্যে অপর স্থানে বাস করে।

পীড়া। পরপুষ্ট জীব যে জীবের দেহে আশ্রয় লয়, তাহাতে নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন করিতে পারে; অবশেষে তাহার জীবন নষ্টও করিতে সমর্থ হয়। উদ্ভিদশ্রেণীর পরপুষ্ট জীবের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কোষ (৬) পুয়ঃ, সেপ্টসিমিয়া, এরিসিপিলাস, গণোরিয়া, কলেরা, টাইফএড্ জ্বর, প্লেগ, নিওমোনিয়া, ইনফ্লুএন্জা, ডিপ্থিরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে। জন্তুশ্রেণীর পরপুষ্ট জীবেরও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কোষ (৭) ম্যালেরিয়া, আমাশয়, উপদংশ, কালাজ্বর প্রভৃতি পীড়া জন্মাইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত। পরপুষ্টগণ যে সকল শ্রেণীর উদ্ভিদ ও জন্তু মধ্যে অধিক দেখা যায়, তাহাদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এ স্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটীমাত্র উল্লেখ করিতেছি। জন্তুগণকে যদি মেরুদণ্ড-যুক্ত এবং মেরুদণ্ড হীন, এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, তবে দেখা যায় যে মেরুদণ্ড-যুক্ত জন্তুগণ প্রায় কেহই প্রকৃত পরপুষ্টাবস্থা গ্রহণ করে না। উহারা আপন চেষ্টাতেই আহার সংগ্রহ করে; মেরুদণ্ড-যুক্ত জীবমধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অনুন্নত, অর্থাৎ মৎস্য, তাহাদিগের মধ্যে অতিক্ষুদ্র তিনচারি প্রকার মৎস্য পরপুষ্টাবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল দেশে অত্যন্ত ক্ষুদ্র একপ্রকার মৎস্য (৮) আছে; তাহারা মূত্রের গন্ধে আকৃষ্ট হয়; এবং যাহারা স্নান করিতে জলে নামিয়া প্রস্রাব করে, তাহাদিগের মূত্রনালির মধ্যে প্রবেশ করে। একবার প্রবেশ করিলে আর ঐ ক্ষুদ্র মৎস্যকে বাহির করা যায় না। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ব্রেজিলে ছিদ্রযুক্ত নারিকেলের খোল দ্বারা মূত্রদ্বার আবৃত করিয়া লোকে অবগাহন স্নান করিয়া থাকে (৯)। স্নান করিতে নামিয়া, জলে প্রস্রাব করা নানা কারণেই অসঙ্গত।

---

(৫) Varieties. (৬) Bacteria, (৭) Microbe. (৮) Vandellia Cirrhosa.
(৯) Encyclopedia: Brittannica, : 11th Ed, Vol. 20, p 794.

মেরুদণ্ডহীন জন্তুগণ মধ্যে শম্বুক শ্রেণীতে প্রকৃত পরপুষ্ট প্রায় নাই বলিলেই হয়। উকুন, খোস-পাঁচড়ার পোকা, ফুলের পোকা প্রভৃতি বহু সংখ্যক প্রাণী পরপুষ্ট। কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি কঠিন-আবরণ-যুক্ত প্রাণী মধ্যে অনেক পরপুষ্ট দেখা যায়। বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পরপুষ্ট প্রাণী, কীট শ্রেণী মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহারা ডিম্বাবস্থায় আশ্রয়-দাতার দেহের মধ্যে বাস করে; পূর্ণ বয়সে তাহার দেহের বহিরাবরণে যুক্ত হয়। এই শ্রেণী মধ্যে নানাপ্রকার পরপুষ্টাবস্থা দেখা যায়। পিপীলিকারা তাহাদিগের বাসায় অন্য কীট (১০) পোষে এবং সেই কীটের দেহে শুঁড় দিয়া নাড়িতে নাড়িতে একপ্রকার মিষ্ট তরল রস বাহির করিয়া ভক্ষণ করে। আমরা যেমন গরু পুষিয়া দুগ্ধ খাই, সেইরূপ। এস্থলে পিপীলিকাকে পরপুষ্ট বলা যায় না; অথচ যে কীটের রস খায়, তাহাকে গৃহপালিত-বৎ করিয়া তুলে। পরপুষ্ট অবস্থার যে সকল কুফল পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে, তাহা ঐ পিপীলিকা পালিত কীটের (এবং পিপীলিকারও) অনেক পরিমাণে হইয়া থাকে। তাহা পরে দেখাইব। জোঁক আংশিক ভাবে পরপুষ্ট। ফিতার মত কৃমি সকলেই পরপুষ্ট; ইহারা কেহই স্বাধীন জীবনযাপন করে না; ইহারা আশ্রয়-দাতার দেহমধ্যে বাস করে। কিন্তু গোল কৃমিসকলের মধ্যে পরপুষ্টও আছে, স্বাধীনও আছে। অত্যন্ত অনুন্নত প্রাণীগণ মধ্যে প্রায় প্রথম স্তরের জীব, এমিবা। ইহারা অনেকে পরপুষ্টাবস্থা গ্রহণ করে। ইহারা কেহ কেহ আমাশয় পীড়া উৎপাদন করে।

উদ্ভিদগণের মধ্যে অনেকে পরপুষ্ট। ব্যাক্‌টেরিয়া (অর্থাৎ উদ্ভিদাণু) নানাপ্রকার পরপুষ্ট ভাব ধারণ করে। ইহাদিগের অধিকাংশই জীবনের কোন না কোন অংশ পরপুষ্টাবস্থায় কাটাইয়া দেয়। ব্যাঙের ছাতার (১১) দেহে সবুজ পদার্থ নাই। উদ্ভিদ-পত্রের সবুজ পদার্থই, সূর্য্যকিরণের সাহায্যে, বায়ু হইতে অঙ্গার-পদার্থ সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদের দেহ গড়িয়া তুলে। ঐ সবুজ পদার্থ (১২) ব্যাঙের ছাতায় নাই। সুতরাং উহার দেহ-গঠন কার্য্যে যে কিঞ্চিৎ অঙ্গার আবশ্যক হয়, তাহা অন্য মৃত অথবা জীবিত প্রাণী হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। এই নিমিত্ত পচা জৈবিক পদার্থ হইতে অথবা জীবিত প্রাণীর দেহ হইতে ব্যাঙের ছাতারা অঙ্গার গ্রহণ করে। সুতরাং উহাদিকে পচাপুষ্ট অথবা পরপুষ্ট অবস্থা অবলম্বন করিতে দেখা যায়। ইহারা নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন করে। লতাগাছ ও গুঁড়ি বিশিষ্ট গাছের মধ্যেও অনেক পরপুষ্ট আছে। হলদি, (১৩) আলগুছি লুটা, কল্‌মি, ভুঁই-কুমড়া, দুধ-কুমড়া, ইত্যাদি বহু লতা সময় সময় পরপুষ্ট ভাব ধারণ করে। ইহাদিগের কাহারও ২ সামান্যমাত্র গুঁড়ি আছে; কাহারও নাই। সংস্কৃতে যাহাকে "আকাশবল্লী" গাছ বলে তাহারা সকলেই পরপুষ্ট। এই গাছ চিনিতে পারি নাই। কিন্তু বটবৃক্ষাদির ন্যায় বড় গাছ পরপুষ্ট হইতে প্রায় দেখা যায় না; তথাপি কখন ২ বড় গাছও অন্য বড় গাছের উপর জন্মে; তখন ইহারাও পরপুষ্ট হয়। আম গাছে, ডালিম গাছে সর্ব্বদাই পরপুষ্ট "আলোকলতা" দেখা যায়। খেজুর গাছের উপর পরপুষ্ট অবস্থাপন্ন বটগাছ অনেক দেখা যায়।

উদ্ভিদ ও জন্তুগণের মধ্যে কতিপয় পরপুষ্টের উল্লেখ করিলাম।

---

(১০) Aphides, ইত্যাদি।　(১১) Fungus; কোন কোন প্রদেশে কুকুর ছাতা বলে।
(১২) Chlorophyll.　(১৩) কোন কোন স্থানে হলুদ বলে।

কুফল। এক্ষণে এই অবস্থার কুফলসকল উল্লেখের সময় উপস্থিত হইয়াছে। কুফল দুইদিক হইতেই বিবেচনা করা যায়। যে পরপুষ্ট তাহারও অবনতি হয় এবং পরপুষ্টেরা যাহার দেহে আশ্রয় লয়, তাহাকেও অবনত করে; কখন বা মারিয়াও ফেলে। প্রথমতঃ, আশ্রয়দাতার কথাই বিবেচনা করা যাউক। এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, আশ্রয়দাতার দেহ সুস্থ ও সবল থাকিলে পরপুষ্টগণ, (উদ্ভিদই হউক, জন্তুই হউক,) বিশেষ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। তাহার দেহ আহার অভাবে শক্তিহীন ও দুর্ব্বল হইলেই, উহারা অধিক অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয়; নচেৎ বিশেষ কিছু করিতে পারে না (১৪)। আমাদিগের প্রত্যেকের দেহেই পীড়াদায়ক পরপুষ্ট জীবানু প্রবেশ ও বাস করে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত রক্তের জোর থাকে, সে পর্য্যন্ত বড় অনিষ্ট করিতে পারে না। রক্তের জোর বলিতে, উহার মধ্যস্থ শ্বেতবর্ণ রক্তকীটদিগের শক্তি বুঝিতে হইবে। পীড়াদায়ক জীবানু, দেহে প্রবেশ করিলেই, ঐ সকল রক্ত-কীট (phagocytes) তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। পরপুষ্ট জীবানুগণের ও তাহাদিগের বংশীয়গণের সহিত রক্তকীটগণের যুদ্ধ হইয়া, যে পক্ষ জয়ী হয়, তদনুসারে ফলও হয়। রক্তকীটগণ জয়ী হইলে, পরপুষ্টগণ কিছুই করিতে পারে না; তাহারা পরাজিত হইলে, পীড়াদায়ক পরপুষ্ট জীবানুগণই আশ্রয়দাতার দেহাভ্যন্তর ছাইয়া ফেলে এবং নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। কখন কখন ইহারা অসংখ্য দলে আশ্রয়দাতার দেহের অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রসকলকে আক্রমণ করিয়া, এত পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে যে, তাহার জীবন শেষ হইয়া যায়। আশ্রয়দাতার দেহের রসভাগে ও ধাতুতে যদি এরূপ পদার্থ থাকে, যাহাতে পরপুষ্টগণের দেহপোষণ হয়, তবে উহারা সেই খাদ্যের লোভে, তাহার দেহে প্রবেশ করে; এবং তাহার রক্তের জোর না থাকিলে, বিপন্ন করিয়া তুলে; পরিশেষে, তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করে।

উপরে যে পিপীলিকা এবং তৎপালিত কীটের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এক্ষণে স্মরণ করুণ। এস্থলে পিপীলিকাকেই পরপুষ্ট বলা যাইতে পারে। কিন্তু পিপীলিকাই প্রভু। তাহার দাস পিপীলিকা (১৫) আছে। সে পালিত কীটের দেহে শুঁড় দ্বারা স্পর্শ করিতে করিতে, দেহ হইতে যে মিষ্ট জলীয় পদার্থ ক্ষরিত করে, তাহা প্রভু-পিপীলিকাকে খাওয়ায়। প্রভু এইরূপ পরিচর্য্যা পাইতে ২ এতদূর অলস ও জড়বৎ হইয়া যায় যে, দাস তাহাকে না খাওয়াইয়া দিলে, সে অনাহারে মারা যাইবে; তথাপি স্ব-চেষ্টায় আহার করিবে না। তাহার এই দশা কেবল পালিত কীটের রস সম্বন্ধেই হয়, এমত নহে; প্রভু পিপীলিকার সর্ব্বপ্রকার আহারই, দাস পিপীলিকা দ্বারা প্রদত্ত হওয়ায়, সে আর স্ব-বশে কোন আহারই লইতে পারে না(১৬)। পক্ষান্তরে,

(১৪) A plant or animal in perfect health is more resistant to parasitic invasion than one which is ill-nourished and weakly.—Ency: Brit., 11th Ed., Vol 20, p. 924.

(১৫) Slave ant.

(১৬) Notwithstanding the fact that the food was easy of access ... they (the red slave owner ants) would not touch it. I then placed a black slave in the jar. She at once went to her masters ... and gave them food. These red ants would

পালিত কীটের দেহ হইতে রস ক্ষরিত হইতে হইতে, সে ক্রমে এত দুর্ব্বল অঙ্গহীন ও রসহীন হইয়া যাইতে পারে যে, তাহার শেষ-দশা উপস্থিত হয়। যে সকল জীব প্রকৃত পরপুষ্ট অবস্থায় অন্য জীবের দেহ মধ্যে অথবা দেহের বহিরাবরণে বাস করিয়া তাহার দেহ হইতে স্ব স্ব আহার্য্য পদার্থ সংগ্রহ করে, তাহারাও স্ব-চেষ্টায় অনভ্যস্ত হইয়া যায়। তাহাদিগের জীবিকার নিমিত্ত নিজের কোন কর্ম্ম করিতে হয় না। কর্ম্ম না করিতে করিতে দেহের অঙ্গসকল জড় ও ও ক্ষীণ ও কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়। জীব-তত্ত্বের ইহা একটী প্রধান নিয়ম যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রিয়াহীন হইয়া যায়, তাহারা অবসন্ন হইতে হইতে বিলুপ্ত হয়। পরপুষ্টের পাকস্থলী ক্রিয়া করিয়া খাদ্যবস্তুকে শরীর-পোষক রসরক্তে পরিণত করে না ; আশ্রয়দাতার দেহ হইতে প্রস্তুত রসরক্ত প্রাপ্ত হয়। এই হেতু, উহার পাকস্থলী নিষ্ক্রিয় হইতে হইতে বিনষ্ট হইয়া যায়। উহার পদাদি স্ব স্ব কর্ম্ম করিয়া উহাকে স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া খাদ্য সংগ্রহ করায় না ; সুতরাং হস্ত পদাদিও ক্রমে লুপ্ত হয়। উহার চোয়ালকে কর্ম্ম করিতে হয় না ; সুতরাং চোয়ালও লুপ্ত হয়। অবশেষে জননেন্দ্রিয়ও বিনষ্ট হইয়া যায়। উহার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই ক্রমে বিনষ্ট হইয়া, অঙ্গ-বহুল পরপুষ্টও একটীমাত্র কোষে পরিণত হইতে পারে (১৭)। পরপুষ্ট, আশ্রয়দাতার দেহে বাস করিতে করিতে তাহার ধাতু ঐ একটীমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সমঞ্জস হইয়া উঠে। যে জীব যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকে, তাহা সহ্য হইয়া গেলে, সে ঐ অবস্থারই উপযোগী হয় ; অন্য অবস্থায় বাস করা এবং জীবিত থাকা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। যদি সে অন্য অবস্থায় উপযোগী ভাবে পরিবর্ত্তিত হইল, তবে বাঁচিল ; নচেৎ নানারূপে অবসন্ন হইতে হইতে মরিয়া গেল। এই নিয়মের বশে, পরপুষ্ট ক্রমে তাহার আশ্রয়দাতার ধাতুরই উপযোগী হইয়া উঠে। কিন্তু আশ্রয়দাতাকে সে নানা ভাবে পীড়িত ও জীর্ণ করিয়া ফেলে ; হয়ত বিনষ্ট করে। সুতরাং সে যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় উপযোগী হয়, তাহা সে নিজেই পরিবর্ত্তিত ও নষ্ট করে। এই হেতু সে (অন্য অবস্থায় অনুপযোগী বিধায়) স্বয়ংই মারা যায় (১৮)। সে যদিবা কোনক্রমে জীবিত থাকে, তাহা হইলেও তাহার বংশধরগণ বিনষ্ট হইতে পারে। এই কারণবশতঃ, তাহার অত্যন্ত অধিক বংশবৃদ্ধি না হইলে, দুই চারিটীও জীবিত থাকা অসম্ভব হইয়া উঠে। যদি অত্যন্ত বংশবৃদ্ধি হয়, তবে উহারা নির্ম্মূল হয় না ; নচেৎ নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিলোপ হেতু, পরপুষ্টগণ দুর্ব্বল, অবসন্ন এবং অনুন্নত হইবেই।

---

have starved to death in the midst of plenty, if they had been left to themselves.—Weir's Dawn of Reason, p. 155.

(১৭) If the parasitic life be once secured, away go legs, jaws, eyes and ears ; the active highly gifted crab, insect or annilid may become mere sac.—Ray Lankester's Degeneration, p. 33.

(১৮) A creature regidly adapted to a special enviroment fails, if it does not reach that environment ... High reproductive capacity is ... urgent when the parasites tend to bring to an end their own environment by killing their host.

—Ency : Brit: 11th Ed., vol. 20, p. 796.

মানব। সকল আলোচনাই মানব-সমাজের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে, সার্থক ; নচেৎ, নিষ্ফল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু মানব ত চিরদিন পরপুষ্টভাবে থাকে না। সে যে কাল মাতৃগর্ভে থাকে, সেই কালই পরপুষ্ট অবস্থা গ্রহণ করে ; কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই সে আর অন্য প্রাণীর দেহের মধ্যেও বাস করে না, বহিরাবরণেও যুক্ত হয় না। সেভাবে সে আহার সংগ্রহ করে না। অধিকাংশ মানবই স্বচেষ্টায় আহার সংগ্রহ করে। ভিক্ষুক অথবা নিতান্ত নিষ্কর্ম্মা অন্নদাস ব্যতীত অপরে স্বচেষ্টা দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করে। সুতরাং মানবের পরপুষ্ট অবস্থা উপরের বর্ণিত প্রভু-পিপীলিকা ও দাস-পিপীলিকার সহিত তুলনীয় ; কৃমি অথবা উকুনের সহিত নহে। কিন্তু যে ভাবের পরপুষ্টাবস্থাই হউক, উহার কুফলসকল, কর্ম্মের অভাববশতঃ উৎপন্ন হয় ; চেষ্টার অভাব বশতঃ যে জড়ত্ব উপস্থিত হয়, তাহা হইতেই জাত হয়। কর্ম্ম আমাদিগের সহজাত অনুষ্ঠান ; কর্ম্ম-প্রবৃত্তি সহজাত প্রবৃত্তি। (১৯) সুতরাং মানব যতই কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে বাধ্য হয়, ততই তাহার দেহ অবসন্ন, পীড়িত ও বিলুপ্ত হয়। সহজাত বৃত্তির অননুষ্ঠান, প্রায় সর্ব্বদাই অমঙ্গলজনক হয়। আহার সংগ্রহের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় যে সকল কর্ম্ম, তাহা প্রতিহত হইলে, অথবা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার অবসর কিম্বা সুযোগ না থাকিলে, দেহ ও মন অবসন্ন হয় ; ইতর জীবেরও হয়, মানবেরও হয়। যখন কোন মানব অথবা মানব-সমাজ অপর মানব কিম্বা মানব-সমাজের প্রভু হয় এবং তাহার হস্ত হইতে প্রায় সকল কর্ম্মই কাড়িয়া লয়, অথবা যখন প্রভুর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম স্বাধীনভাবে করিবার সুবিধা অপহৃত হয়, কিম্বা যখন আহার-সংগ্রহ-কর্ম্মের প্রভু, নির্দ্দিষ্ট পথ ব্যতীত, স্বাধীন চেষ্টার ও পন্থা আর থাকে না, অথবা হ্রাস হইয়া যায়,—তখন অধীন-মানব অথবা মানব-সমাজ পরপুষ্টাবস্থার সহিত তুলনীয় হইয়া থাকে। স্বাধীন কর্ম্মে, নিজের প্রয়োজনীয় কর্ম্মে চেষ্টিত হইলে, মানবের উদ্ভাবনী-শক্তি মার্জ্জিত ও উন্নত হয় ; দৃঢ়প্রতিজ্ঞা উদ্বুদ্ধ হয় ; সফলতার নির্ম্মল আনন্দ সঞ্জাত হয়। পরকর্ম্ম সফল হইলেও, এ সকল বৃত্তি ও আনন্দ তাদৃশ-ভাবে উৎপন্ন করিতে পারে না। এই নিমিত্ত, অধীন-ভাব, দাস-ভাব, মানব এবং মানব-সমাজের এত অনিষ্টজনক। ইহাতে কর্ম্মবৃত্তি প্রতিরুদ্ধ হইবেই, এবং তাহার ফলে জড়ত্ব আনয়ন করিবেই। (২০) বরং ইতর জীব অপেক্ষা, মানবে পরপুষ্টাবস্থায় কুফল, পরবশতায় শোচনীয় পরিনাম অধিকতর দ্রুতগতিতে উৎপন্ন হয়। ইতর জীবসম্বন্ধে পরপুষ্টাবস্থা, গৃহপালিত অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, মানবের ক্ষেত্রে পরবশতা—নানাবিধ প্রকারের পরবশতা—তদ্রূপই শোচনীয় এবং অমঙ্গল-জনক। পরপুষ্ট ইতর-জীব অপর জীবের দেহ হইতে রস রক্ত গ্রহণ করিয়া, তাহাকে অবসাদ-গ্রস্ত করে ; মানবের ক্ষেত্রে দেহ হইতে রসরক্ত গ্রহণ করা

(১৯) Lawyers, criminologists and philosophers frequently imagine that only want makes man work. This is an erroneous view. We are instinctively forced to be active in the same way as ants and bees.—Loeb, Comparative Physiology of the Brain, p. 197.

(২০) The influence of slavery on the human race shows very plainly that man himself quickly ... loses his *stamina* when subjected to it.

—Wier, Dawn of Reason, p. 157.

নাই ; কিন্তু যে আহার্য্য-বস্তু খাইতে পাইলে, আমার দেহে রসরক্ত উৎপন্ন হইত, সেই আহার্য্য-বস্তু অথবা উহা সংগ্রহের উপায় সকল, অপর মানব গ্রহণ করিয়া অথবা নষ্ট করিয়া, আমাকে অবসাদ-গ্রস্ত করাই প্রচলিত নিয়ম হইয়াছে। পরপুষ্টজীব অন্য জীবকে যাদৃশ দুরবস্থায় আনয়ন করে,. আমার আহার্য্য-লুণ্ঠনকারী আমাকে তাদৃশ দুরবস্থায় ফেলিয়া দেয়। প্রভু-মানব স্নেহ মনের কল্যাণকর নানাবিধ কর্ম্ম হইতে অপর মানবকে বঞ্চিত করিয়া, তাহার আহার্য্য-বস্তু গ্রহণ করিয়া, তাহার আবশ্যকীয় অন্য বস্তু অথবা সেই বস্তুর প্রতিনিধি,—অর্থ—আত্মসাৎ করিয়া, তাহার চেষ্টা সীমাবদ্ধ করিয়া, অধীন-মানবকে যে দুর্দ্দশায় উপনীত করে, তাহা পরপুষ্টাবস্থার সহিত বিশেষভাবে তুলনীয়। যে পরবশ অবস্থায়, ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় কর্ম্ম ও চেষ্টা সীমাবদ্ধ কিম্বা প্রতিহত হয়, কর্ম্মক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পরপুষ্ট-জীব স্বয়ং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করে ; কিন্তু মানব অনন্যগতি হইয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ফল, উভয় ক্ষেত্রেই সমানসাংঘাতিক। এই নিমিত্তই মনু বলিয়াছেন,—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং, সর্ব্বমাত্মবশং সুখং॥

শ্রীশশধর রায়।

ক্ষমা।

কত অপরাধ করেছি গো পদে
সকলি করেছ ক্ষমা
এখনও আমি এত অপরাধী
নাহি যে তাহারি সীমা।
তাও ভগবন ক্ষমিতেছ দেখি
হ'তেছে বড়ই ভয়,
এবে এই শুধু মাগি তব কাছে
এমন না যেন হয়।

কারণ জানিগো, যদি ক্ষমা পাই,
বেড়ে যাবে মোর দোষ,
দোষী ক্ষমা পাবে শুধু তব কোলে—
এ কিরূপ পরিতোষ ?
করিও না ক্ষমা দিওগো বেদনা
যখনি করিব ভুল,
সদা এইটুকু মনে থাকে যেন,
তুমিই সবারি মূল।

শ্রীবিষ্ণুপদ মণ্ডল।

অপৌরুষেয় বাণী।

[Revelation]

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি ? মানব-জ্ঞানে ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা কোথায় ? এই প্রশ্নের উত্তরে যাহারা বলিবেন, কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাদের পক্ষে উত্তর দুই দিক্ হইতে দেওয়া চলে। প্রথম,—জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাছে'তো ঈশ্বর-বিশ্বাস কুসংস্কার মাত্র। সুতরাং, মানব যে পরিমাণে প্রকৃত জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, ধর্ম্মও মানুষকে পরিত্যাগ করিবে। অন্ততঃ, ঈশ্বর-বিশ্বাস দূরে পলায়ন করিবে। ঈশ্বর-বিশ্বাস ছাড়া যদি

কোন ধর্ম্ম থাকে, তবে তাহা থাকিতে পারে। এই মতটি নিজেই একটী মস্ত কুসংস্কার। কিছুদিন পূর্ব্বে, এরূপ নাস্তিক্যবাদ থাকিলেও থাকিতে পারিত এবং কোন কোন স্থলে ছিলও। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারে হুবহু নাস্তিক্যবাদ আর নাই। উহা কুসংস্কার। বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং এ মতের বিচার নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয়,—মানব-জ্ঞান, মানবের বিচারবুদ্ধি, ধর্ম্মের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে না। মানবের এমন কোন মনোবৃত্তি নাই যাহার সাহায্যে সে ব্রহ্ম-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ। ব্রহ্ম-তত্ত্ব তাহার নিকট উপর হইতে আসে। সে তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। সে তত্ত্ব তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অতীত; তাহার বিচারবুদ্ধি তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ। সে যদি তাহা লইয়া বিচার করিতে বসে, তো অনর্থই ঘটাইবে। তাহা পাইলে নির্ব্বিচারে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ কর—ইহাই ধর্ম্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে মানবের জ্ঞান বুদ্ধির প্রকৃত অবস্থা। অবশ্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, তত্ত্ব উপর হইতেই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। ব্রহ্ম মানুষের নিকট নিজেকে প্রকাশিত করেন। ইহাই ধর্ম্মের ও ধর্ম্ম-জীবনের মূল ভিত্তি। যাহাতে ব্রহ্ম-বাণীর স্থান নাই, তাহা ধর্ম্ম নামেরই যোগ্য নহে। বাস্তবিক, ধর্ম্ম-তত্ত্ব মানবের নিকট ব্রহ্মের প্রকাশ। এ কথা স্বীকার করিতে কোন ধর্ম্মবিজ্ঞানবিদ্ কুণ্ঠিত হইবেন না যে, ব্রহ্মের প্রকাশ—বাণী (revelation) রূপেই ব্রহ্মের প্রকাশ—ছাড়া ধর্ম্ম হয় না। ব্রহ্ম দর্শন, ব্রহ্মবাণী শ্রবণ ছাড়া মানবের ধর্ম্ম পিপাসা কখনও পরিতৃপ্ত হইাত পারে না। জীব-আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ, জীবাত্মার পরমাত্মার সাক্ষাৎ লীলাই ধর্ম্ম। শুধু বুদ্ধি-বিচারে মীমাংসায় ধর্ম্ম হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে যে, মানবের জ্ঞান ও তাহার বুদ্ধি বিচারের সঙ্গে এই তত্ত্বের যে সম্বন্ধ স্থানে স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে, তাহা কখনও গ্রাহ্য হইতে পারে না। বুদ্ধি-জীবী মানুষের বুদ্ধি (reason) তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান পরিণতির সঙ্গে মিশ খাইবে না, এই মত কখনও স্বীকৃত হইতে পারে না। যে প্রকাশে, ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব ও মানুষের সর্ব্বপ্রধান গৌরব, তাহা তাহার জ্ঞানের বিরোধী বা তাহার জ্ঞানের অতীত, ইহা অতীব অসঙ্গত মত। একটু তলাইয়া দেখিলেই ইহার ভ্রান্তি ধরা পড়িবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কোন কোন মতে, ধর্ম্ম, বুদ্ধির কাছে, কুসংস্কার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এ মতে অবশ্য, ধর্ম্ম বুদ্ধির গ্রাহ্য। ধর্ম্ম-তত্ত্বের আলোচনায় জ্ঞানের অধিকার আছে। অন্যমত বলিবেন, ধর্ম্মতত্ত্ব বুদ্ধি-গ্রাহ্য নহে। মানব-মন লৌকীক বিষয়েরই কেবল ধারণা করিতে পারে, আলোচনা করিতে পারে। পরমার্থ তত্ত্ব লৌকীক জ্ঞানের অতীত। হয়, সে তত্ত্ব মানবের জ্ঞান বিচারের সম্পূর্ণ অতীত; না হয়, তার সিদ্ধান্তের বিরোধী। অর্থাৎ, বিচারের কাছে যাহা অসম্ভব, তাহাই পরমার্থ-তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই মত কিন্তু ধর্ম্মকে জ্ঞানের অনধিগম্য বলিতেছে না। যাহা বুদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরোধী, তাহাই সত্য—পরমার্থ-তত্ত্ব-নির্ণয় মানব-জ্ঞানের এই প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং, সে তত্ত্ব বিচারের বাহিরে পড়িতেছে না। যদিও ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় নিতান্ত একটা বুজরুকীর ব্যাপার দাঁড়াইতেছে। জ্ঞান ও ধর্ম্ম যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তবে কোনটা গ্রহণীয় তার বিচার ভার উভয়ের অতীত কিছুর উপর পড়িবে। সে কিছু কি ? জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই তো নাই। 'পরমার্থিক-সত্য, অপৌরুষের বাণী যে গ্রহণ করিতেই হইবে, তাহা কাহার সিদ্ধান্ত ? জ্ঞানের সিদ্ধান্ত নয় কি ? জ্ঞানের দ্বারা

সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম যে বাণী গ্রহণ করিতে হইবে ; অথচ জ্ঞানকে বলা হইতেছে যে, যাহা তোমার মীমাংসার বিরোধী তাহাই গ্রহণ কর। ইহা যদি বুজরুকি না হয়, তবে বুজরুকি কি তাহা জানি না। সুতরাং জ্ঞান (reason) ও বাণী (revelation) একান্ত বিরোধী কল্পনা। অর্থাৎ বিশ্বাস যাহা গ্রহণ করিবে, জ্ঞান তাহা বর্জ্জন করিবে। তাহা হইলে, ফল হইবে ঘোরতর অবিশ্বাস। না হয়, গায়ের জোরে সন্দেহ চেপে রাখা। মানব প্রকৃতিতে যাহারা অভিজ্ঞ তাহারা জানেন যে, এই চাপ চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে না। তাই সর্ব্বদেশে, বিশেষভাব খৃষ্টীয়-জগতে, ইহার পরিণাম হইয়াছে, জ্ঞানালোচনাকারীদের পক্ষে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতা। হয় জ্ঞানের সঙ্গে বাণীর বা আপ্তবাক্যের সামঞ্জস্য দেখাইতে হইবে ; না হয়, জ্ঞান আপ্তবাক্য সম্বন্ধে হাঁ না কোন কথাই বলিবে না। অর্থাৎ, আপ্তবাক্য জ্ঞান বিরোধী নয়, কিন্তু জ্ঞানের অতীত। আমাদের কাছে তাহা অবোধ্য হইতে পারে ; অবোধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করা চলিবে না, যদি প্রমান করা যায় যে, ইহা আপ্তবাক্য বা অপৌরুষেয় বাণী। তাহা হইলে এখন প্রশ্ন হইতেছে, কি উপায় জ্ঞানের সাক্ষ্য অতিক্রম করিয়া, আপ্তবাক্যের আপ্ত-বাক্যত্ব প্রমাণ করা যায়।

আপ্তবাক্য কি ? ভগবান্ লোক-শিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, বা সময়ে সময়ে তিনি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদিগকে—যেমন আমাদের দেশে বিশ্বাস, ঋষিদিগকে—অনুপ্রাণনা দিয়াছেন এবং অনুপ্রাণিত অবস্থায় তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন বা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই আপ্ত-বাক্য। এখন দেখা যাক, আমরা এখানে আমাদের জ্ঞানকে কতটা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেছি। ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন—এখানে দেখা যাইতেছে, আপ্ত-বাক্য উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, আমাকে অনেকগুলি ধর্ম্মতত্ত্ব আরও মানিয়া লইতে হইবে, যে গুলি আপ্তবাক্য হইতে পারে না। অর্থাৎ, ভগবান্ আছেন, তিনি অবতীর্ণ হন, তিনি উপদেশ দেন। এ উপদেশ গুলি আবার সাধারণ তত্ত্ব হইতে বিভিন্ন হওয়া চাই, নতুবা ইহাদের কোন প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং লৌকিক ও পারমার্থিক তত্ত্বের পার্থক্য বিচার, আমাকেই করিতে হইবে। কাজেই, ধর্ম্মতত্ত্ব আমার জ্ঞানের অতীত, একথার কোন সার্থকতাই থাকিতেছে না। কতকগুলি তত্ত্ব আমার আয়ত্ত, আর কতক নয়—এ কথা বলিলেও ঐ বিপদ। কোন্ গুলি আয়ত্ত, আর কোন্ গুলি নয়, তাও আমর বিচারাধীন। তারপর, এই উপদেশ গুলি যে আপ্তবাক্য, আপ্ত বাক্যের জ্ঞান আমার আগে হইতে না থাকিলে, তাহা বুঝিব কিরূপে ? যার কাঞ্চনের জ্ঞান নাই, কাঞ্চন তার কাছে উপস্থিত করিয়া কি লাভ ? সুতরাং, যাহা বাহির হইতে আনিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা যে আগে হইতে অন্তরেই রহিয়াছে। না থাকিলে, আপ্তবাক্য ও লৌকিক কথার কোন পার্থক্য আমার কাছে থাকিবে না। সুতরাং দাঁড়াইয়াছেন,

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

—নারদপঞ্চরাত্র।

যদি বলা যায়, আপ্ত বাক্যের মধ্যে এমন কিছু আছে যে তা দেখলে বুঝা যাবে উহা আপ্ত-বাক্য, ভিতরের কিছুর প্রয়োজন হইবে না, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, এই দাবী নিতান্ত ভিত্তিহীন। শাস্ত্রাদি তো দূরের কথা ; অবতারদিগের মুখ হইতে যাঁহারা উপদেশ শুনিয়াছিলেন,

তাঁহাদের অধিকাংশই সেগুলি আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। যদি বলা যায়, বুঝিতে সময় লাগিবে, আত্মাকে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা হইলেও তো ভিতরের কিছুর প্রয়োজন হইতেছে। লৌকিক কথায় বলে—ঘুরে শোও ফিরে শোও, পৈথানেতে পা; ঘুরে ফিরে জ্ঞানেরই দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। যে জ্ঞানকে বাদ দিয়া ধর্ম্মের সৌধ নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব, নেড়ে চেড়ে দেখা যায়, সেই জ্ঞানরূপ ভিত্তির উপরই তাহা প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় কথা, তিনি যে অবতার তার প্রমান কি? শিষ্যেরাই তো অবতার গড়িয়াছে। তাহারা যে ভুল বুঝে নাই, তার মীমাংসা কে করে? প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা বা প্রত্যক্ষ-শ্রোতাদের মধ্যেই তো অনেক সময় মতভেদ উপস্থিত হয়। সুতরাং, অবতার যে কি উপদেশ দিয়াছিলেন, খাঁটি খবর আমি পাব কোথায়? খালি ভগবানকে অবতীর্ণ হয়ে উপদেশ দিলে হবে না। টীকাকারকেও অবতারই হতে হবে। তাতেও নিস্তার নাই; আমি যদি বুঝতে ভুল করি। সুতরাং আমাকেও অবতার,—নিদেন পক্ষে, অনুপ্রাণিত—হতে হবে। তাই যদি হয়, তবে ভগবান্ তো আমার অন্তর্য্যামীরূপে রয়েছিলেনই—তবে তাঁকে দু হাজার পাঁচ হাজার বৎসর জুড়িয়া বৃন্দাবন হতে শাস্ত্রের রশি দিয়া টেনে আন্তে হবে কেন? যতই তলাইয়া দেখা যায়, দেখা যাইবে ধর্ম্মতত্ত্বের আদি অন্ত মধ্যে জ্ঞানের জালই জড়িত রহিয়াছে। নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। আর যদি অবতার বলিয়াই থাকেন যে, তিনি স্বয়ং ভগবান্, তাহলেই কি সেটা বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে? যে কেউ ভগবানত্বের দাবী করিলেই যদি তাহাকে ভগবান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে এ বিশ্বে ভগবানের ঠাই হইবে না। সংসারে বাতুলের সংখ্যা কম নয়। মৃগী হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি আপদে পড়িয়া মানুষ অনেক সময় অনেক অনর্থ ঘটাইয়া থাকে। সুতরাং এখানেও বাছিয়া লইতে হইবে এবং সাচ্চা ঝুটা বাছিয়া লইবার ভার, আমরাই। অন্যদিকে, অনুপ্রাণিত হইয়া উপদেশ দিবার বা লিপিবদ্ধ করিবারও বিপদ কম নয়। কোন্ টুকু অনুপ্রাণন, কোন্ টুকু মানুষ নিজের নিম্নভূমির কথা যোগ করিতেছে, তাহা বুঝিব কিরূপে? যাঁহারা প্রেততত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা মধ্যবর্ত্তীকে অজ্ঞান করিয়াও নিস্তার পান না। প্রেত-মধ্যবর্ত্তীর মধ্যদিয়া কিছু প্রেরণ করিল; মধ্যবর্ত্তীর সুপ্ত-আত্মার (subliminal self) তাহার মধ্যে কিছু যোগ করিয়া দিল—সে অজ্ঞাতসারেই করিল; ইচ্ছা করিয়া করিল না। সুতরাং আমরা প্রেতলোকের খাটি খবর পাইলাম না। এখানেও তুষ হইতে শস্য বাছিয়া লইবার ভার, জ্ঞানের; নান্যঃপন্থা। বাস্তবিক, যখন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া বলি,—আহা! কি স্বর্গীয়!—মনে রাখিতে হইবে, স্বর্গটা ভিতরে; বাহিরে নয়। কেহ হয়তো বলিতে পারেন, অবতার বা অনুপ্রাণিতব্যক্তি যখন অতি প্রাকৃতিক বা অলৌকিক ক্রিয়া দ্বারা আপনার ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, তখন তাঁহার উপদেশ বিচার বিতর্কের অতীত; সুতরাং অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। এখানেও ধরিয়া লওয়া হইতেছে, লৌকিক অলৌকিক সকল জ্ঞানই আমার মধ্যে আছে এবং কোন্‌টা লৌকিক কোন্‌টা অলৌকিক তাহার বিচারকর্ত্তাও, আমি। জ্ঞানের সীমানা সঙ্কুচিত হওয়া দূরে থাকুক, অনেকটা বেশী বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যখন কোন ঘটনাকে বলিব, ইহা নৈসর্গিক নয়, তখন সকল নৈসর্গিক জ্ঞানতো আমার মধ্যে থাকা চাই-ই এবং ঐ জ্ঞান-ভাণ্ডার অতিক্রম না করিলে, কোন কিছুকে নৈসর্গিক নয় বলিবারও অধিকার থাকিবে না। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ না হইলেও, আমাকে তাঁহার

কাছা কাছি পৌছিতে হইবে। আমার অজ্ঞানতা দেখাইতে যাইয়া, আমার ঘাড়ে ত্রিকালের জ্ঞানের বোঝা চাপান হইল। রহস্য মন্দ নয়। তারপর, মানুষ যখন সর্ব্বজ্ঞ নয়, তার জ্ঞান যখন ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইতেছে, তখন আজ যাহা অবোধ্য, কাল যে তাহা বোধগম্য হইবে না, তাহার প্রমাণ কি। দুই হাজার বৎসরে একটা কথার মীমাংসা হয় নাই বলিয়া, চিরদিনই তাহা অমীমাংসিত থাকিবে, তাহার কোন অর্থ নাই। বরং দেখিতেছি, যাহা এক দিন মহা মহা পণ্ডিত-তের কাছে অনৈসর্গিক বলিয়া মনে হইয়াছিল, স্কুলের বালকের কাছে আজ তাহা অতি স্বাভাবিক। আজ এই মুহূর্ত্তে বৈজ্ঞানিকের কাছে যাহা নিতান্ত সহজ-বোধ্য স্বাভাবিক, সাধারণ নিরক্ষর ব্যক্তি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহাকে অতি-প্রাকৃতিকের সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। সুতরাং চৈতন্যদেব ষড়ভূজরূপ দেখাইয়া ছিলেন, এই হেতুতে যে একজন বৈষ্ণব আমাকে তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিতে বলিয়াছিলেন, আমি নানা কারণেই সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। প্রথমতঃ, উহা যে অতি-প্রাকৃতিক তাহার প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, উহা ভেল্কীও হইতে পারে। বাজীকরেরা তো অনেক ঘটনায় এমনই তাক্ লাগাইয়া দেয়। আমি ভেল্কীবাজীর অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাহার অর্থ তখনও বুঝি নাই, এখনও বুঝি না। সুতরাং কি স্বীকার করিব যে, আমাদের গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে অনেক ঈশ্বর ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যদি বলা যায়, তাহার অন্যান্য কার্য্যের আলোকে তাঁর অবতারত্ব বিচার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঈশ্বরত্বের প্রমাণ আমার বুকের মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে; বাহির হইতে আমার উপর চাপাইতে হইবে না। তৃতীয়তঃ, উহা যে সত্য ঘটনা, তা আমি হঠাৎ কেমন করিয়া স্বীকার করিব। ইতি-পূর্ব্বে কত ঘটনা অনৈতিহাসিক বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা বহুদিন ঐতিহাসিক বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। এই তো সেদিনের কথা; এখনও লোকের মনে সন্দেহ রহিয়াছে যে, আসল নেপোলিয়নকেই সেণ্ট হেলেনায় পাঠান হইয়াছিল কি না। ইতিহাস, পুরাণে এমন কত কথা আছে যাহা বস্তুতঃ সত্য নহে। যদি বলা যায়, যাঁহারা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা ভাল লোক। অনুপ্রাণিত মিথ্যা লিখিতে পারেন না। তাহা হইলে, অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিলেও কি বিপত্তি ঘটিতে পারে, সে সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এখানেও স্মরণ করিতে হইবে। তারপর, যাঁরা ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য, সত্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন নাই। ঐতিহাসিকগণ তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। যারা ধরা পড়িয়াছেন, তা ছাড়া সে দলে আর কেহ নাই, তা বুঝিব কিরূপে? এবং তাহা যদি না বুঝিলে না চলে, তবে তাহা বুঝিবার ভারও আমারই জ্ঞানের। মানুষ আপনার ছায়ার ন্যায় আপনার জ্ঞানকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ।

ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, কোন মত জ্ঞান-বিরুদ্ধ হইলে, তাহা স্ববিরোধীতা দোষে দুষ্ট হয়। সেইজন্য ধর্ম্মবিষয়ক তত্ত্ব, সকল জ্ঞানাতীত বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞানাতীত বলিলেও কি দোষ ঘটে তাহাও আমরা দেখিয়াছি। বাস্তবিক, এই দুই মতে পার্থক্য অতি কম; নাই বলিলেই হয়। আমাদের দেশের মায়াবাদীরা বলেন যে, সংসারটা মায়া-বিজৃম্ভিত। এখানকার যা কিছু সব অজ্ঞানতা-প্রসূত। সত্য বা পারমার্থিক-তত্ত্ব এখানে

পাওয়া যাইবে না। এখানে যা কিছু করিবে, সবই তত্ত্ব-বিরোধী। প্রকৃত তত্ত্ব হ'ল, ব্রহ্ম-তত্ত্ব। তাহা সংসারের অতীত। সে তত্ত্ব না পাইলে, সংসারের অতীত হইতে পারিবে না। যতক্ষণ সংসারে আছ, সে তত্ত্ব পাইবে না। অর্থাৎ যার ব্রহ্মজ্ঞান আছে, তার সংসার নাই; যার সংসার আছে, তার ব্রহ্মজ্ঞান নাই। এই সংসারে বেড়াইতে বেড়াইতে, যদি কেহ ঠিক্‌রাইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে যাইয়া পড়ে, তবেই তার ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু সে পথও রুদ্ধ। কেন না, ব্রহ্মজ্ঞান সংসারের অতীত, লৌকিক জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেটা যে কি, তাও না পাওয়া পর্য্যন্ত, বুঝিবার সাধ্য নাই। সুতরাং, আমরা যখন আমাদের জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানের খবর রাখি না, রাখিতে পারিও না, তখন যা কিছু আমাদের এই জ্ঞানের সঙ্গে সুসমঞ্জস্য নহে, তাহাও অসঙ্গত বা স্ববিরোধী বলিয়াই আমাদের মনে হইবে। জ্ঞানবিরুদ্ধ বা জ্ঞানতীত তখন এক কথাই দাড়াইবে। যা এখন বুঝি না, পরে বুঝিতে পারি, তার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমার জ্ঞানের দ্বারা কোন কালেই যার ব্যাখ্যা হইবে না, তার সঙ্গে সুতরাং কোন কালে আমার কোন সম্বন্ধের কল্পনা, নিতান্তই কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে।

তবে, এ কথা সত্য, আত্মায় পরমাত্মার প্রকাশে মানুষ যে সকল ভাব প্রাপ্ত হয়, তার সকলই যে সে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধির বিচারে আয়ত্ত করে বা ভাষায় সম্যগ্ ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহা নহে। কিন্তু যা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহা তাহার জ্ঞান বিরুদ্ধ বা জ্ঞানের অতীত হইতে পারে না। অধ্যাত্ম বিষয় তো দূরের কথা, মানুষ তো ব্যবহারিক তত্ত্বই ভাষায় প্রকাশ করিতে যাইয়া, হয়রাণ হইয়া পড়ে। মানুষের ভাষায় দুর্ব্বলতা তো পদে পদেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এমন যে প্রচলিত কথা—'খাওয়া,' তা লইয়াই না মানুষ কত বিব্রত। সে ভাত খায়, তাতো সকলেই জানে। কিন্তু কাণমলা, খাবি ও ডিগ্‌বাজী খাইতেও কসুর করে না। কলা, ঘোল ও মাটি একাধিক রকমে খায়। কখন কোন্ রকমে খায়, তা ভাষা নির্ণয় করিতে অসমর্থ; মনের ভাবের সাহায্য লইতে হইবে। নতুবা হিতে বিপরীত ঘটিবে। স্পষ্ট নিরাকার-বাদী, আকার ইঙ্গীতে নহে, কিন্তু স্পষ্টভাবেই যখন স্বীয় ইষ্টদেবতায় মুখ, চরণ, হাত আরোপ করে, তখন কথাটা বুঝিতে ভাষাকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হয়। ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না বলিয়া, কথাটা বুঝি নাই, তা নয়। মানুষ মনের ভাব ব্যক্ত করিতে যাইয়া সর্ব্বদাই রূপক উপমার (analogyর) সাহায্য লয়। উপমার ব্যবহার সম্ভব হয়, জ্ঞানের পক্ষে, উপমার ও উপমেয়ের মধ্যে কোন জাতিগত পার্থক্য নাই বলিয়া। যাঁহাকে উপমা দ্বারা বুঝাইতে যাই, তাঁহার সম্যক ধারণা না থাকিলে, উপমা খুঁজিতে যাওয়া অর্থশূন্য হইত। ভাষার দৈন্য, ভাবের ঘরের শূন্য সূচনা করে না। মানুষের অভিজ্ঞতা দর্শনিক-তত্ত্বে পরিণত হইতে সময় লাগিতে পারে, কিন্তু তাহা জ্ঞানের ব'হিরে থাকিতে পারে না। জ্ঞান বলিতে যদি মানুষের সমগ্র প্রকৃতির সাক্ষ্য ("Human powers of insight in their completest scope"—Howison) বুঝি, তাহা হইলে জ্ঞানাতীত কথাটাই নিরর্থক হইয়া যাইবে।

শেষকথা। আমাদের দেশে অপৌরুষেয় বাণী বা আপ্তবাক্য-বাদ বোধ হয় বৈদেশিক শাস্ত্র-বাদের প্রভাবে প্রাচীন ঋষিদের নির্দ্দিষ্ট পন্থা হইতে কিছু সরিয়া পড়িয়াছে। ঋষিদের শাস্ত্রবাদ—

তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।

অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ।

এখানে জ্ঞানের বিষয় সমূহের মধ্যে উচ্চ নীচের ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান এক। জ্ঞানের যে অংশ ব্রহ্মমুখী, তাহাই শ্রেষ্ঠ। গ্রন্থ-বিশেষকে আপ্তবাক্যের আধার বলা হইতেছে না। যাহা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ এবং আমার জ্ঞানই তাহা নির্ণয় করিবার একমাত্র আলোক। কেন না, বেদাদি যদি তা নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহাও অগ্রাহ্য।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।

অন্যত্তৃণবদগ্রাহ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা ॥

—রামমোহন-ধৃত বৃহস্পতি বচন।

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ। জ্ঞানের আলোকে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহাই শাস্ত্র। সত্যং শাস্ত্রম্। তাহাই কেবল সে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য। সুতরাং অপৌরুষেয় বাণী পুরুষের অনধিগম্য তো নহে-ই, বরং সে সর্ব্ব প্রযত্নে শ্রদ্ধানতচিত্তে স্বীয় জ্ঞানের আলোকে, ভগবত্তত্ত্বের আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়া কৃতার্থ হইবে। এই খানেই তার বুদ্ধিবৃত্তির চরম সার্থকতা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

মহাভারত মঞ্জরী।

সভাপর্ব্ব।

চতুর্থ অধ্যায়—সভানির্ম্মাণ।

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থের নিকট যমুনা তীরে বসিয়া আছেন। এমন সময় ময়দানব আসিলেন। অর্জ্জুনকে বিনীত ভাবে বলিলেন, "আপনি আমাকে খাণ্ডব-দাহ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য আমি আপনার কিছু প্রত্যুপকার করিতে চাহি।" অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, "আপনি উপকার পাইয়াছেন বলিয়া প্রত্যুপকার করিতে চাহিতেছেন, এজন্য আমি আপনার নিকট হইতে প্রত্যুপকার লইতে পারিনা। আপনি যে উপকার করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাতেই আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না।" তথাপি কৃতজ্ঞ ময়দানব কিছু করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন বলিলেন, "তবে আপনি কৃষ্ণের কোন প্রিয়কার্য্য করুন, তাহা হইলেই আমার প্রিয় কার্য্য করা হইবে।" ময়দানব তখন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কোন কার্য্য করিব ?" কৃষ্ণ লোভ-মোহের অতীত। তাঁহার নিজের জন্য কিছুরই প্রয়োজন নাই।
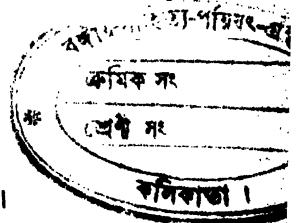
তিনি কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যদি আপনি আমার প্রিয়কার্য্য করিতে চান, তাহা হইলে রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য মনোহর সভা নির্ম্মাণ করুন। তাহা যেন জগতে অতুলনীয় হয়।" ময়দানব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তখনই সেই সভার কল্পনা করিয়া দেখাইলেন। পরে বলিলেন, "হিমালয়ে বহু মণি কাঞ্চন ও স্ফটিক আছে। তাহা দ্বারা সভা নির্ম্মাণ করিব। এখন সে সকল আনিতে চলিলাম।" এই বলিয়া তাঁহাদের কাছে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। ময়দানব একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

কৃষ্ণ আজ দ্বারকায় যাইলেন। তিনি সকলের কাছে বিদায় লইয়া স্বীয় গরুড়-ধ্বজ রথে আরোহণ করিলেন (১)। রাজা যুধিষ্ঠির সেই রথে উঠিয়া সারথির পার্শ্বে বসিলেন। তাহার হস্ত হইতে অশ্বরশ্মি লইয়া রথ চালাইতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সেই রথের মধ্যে দাঁড়াইয়া শ্বেত-চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। ভীম নকুল সহদেব ও বহু পুরবাসী কৃষ্ণের রথের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। এই রূপে সকলে দুই ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিলেন। তখন কৃষ্ণ সকলকে গৃহে গমন করিতে বলিলেন। আর কহিলেন, "আবার আসিব।" তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, মস্তক চুম্বন করিয়া বিদায় দিলেন। এখন রথ অতিদ্রুত ধাবিত হইল। যতক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ পাণ্ডবেরা নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। শেষে তাহা অদৃশ্য হইলে কৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে শূন্য মনে শূন্য গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

যাহার মন উন্নত, সে কি উপকার পাইয়া নীরব থাকিতে পারে? প্রত্যুপকার না করিয়া স্থির হইতে পারে? উপকৃত ময়দানব শীঘ্রই ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলেন। অর্জ্জুনকে "দেবদত্ত" নামক মহাশঙ্খ ও ভীমকে এক ভীষণ গদা প্রীতি-উপহার দিলেন। এখন তিনি সভা-নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইলেন। প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক কার্য্য করিতে লাগিল। চতুর্দ্দশ মাসের অকাতর পরিশ্রমে সকল সমাপ্ত হইল। তখন তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে সংবাদ দিলেন। তিনি ভ্রাতৃগণ ও অমাত্যগণ-সহ দেখিতে আসিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হইলেন। দেখিলেন—ময়দানব সে সভাস্থল পঞ্চ সহস্র হস্ত চতুষ্কোণ করিয়াছেন। তাহার মধ্যস্থলে অতি সুন্দর সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহা যেমন স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হইয়াছে, তেমনি কত স্ফটিক, মণি মুক্তা ও স্বর্ণ দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। তাহার গাত্রে স্বর্ণ ও বিবিধ বর্ণের রত্নরাজি নির্ম্মিত বৃক্ষ লতা পাতা প্রভৃতি বহু বিধ চিত্র খোদিত রহিয়াছে।

ঐ সভাগৃহের চতুষ্পার্শ্বে মনোহর উদ্যান রচিত হইয়াছে। তাহাতে শ্যামল বৃক্ষরাজি ও লতা কুঞ্জ নানাবিধ ফুল ফলে সুশোভিত হইয়া চিত্তরঞ্জন করিতেছে। সেই উদ্যান মধ্যে জলাশয় নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যে আবার বিবিধ বর্ণের পদ্ম ও কুমুদ প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। কত জল-প্রিয় বিহঙ্গম তাহার মধ্যে বিচরণ করিতেছে। জল ও স্থল হইতে পুষ্পগন্ধ উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে।

১। প্রাচীনকালে ভারতের গণ্যমান্য লোকদের পতাকায় একটা একটা জন্তুর মূর্ত্তি থাকিত। কৃষ্ণের পতাকায় গড়ুর ও অর্জ্জুনের পতাকায় কপির মূর্ত্তি ছিল।

তাহার অদূরে আবার স্ফটিক নির্ম্মিত তরঙ্গযুক্ত এক কৃত্রিম সরোবর শোভা পাইতেছে। তাহাতে স্বর্ণ এবং নীল পীত লোহিতাদি বিবিধ বর্ণের রত্নরাজি বিনির্ম্মিত কমল, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি জলজ পুষ্প সকল ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহারা কৃত্রিম হইলেও নিকটবর্ত্তী সরোবর স্থিত প্রকৃতির পুষ্পশোভার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে মধ্যে সেই সকল মণি মুক্তার উপাদানে নির্ম্মিত হংস, বক, সারস প্রভৃতি জলচর পাখী, জীবন্ত পাখীর ন্যায় বসিয়া আছে। কত স্বর্ণ ও মণি মুক্তার মৎস্য সেই জলাশয়ে শোভা পাইতেছে। সকলে মিলিয়া মিশিয়া এক বাস্তব জলাশয়ের ভ্রম-উৎপাদন করিতেছে।

আমরা যদি দিল্লী ও আগ্রার শ্বেত-মর্ম্মরের স্বপ্নময়ী সৌধশোভা না দেখিতাম, তাহার গাত্রে বিবিধ বর্ণের রত্নরাজি বিনির্ম্মিত, খোদিত বৃক্ষাবলী প্রত্যক্ষ না করিতাম, তাহা হইলে এই সভার বর্ণনা কবি-কল্পনা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতাম। বস্তুত, একদিন ভারতের সকলই বিচিত্র, সকলই বিস্ময়-কর ছিল। প্রাচীন ভারত এত উন্নত ছিল, আর আজ আমাদের এত অধঃপতন হইয়াছে যে, আমরা সে ভারতের ধারণা কল্পনা-বলেও করিতে অসমর্থ। (২) ক্রমশঃ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

২। দিল্লী ও আগ্রার এ সকল গৃহের বর্ণনা মৎপ্রণীত 'সম্রাট আকবরে' প্রদত্ত হইয়াছে। নারদ এই সভা দেখিতে আসিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্নের ছলে অনেক উপদেশ দেন ঐ ঐ বিষয়ের অনেক কথা মহাভারতের অন্যান্য স্থানে আছে। আমরা সে সকল একত্রিত করিয়া সাজাইয়া এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায় 'রাজধর্ম্মে' লিখিয়াছি।

অর্থের স্বামিত্ব ও দাসত্ব।

সংসারী মাত্রেই ভোগ্যবস্তুর প্রতি যত্নশীল। যে নয়, সে অসংসারী—অর্থাৎ কোন উচ্চতর ভোগের অধিকারী হইয়া ক্ষুদ্রতর ভোগে বীতস্পৃহ—অথবা শিক্ষা ও সংস্কারগত কোন বিশেষ কারণে তৎসম্বন্ধে যত্নহীন। ভোগ-পরায়ণ ধনী-সন্তানেরা এই কারণে অপব্যয়ী হইয়া অতি শীঘ্র পথের ভিখারী হইয়া পড়ে। আর এক শ্রেণীর ধনবান্ আছে,—তাহারাও ধনের উপার্জ্জক নহে, উত্তরাধিকারীমাত্র,—কিন্তু সেই পিতৃধনে তাহাদের বিকট আকর্ষণ। ইহারা অল্প-প্রাণ অর্থ-দাস মাত্র, এবং পূর্ব্বোক্ত অপব্যয়িগণের বহু নিম্নে ইহাদের স্থান। তাহাদের মধ্যে বরং একটা মুক্তভাব আছে; ইহাদের মধ্যে কিছুই নাই। ইহারা অতি সতর্ক; বাজে খরচের পথ—এমন কি দানাদির পথও—একবারে রুদ্ধ। কারণ, কেবল প্রাণে ভয়—"আজ যদি এই অর্থরাশি আমার হস্তচ্যুত হয়, তাহা হইলে এই অকর্ম্মণ্য 'আমি'টীর স্থান কোথায়?" আগাছাকে যেমন নিজের অস্তিত্ব রক্ষার ভার নিজেকেই লইতে হয়, এ সমস্ত কৃপণকেও তেমনি নিজের রক্ষাভার নিজের উপরই লইতে হইয়াছে। সে জানে, জীবনে সে এমন কিছু করে নাই, যাহাতে অপরে তাহার রক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিবে। সে আরও জানে, সে এমন কিছু কর্ম্মশক্তির অধিকারী নহে যে, আজ পথে দাঁড়াইলেও কালে আবার সে ঘরবাড়ী

—মায় ঠাকুরদালান ও নাচঘর—সবই করিয়া লইতে পারিবে। কাজেই, সে বিষয়ের দাস। অপব্যয়ীর মূঢ়তা ও অবিমৃষ্যকারিতা নিন্দনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঁচিয়া থাকার মত ক্ষুদ্র জিনিষের জন্য সে যে নিজের ভোগ-দীপ্ত জীবনকে নিষ্প্রভ করিতে চায় না, ইহাতে তাহার বুদ্ধিম[illegible]পরিচয় হয়। "বাঁচি ত সুখেই বাঁচিব, সুখ-শূন্য জীবনের অবসানই ভাল"—ইহাই তাহার চিন্তার গতি। কিন্তু, কৃপণ নিজেকে ও জগৎকে পদে পদে বঞ্চিত করিয়া, শুধু ভবিষ্যতের নয়, বর্ত্তমান প্রতি মুহূর্ত্তের চিন্তায়, চির-সংকোচের জীবন যাপন করে। তাহা অপেক্ষা দুঃখের আর কি আছে? পিপীলিকা—সে একটীমাত্র নরপদক্ষেপে প্রাণত্যাগ করে—তাহারও জীবন এই কৃপণের তুল্য দুর্ব্বহ নহে। কারণ, ভগবান্ তাহাকে মানুষের মত চিন্তাশক্তি দেন নাই,—সে পরমুহূর্ত্তের জন শঙ্কিত ও কুণ্ঠিত নহে। কৃপণকে কিন্তু সেই শঙ্কা অনবরত বুকে করিয়া থাকিতে হয়। বাঁচাই তাহার চরম লক্ষ্য। কিন্তু বিধাতার বিধানে সে কামনা পূর্ণ হইবার নহে; মরিতেই তাহাকে হইবে। এ মরণ কি ভয়ানক! বাঁচা ছাড়া যাহার চিন্তা নাই, নিশীথ-নিদ্রা বিসর্জ্জন দিয়াও যাহাকে কল্পিত ঘাতকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়, সে যদি ঠিক্ জানে মরণ অপেক্ষা নিশ্চিত আর তাহার পক্ষে কিছুই নাই—তবে সে কি নৈরাশ্যের অতল সাগরে ডুবিয়া যায় না? বলিতে কি, সে প্রতি মুহূর্ত্তেই মরিতেছে। কারণ বাঁচাই যাহার সর্ব্বস্ব, অথচ মরণই যাহার সুবিদিত পরিণাম, তাহার জীবন মৃত্যুর নিকট ঋণ-গ্রহণ মাত্র; ঋণমাত্র, বর নহে। কুসীদ-জীবী সেই কৃপণও ঠিক্ জানে, এ ঋণ তাহাকে সুদ-সমেত শোধ [illegible]হইবেই। আসল শোধ হইবে মরণে; আর সুদের পরিশোধ—যাহা উত্তমর্ণের নিকট [illegible]র অপেক্ষাও মূল্যবান, তাহার শোধ—হইবে ব্যাকুলতায়, পরপারের শূন্যতা-চিন্তায়, তাহার একমাত্র সত্যবস্তুর সহিত চিরবিচ্ছেদের অসহ্য যন্ত্রণায়। অপব্যয়ী অর্থের স্বামিত্ব ভোগ করিয়া মুক্ত হয়; কৃপণ অর্থের দাসত্ব করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে আত্মহত্যা করে।

শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ।

গান।

(ভৈরবী)

প্রভাতের অরুণ আলোয়
কে ডেকেছে!
আমি যে আর আপন মনে
ঘরে কোণে রইতে পারিনে!
কানন-ভরা কুসুম-গন্ধে
কল-পাখীর মৃদুল ছন্দে
ঝর্ণা-ধারার বিপুল আনন্দে
কে ডেকেছে!

আমার প্রাণে রঙীন রাখী
দিয়ে, সকল হৃদয় ঢাকি
কে ডেকেছে!
(আজ) আকাশ আলো বক্ষে নিয়ে
চল্‌বো সকল বিশ্বে ধেয়ে
সেই বারতা লয়ে, প্রাণে
কে ডেকেছে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

আমরা কি চাই? (২)

অন্তরে "স্বরাজের" উপলব্ধি? না, সমাজে "স্বরাজের" প্রতিষ্ঠা?

আমরা যে "স্বরাজ" পাইবার জন্য দেশটাকে এমন করিয়া তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছি, সেই "স্বরাজ" কি কেবল ভিতরেই উপলব্ধি করিবার বস্তু, না বাহিরে,—আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে,—মানুষে মানুষে যে সকল সম্বন্ধ আছে, সে সকল সম্বন্ধের মধ্যে এই স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করিতে চাই?

এতাবৎকাল এরূপ কোনও প্রশ্ন উঠে নাই; তোলার প্রয়োজনও উপস্থিত হয় নাই। কারণ, এতাবৎকাল যাঁহারাই স্বরাজের কথা কহিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাহাঁরাই স্বরাজ বলিতে একটা রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা বুঝিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এখন নূতন কথা উঠিয়াছে, স্বরাজ ভিতরের বস্তু। ইহাকে অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে। "ইহাতে"—এই সে দিন চিত্ত বাবু তাঁর বরিশালের বক্তৃতায় কহিয়াছেন,—"কোনও system of government এর কথা নাই।" চিত্ত বাবু তাঁর বরিশালের বক্তৃতায় আরও কহিয়াছেন—"স্বরাজ উপলব্ধি কর, নিজের প্রাণের মধ্যে ধ্যান-নিবিষ্ট হও.........বাহিরের সব আশ্রয় ত্যাগ কর। আমাদের একমাত্র আশ্রয় ভগবান, তাঁর স্মরণাপন্ন হও......দৃঢ়তার সহিত নিজের পায়ের উপরে দাঁড়াও। যুক্ত-করে ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা কর—'হে বিধাতা, আমার মধ্যে যে অচেতন পুরুষ আছেন, তাঁকে জাগ্রত কর, আমার হৃদয় নিহিত স্বর্গীয় দেশ-প্রেমকে উদ্বুদ্ধ কর, আমি তার মধ্যে ডুবে যাই'।"

যাহা অন্তরে উপলব্ধি করিতে হয়, নিজের প্রাণের মধ্যে ধ্যান-নিবিষ্ট হইয়া যাহার সাক্ষাৎ-লাভ করিতে হয়, যাহা লাভ করিতে গেলে বাহিরের সকল আশ্রয় ত্যাগ করিতে হয়, আমার মধ্যে যে অচেতন পুরুষ আছেন, তাঁকে জাগ্রত করিতে হয়—সে বস্তু জীবের আত্যন্তিক অন্তরঙ্গ বস্তু। এ বস্তু বাহিরের বস্তু নহে। বাহিরের অবস্থা বা ব্যবস্থার উপরে এ বস্তু লাভ বা সম্ভোগ করা প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে না। এ বস্তু লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়সকলকে বাহ্য বিষয় হইতে, ইন্দ্রিয় সকলের রাজা—মনকে এ সকল ইন্দ্রিয় হইতে, বুদ্ধিকে মন হইতে, আর নিজের আত্মবস্তুকে বুদ্ধি হইতে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাতে আত্ম-সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হয়। এ বস্তুকেই আমাদের প্রাচীন বেদান্তে মুক্তি কহিয়াছেন। আর আমাদের প্রাচীনেরা স্বরাজ শব্দ এই মুক্তির অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। এই মুক্তিলাভ হইলে জীব স্বরাট হয়। 'স স্বরাড্ ভবতি'—ছান্দোগ্য উপনিষদে এ কথা আছে।

এই স্বরাজ-সাধনার তুইটী পথ; অথবা, একই পথেরই দুইটী বিভাগ। প্রথম বিভাগকে ব্যতিরেকী কহে; দ্বিতীয় বিভাগ,—যাহা চরমে ও পরমে গিয়া পৌঁছিয়াছে,—তাহাকে অন্বয়ী বিভাগ কহা যায়। ব্যতিরেকী-পন্থার সূত্র—নেতি, নেতি সাধন;—বর্জ্জন। এই পথে বাহিরের সমুদয় বিষয় ও আশ্রয়কে "আমি নই" বলিয়া পরিহার করিতে হয়। অন্বয়ী পথের সূত্র—সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্মময়ং জগৎ। এই চঞ্চল জগতে যাহা কিছু আছে, সকলই ব্রহ্মময় বা

আত্মময়। এ পথে, এই ভাবটী সাধন করিতে হয়। যাহাকে প্রথমে অনাত্ম বলিয়া পরিহার করিয়াছিলাম, তাহাকেই এখন, বিবেক-বৈরাগ্যাদি দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি ও আত্ম-শুদ্ধি হইলে পরে, আত্ম বস্তু বলিয়া অধিকার করিতে হয়। এইরূপে সাধক যখন আপনাকে সমুদয় বিশ্বের মধ্যে এবং নিখিল বিশ্বকে আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন, তখনই 'স স্বরাড্ ভবতি'—তিনি স্বরাট হ'ন। শাস্ত্রে কহেন, বামদেব ঋষি এইরূপ স্বরাট হইয়াছিলেন এবং সেইআত্মৈকত্ব উপলব্ধি করিয়া 'আমি মনু হইয়াছিলাম,' 'আমি সূর্য্য হইয়াছি' এই ভাবে বিশ্বময় নিজের আত্ম-স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

অকিঞ্চন হইলেও, এ সকল কথা গুরু শাস্ত্র মুখে শুনিয়াছি। এই স্বরাজ-বস্তু যে কি,—যে স্বরাজ অন্তরে উপলব্ধি করিতে হয়, ধ্যান-নিবিষ্ট হইয়া যাহার সাক্ষাৎকার পাইতে হয়, যে বস্তু পাইবার জন্য জীবের মধ্যে যে অচেতন পুরুষ আছেন, তাঁহাকে জাগাইতে হয় এবং তাঁহার মধ্যে ডুবিতে হয়,—সে বস্তু যে কি, ভারতের সনাতন সাধনা এবং সিদ্ধিতে তাহা জানা আছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, আমরা যে স্বরাজের আন্দোলন তুলিয়াছি, যাহার জন্য ইংরাজের শাসন-যন্ত্রকে বিকল করিবার করিবার চেষ্টায় তাহা হইতে সর্ব্বতোভাবে নিজেদের হাত গুটাইয়া আনিবার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান করিতেছি, তাহা কি ছান্দোগ্য উপনিষদের স্বরাজ, না, অন্য কোনও বস্তু?

চিত্ত বাবুর বরিশালের বক্তৃতার পূর্ব্বে দেশের, অপর কোনও আধুনিক "স্বরাজ-সাধক" স্বরাজ বলিতে এই অন্তরঙ্গ বস্তু বুঝেন নাই। চিত্ত বাবু এখনও যে নিজে স্বরাজ বলিতে ছান্দোগ্য উপনিষদের স্বরাজ বুঝেন, এমন কথাও সাহস করিয়া বলা যায় না। তাঁর বরিশালের বক্তৃতাতেই তিনি কহিয়াছেন—

> স্বরাজ মানে, ভারতে হিন্দু-মুসলমানে মিলে যে নূতন জাতি গঠিত হয়ে উঠ্‌ছে, এই জাতির যে যথার্থ প্রকৃতি, তার অনুকূল যা', তাই স্বরাজ।

চিত্ত বাবুর এই কথার মধ্যে তিনটী বিষয়ের উল্লেখ আছে। প্রথম, ভারতে একটী নূতন জাতি গঠিত হয়ে উঠ্‌ছে; দ্বিতীয়, হিন্দু আর মুসলমান মিলিত হইয়া এই নূতন জাতিটা গড়িয়া উঠিতেছে; তৃতীয়, এই গড়ন্ত নূতন জাতির একটা যথার্থ প্রকৃতি আছে। আর এই তিনটী বিষয় বুঝিলে পরে, এই নূতন জাতির প্রকৃতির অনুকূল যে স্বরাজ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব।

প্রশ্ন এই, চিত্ত বাবু এখানে যে স্বরাজের সংজ্ঞা দিয়াছেন, সেই স্বরাজ বস্তু কি ভিতরের বস্তু? ভারতের এই গড়ন্ত নূতন জাতির যথার্থ প্রকৃতি যে কি, ইহা অন্তরে উপলব্ধি করিলেই কি আমাদের স্বরাজ-লাভ হইবে? প্রথম কথা এই, হিন্দু-মুসলমানে মিলিত হইয়া ভারতে যে নূতন জাতি গড়িয়া উঠিতেছে তাহার যথার্থ প্রকৃতির সাক্ষাৎকার লাভ করিব কোথায়? সেও কি আমার অন্তরে? আমার মধ্যে যে অচেতন পুরুষ আছেন, তাঁহার ভিতরে? না, আর কোথাও? তারপর, হিন্দু আর মুসলমানে মিলিয়া ভারতে একটা নূতন জাতি গড়িয়া উঠিতেছে। ইহার অর্থ এই যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পরের সম্বন্ধের উপরে চিত্ত বাবুর এই নূতন জাতিটা গড়িয়া উঠিতেছে। হিন্দু মুসলমান নয়, মুসলমান হিন্দু নয়। ইহারা দুইটী পরস্পর বিভিন্ন বস্তু। দুইটী বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কোনও সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইলে, একটা

সামান্য-ধর্ম্মের প্রয়োজন হয়। যেখানে দুই বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সামান্য-ধর্ম্ম না থাকে, সেখানে ইহাদের পরস্পরের কোনও সম্বন্ধের আশ্রয়ও থাকে না। সম্বন্ধ মাত্রেই একটা সামান্য-ধর্ম্মের অপেক্ষা রাখে। এ সকল কথা ইংরাজী শিখিয়া পাই বা না পাই, আমাদের ইংরাজী-শিক্ষার দুষ্ট-সম্পর্ক-বর্জ্জিত প্রাচীন বেদান্ত দেখিয়া বুঝিয়াছি। সুতরাং, এ কথাটাকে ইংরাজী-শিক্ষার আবর্জ্জনা বলিয়া চিত্ত বাবুও উড়াইয়া দিতে পারিবেন না।

এখন কথা এই, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটা সাজাত্য বা জাতিগত সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে বা উঠিয়াছে, তাহার আশ্রয়ীভূত সামান্য-ধর্ম্মটা কি? এ সামান্য-ধর্ম্মটাকে কি আমরা আমাদের অন্তরে উপলব্ধি করি, না, বাহিরে প্রত্যক্ষ করি? আত্মার মধ্যে ধ্যান-নিবিষ্ট হইয়া যখন মুসলমানকে দেখি, তখন তাহাকে আত্মবস্তু রূপেই প্রত্যক্ষ করি। আমার মধ্যে যিনি আমার অন্তরাত্মারূপে বিরাজ করিয়া আমার জীবনের সাক্ষী হইয়া আছেন, যাঁহার মধ্য দিয়া আমি জগতের রূপরসাদি ভোগ করিতেছি, যিনি আমার হৃষিকেশ-রূপে ইন্দ্রিয় সকলকে নিজ নিজ বিষয়ে প্রেরিত করিতেছেন, তিনি সর্ব্বভূতান্তর্যামী, তিনি মুসলমানের মধ্যে, তাহার অন্তরাত্মারূপে বাস করিয়া তাহারও জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। আমার অন্তরের বা ভিতরের এই অন্তর্য্যামী পুরুষের মধ্যে আমি মুসলমানকে মুসলমান বলিয়া দেখি না; জীবরূপেই প্রত্যক্ষ করি। এই আত্মতত্ত্বের ভূমিতে হিন্দু নাই, বৌদ্ধ নাই, খ্রীষ্টান নাই; স্বদেশী নাই, বিদেশী নাই; ভারতবাসী নাই, ইংরাজ নাই। এখানে আছে, কেবল জীব। এখানে জীবত্বই আমাদের সামান্য-ধর্ম্ম। এখানে ইংরাজের মুখের গ্রাস কাড়িয়া আনা যেমন সামান্য-জীব-ধর্ম্ম-বিরোধী, আমার নিজের পুত্রকন্যার মুখের গ্রাস কাড়িয়া আনা সেইরূপই সামান্য-জীব-ধর্ম্মের বিরোধী। এখানে কোনও ভেদাভেদ নাই। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানে যে নূতন জাতি গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা উভয়ের সামান্য-জীব-ধর্ম্মের উপরে গঠিত নহে। হিন্দুও জীব, মুসলমানও জীব, এই বলিয়া ইহাদের মধ্যে এই সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে না। এই সম্বন্ধের আশ্রয় আর একটা কিছু। সে কিছুটা কি?

হিন্দু ভারতবর্ষের লোক, অর্থাৎ স্মরণাতীত কাল হইতে এই ভারত ভূমিতেই বাস করিতেছে। আর মুসলমানও সাত আট শত বৎসর ধরিয়া, এই ভারতবর্ষে বসবাস করিতেছে বলিয়া ভারতবর্ষের লোক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, এক দেশে বাস করাটাই ইহাদের মধ্যে এখন একটা সামান্য-ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। অতএব, ভারতবাসীত্ব-রূপ যে সামান্য-ধর্ম্ম, তাহারই উপরে এই নূতন সম্বন্ধটা গড়িয়া উঠিতেছে? ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও এই সম্বন্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত যে স্বরাজ, তাহা, যে বস্তুকে অন্তরে উপলব্ধি করিতে হয়, সেরূপ আধ্যাত্মিক বস্তু হয় না।

কিন্তু আমরা যে স্বরাজের কথা কহিতেছি, তাহা কি কেবল একটা ভৌগলিক বস্তু? একই ভূভাগে পরস্পরের নিকটে প্রতিবেশীরূপে বসবাস করাতে, আমাদের উভয়ের চরিত্রে ও ব্যবহারে, চিন্তাতে ও সাধনাতে যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই কি এই নূতন জাতির যথার্থ প্রকৃতি বলিব, এবং, এই প্রকৃতির অনুকূল যাহা, তাহাকেই স্বরাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইব?

এই বাঙ্গলাদেশে হিন্দু মুসলমানের দরগায় সিন্নি দেয়; মুসলমান হিন্দু দেবদেবীর নিকটে বলি লইয়া আইসে। এই যে পরস্পরের মধ্যে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটা উদারতা গড়িয়া উঠিয়াছে, এই বস্তুটি চিত্ত বাবু যে নূতন জাতির কথা কহিতেছেন, তাহার মূল প্রকৃতির অঙ্গীভূত বটে। এইরূপ আরও দুই দশটা লক্ষণের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহা দ্বারা ভারতের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের সম্বন্ধের মূল প্রকৃতিটা অল্প বিস্তর বুঝিতে পারা যাইবে। প্রশ্ন এই, এই গুলির অনুকূল যাহা তাহাকেই কি স্বরাজ বলিব ?

তারপর, হিন্দু-মুসলমানের এই সম্বন্ধের মূল প্রতিষ্ঠা কি ভৌগলিক, না আর কিছু ? এরূপ কল্পনা করা ত সম্ভব যে, সমগ্র পঞ্জাব-প্রদেশ কাবুলের আমীরের অধীনে থাকিতে পারিত, আর সমগ্র অন্ধ্র-প্রদেশও অবস্থা বিশেষে হায়দ্রাবাদের নিজামের শাসনাধীনে থাকাও একেবারে অসম্ভব ছিল না। এইরূপে পশ্চিমে একটা স্ব-তন্ত্র ও স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র, আর পূর্ব্বে ইহারই মতন আর একটা মুসলমান রাষ্ট্র থাকিলে, এই সকল রাষ্ট্রের মুসলমানের সঙ্গে বাঙ্গলার বা বোম্বাইয়ের, অযোধ্যা এবং প্রয়াগের, কিম্বা গুজরাটের বর্ত্তমান হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে, চিত্ত বাবু যে নূতন জাতি গঠিত হইয়া উঠিতেছে বলিতেছেন, সেরূপ একটা নূতন জাতি কি গড়িয়া উঠিত ? কিম্বা, এখন আমরা যেমন আফগানিস্থানের বা পারস্যের মুসলমানদিগকে আমাদের জাতির লোক বলিয়া স্বীকার করি না, সেইরূপ তখন পঞ্জাবের বা অন্ধ্রের মুসলমানদিগকেও নিজেদের লোক বলিয়া জানিতাম না। সুতরাং, হিন্দু-মুসলমানে মিলিয়া ভারতে যে নূতনজাতি গড়িয়া উঠিতেছে, কেবল একদেশে বাস করাতেই এই জাতির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কেবল এক দেশে বাস করি বলিয়া নয়, কিন্তু আমরা এক রাষ্ট্র-শক্তির অধীনে আছি, একই রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা আমাদের ধন, মান, প্রাণ রক্ষিত এবং আমাদের পরস্পরের ব্যবহারিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বলিয়া, হিন্দু-মুসলমানের এই নূতন জাতি গড়িয়া উঠিতেছে। সুতরাং, এই জাতির প্রতিষ্ঠা অন্তরে নহে, বাহিরে; ধর্ম্ম-সাধনে নহে, রাষ্ট্রীয়-শাসনে। আর এই নূতন জাতির স্বারাজ্য অন্তরে উপলব্ধি করিবার বস্তু নহে; কেবল ধ্যান-নিবিষ্ট হইয়া এ বস্তুলাভ হইতে পারে না। এই বস্তুকে সমাজে, রাষ্ট্রীয় শাসনে, আমাদের জাতীয় জীবনের বহিরঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই স্বরাজ কেবল ভিতরের কথা নয়; ভিতরে ইহার জন্য সংকল্প জাগাইতে হইবে, সত্য। কিন্তু, বস্তুলাভ হইবে বাহিরে; ভিতরে নয়। এ কথাটা বুঝিলে, স্বরাজটা system of administration নয়, এরূপ বাগ্‌জাল বিস্তার করা অসাধ্য হইয়া পড়ে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

শঙ্খ।

[গাথা]

নন্দিতা নীল সিন্ধু-মাতার
উজলি শীতল অঙ্ক,
উর্ম্মি-মথিত উছল বক্ষে,
গোপন হিয়ার সুরভি কক্ষে,
সার্থক কোন্ সাধনা লক্ষ্যে
লালিত তুমি, হে শঙ্খ!

ত্যজি অতলের সুশীতল গেহ,
মাতৃ-মমতা-বর্দ্ধিত স্নেহ,
লইয়া শুভ্র কঙ্কাল দেহ
তোমার সমুত্থান ;
মহা-মহর্ষি দধিচীর মত,
নীরবে সাধিলে লোক-হিত-ব্রত,
জীবনে মরণে হয়ে সংহত
পরাণ করিলে দান।

ছাড়িয়া কোমল জননীর কোল,
ধরায় ছড়ালে সুধা-হিল্লোল,
স্নিগ্ধ তীব্র গম্ভীর রোল,
বাজিল গগন গায় ;
মধুর ধ্বনির রন্ধ্রে রন্ধ্রে,
মঙ্গল নাচে জীমূত মন্ত্রে,
গ্রহ-তারা আর তপন-চন্দ্রে
মুগ্ধ নয়নে চায়।

নব স্বরলোক করিয়া সৃষ্টি,
ভূতলে ঢালিলে আশীষ-বৃষ্টি,
কোন্ স্বপনের স্নিগ্ধ দৃষ্টি
বুলাইল স্নেহ-কর!
সুধা-কণ্ঠের মঞ্জুল রবে,
মোহিত মগন বিশ্ব-মানবে,
বিমল শান্তি-পীযুষ-আসবে
মগ্ন হে চরাচর।

শুভ মঙ্গল শোভন-কর্ম্মে,
অশুভ-নাশন পূজন-ধর্ম্মে,
বাজে তব রাগ সকল মর্ম্মে,
সম-ভাবে সুখে দুখে ;
তরুণ অরুণে করুণ লহরে,
তব গুঞ্জন গগণে বিহরে,
থমকিয়া উষা চমকি শিহরে,
লুকায় রবির বুকে।

প্রভাত-ককালি-ধ্বনির লগনে,
বাল-রবি হাসে উদয় গগনে,
জাগ্রত ধরা কর্ম্ম-মগনে
গাহে জীবনের গান ;
মধ্য-দিনের তপ্ত তপনে,
রক্ত-রবির আঁখির দাপনে,
তব ওঁ-কার মন্ত্র-বপনে
বাজে মঙ্গল তান।

দিনকর যবে মরণের শ্বাসে,
দিবা অবসানে ম্লান মুখে হাসে,
সম্ভাষো তারে গম্ভীর ভাষে
তুমি হে বৈতালিক!
সন্ধ্যা-বধুর আবাহন-রাগে,
সান্ধ্য-গগণে ধ্বনিছ সোহাগে,
ক্লান্তি-কুহেলা ক্ষান্তির যাগে
তুমি মহা-ঋত্বিক।

তব ফুৎকারে আঁধার বিনাশে,
নিশীথে আলোক-অনল বিকাশে,
সে অনলে শশী-তারকারা হাসে
পরি কৌমুদী-মালা ;
তটিনীর বুকে পাদপ-নিকরে,
দেবালয়ে পথে সৌধ-শিখরে,

পুলক-প্লাবিত জ্যোছনা ঠিকরে—
স্বরগ-স্বপন ঢালা।

শুনিয়াছ তুমি, উদার মহান্—
মহা-সাগরের কল্লোল-গান,
সে সুগম্ভীর ভৈরব তান
প্রাণের পরতে জাগে;
সিন্ধুগামিনী নদীর ভাষণ,
শিখায়েছে সুধা কল-কল স্বন,
কালের ঝুলনে মৃদু ও ভীষণ
হিন্দোলে সুর-রাগে।

মন্দিরে তুমি আরতি-অঙ্গ,
উৎসব-দিনে উলাস-রঙ্গ,
উদ্বাহে উলু-রবের সঙ্গ
তব মঙ্গল ধ্বনি;
তোমার আরাবে যোদ্ধ-পরাণ,
বর্ম্মের নীচে বহিছে তুফান,
পিধান-বদ্ধ লুব্ধ কৃপাণ
নাচে মৃদু ঝনঝনি।

তোমারে পাইয়া মদন-মোহন,
ছাড়িল ললিত মুরলী-গাহন,
বিফল গোপীর চটুল চাহন,—
পিরীতির রস গীত;
শঙ্খ হে, তব ডঙ্কার রবে,
ভারত-যুদ্ধে সাজে কৌরবে,
ক্ষত্র-শোণিত-মহা-উৎসবে
তুমি ছিলে পুরোহিত।

হিন্দোলে যবে বাসুকীর শির,
ঘন কম্পনে নাচে ধরা-নীর,
তব ভৈরব-নিনাদ গভীর
সঘনে ফুকারি ডাকে;
নিদাঘ-তাপের প্রদাহ যেমন,
তেমনি সে স্বর দহে তনু-মন,
কাঁপায়ে ভূধর কান্তার-বন,
গগণে নাচিতে থাকে।

ভেদিয়া যখন মেঘ-আবরণ,
ঠিকরি আকাশে বিজলী-বরণ,
ভীষণ দৈত্য করি গরজন
ভূতলে নামিয়া আসে;
তখন ব্যাপিয়া নিখিল ভুবনে।
তব নাদ বাজে ভবনে ভবনে,
বসিয়া রুদ্ধ দ্বার-বাতায়নে
কম্পিত সবে ত্রাসে।

উৎসব মাঝে বন্ধুর দল,
গৃহ-প্রাঙ্গণে করে কোলাহল,
দুঃখ-দিনের চক্ষের জল,—
কেহ নয় তার ভাগী;
তুমি জ্বালাইয়া মঙ্গল-বাতি,
শুভদিনে সুখে কর মাতামাতি,
নীরবে কাটাও সুদীর্ঘ রাতি
রোগের শিথানে জাগি।

ধন্য হে তুমি সুধীর সুজন,
অম্বুনিধির বুক-চেরা ধন,
মরণে পেয়েছ নব যৌবন—
কোমল করুণ প্রাণ;
নবীনার নব সঙ্গ-সরসে,
লালসা-লুপ্ত অধর পরশে,
বাজাও রাগিনী ললিত হরষে,
উছলে পুলক-বান।

চন্দ্রের চারু অমল জ্যোছনা,
যে নারীর পদ-নখর-তুলনা,
তুমি হে তাহার গ্রীবার কামনা—
কম্বু তোমার নাম;
সার্থক তব নন্দিত স্বরে,
নন্দন নাচে প্রতি ঘরে ঘরে,

সকল বেদনা গুমরিয়া করে
মঙ্গলে বিশ্রাম।

রমনী অধরে পতিয়া আসন,
গুঞ্জরি কর প্রণয়-শাসন,
সোহাগ জড়িত রাখীর বাঁধন
বেঁধেছ সতীর করে;
যে ভবনে তুমি রয়েছ অচলে,
চঞ্চলা সেথা আছে অবিচলে,
জনার্দ্দনের চারু করতলে
শোভিছ পুলক-ভরে।

কোটি-অর্ব্বুদ করি পরাভব,
তোমার সংখ্যা জাগে অভিনব,
অমূল তোমার বিত্ত-বিভব,
উঠেছে উদধি ছাপি;
তাই কি লক্ষ্মী পদ্মের নীরে—
বিছায়ে চরণ তোমার শরীরে,
ভক্ত মানবে ডাকিছে সুধীরে
হাতে লয়ে হেম ঝাপি?

জীবন-প্রভাতে মেলিয়া নয়ান,
শুনিনু প্রথম তব শুভ গান,
শিশির-সিক্ত কুসুম সমান
যে দিন ফুটিল হিয়া;
যৌবনে কোন্ মুখর নিশিতে,
তব মঙ্গল সুধা সঙ্গীতে,
বাঁধিল আমারে প্রেম-শীকলিতে
প্রাণের পরাণ প্রিয়া।

আজি মরণের কূলে দাঁড়াইয়া,
উৎসুক আমি রয়েছি চাহিয়া,
জীবন-বীণাটি উঠিবে গাহিয়া
তোমার রাগিনী কবে?
শেষ খেয়া যবে লইয়া আমায়,
নীরবে নাচিবে অকূল সীমায়,
শ্রান্ত পরাণ যেন গো ঘুমায়
তোমার মহান্ রবে।

—দরবেশ।

দুই দিক।

১ম ব্যক্তি। কলকারখানা গুলা বসিয়া গেলে বাঁচা যায়; নতুবা অন্নাভাবেই সকলে মারা পড়িবে।

২য় ব্যক্তি। আমার কিন্তু কলকারখানায় তত শ্রদ্ধা নাই। তাহাতে ভারতীয় প্রকৃতির বিশেষত্ব নষ্ট করিবে।

১ম। অন্য ভাবেও আমাদের বাঁচিবার উপায় নাই।

২য়। সে কথার বিচার পরে হইবে, কিন্তু জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাইয়া বাঁচা যে মরণেরই নামান্তর।

১ম। দেহটা ত থাকিবে, হাড় থাকিলে 'মাস' পরে আপনিই আসিবে।

২য়। যদি 'মাসের' অনুকূল মালমসলা প্রস্তুত থাকে। কলকারখানা মুখরিত সভ্যতার মধ্যে ভারতীয় শান্তভাবের উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত থাকিবে কি?

১ম। না হয়, নূতনই একটা কিছু হইল, তাহাতেই বা দোষ কি?

২য়। নূতনত্ব লইয়াই ত জীবনের গতি, তাহা ত আসিবেই। কিন্তু নূতনের গ্রহণ আর পুরাতনের বিসর্জ্জন এক কথা নহে; পুরাতনেরই ভিত্তির উপর নূতনের প্রতিষ্ঠা হয়।

১ম। নূতনের উপরই না হয় নূতনের প্রতিষ্ঠা হইল ; দোষ কি ?

২য়। প্রথম দোষ, অপব্যয় ; পুরাতনকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে চাহিলে, প্রকৃতির এতদিনের পরিশ্রমকে অস্বীকার করিতে হয়। আর এক দোষ, অবিমৃষ্যকারিতা। বিনাদোষে বর্জ্জন করার মধ্যে অপরাধও আছে। সে অপরাধ সীতা-বর্জ্জনেই সীমাবদ্ধ করিলে চলিবে না ; সভ্যতা-বর্জ্জন সম্বন্ধেও সে কথা খাটে।

১ম। বর্জ্জন করিলেই যদি পুরাতন বিলুপ্ত হয়, তবে তাহার বিলুপ্ত হওয়াই উচিত।

২য়। সে কথা সত্য। কিন্তু জানকীকে বনবাসে পাঠাইয়া ঐ যুক্তির আশ্রয় লইলে কি রামচন্দ্রের সাফাই হয় ? যাহার জোর আছে সে বাঁচুক, যাহার নাই সে মরুক—এ বলিলে ত অনেক কাজ কমিয়া যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বও কমে,—হৃদয় ও মস্তিষ্ক দুই-ই। পুরাতন সভ্যতাটা পারে ত অসহায় অবস্থাতেই সংগ্রামে জয়ী হউক, নয় ত মরুক—এরূপ কথা না যুক্তি-সঙ্গত, না ধর্ম্ম-সঙ্গত।

১ম। কিন্তু পুরাতন যে মরিতেছে, তাহা বাঁচাইয়া রাখা যে অসম্ভব।

২য়। গ্রীস্ মরিয়া আবার নূতন ইউরোপের ঘাড়ে চাপিয়াছে,—মানব-চক্ষুর অন্তরালে তাহার ভিতরে প্রাণ লুক্কায়িত ছিল। ভারতেরও যদি প্রাণ থাকে, ত' আবার কোন নূতন সভ্যতার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে। এই হিসাবে সত্য কাহারও মুখাপেক্ষী নহে,—কিন্তু ভারত যে আমাদের ? 'মরিতেছে' দেখিয়া ঔদাস্য-প্রকাশ কি আত্মীয়ের কাজ ? হয় ত "বাঁচিবে না" ইহাই ঠিক্,—কিন্তু তাহাকে বাঁচাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কি ভারত-সন্তানের কর্ত্তব্য নহে ? সে কর্ত্তব্য করা হইয়াছে কি ?

১ম। সে কর্ত্তব্য কাহার ?—যে ভারতকে বুঝিয়াছে তাহারই।

২য়। আর যে সুযোগ থাকিতেও বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, সে বুঝি আরাম-ভোগের অধিকারী ? রেহাই কাহারই নাই, কাজ সকলকেই করিতে হইবে। এসব ক্ষেত্রে নেল্‌সনের সেই মহাবাক্য স্মরণীয়—England expects everyone to do his duty। সৈন্য সেনাপতির ভেদ নাই, ক্ষুদ্র বৃহতের ভেদ নাই, জ্ঞানী অজ্ঞানীর ভেদ নাই, শক্তাশক্তের ভেদ নাই ; প্রত্যেকেই আসুক মার সেবা করুক। মা বাঁচিবেন। আর মরেন ত সুখী হইয়াই মরিবেন। সঙ্গে সঙ্গে যাহারা মরিবে তাহারাও ধন্য হইবে।

১ম। কিন্তু উপায় কই ? ধরুন, আমার ভারত-সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব ; কোথায় ও কিরূপে তাহার পূরণ হইবে ?

২য়। কেবল 'ধরুন' এর উপর অতটা উত্তর দেওয়া যায় না। জ্ঞানাভাবটা যদি সত্য হয়, তাহার দূরীকরণ যদি অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, তাহা হইলে পন্থাও নিশ্চয়ই আছে।

১ম। সেই পন্থার কথাই জিজ্ঞাস্য।

২য়। মনে করুন, এই ভারতীয় সাহিত্য।

১ম। এ সাহিত্য ত অনেকেই পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন, কই তাঁহাদিগকে ত বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়া বোধ হয় না।

২য়। তাঁহারা সাহিত্যের রসে আপনাদিগকে সিক্ত না করিয়া আপনাদের রসে সাহিত্যকে তিক্ত করিয়া থাকিবেন। আর, পনর আনা ক্ষেত্রে, তাহাই ঘটে। Open mind রাখা সহজ ব্যাপার নহে। সেই জন্যই শয়তান ধর্ম্মগ্রন্থে নিজ-সমর্থন খুঁজিয়া পায়, ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিক অসভ্য-ভারতে polyandry দেখিতে পান, সর্ব্বভূক্‌-পণ্ডিত বেদে গো-হত্যার বিধান-দর্শনে পুলকিত হন, আর বঙ্কিম-যুগের সেই নীতি-পাঠ-কুশল ছাত্রটী, "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু"র দোহাই দিয়া, মাঘের শীতে পরের স্নানে নিজের স্নান ও নিজের আহারে পরের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিশ্চয় করিয়া, পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে।

১ম। কিন্তু নিজেকে সর্ব্বতোভাবে ঠেকাইয়া রাখা কি সম্ভব ?

২য়। জ্ঞানের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য তাহা যে প্রয়োজন। এই দেখুন না, যন্ত্র-শিল্প। সে জন্য বিলাতী বই ও চিন্তা ত চাই-ই ; তা ছাড়া, বিলাতী পোষাকটা পর্য্যন্ত বাদ দেওয়া চলে না। অবশ্য অভিজ্ঞ শিক্ষকও প্রয়োজন।

১ম। যদি না পাওয়া যায় ?

২য়। একলব্যের মত সাধনশীল হইলে, মৃন্ময় শিক্ষকেও চলে ; আর শিক্ষা-প্রয়াস অভিমান-প্রসূত না হইলে, জ্ঞানলাভও সহজ হয়।

১ম। অধ্যবসায়ের মূলে কিন্তু অভিমান থাকেই ; একলব্যেরও ছিল।

২য়। একলব্যের যে অভিমান, তাহার প্রকৃত নাম, নিষ্ঠা। তাহা অহঙ্কার নহে। হইলে, দ্রোণ-মূর্ত্তি কখনই তাঁহার উপাস্য হইতে পারিত না।

১ম। নিষ্ঠা ও সদ্‌গুরু-সম্পদের অভাবে কি বসিয়া বসিয়া সময় নষ্ট করিতে হইবে ?

২য়। কাল-প্রতীক্ষা আবশ্যক।

১ম। তাহা ত' আলস্য-চর্চ্চার নামান্তর।

২য়। কাল-প্রতীক্ষা যে আলস্যে সময় নষ্ট করা নহে, গত যুদ্ধে ইংরাজ তাহা বিশেষভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছেন। কালকে প্রসন্ন করিতে হয় ; আপনার দোষ ত্রুটী যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া লইতে হয়। সুপ্ত সিংহের মুখে কোন দিনই আপনা হইতে মৃগ আসিয়া প্রবেশ করে না। কিন্তু, গুপ্ত সিংহ আর সুপ্ত সিংহ এক নয়। হাঁপাহাঁপি কে কাজ বলে না—অনেক সময় তাহা অকাজ। আর, তাহার অভাবকেও আলস্য বলে না। বিরলে, শান্তভাবে, করিবার কাজ বাস্তবিকই অনেক আছে।

১ম। সাহিত্য-চর্চ্চার কাল-প্রতীক্ষা কিরূপ ?

২য়। বাহিরে সৎশিক্ষকের সন্ধান ও ভিতরে আপনার অকিঞ্চনতা স্মরণ। তাহাতে অহঙ্কারের মালিন্য ঘুচে, এবং জ্ঞানের দেবতা নিজেই আসেন বা কোন সৎশিক্ষকের মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেন।

১ম। অকিঞ্চনত্ব-বাদ স্বামীজীর শিক্ষার বিরোধী।

২য়। তিনি বলেন—"বীর হও"। তাঁহার গুরুদেব বলেন—"মায়ের কাছে কাঁদো"। গুরুশিষ্যে এ বিরোধ কি সম্ভবপর ? সমন্বয় আছে—পাত্র-বিচারে। যাহারা সত্যই অকিঞ্চন, অনুচিকীর্ষু, দুর্ব্বল—তাহাদিগকেই তিনি মনুষ্যত্বের গৌরব ও অধিকার গ্রহণে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু

যাঁহারা পৌরুষশালী তাঁহাদের পন্থা—ত্যাগ ও আত্ম-বিলয়। বিনয়, গুণের ভূষণ-মাত্র নয়,—আশ্রয়।

১ম। না হয়, কাঁদাকাঁটি করিয়া জ্ঞানলাভ বা গুরুলাভই হইল, কিন্তু মাঝের সময়টা যে দেশের পক্ষে বৃথায় গেল।

২য়। সে চিন্তা আমার নহে। বিশ্বের ভার বিশ্বেশ্বরের। আমার উপর ভার আমার নিজ সামর্থ্যের উপযুক্ত সামান্য কিছু করিয়া তোলা। তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকিব। জাহাজের খবরে আমার প্রয়োজন?

১ম। কাজের সুবিধা হয়।

২য়। কল্পনার মাদকতায় কর্ম্মের দিকে উত্তেজনা আইসে; কিন্তু, অবসাদ কৃত্রিম উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। আর না হয় মনেই করা গেল যে, নিজের দায়িত্বকে খুব বিরাট্ কল্পনা করিয়া, সত্য সত্যই অনেকটা কাজ শেষ করা হইল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সে কর্ম্ম-প্রচেষ্টার অভাবে বিশ্বের কোন্ পরমাণুটী বিভ্রষ্ট হইত?

১ম। এই অকিঞ্চনতা বোধ লইয়া লোকে কাজ করিতে যাইবে কেন?

২য়। জগদুদ্ধারের কমে আর কোন মতেই চলিবে না? তাহা হইলে, অবস্থা সাংঘাতিক। হ্রদের জলে লাফালাফির সময় শফরীকে ভাবিতেই হইবে, সে হ্রদটীকেই কৃতার্থ করিতেছে?

নিজের তৃপ্তি কি যথেষ্ট নহে? উদ্বুদ্ধ জ্ঞান, ব্যথিত প্রেম ও উদাত্ত শক্তির পরিতৃপ্তিতে কি প্রাণ পূরে না? অথচ, ভিতরের এই অদম্য কর্ম্ম-প্রেরণায় জগৎ সংসার চঞ্চল, একটী পরমাণু পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। ইহাই বিশ্বের কর্ম্মানন্দ। এ আনন্দ-লহরীর মধ্যে, কোন্ দুর্ভাগ্য ইচ্ছা করিয়া বসিয়া থাকিবে?

শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ।

উৎসর্গিতা

ভিক্ষুণী মহামায়া—
ভিক্ষা মাগেন, বুদ্ধ-করুণা লভিয়াছে যেন কায়া।
যেথা ক্রন্দন হাহাকার, যেথা যেথায় ব্যথিত প্রাণ,
সেথানে তাঁহার আকুল মর্ম্ম করিতেছে মায়া দান।

যৌবনে শোভে দেহ,
রূপেরি মতন অতুল কান্ত অন্তরে ভরা স্নেহ।
স্বর্গের যেন মূর্ত্ত-মাধুরী এসেছে ভুবনে নেমে,
জীবন লভেছে বিধাতার যেন অপার উছল প্রেমে।

ধনী সে রতন দাস—
লম্পট যুবা, পাশব-আচারী, নগরবাসীর ত্রাস।

মহামায়া যবে করেন ভিক্ষা, কহিল তাঁহারে কামী,—
"ভাণ্ডার মম উজাড় করিয়া তোমারে সঁপিব আমি।
বিনিময়ে চাই পরাণ-পাগল ওই তব দেহ ছবি;
ভিক্ষা লওগো, ঢেলে দিব আজি, আমার রত্ন সবি।"
ভিক্ষুণী ঘৃণা ভরে,
চলিলেন পুনঃ অপর দুয়ারে, বিন্দু-কৃপার তরে।
চকিতে চিত্তে উঠিল দ্বন্দ্ব—কেন না নিলাম দান?
বিশ্বের কাছে নিঃশেষ করি সঁপেছি ত মন প্রাণ!
মিথ্যা তাহা যে, মিথ্যা সকলি, ছলনা সকলি মোর,
নিজেরে তেমনি রেখেছি পূর্ণ, সত্যের কাছে চোর!
আমার মাংস বিনিময়ে যদি ক্ষুধিত অন্ন পায়;
এ দেহ পিণ্ড নরকে যাউক ক্ষতি কিছু নাহি তায়।
বিশ্বের সুখে আমার শান্তি, সেবাই পুণ্য মম।
বিসর্জ্জিব আজ ধর্ম্ম আমার, নির্ব্বান শ্রেষ্ঠতম!

* * *

কহিল রতন দাস—
"আমার দুয়ারে, ওগো ভিক্ষুণী; কি তব আবার আশ?"
ক'ন মহামায়া—"দিব দেহ আমি, দাও তব সব ধন!
তৃপ্ত হউক ক্লান্ত-কাতর-ক্ষুধিত-ব্যথিত জন!"
মুগ্ধ রতন দাস।
ভিক্ষুণী পদে লুণ্ঠিয়া পড়ি কহিল কাতর ভাষ,—
"যে স্নেহে জননী ভীষণ নরক অমরা তোমার কাছে—
জননী আমার, সন্তান তব সে সুধা আজিকে যাচে।"
রতন দাসের সম্পদ সব দুঃখী দীনের ধন,
ভিক্ষুণী সাথে ভিক্ষু রতন সেবিছে জগৎ জন!

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

স্মৃতির সুরভি (১)।

সংসারের দাব-দাহে শান্তির স্বপন
স্মৃতির সুরভি এযে অর্ঘ্য নিবেদন।

মহাকবি নবীনচন্দ্রের "আমার জীবন" প্রথম ভাগ যেদিন উপহার পাইলাম, সেদিনই বিকালে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে তাঁহার প্রিয় নিকেতন "লক্ষ্মী-ভিলায়" গেলাম। তিনি তখন একাকী সম্মুখস্থ কক্ষে বসিয়াছিলেন। আমাকে সস্নেহে তাঁহার নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "তোমায় 'আমার জীবন' পাঠাইয়াছি, বোধ হয় পাইয়াছ। বহিখানি পড়িয়াছ কি? কেমন লাগিল?" আমি বলিলাম, "আপনার 'আমার জীবন' পাইয়াছি। উহা আমার কাছে

এত ভাল লাগিয়াছে যে, আমি ইতিমধ্যেই আগাগোড়া পড়িয়া শেষ করিয়াছি। বহিখানির ভাষা ও রচনা-প্রণালী এত সরস ও চিন্তা-কর্ষক হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন উপন্যাস পড়িতেছি—যেন আপনার কাছে বসিয়া আপনার মুখে আপনার জীবনের কথা শুনিতেছি! কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ 'জীবন' আপনার উপযুক্ত হয় নাই; ইহা সাধারণের কাছে আপনাকে খাটো করিয়া দিবে। বহির মধ্যে 'ষষ্ঠী মাহাত্ম্য', আপনার পাঁউরুটি খাইবার জন্য ব্রাহ্ম হইবার কথা, বিদ্যুৎলতার কথা প্রভৃতি না থাকাই উচিত ছিল।" তিনি একমনে আমার কথা শুনিতেছিলেন; আমি নীরব হইবামাত্র গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "দেখ জীবেন্! তোমরা আমার জীবনকে যত বড় মনে কর, বাস্তবিক তাহা ততবড় নয়; আমার জীবন 'খেলো জীবন'! সে জন্যই আমি তাহা খেলো' ভাবে আঁকিয়াছি।"—আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, লোকে যাঁহাকে দাম্ভিক বলে, একি সেই দাম্ভিক নবীনচন্দ্রের কথা? তাঁহার গভীর আত্মনিষ্ঠাই কি লোকের চক্ষে আত্মম্ভরিতারূপে প্রতীয়মান হইয়াছে?

* * *

পুনরায় কিছুদিন পরে নবীনচন্দ্রের কাছে গিয়াছি। সে দিন দেখিলাম, "লক্ষ্মী ভিলার" একটী ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি শুইয়া আছেন, দরবিগলিত অশ্রুধারায় তাঁহার উভয় গণ্ড প্লাবিত হইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে কোন অচির-মৃতা বন্ধু-পত্নীর জন্য আক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার সেই আক্ষেপ বেশী কিছু নয়—শুধু একটী কথাই তিনি বার বার বলিতেছেন, —"হা, গোপী ঘোষের স্ত্রী মারা গিয়াছেন, তিনি কি চমৎকারই রান্না করিতে পারিতেন!" তাঁহার এ আক্ষেপ আমাদের নিকটে হাসির মতই শোনায়; কিন্তু তিনি ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ রূপেই ডুবিয়া গিয়াছেন, সংসারের আর কিছুর সঙ্গে তাঁহার যেন কোন সম্পর্ক নাই! তিনি অন্যদিন আমাকে দেখিলে কত আদরের সহিত তাঁহার নিকটে বসাইতেন, কত গল্প করিতেন; আজ যে আমি দাঁড়াইয়া আছি, সে খেয়ালও তাঁহার নাই! আমি নিজ হইতে তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া, তাঁহাকে কত ভাবে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু তিনি যেন আমার একটী কথাও শুনিতে পাইলেন না—একটী মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সেই আক্ষেপ-বাণীর বিরাম হইল না! অশ্রুধারাও থামিল না! অবশেষে প্রায় আধঘণ্টা তাঁহার নিকটে নীরবে বসিয়া থাকিয়া, তাঁহাকে প্রবোধ দিবার প্রয়াসে নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরিলাম।—নবীনচন্দ্রের এমনি ধারা অপূর্ব্ব ভাব-তন্ময়তার তুলনা নাই। এরূপ অতুলনীয় ভাব-রাজ্যের অতল তলে ডুবিয়াই তিনি একদিন "প্রভাসে" তাঁহার মানস-নন্দিনী শৈলজার মুখ দিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—

কভু পার্থ পতি, আমি প্রেমে আত্মহারা,
কভু পার্থ পিতা, আমি ভক্তিতে অধীরা।
কভু পার্থ ভ্রাতা, আমি স্নেহে নিমজ্জিতা,
কভু পার্থ পুত্র, আমি বাৎসল্যে পূরিতা।
কভু পার্থ সখা, আমি সখী বিনোদিনী,
কভু পার্থ প্রভু, আমি দাসী আজ্ঞাধিনী।
কভু আমি পার্থ, পার্থ শৈলজা আমার।
অভিন্ন উভয় কভু—নদী পারাবার।

একদিন প্রাতে আমার "সাধনা-কুঞ্জে" বসিয়া কি একটী কবিতা লিখিতেছি, এমন সময় তিব্বত-পর্য্যটক শরচ্চন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যখনই আমাদের বাড়ী আসিতেন, আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া যাইত—তাঁহার প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাসে কাহারও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় ছিল না। সেদিনও মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল! আমাকে বলিলেন, "শীঘ্র কাগজ কলম লও, একটী সঙ্গীত-সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে।" তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান সঙ্গীত-শাস্ত্রের কিছু চর্চ্চা রাখিতেন; তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তখনই কল্পিত "সঙ্গীত-সঙ্ঘের" প্রতিষ্ঠান-পত্র, নিয়মাবলী প্রভৃতি প্রস্তুত হইল। শরৎ বাবু নিজে ইহার সভাপতি হইলেন ও আমরা কেহ কেহ সহযোগী সভাপতি, সম্পাদক, ইত্যাদি হইলাম। আমাদের বিস্তৃত বৈঠকখানা কক্ষই "সঙ্গীত-সঙ্ঘের" স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। উল্লেখ বাহুল্য, কার্য্যতঃ কয়েক তা কাগজের সদ্ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই হয় নাই। কিন্তু তাঁহার কি অদম্য কর্ম্মোৎসাহ! "সঙ্গীত-সঙ্ঘের" ব্যাপার শেষ হইলে, তিনি আমাকে বলিলেন, "জীবেন্! আজ রাত্রে আমি তোমাদের এখানে খাব। আর এই যে আমার সঙ্গে বামনটা দেখিতেছ—যিনি আমার "বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা" বহি অনুবাদের সহকারী,—তাঁহাকেও দুই একখানি লুচি সেই সঙ্গে ফেলিয়া দিও!" ইহা বলিয়াই তিনি হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন—আমরাও তাঁহার সেই হাসিতে যোগ দিলাম। তিব্বত-গৌরব-হারী, বিশ্ববিখ্যাত, তীক্ষ্ণধী শরচ্চন্দ্রের একি শিশুর মত বিচিত্র সরলতা! এরূপ অকপট সরলতা ও হৃদ্যতা যে ক্রমশঃ দুর্ল্লভ হইয়া আসিতেছে।

* * *

এ ঘটনার কয়েকদিন পরেই শরচ্চন্দ্র আবার আমাদের বাড়ী আসিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বদিন "চট্টগ্রাম সাহিত্য-পরিষদের" এক অধিবেশন হইয়াছিল। আমি তাহাতে যোগ দিতে পারি নাই। শুনিয়াছিলাম, স্থানীয় কলেজের জনৈক অধ্যাপক এ অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন, এবং সভান্তে শরৎবাবু, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া, তাঁহার কোন কোন অসঙ্গত উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন। আমি শরৎ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া তাঁহাকে এরূপভাবে অপদস্থ করিলেন কেন? ইহা কি সভার নিয়ম-বহির্ভূত নহে? তৎক্ষণাৎ তিনি সজোরে বলিলেন, "না, ইহা ঠিকই হইয়াছে! তুমি 'নোট' করিয়া রাখ, সভাপতি যদি তাঁহার শেষ অভিভাষণে কোন অন্যায় কথা বলেন, তবে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার সময় উহার তীব্র-প্রতিবাদ করিবে। সভাক্ষেত্রে তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিবার আমাদের আর যে সুযোগ নাই।" অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন, "জীবেন্, তামাসা নয়। তুমি আমার এ কথাগুলি 'নোট' করিয়া রাখ।"

* * *

চট্টগ্রামে "বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের" ষষ্ঠ অধিবেশন আগত-প্রায়। আমি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রস্তাব করিলাম, স্থানীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হউন। কেন না, মহাকবি নবীনচন্দ্রের

পরে, তিনিই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি। আমাদের কার্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে এ সম্বন্ধে উপস্থিত প্রায় কাহারও তেমন মতভেদ দেখা গেল না। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। হটাৎ রাত দশটার সময়, কয়েকজন ভদ্রলোক গাড়ী করিয়া আমার বাড়ীতে উপস্থিত। তাঁহাদের মধ্যে এমনও কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা দয়া করিয়া ইতি-পূর্ব্বে আমার বাড়ীতে আর কখনও পদধূলি দেন নাই। ব্যাপার কি? তাঁহারা সকলে একবাক্যে আমায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, আমি যেন নবীনবাবুর সভাপতি হইবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। তাঁহার অপরাধ? তাঁহার অগ্রজ শরচ্চন্দ্র কোথায় কায়স্থদের গালাগালি দিয়াছেন। আমি কায়স্থ হইয়া এরূপ প্রস্তাব করা আমার পক্ষে ঠিক নয়। আমি নাকি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করিলে, আমার ব্যক্তিগত প্রভাব অতিক্রম করিবার সাধ্য, তাঁহাদের কাহারও নাই! আমার সমস্ত অন্তর একবারে তিক্ত হইয়া উঠিল। আমি বলিলাম, "ইহা তো আপনাদের বৈদ্য বা কায়স্থের সভা নহে। এখানে জাতি বিচার কেন? বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে বা সাহিত্য-ক্ষেত্রে চিরকাল যোগ্যব্যক্তির সম্মান হওয়াই উচিত। আর নবীনবাবু তো আপনাদের গাল দেন নাই, তাঁহার অগ্রজের ক্রটিতে আমরা কেন তাঁহাকে দোষী করিব? যাহা হউক, আমি কাল নিজে নবীন-বাবুর কাছে যাইব। তিনি যদি আমাদের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইতে স্বীকৃত হন, তবে আমি কিছুতেই আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিব না।" তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের দলভুক্ত করিতে না পারিয়া কতকটা নিরাশ হইয়া ফিরিলেন।

তার পরদিন বিকালে আমি কবিগুণাকর নবীনচন্দ্রের "দেব-পাহাড়ে" তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমাকে সস্নেহে তাঁহার নিকটে বসাইয়া বলিলেন, "জীবেন্দ্র বাবু! আমি জানি, কেন আজ আপনি আমার কাছে আসিয়াছেন। যখন এরূপ একটা কথা উঠিয়াছে, তখন আমি আর আমাদের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইতে ইচ্ছা করি না। আপনি আর এ বিষয়ে জেদ্ করিবেন না। আমার দেশের কাজ আমি পশ্চাতে থাকিয়াই করিব।" আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার এ মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলাম না। এই প্রবল আত্ম-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী-যুগে তাঁহার এবম্বিধ আত্ম-গোপনেচ্ছা আমাকে বাস্তবিকই মুগ্ধ ও শ্রদ্ধাবনত করিল। এ ক্ষুদ্রতার রাজ্যে যিনি যত বড়, তিনিই বুঝি তত নিজকে এমনি লুকাইয়া রাখিতে ভালবাসেন!

আর একদিন আমি ও সাহিত্য-শাস্ত্রী বিজয়কৃষ্ণ, কবিগুণাকর নবীনচন্দ্রের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার "দেব-পাহাড়ে" গিয়াছি। তিনি তখন পারিবারিক নানা ঝঞ্ঝাটে একান্ত উত্যক্ত হইয়া সংসারের সহিত সকল সম্পর্ক একরূপ ছাড়িয়া নগরের কোলাহল হইতে বহুদূরে নিভৃত "দেব-পাহাড়ে" তাঁহার বিধবা কন্যাটিকে লইয়া থাকিতেন। আমরা যখন "দেব-পাহাড়ে" উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা-সমাগত-প্রায়; "দেব-পাহাড়ের" সমুচ্চ শিখর হইতে চারিদিকের দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। কিন্তু তখন আমাদের তাহা দেখিবার অবসর ছিল না; "দেব-পাহাড়ে" যে দেব-চরিত্র নবীনচন্দ্র ঋষির মত নির্জ্জন জীবন

যাপন করিতেছিলেন, আমরা তাঁহারই পবিত্র আশীর্ব্বাদ লাভের আশায় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলাম। তিনি আমাদের সাদরে গ্রহণ করিলেন। তিনি তখন তাঁহার সম্পাদিত "প্রভাত" পত্রের জন্য মহাকবি ভারবি-রচিত "কিরাতার্জ্জুন" কাব্যের বঙ্গানুবাদ করিতেছিলেন। আমাদিগকে তাহার কোন কোন অংশ পড়িয়া শুনাইলেন। মূলের সহিত ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, তাঁহার মত সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদে এমন কৃতিত্ব আর কেহই প্রদর্শন করেন নাই। সেদিন তাঁহার পঠিত কবিতার দুইটী পংক্তি এখনও মনে পড়ে—

"মহতের সংসর্গেতে জনমে সুফল,
ঘটে যদি দৈবে কভু তাহাও মঙ্গল।"

সে সময়ে মনে হইতেছিল, আমরাও বুঝি আজ তাঁহার সংসর্গে এমনি মঙ্গলের অধিকারী হইয়াছি। কথা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার কথা আসিল। দেখিলাম, তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতারই সমধিক পক্ষপাতী। যাহা হউক, রাত্রি আসন্ন দেখিয়া আমরা সে দিনকার মত বিদায় লইয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন, "জীবেন্দ্রবাবু! আর একটু বসুন। আমি একটু ভিতর হইতে আসি।" অল্পক্ষণ পরেই তিনি দুইখানি ক্ষুদ্র রেকাবীতে দুইটী সন্দেশ লইয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটী চাকরও দুই গ্লাশ জল লইয়া আসিল। নবীনবাবু বলিলেন, "বাজার বহু দূরে—ঘরে আমার মেয়ের তৈরী যে সামান্য মিষ্টি ছিল, তাহাই আপনাদের জন্য আনিয়াছি, আপনারা একটু মিষ্টিমুখ করুন। আর "দেব-পাহাড়ে" জল তোলা কষ্টকর বলিয়া, আমি পান করিবার জন্য পাকা চৌবাচ্চায় বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিয়াছি, দেখুন, কি চমৎকার!"—এমন অনাবিল স্নেহাদর এ জীবনে আর কি পাওয়া যাইবে?

*　　*　　*

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের" চতুর্থ অধিবেশন ময়মনসিংহে হইয়াছিল। তাহাতে যোগদান করিতে ময়মনসিংহে গিয়াছি। আনন্দমোহন-কলেজ-বোর্ডিংএ আমাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমার কক্ষে আর কয়েকজন বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিও স্থান পাইয়াছেন। "সাহিত্য-সম্মিলন"-অধিবেশনের প্রথম দিন প্রাতঃকালে একজন সৌম্যমূর্ত্তি ভদ্রলোক আমাদের কক্ষে প্রবেশ করিয়া হাসিমুখে সকলকে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের কাহারও কোন প্রবন্ধ "সাহিত্য-সম্মিলনে" পাঠার্থ আছে কি?" মুহূর্ত্ত মধ্যে বাক্যালাপ মুখরিত কক্ষটী নীরব হইয়া গেল; বুঝিলাম, সকলেই মায়ের পূজার নৈবেদ্যের অভিলাষী, নৈবেদ্য-রচনার কষ্ট-স্বীকার করে কে? তখন আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া, একটী ক্ষুদ্র কবিতা তাঁহাকে দিয়া বলিলাম, "এই ঘরে আমি সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে ও জ্ঞানে ছোট; তবু আমি এই ঘরের সম্মান রক্ষার্থ মায়ের পূজার "অর্ঘ্য" আপনাকে দিতেছি!" তিনি সাদরে কবিতাটী গ্রহণ করিলেন ও কবিতা শেষে আমার নামটী পড়িয়া আমাকে নিবিড় বাহুপাশে বাঁধিলেন। এই নিবিড়-বন্ধন তাঁহার জীবনে আর শিথিল হয় নাই। যাহা হউক, তিনি আমাদের কক্ষ ত্যাগ করিলে পরিচয়ে জানিলাম, ইনিই আমাদের পরিষৎ-প্রাণ, ব্যোমকেশ। এত সহৃদয় তিনি!

ময়মনসিংহে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের" প্রথম দিনের অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। ব্যোমকেশ বাবুর মধুর-কণ্ঠে আমার কবিতাটী পঠিত হওয়াতে সভাক্ষেত্রে বেশ একটু আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আমি আশাতীত রূপে অভিনন্দিত হইয়া যখন সভামঞ্চ পরিত্যাগ করিতে উঠিতেছি, তখন দেখিতে পাইলাম, বহুদূর হইতে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বহুকষ্টে জনসঙ্ঘের ভিড় ঠেলিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন। আমার সাধ্য নাই যে তাঁহার কাছে অগ্রসর হইতে পারি। আমি তাঁহার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি নিকটে আসিয়া বলিলেন, "জীবেন্দ্র বাবু! আমি গোবিন্দ দাস।" ইনি "কুস্কুম", "চন্দন' প্রভৃতির কবি গোবিন্দ দাস! তখনই মনে হইল, আমরা অন্তরের দৈন্য, বাহিক পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিচ্ছদে ঢাকিয়া "মঞ্চাধিপতি" হইয়া সুখে বসিয়া আছি, আর বিপুল অন্তর-সম্পদশালী গোবিন্দদাস, ছিন্ন মলিন বস্ত্রের বিড়ম্বনায় এতক্ষণ কতদূরে জন-সংঘর্ষে নিপীড়িত হইতেছিলেন! তাঁহার সহিত কি কথা বলিতেছি, এমন সময় পশ্চাতে আকৃষ্ট হইয়া ফিরিয়া তাকাইলেই আর একজন বৃদ্ধ মহাত্মা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "আমি বেনোয়ারীলাল।" আমার অগ্রে ও পশ্চাতে দুইজন শক্তিশালী প্রবীণ কবি—একবারে "দুইদিকে দুই সোনার চূড়া!" আমি গোবিন্দ বাবুর সহিত বেনোয়ারী বাবুর আলাপ করাইয়া দিলাম এবং মহানন্দে সকলে মিলিয়া আমার প্রবাস-কক্ষে ফিরিলাম। বেনোয়ারী বাবু প্রস্তাব করিলেন, কবিবর রাজকৃষ্ণের "বীণার" মত, শুধু কবিতায় একখানি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করিতে হইবে; গোবিন্দবাবু সাগ্রহে সম্মতি দিয়া বলিলেন, "এ পত্রিকা খানি প্রবীণ ও নবীন কবির সম্মিলন ক্ষেত্র হইবে।" আমি এই দুই হৃদয়বান্ কবিকে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করিয়া বলিলাম "বর্ত্তমান-যুগে কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকা চলিতে পারে না।" কার্য্যতঃও কিছু হইল না।

* * *

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের" সপ্তম অধিবেশনে যোগদান করিতে কলিকাতায় গিয়াছি। দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ হীরেন্দ্রনাথের স্নেহাশ্রমে আমি অতিথি। একদিন প্রাতে আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আমি একা বসিয়া কি একখানি বহি পড়িতেছিলাম। এমন সময় একজন শুভ্রবেশ প্রৌঢ় ভদ্রলোক, আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া চির-পরিচিতের ন্যায় হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবেন্দ্রবাবু! ভাল আছেন তো?" আমি একটু বিস্মিতভাবে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনি তো আমায় চিনিতে পারেন নাই, তবে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে!" আমিও একটু হাসিয়া বলিলাম, "আমি যদি আপনাকে না চিনিয়াই আপনার শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি, তবে আমি যে উহা কিছু অন্যায় করিয়াছি, আপনি তাহা বলিতে পারেন না।" তিনি তখন স্মিতমুখে বলিলেন, "আমি অক্ষয় বড়াল। হীরেন্দ্র বাবুর কাছে শুনিলাম আপনি আসিয়াছেন, তাই আপনার সহিত দেখা করিতে আসিলাম"। বহুক্ষণ তাঁহার সহিত আধুনিক কবিতার অস্পষ্টতা ও সমালোচনা-ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচারিতা সম্বন্ধে আলাপ হইল। হায়, তখন কে জানিত, তাঁহার সহিত এই আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ!

* * *

একদিন প্রাতে আমাদের "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের" ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সারদাবাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম। তখন তিনি জজিয়তী হইতে অবসর লইয়া, পুনরায় ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি যে কক্ষে বসিয়াছিলেন, দেখিলাম, তাহা তাঁহার মাড়োয়ারী মক্কেলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে জনৈক ভদ্রলোকের নামে আমার একখানা পরিচয়-পত্র লওয়া আবশ্যক ছিল। ভাবিলাম, এত মক্কেলের হাঙ্গামায় এ বেলা তাহা আর হইল না। তিনি সস্নেহে আমাকে নিকটে বসাইলে, আমি তাঁহাকে আমার উদ্দেশ্যের কথা জানাইয়া বলিলাম, "আপনি এখন এত ব্যস্ত আছেন, জানিতাম না। আমি আবার কবে আসিব, বলুন তো?" তিনি বলিলেন, "আবার আসিবেন কি! আমি এখনই আপনার পরিচয়-পত্র লিখিয়া দিতেছি।" মনে করিলাম, এত কাজের ভিড়ে তিনি হয়ত দুই পংক্তি পরিচয়-পত্র লিখিয়া দিয়া, তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তিনি সমস্ত কাজ বন্ধ রাখিয়া, চারিপৃষ্ঠা-ব্যাপী আমার এক অতি-প্রশংসা-পূর্ণ পরিচয়-পত্র লিখিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখুন, জীবেন্দ্রবাবু! হইয়াছে কিনা!" আমি তাঁহার অনন্য-সাধারণ সহৃদয়তা ও সময়াভিজ্ঞতাতে একান্ত মুগ্ধ হইয়া ফিরিলাম। শুনিয়াছি, কোন কোন তথা-কথিত "বড়লোক" আছেন, যাহারা প্রার্থীকে, সামান্য সামান্য বিষয়েও, দশ বারো বার ঘুরাইয়া নিজেদের "বড়-মানুষিত্ব" জাহির করেন। তাঁহাদের সহিত মহা-প্রাণ সারদাচরণের কত তফাৎ!

*　　*　　*

স্যার গুরুদাস বাবুর সহিত কয়েকবার দেখা করিতে গিয়াছিলাম। এই ঋষিতুল্য মহাত্মার পবিত্র-সঙ্গ, আমার নিকটে মহাতীর্থ সম্মিলনের মতই পুণ্যময় বোধ হইত। একবারের কথা বিশেষ-ভাবে আমার স্মরণ আছে। সেবার আমি যখন তাঁহার কাছে যাই, সে সময় তিনি আহ্নিক করিতে গিয়াছিলেন; আমি তাঁহার দ্বিতলের সুসজ্জিত কক্ষটীতে অপেক্ষা করিতেছিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে, খড়মের খটাখট্ শব্দ শোনা গেল; আমি উৎসুক চিত্তে দ্বারের পানে চাহিলাম। দেখিলাম, 'জ্ঞান ও কর্ম্মের' জীবন্ত বিগ্রহ, গুরুদাস বাবু কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াই আমার কাছে আসিতেছেন, তাঁহার পূজার কাপড় ছাড়িবার আর অবসর হয় নাই। তাঁহার তখনকার সেই ভক্ত-পূজারির বেশ আমার চক্ষে বড়ই অনির্ব্বচনীয় সুন্দর দেখাইতেছিল। যেন প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মণ্যতেজঃদীপ্ত ভূদেব সম্মুখে মূর্ত্তিমান হইয়াছেন! আমি এ জীবনে আমার প্রত্যক্ষ-দেবতা পিতামাতার পদধূলি ভিন্ন আর কাহারও পদধূলি গ্রহণ করি নাই। কিন্তু সেদিন সসম্ভ্রমে তাঁহার পবিত্র পদধূলি গ্রহণ করিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৃষিত-আত্মা যেন চরিতার্থ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবেন্দ্র-বাবু! আপনি অনেকক্ষণ একা বসিয়া আছেন, কিছু কষ্ট হয় নাই তো?" এই বলিয়াই তিনি বৈদ্যুতিক পাখাটী খুলিয়া দিলেন। তারপর সেদিন তাঁহার সহিত কি কথা হইল, আজ আমার ঠিক মনে নাই। আমার সমস্ত মন যেন তাঁহার সেই দিব্য বেশে ও আশীর্ব্বাদে একবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল; তখন আর কোন কিছুই ধরিয়া রাখিবার মত শক্তি তাহার ছিল না।

*　　*　　*

যে দিন কলিকাতায় "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের" অধিবেশন হইবে, সে দিন প্রাতে আমি গাড়ী চড়িয়া আসিতেছি; এমন সময় দেখিলাম, "সম্মিলনের" প্রধান-কর্ম্মী ব্যোমকেশ বাবু গামছা হাতে বাজার করিয়া আসিতেছেন; আমি তাঁহাকে আমার গাড়ীতে তুলিয়া লইলাম। তিনি আমার পাশে বসিয়া বলিলেন, "ভাই, আজ সকালে আমার একটী মেয়ে মরিয়াছে; তাহাকে ঘাটে পাঠাইয়া, আমি বাজার করিতে আসিয়াছি। এখনই আবার আমাকে স্নানাহার করিয়া, "সাহিত্য-সম্মিলনে" যাইতে হইবে।" তিনি এ কথাগুলি এমন ভাবে বলিলেন, যেন আজ কন্যা-বিয়োগ তাঁহার নহে, আর কাহারও হইয়াছে; এবং, এ গোলযোগে, স্নানাহার করিয়া "সাহিত্য-সম্মিলনে" উপস্থিত হইতে হয়ত তাঁহার একটু দেরী হ'বে, এ জন্য তিনি ক্ষুন্ন! আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া এই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ সাহিত্য-প্রাণ পুরুষসিংহের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। একটী সান্ত্বনার বাণীও আমার মুখ দিয়া সরিল না!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

প্রভেদ

[যুক্তিবাদীর কথা]

ছুঁয়োনা উহারে, ও যে গো চণ্ডাল,
বসিতে দিয়োনা কাছে,
যুক্তি ও তর্ক তুলি, যুক্তিবাদী
কহে, "শাস্ত্রে" নিষেধ আছে!
ছি, ছি, ও মূর্খ, সভামাঝখানে
উহাকে না দিয়ো স্থান,
"জ্ঞানে" ও "ধর্ম্মে" উচ্চ আমরা
যাবে যে মোদের মান।
ক'রনা, ক'রনা, ওই দীন হীনে
এখানেতে নিমন্ত্রণ,
হ'ক না আত্মীয়, ক'রনা স্বীকার,—
বোল না যে ও আপন।
চাচা আপনার বাঁচারে পরাণ,
মরুক না ওটা কেন,
আপনি বাঁচিলে বাপের যে নাম,
ও বাঁচিলে হবে হেন?
ক'টা উপদেশ দিলাম আজিকে,
আরও বলিব পরে,
সভ্য-জগতে, "যুক্তির" মান
আদর সকলে করে।
"লাভ" আর "ক্ষতি" সব দিক থেকে
খতায়ে দেখিবে আগে
করিবে তেমন, যেমন দেখিবে
লাভ বেশী যেই ভাগে।

[প্রেমবাদীর কথা]

জাতি কুল মান না মানিবে কিছু
সকলেরে দিবে কোল;
এ যে শ্রীক্ষেত্র প্রেম পুরীধাম
করিও না কোন গোল।
মূর্খ, দরিদ্র, সহায় বিহীন—
এদেরি টানিবে কাছে,
কেননা এদেরি জ্ঞানের অভাবে
"জাতি" পরাধীন আছে।
হয় যদি "পর" দিবে পরিচয়—
অন্তে, "আপন" বলি,
তা'হলে তাদের কেহ পারিবে না
যাইতে চরণে দলি।
কেহ কিছু নাই, আহা, বাছা বলি
ওদেরি' ত ডাকি লবে,
না আসিলে হাত ধরিয়া তুলিয়া
ময়লা মাটী মুছাইবে।
প্রেমবাদী কহে, শুন মোর কথা
যদি স্বর্গ শান্তি চাও,
আপনারে, ভাই, জগতের পায়
যাচিয়া বিলায়ে দাও।

শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক।

স্বাধীনতা

আমার স্বাধীনতার সীমা, অন্যের স্বাধীনতা। আমি তাহা করিতে পারি, যাহাতে অন্যের অপকার না হয়। এ কথাটি অনেকেই স্বীকার করিবেন। স্বাধীনতা এবং যথেচ্ছাচারেরও সীমা এইখানে।

যথেচ্ছচার নিন্দনীয়, কিন্তু স্বাধীনতার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র। অথচ যদি আমি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক তোমার পদলেহন করি, যদি তোমার উদ্গার ভক্ষণ করি, যদি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক দেহ বিক্ষত করি, যদি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক আত্মহত্যা করি, আমাকে অপরাধী বলিয়া তোমরা দণ্ডিত করিবে; দণ্ড, রাজ-দরবারেই হউক, আর, সমাজেই হউক। আমার বস্ত্র আমি টানিয়া ছিঁড়িব, আমার রোপিত লতা আমি উন্মূল করিব, আমার পোষিত পাখী আমি আকাশে ছাড়িয়া দিব, আমি ঊর্দ্ধপদ হইয়া দুই হস্তে চলিব, সম্মুখ-কেশ-গুচ্ছ বেণী বিনাইয়া পশ্চাৎ কেশ মুণ্ডন করিব, আমি পায়ে ইয়ারিং কানে চন্দ্রহার পরিব, ব্রাহ্মণীর সাটী পরিয়া গায়ে ওভারকোট দিয়া মস্তকে চীনা টুপি পরিয়া, দিবসে বাতি জালিয়া, বৃক্ষ মূলে বা গৃহে প্রাঙ্গনে বসিয়া থাকিব, তুমি আমাকে টিটকারী দিবে কেন? কার্য্য ছাড়িয়া দাও, বলিতে পার যে আমার দেখিয়া দশজনে শিখিতে পারে। পরোক্ষভাবে সমাজের ক্ষতি করিতে পারি বলিয়া, দণ্ড দিবার তোমার অধিকার জন্মে। কিন্তু আমি গোপনে মনে মনে যে চিন্তা পুষিয়া রাখি, কেহ পীড়াপীড়ি না করিলে কাহাকেও যাহা বলি না, তাহার জন্য অপদস্থ, অবমানিত, উপেক্ষিত বা উপহসিত হইতে হয় কেন? বুঝিলাম, আমার স্বাধীনতা জ্যামিতিক বিন্দু-মাত্র,—অবস্থিতি আছে, কোন বিস্তৃতি নাই।

পক্ষান্তরে, প্রতিভা সমাজের কঠোরহস্তে রুদ্ধশ্বাস, বিগত-জীবন হইলে, সমাজের অস্তিত্ব থাকিত কোথায়? স্বতন্ত্র পাশ-প্রকৃতি বনচারী, আজ সকলে বনে বনেই ফিরিতাম, ঘুরিতাম। তোমাদের উপহাস, পরিবাদ, উপেক্ষা করাতেই আমার কার্য্য-কারিতা। কারা-কুটীরের প্রাচীর-মধ্যে গ্যালিলিওর উদ্ভাবনা পর্য্যবসিত হইত, যদি সমাজ-দণ্ডে বীরপুরুষ ত্রস্ত হইতেন। বিষ-লতার বিষ-সঞ্চারে ক্রুশে সলাকা প্রহারে কত অমৃত বল্লরী অঙ্কুরে, কত জীবন্ত জীবন-কোষ অকালে শুষ্ক হইয়াছে, অন্যথা ঘটিলে বুঝিতে পারিতাম। মস্তিষ্ক পৃষ্ঠাস্থির বিবর্ত্তন-সঞ্জাত বলিয়া জার্ম্মানাচার্য্য যে দিন ঘোষণা করিয়াছিলেন, ঘাতকের কুলিশাঘাতে সে দিন গেটের প্রাণান্ত ঘটিলে, কি রত্ন অন্ধকারের অন্ধতম গুম্ফে গুপ্ত থাকিত, একবার কল্পনা করিয়া দেখ দেখি! ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রের কঠোর শাসন উপেক্ষা করিয়া, শাক্যসিংহ সমাজ-বর্ত্তুলে পদাঘাত না করিলে, কোথায় থাকিত হিন্দুসমাজের আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন? সিদ্ধার্থের সিদ্ধার্থতা নিরর্থক হইত। যে সকল মনীষী উপস্থিত অবস্থান বিশৃঙ্খল করিয়া, শত সহস্র জনের আনন্দ-কানন শ্মশানে পরিবর্ত্তন করিয়া, লক্ষ লক্ষ জনের ঐহিক পারত্রিক অপকার-সাধন করিয়া, আপনাকে চির-পূজনীয় করিয়া গিয়াছেন, কে তাঁহাদের গৌরব গানে না যোগ দেয়? তবে মানব-স্বাধীনতার বিস্তৃতির অন্ত কোথায়? যাহাকে বিন্দু বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, তাহা কি মহোদধির ন্যায় বিশাল নহে?

আমি সমাজ-শৃঙ্খলের একটা বন্ধনী। আমাকে স্থান দিবার জন্য অন্য সকলকে, কষ্ট-স্বীকার করিয়া, সরিয়া বসিতে হইয়াছে। আমার যাহারা তাহাদিগকেও স্থান দিতে হইবে। আমি সমাজ হইতে স্বতন্ত্র নহি। হাত কাটিলাম, কিন্তু দেহে আঘাত করিলাম না; আত্ম-বিকৃত করিলাম, কিন্তু সমাজকে অপকৃত করিলাম না; উভয়ই অসার প্রলাপ। আমার কার্য্যে সমাজ রঞ্জিত, কলঙ্কিত; সমাজ আমাকে যেমন প্রভাবিত করে, আমার দ্বারা তেমনি প্রভাবিত হয়; কেবল মাত্রার ইতর বিশেষ। আমাকে ছাড়িয়া সমাজ নহে, সমাজ ছাড়া আমি নহি! আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে, এবং যাহারা আমার তাহাদিগের দ্বারা, পরোক্ষভাবে, সমাজকে অনুপ্রাণিত করি। আমি বিষবিন্দু ঢালিয়া সমস্ত গরলিত, অমৃত ঢালিয়া সমস্ত সঞ্জীবিত করিতে পারি। জগতের অপরিজ্ঞাত গূঢ় চিন্তা আমাকে ও আমাদিগকে, সুতরাং সমাজকে, প্রভাবিত করে; সুতরাং, অন্যের অপকার আমার স্বাধীনতার সীমা নহে। যাহাতে আমার অপকার, তাহাই আমার স্বাধীনতার সীমা; যাহাতে আমার উপকার, তাহাতে সমাজের উপকার; যাহাতে সমাজের উপকার, তাহাতে আমারই উপকার।

আমার জীবন অন্যের জন্য, কথাটী মহা-সত্য; আমার জীবন আমার জন্য, এটি মহত্তর সত্য। যখন স্বতন্ত্র স্বাবলম্বী জীব, উর্দ্ধস্কন্ধ তালবৃক্ষের ন্যায় কাহারও অপেক্ষা না করিয়া, কাহাকেও আশ্রয়চ্ছায়া বিতরণ না করিয়া, স্বয়ং-সিদ্ধ স্বার্থপর হইয়া জীব-সাম্রাজ্যে বিরাজ করিত, তখন কোনও মহানুভব ব্যক্তি "Live for others" এই সত্যের আবিষ্কার করিয়া, অনাবৃত-বক্ষ নীরস পাষাণ, কোমল শৈবালে আবৃত করিয়াছিলেন। যখন লতায় পাতায় আকুল হইয়া, সামাজিকতার আওতায় জীবের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত জীবন বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন মহত্তর নীতিবেত্তা বলিয়াছিলেন"Live for yourself"। পরের উপকারের জন্য যদি সকলে প্রাণ-ধারণ করে, তাহা হইলে সকলেরই আপন আপন কার্য্য চলিয়া যায়। বস্তুতঃ, একটু ঘোরাল রকমে, একটু আড়ে আড়ে, সহজ কথাটা বাঁকাইয়া সুন্দর করা হইয়াছে মাত্র। নতুবা, "Live for others" এ সত্যের মূল, স্বার্থপরতা। প্রাচীন কালের তেজস্বী লোকেরা বাঁকা চুরা বুঝিতেন না, চক্ষু-লজ্জার খাতির রাখিতেন না; যাহা মনে আসিত, তাহা মুখ দিয়া কুটিত। তাঁহারা পরদার আড়াল বুঝিতেন না। আম-খাস দেওয়ান-খাস রাখিতেন না। সভ্যতা, সত্যকে রঞ্জিত করিতে চাহে, অলঙ্কৃত করিতে চাহে; কুইনাইনের বড়ির উপর চিনির পুট না দিলে, কেহ গ্রহণ করিতে চায় না।

আমি আপনার দ্বারা পরের কথা অনুমান করি। আমার মন আছে, তাই পরের মন কল্পনা করি। আমার যাহাতে সুখ দুঃখ লাভালাভ, পরের তাহাতেই সুখ দুঃখ লাভালাভ, অনুমান করি। বস্তুতঃ, আপনাকে মান-দণ্ড না করিলে, পরের ওজন কিছুতেই বুঝিতে পারি না। এমন অবস্থায়, যে আপনার জন্য বাঁচিতে না চাহে, সে পরের জন্য বাঁচিতে পারে না। যে আপনার স্বার্থ, আপনার লাভালাভ বুঝে না, সে পরের কিসে উপকার হইবে বুঝিতে পারিবে, অসম্ভব কথা। আমার পরিমাণে আমি আমার দেবতা সৃষ্টি করি, আমার পরিমাণে আমার কর্ত্তব্য সৃষ্টি করি, আমার পরিমাণে আমার ঘর-সংসার বাঁধিয়া লই। সকল কার্য্যে, আমি প্রধান। আমি একমাত্র।

আমি আমাকে কখন অতিক্রম করিতে পারি না। আমাকে অতিক্রম করিয়া, আমাকে উপেক্ষা করিয়া, আমি তোমার জন্য, বিশ্ব-সংসারের জন্য খাটিব, বিশ্বের হিতার্থে আপনাকে অগ্রাহ্য করিব, বলিদান দিব, যাঁহারা আত্ম-পীড়নের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আত্মোৎসর্গ শিখেন নাই, এ সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদিগের কল্পনা। আমাকে লইয়া সংসার, পৃথিবী, জগৎ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য। আমার মান-দণ্ডে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিমিত। আমি এই অনন্ত সংখ্যার বন্ধনী। আমাকে উপেক্ষা করিলে, সকলই আদিম অবন্ধনে পর্য্যবসিত হইবে। সৃষ্টি-পূর্ব্ব অব্যক্ততা আসিবে। সহজ কথা বাঁকাইতে গিয়া, অদূরদর্শী নীতিবাদীগণ মনুষ্যদিগকে নীতিশূন্য নাস্তিকতায় অবনত করিয়াছেন। ধনুকের ছিলা কাটিয়া দাও, পৃথিবী সুস্থতা লাভ করিবে।

অন্যকে ছাড়িলে, আমার কোন কার্য্যই থাকে না; আমার আমিত্ব ঘুচিয়া যায়। দশজনকে লইয়াই আমি, সমাজকে লইয়াই আমি, স্বদেশকে লইয়াই আমি। আমার বন্ধনী যত প্রসারিত করিবে, আমার শূন্যতা পূর্ণতায় তত পরিণত হইবে,—আমার মহত্ব বাড়িবে। আমার আমিত্ব আমার দেহের অতীত, আমার পরিবারের অতীত, আমার গোত্রের অতীত, আমার সমাজের অতীত, আমার দেশের অতীত, আমার পৃথিবীর অতীত, আমার ইহ-কালেরও অতীত। এই 'আমার' যে স্বার্থ, সে স্বার্থ জগতের স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। সকলের স্বার্থ লইয়া আমার স্বার্থ। জিনিষটা আমার, দেখি অন্যের ভিতর দিয়া। ইহাতে, সত্যের সরলতার সহিত, কল্পনার সৌন্দর্য্য সংমিশ্রিত হইয়া, অতি শোভনীয় হইয়া উঠে।

স্বার্থ ও পরার্থতার সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা একবার ভারতবর্ষে হইয়াছিল। ভগবদ্গীতায় তাহার ইতিবৃত্ত বর্ণিত আছে। সে সমন্বয়ের আচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণ। চেষ্টা সফল হয় নাই।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন রাজ্যং ন সুখানি চ ॥ ৩১।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২।
তইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোপি মধুসূদন ॥ ৩৪।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫।

* * *

স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব। ৩৬।

—প্রথম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ, রাজ্য ধন, যশ গৌরব, পুণ্য স্বর্গ অমরত্ব, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ, কত সুখের প্রলোভন

দেখাইয়া, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের সরল ধর্ম্মভাবের সম্মুখে কূট-নীতিক শ্রীকৃষ্ণের তর্কজাল বিস্তার দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। বরং আচার্য্যের প্রতি একটু ঘৃণার ভাব উদয় হয়। অর্জ্জুন বালক নহেন, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় উচ্চ "একব্বরী" ধর্ম্ম ও রাজনীতিজ্ঞও নহেন। শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন, জ্ঞাতি গোত্র শত্রুদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করিলে, অর্জ্জুন ধরিত্রীর অসপত্র রাজত্ব ভোগ করিবেন। অর্জ্জুন বুঝিলেন, সুখ-ভোগ ত সকলকে লইয়া হয়; সকলকে বধ করিয়া, বাদ দিয়া বা উপেক্ষা করিয়া, কেহ একজন সুখী হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন, যুদ্ধ-কার্য্য ক্ষত্র-ধর্ম্ম। অর্জ্জুন বুঝিলেন, সার্ব্বভৌম-ধর্ম্মের বিপরীত স্থান বা কালীয়-ধর্ম্ম উপেক্ষনীয়। শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন, যশ লোভনীয়, নিন্দা উপেক্ষনীয়। অর্জ্জুন বুঝিলেন, সার্ব্বভৌম সুকৃতির জন্য কয়েক জনের যশ বা নিন্দা গণনীয় নহে। শ্রীকৃষ্ণ, স্বার্থপরতার গুণগান করিলেন; অর্জ্জুন, পরার্থপরতার মাহাত্ম্য বুঝিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, পরার্থপরতার স্তুতিবাদ করিলেন; অর্জ্জুন, স্বার্থপরতার গুণবাদ বুঝিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, মৃত্যু অপরিহার্য্য দেখাইলেন, অর্জ্জুন অমরত্বের আকাঙ্ক্ষাণীয়তা উপলব্ধি করিলেন। গত্যন্তর না দেখিয়া, দ্বাপরের মাকিয়া-ভেলী নিষ্কাম-ধর্ম্মের প্রস্তাব করিলেন। নিষ্কাম-ধর্ম্মের সংক্ষেপ অর্থ,—নদীস্রোতে গা ঢালিয়া দাও, কোথায় যাইবে কল্পনা করিও না, স্রোতে যেখানে লইয়া যায় সেইখানে চল। কার্য্য-ফল যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে। তুমি আমি নিমিত্ত-মাত্র। পরার্থপরতা ও স্বার্থপরতার মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তোমার আমার তুলনা করিবার সাধ্য নাই। "রাম রাবণয়োর্যুদ্ধং রাম রাবণয়োরিব।" পরার্থপরতা প্রচার করিলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিনাশ হয়, কর্ম্মের উৎস শুকাইয়া যায়, শূন্যের সমষ্টিতে সংখ্যা গড়িতে হয়। স্বার্থপরতা প্রচার করিলে, দুর্ব্বল মনুষ্য-জগতকে উপেক্ষা করিয়া, অহঙ্কারী হইতে পারে। এ জন্য কাহারও আশ্রয় না লইয়া, ফলাফল গণনা না করিয়া,—কাহার ভাল হইবে, কাহার মন্দ হইবে, না দেখিয়া,—যাহাতে নিযুক্ত হইবে, তাহাই কর। কর সকলি, যাহা তোমার আত্মীয়তা তোমাকে করিতে বাধ্য করে। তোমার মাত্রায় তুমি কার্য্য কর।

সংক্ষেপে, শ্রীকৃষ্ণ স্বার্থপরতা প্রচার করিয়াছিলেন। তবে, স্বার্থপরতার শ্রুতিকটুদোষ পরিহারার্থ, তাহাতে নিষ্কামতার অলঙ্কার দিয়াছিলেন। সে অলঙ্কারের গরলে, তৎ-প্রচারিত সত্য জর্জ্জরিত হইয়াছে। নিষ্কাম-ধর্ম্ম, উন্মাদ ও বাতুলের অবশ্য-কর্ত্তব্য; মনুষ্যের অকর্ত্তব্য, অসম্ভবনীয়। নিষ্কাম-ধর্ম্মের প্রচারে আর্য্যবংশের কর্ম্মস্রোত বন্ধ হইয়া, জড় আলস্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; সন্ন্যাসী, ফকির ও দরবেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। যাঁহারা অলঙ্কারের শোভা, বিশেষণের গরিমা, স্বত্ব স্বরূপে গণনা করিয়া আত্ম-প্রতারিত হইতে চক্ষু বুজাইতে চাহেন, তাঁহাদের পথ উন্মুক্ত; আমরা বাধা দিব না।

স্বার্থপরতা কর্ম্মের উৎস, ভাবের জননী। স্বার্থপরতা জীবের প্রাণ, মানবের প্রাণতা। মনুষ্য কর্ম্ম-ফলের নিমিত্ত, স্বার্থপরতা কার্য্যের নৈমিত্তিক কারণ। আমার যাহাতে অপকার, তাহা আমার স্বার্থপতার—আমার কর্ম্মের—সীমা। কিন্তু এ সীমা অস্পষ্ট। স্পষ্টীকৃত করিয়া বলিতে হইবে, যাহাতে আমার উপকার, তাহাই আমার স্বাধীনতার সীমা, আমার কর্ত্তব্যের মান-দণ্ড। যাহাতে আমার উপকার, তাহাতে জগতের উপকার। অধিকাংশ লোকের

অধিকতম সুখ কিসে হয়, জানিবার একমাত্র উপায়, আমার স্বার্থ। আমার স্বার্থের মান-দণ্ডে জগতের সুখ পরিমিত। স্বার্থের মান অনিত্য, স্বীকার করি। আজ যাহাতে আমার উপকার, কাল তাহাতে উপকার হইবে না জানি; কিন্তু জগতের অধিকাংশ লোকদেরও সুখ দুঃখ এইরূপ পরিবর্ত্তনীয়। আজ যাহা সত্য, কাল তাহা অসত্য হইবে; বাঙ্গালায় যাহা ধর্ম্ম, পঞ্জাবে তাহা অধর্ম্ম। নদীর একপারে যাহা কর্ত্তব্য, অপর পারে তাহা অকর্ত্তব্য। একস্থানে যাহা পাপ, স্থানান্তরে তাহা পুণ্য। পাপ পুণ্যের ভৌগলিক সীমা আছে, পর্ব্বত কন্দরে কর্ত্তব্যের সীমা প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করে। এই চির-পরিবর্ত্তনশীল সংসারে অন্য কোন দণ্ডে কর্ত্তব্যের পরিমাণ যথাযথ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। আমার স্বার্থ-ই একমাত্র সার্ব্বভৌম মান-দণ্ড। আমার স্বার্থের নিরাপক, আমার কর্ম্ম-ফল। আমার স্বার্থ, আমার উপকার, আমার কর্ত্তব্যের সীমা, ইহা সুবুদ্ধি ও স্বভাব-সিদ্ধ।

৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

প্রকাশক—শ্রীপ্রণব রায়চৌধুরী।

আমি ও আমার।

[ব্যবহারিক]

"আমি" "আমি" কর মন, "আমারেতে" ভয়।
"আমি" তোর চির সাথি, "আমার" তা' নয়।
পিতা, মাতা, দারা, সুত,
ধন, জন, দউলত,
আমার যা' কিছু, তারা মরভূমে রয়।
"আমি" নিয়ে মজ মন, "আমারেতে" নয়।

আমি ভাবি, আমি করি, ধরা আমি-ময়।
আমি হাসি, আমি কাঁদি,—জগতে কি হয়?
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি,
"আমি" তার ক্ষুদ্র স্বামী;
"আমার" অসীম বাণী ধরা ছেয়ে লয়।
"আমি" নিয়ে মজ মন, "আমারেতে" নয়।

অভিমান-হত আমি, মন ক্ষুদ্র বয়।
"আমার" ছাড়িলে আশা ক্ষুদ্রতর রয়।
আশা-ভঙ্গে, শান্তি নাশ,
ক্ষুদ্র আশে, তৃপ্তি-আশ;
কোন পথে যাবে মন কর সুনিশ্চয়!
"আমি" নিয়ে মজ মন, "আমারেতে" নয়।

লোকে কবে কিবা বলে, সদা প্রাণে ভয়;
লোক লয়ে কিবা কাজ, আমি "আমি"-ময়।
আমি সুধু জানি "আমি,"
মোরে জানে অন্তর্যামী;
সে সুধু আমার বলি, আর কিছু নয়।
"আমি" নিয়ে মজ মন, "আমারেতে" নয়।

[পারমার্থিক]

ইন্দ্রিয়-তন্মাত্র যাই জড়-বীজ-ময়,
"আমার" "আমার" করি মন জড়ে রয়।
জড়ের মমতা যাই
সদা মন মাঝে পাই,
সুধী-জনে মন তোরে জড় বলি কয়।
"আমি" নিয়ে মজ মন, "আমারেতে" নয়।

"আমি"র আমিত্ব সুধু জড় নিয়ে নয়।
মমতায় মন যবে বিচলিত হয়,
কা'র আজ্ঞা বহে তা'রা,
বিতাড়িত কা'র দ্বারা?
প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে অহংতত্ত্ব হয়।
"আমি" নিয়ে মজ মন, "আমারেতে" নয়।

বিশ্বমূলে আমি-তত্ত্ব শাস্ত্রীবাণী কয়।
খাল-ব্রহ্মা ধ্যানে যবে, জড় কোথা রয়?
"আমার"-বাণীর সৃষ্টি
ভেদে, কয় সাংখ্য-দৃষ্টি;
শাক্যসিংহ মুগ্ধ তাই, বিশ্ব "আমি"-ময়।
"আমি" নিয়ে মজ মন, "আমারেতে" নয়।

"আমার" মায়ার বাণী বিশ্ব ব্যেপে রয়;
বারিধি নীলিমা-নিধি যথা মনে হয়।
মৌলি এক দ্বৈতময়,
মায়াশক্তি পরিচয়।
"আমার" নীলিমা-আভা, মূলে কিছু নয়।
"আমি" নিয়ে মজ মন, "আমারেতে" নয়।

শ্রীবিপিনবিহারী নিয়োগী।

স্বরাজ।

[৭৯ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি]

(১০)

রাষ্ট্রের মূলভিত্তি যদি শক্তি, রাষ্ট্র-শক্তিরও মূলকথা লোক-বল। আধুনিক সভ্য-জগতে, আর এক বড় কথা—অর্থ-বল।

জড়-শক্তি ও পশু-শক্তিকে রাষ্ট্র-শক্তিতে পরিণত করে কে? মানুষ। সংহারক-যন্ত্র আবিষ্কার করে, মানুষ। আত্মরক্ষার উপায় আবিষ্কার করে, মানুষ। বহুজনের সমবেত উদ্যোগে, মানুষকে বিনাশ করিবার ব্যবস্থা করে, মানুষ। সংহার-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য গণিত, রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যার প্রয়োগ করে—মানুষ। জড় ও পশুকে বশ করিয়া, সংহার-শক্তি আহরণ করে—মানুষ। আর এ সব একজন রাষ্ট্রপতির সাধ্যায়ত্ত নয়। সহস্র মানুষের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। রাষ্ট্র-শক্তির মূলকথা, **লোক-বল**।

কোনও রাষ্ট্রের লোকবল কত তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, শুধু তাহার লোকসংখ্যা জানিলে চলে না। লোকসংখ্যা একেবারে কম হইলে, সে রাষ্ট্র শক্তিশালী হয় না। কিন্তু লোকসংখ্যা বেশী হইলেই যে রাষ্ট্র তদনুযায়ী শক্তিশালী হইবে, তাহাও নয়। মনে কর, একরাষ্ট্রের জনসংখ্যা তেত্রিশ কোটী; তাহার মধ্যে ত্রিশকোটী নিরক্ষর, ও বাকী তিন কোটীর মধ্যে, মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ লোকের হৃদয়ে স্বদেশ-প্রীতি একটু জাগিয়াছে ও স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞান কিছুটা পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়াছে। আর ঐ তেত্রিশ কোটীর মধ্যে মাত্র পাঁচলক্ষ লোক রাষ্ট্র-সেবায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাকী বত্রিশ কোটী পঁচানব্বই লক্ষ লোক, স্বীয় স্বীয় পরিবার পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য পরায়ণ হইলেও, তাহাদের মধ্যে স্বদেশ-প্রীতি ও স্বরাষ্ট্র-বোধ সম্যক্ পরিস্ফুট না হওয়াতে, রাষ্ট্র-সেবায় স্বার্থ-বিসর্জ্জন দিতে তাহারা শেখে নাই, ও সুনিয়ন্ত্রিত সমবেত উদ্যোগে অনভ্যস্ত বলিয়া, তাহারা রাষ্ট্র-সেবা-কুশল নহে। আর মনে কর, অপর এক রাষ্ট্রের পূর্ণ লোক-সংখ্যা মাত্র তিন কোটী; কিন্তু তাহারা প্রায় সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষিত; স্বদেশ-প্রেমে পরিপূর্ণ, স্বরাষ্ট্র-বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র-সেবায় স্বীয় স্বীয় সুখ স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত; সমাজ ও রাষ্ট্রের বহুবর্ষব্যাপী সাধনার ফলে তাহারা যেমন যুদ্ধের আয়োজনে, তেমনই শান্তির সময়ে, দশের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একযোগে কার্য্যোদ্ধার করিতে অভ্যস্ত। তবুও কি বলিবে যে, তেত্রিশ কোটীর রাষ্ট্র, তিন কোটীর রাষ্ট্র অপেক্ষা এগার গুণ শক্তিশালী?

রাষ্ট্রের লোকবল চাও, তবে সুগঠিত সবল সুস্থ শিশুর প্রয়োজন, সর্ব্বাগ্রে। তাহার জন্য সুস্থ সবল সদাচারী পিতা; পূর্ণাঙ্গী দৃঢ়ব্রতা সন্তান-পালন-কুশলা স্বদেশ-পরায়ণা জননী; প্রচুর স্বাস্থ্যোপযোগী খাদ্য ও পানীয়; ব্যাধি-বিমুক্ত, স্বাস্থ্য-বিধায়ক জনপদ—এ সকলেরই প্রয়োজন। আর তেমনই প্রয়োজন, সহিষ্ণুতা-সংযম-সাধনানুকুল, শ্রমাভ্যাস-প্রবর্ত্তক, স্বাবলম্বনেচ্ছা-পরিপোষক সামাজিক রীতি-নীতির। জনসংখ্যা যতই হউক, রাষ্ট্রের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল না হইলে, জলবায়ু শ্রমশীলতার অনুকূল না হইলে, সে রাষ্ট্র শক্তিশালী থাকিতে পারে না। পণ্ডিতেরা বলেন, রোম-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের অন্যতম কারণ—প্লেগ-মহামারী ও ম্যালেরিয়া।

রাষ্ট্রের লোকবল প্রজাসাধারণের দৈহিক শক্তির উপর যেমন নির্ভর করে, তাহাদের মানসিক-

শক্তির উৎকর্ষ-সাধনের উপরও তেমনই নির্ভর করে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালনা দ্বারা দৈহিক বৃত্তির সম্যক্ বিকাশ হয়। মানসিক বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য, মনোবৃত্তি গুলির পরিচালনা তেমনই প্রয়োজনীয়। সভ্যতার ইতিহাসে এমন সময় ছিল, যখন বর্ণমালার অবিষ্কার হয় নাই। কিন্তু, কবি ও কাব্যের সাহায্যে, সামাজিক আদর্শ ও ব্যক্তিগত চরিত্র গঠিত হইত। তখন লেখাপড়া ছিলনা, কিন্তু শিক্ষাদান ছিল। তখন গুরু লিখিতেন না, শিষ্য পড়িত না। গুরু বলিয়া গেলে, শিষ্য শুনিয়া অনুবচনের দ্বারা শ্রুতি বা স্মৃতি আপন মনে মুদ্রিত করিয়া রাখিত। তখন শিক্ষা-বিস্তারের প্রণালী ছিল, অনুবচন। লোক-শিক্ষার উপায় ছিল, কবিদিগের গীত শ্রবণ। এ কালে বা সে কালে, তোমার আমার জীবনে আগে গদ্য, পরে পদ্য। সাহিত্যের ইতিহাসে আগে পদ্য, পরে গদ্য। যে কারণেই হউক, কবির আধিপত্য উঠিয়া গিয়া এখন গদ্যের যুগ চলিয়াছে। অনুবচনের যুগ চলিয়া গিয়া এখন লেখা পড়ার যুগ চলিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা বহু বহুতর সংখ্যক লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব হইয়াছে। জগমান্য সম্রাট্ অশোক লোক-শিক্ষার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন। আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনে লোক-শিক্ষা ক্রমশঃ সুবিস্তৃত হইতেছে। পৃথিবীর সঞ্চিত জ্ঞান লাভ করিবার প্রথম সোপান এখন বর্ণমালার সহিত পরিচয়। সুতরাং, পৃথিবীর সর্ব্বত্র এখন লোক-শিক্ষা বিস্তারের প্রধান উপায় বর্ণপরিচয়, লেখা-পড়া। জ্ঞান লাভে যদি শক্তি লাভ সম্ভব হয়, তবে রাষ্ট্রের লোক-বল-বৃদ্ধির জন্য জ্ঞান লাভের উপায় লেখাপড়া, বর্ণপরিচয় সর্ব্বসাধারণের আয়ত্তাধীন করিতে হইবে। তারপর জন-সাধারণের পর্য্যবেক্ষণ, গণনা, গঠন প্রভৃতি বৃত্তির বিকাশ করিতে হইবে। বাষ্পীয় যানের আবিষ্কারের ফলে জগৎব্যাপী প্রতিযোগিতা যখন অনিবার্য্য, তুমি চাও আর নাই চাও, চীন দেশ হইতে মুচি, মিস্ত্রী আসিয়া যখন ভারতবাসী চর্ম্মকার ও সূত্রধরের মুখের গ্রাসে ভাগ বসাইতেছে, তখন রাষ্ট্রের লোকবল বৃদ্ধির জন্য প্রজা সাধারণের মনোবৃত্তি-বিকাশের উপায় তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেই হইবে। এক কথায়, রাষ্ট্রের সকলের জন্য কর্ম্মোপযোগী নিম্ন-শিক্ষার আয়োজন চাই। নতুবা, রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা তেত্রিশ কোটী হইলেও, রাষ্ট্রের লোকবল তদনুরূপ হইতে পারে না।

দৈহিক-শক্তি লাভ হইলে, মনোবৃত্তি বিকাশের পথ উন্মুক্ত হইলে, আরও কিছু চাই। প্রজা-সাধারণের চরিত্র সুগঠিত হওয়া চাই। অনেকের এখনও ধারণা আছে যে, যে মানুষ বারবনিতা বা পরদারে আসক্ত নহে, সে-ই সচ্চরিত্র। সচ্চরিত্রের ইহা অতি হীন আদর্শ। এই আদর্শানুযায়ী জীবন যাপনের জন্য, কামেন্দ্রিয় সংযমেরও তেমন প্রয়োজন হয় না। মনে কর, এক জন অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছে ও তাহার স্বীয় পত্নীর প্রতি অসংযতেন্দ্রিয়। এই হীনাদর্শানুসারে সেও সচ্চরিত্র। কামেন্দ্রিয়-সংযম সচ্চরিত্রের একটী একটী লক্ষণ বটে, কিন্তু একমাত্র লক্ষণ নহে। রাষ্ট্রের প্রজাসাধারণ যথা-সম্ভব সচ্চরিত্র না হইলে, সে রাষ্ট্র তেমন বলশালী হয় না। রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিতে হইলেই, চাই সত্য-পরায়ণতা, চাই দায়িত্ব-বোধ, চাই স্বদেশ-প্রীতি, চাই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, চাই দৈহিক জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র ব্যাপারে সততা ও সুশৃঙ্খলা, সর্ব্ব প্রকার বিঘ্ন সিদ্ধিতে আনন্দ-বোধ ও নিপুণতা, দশের সহিত সমবেত উদ্যোগে আত্ম-সম্বরণ ও উৎসাহ, রাষ্ট্রোন্নতি-কল্পে সুখ স্বার্থ বিসর্জ্জন, চাই

প্রীতিতে বিশালতা, চরিত্রে দৃঢ়তা, অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা। তবে ত লোক-সংখ্যায়, লোক-বল।

এমন সময় ছিল, যখন লোকে সত্য সত্যই বিশ্বাস করিত যে দলপতি বা রাষ্ট্রপতি দেবতার অংশ। লোক তখন দেব আজ্ঞা মনে করিয়া, রাষ্ট্রপতির আদেশ শিরধার্য্য-জ্ঞানে, বিনা-বিচারে পালন করিত। খুব বেশী দিনের কথা নয়, ইংলণ্ডের রাষ্ট্রপতিকে দেবতার প্রতিনিধি বলিয়া ইংলণ্ডের জ্ঞানীগণও মানিতেন। বিস্মার্কের ন্যায় বিচক্ষণ পণ্ডিত এক সময় জার্ম্মাণ রাষ্ট্রপতিকে দেব-প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়াছেন। জাপানের মিকাডোর সৌভাগ্য-রবি আজও অস্তমিত হয় নাই। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে দেবতার অংশ বলিয়া বিশ্বাস এখন আর লোকে রাখিতে পারিতেছে না। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে যে টুকু বা রাজভক্তি ছিল, যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রপতিগণ কে কোথায় খসা-তারার মত অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল। আর যে দুই চারিজন এখনও মিটিমিটি জ্বলিতেছে, বেচারীরা দেব-প্রতিনিধিত্ব দূরের কথা, কোনও প্রকারে আপনাদিগকে জন-প্রতিনিধি সাব্যস্ত করিয়া, সিংহাসন বজায় রাখিতে পারিলেই পরম সৌভাগ্য-বান মনে করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, রাজভক্তির মূল এখন আর প্রজার হৃদয়ে, তাহার সহজ ধর্ম্ম-ভাবে নিহিত নহে। সে কালে রাজার কর্ত্তব্য ছিল, সুশাসন; বিনিময়ে প্রজার কর্ত্তব্য ছিল, রাজভক্তি। রাজা প্রজা-পালন করিতেন, প্রজা রাজাকে হৃদয়ে ভক্তি করিতেন। বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রপতিগণ এখন নিজেরা, সু বা কু, কোনই শাসনই করেন না। বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রপতিগণ শাসনভার নিজেদের হাতে রাখিতে চাহিলেও, প্রজা তাহা চাহে না ও রাখিতে দেয় না। প্রজা সুশাসন যত চাহে, তার বেশী চাহে স্বয়ং-শাসন। এখন প্রকৃত-পক্ষে শাসন-কার্য্য প্রজাই করিতেছেন, রাজা করেন না। সুতরাং রাজ-ভক্তি ম্লান হইয়া আসা স্বাভাবিক। এ রাজ-ভক্তির যুগ নয়, এ রাষ্ট্র-প্রীতির যুগ।

এ যুগে প্রজার শুভ-ইচ্ছায় রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করিতে হইবে। আর রাষ্ট্রের লোকবল প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী করিতে হইলে, রাষ্ট্রের জনসাধারণের চরিত্র-গঠন অত্যাবশ্যকীয়। এই চরিত্র-গঠন-সাধনা যদি ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবেই তাহা সহজ ও সতেজ হইবে। কিন্তু সে ধর্ম্মের আদর্শ কি হইবে? সে আদর্শ রাষ্ট্র-শক্তি-বৃদ্ধির অনুকূলও হইতে পারে, প্রতিকূলও হইতে পারে। তুমি কোন আদর্শ চাও, তাহা তোমাকে বাছিয়া স্থির করিতে হইবে। মানব-প্রকৃতির সহস্র সদ্বৃত্তির মধ্যে কোন্‌গুলির উৎকর্ষ-সাধন দ্বারা জাতীয়-জীবনকে সুগঠিত ও সবল করিতে হইবে, তাহা তোমাকে বাছিয়া স্থির করিতে হইবে। একথা নিশ্চিত যে, সকল সদ্বৃত্তির অতিমাত্রায় সাধনা, রাষ্ট্র-শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল নহে। রাষ্ট্র-শক্তি-বৃদ্ধির অনুকূল আদর্শের আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন বলিতে চাই যে, আদর্শ মহান্, উদার বা শান্তি-প্রদ হইলেই যে তাহা রাষ্ট্র-শক্তি-বৃদ্ধির উপযোগী হইবে, এরূপ মনে করা ভুল। যে আদর্শে মানবের শরীর একেবারে তুচ্ছ আর তাহার সমগ্র চিন্তা ও চেষ্টা শুধু তাহার আত্মাকে লইয়াই ব্যস্ত; যে আদর্শে ইহকালের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ ও মৃত্যুর পরপারের জীবন লইয়াই মানুষ অত্যধিক ব্যস্ত; যে আদর্শে ইহজন্ম প্রাক্তন-কর্ম্মের ফল মনে করিয়া, মানুষ

জীবন-ব্যাপী সাধনার দ্বারা এ জগতে তাহার পুনর্জন্ম নিবারণের চেষ্টা করে, যে আদর্শানুযায়ী সাধনার ফলে, জনসাধারণ পুরুষকার ভুলিয়া গিয়া, সকল আনন্দ ও সুখের প্রত্যাশা করে, মৃত্যুর পরপারে; যে আদর্শে মানুষ অত্যাচারীকে না পারে ক্ষমা করিতে, আর না পারে শাসন করিতে, ও পরকালে, ভগবানের হাতে, দুষ্টের দমন হইবেই হইবে, এই আশায় মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে; যে আদর্শে অদৃষ্ট-বাদে সাধারণ মানুষকে সকল দুর্ণিবার অশুভের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে পরামর্শ দেয়; যে আদর্শে, হয় পবিত্র নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচারী, নয় কপটাচারী সাধু-বেশী লম্পট, এ দুইয়ের মাঝা-মাঝি কোনও ব্যবস্থা নাই; যে আদর্শে সংযত, ধর্ম্মপরায়ণ লোকের পক্ষে ব্যবস্থা বনবাস; যে আদর্শে মানুষ জীবের প্রতি অহিংসা ও মৈত্রীর মাত্রা সামলাইতে না পারিয়া, মানবের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করে—সে সকল আদর্শ মহান্ উদার ও শান্তিপ্রদ হইতে পারে। সে সকল আদর্শের গৌরবের হানি করিতে আমি চাহি না। কিন্তু, তাহার ছায়ার গঠিত জাতীয় চরিত্র রাষ্ট্রের লোক-শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল নয়, ইহা সুস্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই। এ আদর্শগুলি কোনও কাজের নয়, এমন কথা বলিতেছি না। এ আদর্শে গর্ব্বানুভব-যোগ্য ঔদার্য্য ও মহত্ব নাই, তাহাও বলিতেছি না। কিন্তু এ আদর্শে গঠিত প্রজা-শক্তি, রাষ্ট্র-শক্তিতে হীন হইবেই হইবে। তুমি কি চাও, তাহা পূর্ব্বে স্থির কর। যদি আম বাগান চাও, বাগানে শুধু আনারসের চারা লাগাইলে চলিবে না।

(১১)

রাষ্ট্রশক্তির আর এক বড় কথা, **অর্থ-বল**। এখন ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য অর্থের প্রয়োজন, সুখ-সাধনের জন্য অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন। রাজভক্তি থাকুক বা নাই থাকুক, স্বদেশে-প্রীতি থাকুক বা নাই থাকুক, অর্থের জন্য মানুষ রাষ্ট্রপতির আদেশে মানুষ-সংহার ব্যাপারে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে। অর্থদ্বারা জড়-শক্তি ও পশু-শক্তি আহরণ করা যায়। অর্থদ্বারা নূতন আবিষ্কার কেনা যায়। অর্থ দ্বারা সমবেত উদ্যোগের ব্যবস্থা-বুদ্ধি কেনা যায়। রাসায়নিকের বিদ্যা কেনা যায়। সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় যে মানুষের প্রাণ, তাহাও কেনা যায়। রাষ্ট্রপতি অর্থ-বলে লোক-বল বাড়াইয়া নিতেছেন। শুধু স্বীয় রাষ্ট্রের লোকশক্তি অর্থবলে আহরণ করিতেছেন এমন নয়, পররাষ্ট্রের মানুষকেও অর্থদ্বারা বশীভূত করিতেছেন। অর্থ দ্বারা রাজভক্তি ও স্বদেশ-প্রীতিও কেনা যায়। "কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে"—একথা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে যতটা সত্য ছিল, এখন তার চেয়ে বেশী বই কম সত্য নহে। তাই বলিতেছিলাম, অর্থবল বড় বল।

একাকী রাষ্ট্রপতি বা তাহার জনকয়েক অমাত্য বা পার্শ্বচর অর্থোপার্জ্জন করিলে রাষ্ট্রের অর্থবল হয় না। রাষ্ট্রের জনসাধারণ ব্যবসায়, বুদ্ধি, কারিকরী নৈপুণ্য ও শ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিলে, তবে রাষ্ট্র-সেবায় অর্থ মিলিবে। প্রজার অর্থে রাষ্ট্রের অর্থ-বল।

এক সময় শুধু মাংসপেশীর শক্তি দ্বারা শ্রমসাধ্য কাজ সম্পন্ন হইত। মানুষের বা পশুর মাংসপেশীর শক্তি দ্বারা পৃথিবীতে তখন অনেক বৃহৎ ব্যাপার সাধিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত, যথা—মিশরের পিরামিড, দক্ষিণ ভারতের বিশাল মন্দির। তারপরে, জলের প্রবাহ ও বাতাসের শক্তির সাহায্যে মানুষ শ্রমসাধ্য কাজ সম্পন্ন করিয়াছে। তাহার পর, বাষ্পীয়-চালক-যন্ত্রের প্রচলন; ইহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। এখন মাংসপেশীর শক্তির

স্থানে আসিয়াছে, জলীয়-বাষ্প-শক্তি (steam), তড়িৎ-শক্তি (electricity), বিস্ফোরক-বাষ্প-শক্তি (explosive gas)। একমাসের পথ মানুষ এখন একদিনে যাইতেছে। সমুদ্র পার হওয়া এখন সহজ হইয়াছে। জল ও স্থলই যে শুধু মানুষের আয়ত্তাধীন হইয়াছে, তাহা নয়। দেখিতে দেখিতে, আকাশও মানুষের আয়ত্তাধীন হইয়া আসিতেছে। এই নবাবিস্কৃত শক্তি ও যন্ত্রের সাহায্যে, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী কাজ মানুষ করিতে পারিতেছে। পূর্ব্বে যে দেশে শ্রম ও বুদ্ধি দ্বারা হাজার টাকা উপার্জ্জন হইত, এখন সে দেশে তাহার স্থানে লক্ষ টাকা অর্জ্জিত হইতেছে। এই সব শক্তি ও কলের সাহায্যে প্রভূত ধন উৎপন্ন হইতেছে। আর রাষ্ট্রের উৎপন্ন ধন, প্রয়োজন হইলেই আসিয়া, রাষ্ট্র-শক্তিকে পরিপুষ্ট করিতেছে।

নবাবিস্কৃত এই সকল শক্তি ও কলের সাহায্য ব্যতীত পূর্ব্বে অর্থোপার্জ্জন হয় নাই বা এখন হইতে পারে না, এমন যেন কেহ মনে না করেন। কিন্তু বাষ্পীয়-চালক-যন্ত্রের প্রচলনের ফলে, অর্থোপার্জ্জনের পুরাতন পদ্ধতিতে ও এই নূতন পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতা অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিযোগিতায় মাংসপেশীর শক্তি নিশ্চয়ই জলীয়-বাষ্প-শক্তি, তড়িৎ-শক্তি ও বিস্ফোরক-বাষ্প-শক্তির নিকট হার মানিয়াছে। আমরা অনেক সময় বলিয়া থাকি যে, পাশব-বল দ্বারা বিদেশী আমাদিগকে পরাজিত করিয়া, আমাদিগের শিল্প ও সমৃদ্ধি নষ্ট করিয়াছে। যাহারা আজও ইউরোপীয় জাতির নিকট পরাজিত হইয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারায় নাই, তাহাদিগেরও শিল্প ও সমৃদ্ধি ক্রমশঃ ইউরোপের সহিত প্রতিযোগিতায় লোপ পাইতেছে। ইহা শুধু পাশব বলের বা রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার ফল নহে। ইউরোপীয় জাতিগণ তাহাদিগের শ্রম-ব্যাপারে শ্রম-বিভাগ (division of labour) নীতি সুকৌশলে প্রয়োগ করিয়া ও বহুজনের সমবেত সুনিয়ন্ত্রিত উদ্যোগের (organisation) ব্যবস্থা করিয়া, এই সকল নবাবিস্কৃত শক্তি ও কলের সাহায্যে, আমাদিগের পুরাতন মাংসপেশীর শক্তিকে ও কারিকরী নিপুণতাকে পরাস্ত করিয়াছে। এই যে অর্থোপার্জ্জন ব্যাপারে পরাজয়, ইহা শুধু পাশব-বলের প্রাধান্যের ফল নয়। শ্রম-বিভাগ (division of labour) ও বহুজনের সমবেত সুনিয়ন্ত্রিত উদ্যোগের ব্যবস্থা (organisation)—এই দুইটাই ইউরোপীয় জাতি সমূহের চেষ্টার সফলতার মূল কারণ। এই দুই মূলমন্ত্র লইয়া তাহারা নবাবিস্কৃত শক্তি ও কলের সাহায্য অর্থোপার্জ্জনে এশিয়াকে দূরে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। এসিয়ার যে সকল রাষ্ট্র এই দুই মূলমন্ত্রের ও এই সকল নবাবিস্কৃত শক্তির ও যন্ত্রের সাহায্য লইয়া অর্থশালী হইতে পারে নাই, ইউরোপীয় রাষ্ট্র সকলের তুলনায় তাহারা হীনশক্তি ও দুর্ব্বল।

প্রজার অর্থে রাষ্ট্রের অর্থবল। কিন্তু প্রজার শ্রমলব্ধ অর্থে রাষ্ট্রপতির অংশ কতটা? দেবতার অংশরূপে পূজিত বলিয়াই হউক বা অপর কোনও কারণেই হউক, রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির তেমন প্রতিপত্তি থাকিলে, রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের জন্য কোনও এক শ্রেণীর প্রজার সঞ্চিত সর্ব্বস্ব, রাজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারে। ইতিহাসে, সময়ে সময়ে এরূপও ঘটিয়াছে। যেমন, পুরাতন ইংলণ্ডের য়িহুদী-প্রজার বেলায়। কিন্তু, এরূপ অব্যবসায়ী রাষ্ট্রপতি সচরাচর দেখা যায় না। প্রজার অর্থে রাষ্ট্রের অর্থবল বাড়াইতে হইলে, রাষ্ট্রপতিকে বুদ্ধিমান্ সংবণিক হইতে হয়। সংবণিক তাহার খরিদ্দারের সর্ব্বনাশ চায় না। সে চায় উত্তরোত্তর খরিদ্দার সমৃদ্ধিশালী হউক। আর বণিকও, বৎসরের পর বৎসর খরিদ্দারের সহিত কারবার করিয়া, নিজে অর্থলাভ করে। যে

বণিক, একবৎসর মাত্র অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশায়, প্রবঞ্চনা দ্বারা বা অপর অসদুপায়ে, খরিদ্দারের সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করে, সে বণিক বিষয়-বুদ্ধি শূন্য। বণিকের বেলায় যেমন, রাষ্ট্রেও তেমনি। রাষ্ট্রপতিতে ও প্রজাতে সহযোগিতা না থাকিলে, প্রজার অর্থ দ্বারা রাষ্ট্র শক্তিশালী হইতে পারে না।

বিনা অর্থবলে রাষ্ট্র যে শক্তিশালী হইতে পারে না, ইহা রাষ্ট্রপতি যেমন জানেন, প্রজাও তেমনই জানে। আধুনিক ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজ-শক্তিতে প্রজা-শক্তিতে যখন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, প্রজা যখন রাজার ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে চায়, তখন প্রজা-শক্তির নজর পড়ে, সর্ব্ব প্রথমে রাষ্ট্রপতির অর্থবলের উপর। রাষ্ট্রপতির অর্থবল প্রজাদিগের বা প্রজা-প্রতিনিধিদিগের আয়ত্তাধীন করিবার জন্য তখন প্রজা-শক্তির চেষ্টা চলে। রাষ্ট্রের অর্থবল আয়ত্তাধীন করিতে পারিলে, অনেক ব্যাপারে প্রজা-প্রতিনিধিগণ কার্য্যতঃ রাষ্ট্রপতির সমান প্রতি-শক্তিশালী হয়। রাজ-শক্তি ও প্রজা-শক্তির দ্বন্দ্ব তখন এই দুইটী কথায় আসিয়া দাঁড়ায়,—প্রথম, রাজস্বের পরিমাণ কে নির্ণয় করিয়া দিবে? দ্বিতীয়, নির্ণীত রাজস্ব কাহার ইচ্ছানুযায়ী ও কোন্ কোন্ ব্যাপারে ব্যয়িত হইবে? আধুনিক ইতিহাসে এই দুই প্রশ্নেই প্রজার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে। প্রজার অর্জ্জিত অর্থের কত অংশ রাষ্ট্রের জন্য রাষ্ট্রপতি রাজস্ব বলিয়া দাবী করিবেন, তাহা প্রজা বা প্রজা-প্রতিনিধি স্থির করিয়া দেয়। প্রজা তাহার প্রতিনিধি দ্বারা সম্মতি জানাইলে, তবে রাষ্ট্রপতি রাজস্ব (tax) দাবী করিতে পারিবেন। আগে, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন , পরে, রাজস্বের দাবী (no representation, no taxation)। তারপরে মনে কর, প্রজা-প্রতিনিধিগণ বলিয়া দিল, এ বৎসর রাষ্ট্রপতি এক কোটী টাকা রাজস্ব আদায় করিয়া ব্যয় করিতে পারিবেন। রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন ব্যয় হইলে, এই এককোটী টাকার কিছুটা প্রজার হিতে, আর কিছুটা হয়ত প্রজার অনিষ্টকর ব্যাপারেও ব্যয়িত হইতে পারে। এখানেও প্রজা-প্রতিনিধিগণ বলিয়া দেয়, এই এক কোটী টাকার, এক নির্দ্দিষ্ট অংশ এই নির্দ্দিষ্ট ব্যাপারে, অপর নির্দ্দিষ্ট অংশ অপর এক ব্যাপারে, ও বাকী টাকা অপর কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট ব্যাপারে ব্যয়িত হইবে—ইহার অন্যথা হইতে পারিবে না। এই যে অধিকার—রাজস্ব-ব্যয়ের বাবদ নির্দ্দেশ করিয়া দিবার অধিকার (appropriation of supplies)—ইহা এক বড় অধিকার। রাষ্ট্রের অর্থবল এই দুই প্রকারে প্রজাশক্তির আয়ত্তাধীন হইলে, রাষ্ট্রপতির প্রজার বিরুদ্ধে যথেচ্ছ ব্যবহার আর সম্ভবপর হয় না।

(১২)

দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার, নির্ধনের উপর ধনীর অত্যাচার, সহায় সম্পদ্‌হীনের উপর প্রতিপত্তিশালীর অত্যাচার, রাষ্ট্র হইতে দূর করিবার জন্য, সভ্যতার শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত, নানা প্রকারের চেষ্টা চলিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে আজ পর্য্যন্ত মানুষ যত পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, অনেক স্থলেই তাহাতে বৈষম্য মানিয়া লওয়া হইয়াছে। চেষ্টা হইয়াছে, তাহার কুফল নিবারণ করিবার। ধনের বৈষম্য, শক্তির বৈষম্য, প্রতিপত্তির বৈষম্য আছে, থাকুক্। তাহার কুফল নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

বৈষম্য মানিয়া লইয়া, তাহার কুফল নিবারণ করিবার চেষ্টায়, রাজাকে পথ আগলাইয়া বসিয়া আছে, মন্ত্রী; মন্ত্রীকে গ্রাস করিবার চেষ্টায় আছে, হস্তী, অশ্ব ও নৌসেনা; আবার তাহাদের গ্রাস করিবার চেষ্টায় আছে, বড়ের দল। ফলে, বড়ের কিস্তীতে মাৎ হইবার সম্ভাবনা, রাজার কপালেও সময়ে সময়ে থাকে। সভ্য রাষ্ট্রে বৈষম্য মানিয়া নিয়া, অত্যাচার নিবারণ করিবার নানাপ্রকার চেষ্টার মধ্যে কয়েকটার কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি।

* রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য ও ক্ষমতা বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লইয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর সেই কর্ত্তব্য-ভার ও ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। সেই ক্ষমতা-প্রাপ্ত লোকেরা—অপর প্রতিপত্তি-শালী লোকের প্রতি ঈর্ষ্যা বশতঃ হউক, বা প্রতিপত্তি-হীনের প্রতি অনুকম্পা বশতঃ হউক, বা ন্যায় ও সাম্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই হউক,—নিজেরা পরস্পরকে সামলায়। একদল ক্ষমতাশালী লোক, অপরদল ক্ষমতাশালী লোককে তেমন বাড়িয়া উঠিতে দেয় না। পরস্পর, একে অন্যের গায়ে হেলিয়া, প্রত্যেকে অপরকে সোজা রাখে। এই কিস্তির পর কিস্তি ও পরস্পরের মাৎ সাম্‌লাইবার চেষ্টায়, অনেক শক্তি ও প্রতিপত্তির অপচয় হয় বটে, কিন্তু শক্তি-হীনের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা ইহাতে কমিয়া যায়।

রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যগুলি প্রধানতঃ তিনটী শ্রেণীতে বিভাগ করা হয়—(১) ব্যবস্থা-প্রণয়ন (legislative), (২) শাসন (executive), ও (৩) বিচার (judicial)। ইহাতেই সভ্য-রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য শেষ হয় না বলিয়া, আরও দুই একটী শ্রেণী সৃষ্টি করা হইয়াছে, যথা—(৪) ধর্ম্ম, নীতি, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি সভ্যতার প্রধান অঙ্গের পরিদর্শন ও পোষণ; (৫) অর্থবল-লাভের চেষ্টায় সহায়তা (public economy)। ক্ষমতা বৈষম্য-জনিত অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য, সভ্য-রাষ্ট্রে যাহাদের হাতে শাসন বা পুলিস বা সৈন্যের ভার থাকে, তাহাদের হাতে সাধারণ প্রজার বিচার-ভার রাখা হয় না। ক্ষমতার বৈষম্য যদি রাষ্ট্রে থাকিবেই, প্রজার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, এই শাসন-বিভাগ ও বিচার-বিভাগ পৃথক করা (separation of judicial and executive functions) নিতান্ত কর্ত্তব্য।

কিন্তু এতো গেল বৈষম্য মানিয়া নিয়া, তাহার কুফল নিবারণের চেষ্টা। বহু শতাব্দী হইতে মানুষ আর এক পন্থার কথা ভাবিয়াছে। তাহা বৈষম্য সমূলে উৎপাটিত করিয়া, অত্যাচারের সম্ভাবনা-পর্য্যন্ত বিলোপ করা। ধন বৈষম্যের মূলে পৃথক্ সম্পত্তির (private property) ব্যবস্থা। পৃথক্-সম্পত্তি যদি জন-সমাজ হইতে দূর করিয়া দেওয়া যায়, তবে বুঝি আর ধনী দরিদ্রের পার্থক্য এ পৃথিবীতে থাকিবে না। পৃথক্-সম্পত্তি (private property) সমাজে যদি থাকিতে দেও, তবে ধন-বৈষম্য থাকিবেই। ধন-বৈষম্য থাকিলে, তাহার ফল—দরিদ্রের প্রতি ধনীর অত্যাচার—আপনা আপনিই আসিয়া দেখা দিবে। সুতরাং, অত্যাচার দূর করিতে চাও, ত মূলে কুঠারাঘাত কর; পৃথক্-সম্পত্তি মানব-সমাজ হইতে বিদায় করিয়া দেও। এ জমি আমার, ঐ জমি তোমার, অপর জমি আর একজনের, এ ব্যবস্থা থাকিতে দিও না। সেই সভ্যতার শৈশবে যেমন সকল জমি সকলের ছিল, সেই ব্যবস্থা আবার ফিরাইয়া আন। শুধু জমি লইয়া নয়। ধনও এতটা আমার, আর অতটা তোমার, এরূপ থাকিতে দিও না। সব ধন সকলের। প্রয়োজন-মত লোকে ভোগ করিবে। সঞ্চয় করিতে পারিবে না।

প্রত্যেককে শ্রম করিয়া শ্রমার্জ্জিত ধন ভোগ করিবার অধিকার দেওয়া হইবে; কিন্তু কেহ নিজের জন্য ধন-সঞ্চয় করিতে পারিবে না। আর উপার্জ্জকের মৃত্যুর পর, তাহার পুত্র বা কন্যা যে উপার্জিত ধন ভোগ করিবে, তাহাও হইতে পারিবে না। পৃথক্-সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকারিত্ব (inheritance) দূর করিয়া দেও। মূলধনের (capital) সঙ্গে সঙ্গে সুদ (interest) দূর করিয়া দেও। রাষ্ট্র-শাসনের জন্য প্রজা-প্রতিনিধিকে ক্ষমতা দেও। সাধারণ প্রজার প্রতিনিধিদ্বারা রাষ্ট্র-শাসনের ব্যবস্থা (parliamentary government) চলুক। কিন্তু, ধনী দরিদ্রের পার্থক্য দূর করিবার জন্য পৃথক্-সম্পত্তি দূর কর। আর ইহার জন্য প্রয়োজন, শ্রেণীতে শ্রেণীতে যুদ্ধ। মানব-সমাজে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ, এই পৃথক্-সম্পত্তির ব্যবস্থা বজায় রাখা। দরিদ্রের, কৃষকের, শ্রমজীবীর স্বার্থ, এই পৃথক্ সম্পত্তির ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া। সুতরাং, চাই এই দুই শ্রেণীতে যুদ্ধ (class war)। 'ভদ্রলোকের' বিরুদ্ধে দরিদ্র—যাহাদিগকে 'ভদ্রলোকেরা' বলে 'ছোট-লোক'—তোমরা যুদ্ধ ঘোষণা কর। ঐ দেখ, শতাব্দীর পর শতাব্দী, তোমার শ্রম-লব্ধ অর্থে পরিপুষ্ট 'ভদ্রলোক' তোমাকে কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়া, দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত করিয়া, নিজে পৃথিবীর সকল সুখ ভোগ করিতেছে। এ যুদ্ধে খোয়াইবার তোমার কি আছে? তোমার আছে বলিতে, শৃঙ্খল। খোয়াইলে খোয়াইবে, শুধু তোমার ঐ শৃঙ্খল। ওঠ, জাগ, 'ভদ্রলোকের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা কর; শৃঙ্খল-মুক্ত হও। সমাজ-তন্ত্র-বাদীর (socialist) এই আহ্বান।

রাষ্ট্রে বৈষম্য মানিয়া লইয়া, তাহার কুফল নিবারণের চেষ্টার পন্থার কথা বলিয়াছি। এ পথে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিস্তীর পর কিস্তী; একদল ক্ষমতাশালী লোক, অপর ক্ষমতাশালী দলকে দোরস্ত রাখে (check-and-balance-system। তারপরে বলিলাম, সমাজ-তন্ত্র-বাদীর পন্থা, বৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত। কিন্তু তবুও রাষ্ট্রে ও সমাজে বল বা শক্তি (force) রহিয়া গেল। এবার একদল বলিতেছেন যে, বল বা শক্তিকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে, তবে অত্যাচার থামিবে।

রাষ্ট্রের রাজ-শক্তি একজন বংশানুক্রমিক রাজার হাতে ন্যস্ত থাকুক বা লোক-নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতির হাতে কয়েক বৎসর মাত্র ন্যস্ত থাকুক, অল্প সংখ্যক অভিজাতের বা নায়ক পিতৃগণের হাতে ন্যস্ত থাকুক, বা বহুসংখ্যক নির্ব্বাচিত সঙ্ঘ-বদ্ধ প্রজা-প্রতিনিধির হাতে ন্যস্ত থাকুক, বল বা শক্তি বাদ দিলে রাষ্ট্র টেকে না। রাজ-তন্ত্রই বল, অভিজাত-তন্ত্রই বল, আর গণ-তন্ত্রই বল,—বল বা শক্তির হাত এড়াইবার উপায় নাই।

তবুও রাষ্ট্রের মূলভিত্তি শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আজ অন্ততঃ ২২০০ বৎসর চলিয়াছে। কোনও প্রকার শক্তি-প্রতিষ্ঠিত শাসন থাকিবে না, একথা মানবের দু দশ বৎসরের নূতন খেয়াল নহে। বহু পুরাতন দাবী। রাজ-তন্ত্র, গণ-তন্ত্র—কোথায়ও সকলের সম্পূর্ণ সম্মতি লইয়া শাসন হয় না। কোথায়ও বা অল্পের সম্মতি লইয়া, এক বা একাধিক জন রাষ্ট্র-শাসন করে। কোথায়ও বা বহুর সম্মতি লইয়া রাষ্ট্র-শাসন চলে। অধিকাংশের সম্মতি লইয়া রাষ্ট্র-শাসন পুরাকালে বড় একটা ছিল না। আমাদের দেশে, আজও অল্পাংশের সম্মতি লইয়াই রাষ্ট্র-শাসন চলিতেছে। অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, যে সব রাষ্ট্র স্বাধীন, তাহাতে সর্ব্ব-সম্মতি-ক্রমে

রাষ্ট্র-শাসন হয়। দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্ ; ইংলণ্ডে নির্ব্বাচিত প্রজা-প্রতিনিধি দ্বারা শাসনের ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু নির্ব্বাচনের সময় যাহারা ভোটে পরাস্ত হয়, তাহারা, ও যাহাদের আদৌ ভোট্ নাই, এই দুই দলের মোট সংখ্যা অনেক সময় ভোটে জয়ী দলের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হয়। সুতরাং, নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা থাকিলেও, স্বাধীন রাষ্ট্রে পর্য্যন্ত অনেক সময় অল্লাংশের সম্মতি লইয়াই অধিকাংশের শাসন চলে। অরাজক-বাদী (anarchist) বলে যে, হয়, রাষ্ট্রে শাসন থাকিবে না, নয়,—সেই একই কথার ভিন্নরূপ—রাষ্ট্রের প্রত্যেকের সম্মতি লইয়া শাসন করিতে হইবে। তাহা হইলে আর বল বা শক্তির আধিপত্য থাকিবে না।

অরাজক-সমাজ (anarchy) বলিতে, বোমা-ছোড়া বা গোপনে প্রাণনাশ বুঝিতে হইবে না। অরাজক-সমাজের আদর্শ যাহারা প্রচার করে, তাহারা বল বা শক্তিকে (force) রাষ্ট্র হইতে বিদায় করিতে চায়। তাহারা নিজেও বল বা শক্তির শরণাপন্ন হইতে চায় না।

এই বল-বিবর্জ্জিত আদর্শের মূর্ত্ত-প্রকাশ আজ পর্য্যন্ত কোনও উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রে বা সমাজে দেখা যায় নাই। প্রত্যেকের সম্মতি লইয়া রাষ্ট্র-শাসন পৃথিবীতে আজও দেখা যায় নাই। মার্কিন ভূমি হইতে দাসত্ব দূর করিবার জন্য, যুক্ত-রাজ্যে, প্রজার রক্তে যখন দেশ প্লাবিত হইতেছিল, মহাপুরুষ এব্রাহাম লিঙ্কন্ যখন যুক্ত-রাজ্যে স্বাধীনতার নূতন আবির্ভাবের কথা বলিতে বলিতে দিব্য-চক্ষে মূর্ত্ত-স্বরাজ দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে—"জনগণেরই হিতার্থে,জনগণ-দ্বারা জনগণের শাসন" ("government of the people, by the people, for the people") রাষ্ট্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন—তখন তিনিও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, রাষ্ট্রীয় জনগণের প্রত্যেকের সম্মতি না পাইলে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

খ্রীষ্টীয় আদর্শ-বাদ—দ্বাদশ শতাব্দী।

Scholasticism

সেণ্ট অ্যান্‌সেল্‌ম্ যখন ক্যাণ্টারবেরীর প্রধান যাজকের পদে উন্নীত হন, তখন পণ্ডিত-সমাজে বাস্তব-বাদ (realism) ও নাম-বাদ (nominalism) লইয়া যে ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল, সেই আন্দোলনে তিনি বিশেষভাবেই যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে ফ্রান্সের চার্টার (Chartres) ও প্যারী নগরে কতকগুলি তত্ত্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল ; তাহাদের মধ্যে শেষোক্ত নগরের তিনটি বিদ্যালয় বিশেষরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং অল্পদিনের মধ্যেই যাবতীয় জ্ঞানচর্চ্চা তাহাদের অন্তর্ভূত হয়। আন্দোলনের মূল আলোচ্য বাস্তব-বাদ ও নাম-বাদের বিরোধ হইলেও, এই দুই মতের আবার বিভিন্ন শাখা দেখা যায়।

সুপ্রসিদ্ধ পিটর্ অ্যাবিলার্ড (Abelard) গোঁড়া বাস্তব-বাদের (extreme realism) প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এক দিকে যেমন বিভিন্ন দলের বিবাদ, অন্যদিকে তেমনি, বিবাদের ফলে, নব নব মতের আবিষ্কার ও সঙ্কলন আরম্ভ হয়। যাঁহারা এই নবাবিষ্কৃত মত সমূহ লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সল্‌সবেরীর জন্ এবং লীল্ নগরীর অ্যালানের (Alan) নাম উল্লেখ-যোগ্য।

উল্লিখিত শাখা-সমূহের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের লোক স্কোটাস্ ঈরিগিনার অনুকরণে খ্রীষ্টীয় আদর্শ-বাদের বিপক্ষতা করিতেছিলেন। এই দলের প্রায় সকলেই সর্ব্বভূতে দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। অপর এক দলের লোক (১) যাহারা ক্যাথেরী (Catheri) অ্যাল্‌বিজেন্সী (Albigenses) নামক দুই বিধর্ম্মী সম্প্রদায়ের নির্যাতনে নিযুক্ত ছিলেন, প্রাচীন এপিকিউরীয় দিগের ন্যায় (২) ঐহিক সুখ-সম্ভোগের প্রতি তাঁহাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইত। তৃতীয় এক দলের লোক. কঠোর ধর্ম্মতত্ত্বে মনোনিবেশ করায় ধর্ম্মতত্ত্বেরও (Theology) উন্নতি হইয়াছিল।

গোঁড়া বাস্তব-বাদ (extreme realism)—দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ, গোঁড়া বাস্তব-বাদের প্রাধান্য-কাল। এই মতের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে জাতি-বাচক এবং শ্রেণী-বাচক যাবতীয় জ্ঞানের মূলে এক সার্ব্বজনীন সত্তা নির্দ্ধারিত হইলেও, সেই সত্তায় যাবতীয় বস্তুর মিলন-গ্রন্থি-রূপ ঐশ্বরিক-ঐক্য (pantheistic unity) সূচিত হয় না। যে সকল বিশেষত্ব লইয়া 'জাতি', 'শ্রেণী' ও 'ব্যক্তি' বিশেষিত হয়, সেই বিশেষত্বগুলি সার্ব্বজনীন সত্তারই অঙ্গ-স্বরূপ (*Cf.* Plato's Ideas), অথচ তাহাদের ভিতর ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব নাই; সেগুলি যেন প্রাণহীন, পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ-রহিত। এরূপ মতকে ভ্রান্ত-মত বলিতে হইবে। সার্ব্বজনীন সত্তা যদি যাবতীয় বস্তুর মূল কারণ বা ভিত্তি হয়, তবে আর তাহাতে ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব আরোপ করিতে আপত্তি কি? এই সময়ের বাস্তব-বাদ সংক্রান্ত মতাবলী মোট দুই প্রধান ভাগে বিভাজ্য। প্রথম, সাম্পোর উইলিয়মের মত; এবং দ্বিতীয়, চার্টার বিদ্যালয়ের মত।

(১) ইঁহারা পোপ Innocent III. ও তাঁহার অনুচরবর্গ। ইনোসেন্ট "হেরেটিক" বা ভিন্ন-মতাবলম্বীদিগের উচ্ছেদ-সাধন কল্পে যে অভিযান করিয়াছিলেন, ও তাহার ফলে পশ্চিম-ইউরোপ-খণ্ডে যে রক্তপাত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসজ্ঞ-মাত্রেই অবগত আছেন। Albigenses-সম্প্রদায় বা Albigeois-দিগের উচ্ছেদ সম্বন্ধে Prof. Bury তাঁহার History of the Freedom of Thought গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, পাঠকদিগের অবগতির জন্য তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"Langnedoc in south-western France was largely populated by heretics, whose opinions were considered particularly offensive, known as the Albigeois. They were the subjects of the Count of Toulouse, and were in industries and respectable people. But the Church got far too little money out of this anti-clerical population, and Innocent called upon the Count to exterpate heresy from his dominion."—p. 56 (Home University Edition.)

(২) গ্রীক-দর্শন, ১৩৯-১৪৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

১। সাম্পোর উইলিয়ম্ (William of Champeaux)

সাম্পোর উইলিয়ম্ খ্রীষ্টীয় ১০৭০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্রমান্বয় সালোঁর বিশপ-পদে (Bishop of Chalons) প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

যৌবনে তিনি লেয়ঁর বিদ্যালয়ে অধ্যাপক অ্যানসেলমের (Anselm of Laon) নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে এই বিদ্যালয়ের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং বহুদূর হইতে শিক্ষার্থিগণ তথায় সমাগত হইতেন। উইলিয়ম্ যখন ১১০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীর ক্যাথেড্রাল বিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে তিনি একবার গুরু-বিদ্বেষী হইয়া উঠেন। কিন্তু পরে, তাঁহারই শিষ্য, পিটর্ অ্যাবিলার্ড, কর্ত্তৃক কঠোররূপে আক্রান্ত হইয়া, স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার ফল পাইয়াছিলেন।

উইলিয়ম্ "ডায়ালেক্‌টিক্‌স্" সম্বন্ধে অনেক গুলি পুস্তক প্রণয়ন করিলেও, সেই সকল পুস্তকের অধিকাংশই এইক্ষণ বিলুপ্ত হইয়াছে। "Sentences" নামে তাঁহার একখানি সংগ্রহ-পুস্তকও ছিল। অ্যাবিলার্ডের গ্রন্থে দেখা যায় যে, উইলিয়ম্ 'নাম' (universals) সম্বন্ধে স্বীয় মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতের প্রধান আলোচ্য বিষয় গুলি নিয়ে সংক্ষেপে বিবৃত হইল,—

একত্ব-বোধক মত বা Identity Theory। সার্ব্বজনীন-সত্তা তাহার অন্তর্ভূত প্রত্যেক "শ্রেণী"তে এরূপ ভাবে বিরাজিত যে, সেই শ্রেণীর অন্তর্গত "ব্যক্তি" সমূহেও তাহা পৃথক পৃথক ও পূর্ণরূপে বিদ্যমান। ব্যক্তিসমূহ (individuals) শ্রেণীর বিকার (modification) এবং বিকারগুলি আকস্মিক বা দৈব-সাপেক্ষ। শ্রেণী, মূল সত্তার অংশ বিশেষ। এই মত সহজেই উপহসিত হইতে পারে। প্রত্যেক মানুষই যদি নিখিল মানব-জাতির প্রতিনিধি হয়, তবে সমগ্র মানব-সমাজই এক কালে পূর্ণ ও একক ভাবে রোমে সক্রেটিসের ভিতর এবং এথেন্সে প্লেটোর ভিতর অবস্থিত; অর্থাৎ মানব-জাতীর প্রতিনিধিরূপে সক্রেটিস্, ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়াও, প্লেটোর সহিত একত্র অবস্থান করিতেছেন বলিতে হইবে। প্লেটোর সম্বন্ধেও ঐ কথা। যতই উপহসনীয় হউক, উইলিয়ম্ যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা এই যে, একমাত্র সর্ব্বজনীন সত্তা ভিন্ন আর কোন বস্তুই সত্য বলিয়া গ্রাহ্য নয়। মানব বলিতে একটি মাত্র সর্ব্বব্যাপী সত্য স্বরূপ মানবই বুঝায়, আর ইহাই আদর্শ মানব, বা মানব-জাতীর রূপ। সক্রেটিস্ প্লেটো প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মানুষ, দৃশ্যতঃ পৃথক হইলেও, মূলতঃ (fundamentally) এক। ইহাদের পরস্পরের যে ভেদ বা পার্থক্য, সেই ভেদ বা পার্থক্য গুলি মূল সত্তার "আকস্মিক" বিকার ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহাদের বাস্তবতা বা সারবত্তা নাই; মোটের উপর, ইহারা শূন্য-গর্ভ শব্দ বা "নাম" (*flatus voces*)। *গোঁড়া বাস্তব-বাদী বা আদর্শ-বাদীর মতে প্রত্যেক জাতি-বাচক ধারণার মূলে এমন এক অখণ্ড নিত্যবস্তু কল্পিত হয় যে, সেই বস্তুর সহিত তাহার ধারণার পুঙ্খানুপুঙ্খ ঐক্য বা সামঞ্জস্য থাকে। বস্তুগুলি আমাদের মানস-রাজ্যের বহির্ভাগেই অবস্থিত; অর্থাৎ, তাহাদের অস্তিত্ব আমাদের 'ভাবা' কিম্বা 'না ভাবা'র উপর নির্ভর করে না। যাহা হউক, আবিলার্ডের তীব্র বিদ্রূপ সহিতে না পারিয়া, উইলিয়ম্, ১১০৮ খ্রীষ্টাব্দে, নোটর্‌ডাম্

বিদ্যালয় ত্যাগ করেন ও তাহার কিছুদিন পরে সেণ্ট্ ভিক্টর বিদ্যালয়ে অনুরূপ মতের প্রচারে প্রবৃত্ত হন। উইলিয়ম্ই শেষোক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

মাধ্যমিক-মত বা Indifference Theory—এই মত মধ্য-পন্থী বলিয়া, দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অনেকের নিকট, বিশেষতঃ উইলিয়মের শিষ্যদিগের নিকট, বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল। Indifference Theoryর অনেকেই অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "জাতি" ও "শ্রেণী" বিভাগ সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তকের প্রকাশক হয়ারো (M. Haureau) "indifference"এর স্থলে "individuality" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। মোটের উপর, কুজা (Cousins) হয়ারো'র মতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই যে, একই সত্য বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিদ্যমান থাকিয়াও, স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে; অর্থাৎ, বস্তু ব্যক্তিতে বিদ্যমান বটে, কিন্তু সেই বিদ্যমানতা বা অস্তিত্ব ব্যক্তির, individuality বা স্বাতন্ত্র্যের অনুরূপ। যে ব্যক্তিতে যতটুকু স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিত্ব সম্ভবপর, তাহাতে ততটুকু সত্যই প্রকটিত হয়। এই মত যতই আদরনীয় হউক, এখানেও অ্যাবিলার্ড শত্রুতা সাধিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য ইহাও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

সাদৃশ-মত বা Similarity Theory—এই মতে, বস্তুর সার "ব্যক্তি"তে (individualএ) বিবর্তিত ও বিবর্দ্ধিত (multiplied) হইলেও, বিবর্দ্ধিত-সার-সমূহের পরস্পরের "সাদৃশ্য" নষ্ট হয় না; অর্থাৎ, সাদৃশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিতেই প্রকাশ পায়। ইহার ফলে, এক জাতীয় যাবতীয় জীবের 'জাতি'গত স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে।

এস্থলে গোঁড়া বাস্তব-বাদের পরিবর্তে বরং রস্কেলিনের, এমন কি প্রকারান্তরে অ্যাবিলার্ডের, যুক্তিই সমর্থিত হইতেছে।

উইলিয়মের পুনঃ পুনঃ মত পরিবর্ত্তনের আসল কারণ এই যে, তিনি অ্যাবিলার্ডের বিচারে পরাস্ত হইয়া, অবশেষে তাঁহার মতই অবলম্বনীয় মনে করিয়াছিলেন।

২। চার্টার বিদ্যালয়।

বার্ণার্ড্ (Bernard of Chartres.)

ফুল্বার্ট (Fulbert) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চার্টার বিদ্যালয়, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে গোঁড়া বাস্তব-বাদের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল। চার্টারের বার্ণার্ড্ ব্যতীত, মেলান ও টুর্সে'র আরও দুইজন বার্ণার্ড্ ছিলেন; তাঁহাদের সহিত বক্ষ্যমান বার্ণার্ডের সম্বন্ধ নাই।

চার্টার বিদ্যালয়ে যে কয়জন প্রধান অধ্যাপক অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বার্ণার্ড্ই সর্ব্ব-প্রথম। ইহাঁর শ্রোতাদিগের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়, যথা, ১১১৭ খ্রীষ্টাব্দে, গিল্বার্ট ডে লা পরী (Gilbert de la Porree), এবং ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে, কঞ্চের উইলিয়ম্ ও বিশপ রিচার্ড্। ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চার্টার চার্চ্চের চান্সেলর (Chancellor) পদলাভ করেন, এবং ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁহার মৃত্যু হয়।

বার্ণার্ডের মতে জাতি-বাচক ও শ্রেণী-বাচক বিশেষত্ব গুলি (generic and specific essences) ত ভিত্তিহীন হইতেই পারে না। অধিকন্তু, ব্যক্তিগত আকস্মিক গুণ গুলিরও

(accidents) মূলে বাস্তব-সত্তার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে, সার্ব্বজনীন-সত্য-সমূহ বিদ্যমান আছে বলিয়াই, জীবের অস্তিত্ব রক্ষিত হইয়াছে। নচেৎ, কেবল ইন্দ্রিয়জ সংস্কারের আর স্থায়িত্ব কি? সেগুলি ত ছায়ার মতই চঞ্চল ও অসার। মধ্যযুগের এই মতের সহিতই প্রাচীন যুগের আদর্শ-বাদের (Plato's Idealism) সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। বার্ণার্ড্ অধ্যাত্ম-জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া, তন্মধ্যে তিনটি প্রধান ও পৃথক স্তর দেখিতে পান। (১) ঈশ্বর,—মহান্ ও অনন্ত সত্তা। (২) জড়,—(matter), যাহার নিজের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, পরন্তু, যাহা ঈশ্বরের ক্রিয়াশীলতার ফল-স্বরূপ উৎপন্ন হইয়া, আদর্শ কর্ত্তৃক দৃশ্যমান জগতে পরিণত হইয়াছে। (৩) আদর্শ বা বস্তুগত-রূপ সমূহ—যদ্দ্বারা নিখিল সৃষ্টি ভূত ভবিষ্যৎ কাল নির্ব্বিশেষে অনন্ত প্রজ্ঞার গোচর রহিয়াছে। বার্নার্ড্ কি প্রকারে এই তিন পর্য্যায়ের পরস্পরের সহিত সন্ধি-স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা কঠিন। তদীয় ঐতিহাসিক সল্স্বেরীর জন্ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, সময়ে সময়ে তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন ঘটিত। তিনি কখনও এক পক্ষে নশ্বর দ্রব্য নিচয়ের সমষ্টিরূপ ইন্দ্রিয় জগৎ, এবং অপর পক্ষে, ঈশ্বরের অন্তর্লীন-ভাব (immanency) বা আদর্শ সমূহ, এই দুয়ের সংযোগ-সূত্র-রূপে এক তৃতীয় সত্তা বা স্বাভাবিক-রূপ (*formæ nativa*) কল্পনা করিয়াছিলেন। এই স্বাভাবিক রূপ বা মিলন-গ্রন্থি, অনন্ত আদর্শের (ঈশ্বরের) প্রতিনিধিরূপে জড়ের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইলেও, সেই আদর্শ সমূহের সহিত মিলিয়া যায় না। আবার কখনও ইহাও বলিয়াছেন যে, জড় ও আদর্শ বা রূপের মধ্যে তৃতীয় বস্তুর ব্যবধান নাই; আদর্শ জড়ের সহিত মিলিয়া একীভূত হয়, অর্থাৎ জড় কিম্বা আদর্শের পৃথক সত্তা থাকে না। বার্ণার্ড্ যদি শেষ পর্য্যন্ত এই মতকেই অবলম্বন করিয়া স্থির থাকিতেন, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহাকে সর্ব্বদেবত্ব-বাদী বা pantheistic বলিয়া গণ্য করা যাইত। কিন্তু, তিনি যে শেষ পর্য্যন্ত এই মতেরই পোষকতা করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

বার্ণার্ড্ সৃষ্টির উপাদান-স্বরূপ এক প্রকার আদি-জড়ের (*materea primordialis*) অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। এই আদি-জড় 'স্বভাবতঃ' শৃঙ্খলা-বিহীন; তবে তন্মধ্যে রূপ-প্রদায়িকা-শক্তি (plastic principle) বিদ্যমান থাকায়, সেই অ-রূপ জড়, অশেষ রূপের ছাঁচে ঢালাই হইয়া, অসংখ্য অবয়ব ধারণ করিয়াছে। এই মত যে শক্তি-বাদের অনুকূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং অ্যারিষ্টটলের জড়-ও-রূপ-সংক্রান্ত মতের বিরোধী। (৩) বার্ণার্ডের শক্তি-বাদ, চার্টার বিদ্যালয়ের মতাবলীর মধ্যে অত্যন্ত প্রিয়মত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ইহারই পাশাপাশি আর এক প্রাচীন মতের পুনরভ্যুদয় হয় এবং তাহাতে বিশ্ব-প্রকৃতিকে দেবী-রূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) বিশ্ব-প্রকৃতি এক বিশাল জীব-দেহ তুল্য; সুতরাং, উহা যাবতীয় পৃথক পৃথক জীব হইতে ভিন্ন এবং স্বয়ং-আত্মা বিশিষ্ট। বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত বিশ্বাত্মার সম্বন্ধ-স্থাপন কল্পে, বার্ণার্ডের শিষ্যগণ পিথাগোরাসের কল্পিত সংখ্যা-মালার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। চার্টার সম্প্রদায়ের অনেকেই বার্ণার্ডের অনুকরণ করিয়াছিলেন। এবং তদীয় শিষ্যদিগের মধ্যে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা থিওডোরিকের (Theodoric) সময়ে, উক্ত সম্প্রদায়ের যৎপরোনাস্তি শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

(৩) গ্রীক দর্শন, ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (৪) গ্রীক দর্শন, ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
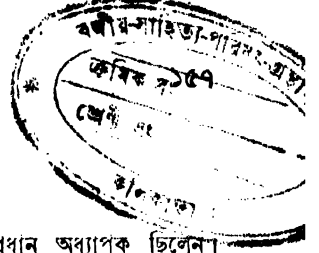
থিওডোরিক (Theodoric)।

থিওডোরিক "মাজিষ্টার স্কলি" (*magister scholæ*) বা প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। এই সময়ে সল্‌স্‌বেরীর জন্ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করেন। ১১৪১ খ্রীষ্টাব্দে, চার্টারে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের 'চান্সেলর' হন, এবং তাহার চৌদ্দ বৎসর পরে, তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপ্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে "Eptateuchon" বা সপ্ত-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট।

চার্টারে যে সকল বিষয় অধীত হইত, তন্মধ্যে ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও তর্ক-শাস্ত্র, এই ত্রিবিদ্যা বা "ট্রিভিয়াম্" (*Trivium*)-এর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর ছিল। পণ্ডিতেরা বলিতেন যে, অলঙ্কার-শাস্ত্রে এবং লাটীন ভাষায় ব্যুৎপত্তি না থাকিলে, বিজ্ঞান-শাস্ত্রে সম্যক্ অধিকার হয় না। "এপ্টাটিউকন্"-গ্রন্থে অ্যারিষ্টটল-কৃত "অর্গাননে"র অনেক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয় যে, এই গ্রন্থ হইতেই পশ্চিম ইউরোপে অর্গাননের প্রচার হইয়াছিল। থিওডোরিক যে কিরূপে "অর্গাননে"র অংশগুলি হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় না। 'এপ্টাটিউকনে'র আবিষ্কর্ত্তা ক্লার্ভাল্ (M. Clerval) এ সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। মোটের উপর, থিওডোরিক তাৎকালিক পণ্ডিতদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতি-কল্পে ও সামঞ্জস্য-বিধানে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই থিওডোরিকের নিকটই দাল্‌মেটিয়ান্ হর্ম্মান্ কর্ত্তৃক, ১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দে, টোলেমীর "প্লেনিস্ফিয়ার" (Planisphere) নামক গ্রন্থের লাটীন অনুবাদ (আরবীয় সংস্করণের) প্রেরিত হইয়াছিল।

অধ্যাত্ম-শাস্ত্র সম্বন্ধে থিওডোরিক সোৎসাহে ও দৃঢ়তার সহিত আদর্শ-তত্ত্বের বিচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই আদর্শ-বাদ চার্টার বিদ্যালয়ের অবনতি-কাল পর্য্যন্ত প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ক্লার্ভাল্ ও হয়ারো প্রভৃতির মতে, তিনি গোড়া আদর্শ-বাদ ও সর্ব্বদেবত্ব-বাদের মধ্যে যে সামান্য ব্যবধান, তাহাও ভেদ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা যাহাই বলুন, থিওডোরিক কিন্তু অতটা অগ্রসর হন নাই। ঈশ্বরের অনন্ত প্রভাব এবং স্রষ্টার উপর সৃষ্টির একান্ত নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে তাঁহার যে সকল রচনা আছে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে গেলে সতর্কতা আবশ্যক। "অনন্ত এক" হইতে "সান্ত অনেকে"র উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি যে পিথাগোরীয় মতের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাও খুব বেশি পরিমাণে নয়। ঈশ্বর একমাত্র অনন্ত মহা-সত্তা বলিয়া তিনি দুই বা বহু'র অতীত, এবং দ্বিত্ব-বোধক যাবতীয় বস্তুই অনন্ত একের অনুপ্রবেশ (compenetriation) ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। তাঁহার এই উক্তিরও যথাযথ অর্থ-গ্রহণ করিতে হইবে। স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত মত এই যে, নিয়মাবদ্ধ বাহ্য-জগতে ঈশ্বর সৃষ্টবস্তু-জাতের নিয়মিত অবস্থানের একমাত্র 'হেতু' হইলেও, প্রত্যেক প্রাণীরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এবং সেই স্বাতন্ত্র্য, ঈশ্বরেরই 'কৃত'। এই মত প্রকাশে থিওডোরিক কোন সন্দেহ রাখেন নাই। উপসংহারে বলিতে হইবে, তাঁহার চিন্তা-প্রণালী "স্কলাষ্টিক" বা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মানুমোদিত হইলেও, অ-খ্রীষ্টীয় বা "অ্যান্টি-স্কলাষ্টিক" মতের খুব কাছাকাছি গিয়াছিল।

"কস্‌মলজি" বা সৃষ্টি-বিজ্ঞানের বিচারে থিওডোরিক তদীয় ভ্রাতার মতেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহা বাইবেল-বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ।

থিওডোরিকে'র শিষ্যদিগের মধ্যে রেটিনার (Retines) রবার্ট, ডাল্‌মেটিয়ান্ হর্ম্মান্, এবং সল্‌স্‌বেরীর জন্'ই সুপরিচিত।

উইলিয়ম্ কঞ্চ্ (William of Conches)।

উইলিয়ম্ কঞ্চ্ (১০৮০-১১৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) বার্ণাডের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। "হিউম্যানিজম্" (Humanism) বা সাহিত্য-সেবায় এবং জড়-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় তিনি সর্ব্বদাই যত্নবান্ থাকিতেন। এই সকল কারণে তাঁহাকে চাটারের মতের পরিপোষক বলিয়া গণ্য করা হয়। প্যারী নগরে কিছুকাল অধ্যাপনার পর, তিনি রাজা হেন্‌রীর (Henry Plantagenet) গৃহ-শিক্ষক হইয়াছিলেন! প্লেটোর "টিমিয়াস্"-গ্রন্থ এবং "ডি কন্‌সোলেশিওনি ফিলজফী" নামক গ্রন্থের কথঞ্চিৎ উন্নতি-সাধন ব্যতীত, তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ-রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তকের মধ্যে—"Magna de Naturis Philosophia," "De Philosophia Mundi" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত পুস্তকখানি কখনও কখনও বীডে'র রচিত বলিয়া উক্ত হয়।

প্রথম জীবনে উইলিয়ম্ গোড়া বাস্তব-বাদের দিকে অধিক ঝুঁকিয়াছিলেন; এমন কি, ধর্ম্ম-তত্ত্বে পিথাগোরাসের মত প্রয়োগ করিতে গিয়া, খ্রীষ্টের আত্মাকে (Holy Ghost) বিশ্বাত্মারূপে দেখাইতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সেণ্ট্ থিওডোরিকের উইলিয়ম্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, তিনি এই অদ্ভুত মতের প্রত্যাহার করেন এবং তৎপরে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন।

চার্টার বিদ্যালয়ে অন্যান্য শাস্ত্র-সমূহের সহিত চিকিৎসা-শাস্ত্রও বিশেষভাবে আলোচিত হইত। এই সময়ে চিকিৎসক (Alexander) অ্যালেক্‌জাণ্ডারের "De Arte Medica" বা চিকিৎসা-বিদ্যা, "ইসাগোগ্ জোহানিটি" (Isagoge Johanitie) হিপাক্রেটিসের মূল সূত্র-সমূহ (Aphorisms of Hippocrates), ফিলারিটাসের "ডি পল্‌সিবুস্" (De Pulsibus), থিওফিলাসের "ডি ইউরিনিস্" (De Urinis), কনষ্ট্যাণ্টাইনের "থিওরিকা" (Theorica) এবং গ্যালেনের উপর লিখিত ভাষ্য-সমূহ একমাত্র চিকিৎসা-গ্রন্থ-রূপে ব্যবহৃত হইত। কনষ্ট্যাণ্টাইনের পুস্তক সাহায্যে, উইলিয়ম্ গ্যালেন ও হিপক্রেটিসের শারীর-বিদ্যা সংক্রান্ত অনুমান-সমূহ অবগত হইয়াছিলেন এবং সেই সকল অনুমানের সহিত স্নায়বিক জ্ঞানের ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কনষ্ট্যাণ্টাইনই পশ্চিম প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সহিত দৈহিক পরিবর্ত্তনের সামঞ্জস্য প্রচার করেন। সেই হইতে এ বিষয়ে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ায়, মানসিক-বৃত্তিগুলির চর্চ্চা ক্রমান্বয় লোপ পাইতে থাকে। বাথের অ্যাডিলার্ড্ (Adelard), সেণ্ট্ থিওডোরিকের উইলিয়ম্ (William of St. Theodoric), হিসিউর উইলিয়ম্ (William of Hirschau) এবং আরও অনেকে, সম্বিৎ-উৎপাদনে মানসিক-ক্রিয়ার অপেক্ষা, স্নায়বিক-ক্রিয়ার প্রাধান্য অধিক স্বীকার করিতেন।

সৃষ্টি-বিজ্ঞান (Cosmology) সম্বন্ধে চার্টার বিদ্যালয়ের অপর দুইজন অধ্যাপকের সহিত উইলিয়মের মতের মিল ছিল না। সৃষ্টিতত্ত্বে তাঁহারা শক্তির কার্য্যকারিতায় বিশ্বাস করিতেন; উইলিয়মের মত পরমাণু-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অগ্নি, বায়ু, জল ও মৃত্তিকা এই চারি উপাদান পরস্পর সমধর্ম্ম এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য জড়কণা সমূহের সম্মিলনে উৎপন্ন। কণাগুলি সহজেই চালিত ও মিলিত হইয়া অবয়ব প্রাপ্ত হয়। স্বভাব-জাত যাবতীয় দ্রব্য, এমন কি, সর্ব্বাপেক্ষা পরিণত-জীবনী-শক্তি-বিশিষ্ট মানব-দেহও, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বা পরমাণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং, আত্মাই যে দেহ-গঠনের মূল কারণ—আত্মা হইতেই যে দেহ রূপ-প্রাপ্ত হইতেছে, এরূপ বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। তবে যে উইলিয়ম্ বিশ্বাত্মার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন, সে কেবল চার্টার বিদ্যালয়ের সংস্কার-বশেই করিয়াছিলেন।

উইলিয়ম্ কঞ্চের অপর একখানি পুস্তকের নাম Summa Moralium Philosophorum বা "মর‍্যাল্ ফিলজফি"র সংগ্রহ। ঐতিহাসিকেরা এই পুস্তককে মধ্যযুগের নীতি-শাস্ত্র-বিষয়ক প্রথম-গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। ইহার বক্তব্যগুলি প্রধানতঃ সেনেকা ও সিসিরো হইতে গৃহীত হইয়াছিল। প্রকৃত নীতি-শাস্ত্র বা নীতি-বিজ্ঞান (Ethics) যাহাতে মানব-চরিত্রের প্রকৃতি এবং মানবের চরম উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়, তাহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সঙ্কলিত হয় নাই।

সর্ব্বদেবত্ব-বাদের অভ্যুদয় (Dawn of Pantheism)।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বদেবত্ব বাদ ও গোঁড়া বাস্তব-বাদের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান নাই; এবং থিওডোরিকের মতের সামান্য পরিবর্ত্তন করিলেই, তাহা পূর্ব্বোক্ত মতে পরিণত হইতে পারে। হইয়াছিলও তাহাই। বহুসংখ্যক দার্শনিক গোঁড়া বাস্তব-বাদের আলোচনা হইতে ক্রমান্বয় সর্ব্বদেবত্ব-বাদের (Pantheism) পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। ইঁহাদের মধ্যে, অ্যাবিলার্ড্ই সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম-বিচারক-রূপে পরিগণিত ছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীদিগ্বিজয় রায়চৌধুরী।

শিক্ষা-জগতের যৎকিঞ্চিৎ।

শিক্ষা কি রকম হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে আমায় কিছু বল্‌তে বল্লেই, আমার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হয়। আমি আপত্তি করাতে আমায় বলা হল—"বাঃ রে, তুমি এত যায়গায় কাজ করে এলে; তুমিই ত এ বিষয়ে বল্‌বার লোক।" আমি তখন যোড়হাত করে বল্লাম—"আজ্ঞে, কিন্তু সব জায়গায়ই যে আমায় আনাড়ি ঠাউরে, অনেকেই উপদেশ দিয়ে গেলেন, কি রকম করে শিক্ষা দিলে শিক্ষাদান কাজটা সুসম্পন্ন হয়।" বাস্তবিক, আমার মনে হয়, শিক্ষকদের মত—বিশেষ করে, শিক্ষায়তনের কর্ণধারদের মত—বেচারা লোক আর কেহ নাই। শিক্ষা-বিজ্ঞানের আজ পর্য্যন্ত অতি শৈশব অবস্থা। তার উপর, এটা যে একটা বিজ্ঞান, অনেকে তাই-ই স্বীকার

করেন না। কাজেই এর উপর রাম, শ্যাম, খেঁদী, পুঁটী সকলেই নির্ভয়চিত্তে নিজের মত রীতিমত জাহির করে আসছেন। আমার জীবনেই ত আমি দেখলাম, এ বিষয়ে যিনি যত বেশী অনভিজ্ঞ, তাঁরই তত বেশী মত দিবার প্রবল আকাঙ্খা ও চেষ্টা; এবং তাঁর মত অগ্রাহ্য হলে, তাঁর তত বেশী রাগ। শিক্ষায়তনের কর্ত্রী হয়ে আমি এটা বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি যে, অল্প শিক্ষিত বাবা-মা-রাই নিজেদের, আমাকে আমার কাজ শেখাবার অধিকারী বিবেচনা ক'রে, ক্রমাগতই উপদেশ দিয়ে গেছেন। কলম্বোতে থাকৃতে দুটী তিনটী মহিলার বিশেষ অনুগ্রহ-দৃষ্টি আমার উপর পড়ে। তাঁরা, সময় অসময়ে শুভাগমন করে, তাঁদের উপদেশ দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করতেন। ছুটীর পর চটী পায়ে দেওয়া, আঁচলে চাবী বাধা, নিতান্ত ভারতীয় এই মেয়েটীর যে সাহায্যের বিশেষ দরকার, তা তাঁরা খুব ভাল করেই বুঝেছিলেন, বোধ হয়। কিন্তু আমি কোনও রকমে ভেবে পেতাম না যে, এঁদের মতকে আমি কি রকমে গ্রহণ কর্ব্ব বা প্রকাশ দোবো। এঁরাও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠ্‌লেন; বল্লেন, মেয়েটী বড়ই এক রোখা; নিজের মত অনুসারেই চলে, কারো মত গ্রাহ্য করে না। আমি উপায়ান্তর না দেখে, একদিন জনদশেক মহিলাকে ডেকে বল্লাম—"কলেজের কাজ,—বিশেষ করে, ছাত্রী-নিবাসের কাজ—সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কর্ব্বার জন্য আমি আপনাদের সাহায্য-ভিক্ষা করছি। আপনারা অনুগ্রহ করে আমায় আপনাদের অভিজ্ঞতার ফল দিয়ে সাহায্য করুন।" পূর্ব্ব কথিত মহিলাদের মধ্যে একজন বল্লেন,—"আপনি ত আমাদের মত গ্রাহ্যই করেন না। আমি বল্লাম—"আপনারা লিখে দিলে, আমার সেই অনুসারে কাজ কর্ব্বার সুবিধা হয়; যদি অনুগ্রহ করে লিখে দেন"। আমার নম্রতায় তাঁদের রুষ্ট-হৃদয়, বোধ হয়, পরিতৃপ্ত হল। পরদিনই তিন খানা পত্র পেলাম। একজন আমার উপর ভার দিয়েই নিশ্চিন্ত; অপর দুজন তাঁদের মত ব্যক্ত করেছেন। এক সপ্তাহ অপেক্ষা করলুম, আর কেহই মত দিলেন না। আমি চেয়ে পাঠাতে, দুইএক জন উত্তর দিলেন—"আপনার কাজ,আপনিই বুঝুন্ না কেন? আমাদের আর কি বল্‌বার আছে। আপনি, যা' হচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট।" আমি আবার সবাইকে ডাকলুম; আস্‌লেন, মাত্র পাঁচজন। আমি তখন সেই দুটী পত্র-লেখিকাকে তাঁদের পত্র দুটী—এককে অন্যের—পড়্‌তে দিলাম। বল্লাম—"আমি কি করে এখন কাজ করি, বলে দিন"। এ দুজন ঠিক বিপরীত মতই ব্যক্ত করেছেন। একজনের মত চালাতে গেলে, অন্যজনের মত গ্রহণ কর্ব্বার উপায় থাকে না। এঁদের দুজনাকে মত নিয়ে তর্ক করবার অবকাশ দিয়ে, আমি অপর তিন জনকে নিয়ে অন্য কোনও বিশেষ কাজে মন দিলাম। ঐ দিন থেকেই আমার সাহায্য কর্ব্বার প্রবৃত্তি, এই দুটী হিতৈষিণীর মধ্যে আর ততটা পরিস্ফুট হতে দেখি নি।

আমার এক বন্ধু আমায় সর্ব্বদাই এই বদনাম দেন যে, আমি অতিশয় অসহিষ্ণু এবং ঝগড়াটে। কিন্তু এই সমস্ত মতের অত্যাচার, আমরা শিক্ষায়তনের কর্ত্তা কর্ত্রীরা যে রকম নীরবে এবং হাসিমুখে সহ্য করে থাকি, সেটা যখন মনে হয়, তখন নিজের প্রতিই নিজের চিত্ত, শ্রদ্ধায় ভেরে ওঠে; সকল দেশের সকল শিক্ষায়তনের কর্ণধারদের প্রতি সমবেদনায় মন পূর্ণ হয়।

স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীদের মুখে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে- মেয়েদের লেখাপড়া শেখালেই তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। এই স্বাস্থ্য নষ্ট হবার কারণ খুঁজ্‌তে গিয়ে কতকগুলি জাজ্বল্যমান অভাব আমাদের চোখে পড়ে গেল। তার একটী হচ্ছে, মেয়েদের শরীর-চালনা

ও ব্যায়ামের অভাব। তখন স্থির হ'ল যে, ব্যায়ামের ব্যবস্থা হবে। বিদ্যালয়ের সময়-বিভাগে, সপ্তাহে দু'ঘণ্টা ড্রিলের ব্যবস্থা করা হ'ল। কিন্তু তাতেও ঠিক হয় না মনে করে, আমরা জন কয়েক নূতন-ব্রতী, প্রধানাচার্য্যা ও প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে, বিদ্যালয়ের ছুটীর পর ব্যায়াম-শিক্ষার বন্দোবস্ত করলাম। একটা nominal fee নেওয়াও ঠিক হ'ল। মেয়েদের বলা হ'ল বাড়ী গিয়ে বলতে বা বাড়ীর লোকদের লিখে জানাতে। কয়েক দিন পরে, প্রধান-শিক্ষক মশাই, হাতে এক তাড়া চিঠি নিয়ে ডেকে বল্লেন—"শুনে যাও, তুমি না ভারী উৎসাহী। এই দেখ মজা।" অধিকাংশ চিঠি গুলির মত, একই—এই রকম ব্যায়াম শিক্ষা দ্বারা আমাদের দেশের মেয়েদের জাতিগত বিশেষত্ব হারাইবার সম্ভাবনা। এক একজন লিখেছেন যে, জল তোলা, বাট্না বাটা, এবং বাসন মাজার কাজেই মেয়েদের ব্যায়াম করা হতে পারে। কিন্তু তাঁদের এটুকু মনে এল না যে, সহরে কলের জল; পাড়াগাঁয়ের পথ হেঁটে, নদী বা পুকুর থেকে জল আনার মত, এখানে জল তোলার কাজে, সে রকম শরীর-চালনা হয় না। তারপর, বাটনা-বাটা বা বাসন-মাজা বিদ্যালয়ে হ'তে পারে না। এত জাতির বিচার এবং হাজার কুসংস্কারের বাধা ঠেলে, এ দেশে তা' হওয়াও সম্ভব এখন নয়। বাড়ীতেও স্কুল-প্রত্যাগত ক্লান্ত মেয়েটীকে দিয়ে, পারত-পক্ষে, বাবা-মা-রা ওসব কাজ করান্ না। একজন বাবা তাঁর কন্যাকে লিখেছিলেন—"কেন? তোরা কি সব দেবী-চৌধুরাণী হয়ে উঠ্‌বি, যে, আবার ড্রিল ইত্যাদি শেখার ঢঙ্ উঠেছে? ও সব করলে তোর শরীরের কোমলতা নষ্ট হয়ে যাবে; ও সব তোকে করতে হবে না।" অথচ এই ভারতবর্ষেই নৃত্য-গীতের বহুল আদর ছিল এবং আজ পর্য্যন্ত রাজান্তঃপুরিকাগণ, রাজ-রাণী থেকে আরম্ভ করে সবাই-ই, গার্ভা, কজরী ইত্যাদি কত নাম দিয়ে, এই ড্রিলই করে' থাকেন। আমরা তখন নূতন কাজে ব্রতী; ব্যাপার দেখে, একেবারেই হাল ছেড়ে দিলাম।

কলাম্বোতে থাকতে আমি ছাত্রী-নিবাসের ছাত্রীদের মধ্যে শরীরের সকল অঙ্গ-চালনার উপযোগী খেলার প্রবর্ত্তন করেছিলাম এবং তারা যাতে এসব খেলা নিয়মমত খেলে, সে দিকেও দৃষ্টি রেখেছিলাম। Day scholar-দেরও শ্রেণী-হিসাবে, পালা করে, খেলাতে যোগ দিবার বন্দোবস্ত করেছিলাম। ছাত্রীরা অধিকাংশই খুব আগ্রহের সঙ্গেই এই নূতন নিয়মটীকে গ্রহণ করেছিল।

একদিন ম্যানেজার মশাই হঠাৎ একখানা চিঠি নিয়ে এসে বল্লেন—"তোমার নামে যে নালিশ এসেছে, মা"। একজন বাবা লিখেছেন—"আমি বাড়ীতে ছেলে মেয়েদের মোটেই খেলতে দিই না। তারা স্কুল থেকে এসেই পড়তে বসে যায়" (তারপর কত ঘণ্টা পড়ে, তার এক হিসাব দিয়ে, তিনি লিখেছেন) "আর, ইঁনি স্কুলে খেলার নিয়ম করে বসেছেন। এটা কি ভাল! লেখাপড়ার সময় খেলার দিকে মন দিলে, এদের লেখাপড়া হবে না যে।" আর একটী মহিলা, রেলগাড়ীর ভাড়া খরচ করে, আমায় বলতে এসেছিলেন, তাঁর মেয়েটী খেলার সময়, কাপড়ে জরীর ফুল-তোলা বা কোনও রকম চারু-সূচী-শিল্পের কাজ করতে পারে কি না। আমি বল্লাম "না, তা' পারে না ত! এখানকার নিয়ম যে, খেলা করা।" তিনি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বল্লেন "খেলা যদি করতে হয়, তা হলে যেন তাসই খেলে।" এক পাঞ্জাবী মায়ের ভয় হয়েছিল, তাঁর মেয়ে শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে, টেনিস কোর্টের আব্দার ধরে বসতে পারে।

মেয়েদের স্বাস্থ্য-হানির আর একটা কারণ আমি পেয়েছিলাম, সেটা তাদের অসময় খাওয়া; এবং তাও, পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে এবং শরীরের পুষ্টির দিকে দৃষ্টি রেখে নয়। বিদ্যালয় থেকে এর কোনও সুব্যবস্থা করা আমাদের দেশে কঠিন; কারণ, প্রথমতঃ, এখানে residential school বা college হওয়া সম্ভবপর নয়; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের বালিকা-বিদ্যালয় গুলিকেই, ছাত্রী আনিবার বন্দোবস্ত করতে হয়। এই দ্বিতীয় কারণের জন্যই, স্কুল-পড়া ছেলেদের চেয়ে, মেয়েদেরই খাওয়ার অনিয়ম বেশী হয়। কলাম্বোতে সে ঝঞ্চাট ছিল না; ছাত্রী আসার বন্দোবস্ত বাড়ী থেকেই করা হয়। সেই জন্য আমি সেখানে সকালে স্কুল করতাম। ডিরেক্টার ডেন্‌হ্যাম সাহেবের এই ব্যবস্থা পছন্দ হওয়াতে, তিনি সমস্ত স্কুল কলেজকে এই ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। ১১টার সময় খাবার ছুটী হ'ত। বাড়ী যাদের কাছে, তারা বাড়ী গিয়ে খেয়ে আস্‌ত। বাকীদের খাওয়ার বন্দোবস্ত স্কুলে করা হ'ত। কেউ ছাত্রী-নিবাসে, মাসিক fee দিয়ে, সেখানকার খাবার খেতেন; কারো বা বাড়ী থেকে খাবার আস্‌ত। যাদের বাড়ী থেকে খাবার আস্‌ত, তাদেরও খাওয়া আমি নিজে গিয়ে দেখ্‌তাম। একজন মা কিন্তু এই খবর শুনে বড়ই চটে উঠেছিলেন। এই দেখাটা যে আমার একটা কর্ত্তব্য, সেটা অনেকখানি বেগ পেয়েই আমায় তাঁকে বোঝাতে হয়েছিল; আমি অতিকষ্টে তাঁকে শান্ত করি। বেথুন-স্কুলে একটা চালাক চতুর মেয়েকে বিকালের দিকে প্রায়ই অন্যমনস্ক এবং ক্লান্ত দেখ্‌তে পেতাম। একদিন সে মূর্চ্ছিত হয়েও পড়্‌ল। তাকে প্রশ্ন করে এবং তার সহ-পাঠিনীদের কথা শুনে আমি জান্‌তে পারলাম যে, গাড়ী এ'কে খুব সকাল সকাল আন্‌তে য'য় বলে, এর ভাগ্যে প্রায়ই পান্তা-ভাত বা আগের দিনের বাসী রুটী জোটে; তার উপর, মেয়েটী টিফিন খায় না। তাকে আমি বল্লাম—"তুমি যদি ফের এরকম কর, টিফিন না খাও, ত, তোমার পড়া আমি নেবো না, আর ক্লাশে তোমায় last থাক্‌তে হবে। এমনি কর্‌লে তুমি স্কুলেই পড়্‌তে পার্‌বে না; আমি হেড-মাষ্টার মশাইকে বলে দোবো, তোমার নাম কাটিয়ে দিতে।" মেয়েটীর বাড়ীর লোকে আমার উপর খুব রেগে গিয়ে, হেড-মাষ্টারের কাছে অভিযোগ এনেছিলেন—"আমার মেয়ে খেতে পেলে কি না পেলো, বাঁচল কি মর্‌ল, তাতে ওঁর কি মাথা-ব্যথা? উনি নিজের কাজ করুন্।" হেড-মাষ্টার মশাই বলেছিলেন—"ও ত নিজের কাজই করেছে। এ রকম অনাহার-ক্লিষ্ট, দুর্ব্বলাকে ও কি ক'রে পড়াবে?" পেটের খোরাকের দিকে দৃষ্টিপাত না করে, শুধু মনের খোরাক যোগাতে ব্যস্ত বলেই ত' দেশের তরুণ ছাত্র ছাত্রীদের আজ এই চেহারা।

কোনও কোনও বাবা মা আছেন যাঁরা মনে করেন, ক্লাশের সকল ছাত্র বা ছাত্রীই যখন সমান টাকা মাহিনা দিচ্ছে, তখন সকলেরই সব বিষয় সমান-রূপে জানা উচিত। ক্লাশের যেটা standard তার নীচে হলেই, শিক্ষককে শুধু যে জবাব দিহি দিতে হয়, তা নয়; ক'এর যদি খ'এর সমান ইংরাজীতে বা অঙ্কে ব্যুৎপত্তি না হয়, তারও কারণ জানাতে হয়। কারো কারো যে কোন বিষয়কে আয়ত্ত কর্ব্বার বিশেষ একটা শক্তি থাকে, তা' তাঁরা বোঝেন না। আমি সঙ্গীত, সূচী-শিল্প আর চিত্র-বিদ্যার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের এ কথা অনেক বার বল্‌তে শুনেছি, অমুকের বাবা-বা-মা আমাকে জালাতন করে তুলেছেন; তিনি কিছুতেই বুঝবেন না যে, তাঁর কন্যার স্বর-বোধ নাই, কিম্বা সেলাই এর প্রতি অনুরাগ নাই, কিম্বা সরল বা বাঁকা রেখার প্রত্যেক

তত বোঝে না, কিম্বা বর্ণ-জ্ঞান নাই। অনেক চেষ্টা বা ঘসা-মাজার ফলে, এই বোধ-শক্তি বিকশিত হয়; কিন্তু সে, এই বিষয়ে স্বাভাবিক প্রতিভা-সম্পন্না ছাত্রীকে যে ধরিতে পারে না, তা' বাবা মা বুঝ্‌তে চান্ না। আমাকে একবার একজন মা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"আমার মেয়েটীকে আপনি কেমন মনে করেন। আমি বল্লাম—"বেশ চমৎকার, খুব চালাক চতুর মেয়েটী।" তিনি অমনি তার term reportটী বাহির করে বল্লেন "তবে?" মেয়েটী কোনও বিষয়েই শ্রেণীতে প্রথম-স্থান অধিকার করে নাই। সে ছিল ভারী চঞ্চল এবং সর্ব্বদাই অন্যের ভাবনা ভেবেই অস্থির। সেই শ্রেণীতে এই মেয়েটীর মতই বুদ্ধিমতী এবং এর চেয়েও বুদ্ধিমতী দু তিনটী মেয়ে ছিল, যারা পরের চরখায় তেল দেওয়ার চেয়ে নিজের চরখায় তেল দেওয়াটাই বেশী ফল-দায়ক মনে করত; ফলে, তারাই প্রথম, দ্বিতীয়, ইত্যাদি স্থান অধিকার করেছিল। আমি খুব ধীরভাবেই বল্লাম—"আপনার মেয়ে খুব চালাক; কিন্তু তার চেয়েও চালাক মেয়ে যে শ্রেণীতে নেই, একথা ত আমি বলি নি।" জননী দেবী চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে বল্লেন—"আপনি একটু খোঁজ করে দেখ্‌বেন, ক্লাশের শিক্ষয়িত্রী বিদ্বেষ করে আমার মেয়েটীকে কম নম্বর দিয়েছেন কি না"। আমি বল্লাম—"একজনের না হয় বিদ্বেষ থাক্‌তে পারে; সব শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর বিদ্বেষ থাকার কারণ কি? আপনার মেয়েটী এতই দুষ্টু, আর শাসনের বাহিরে মনে করার মত ত আমি কিছু দেখি না। ও শুধু একটু অন্যমনস্ক আর চঞ্চল—এ ছাড়া কিছু নয়।" মা চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্লেন—"আপনি ত শিক্ষয়িত্রীদের বিরুদ্ধে কিছু শুন্‌বেন্ না—আমি আর কি কর্ব্ব?" আমি বলিলাম—"আমি যে তাঁদের সঙ্গে কাজ কর্‌ছি, আমি যে তাঁদের জানি।"

আর এক মার একটী মেয়ে গানের প্রাইজ পাওয়ার পর, তার জ্যাঠামশাই আমাদের সঙ্গে দেখা করে বল্লেন—"আমার স্ত্রী বল্‌ছিলেন, আমাদের মেয়েটীও,—র মতই চমৎকার গান গায়; তবে সে প্রাইজ পেলো না কেন?" আমাদের একজন একটু বিরক্তির সুরে বলে উঠ্‌লেন—"আপনার স্ত্রী পরীক্ষা করেন নি বলে, আর কিছুর জন্যে নয়।" পিতাটী একটু থতমত খেয়ে উত্তর দিলেন—"না, আমাদের মনে হচ্ছিল যে, ওকে ততটা যত্ন নিয়ে শেখানো হয় নি। শেখানোর দিক থেকে গলদ্ থাক্‌তে পারে ত?" আমি বল্লাম—"আবার শেখার দিক থেকেও গলদ্ থাকে কি না! অবশ্য যিনি শেখাচ্ছেন তাঁর খুবই অন্যায়; আপনার মেয়েও যে টাকা দিচ্ছেন, আপনার ভাই-ঝিও তাই দিচ্ছেন। শিক্ষকের উচিত ছিল, ওজন করে, সমান মাপের, সঙ্গীত-বিদ্যা দুজনাকে বাঁটিয়া দেওয়া। ভবিষ্যতে যাতে এরকম হয়, আমরা তা' দেখে দিব; আপনিও আপনার মেয়েটীকে বল্‌বেন, তিনি যেন যত্ন করে গ্রহণ করেন; অন্যমনস্ক হয়ে বা অন্য কোনও কারণে, কম না নেন।" জানি না, তিনি আমার কথা বুঝলেন কি না। ছোট একটা "হুঁ" বলে, আমাদের নমস্কার জানিয়ে, তিনি চলে গেলেন।

বাস্তবিকই, অনেক বাবা মা মনে করেন আমরা শিক্ষকেরা যেন দোকান-দারী কর্‌ছি। দুই টাকা দামে, সকলকেই সমান ওজনে, অঙ্ক, ইতিহাস, ভুগোল, ভাষা, ইত্যাদি মেপে তুলে দিব। তা'ত দেওয়া হ'ল ক্লাশে—কিন্তু পাত্রের গভীরতা, প্রসারতা, ইত্যাদি অনুসারে সে গুলি যে ধারণ করা হ'ল, তাহা তাঁদের খেয়ালে আসে না।

অনেক বাবা মা আবার আব্দার ধরে বসেন, তাঁদের ছেলে মেয়ের দিকে বিশেষ করে দৃষ্টি

রাখ্‌তে ; তাদের বেলায় নিয়মগুলি ঢিলা কর্‌তে। আমার একটী বন্ধুকে একজন, তাঁর ছেলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌তে অনুরোধ করায়, বন্ধুটী বড় বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ছেলের মা বাবাকে কি বলেছিলেন জানি না ; কিন্তু, আমায় এসে অনেক কথাই বলেছিলেন ; তা'র একমাত্র কারণ, আমি এঁদের দুজনার সঙ্গে একটু পরিচিত ছিলাম। জালন্ধরে কন্যা-মহা-বিদ্যালয়ে নিয়ম আছে যে, ভোর পাঁচটায় উঠে, ছাত্রীরা আপন আপন শয্যা আপনি পরিষ্কার করে', আপন আপন কাজে যায়। একজন বড়লোকের গৃহিণী এসে একদিন আমাদের কাছে কান্না সুরু করে দিলেন—"আমার মেয়েরা বাড়ীতে আটটার আগে ওঠে না ; চাকর তাদের খাবার বিছানায় কাছে এনে দেয়, তবে তারা খায়।" আমি বল্লাম "তা' বেশ ! তা' আমাদের কি করতে বলেন ? এখানে ত চাকর নেই ; কাজেই সে কিছু খাবার নিয়ে বিছানার কাছে পৌছিয়ে দিতে পারে না। তারপর, বিদ্যালয়ের নিয়ম যে, পাঁচটায় সময় শয্যাত্যাগ করা।"

"হাঁ, তা'ত ; কিন্তু তা'তে আমার মেয়েদের যে কষ্ট হয়।"

"হবারই ত কথা ! তা আপনি তাদের এমন কোনও স্কুলে দিন না কেন, যেখানে আটটা পর্য্যন্ত তারা বিছানায় শুয়ে থাকতে পার্ব্বে ; তারপর চাকরে খাবার এনে দিলে, উঠে খাবে !"

সঙ্গিনী কুমারী লজ্জাবতী হেসে বল্লেন—"তা কেন ? বাড়ী নিয়ে-ই যান না ওদের। এখানে থাক্‌লে ত ঐ নিয়ম মান্‌তে হবে।" মা যা' বল্লেন তাতে বুঝ্‌লাম যে, বাড়ী নিয়ে যাওয়া বা অন্য স্কুলে দেওয়া হতে পারে না ; কারণ, তাঁর কন্যাদের বিবাহ-সম্বন্ধ যেখানে স্থিরীকৃত হয়েছে, তাঁরা চান্, কন্যারা এই বিদ্যালয়েই পড়ে। কাজেই, আমাদের উচিত হয়, নিয়ম শিথিল করা। কিন্তু, কাজটা কর্‌তে বলা তাঁর পক্ষে যতটা সহজ, করাটা আমাদের পক্ষে ততখানি যে নয়, তা বুঝতে তাঁর প্রায় তিন দিন লেগেছিল।

আর একবার, রাত্রি দশটার সময়, লজ্জাবতী দেবী আমার ডেকে আন্‌লেন, বাহিরের কন্‌কনে শীতের মধ্যে, একজন পাঞ্জাবী বাবুকে বোঝাবার জন্য যে, নিয়মভঙ্গ করা, প্রিন্সিপ্যালের পক্ষেও অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক ঘটনা নয়। বাবুটি বুঝ্‌লেন না। তিনি লজ্জাবতীকে সম্বোধন করে বল্লেন—"কুমারীজী, আপনার প্রতি আমার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল ; কিন্তু, আমি আজ তা' হারালাম।" আমি আসার প্রায় আধঘণ্টা আগে থেকে, এই মেয়েটি এঁকে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌ছিলেন। কন্‌কনে শীতে, লেপ থেকে বাইরে এসে, আমার মেজাজ্‌টা কিন্তু বড় ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি। আমি তাই উত্তর কর্‌লাম—"আপনারই ত ক্ষতি হ'ল ; কারণ, হারালেন যে আপনি।"

শিক্ষার বিষয় নির্ব্বাচনের সময় দেখা যায়, অনেক বাবা মা পুত্রকন্যার রুচি ও ঝোঁক্‌কে একেবারে অগ্রাহ্য করে, নিজেদের মত চালিয়ে যান্। আবার অনেক সময় দেখা যায়, পুত্র বা কন্যা, আপনার ইচ্ছামত শিক্ষণীয় বিষয় পছন্দ করে নেয় ; তারপর বাবা মা হয়ত এমন একটা পেশা তাকে অবলম্বন কর্‌তে বলেন, যার সঙ্গে তার শিক্ষা-লব্ধ অভিজ্ঞতার কোন মিল থাকে না। বি-এ-তে দর্শন আর ইতিহাস নিয়েছে যে, তাকে আমি ডাক্তারী পড়্‌তে যেতে দেখেছি ; কারণ, বাবা কি মা চান্। আই-এ-তে লজিক, ইতিহাস আর অঙ্ক নিয়েও, ডাক্তারী পড়্‌তে যায়, এমন ছেলেও দেখেছি।

এইসব বিষয়ে আমি বরাবরই ব্যক্তি-তন্ত্রতা ও বিশিষ্টতার পক্ষপাতী। এই জন্যই বোধ করি, আজ পর্য্যন্ত খুসী মনে নারী-সমাজকে ডাক দিয়ে এই কথাটি বল্‌তে পারলুম না যে, আপনারা খালি চরখা কাটুন, আর হিন্দী শিখুন; আর কিছু শিখে দরকার নাই। ভয় হয় পাছে, এতে কারো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের হানি হয়ে যায়।

আমার একটী ছাত্রীর ইতিহাস পড়ার দিকে খুব ঝোঁক্ ছিল। ইতিহাস সে খুবই ভালবাসিত। তাই তার খুবই ইচ্ছা ছিল যে, সে ইতিহাস এবং লজিক নেয়; কারণ, লজিক না নিলে, সে মনস্তত্ব বা সমাজ-তত্ব পড়িবার পথ খোলা রাখ্‌তে পার্ব্বে না। কিন্তু তার বাবা চাইলেন যে, সে লজিক এবং উদ্ভিদ-বিজ্ঞান নেয়। তার আন্তরিক ইচ্ছা দেখে, আমি তার বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা কর্‌লুম যে, তাকে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের বদলে, ইতিহাস নিতে দেওয়াই ভাল। বাবা আমাকে বল্লেন যে, তিনি কন্যাকে সুগৃহিণী গড়ে তুল্‌তে চান্ বলেই বিদ্যা-শিক্ষা দিচ্ছেন। বিদুষী পণ্ডিতা কর্ব্বার জন্য নয়। কাজেই, তাকে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান নিতেই হবে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"আই-এতে, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান নিলে কি খুব সুগৃহিণী হওয়া যায়? কেন?" তিনি উত্তরে বল্লেন "উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান পড়্‌লেই মেয়ে ভাল রান্না কর্‌তে পার্‌বে।" রান্নাটা যে একটা আলাদা বিজ্ঞান এবং আর্ট, তা বাবা-টার জানা ছিল না। আমি একটু হেসে উত্তর দিলাম—"তরকারী কুট্‌তেও আপনার মেয়েটা ভাল করেই পার্‌বেন। চিড়া-জীরা, লাউ-ঘণ্টের লাউ, ইত্যাদি কোটা তাঁর পক্ষে খুব সহজ হবে।" বাবা খুসী হয়েই বল্লেন—"হাঁ, তাও ত ঠিক। তরকারী কোটাও ত শিখ্‌তে হয়—সেটাও ত দরকারী।" মেয়েটিকে এই রকমে সুগৃহিণী হওয়াই শিখ্‌তে হ'ল। তার আর ইতিহাস শেখার সাধ মিটিল না।

আমার একটী ছাত্রের জীবনেও বাবার ইচ্ছা জয়যুক্ত হতে গিয়ে, খুব বড় রকমের একটা করুণ-রস সৃষ্টি করে তুলেছিল। এ ছেলেটা বড় ভাব-প্রবণ এবং শিশু বয়সেই চিত্রাঙ্কনে খুব দক্ষতা দেখিয়েছে। এর বড়ই ইচ্ছা, চিত্রকর হয়। আমার ইচ্ছাধীনে যতদিন ছিল, ততদিন এর স্বাভাবিক-শক্তির স্ফুরণে আমি যতটা সুবিধা এবং সহায়তা করিতে পারি, ত্রুটী করি নাই। আমার ছাত্রত্ব শেষ করে সে যখন গেল, তখন তাহার বাবাকে এই দিকে একে শিক্ষা দিতে বারম্বার করে অনুরোধ করে ছিলাম। কিন্তু তিনি বল্লেন—"আমাদের বংশে কেউ কোন কালে চিত্রকর হয় নি; বংশের পুরুষেরা ওকালতী ব্যবসায় অবলম্বন করেছে। আমার বাপ, দাদা, উকীল ছিলেন; আমি উকীল; আমার ভাই উকীল;—আমার ছেলেও উকীল হবে।" এর উপর কি আর অন্য কোন যুক্তি খাটে? এ হিসাবে ত কালিদাসের ছেলে, নাতি সকলকারই "রঘুবংশ" লেখা উচিত ছিল; কিম্বা সেক্ষপীয়রের বই লেখাটা একবারেই ভুল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, বোঝে কে?

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

তরণীসেন।

"ঘরের শত্রু বিভীষণ" এই প্রবাদ-বাক্য, ত্রেতা-যুগের লঙ্কাধিপতি দশাননের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। কেহ স্বজাতি বা স্বদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিলেই 'বিভীষণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিভীষণ ধর্ম্ম-ভীরু ছিলেন। লঙ্কেশ্বরের অবৈধ কার্য্য তিনি কখনও সমর্থন করিতে পারেন নাই। নীতি-ধর্ম্মের অনুগত হইয়া জীবনাতিপাত করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। যখন রাবণ, রামের পত্নী সীতাদেবীকে অন্যায় রূপে হরণ করিয়া আনেন্ এবং তদুপলক্ষে রাম-রাবণে যুদ্ধারম্ভ হয়, তখন বিভীষণ, সীতাদেবীকে প্রত্যর্পণ করিয়া, শান্তি-স্থাপন করিতে ভ্রাতাকে অনুরোধ করেন। তাহাতে কোন ফল হয় না। বরং, বিভীষণ, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া, মনোদুঃখে, ন্যায়ের আদর্শ, রামের শরণাপন্ন হন; উভয়পক্ষে যুদ্ধের নিবৃত্তি না হওয়ায়, বিভীষণকে পাইয়া, রামচন্দ্রের মন্ত্রণা-কার্য্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়। সসম্মানে, বিভীষণ রামের মন্ত্রণা-পরিষদে স্থানলাভ করেন। মন্ত্রণা ব্যপদেশে বিভীষণ স্বজাতি ও স্বদেশের প্রভূত অপকার সংসাধিত করেন। পতনের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। এককথায় বলিতে হয়, বিভীষণের সহায়তায়ই রামচন্দ্র বিজয়-লক্ষ্মী লাভ করেন। প্রিয়তমা সীতার উদ্ধার-সাধনে সমর্থ হন। ন্যায়-পক্ষপাতী হইলেও, বিভীষণ আত্মীয়-দ্রোহী হওয়ায়, জগতে নির্ম্মল-গৌরবের অধিকারী হইতে পারেন নাই। আমাদের মনে হয়, তিনি স্বদেশের পতনের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া পাপ-ভাগী হইয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন যেন আত্ম-দ্রোহিতা কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

বীর তরণীসেন, সেই বিভীষণের তনয়। পিতা দেশের শত্রু-পক্ষে যোগদান করিলেও, তরণীসেন দেশের পক্ষে থাকিয়া, দেশাধিপতি, জনকের অপমানকারী, জ্যেষ্ঠ তাত দশাননের গৌরব-রক্ষার জন্য প্রাণপাত করিতে দ্বিধা-শূন্য ছিলেন। পিতার দৌর্ব্বল্যের অনুসরণ করা, তাঁহার কখনও অভিপ্রেত হয় নাই। দেশাত্ম-বোধ, তাঁহাকে পিতৃ-বৈরী লঙ্কেশের অধীনতা হইতে বিচ্ছিন্ন করে নাই! বিভীষণের বীর-পুত্র তরণীসেন, তাই রাবণের সেনাপতি হইয়া, রামের সহিত সংগ্রাম করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অলোক-সামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া, দেহপাত করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

তরণী, জগতে এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাহি পরমন্তপঃ'-স্বরূপ-হইলেও, স্বদেশ-দ্রোহী পিতার পক্ষাবলম্বন করা ধর্ম্ম-সম্মত নহে। স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব-রক্ষা করা মানব-মাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যের প্রতিকূল জনকের পদাঙ্কানুসরণ না করিলে, কোনই প্রত্যবায় হয় না; বরং, মনুষ্যত্ব রক্ষিত হয়।

তরণীসেন আরো শিক্ষা দিয়াছেন, জাতীয় স্বার্থের সম্মুখে, ব্যক্তিগত মান-অপমান গণনা সঙ্গত নয়। উহা ভুলিয়া গিয়া, জাতীয়-স্বার্থকে বড় করিয়া ধরিতে হয়; তাহার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে হয়। তাহাতেই জীবনের সার্থকতা।

তরণী যদি পিতার অপমানকে বড় করিয়া তুলিতেন, দেশের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতেন,

স্তবে তিনি সেনাপতি-রূপে দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে পারিতেন না। পিতার ন্যায় স্বদেশ-দ্রোহী, আত্মীয়-দ্রোহী সাজিতেন। রামের পক্ষাবলম্বন করিয়া পিতার যোগ্যপুত্র হইতেন। কিন্তু, তাহার অত্যুচ্চ চরিত্র, তাঁহাকে অবনত হইতে দেয় নাই ; স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভুলিবার মত নীচতা লাভ করিতে পারেন নাই। তরণীর চরিত্র কি অপূর্ব্ব! স্বদেশ-প্রেম কি প্রগাঢ়, !! স্বজাতির গৌরব-রক্ষায় আগ্রহ কি অসামান্য।

ত্রেতার রক্ষ-পরিবারের বীর-তরণীর আদর্শ, বর্ত্তমান মানব-সমাজের সর্ব্বতোভাবে অনুকরনীয়। রাজনীতি-ক্ষেত্রেই হউক, সমাজেই হউক, বিভীষণের সংখ্যাধিক্য, ক্ষতির কথা, কলঙ্কের কথা! তরণীর সংখ্যা-বর্দ্ধনই কল্যাণের কারণ, গৌরবের বিষয়, সাফল্যের নিদান। ব্যক্তিগত লাভ লোকসান, মান অপমান ভুলিয়া গিয়া, সমষ্টির ক্ষতি-বৃদ্ধির গৌরব অগৌরবের গণনা করিয়া কার্য্য করিতে না শিখিলে, কখনও দেশ ও জাতির মুখোজ্জ্বল হয় না। কর্ম্মীও ধন্য হইতে পারেন না। শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ-বর্ম্মা।

নগর ও পল্লী-গ্রাম।

প্রতীচ্য-জগতের সঙ্ঘর্ষে এ-দেশের পল্লী-নিবাস বিধ্বস্ত হইতেছে। নানা কারণে, লোক গ্রাম ত্যাগ করিয়া নগরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নগর পুষ্ট হইতেছে, নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে ; পল্লীগ্রাম হতশ্রী হইয়া, ক্রমে কেবল কৃষি-জীবির বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে।

শিক্ষা বা বিষয়-কার্য্য অনেককে নাগরিক হইতে বাধ্য করে। আধুনিক সভ্যতার অনেক উপকরণ পল্লীগ্রাম যোগাইতে পারে না। বিদ্যা-শিক্ষা, পূর্ব্বে, পল্লী-গ্রামস্থ টোল, পাঠশালা বা মুক্তাবে চলিত। এক্ষণে নাগরিক বিদ্যালয়ে কিছুদিন সময়-ক্ষেপ না করিলে, কাহারও শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইবার দাবি জন্মে না। বিচার, পূর্ব্বে, গ্রাম্য-জমিদারী কাছারিতেই হইত ; এক্ষণে, তাহার অন্বেষণ করিতে হয়, নগরে। চাকরী- ও আইন-ব্যবসায়ী বাঙ্গালীর জীবিকা-স্থল, নগর। ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি, নগরে। বিলাতী শিল্পজাত-দ্রব্য ভিন্ন, আবশ্যক ও অনাবশ্যক, অনেক কার্য্য চলে না ; তাহার আশ্রয়-স্থল, নগর। সামান্য প্রয়োজনে, লোককে নগরের আশ্রয়-গ্রহণ করিতে হয়। শিক্ষিত ও মার্জ্জিত লোকের সংসর্গ, নগর ব্যতীত ঘটে না। রোগা-ক্রান্ত ব্যক্তির আশার ক্ষেত্র, নগর। নানা স্থানে গমনা-গমনের সুবিধা, নগর হইতে। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার পল্লীগ্রামে যতদূর সম্ভব, নগরে তেমন নহে। অনেক প্রকার সুখ, সুবিধা ও বিলাসিতা গ্রামে সম্ভব হইয়া উঠে না।

অথচ, পল্লী-সমষ্টি, পল্লী-প্রতিষ্ঠান লইয়াই বাঙ্গালা-দেশ চিরকাল আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহার অতীত-সমৃদ্ধি, অতীত-গৌরব, পল্লীতে। বঙ্গের অধিকাংশ আধুনিক নগর, বর্দ্ধিত-কায় পল্লী মাত্র।

ইংরাজি শিক্ষা এই যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, ইহাতে সুফল কি কুফল ঘটিতেছে, এবং কোন কুফল ঘটিয়া থাকিলে, তাহার কি প্রতিবিধান কর্ত্তব্য, একবার ভাবিয়া দেখা

উচিত। এই নগরে আসক্তি, দেশে ঘোর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে। পল্লী-সমাজের সে দৃঢ়তা আর নাই। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের শিথিলতা হয়ত আধুনিক শিক্ষার ফল। কিন্তু, আচার ব্যবহারের শিথিলতা, অনেক পরিমাণে, প্রাচীন-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন-বাসেরই ফল। ইহাতে যে কিছু সুফল না হইতেছে, এমন বলা যায় না। বিভিন্ন স্থানের লোকের সহিত সংমিশ্রনে, উচ্চতর শ্রেণীতে, উদারতার বৃদ্ধি পাইতেছে; অন্ততঃ পাওয়া উচিত বটে। হয়ত সঙ্গে সঙ্গে একতার বীজও কতকটা অঙ্কুরিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে যে উচ্ছৃঙ্খলতার বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহাও বলা যায় না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সামাজিক কুপ্রথার প্রতিবিধান, সমবেত ভাবে কার্য্য, ইত্যাদি নগরে যতদূর সম্ভব, সঙ্কীর্ণ পল্লী-সমাজে ততদূর নহে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, দেশ, এখনও, প্রধানতঃ কৃষিজীবি। যে দেশের সামাজিক-ভিত্তি পল্লী-জীবনে, সে দেশের শিক্ষিত-লোক বিচ্ছিন্ন-ভাবে বাস করায়, পল্লী-সমাজের অবস্থা কি ঘটিতেছে; দেশের ও তাহার অধিকাংশ লোকের অবস্থা কি দাঁড়াইতেছে। আর, যাঁহারা নগরে জীবন-যাপন করিতেছেন, তাঁহাদেরই বা চতুর্ব্বর্গ-লাভের আশা কতদূর?

অবস্থার তাড়নায় অনেককে গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতা-বাসী হইতে হইয়াছে। উদরান্নের সংস্থান সর্ব্বাগ্রে; ম্যালেরিয়া হইতে জীবন-রক্ষাও কম প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু যাহাদের অবস্থা খুব ভাল নহে, তাহারা যে কলিকাতায় খুব সুখ সচ্ছন্দে জীবন-যাপন করে, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? বাস-গৃহ ও দুগ্ধাদি অত্যাবশ্যক দ্রব্যের অভাবে, তাহাদের স্বাস্থ্য ও নৈতিক জীবনের যে অবনতি হইতেছে, ইহাই অনেকের মত। অল্পায়তন গৃহে, এক বাড়ীতে বহু পরিবারের সমাবেশ, নানা কারণেই বাঞ্ছনীয় নহে। রুদ্ধ-বায়ু প্রকোষ্ঠে দীর্ঘকাল অবস্থানে, স্ত্রী-জাতির স্বাস্থ্য-ভঙ্গ ও অকাল-মৃত্যু অত্যন্ত অধিক। আর দুগ্ধের অভাবে শিশুদের যে অবস্থা ঘটিতেছে, তাহা সকলেরই বোধ-গম্য। থিয়েটার ও বায়স্কোপ দেখার সুবিধা আছে, সত্য! কিন্তু কলিকাতায় যে অবস্থায় সাধারণ ভদ্র-লোকগণকে অবস্থান করিতে হয়, তাহা যে পল্লী-গ্রাম অপেক্ষা স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অনুকূল, তাহা বলা যায় না। জলের কল ও বৈদ্যুতিক আলোক-যুক্ত কলিকাতার সহিত, নিম্নে, সরকারী রিপোর্ট অনুসারে, দুইটী মফঃস্বল জেলার ও সমগ্র বাঙ্গালার পল্লী-গ্রামের মৃত্যুর হার তুলনা করা যাইতেছে—

	১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু (হাজার করা)	পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের গড়	১৯১৯ খৃঃ অব্দে মৃত্যু (হাজার করা)	পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের গড়
কলিকাতা—	৩৫	২৬·৯	৪২·২	২৮·১
২৪ পরগণা— মিউনিসিপ্যালিটী বাদে)	২৮·৪	২৪·৮	৩৯·৪	২৫·৪
ফরিদপুর জেলা মিউনিসিপ্যালিটী বাদে)	৩২·৬	২৯·৫	২৯	২৯·৮
সমগ্র বাঙ্গালা মিউনিসিপ্যালিটী বাদে)	—	—	৩৬·৪	৩১·৭
সমস্ত মিউনিসিপালিটী	—	—	৩৬·২	৩১·২

বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার অনেক স্থানে, এবং বিশেষভাবে উল্লিখিত দুইটী জেলাতেই, যথেষ্ট ম্যালেরিয়া বর্ত্তমান। পূর্ব্ব কয়েক বৎসরের সহিত তুলনায়, ১৯১৮ ও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের মৃত্যুর আধিক্য, হয়ত প্রধানতঃ ইনফ্লুয়েঞ্জা-জনিত। কিন্তু, যে-দিক্ দিয়াই দেখা যাউক, বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন সত্ত্বেও, কলিকাতা, ম্যালেরিয়া ও জল-কষ্ট পীড়িত পল্লী-গ্রামের নিকট, স্বাস্থ্য-রক্ষার হিসাবে বিজয়-মাল্য লাভ করিতে পারিতেছেন না। আবার, কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ, মানিকতলা ও বরাহনগর মিউনিসিপ্যালিটীতে মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক দেখিতে পাই। এখানে কলিকাতার অসুবিধা প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান; কিন্তু তাহার বৈজ্ঞানিক-প্রণালী সম্পূর্ণ আয়ত্ত হয় নাই। মফঃস্বলস্থ নগরগুলির অবস্থা বরং কতকটা ভাল। সাধারণ-লোকে মুক্ত-বায়ুর অভাব অনুভব করে না; মিউনিসিপ্যালিটীর উপকারিতাও কতকটা পায়; খাদ্য-দ্রব্যের সুবিধা ও অসুবিধা পল্লীগ্রাম ও কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী।

পূর্ব্ববঙ্গের দুইটী গ্রাম ও নগরের হাজার করা মৃত্যুর হার নিম্নে দেওয়া হইতেছে—

	১৯১৮ খৃষ্টাব্দে	পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের গড়	১৯১৯ খৃষ্টাব্দে	পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরের গড়
ফরিদপুর গ্রাম	৩২·৬	২৯·৫	২৯	২৯·৮
ফরিদপুর নগর	২৬·৩	২২·১	১৮·২	২২·২
মাদারিপুর	২৭·৫	২২·৮	২৭·২	২৪
ঢাকা গ্রাম	৩৩·৩	২৭·৫	২৭·৫	২৮
ঢাকা নগর	৩১·৪	২৬·১	৩৬	২৬·৯
নারায়ণগঞ্জ	—	—	২৫·৫	২১·৭

একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পল্লী-গ্রামে স্বাস্থ্য-রক্ষার বিজ্ঞান-সম্মত উপায় অবলম্বিত হইলে, মৃত্যুর হার বিশেষ পরিমানে কমিয়া যাইবে এবং নগরের সহিত তুলনায় পল্লীগ্রাম অধিকতর স্বাস্থ্যকর হইবে। পল্লীগ্রামের একটী প্রধান অভাব, বিশুদ্ধ পানীয়-জল। এই অভাবের কারণ কেবল অর্থভাব নহে; গ্রামবাসীর অভ্যাস-দোষ ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে, ফরিদপুরে বিশুদ্ধ পানীয়-জলের ব্যবস্থা হওয়ার পর, সেখানে মৃত্যুর হার পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয় নাই; পল্লীগ্রামে তাহা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নাই। কোনও এক নির্দ্দিষ্ট পুষ্করিণীতে বিশুদ্ধ জলের সংস্থান থাকিলেই, অনেক উপকার হইতে পারে। এখনও ফরিদপুরের ন্যায় জেলার পল্লীগ্রামে, যে স্থান স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে অনুকূল, সেখানে ১১৩ বৎসর বয়সে পুত্রোৎপত্তি ও অধিকতর বয়সে মৃত্যুর বিবরণ পাওয়া যায়। * পানীয়-জল বায়ুর উন্নতি ও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে জীবন-যাপনের ব্যবস্থা হইলে, সেরূপ স্থানের পরিমাণ যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

স্বাস্থ্যের হিসাবে, আর্থিক হিসাবে, অধিবাসীর হিসাবে, কোন দিকেই আর পল্লীগ্রামের

* Final Report on the Survey and Settlement Operations in the Faridpore District. p. 06

সাবেক দিন নাই। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে, সভ্যতার অঙ্গ (লৌহবর্ত্ম প্রভৃতি) যোগাইতে গিয়া, কৃষিকার্য্যের পরিবর্ত্তিত অবস্থায়, পল্লীগ্রামের যে ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য-উন্নতির উপায় অবলম্বিত না হওয়ায়, অনেক পল্লী এক্ষণে ব্যাধি ও মারীভয়ের আকর। পল্লীগ্রাম যাহাদিগকে লইয়া গৌরব করিত, এই উন্নতি-সাধনে এক্ষণে আর তাহাদের সহায়তা পায় না। লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে, লোকের প্রয়োজন ও বিলাসিতা বাড়িয়াছে; কিন্তু জমির পরিমাণ বাড়ে নাই। এখন আর ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যে ভদ্রলোকের উদরান্নের সংস্থান হয় না। পুষ্করিণী-জাত মৎস্য (বোধ হয়, ভূমি অধিকতর উন্নত হওয়ায়) ফরিদপুরের ন্যায় মৎস্য-পূর্ণ জেলায়ও অবস্থাপন্ন গৃহস্থের আর সঙ্কুলান হয় না। বিলাসিতার আমদানি বাড়িয়াছে; বিলাসিতা উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তরে বিস্তৃতি-লাভ করিতেছে। তাহার পরিতৃপ্তির কিন্তু উপায় কোথায়? জমির খাজনাতে সাধারণ ভূম্যধিকারীর আর কয় দিন চলে? মুদ্রার মূল্য কমিয়াছে, প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়াছে। নানা প্রকার কায়িক পরিশ্রম, যাহা পূর্ব্বে 'ভদ্র'-আখ্যাধারী ব্যক্তিগণ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, এখন অপমান-জনক বিবেচিত হইতেছে। নানা প্রকার জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়, অশ্রদ্ধেয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে; কিন্তু তাহার স্থান অন্যরূপে পরিপূরিত হইতেছে না। ভদ্রগণ চাকরী ও ওকালতী শিখিয়া বসিয়াছেন। উভয়ত্রই, ন স্থানং তিল-ধারণে।

ইংরাজী সভ্যতার রশ্মি দৃষ্টিপথে আসিয়াছে, কিন্তু সেই রশ্মিতে পথ দেখিবার শক্তি এখনও জন্মে নাই। এই শক্তি জাগরূক করিতে হইবে। ধর্ম্ম-বিশ্বাস শ্লথ হইয়াছে; কিন্তু অনেক স্থানেই, ধর্ম্মের ভাণ মাত্র আছে। সামাজিক কু-নিয়ম দলিত হইতেছে, কিন্তু তাহা ছিন্ন করিবার তেজ নাই। অভাবে ও কু-শিক্ষার ফলে, গ্রাম্য সরলতা এক্ষণে উপন্যাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যা-মোকদ্দমা, মিথ্যা-সাক্ষ্যে পল্লীগ্রামের মস্তিষ্ক আলোড়িত। এই মস্তিষ্ক সুপথে চালিত করিবার ভার কে নেয়? গ্রামবাসী যাহাতে দলাদলি ও পরস্পরের সহিত কলহ ও মোকদ্দমায় সময়পাত না করিয়া, দেশের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা কে করে?

শিক্ষিত-সমাজ পৃথকভাবে নগরে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিলে, তাহা হইতে পারে না। কুসংস্কার দূর করিতে, সামাজিক-উন্নতি সাধন করিতে, শিক্ষিত-সমাজের সহায়তা আবশ্যক। আমাদের শিক্ষিত-সমাজের এখনও নৈতিক-বল কম, কার্য্য-ক্ষমতা খুব অধিক নহে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিলে, সৎভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইতে থাকিলে, এই সকল অভাব শীঘ্রই পলায়ন করিবে। স্বাস্থ্য-উন্নতি ও শিক্ষা-বিস্তারের জন্য, গ্রামবাসীর সমবেত চেষ্টার উদ্বোধন আবশ্যক। কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্যই অবস্থানুযায়ী সাহায্য করিবেন।

শিক্ষিত-সমাজকে বুঝিতে হইবে, গ্রাম অশ্রদ্ধেয় নহে। গ্রামেও অনেক প্রকার সুখ ও শান্তি আনয়ন করা চলে। গ্রামের ও আকৃতি ও প্রকৃতি সভ্যতার আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া, জন-সমাজে উপস্থিত করা চলে। যাঁহারা এক্ষণে নাগরিক, তাঁহাদের কতকাংশের

গ্রামবাসী হওয়া আবশ্যক। গ্রামে থাকিয়াই, তাঁহাদিগকে উদরান্নের সংস্থান করিতে হইবে; অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিতে হইবে। এই অর্থ, ক্লেশ দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায় কি? কিঞ্চিৎ ভাষা-শিক্ষা ও নগরে চাকরীর চেষ্টা দ্বারা অবশ্যই জন-সাধারণের আর্থিক অভাব দূর হইতে পারে না। পল্লীগ্রাম পূর্ব্বে যে ভাবে চলিত, এখন সে ভাবে চলিলেও, এ সমস্যার মীমাংসা হয় না। বাঙ্গালার একটা জেলা ধরা যাউক্। ফরিদপুরের ভূত-পূর্ব্ব সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার, জ্যাক সাহেব, অনুমান করেন, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে, এই জেলার লোক-সংখ্যা প্রায় নয় লক্ষ ছিল। ১৯১১ সালের আদম সুমারি অনুসারে, উহা একুশ লক্ষের উপর। গত লোক-গননায়, উহা বাইশ লক্ষের উপর বলিয়া জানা গিয়াছে। যে ভূমির উপসত্বের উপর নয় লক্ষ লোক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহাতে বাইশ লক্ষ লোকের বাঁচিতে হইলে, এবং তাহার উপর, অধিকতর বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইলে, অবশ্য নূতন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। স্বীকার করি, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যে পরিমাণ ভূমি কর্ষিত হইত, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক জমি চাষ হয়। কিন্তু লোক-সংখ্যা যে অনুপাতে বাড়িয়াছে, কর্ষিত-ভূমির পরিমাণ সে অনুপাতে বাড়িয়াছে কিনা, সন্দেহ। বাড়িয়া থাকিলেও, জলাভূমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায়, মৎস্যের পরিমাণ কমিয়াছে। পতিত-ভূমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায়, গবাদি পশুর খাদ্য কমিয়াছে। ফরিদপুরে প্রতিবর্গ মাইলে জন-সংখ্যার গড়, ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী; অথচ, ফরিদপুরের শত করা সাতাত্তর জন অধিবাসী, কৃষি-জীবী। শিল্প, নাই বলিলেই হয়; যাহা ছিল, প্রতিযোগিতায় উঠিয়া যাওয়ার মধ্যে। বিলাতে, ⅛ অংশ লোক মাত্র কৃষিজীবী; ⅞ অংশ লোক, বড় বড় নগরে বাস করে।

কৃষি-জাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ও বিলাসিতা এখনও কম মাত্রায় প্রবেশ করায়, কৃষি-জীবী লোক, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্রভৃতি দুর্ঘটনা না হইলে, গ্রামে খাওয়া পরা এখনও একরূপ চালাইয়া দিতে পারে। কিন্তু যাহাদিগকে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়, অথচ যাহাদের আয় কম, দিন দিন শস্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদেরই জীবন-ধারণ কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর ও অর্থশালী লোকের মধ্যেই, নগর-বাসীর সংখ্যা বাড়িতেছে, এবং এই শ্রেণীর মধ্যেই আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্ত লোক অধিক। দেশের মধ্যে, শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নত-কৃষি-প্রণালী অবলম্বন ভিন্ন, ইহাদিগের, ও তৎসঙ্গে গ্রামবাসী কৃষি-জীবি লোকের, সুখ-সাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির উপায় নাই।

বিলাতের সহিত এদেশের তুলনা হয় না। বিলাত, প্রধানতঃ শিল্প ও বাণিজ্যের উপর নির্ভর-শীল; বিলাতের কৃষি-কার্য্যও ভিন্ন উপায়ে—প্রধাণতঃ, ধনবান ব্যক্তির ব্যয়ে শ্রমজীবী লোক দ্বারা—পরিচালিত। বিলাতি নিয়মে শিল্প ও কৃষি উভয়ই, বিস্তর মূল-ধন সাপেক্ষ। বিলাতি শ্রমজীবি-সম্প্রদায় সংখ্যায় প্রবল, অভাবে উত্তেজিত; তাহারা এক্ষণে নানারূপ দাবি উপস্থিত করিতেছে। এখানেও, কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠস্থ শ্রমজীবি-সম্প্রদায়, তাহাদের অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের অবস্থা ও অভাব গ্রাম্য-শ্রমজীবির অভাব ও অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র। আমাদের দেশের কৃষকের, জমীর

উপর বিলক্ষণ স্বত্ব আছে। তাহারা আড়ম্বর-শূন্য জীবনেও, মোটের উপর, বিলাতী শ্রমজীবি অপেক্ষা সুখী। বিলাতের কৃষি-প্রণালী এদেশের অধিকাংশ স্থলেই চলিবে না। আমাদের কৃষকের স্বাতন্ত্র্য ও শান্তি বজায় রাখিয়াই, গ্রামের উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। কৃষিকার্য্যে ইহাদের সমস্ত সময় ব্যয়িত হয় না। সংখ্যাও ক্রমে বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। পরিবারস্থ কতকলোক অবশ্যই, উপদেশ, শিক্ষা ও সুযোগ পাইলে, ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিয়া, পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করিতে পারে। শিক্ষিত ভদ্রলোক গ্রামবাসী হইলে, উভয়ের সমবেত চেষ্টায়, কৃষি-শিল্প, বাণিজ্য, পশু-পালন, ইত্যাদির উন্নতি-বিধান হইতে পারে।

সময়ের গতি ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির সহিত, কতক লোকের নগরে বাস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, কেবল নগর-বাসের জন্য নগর-বাস, বাঞ্ছনীয় নহে। এ দেশের জন-সংখ্যা, শ্রেণী-বিভাগ ও পূর্ব্বতন সামাজিক-ব্যবস্থা এরূপ, যে, চেষ্টা করিলে, গ্রামগুলিকে আবার পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির মধ্যে লওয়া অসম্ভব নহে। চাই, প্রবৃত্তি ও শক্তি প্রয়োগ; চাই, উপযুক্ত পরিমাণে চেষ্টা। গ্রামে কিরূপ উন্নতির সোপান নির্ম্মিত হইতে পারে, খৃষ্টান মিশনরিগণ দ্বারা পরিচালিত, ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি-স্কুল, তাহার প্রমাণ। খুব বৃহদায়তনে না হউক, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনে, দেশের সুখ-সমৃদ্ধি-বর্দ্ধক অনেক কারখানা, কারবার ও সমিতি, নগরের বাহিরেও পরিচালিত হইতে পারে। এ দেশে যেমন শিক্ষা ও অভাব প্রসার-লাভ করিতেছে, নগরে বাস যেমন ব্যয়-সাধ্য, ও অনেক সময়ে, স্বাস্থ্যের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকের এই দিকে মনোনিবেশ একান্ত কর্ত্তব্য। মফঃস্বলস্থ অধিকাংশ নগরে যেরূপ স্বাস্থ্য-বিভাগের ব্যবস্থা, কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলেই, বৃহৎ গণ্ডগ্রামে অথবা গ্রাম-সমষ্টিতে, তদনুরূপ কিছু করা চলিতে পারে। কেরাণী শ্রেণীর লোকে দেশ পূর্ণ করার পরিণাম কখনও, আর্থিক হিসাবে, মঙ্গল-জনক হইতে পারে না। যে শিক্ষায় জীবিকার্জ্জন ও নীতি-জ্ঞান জন্মে, দেশের অনেক স্থানেই তাহার ব্যবস্থা চলিতে পারে। অবশ্য, উচ্চ-শ্রেণীর শিক্ষার জন্য, কতক লোককে দূরবর্ত্তী স্থানে আসিতেই হইবে। বড় বড় কল কারখানা স্থাপন করিতে পারিলে, বা বড় বাণিজ্য-ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইলে, বড় বড় নগরের সহিত সংস্রব রাখিতেই হইবে। কিন্তু, যে সকল যুবক প্রতিবৎসর প্রবেশিকা ও অন্যান্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ হইয়া সংসারে নিঃসম্বল অবস্থায় ঝাঁপ দিতেছে, তাহাদের জীবনে শান্তি ও সাচ্ছন্দ্য আনয়ন করিতে হইলে, কেবল নগরের প্রতি তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না। কেবল চাকুরী, ওকালতী, বা ইউরোপের আদর্শে পরিচালিত কারবারের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। কেরানী ও উকীল দুনিয়াতে আবশ্যক; কিন্তু, তাহা ছাড়াও অনেক শ্রেণীর জীব আবশ্যক। মান্ধাতা মহারাজের সময়কার আর্থিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেও চলিবে না। স্থান, সময় ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া, নূতন নূতন ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইউরোপের সামাজিক ইতিহাস ও আদর্শ আমাদের ইতিহাস ও আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র, একথা মনে রাখিতে হইবে। পল্লী-জীবন আমাদের সমাজের মজ্জাগত; পারিবারিক-জীবন ও কর্ম্ম-স্বাতন্ত্র্য আমাদের বৈষয়িক-ব্যবস্থার ভিত্তি। আমরা ইউরোপের শ্রমজীবি-সমস্যার মধ্যে পড়িতে চাহি না। সমাজে

ব্যক্তিগত মর্য্যাদা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া, সমবায়ের উপর কর্ম্ম-ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলে, আমরা দেশের ও জগতের উপকার করিতে পারিব। কিন্তু, সাবধান; অসঙ্গত মর্য্যাদা-জ্ঞান যেন আমাদের পথে প্রতিবন্ধক না হয়। আমরা যেন মনে রাখি, আমাদের আদর্শ রাজার যে তিনজন আদর্শ-মিত্র, তাহার একটা চণ্ডাল, একটা রাক্ষস, ও একটী বানর। ব্যক্তি-গত গুণ বা অবস্থাগত-পার্থক্য জগতে চিরকালই থাকিবে। আমরা যেন কৃত্রিম বা কল্পিত পার্থক্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, পরস্পরের সহিত বৃথা কলহে লিপ্ত থাকিয়া, দেশের ও সমাজের স্বার্থ, সঙ্কীর্ণতার মন্দিরে বলি দেই না। জন-সাধারণের শিক্ষা ও সমবেত-ভাবে কার্য্য করার সঙ্গে সঙ্গে, কালের গতিতে সামাজিক পরিবর্ত্তন, অনিবার্য্য। শিল্প-বাণিজ্যাদি ব্যাপারে লিপ্ত হইলে, প্রতিযোগিতা ও বহিঃস্থ লোকের সংশ্রব, অবশ্যম্ভাবী। গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি ও শিক্ষার উন্নতির সহিত এই সব প্রস্তাব জড়িত। কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত; এই জনপূর্ণ দেশে, লোকেরও অভাব নাই। চাই, উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য-ব্যক্তির চেষ্টা। নগরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, চাকুরী-সংগ্রহে যে পরিশ্রম ও ক্লেশ হয়, সেই পরিশ্রম ও ক্লেশ সহ্য করিয়া, গ্রাম্য কৃষি ও শ্রমজীবির সহিত একযোগে, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কি উদরান্নের সংস্থান, এবং সঙ্গে সঙ্গে, দেশের উন্নতি-সাধন করা যায় না? খাদ্য দ্রব্যাদির উৎপত্তি ত, প্রধানতঃ, গ্রামে। গ্রামে কি চেষ্টা করিলে উন্নততর উপায়ে, গম হইতে ময়দা, ধান্য হইতে তণ্ডুল, সর্ষপ বা তিল হইতে তৈল, কাষ্ঠ হইতে বাক্স, সূত্র হইতে অন্ততঃ মোজা ও গেঞ্জি, ইত্যাদি, প্রস্তুত করিয়া, সমবেত-চেষ্টার উদ্বোধন করা চলে না? গ্রাম হইতে, কৃষকের সহযোগিতায়, কি নগরের বড় বড় কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহের প্রত্যক্ষ-ভাবে বন্দোবস্ত করা চলে না? নীতি-জ্ঞান, রাসায়নিক-জ্ঞান, বিনিময়ের সুব্যবস্থা, নূতন শিল্পের বা নূতন প্রণালীতে শিল্পের প্রবর্ত্তন, কৃষি-বাণিজ্যাদিতে সমবায়, স্বাস্থ্য-রক্ষার উপায় বিধান, চিকিৎসার বন্দোবস্ত, ইত্যাদি, শিক্ষিত-সমাজ দূরে অবস্থান করিলে, গ্রামে কোথা হইতে আসিবে? ইহাতে নিজের ও অপরের, উভয়েরই লাভ। ইহাতে কাহারও, প্রতিপক্ষ সাজিয়া, দেশকে যুদ্ধোন্মুখ করিয়া তোলার প্রয়োজন দেখা যায় না। চাই, উদ্যোগ ও সম্মিলন; চাই, অসূয়া-শূন্য জাগরণ ও সকলের সহানুভূতি-লাভ।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

রোগ ও তাহার প্রতীকার।

আজ পনর বৎসর শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যাপৃত আছি; কিন্তু গৃহ-শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত আছি, আজ চব্বিশ বৎসর। যখন উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ করিতাম, তখন হইতে আরম্ভ করিয়া, আজ পর্য্যন্ত, বিভিন্ন জেলায়, বিভিন্ন পরিবারে, বিভিন্ন প্রকৃতির, কত ছাত্রই পড়াইলাম। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া, দেখিয়া শুনিয়া, ঠেকিয়া বুঝিয়া, আজ জীবনের মধ্যভাগে যাহা উপলব্ধি করিতেছি এবং যে মীমাংসায় পৌছিয়াছি, আজ তাহাই স্বদেশ-বাসীর চরণে নিবেদন করিব।

বর্ত্তমানে শিক্ষা-সমস্যা লইয়া অনেক গণ্যমান্য স্বনাম-ধন্য মনীষী ও মনস্তত্ত্ব-বিদ আলোচনা করিতেছেন। আজকাল আবার, "মানসিক দাসত্ব" এই কথাটি লইয়াও প্রায় সর্ব্বত্র বিপুল আন্দোলন চলিতেছে। অনেকের মতে, এই মানসিক দাসত্বের জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীই প্রধানতঃ দায়ী।

যিনিই দায়ী হউন, আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, আসল রোগটি কোথায়, এবং তার প্রতীকারেরই বা উপায় কি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে, প্রত্যেক উচ্চ-ইংরাজী-বিদ্যালয়ে, অন্ততঃ তিনজন উপাধিধারী শিক্ষক রাখিতে হয়। আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রই, উপাধি-ধারী শিক্ষকগণের সংখ্যাই, বিদ্যালয়ের যোগ্যতার (মাপকাঠির) পরিমাপক হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি আবার বি-টি, এল্-টি, প্রভৃতি তাহার উপর আর একটুকু রং ফলাইয়াছে। কেহ যেন মনে করিবেন না, ইঁহাদের প্রতিকূলে কিছু বলাই আমাদের অভিপ্রায়। তা আদৌ নয়। B. T., L. T-গণ যে (বিশেষতঃ মেয়েদের মধ্যে যাহারা B. T বা L. T হন, তাহারা) অধিকাংশ স্থলেই অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় দিয়া থাকেন, সে কথা আমরা বিশেষরূপেই জানি। কিন্তু তথাপিও রোগ যেখানে, ঔষধ সেখানে পৌছিতেছে না। যাহার উদরের পীড়া হইয়াছে, তাহার গালে প্রলেপ মাখাইলে ফল-লাভের সম্ভাবনা কতটুকু, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। B. A., M. A., B. T., L. T., যিনি যতগুলি উপাধী-ধারীই হউন না কেন, যতক্ষণ তিনি ছাত্রদের সেবায় নিজকে তন্ময় করিতে না পারিবেন, যতদিন ছাত্রদের সেবাই তাহার প্রধানতম ব্রত বা তপস্যা না হইবে, ততদিন তিনি সমস্ত বিশ্বের বিদ্যার অধিকারী হইলেও, প্রকৃত শিক্ষক হইতে পারিবেন না। মানুষ গড়িয়া তোলা তাঁহার কর্ম্ম নয়।

মনীষীগণ যতই নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত করুন না কেন, যতদিন শিক্ষকতৈয়ারী না হইবে, ততদিন, শত-সহস্র নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াও, তাঁহারা প্রকৃত-শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবেন না। দোষ, নিয়মের নয়; দোষ, শিক্ষকের। দেশের প্রধান অভাব, শিক্ষক। আমার কথা যে সত্য, তাহার সাক্ষী, প্রত্যেক অভিভাবক; তাহার সাক্ষী, প্রত্যেক ছাত্র। ডাক্তারের ত্রুটীতে,রোগীর মৃত্যু হয়; আর আমাদের কৃপায়, কতশত ছাত্রগণ যে জন্মের মত উৎসন্ন যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। ছাত্রদের সঙ্গে, অধিকাংশ স্থানেই আমাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক এবং ভক্ষ্য ভক্ষকয়োঃ প্রীতিং বিপত্তে কারণং মাং। যেই মানসিক দাসত্বের কথা তুলিয়া, আমরা বড় গলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর দোষারোপ করিতেছি, সেই মানসিক দাসত্বের প্রধানতম উৎস-ই আমরা, এই শিক্ষক মহাশয়গণ। ছাত্রগণ সর্ব্বদাই আমাদের ভয়ে তটস্থ। বুঝুক্, আর নাই বুঝুক্, তাদের মানিয়া লইতেই হইবে যে, তাহারা বুঝিয়াছে, এবং মন সায় না দিলেও, প্রাণের ভয়ে, মুখ সায় দিতে বাধ্য! তাহাদের প্রতিবাদ করিবার অধিকার নাই, দাঁড়াইয়া 'আমি নির্দ্দোষ', একথা বলিবার অধিকার নাই। যেহেতু, সে ছাত্র এবং আমরা শিক্ষক। কদাচিৎ, দুই একজন মহা-প্রাণ শিক্ষক যে নাই, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু সাধারণত যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাই বলিতেছি। শৈশব হইতেই, শাসনের ভয়ে, ছাত্রেরা ঘাড় পাতিয়া, বিনাদোষে দোষী, বিনাপরাধে শাস্তি, সত্যবাদী হইয়া মিথ্যাবাদী, অথবা মিথ্যাবাদী হইয়া সত্যবাদী, ইত্যাদি স্বীকার করিয়া

লইতে শিখে। জীবনের উষায় তাহারা সর্ব্বাগ্রে এই সর্ব্বনেশে শিক্ষাই পাইয়া থাকে যে, শিক্ষক মহাশয়ের সব কথায় ঘাড় পাতিয়া বা মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া যাইতে হয়। যদি কখনও কোনও ছাত্র, দুর্ভাগ্য ক্রমে, ইহার অন্যথাচরণ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাকে কতকটা উপভোগ্য ; ভুক্তভোগীরা সকলেই একবাক্যে তাহার সাক্ষ্য দিবেন।

বুঝিবার বা আয়ত্ত করিবার শক্তি কখনই সকলের সমান থাকিতে পারে না। কিন্তু, আমাদের আইন অনুসারে, সকলকেই সমান বুঝিতে বা আয়ত্ত করিতে হইবে। বরং অধিকাংশ স্থলেই, আমরা অধিকতর মেধাবী বা শক্তিশালী ছাত্রগণকেই, সকলের শক্তির মাপকাটী বলিয়া ধরিয়া লই। প্রায় সকল বিষয়েই ভাল ছাত্রগণের রায়ই, আমরা উচ্চ আদালতের রায়ের মত, অম্লান-বদনে মানিয়া লই। এইরূপে, অপেক্ষাকৃত অল্প-মেধাবী বা অল্প-শক্তি-বিশিষ্ট ছাত্রগণ দিন দিনই পিছাইয়া পড়িতে থাকে। তখন তাহারা ক্রমে আমাদের প্রদত্ত (অবশ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়) idiot ইত্যাদি, শ্রুতি-মধুর ইঙ্গ-বঙ্গ উপাধিতে বিভূষিত হইতে থাকে। এইরূপে দুইএক বৎসর অতিবাহিত করিবার পর, তাহারা, মা স্বরস্বতীর উপর ক্রমেই বীতরাগ হইয়া উঠে, এবং ক্রমে, তাহার পর সেলাম ঠুকিয়া সরিয়া পড়ে। এই সমস্ত 'খারাপ' (?) ছাত্রদের উন্নতির জন্য যে কোনও শিক্ষক চেষ্টা করিয়া থাকেন, এইরূপ অপবাদের খবর প্রায়ই আমাদের শ্রুতি-গোচর হয় না। আমরা যে তৈল-সিক্ত মস্তকেই তৈল-মর্দ্দন করিতে অধিক পটু, তাহা অকাট্য সত্য। যারা নিজের পায় দাঁড়াইতে পারে, অধিকাংশ স্থলেই, আমরা তাহাদেরই গায়ে একটু হাত বুলাইয়া বাহাদুরী নিয়া থাকি। যে দাঁড়াইতে পারে না, তাহাকে আমরা প্রায় কোনও উৎপাত করি না ; অকাতরে মাটিতে পড়িয়া গড়াইতে দেই।

এ সকলেরই একমাত্র কারণ, আমরা শুধু পেটের দায়েই এই ব্যবসায়টা গ্রহণ করিয়া থাকি ; আমরা অনেকেই ইহা আদৌ পছন্দ করি না ; তবে, নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে আয়ণায় ; তাই এই কার্য্যেই ব্রতী থাকিয়া যাই।

একজন বড় পণ্ডিতের পুত্র আমাদের স্কুলে পড়িত। গজঃ, গজৌ, গজাঃ, দেখিয়াই যখন তাহার চক্ষু কপালে উঠিল, এবং সাজা পাইবার ভয়ে, মজা করিয়া যখন সে, তাহার বিদ্যালয়ে যাইবার পথে, খাজা ও জিবে গজা কিনিয়া খাইতে লাগিল, তখন তাহার পিতা বলিলেন,— "আর পড়ে দরকার নাই, ওকে ভট্‌চার্য্যি করে দেব।"

আমরাও অনেকে সেইরূপ। যখন আর কোথায়ও কিছু করিতে পারি না, তখনই এই উদ্গীরণ-বিদ্যা বা গিলিত-চর্ব্বণের ব্যবসাটি অবলম্বন করি এবং অসংখ্য ছাত্র-মণ্ডলীর মস্তিষ্ক ভক্ষণ করি।

আমাদের দোষের কথা ত সবই প্রায় বলিলাম। ইহাতে হয়ত কেহ কেহ দুঃখিত হইবেন। কিন্তু ইহা ঠিক যে, ইহার একটি কথাও অতিরঞ্জিত নয়।

এখন দেখা যাক্, এ সমস্তের কারণ কি ? এ সমস্তের জন্য দায়ী কে ? দায়ী, আমাদের সমাজ ; দায়ী, আমরা সকলেই। একটা চলিত কথা আছে, "পয়সা দিবে একটি, আর গান শুনবে অক্রুর-সংবাদ।" আমাদের দেশেরও সেই অবস্থা। সর্ব্বত্রই প্রায় এই ধারণা যে,

শিক্ষকগণ বায়ুভুক্ (সর্প কিম্বা সর্পের প্রকৃতি-বিশিষ্ট কিনা, কে জানে)। তাহাদের না খেলে চলে এবং তাহাদের স্ত্রীপুত্রগণেরও না খেলে চলে ; শুধু তাই নয়, তাহাদের সুখ দুঃখ থাকা সম্ভব নয় ; কেন না, তাহারা এই শিক্ষকতা-রূপ অপকর্ম্মটি গ্রহণ করিয়াছে। এই অপকর্ম্মের শাস্তি—চিৎকার ও অত্যাচার ; পরিণাম, অনাহার ও হাহাকার। আর লাভ,—কর্ত্তৃপক্ষের হাতে লাঞ্ছনা ও তিরস্কার এবং ছাত্র ও অভিভাবক গণের নিকট গঞ্জনা ও অপূর্ব্ব ব্যবহার।

সমাজে, শিক্ষকতা কার্য্যটি দিন দিনই নিন্দনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। সম্মুখে যাঁহারা "ইহা অতি পবিত্র কার্য্য" ইত্যাদি বলিয়া আপ্যায়িত করেন, অন্তরালে আবার তাঁহারাই, শ্লেষ ও বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া, ইহাদিগকে অতীব অকর্ম্মণ্য জীব ও নিতান্ত কৃপার-পাত্র বলিয়া মনে করেন।

এখন প্রতিকারের কথা কিছু বলিব। ভাল শিক্ষক পাইতে হইলে, শিক্ষকগণের অভাব দূর করিতে হইবে ; মর্য্যাদা বাড়াইতে হইবে। যাঁহারা অপরের সন্তানগণের মঙ্গল চিন্তায় নিযুক্ত থাকিবেন, অপর সকলে কি তাঁহাদের অভাব-মোচনের চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ বাধ্য নন্ ? সর্ব্বসাধারণের উচিত, যাহাতে শিক্ষকগণ অনন্য-কর্ম্মা হইয়া, একান্ত মনে, শুধু তাঁহাদেরই সন্তানগণের শিক্ষা-এতে, শক্তি সামর্থ্য, বিদ্যা বুদ্ধি, প্রাণ মন, সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারেন, তাঁহার ব্যবস্থা করা। যতদিন তাঁহারা ইহা না করিবেন, ততদিন, তাঁহাদের সন্তানগণও মানুষ হইয়া উঠিবে না। তারপর, শিক্ষা-প্রদান ও মানুষ গড়িয়া তুলিবার সফলতার উপর (শুধু উপাধি বা পাশ করাইবার শক্তির উপর নয়) শিক্ষকদের উন্নতি নির্ভর করা উচিত। সর্ব্বত্রই শিক্ষকগণের বেতন প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে, অধিকতর উপযুক্ত লোক এই কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিবেন এবং যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহারা, অনন্য-কর্ম্মা হইয়া, শুধু ছাত্রদের উন্নতির জন্যই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে পারিবেন। সমস্ত শিক্ষকই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, স্নান আহারের সময় টুকু ব্যতীত, শুধু ছাত্রদের লইয়াই ব্যস্ত থাকিবেন। ছাত্রগণেরই সেবাই হবে, তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। শুধু ১০টা-৪টা হাজিরা দিয়া, চাকুরী-বজায় রাখিবার মত কার্য্যাদি সমাপন করিলে, হাজার শিক্ষায়তন বা শিক্ষা-পরিষৎ গঠন করিলেও কিছু হইবে না ; যে সরিষা দ্বারা ভূত ছাড়াইতে হইবে, সেই সরিষার মধ্যেই যে ভূত রহিয়াছে, একথা ভুলিলে চলিবে কেন! শিক্ষায়তনই হউক আর শিক্ষা-পরিষৎই হউক, পড়াইব ত আমরাই। উৎ-যোগের হাওয়াতেই অবশ্য আমরা হঠাৎ বদলিয়া যাইব না।

তারপরের কথা। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ, প্রায় সর্ব্বত্রই, দেখাবার কর্ত্তৃপক্ষগণ থাকেন ; শুধু কর্ত্তৃত্ব করবারই জন্য—শুধু প্রভুত্ব দেখানই—তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। আমরা কর্ত্তৃপক্ষ কথাটাতেই আপত্তি করি। পরিচালকগণের প্রধান উদ্দেশ্য হবে, বিদ্যালয়ের উন্নতির কার্য্যে শিক্ষকগণকে নূতন নূতন তথ্য-সংগ্রহ দ্বারা সাহায্য করা। প্রতি মাসেই শিক্ষক-মণ্ডলীর সঙ্গে সমবেত হইয়া, কার্য্যপ্রণালীর দোষ গুণাদির সম্যক্ বা বিশেষ-রূপে আলোচনা করিয়া, প্রয়োজনানুসারে, তাহার সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করা। তাঁহাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, ছাত্রদের সেবায়, শিক্ষকদের মত, তাঁহারাও সাহায্যকারী সেবক

মাত্র। সকলের সমবেত শক্তি দ্বারা এই সেবাকে সফল-প্রসূ করিয়া তোলাই, তাঁহাদের লক্ষ্য।

ছাত্র গড়িবার মূলমন্ত্র—প্রেম ও চরিত্র। ছাত্রদিগকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতে হইবে; বন্ধুর মত তাহাদের সঙ্গে মিশিতে হইবে; তাহাদের ভুল ত্রুটীর দিকে সজাগ নজর রাখিতে হইবে; প্রেমের শাসনে সকলকে বশ করিতে হইবে; ছাত্রদিগকে শাসন না করিয়া, সর্ব্বদাই নিজকে শাসন করিতে হইবে; কঠোর আত্ম-পরীক্ষা প্রতি নিয়তই চালাইতে হইবে; প্রত্যেক শিক্ষক মহাশয়েরই শত শত ছাত্র-রূপী পরীক্ষক যে সর্ব্বদা তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের অনুসন্ধিৎসু চক্ষুগুলি যে শুধু তাঁহারই দোষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, একথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। শিক্ষকগণ মাত্র দুটি চক্ষুর সাহায্যে যখন ত্রিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশ জন ছাত্রের কার্য্য-প্রণালী লক্ষ্য করেন, সেই সময়েই যে ষাট্, আশী বা শত চক্ষু, তাঁহারই কার্য্য-প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিতেছে, একথা প্রতি মুহূর্ত্তে মনে জাগরূক থাকিলে, অধিকাংশ শিক্ষকই অধিকতর সফলতা লাভ করিতে পারিবেন।

আজ কালের ছেলেরা কিছুই নয়, একেবারে অপদার্থ, ইত্যাদি, কথা প্রায় প্রত্যেক শিক্ষকের মুখেই শোনা যায়। ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, আমরাই (আমি-ই হই বা অপর কেহ-ই হউন) তাহাদের অপদার্থ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, আমাদেরই করিতে হইবে। এসব স্থলে, তিরস্কারের বা শাসনের পরিবর্ত্তে, সহানুভূতি, এবং বিশেষভাবে পৃথক সাহায্য, কল্পনাতীত সুফল প্রদান করিয়াছে, ইহা পরীক্ষিত সত্য।

তারপর প্রায় সকল বিদ্যালয়েই, শিক্ষকগণকে অতিরিক্ত খাটানো হইয়া থাকে। উপরওয়ালাগণ শিক্ষকগণের এতটুকু অবকাশও সহ্য করিতে পারেন না। লৌহ-নির্ম্মিত কলগুলিরও বিশ্রামের দরকার হয়; একমাত্র শিক্ষকগণেরই বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। কলেজের অধ্যাপকগণের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু হতভাগ্য শিক্ষকগণের নাকি কিছুতেই ক্লান্তি আসে না। প্রায় কোনও বিদ্যালয়েই শিক্ষকগণ একাধিক পিরিয়ড্ (period) অবকাশ পান না। এই পিরিয়ড্ জিনিষটা কোথায়ও, কোনও বিদ্যালয়ে, ৫৫, কোথায়ও ৫০, আবার কোথায়ও বা, ৪৫ মিনিট মাত্র। ত্রিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশ জন ছাত্রের পড়া শোনা লইয়া, ঘণ্টায় পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতে যে কি কষ্ট এবং কাজটা কতদূর অসম্ভব, তাহা বুঝিতে পারিবার মত লোক দেশে আছে বলিয়া, আমাদের বড় বিশ্বাস হয় না। প্রত্যেকটি ছাত্রের অভিযোগ ইত্যাদি শুনিয়া, প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠে না, এমন শিক্ষক দুর্লভ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। মুখে আমরা যতই বড়াই করি না কেন, কিন্তু ছোট ছাত্রদিগকে পড়াইতে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ শিক্ষক নিযুক্ত করিতে ত আমরা প্রায় কোনও বিদ্যালয়েই দেখিলাম না। সর্ব্বত্রই, যাহাদের সাহায্য করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজন, তাহাদেরেই আমরা অধিকতর অবহেলা করিয়া থাকি। প্রায় সর্ব্বত্রই, অল্প বেতনের অল্প শিক্ষিত শিক্ষকগণের দ্বারা, নিম্নতম শ্রেণী গুলির কার্য্য সম্পাদন করান হয়। শুনিলে অবাক্ হইবেন, অধিক শিক্ষিত মহোদয়গণ, ঐ সকল শ্রেণীতে আরও অধিকতর অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। সর্ব্বদা বড় বড় বিষয় আলোচনা করার দরুণ, ছোট খাটো ছেলেদের শিক্ষাদান-রূপ নিষ্কল-কার্য্যে তাঁহারা প্রায়ই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন।

পোলাও, কোর্ম্মা, ইত্যাদি যাঁহাদের নিত্য ভক্ষ্য—শুক্তানি, চচ্চরী, ইত্যাদি অখাদ্য নাকি তাঁদের প্রায়ই পছন্দ হয় না। আমাদের মতে, উপাধিধারী হউন আর না-ই হউন, সুশিক্ষিত, সুমিষ্ট-ভাষী, ধীর স্থির, সৌম্য-মূর্ত্তি, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, উৎসাহী লোকই নীচের শ্রেণীগুলির পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত। অবশ্য উপরোক্ত গুণগুলি, প্রত্যেক শিক্ষকের মধ্যেই বিদ্যমান থাকা একান্ত প্রয়োজন ও বাঞ্ছনীয়; কিন্তু ছোট ছেলেদের শ্রেণীতে এগুলি আরও অধিক আবশ্যক। আজকাল দেখা যায়, কোনও শিক্ষকই প্রায় নীচের শ্রেণীতে পড়াইতে রাজি হন না। তাহার কারণ এই যে, নীচের শ্রেণীতে পড়াইলে, কতকটা মর্য্যাদার লাঘব হয়, উন্নতির আশা থাকে না, এবং উপর ওয়ালাগণ, তাঁহাদের পরিশ্রম বা সফলতার কথা প্রায় আমলেই আনেন্ না! নিম্নশ্রেণীর শিক্ষক বলিয়া তাঁহারা বিদ্যালয়ে, সহকর্ম্মীদের নিকটে এবং সাধারণের কাছেও অনেকটা অনাদৃত হইয়া থাকেন। বর্ত্তমানে শিক্ষকতা-কার্য্যের সফলতা, শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইবার শক্তির উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। টোট্‌কা ঔষধের ন্যায়, যিনি যত পাশ করাইবার মত, ছুটো সহজ উপায় শিখাইয়া দিতে পারেন, তিনিই ততটা ভাল শিক্ষক। কিন্তু, প্রকৃত-শিক্ষার উদ্দেশ্য যে মানুষ গড়িয়া তোলা, তাহা আমরা সর্ব্বদাই ভুলিয়া যাই। প্রত্যেক শিক্ষকের উচিত—সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখা যে, ছাত্রের বিশেষত্ব কোথায়; যে ছাত্রটীর যেখানে বিশেষত্ব, তাহাকে সেখানে ফুটিয়া উঠিতে বিশেষরূপে সাহায্য করা। প্রত্যেক ছাত্রের 'ধাত্' পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করা ও যাহাতে তাহা সম্যক বিকাশের সুযোগ পায়, তাহা করাই শিক্ষকের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য। কত সময় আমরা দেখিয়াছি, যে ছাত্রটিকে আমরা নেহাৎ 'নিরেট' মনে করিতাম (অর্থাৎ, যে অঙ্ক-শাস্ত্রে বুৎপন্ন নয় বা ইংরাজী-ব্যাকরণ দেখিলে 'ভ্যা'করণ করিয়া থাকে) সে ছাত্রটির হয়ত চিত্র-বিদ্যায় অসাধারণ ক্ষমতা। এরূপস্থলে, তাহাকে নির্য্যাতিত না করিয়া, শিক্ষকের উচিত হয়, উৎসাহ-প্রদান করিয়া, তাহার ঐ শক্তিটির উন্মেষ সাধন করা। রোগ চিনিতে না পারিলে যেমন চিকিৎসা করা যায় না, ছাত্রের 'ধাত' বুঝিতে না পারিলে, তেমনি ছাত্রকে শিক্ষা-দান করা যায় না।

আমাদের মতে, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষককে, সর্ব্ব-নিম্ন-শ্রেণীর শিক্ষা-কার্য্যের ভার দেওয়া উচিত। প্রত্যেক শিক্ষকেরই, একটি শ্রেণী পড়াইতে যাইবার পূর্ব্বে বা পরে, বিশ্রামের সময় থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। সেই সময় তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের নিজ নিজ ছাত্রদের অভাবের কথাই চিন্তা করেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করা উপর ওয়ালাদের একটা কর্ত্তব্য-কার্য্য হওয়া উচিত।

প্রতি সপ্তাহে, অভাব পক্ষে প্রতি মাসে, প্রত্যেক শ্রেণীস্থ ছাত্রদের উপযোগী, অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ প্রভৃতির সাহায্যে, পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের জন্য যথাক্রমে ৫৫।৫০।৪৫।৪০ ইত্যাদি মিনিট সময়-বিভাগে রাখা উচিত। যতই ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতে থাকে, ততই ছাত্রগণ এবং শিক্ষকগণ যে অধৈর্য্য হইয়া উঠিতে থাকেন, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

উপসংহারে সংক্ষেপে এই বলিতে চাই, ছাত্রগণের জন্য শিক্ষকগণই দায়ী এবং শিক্ষকগণের

জন্য সমাজ দায়ী। শিক্ষার উন্নতি করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে চাই, শিক্ষক। তারপর চাই, অর্থ। সেই অর্থ রাজাই দিন্, আর দেশের সদাশয় মহাত্মাগণই দিন্, অথবা ছাত্রগণের অভিভাবকগণই দিন্। স্মরণ রাখিতে হইবে, সর্ব্বাগ্রে আমাদের প্রয়োজন, প্রকৃত শিক্ষক। বেশী নয়; দশ বার জন উপযুক্ত শিক্ষক যোগাড় করুন, দেখিবেন ছাত্রগণ বিদ্যালয় হইতে বাড়ীতে যাইতে চাহিবে না; তাহারা নূতন মানুষ হইয়া, আপনা আপনিই গড়িয়া উঠিবে।

শিক্ষা-বিষয়ে অনেক কথাই বলিবার আছে। সুযোগ ও সুবিধা হইলে, ভবিষ্যতে আরও বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

মহাভারত মঞ্জরী

সভাপর্ব্ব।

পঞ্চম অধ্যায়। মগধরাজ জরাসন্ধ।

দেবর্ষি নারদ বীণায় যে ঝঙ্কার দিয়া গিয়াছেন, তাহা রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাণে রাত্রিদিন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তিনি সভা দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "এখন তোমার রাজসূয়-যজ্ঞ করা উচিত।" সেই কথা যুধিষ্ঠির মনে অহরহ জাগিতেছে। কিন্তু তিনি প্রিয় বন্ধু কৃষ্ণের মত না লইয়া, এত বড় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। এ জন্য তিনি দ্বারকায় দূত ও রথ পাঠাইলেন। কৃষ্ণ অবিলম্বে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলেন। প্রিয় সম্ভাষণাদির পর রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কৃষ্ণ, রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু কেবল ইচ্ছাতেই কার্য্য-সিদ্ধি হয় না। আমার আত্মীয়-স্বজন তাহাতে ব্রতী হইতে পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু কেহ কেহ আত্মীয়তার অনুরোধে, দোষ প্রদর্শন না করিয়া, পরামর্শ দেন; কেহ আবার যাহা বলিলে প্রভু সন্তুষ্ট হন, শুধু তাহাই বলেন; অন্যে আবার নিজ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পরামর্শ দেন। তুমি কাম ক্রোধের অতীত, সর্ব্ব প্রকার স্বার্থ-বর্জ্জিত, আবার এই মহাযজ্ঞ সম্বন্ধে সকলই জান। যাহা শুভকর, বল। আমি তোমার মত অনুসারেই কার্য্য করিব।"

কৃষ্ণ বলিলেন, "রাজন্, আপনি সর্ব্বগুণের আধার? এজন্য এইরূপ যজ্ঞ আপনারই শোভা পায়। কিন্তু যিনি সম্রাট্, একমাত্র তিনিই রাজসূয় মহাযজ্ঞ করিতে অধিকারী। আপনি ত সম্রাট্ নহেন। মগধাধিপতি মহারাজ জরাসন্ধ বাহুবলে অন্য নরপতিকে পরাজিত করিয়া সম্রাট্ হইয়াছেন। মহাবল শিশুপাল তাঁহার সেনাপতি। বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত রাজ্যের প্রবল নরপতিগণ তাঁহার সহিত সম্মিলিত (১)। শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন আরও বহু ভূপতি তাঁহার সহায়। কত রাজা, জরাসন্ধের অত্যাচার উৎপীড়নে ভীত হইয়া, আপন আপন রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া, প্রাণের প্রিয়তম পৈতৃক মথুরানগরী পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী দ্বারকায় আশ্রয় লইয়াছি। (২) এই নরাধম ছিয়াশী নরপতিকে স্বীয় গিরিদুর্গে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। আর চৌদ্দটী নরপতিকে বন্দী করিতে পারিলেই, শঙ্করের নিকট শত নরবলী দিবেন। এই পাপ কার্য্যে যিনি বাধা প্রদান করিবেন,

---

(১) সভাপর্ব্ব ১৪—২০। (২) সভাপর্ব্ব ১৪—৬৭।

তিনিই যশস্বী হইবেন। এই অত্যাচারীকে যিনি পরাজিত করিবেন, তিনিই সম্রাট্ হইবেন। এইরূপ দুর্দ্দান্ত দুরাত্মা জীবিত থাকিতে, আপনার রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, আশা নাই।"

তাহা শুনিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির বিষণ্ণ হইলেন। বলিলেন, "কৃষ্ণ, যখন তুমিই জরাসন্ধকে এত ভয় কর, তখন, আমরা তোমার আশ্রিত ও অনুগত হইয়া, কিরূপে সাহসী হইব (৩)? কাজেই রাজসূয় যজ্ঞের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইতেছে।"

তখন ভীম ও অর্জ্জুন তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ভীম বলিলেন, "দুর্ব্বল ব্যক্তিও সতত সতর্ক থাকিয়া আত্মরক্ষা করিয়া সম্যক্ নীতি-প্রয়োগে বলবানকে পরাজিত করিতে পারে। তবে আমরা কেন পারিব না? আমিই সেই অত্যাচারীকে নিহত করিব।"

অর্জ্জুন বলিলেন, "লোকে বংশ-মর্য্যাদার প্রশংসা করে। কিন্তু তাহা কি শৌর্য্য বীর্য্যাদি গুণের সহিত তুলনীয়? গৌরবান্বিত বংশে জন্মিয়াও যদি লোকে কাপুরুষ হয়, গুণহীন হয়, তবে তাহার বংশ-মর্য্যাদা কোথায় থাকে? আবার কাপুরুষ বংশে জন্মিয়াও যদি লোকে শৌর্য্য-বীর্য্যাদি গুণ-সম্পন্ন হয়, অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে স্বদেশ-উদ্ধার করে, তবে কে তাহার সম্মান না করে? ফলতঃ বংশ-গৌরব কোনক্রমেই পুরুষকারের সহিত তুলিত হইতে পারে না। আমরা সেই পুরুষকার দ্বারা অত্যাচারীকে বিনষ্ট করিব। আপনি অনুমতি দিন।"

তখন কৃষ্ণ বলিলেন, "রাজন্, জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রমশালী, সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া, আমরা যদি তাহার অত্যাচার উৎপীড়ন দমন না করি, তবে আর কে করিবে? চিরদিন নিরাপদে থাকিয়া কে কোথায় উৎপীড়কের হস্ত হইতে স্বদেশ-উদ্ধার করিয়াছে? কেহই অমর হইয়া আসে নাই। তবে সৎকার্য্য করিয়া মরাই শ্রেয়। আমরা যদি আমাদের ছিদ্র গোপন করিয়া, শত্রুর ছিদ্র বাহির করিয়া নেই, ছিদ্র-পথে তাহাকে আক্রমণ করি, তবে কেন না কৃতকার্য্য হইব? ধনুর্দ্ধারী বাণ প্রয়োগ করিয়া, মাত্র একজনকে নিহত করিতে পারে, না-ও পারে; কিন্তু বুদ্ধিমান, বুদ্ধি-প্রয়োগ করিয়া, রাজা ও রাজ্য উভয়ই বিনষ্ট করে। পৃথিবীর সমুদয় বীরগণ একত্রিত হইলেও, সম্মুখ-সংগ্রামে, জরাসন্ধকে পরাজিত করা অসম্ভব। কিন্তু উহাকে বুদ্ধি-বলে বিনষ্ট করা সম্ভবপর।"

কৃষ্ণের কথায় রাজা যুধিষ্ঠির সম্মত হইলেন। বলিলেন, "কৃষ্ণ, একমাত্র তোমারই কথায়, তোমারই ভরসায়, আমি মত দিলাম। আমার প্রাণের অধিক ভ্রাতৃদ্বয়কে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।"

কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনকে লইয়া, ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে নির্গত হইলেন। সরযূ ও গণ্ডকী নদী পার হইয়া, মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে গঙ্গা ও শোণ নদী অতিক্রম করিয়া, পূর্ব্ব মুখে গমন করিয়া, মগধ-রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে, তাঁহারা মগধের রাজধানীর পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের উপরে উপনীত হইলেন। তথা হইতে, নগরীর শোভা ও সম্পদ্ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, "দেখ দেখ, গিরিব্রজ নগরীর চারিদিকে ঐ বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামক পঞ্চ-পর্ব্বত কেমন শোভা পাইতেছে! তাহারা পরস্পরের সহিত

---

(৩) সভাপর্ব্ব ১৫—৮।

সংযুক্ত হইয়া, যেন পরস্পর পরস্পরের হস্ত-ধারণ করিয়া মগধের রাজধানী গিরিব্রজকে রক্ষা করিতেছে। কুসুমময় লোধ্র-বনরাজি শৈল সমুদয়ের শরীর ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বিবিধ শ্যামল বৃক্ষ, কত লতা গুল্ম পর্ব্বত ছাইয়া রহিয়াছে। নগরীর মধ্যে কত সুন্দর শৌধ দেখা যাইতেছে। কত হৃষ্টপুষ্ট লোক ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে। কত স্থানে কত উৎসব হইতেছে। কত সৈন্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এখানে জলের অভাব নাই। প্রকৃতি-সুন্দরী যেন, এই মহা-নগরীকে রক্ষা করিবার জন্য, তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন। এখানেই মহর্ষি গৌতমের আশ্রম। পূর্ব্বে মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতির নৃপতিগণ এই আশ্রমে আসিয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিতেন ?” (৪)

তাঁহারা দ্বার দিয়া গমন না করিয়া, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। সকলেরই স্নাতক ব্রাহ্মণ বেশ। শরীর চন্দন-চর্চ্চিত, গলায় পুষ্পমালা ঝুলিতেছে। তাঁহারা জরাসন্ধের নিকটস্থ হইতেই, তিনি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, “রাজন্, ইঁহারা ব্রত-ধারী। অর্দ্ধরাত্রি অতীত না হইলে, কথা বলিবেন না।” রাজা তাঁহাদিগকে যজ্ঞ-শালায় বিশ্রাম করিতে বলিলেন।

অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে জরাসন্ধ তথায় গমন করিলেন। বলিলেন, “স্নাতক ব্রাহ্মণেরা পুষ্পমালা পরিধান করেন না। আপনারা আমার সংকারও গ্রহণ করিলেন না। আপনারা কে ? কেন আসিয়াছেন ?”

কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, “আমি কৃষ্ণ, ইঁহারা ভীম ও অর্জ্জুন। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া, সাধু ও সজ্জন ক্ষত্রিয়-নৃপতিগণকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ ! বিনা-অপরাধে তাহাদের স্বাধীনতা-হরণ করিয়াছ ! বাহুবলে দৃপ্ত হইয়া, তাহাদিগকে দীর্ঘকাল কারাগারে রাখিয়াছ। ইহা অসহ্য ! ইহা অপেক্ষা অন্যায়, অবৈধ কার্য্য আর কি আছে ? নর-বলি-দান নিতান্ত।অধর্ম্মের কার্য্য। ইহা অপেক্ষা অত্যাচার, উৎপীড়নের কথা আর শুনি নাই। অত্যাচারীর অত্যাচার নিবারণ করা, সকলেরই কর্ত্তব্য কার্য্য। তাহা না করিলে, সকলেই অত্যাচারীর সহকারী বলিয়া, পাপের ভাগী হয় ; অধর্ম্মে পতিত হয়। এইজন্য তোমার অত্যাচার হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিতে আমরা আসিয়াছি। হয়, তুমি বন্দীগণের স্বাধীনতা দাও ; না হয়, আমাদের কাহারও সহিত মল্ল-যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দাও।”

সিংহ সিংহের সহিতই যুদ্ধ করিতে ভালবাসে। জরাসন্ধ ভীমের মহাবল শরীর দেখিয়া, উহাঁর সহিতই যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলেন। দুই বীরে মল্ল-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহাদের হুহুঙ্কার শুনিয়া, নগরের বহু লোক ছুটিয়া আসিল। দুই বীর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইলেন না। কার্ত্তিক মাসের প্রতিপদ হইতে চতুর্দ্দশীর রাত্রি পর্য্যন্ত, ১৪ দিন, দিন ও রাত্রি, সমভাবে যুদ্ধ চলিল। ক্রমে মহাবল জরাসন্ধ শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ভীম তখন তাঁহাকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া, কুম্ভ-কারের চাকার ন্যায়,ঘুরাইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাকে হত-বল করিয়া, শেষে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। অমনি তাঁহার পৃষ্ঠদেশে স্বীয় জানু স্থাপন করিয়া, শরীর ভগ্ন করিয়া নিহত করিলেন।

(৪) সভাপর্ব্ব ২১—৭।

তখনই তাঁহারা কারাগারে গমন করিলেন। অবিলম্বে বন্দীগণের স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। জরাসন্ধের পুত্র, সহদেব, তাঁহাদের বশ্যতা-স্বীকার করিলেন। বহু ধনরত্ন উপহার দিলেন। তাঁহারা তাঁহাকেই মগধের রাজা করিলেন। কৃষ্ণ এখন সকলকে লইয়া মহানন্দে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন। তখনই বিজয়োৎসব আরম্ভ হইল। রাজা যুধিষ্ঠির কারামুক্ত নৃপতিগণের উপর যথেষ্ট সৌজন্য ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন করিলেন। চারিদিকে কৃষ্ণের প্রশংসা হইতে লাগিল। কৃষ্ণ যে এই অতি ভয়ঙ্কর কার্য্য এমন অনায়াসে সুসম্পন্ন করিয়াছেন, অত্যাচারীর হস্ত হইতে দেশ উদ্ধার করিয়াছেন, সে জন্য সকলেই উঁহাকে অসাধারণ পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিতে লাগিল। এই দেশোপকারে, তাঁহার বিমল যশের জ্যোতি, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বিনা গুণে কি কেহ কখনও যশস্বী হইতে পারে? সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া সহস্র সহস্র কণ্ঠে কীর্ত্তিত হইতে পারে? ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পূজিত হইতে পারে? ইহা বীর পূজা নয় ত কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়। রাজসূয় যজ্ঞ।

একমাত্র সম্রাট্ রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অধিকারী। সম্রাট্ হইতে চাহিলে, চতুর্দ্দিকের সমুদয় বশ্যতায় আনয়ন করা আবশ্যক। দিগ্বিজয় ব্যতীত তাহা সম্ভবপর নহে। ভারত যখন স্বাধীন ছিল, তখন দিগ্বিজয় মহাযশের বিষয় বলিয়া বর্ণিত হইত।

এখন ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব চারিভ্রাতা এক এক দিক্ জয় করিতে নির্গত হইলেন। বহু সৈন্য সামন্ত প্রত্যেকের সঙ্গে চলিল। যাঁহারা স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করিলেন, কর দিলেন, তাঁহাদের সহিত কেহ যুদ্ধ করিলেন না। তাঁহারা চারি ভ্রাতায় পৃথক পৃথক ভাবে কাশ্মীর, পুণ্ড্র (উত্তর বঙ্গ), বঙ্গ, যাবতীয় জলোদ্ভব দেশ, সাগর-তীরবর্ত্তী সমুদয় নদী মাতৃক স্থান (নিম্ন বঙ্গ), (৫) তাম্রলিপ্ত (তমলুক), প্রাগ্জ্যোতিষ (আসাম), শর্ম্ম, বর্ম্ম, সুহ্ম, প্রসুহ্ম প্রভৃতি সমুদয় প্রদেশের সহিত বিশাল ভারতবর্ষ ও একাধিক দ্বীপ জয় করিলেন। কর্ণ বিনা যুদ্ধে কর দিতে সম্মত হইলেন না। ভীম তাঁহাকে রণে পরাজিত করিয়া কর আদায় করিলেন। অর্জ্জুন উত্তর ভারতবর্ষ জয় করিয়া চীন, দরদ, কাম্বোজ, বাহ্লীক, ঋষিকুল্যা, হিমালয়, ধবলগিরি, মান সরোবর, কিম্পুরুষ বর্ষ (তিব্বৎ) ও হরিবর্ষ (উত্তর কুরু, সাইবেরিয়া) জয় করিলেন। এইরূপে ভারতের দক্ষিণ-প্রান্তের কুমারিকা হইতে সাইবেরিয়ার উত্তর-প্রান্ত পর্য্যন্ত, এসিয়া মহাদেশের অধিকাংশ, ভারত-সাম্রাজ্য-ভুক্ত করিয়া, চারি ভ্রাতা অপরিসীম ধনরত্ন ও বহুবিধ দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া, মহা-গৌরবে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া আসিলেন। (৬)

নিমন্ত্রণ পাইয়া কৃষ্ণ সবান্ধবে আগমন করিয়াছেন। নকুল হস্তিনাপুর গিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সমুদয় কৌরবগণ ও পুরনারীদিগকে লইয়া আসিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যার ভার অশ্বত্থামার উপর দিলেন। নানা দেশের নৃপতিগণের তত্ত্বাবধানের গুরু-ভার মহা-প্রাজ্ঞ সঞ্জয়ের উপর অর্পণ করিলেন। সর্ব্বপ্রকার উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিতে রাজা দুর্য্যোধন নিযুক্ত হইলেন। স্বর্ণ ও রত্ন প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্য রক্ষার ভার লোভহীন কৃপাচার্য্য

(৫) সভাপর্ব্ব ৩০—৩১ শ্লোক। (৬) সভাপর্ব্ব ২৬ শ্লোক, ৩২ অধ্যায়।

প্রাপ্ত হইলেন। সর্ব্বসাধারণকে সর্ব্বপ্রকার আহারীয় ও পানীয় দিতে দুঃশাসন নিযুক্ত হইলেন। আর এই মহাযজ্ঞের বিপুল অর্থব্যয়ের ভার, ধর্ম্মাত্মা বিদুর গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের অধীনে প্রত্যেক বিভাগে বহু ব্যক্তি কার্য্য করিতে লাগিল। ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য যজ্ঞের যাবতীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। আর কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র ও গদা লইয়া, যজ্ঞরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। (৭)

মহা সমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। বেদব্যাস প্রভৃতি কত মুনি ঋষি যজ্ঞে লিপ্ত হইলেন। নানা দিক্ দেশান্তর হইতে অগণিত নৃপতি বহু সৈন্যসহ আসিলেন। সকলেই স্ব স্ব দেশজাত বহুমূল্য ও বিচিত্র দ্রব্য সামগ্রী ও বহু ধন রত্ন উপহার দিতে লাগিলেন। সে সকল গ্রহণ করিতে করিতে, রাজা দুর্য্যোধনের হস্ত অবসন্ন হইতে লাগিল। উপহার-প্রাপ্ত দ্রব্য-সামগ্রী পর্ব্বতাকারে পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিল।

ক্রমে অভিষেকের দিন আসিল। কৃষ্ণ স্বয়ং শঙ্খোত্তম বাদন করিয়া, সুবর্ণ-কলস-পূর্ণ জল দ্বারা মহানন্দে রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিষেক কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। সমাগত সমুদয় নৃপতি বন্দনা ও বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

একদিন ভীষ্মদেব বলিলেন, "যুধিষ্ঠির, কত নৃপতি আসিয়াছেন, সকলের সৎকার কর। প্রত্যেককে একএকটী অর্ঘ দাও। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ব প্রধান অর্ঘ দাও।"

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতামহ, কোন ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? কাহাকে সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ দিব?

ভীষ্ম উত্তর করিলেন, "সমুদয় গ্রহগণের মধ্যে সূর্য্য যেমন, সমুদয় নৃপতিগণের মধ্যে কৃষ্ণও তেমনি।" (৮)

তখন যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে তাঁহার ভ্রাতা সহদেব কৃষ্ণকে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রধান অর্ঘ প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ সে পূজা গ্রহণ করিলেন।

অমনি চেদি-রাজ শিশুপাল ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি সেই সভামধ্যে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন, "তুমি নিতান্ত বালক, ভীষ্মেরও বুদ্ধি-লোপ হইয়াছে। তোমরা কোন্ বিবেচনায় কৃষ্ণকে সর্ব্বপ্রধান অর্ঘ দিলে? যদি তাহাকে বয়োবৃদ্ধ বলিয়া পূজা করিয়া থাক, তবে তাহার পিতা এখানে থাকিতে, তাহাকে কেন পূজা করিলে? যদি হিতৈষী বলিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাক, তবে দ্রুপদ-রাজ থাকিতে কৃষ্ণকে কেন অর্চ্চনা করিলে? যদি ঋত্বিক বলিয়া তাহার সম্মান করিয়া থাক, তবে এখানে বেদব্যাস থাকিতে কি করিয়া তাহার সম্মান করিলে? যদি বীর বলিয়া কৃষ্ণের পূজা করিয়া থাক, তবে এখানে ভীষ্ম, কর্ণ, একলব্য প্রভৃতি বীরগণ থাকিতে কেন তাহার পূজা করিলে? (৯) সে, না রাজা, না ঋত্বিক, না আচার্য্য—সে কিছুই নহে। যদি তাহাকে অর্ঘ দিয়া আমাদিগকে অপমানিত করাই তোমাদের অভিপ্রায় ছিল, তবে কেন আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলে?"

তারপরে শিশুপাল চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, "আর আমরা সকলে

(৭) সভাপর্ব্ব ৪৪—৩৯। (৮) সভার্ব্ব ৩৬—২৮।

(৯) সভার্ব্ব ৩৭—১৪।১৬। একলব্য নিষাদ-পুত্র, কর্ণ সারথি-পুত্র, বেদব্যাস জেলেনীর পুত্র; তথাপি তাঁহারা উপেক্ষিত হন নাই। সে সময় জাতি অপেক্ষা গুণের সমাদর অধিক ছিল

এখানে থাকিতে, তুমিই বা এই পূজা কিরূপে গ্রহণ করিলে? অথবা নিকৃষ্ট কুকুর যেমন ঘৃত পাইলেই আনন্দে আহার করে, তুমিও তাহাই করিয়াছ। অন্ধের রূপ-দর্শনের কথা যেমন উপহাসের বিষয়, রাজা না হইয়াও তোমার রাজ-পূজা গ্রহণ, সেইরূপ উপহাসের বিষয়।"

শেষে শিশুপাল অন্যান্য নৃপতিগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া যজ্ঞ-ভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে শান্ত করিতে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, ফল হইল না। তখন ভীষ্মদেব উচ্চৈঃস্বরে সকলকে বলিতে লাগিলেন, "মনুষ্য-সমাজে কৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক গুণসম্পন্ন কে আছেন? দয়া, নম্রতা, জ্ঞান, শৌর্য্য, বীর্য্য, তুষ্টি, পুষ্টি প্রভৃতি অশেষ গুণ কৃষ্ণে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। (১০) ইনি জ্ঞানীগণের অগ্রণী, বীরগণের শিরোমণি। এখানে কে আছেন, যিনি কোন বিষয়ে কৃষ্ণকে অতিক্রম করিতে পারেন?"

তাহা শুনিয়া শিশুপাল ভীষ্মদেবকেও গালি দিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ অধীর হইলেন। এমন সময় শিশুপাল তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিলেন। তখন কেশব সকলকে বলিতে লাগিলেন, "এই পাপাত্মা দ্বারকা দগ্ধ করিয়াছে, আমার পিতার অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব চুরি করিয়াছে, তপস্বী অক্রূরের পত্নীকেও হরণ করিয়াছে। এ আমার পিসির পুত্র বলিয়া, আমি এতদিন ইহার অনেক অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি। আজ আর করিব না।" এই বলিয়া কৃষ্ণ চক্র দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। অমনি তাঁহার পক্ষের আর সমুদয় নৃপতি শান্ত ভাব ধারণ করিলেন এবং শিশুপালেরই নিন্দা করিতে লাগিলেন। মানুষ, তুমি কি বিচিত্র জীব!

রাজা যুধিষ্ঠির আদেশ দিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ শিশুপালের সৎকার করিলেন। পরে তাঁহার পুত্রকেই চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

এই যজ্ঞে প্রত্যহই সহস্র সহস্র ব্যক্তি রাত্রিদিন রন্ধন করিত, রাত্রিদিন পরিবেশন করিত, রাত্রিদিন অসংখ্য লোক আহার করিত। দ্রৌপদী স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া, অহরহ সমভাবে পরিশ্রম করিয়া, এই ভোজন-ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং কেহ অভুক্ত থাকিত কি না দেখিতেন। যে পর্য্যন্ত একজন দরিদ্র পঙ্গুও অভুক্ত থাকিত, সে পর্য্যন্ত তিনি আহার করিতেন না। (১১) কুন্তীদেবী সকল দেখিয়া শুনিয়া আনন্দে বিভোর হইতে লাগিলেন।

ক্রমে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। পঞ্চ পাণ্ডবের এখন সুখের সীমা নাই। রাজা যুধিষ্ঠির সমুদয় ভারতের সম্রাট বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন—শুধু সমুদয় ভারতই বা বলি কেন? এসিয়া মহাদেশের অধিকাংশের সম্রাট হইয়াছেন। তাঁহার শাসনগুণে তাঁহার রাজ্য ঐশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার ব্যবস্থায়, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি জনিত বিপদ, দস্যু-ভয়, ব্যাধি-ভয় অন্তর্হিত হইয়াছে। দ্রৌপদীর পঞ্চ-স্বামী দ্বারা পঞ্চ-পুত্র হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের অন্য ভার্য্যার গর্ভে এক পুত্র; ভীমের রাক্ষসী স্ত্রীর উদরে ঘটোৎকচ ও কাশীরাজ দুহিতার গর্ভে একপুত্র; অর্জ্জুনের সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যু, উলূপীর উদরে ইরাবান্ ও মণিপুর রাজকন্যার গর্ভে বভ্রুবাহন; নকুলের অন্য স্ত্রীর দ্বারা একপুত্র; এবং সহদেব মাতুল-কন্যা বিবাহ করায়, তাহার গর্ভে একপুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ-স্নেহময়। মহাবল ভ্রাতৃগণ, অগ্রজে একান্ত অনুরক্ত, তাঁহার অত্যন্ত অনুগত। পঞ্চ-ভ্রাতাই ভ্রাতৃস্নেহের মূর্ত্তিমান আদর্শ। এখন সকলেই ভাবিতেছে, পঞ্চ-পাণ্ডবের ন্যায় সুখী কে? সৌভাগ্যশালী কে? কিন্তু কালের চক্র যে অবিরাম ঘুরিতেছে, তাহাই কেহ বুঝিল না। বুঝিল না, সুখ দুঃখের মধ্যে প্রভেদ অতি অল্প। (ক্রমশঃ)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

(১০) সভাপর্ব্ব ৩৮—৪২। (১১) সভাপর্ব্ব ৫২—৫৮।

হিন্দু সমাজ।
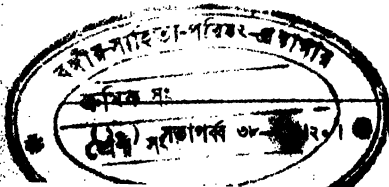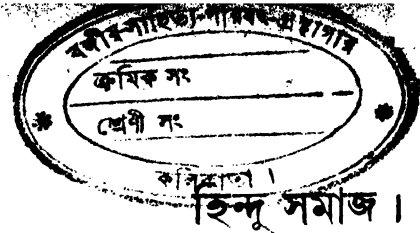
আমরা মনের মধ্যে গণ্ডী টানিলামই বা,—ভ্রূ সঙ্কুচিত করিয়া চাহিলে, চক্ষুই আবছায়া দেখে; সত্যই আর সম্মুখের দৃশ্যবস্তুগুলি মুছিয়া যায় না। তেমনি, আমরা মনের মধ্যে গণ্ডী টানিলামই বা; সত্যই তাহাতে আমাদের দেশ, পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। বিধাতাও বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া আমাদের জন্য বিধান রচনা করেন নাই। সমস্তই অবিচ্ছিন্ন, এক নিয়মেরই অধীন,—একাকার নয় ত' কি? সমাজ আমাদের সৃষ্ট একটা নূতন কিছু নহে। সমাজ বলিতে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা কিছু লইয়া আমরা বসিয়া আছি, যেটার সম্বন্ধে বিশ্বের অপর সকলে অণুমাত্রও এখনও ধারণা করিতে পারে নাই, এমন নয়। সমাজ বলিতে যাহা আমাদের আছে, মূলতঃ সেই জিনিষই দেশে দেশে, কালে কালে সর্ব্বত্রই আছে। সভ্য দেশে আছে, অসভ্য দেশে আছে। মানুষ সংজ্ঞা যাহাদের দেওয়া চলে তাহাদের মধ্যেই আছে। ইহাই যদি হয়, তখন, সমাজের দোহাই দিয়া, হিন্দু বলিতে একটা মাৎসর্য্য প্রকাশ, ভ্রূ সঙ্কুচিত করারই সমকক্ষ। ইহাতে দৃষ্টিই খর্ব্ব হইয়া উঠিতেছে, দৃশ্যের খর্ব্বতা জাগে নাই; জাগিবার সম্ভাবনাও পাইতেছি না।

যতই আমরা মনের সহিত বুঝা পড়া করিতেছি যে, আমাদের স্বাতন্ত্র্যই উচ্চ, ততই দেখিতে পাই, ওই দৃষ্টির খর্ব্বতার মত, আমাদেরই প্রকাশ-প্রভাব, এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মন্দতেজঃ হইয়া আসিতেছে। আজ অবস্থাই আমাকে উদ্দীপ্ত করিতেছে, নূতন ভাবে চিন্তা করিতে; কেমন হৃদয়ের অন্তঃস্থলে সন্দেহ ও শঙ্কা জাগাইয়াছে যে, বৈশিষ্ট্য-রক্ষা আত্মরক্ষার জন্য যে পথ হিন্দু এতদিন অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে, তাহার গন্তব্য-স্থল, সর্ব্বনাশ। সে পথ, ঠিক্ পথ নহে। কবে, প্রমাদে পড়িয়া, আমরা এক পথে যাইতে আর এক পথ ধরিয়া বসিয়াছি। আজ ফিরিতেই হইবে।

মুনি ঋষির নিন্দা করিতেছি না। তাঁহাদের ত্রিকালদর্শী অভিজ্ঞতা সর্ব্বাংশেই শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। সেই অভিজ্ঞতার নির্দ্দেশবর্ত্তী হওয়ার যা' পরিণাম তা' যদি না পাইলাম; যদি দেখি, তাঁহাদের নির্দ্দেশবর্ত্তী হইয়া চলিলে যে সুফল পাওয়া যাইবে, তাঁহারা ভরসা দিয়াছেন, সে ফল মিলিল না; তখন যদি বলি, হয় এই নির্দ্দেশ-মত চলার মধ্যে ভুল আছে, নয় ত, নির্দ্দেশটাই ভুল, তবে কি মিথ্যা বলা হয়?

এইটাই আমার কথা। সমাজ-বন্ধনের মধ্যে জীবন-প্রকাশ যথেষ্টই বাধা পাইতেছে। আজ, হয় বলিতে হইবে যে, বন্ধনটা অনর্থক; নয় বলিতে হইবে, যে ভাবে আমরা বন্ধনটা অনুভব করিতেছি, সে ভাবটা অনর্থক। প্রকৃত বন্ধন কোথায়, সে আমরা গোল করিয়া ফেলিয়াছি। যেটা মানিতেছি, সেটার মধ্যে যখন মঙ্গলের আবির্ভাব কষ্ট-সাধ্য, তখন, মানিবার বস্তু প্রকৃত পক্ষে যেটা, সেটাকে কখন হারাইয়া ফেলিয়া, গোলমাল বাধাইয়াই, এইটাকে ধরিয়া বসিয়া আছি। একটু সন্ধান করিয়া, প্রকৃতটাকে আবার ধরিয়া লইতে হইবে। চোখ কান বুজিয়া, এটাকেই ধরিয়া থাকিয়া, জীবন-প্রকাশ বিলুপ্ত করিয়া দিতে থাকিব,

এমন জিদ্ যদি ভিতরে পাই, তবে বুঝিতে হইবে, সে আমাদের অন্তরাত্মার কথা নহে। কার যে কথা, সেটা বুঝিবার জন্য, তপস্যার প্রয়োজন হইয়াছে। আর বাহির হইতে এমন চাপ্ যদি ঘাড়ে পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে, ভগবানের একটু রুদ্র-লীলার অভিপ্রায় হইয়াছে; একটা বিপ্লব বাধিবেই।

এই যে সমস্ত দেশ-ব্যাপী একটা রব দেশ-মানবের সকল স্তরকেই স্পর্শ করিয়াছে,—উন্নতি, উন্নতি—ইহার অর্থ কি? শরীর অবসাদে আচ্ছন্ন হইলে, তার পরই, তাহার মধ্য হইতে, বিশ্রামকে স্মরণ করিয়া, একটা চেতনা জাগিয়া উঠে। অনাহারের সকল লক্ষণ বিকশিত হইলেই, তারপর আহারের জন্য দাবী প্রত্যেক স্নায়ুতন্ত্রীকে শিহরিত করিয়া, আপনাকে ঘোষিত করিয়া তোলে। এই একই নিয়মের বশে এই রব উঠে নাই কি? এই 'উন্নতি-উন্নতি'-ধ্বনি, আমরা অবনত এই চেতনা, সর্ব্বপ্রকারে পরিস্ফুট হইবার পরেই, প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এ আর অস্বীকার চলে না।

সকল ক্ষেত্রেই সন্ধান চলিতেছে। সমাজ-ক্ষেত্রের সন্ধান-স্পৃহা কত দিন ভ্রুকুটী প্রদর্শনে প্রতিরোধ-ক্ষম হইতে পারে? মুনি ঋষিকে প্রণাম করি। তাঁহারা যে সকল অমূল্য সত্যরাজির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, আপনার অস্তিত্বের মতই, সমস্তের যাথার্থ্য আমার প্রত্যক্ষ-গত। কিন্তু সেই সত্য ভিন্ন, জীবন-লব্ধ চেতনায় তাঁহারা বিশ্ব-বিধানের যে আবিষ্কার-মালা দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই রাখিয়া যান নাই, এই কথা আমি মুক্ত-কণ্ঠে বলিব। তাঁহারা করিয়া যান নাই এমন কোনও আদেশ, যাহার আর ব্যতিক্রম নাই। তাঁহারা রাখিয়া যান নাই এমন কোনও সম্প্রদায়, যাহাদের শাসন, যাহাদের প্রাধান্য, অব্যাহত।

সুতরাং, সমাজ-সমস্যা সমাধানার্থ অন্ধের মত অনুবর্ত্তিতার বিরুদ্ধে যদি নূতন করিয়া ভাবিতে হয়, ভাঙ্গিতে হয়, গড়িতে হয়, আমি কিছুতেই স্বীকার করিব না যে, তাহাতে আমাদের কাহারো আজ অধিকার নাই।

নিশ্চয়ই আছে। আমাদের মধ্যে যেই হোক। অধিকারী হইলে, সে অধিকার তাঁহার নিশ্চয়ই আছে। কেহই রদ্ করিতে পারিবে না।

সমাজ-বন্ধনের রীতি ভাঙ্গা-গড়ার বিরুদ্ধে যত প্রতিবাদ, চতুর্দ্দিকের এই বর্ত্তমান আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া, আধুনিক কাল তাহাকে থামাইয়া দিয়াছে। এখন প্রতিবাদ করা চলে মাত্র এই বলিয়া যে, ভাঙ্গা-গড়া অধিকারীত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া করিতেছ না; এটা তোমার স্বেচ্ছাচার। সামাজিক-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এখন কেবল দেখিতে হইবে, স্বেচ্ছাচার করিয়া এই স্বাধীনতার আমরা অপব্যবহার না করিয়া বসি। বিপ্লবের জয়-পরাজয় এইখানে নির্ভুল হওয়ার উপরই নির্ভর করে। প্রকৃত পথ এই—আগে অন্তরের স্বাধীনতা, তারপর বাহিরের বিপ্লব। এই পথই জয়ের পথ। আগে বাহিরে উদ্দাম বিপ্লবের সৃষ্টি, তারপর তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতে অন্তরের স্বাধীনতা,—এ পথের উপর আমার বিশ্বাস নাই।

এই অন্তরের স্বাধীনতাকেই এখানে অধিকারীত্ব বলিতেছি। ইহা লাভ করিতে হইলে,

গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে। অকুতোভয় অবিচল হইয়া, সত্যের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইবে। মর্ম্মের সকল গ্রন্থি ছেদন করিয়া, তাহাকে অবলম্বন করিতেই হইবে।

কেমন করিয়া তাহা হইতে পারে? প্রথমতঃ, প্রতিষ্ঠিত অভ্যাস প্রবণত্বের কবল ছিন্ন করিয়া, মনের মুক্ত-বিহঙ্গমকে সচেতন হইতে হইবে, প্রকৃতির বিশাল রাজ্যের রাজ-নীতিতে। তবে ত সে আপনার কাজ খুঁজিয়া পাইবে। এই খোঁজার মূলে আছে, শেখা। সমাজ সম্বন্ধে চিন্তা তখনই আমরা করিতে পারিব, যখন সমাজ-তত্ত্বের গূঢ় মর্ম্মে আমরা প্রবেশ করিয়াছি, যখন তাহার সকল গুপ্ত রহস্য আমরা শিখাইয়া লইয়াছি। তার পূর্ব্বে সম্ভব হইবে না। জগতে মানুষ, দেখিয়া শেখে, শুনিয়া শেখে; আর শেখে, ঠেকিয়া। যে জাতির কাছে পর-সংস্রব পরিহারই স্বাতন্ত্র্য, আর তাহাই বৈশিষ্ট্য-রক্ষার উপায়, তাহার দেখিয়া বা শুনিয়া শিখিবার মত বুদ্ধি শুদ্ধি নহে। বাকি, ঠেকিয়া শেখা। কিন্তু জানি, যে ব্যক্তি এমন করিয়া অহঙ্কারে ভরপূর, যে বিরাট পুরুষের মত, সে বিশ্বে একাই একা। আপনার ইতিহাসই তাহার যথেষ্ট; আপনার অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের বাহিরে আর তাহার কাছে পৃথিবী বলিয়া কিছু নাই; তাহার ঠেকিয়া শেখাও কাজের হয় না। চোখ্ কান বুজিয়া, যে আচার অবলম্বন করিয়া আছি, তাহাই লইয়া থাকিব,—জীবন-প্রকাশ বিলুপ্ত হয় কি করিতে পারি,—সমাজ পুরুষের মধ্যে হিন্দুর এই জিদ্ যতখানি আছে, সে এই মনস্তত্ত্বের স্তরেরই।

এই জন্যই দেশকাল স্বপক্ষে দাঁড়াইয়া যুগধর্ম্মকে জয়ী করিতেছে। নূতনের অভিযান কিছুতেই প্রতিহত হইতেছে না। কিন্তু, মাত্র মনের উপর যুগধর্ম্মের জয়, জয় নহে; সে আজ বিভিন্ন নামে নামে বহুদিনই হইয়া আসিতেছে। এই যুগধর্ম্মের ভিত্তির উপর সমাজ-স্থাপনই, নূতনের পূর্ণ জয়। পুরাতন কিছুতেই বাঁচিবার নয়। সে যে কিছুতেই শিখিবে না। বাঁকের মুখে বাধিয়া গিয়া নদী-স্রোত যতই পঙ্কিল হউক—নিশ্চেষ্ট থাকে না। তেমনি পুরাতনের বাঁকে বাধিয়া জীবন-স্রোত যতই ক্ষীণ বিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে, জানিও, পুরাতনকে বসাইবার ততই সে উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছে মাত্র।

মানুষ গৃহ-নির্ম্মাণ করে, বাস করিবার জন্য। তেমনি, সমাজ-নির্ম্মাণও, তাহার এই গৃহ-গুলি আবার তাহার মধ্যে বাস করিবে বলিয়া। তাহার আপনার জন্য গৃহের যে প্রয়োজন, গৃহগুলির জন্য সমাজের সেই প্রয়োজন। এই গৃহ জীর্ণ হয়, তখন সংস্কার না হইলে চলে না। অত কি, বর্ষে বর্ষে সুধাধৌত ধবলিত করিয়া, মলিনতার হাত হইতে, অস্বাস্থ্যের আক্রমণ হইতে, ইহাকে রক্ষা করাই রীতি-সঙ্গত। ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়াও, গৃহস্বামীর পক্ষে অমঙ্গল, অগৌরবের কথা নহে। কিন্তু গৃহ কত পবিত্র। পুরুষানুক্রমের আবাস, ভদ্রাসন, কত স্মৃতি, কত শ্রদ্ধা-মমতা ইহার উপর সঞ্চিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সে কি ওই জীর্ণ-সংস্কারের সহিত অন্তর্হিত হয়? ইহাকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার সময়, পুরাতন উপাদান-পুঞ্জের সহিত সে কি কেহ বহিয়া লইয়া যাইতে পারে? গৃহের পবিত্রতা, গৃহের উপর মমত্ব-বোধ, সে ত ইট কাঠকে অবলম্বন করিয়া রহে না; সে থাকে স্মৃতিতে, সৌরহে অনুভূতিতে। মনের উপর, সেই যে কত বহু দিন হইতে, প্রপিতামহ পিতামহ পিতা, কেহ সম্পদে, কেহ বিপদে,

কেহ দারিদ্র্যে, একই স্নেহ একই ভালবাসা, হাসি কান্না সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া, একটা রক্তের প্রবাহ, একটা চরিত্রের বিশেষ ভঙ্গীর সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহারই প্রভাব না গৃহ? পুরাতন বাড়ীর কড়িকাঠখানি বদলাইতে কেহ কাতর হন না; এই ধারাটি পরিবর্ত্তিত হইবার আশঙ্কা হইলেই, গৃহবাসী সজল নয়নে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন!

সমাজ-গৃহেরও ত আর নূতন কোনও ব্যাখ্যা নাই। এটা, ব্যষ্টি-পরিবারের,—ওটা, সমষ্টি-পরিবারের, বাস-গৃহ। রীতি নীতি, বিধি ব্যবস্থা এগুলিই ত সমাজ-প্রতিষ্ঠানের জড় স্থূল-দেহ গড়িবার কাঠ কাঠরা, ইট পাথর। যদি তাই হইল, যদি এইগুলিকে বুক দিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া, জাতি বলিল—'আমার সর্ব্বস্ব আমি রক্ষা করিতেছি। ওগো, ও স্তূপাকার আবর্জ্জনা যে আমার ওই দেয়ালটী ধসিয়া জমা হইয়াছে। তুমি বলিতেছ, সাপের বাসা; তা আমার কি করিবার আছে? ও যে আমার ধসিয়া-পড়া দেয়াল।'—তবে আর কি বলিব? দীর্ঘশ্বাসে এই বলিতে হইবে যে, সংস্কারাভাবে, জীর্ণ সমাজ-প্রতিষ্ঠান চাপা পড়িয়া জাতি মরিয়া গিয়াছে। এখানে আর কোনও ভরসা নাই। এ মানব-সমষ্টি পশুযূথের মত এখানে জমা হইয়া আছে। মানুষে ইহাকে চরাইবে; মানুষের মত চলিয়া ফিরিয়া কাজ কর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়াইতে ইহারা জানে না!

ঘরে মানুষ থাকিলে যেমন তাহার সৌষ্ঠব দৃষ্টেই চেনা যায়, তেমনি সমাজ-প্রতিষ্ঠান মধ্যে, জাতির প্রাণ টিঁকিয়া থাকিলে, তাহাও সৌষ্ঠবে জ্ঞাতব্য। সর্ব্বত্রই একটা নূতন নূতন, একটা মাজা ঘষা, তক্ তকে ভাব, একটা শুচিতা, একটা গম্‌গমে ব্যাপার। তার মানে, মানুষ তখন তার মধ্যে, যৌবনের স্ফীতিতে কানে-কান্, তার প্রাণ-প্রবাহ তর্ তর্ বেগে ছুটিয়াছে। সেখানে কেবল সার্থকতা।

The principal aim of society is to protect individuals in the enjoyment of those absolute rights which were vested in them by the immutable laws of nature.—*Blackstone*—সত্যই। ইহার অধিক আর কিছুই নাই। স্পষ্টই বল, ঘুরাইয়াই বল, দেবতার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হউক, আর মুনি ঋষি সন্ন্যাসী যাঁহারা দ্বারাই হউক, ইহাই সমাজের অভ্যন্তর নিহিত মূল উদ্দেশ্য। ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই এক প্রেরণাই, বুদ্ধির রঙ্গিন কাচে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, জগতে বিভিন্ন আদর্শ, বিভিন্ন উদাহরণ প্রকটিত করিয়াছে। দেশে দেশে আবহাওয়া, মানুষের অভাব, ক্ষমতা অক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া, তাহাদের রীতি নীতির স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া, এই মূল লক্ষ্যই তাহাদের পৃথক পৃথক সমাজের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। তুমি আমি, আমাদের মধ্যে দুর্ব্বল ব্যক্তিটীও, সকলেই প্রকৃতির সৃষ্ট; প্রকৃতি দ্বারাই চালিত। প্রকৃতিই আমরা এবং প্রকৃতিরই আমরা। তাই, তাহারই বিকাশ, তাহারই স্ফুরণ, আমাদের মধ্যে ঐ absolute right রূপে,—আর সেই বিকাশের শৃঙ্খলা বিধানের প্রেরণাই the aim of society-রূপে আমরা আমাদের বুদ্ধির মধ্যে অনুভব করিতেছি। যিনি জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন, জীবনের সার্থকতাই তাঁহার সৃষ্টির লক্ষ্য; তাহারই উদ্দেশ্যে ঐ শৃঙ্খলা-বিধান-ই প্রতিষ্ঠান; প্রতিষ্ঠা তাঁহারই কাজ। আমরা বুঝিতে পারি না; বুঝি, এই অহঙ্কার সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়া, তিনিই যে আমাদের

কানামাছি খেলাইতেছেন। এই জন্যই সমাজ একটা প্রকাণ্ড positive ব্যাপার। ইংরেজী লেখক Paine এর কথা—society is produced by our wants। আর ইহার কাজ কি?—promotes our happiness positively, by uniting our affections.

হিন্দু সমাজের নেতি-বাদ নাসিকা সীট্‌কার মাহাত্ম্য কেমন করিয়া আসিয়াছে—সে অনেক কথা; প্রবন্ধান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। এখানে কেবল মাত্র বলিতেছি, জোর দিয়াই বলিতেছি, সমাজ একটা positive ব্যাপার; negative, নেতি নেতি, না-না-ধ্বনি, এখানে স্বাভাবিক নহে।

বহুদিন পূর্ব্বে কি একখানা ইংরাজি পুস্তকে—লেখকের নাম বুঝি Idem,—সমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে চমৎকার একটা বর্ণনা পাঠ করিয়াছিলাম। সব ভুলিয়া গিয়াছি; বর্ণনাটুকু এখনও মনে রহিয়াছে, সে টুকু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না—

ধর পৃথিবীর কোনও লোকালয়-বিচ্ছিন্ন প্রান্তে জন কতক কোনও রূপে গিয়া পড়িয়াছে; পৃথিবীর আদিম-মানবের মত তাহারা যেন সেখানের আদিম মানবে পর্য্যবসিত হইল। তাহারা স্বাধীন, স্বতন্ত্র; কাহারো কাছে কাহারো কোনও বাধ্য-বাধকতা নাই। প্রথম কোন্ অভাব তাহাদের মধ্যে অনুভূত হইবে? এই সমাজেরই অভাব। জাগিবে না, তাহাদের আপন ইচ্ছায়। সহস্র দিক হইতে অজস্র শক্তির তাড়নায় উত্তেজিত হইয়াই তাহা জাগিবে, জানিও। তুমি মানুষ তোমার অভাব আছে অনন্ত; কিন্তু, সকল অভাব পূরণের উপযুক্ত শক্তি, তোমার একার নাই। তোমার আছে, মন; সে সবার হইতে বিচ্ছিন্ন বটে; কিন্তু, সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা তাহার স্বধর্ম্ম নহে। মানুষের মানুষ চাই-ই,—সাহায্যের দিগ দিয়া, সুখের দিক দিয়া, মানুষের মানুষ চাই-ই। এমনি করিয়া, স্বল্প কালের মধ্যেই, তাহাদের একথা সমষ্টি-বোধের অনুগত হইয়া পড়িতে হইবেই। একটা বাস-গৃহ তুলিতে গেলেই ত সেখানে মানুষে মানুষে সম্মিলিত হইতে হয়। আহার আচ্ছাদন, মানুষের যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, কোনওটাই মানুষ আপনি আপনার জন্য সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবে, তেমন করিয়া তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা তাহাকে গড়েন নাই। সুতরাং, মাধ্যাকর্ষণ যেমন প্রত্যেক বস্তুটীকে আপনার দিকে টানিতেছে, তেমন, ঐ অভাব-বোধ, ঠিক্ ঐ নিয়মেই, প্রত্যেক মানুষটাকে অপরের দিকে টানিতেছে। মানুষ থাকিলেই সমাজ; আর সেই সমাজ দিনে দিনে যত বড় হইতে থাকিবে, ততই তাহার সমস্যা জটিল হইয়া, তাহাকে নানা অঙ্গে সুশোভিত করিয়া তুলিবে।

সকল লোকালয়েই এমনি করিয়া আদিম মানবের ক্ষুদ্র প্রয়োজন-মূলক মিলন, আদিম-সমাজের উৎপত্তি করিয়াছিল। তারপর, তাহাদের জটিলতা ও তাহারই সমাধান-কল্পে, নব নব প্রতিষ্ঠারই সমাবেশ, বর্ত্তমান সমাজ। ভারতীয় সমাজের পক্ষে নূতন কোনও কথা নাই। সরল স্বল্পাড়ম্বর পিতৃজাতি পঞ্চনদের পুণ্যভূমিতে সুগম্ভীর বেদচ্ছন্দে অন্ধকারের পর-পারস্থ দিব্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের বন্দনা-গান গাহিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেইটাই তাঁহাদের একমাত্র দিক্ নহে। তাঁহাদের জীবনে আর একটা দিক আছে, যে দিকে তাঁহারা বন-ভূমিতে

পর্ণকুটীর বাঁধিয়াছেন, পুত্র দুহিতৃগুলিকে লইয়া হোমধেনুগুলির পরিচর্য্যা করিয়াছেন, অনার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রকাণ্ড বৃক্ষকাণ্ড সকল বহিয়া আনিয়া, গ্রাম-প্রান্তের প্রাচীর-গুলিকে সুরক্ষিত করিয়াছেন। তার পর, সেই বেদ গানের ছন্দঃ ভাব, তাহাই যে কেবল ক্রমশঃ সুন্দর ও গভীর হইয়াছে, তাহাই নহে। তাঁহারাও নব নব ভূমি জয় করিয়াছেন, সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড কৃষিজাতের আকারে পরিণত করিতে, শ্রমকার্য্যে, পরাজিত অরাতিকে তাঁহাদের নিযুক্ত করিতে হইয়াছে ; তাহাদের, সতর্ক দৃষ্টিতে, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইয়াছে। স্বল্প সংখ্যক হইয়াও, বিশালদেশে, প্রচুর অরাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়া অনিবার্য্য হওয়ায়, নিজের প্রতি কঠোর সংযম ও শত্রুর প্রতি কঠোর নিষ্ঠুরতা প্রবর্ত্তিত করিয়া, স্বভাবের মাধুর্য্যকে খর্ব্ব করিয়া আনিতে হইয়াছে। তার পর, আরও শতাব্দীর পর শতাব্দী গিয়াছে। যে সকল দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেছিলেন, তাঁহাদের ভাব, মূর্ত্তিকে কেবল যে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিয়াই তাহাদের জীবনের কাজ শেষ হইয়াছে, তাহা নহে। এ দিকেও, সেই পর্ণকুটীর, কাষ্ঠ প্রাচীর ঘুচিয়া, ধীরে ধীরে মণিময় গবাক্ষ, দিব্য মর্ম্মর হর্ম্ম্যরাজি, নীলাম্বর স্পর্শ করিয়াছে। সংযম, কঠোরতা নির্ম্মমতা বিলাসে ব্যসনে বীরত্বে রূপান্তরিত হইয়াছে। যে বন্দী শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল, যে গ্রামান্তের বনবাসী শত্রু দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছিল, সকলেই অভিভূত হইয়া, অনুগত হইয়া, এক পরিবারের পরিজনের মত, তাঁহাদের সমষ্টি-দেহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

আজিকার হিন্দুও সেই পিতৃজাতির সহিত এক। কিন্তু কোন অর্থে? সেদিনকার জাতীয়ত্বের সহিত কত নব নব প্লাবনে বিভিন্ন উপাদান যে আসিয়া মিশিয়াছে, তাহার ত স্থিরতা নাই। তাঁহাদের বেশ, বাস, আকৃতি, আহার্য্য, জীবনোপকরণ কিছুই ত আজ বর্ত্তমানে মিলে না। তবে কোথায়, কোন বনীয়াদের উপর দাঁড়াইয়া, আজিকার হিন্দু সেই পিতৃজাতির সহিত এক?

এই একত্বের বনীয়াদ চেনার উপরই, এই মিলন-সূত্র আবিষ্কারের উপরই, সমাজ মনের ছুটি নির্ভর করিতেছে। ওই যে ঘরের লোকের আপনাকে অবিশ্বাস, পরকে ভয়, সন্দেহ, শক্তিশালী আত্মীয়কে ঈর্ষ্যা, সমস্তই বিদূরিত হইবে, তখন। এতদিন পর্য্যন্ত একটা ক্ষীণ আলোক রশ্মির মত, স্মৃতি, আর একটা স্থূল যুক্তিহীন বোধ, তাহাই আমাদের ছিল। যাহারা এখনও অচলায়তনে চোখ বুঁজিয়া বসিয়া আছে, তাহারা এই জন্যই আছে। তাহারা জানে, স্বাতন্ত্র্য আমাদের পথ। ঐ জানাটুকুই তাহাদের সব। ভাবে না—স্বাতন্ত্র্য, কখন কোন অবস্থায় পড়িলে, মানুষের পথ হয়; কেন আমাদের পথ হইয়াছিল; কবে হইয়াছিল? যুগধর্ম্ম, মনকে নাড়া দিয়া, এই সবই ভাবাইয়া একটা নূতন চেতনায় সঞ্চার করিয়া দিতেছে। নব-জাগরণ ইহারই জন্য। পুরাতনকে একটা প্রভাবে পড়িয়া জাতি ধরিয়াছিল ; সেই মূল প্রভাবই যদি অপসারিত হইয়া থাকে, পুরাতনের প্রভাব কিসের জন্য ও কতক্ষণ?

আমাদের এই হিন্দু সমাজের ইমারত অনেকবার একেবারে ভাঙ্গিয়া, সমভূমি করিয়াই, আবার গড়িয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার কত স্তম্ভ যে কতবার বদলাইয়া লওয়া হইয়াছে, তাহারও হিসাব নাই। তবুও, সে সকল সত্ত্বেও, ভাঙ্গাবাড়ীর সকল উপদ্রবের মধ্যে এবং

পরে সমাজ সমাজই ছিল। মোট কথা এই যে, সমাজ প্রকাশ করিবে ও ধরিয়া রাখিবে, জীবনকে ; আর জীবন প্রকাশ করিবে ও ধরিয়া রাখিবে, সত্যকে। আহার, বিচরণ, জীবিকা, জন্ম, বিবাহ, মৃতের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম, এ সমস্ত জীবনেরই সংক্রান্ত ; ইহাদের মধ্য। দিয়া জীবন শক্তি বিচ্ছুরিত হয়। যাহাকে প্রাণ বলি, প্রাণই সত্যকে ধরিয়া রাখে। শুধু তাহাই নহে এই প্রাণ ও জাতীয় সত্য উভয়ের মিশ্রণে যে বিচিত্র আলোক জ্বলিয়া উঠে, তাহারই নাম জাতীয়-গরিমা। ভারত যে ভাবে এই আলোকদাম একদিন জ্বালাইয়াছিল, সেই ভাবটাই তাহার বৈশিষ্ট্য! ভাবটা আমরা আজ হারাইয়া ফেলিয়াছি। অচলায়তন মধ্যে রক্ষণশীলতা-রূপে একটা দৃঢ়তা, একটা প্রতিজ্ঞা, এখনও বজায় আছে। সে যদি ভাবের সন্ধানে নিযুক্ত হয়, তবেই সে সার্থক। আর যদি অভাবকে আঁকড়িয়া ধরিয়া পড়িয়া থাকাই তাহার প্রতিজ্ঞা হয়, তবে, বিশ্ব-বিধান-সম্মুখে তাহার আজ কোনই উপযোগীতা নাই।

আমাদের আজ অবস্থা কি? প্রাণের সহিত সত্যের সংযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। জীবনের খণ্ডাংশগুলিকে ছেঁড়া কানির মত বুকে চাপিয়া ধরিয়া আমরা ভাবিতেছিলাম, বৈশিষ্ট্য রক্ষা। বৈশিষ্ট্য, আরো অনেক উচ্চস্তরের কথা,—সে এই এতটুকু বস্তু নহে। ছেঁড়া কানি ফেলিয়া দিয়া, তাহাকেই বুকে তুলিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

শ্রীসত্যবালা দেবী।

আমরা কি চাই ? (৩)

[স্বরাজ—কাহার রাজ ? বা, কোন্ রাজ ?]

১।

যিনি যাহাই বলুন না কেন, দেশের লোকে যে কি চান, ইহা এখনও বলা যায় না। কন্‌গ্রেস স্বরাজের সুর তুলিয়াছেন। তাই স্বরাজ কথাটা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, এই স্বরাজ বস্তুটা যে কি, ইহা অতি অল্প লোকেই এখনও ভাল করিয়া ধরিতে পারিয়াছেন। গ্রামের লোকেরা নাকি, অনেকস্থলেই স্বরাজ কি, এ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। বাঙ্গালার প্রাদেশিক-কন্‌গ্রেস-কমিটির সহকারী-সম্পাদকের মুখে শুনিয়াছি যে, নানা স্থান হইতে, কন্‌গ্রেসের প্রচারকগণ, এই প্রশ্নের একটা সদুত্তর চাহিয়াছেন।

যদি সত্য সত্যই দেশের লোকে স্বরাজ কি বস্তু ইহা না বুঝেন, তাহা হইলে, এই স্বরাজের নামে তাঁরা এমনভাবে মাতিয়া উঠিতেছেন কেন? ইহার উত্তর সহজ। নানা কারণে, দেশের লোক একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। পেটে অন্ন নাই। গায়ে বস্ত্র নাই। রোগে ঔষধ নাই। পথে ঘাটে ইজ্জত নাই। মানুষ যাহা লইয়া বাঁচিয়া থাকে, যাহাতে জীবন-ধারণ সম্ভব ও সার্থক হয়, তার অভাব পড়িয়া গিয়াছে। এ অভাব কখন, কিসে দূর হইবে, তারও কোনও পথ দেখা যাইতেছে না। রাষ্ট্রীয় সভাসমিতিতে, বক্তাগণ, আর সংবাদপত্রে লেখকেরা, সকলেই প্রায় একবাক্যে কহিতেছেন যে, আমাদের স্বরাজ নাই বলিয়াই এমন দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

স্বরাজ পাইলেই, এ দুঃখ দুর্গতি ঘুচিয়া যাইবে। সুতরাং, স্বরাজ এমন একটা কিছু, যাহা লাভ হইলে পরে, ক্ষুধার অন্ন, শীতের বস্ত্র, বর্ষার আচ্ছাদন, আর সংসার-পথে ইজ্জত রাখিবার উপায় হইবে। লোকে এইমাত্র বুঝিতেছে। আর, তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, ইহাই যথেষ্ট। স্বরাজের নামে, তাঁহাদের অন্তরে একটা অভিনব আশার সঞ্চার হইতেছে। এই জন্যই তাঁহারা, স্বরাজ যে কি বস্তু, ইহা না বুঝিয়া এবং না জানিয়াও, এই স্বরাজের আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছেন।

দেশের অবস্থা দেখিয়া উপনিষদের একটা কাহিনী মনে পড়ে। বৃহস্পতি একদিন নিজের মনে কহিতেছিলেন যে, এমন একটা বস্তু আছে, যাহা পাইলে পরে, সকল দুঃখ, সকল অভাব ঘুচিয়া যায়; যাহা লাভ হইলে পরে, আর বিশ্বে লোভনীয় কিছুই থাকে না; সকল কামনার নিবৃত্তি হয়। দেবতারা এবং অসুরেরা উভয়েই একথা শুনিলেন। উভয়েই একথা শুনিয়া, এই অপূর্ব্ব বস্তু লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। দেবতারা তখন ইন্দ্রকে ও অসুরেরা বিরোচনকে বৃহস্পতির নিকট পাঠাইয়া, এই বস্তুর সন্ধান লইয়া আসিতে কহিলেন। ইঁহারা এক সঙ্গেই, সাধ্য-কুশ হাতে লইয়া, ব্রহ্মচারিবেশে বৃহস্পতির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বাদশ বৎসরবৃহস্পতি তাঁহাদের দিকে একটিবারও মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন না। পরে ইঁহাদের নিষ্ঠা দেখিয়া, একদিন ডাকিয়া ইঁহাদের অভিপ্রায় জানিলেন। জানিয়া, বৃহস্পতি কহিলেন, "একটা পাত্রে খানিকটা জল লইয়া আইস"। জলপূর্ণ পাত্র আনিলে, কহিলেন—"চাহিয়া দেখ, ইহাতে কি দেখিতে পাও?" ইন্দ্র ও বিরোচন তাহাই করিলেন। করিয়া, জলের উপরে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া কহিলেন——"আমরা যেমনটি তেমনটিই দেখিতেছি।" ক্ষৌরাদি করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবসানে, স্নাতক হইয়া, গন্ধমাল্যাদি বিভূষিত বেশে, পরদিবস প্রাতে, পুনরায় ঐ জলপাত্র লইয়া আসিতে কহিলেন। ইন্দ্র ও বিরোচন তাহাই করিলেন। বৃহস্পতি কহিলেন—"চাহিয়া দেখ, কি দেখিতে পাও?" উভয়ে জলের উপরে নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া কহিলেন, "আমরা যেমনটি তেমনটিই দেখিতেছি।"

বৃহস্পতি কহিলেন—"তদ্বৎ।" অর্থাৎ, সেই বস্তু ইহাই।

বৃহস্পতির কথা শুনিয়া, ইন্দ্র ও বিরোচণ দুজনেই বস্তুলাভ হইল ভাবিয়া, গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। বৃহস্পতি ইঁহাদের অবস্থা দেখিয়া নিজমনে কহিতে লাগিলেন—"হায়! ইহারা শব্দ শুনিয়া, বস্তুজ্ঞান না পাইয়াই, বস্তুলাভ হইল ভাবিয়া চলিয়া গেল। ইহারা এই শব্দের অনুসরণ করিয়া বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে।" আমাদেরও এই দশাই না ঘটে।

স্বরাজের নামে দেশের লোকে মাতিয়া উঠিয়াছেন, ইহা একদিকে শুভলক্ষণ বটে। কিন্তু এরূপ উৎসাহ, এরূপভাবে, কেবল অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়কে ধরিয়া বেশী দিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃত বস্তু আশ্রয় দিয়া, এ উৎসাহ ও আশাকে কেবল বাঁচাইয়া রাখা নয়, কিন্তু যথাযোগ্য কর্ম্মে নিয়োগ না করিতে পারিলে, পরিণাম বিষময় হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী।

হতাশ রোগীর যে অবস্থা, দেশের সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ডাক্তার কবিরাজ জবাব দিলে, রোগমুক্তির যখন আর বড় আশা বুদ্ধি বিবেচনায় মানুষ খুঁজিয়া পায় না, তখন তন্ত্র-মন্ত্র, টোটকা-টুটকা, যে-যা-বলে, তাই আঁকড়াইয়া ধরে। আমাদের লোকেরা তাহাই করিতেছেন।

উকিল মোক্তারেরা যদি নিজেদের ব্যবসায় ছাড়েন, তবেই স্বরাজ পাইব, বা স্বরাজের পথে

অগ্রসর হইব। বস্। অমনি একদল স্বরাজ-সেবক উকিল-মোক্তারদের পিছনে লাগিয়া গেলেন। অনেক উকিল মোক্তারও দেখিলেন যে, দেশের লোকে যখন অমন করিয়া চাহিতেছেন, তখন, কিছুদিনের জন্য, ব্যবসা'টা না হয় নাই বা করা গেল। তাঁরাও ব্যবসা স্থগিত রাখিতে আরম্ভ করিলেন।

ইংরাজের দেওয়া উপাধি ছাড়িলে স্বরাজ-লাভের পথ প্রশস্ত হইবে। সুতরাং দেশের লোকে উপাধিধারীদের পিছনে লাগিয়া গেলেন। উপাধিধারীদেরও কেহ কেহ উপাধি ছাড়িলেন। যাঁরা ছাড়িলেন না বা ছাড়িতে পারিলেন না, তাঁরা, কোথাও বা একরূপ সমাজচ্যুত, আর দেশের সর্ব্বত্রই লোক-চক্ষে হেয় হইতে আরম্ভ করিলেন।

ইংরাজ সরকারের সংসৃষ্ট স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পড়ুয়া বাহির করিয়া আনিতে পারিলেই, এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ-লাভ হইতে পারিবে। সুতরাং, এ চেষ্টাও চারিদিকে হইতে লাগিল। বহু পড়ুয়া স্কুল কলেজ ছাড়িয়া আসিল। অনেকে আসিল, ভাল পড়া হইবে এই লোভে পড়িয়া; কেহ কেহ আসিল, পড়া চুলোয় যাক্, দেশ যাতে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, এমন কাজে জীবন উৎসর্গ করিবার সংকল্প লইয়া।

চরকা কাটিতে শিখিলে ও ঘরে ঘরে চরকা চালাইতে পারিলেই স্বরাজ-লাভ হইবে। একথা শুনিয়া, চারিদিগে 'চরকা' 'চরকা' ডাক পড়িল। ছেলেরা কলম ছাড়িয়া চরকা ধরিল। যে সকল লোক অকর্ম্মণ্য হইয়া, তাস পিটিয়া বা দাবা ঠেলিয়া দিন কাটাইতেছিল, অথবা যাহারা কর্ম্ম-খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়াইতেছিল, তারা জীবনের একটা লক্ষ্য ও কর্ম্ম পাইল ভাবিয়া, চরকা ঘুরাইতে লাগিল।

তারপর আদেশ হইল—এককোটী লোককে কন্‌গ্রেসের সভ্য করিতে পারিলে, আর এক কোটী টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই স্বরাজ-লাভ হইবে। অমনি লোকে তার চেষ্টায় লাগিয়া গেল।

কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিল না—এ সকলের একটি বা পাঁচটি বা সকলগুলিতে মিলিয়া যাহা লাভ হইতে পারে, তাহাকে স্বরাজ বলিব কেন?

আর এ সামান্য প্রশ্নটা লোকের মনে উঠিল না এইজন্য, যে, তাঁহাদের অনেকেই স্বরাজ বস্তুটা যে কি, ইহা তলাইয়া বুঝিতে ও ধরিতে চেষ্টা করেন নাই। সাধ্য-নির্ণয় হইলে পরে, লোকে স্বভাবতঃই সাধনার সফলতা বা নিষ্ফলতার সম্ভাবনা বিচার করিয়া থাকে। বিচার করিবার অধিকার, তখন তাহাদের জন্মে। যেখানে সাধ্য নির্ণয় হয় নাই, সেখানে লোকে সাধনার বিচার করিবে কি করিয়া, তাহা জানে না ও বুঝিতে পারে না। এখানে চোখ বুজিয়া চলা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে এটি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মপথে যাঁরা একটা নিরবচ্ছিন্ন আরাম, আনন্দ বা শান্তির অন্বেষণে ছুটিয়া হায়রাণ হয়েন, তাঁদের জীবনে এরূপ প্রায়ই ঘটে যে, তাঁরা, প্রাণের জ্বালায়, যে-যা-বলে তাহাই করিতে যান্। ইহাঁদের প্রাণের জ্বালাটা, অনুভবের বস্তু বলিয়া, সত্য। এই জ্বালা নিবারণের ইচ্ছাটা, স্বাভাবিক বলিয়া, অত্যন্ত আন্তরিক সন্দেহ নাই। কিন্তু তারপরে যাহা কিছু সকলই অবধৌতিক। সকলই হাতুড়িয়া; অন্ধকারে ঢিলছুড়া। দশটার মধ্যে কখনও বা, আকস্মিক ঘটনাযোগে, একটা লাগিয়া যায়; অধিকাংশ

সময়, কোনটাই বা লাগে না। তবু যে ইহাঁরা যা-শুনেন্ তাই ধরিতে যান, ইহার অর্থ এই যে, ইহাঁদের প্রাণের জ্বালা বড় বেশী। অত জ্বালা-যন্ত্রণার মাঝখানে কোন্ উপায়টাতে আরামের সম্ভাবনা কতটা, এ সকল বিচারের অবসর ও শক্তি তাঁহাদের থাকে না।

আমাদের বর্ত্তমান "স্বদেশী" বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও তাহাই ঘটিতেছে। লোকের জ্বালা বড় বেশী। অত জ্বালা-যন্ত্রণার মাঝখানে, তাহাদের বিচার-যুক্তি করিবার অবস্থাও নয়, অবসরও নাই, প্রবৃত্তিরও অভাব সুতরাং, যাহা বলা যায়, তাঁহারা তাই করিতে প্রস্তুত। ত্রিতাপ-জ্বালায় ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি যেমন অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠেন; দেশের জনসাধারণে সেইরূপ নানা দুঃখকষ্টে অধীর ও হতাশ হইয়া, অত্যন্ত শ্রদ্ধালু হইয়া উঠিয়াছেন।

এ অবস্থাটা বড় ভাল। কিন্তু দেশের লোকে যে পরিমাণে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছেন এবং অবিচারে "নেতৃবর্গের" নির্দ্দেশ নিষ্ঠা-সহকারে অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই পরিমাণে এই সকল নেতার দায়িত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। যে, বিচার-বিবেচনা না করিয়া, কোনও দিন আমার উপদেশ বা অনুরোধ গ্রহণ করিবে না, জানি, তাহাকে মনে যখন যে খেয়াল আসে, তাহাই বলিতে পারি। আমি যেটা নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়া কষিয়া দিলাম না বা দিতে পারিলাম না, জানি যে, সে তাহা তাহার নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়া খুব করিয়া কষিয়া লইবে। যাহা সত্য, যাহা সম্ভব, যাহা সঙ্গত, তাহাই গ্রহণ করিবে; যাহা মিথ্যা বা সত্যাভাস মাত্র, যাহা অসম্ভব বা অসঙ্গত, তাহা সে আপনিই ছাঁকিয়া, ছাটিয়া ফেলিয়া দিবে। কিন্তু যে আমার কথা বেদ-বাক্যের মতন মানিয়া চলিবে জানি বা বুঝি, তাহাকে এরূপ খাম-খেয়ালি-ভাবে উপদেশ দেওয়া যায় কি? সে যখন আমার কথা কষিয়া দেখিবে না, তখন তাহাকে সে কথা কহিবার আগে, আমাকে ভাল করিয়া কষিয়া দেখিতে হয়। না করিলে—"অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ"—অন্ধ যেমন অন্ধকে চালায়, আমিও তাহাকে সেই রূপই চালাইব না কি?

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই জন্যই একবার একজন ধর্ম্ম-প্রচারককে কহিয়াছিলেন—"আমার ভুলভ্রান্তি যাই হউক না কেন,—ঈশ্বরের নিকটে সে জন্য আমি তোমা অপেক্ষা কম শাস্তি পাইব। আমি নিজেই কুপথে চলিয়াছি। তোমরা আরও দশজনকে ভুল পথে চালাইতেছ। তাদের দণ্ডের ভাগীও তোমাদের হইতে হইবে।"

২।

নেতারা যাহাই উপদেশ করিতেছেন, সরলপ্রাণ জনসাধারণ বিনা-বিচারে তাহারই অনুসরণ করিতেছেন বলিয়া, নেতৃত্বের দায়িত্ব শতগুণ বাড়িয়া পড়িয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্বের বিপদও ঘনাইয়া আসিতেছে। যদি জনসাধারণে ক্রমে ইহা বুঝেন ও দেখেন যে, তাঁহারা যার জন্য, অমন ভাবে নেতাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া, সর্ব্বস্ব-পণ করিয়া ছুটিয়াছিলেন, তাহা পাওয়া গেল না এবং যখন তাঁহারা এটি বুঝিবেন যে, অজ্ঞতা বা অনবধানতা বশতঃ, নেতৃগণ তাঁহাদের বিপথে বা কুপথে চালাইয়া আনিয়াছেন, তখন, কেবল নেতাদেরই নেতৃত্ব যাইবে, তাহা নহে; যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা এতটা সময়, শক্তি এবং অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহার উপরে পর্য্যন্ত লোকের অবিশ্বাস জন্মিয়া যাইবে। আবার যে সম্বন্ধে

দেশহিত-কল্পে এমনভাবে লোকের সহানুভূতি বা সাহায্য পাওয়া যাইবে, এরূপ সম্ভাবনা থাকিবে না।

সকল সাধনাই যে সিদ্ধিলাভ করে তাহা নহে। আমাদের বর্ত্তমান স্বরাজ-সাধনাই যে আমরা যতটা আশু-সিদ্ধির আশা করিতেছি, ততটা সত্বরে সিদ্ধিলাভ করিবে, ইহা না-ও বা হইতে পারে। সিদ্ধিলাভ যে হবে না, এমন ভাবি না। হবে নিশ্চয়, ইহাই বিশ্বাস করি। এবিশ্বাস না থাকিলে সাধনায় নিষ্ঠা সম্ভবে না। তবুও, সিদ্ধি ত আর আমাদের হাতে নয়। সিদ্ধিদাতা, বিধাতা। তাঁর সকল কামনা ও সকল কর্ম্মই বিশ্বতোমুখী, বিশ্বের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত। তাঁর বিশ্ব-বিধানে যখন যে সাধনার সিদ্ধিলাভ আবশ্যক হয়, তিনি তখনই তাহাকে সিদ্ধিদান করেন। সুতরাং আমি যতটা শীঘ্র, বা যে আকারে আমার ইষ্টলাভ হউক, চাহিতেছি, বা হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে, ততটা সত্বর বা সেই আকারে যে তাহা লাভ হইবেই, এমন কথা একেবারে ঠিক করিয়া বলা যায় কি ? সুতরাং, স্বরাজ-সাধনার সিদ্ধিও বিধাতার হাতে ; আমাদের হাতে নয়। তাঁর ইচ্ছা যখন হইবে, তখনই সিদ্ধি পাইব। এখনই যে পাইব, অমন ত কথা নাই।

কিন্তু সিদ্ধিলাভ হউক বা না হউক, সাধকের শ্রদ্ধা যদি "কোমল" শ্রদ্ধা না হয়—অর্থাৎ, শ্রদ্ধা যদি শাস্ত্র (অর্থাৎ, অতীতের অভিজ্ঞতা) এবং যুক্তি (অর্থাৎ, মানব-চিন্তার নিত্য-সূত্র) সঙ্গত হয়, শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা যদি এই শ্রদ্ধা পরিমার্জ্জিত হইয়া, সাধ্যবস্তু সাধকের অনুভবেতে প্রতিষ্ঠালাভ করে, তাহা হইলে, সিদ্ধিলাভ যতই দূরে যাউক না কেন, সাধন কালে যতই বাধা বিপত্তি উপস্থিত হউক না কেন, তাহাতে শ্রদ্ধাও বিচলিত হয় না, সাধনাও শিথিল হয় না।

কিন্তু সাধক যেখানে যুক্তি-বিচার না করিয়া, কিম্বা যুক্তি-বিচারের অবকাশ না পাইয়া, অথবা যুক্তি-বিচার করিয়া পথ চলিতে গেলে যে কাল-বিলম্ব অনিবার্য্য, কিম্বা শ্রম-স্বীকার আবশ্যক, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, গুরুর অনধিগত-অর্থ উপদেশের অনুসরণ করেন, সেখানে, সম্ভাবিত সিদ্ধিলাভ না হইলে, নিরাশ্বাসের নাস্তিক্য দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়েন। তখন সাধ্য সম্বন্ধে হতাশ্বাস এবং গুরু সম্বন্ধে অনাস্থা জন্মিয়া, তাঁহার সকল সাধনের মূল পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দেয়। আমাদের বর্ত্তমান স্বরাজ-সাধনার গুরুগণ এই মোটা কথাটা কি দেখেন না, বা, ভাবিয়া বুঝিবার অবসর পান না ?

৩।

লোকে একটা কিছু চাহিতেছে। লোকের একটা গভীর, দুর্ব্বিসহ অভাব-বোধ হইতেছে। এই অভাবটা কেবল অন্নবস্ত্রের নয়। অন্নবস্ত্রের অনটন ত আছে-ই ; এ অনটন একেবারে নূতনও নয়। এ অনটন যাদের এখনও শূন্যের কোঠায় গিয়া দাঁড়ায় নাই, তারাও একটা যাতনায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। এই একটা কিছু যে কি, সকলের আগে নিজে ইহা পরিষ্কার করিয়া ধরিতে হইবে ; পরে জনসাধারণকে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া, সাধ্য-বস্তুকে তাহাদের চক্ষের উপরে উজ্জ্বলরূপে ধরিতে হইবে। যতদিন না ইহা হইয়াছে, ততদিন এই স্বরাজ-সাধনা সিদ্ধি-পথে কিছুতেই অগ্রসর হইবে না।

পাঞ্জাবের অত্যাচার, খিলাফতের উপরে অবিচার, এই দুইটি বিষয়ের উপরে আমাদের

বর্ত্তমান আন্দোলনকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা হইয়াছে। মুসলমানেরা খিলাফৎ-সমস্যা সকলে বুঝুন্ আর নাই বুঝুন, তাঁদের ধর্ম্মের উপরে একটা গুরুতর আঘাত পড়িয়াছে, ইহা বুঝেন। এই জন্য অনেক মুসলমান খিলাফতের নামে মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁদের প্রেরণা ধর্ম্মের; স্বাদেশিকতার নহে। একথাটা অস্বীকার করা কঠিন। সুতরাং, মুসলমান-সমাজের সঙ্গে যতই সহানুভূতি করি না কেন, এই প্রেরণার দ্বারা যে আমাদের হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া ভারতের নূতন জাতি গড়িয়া উঠিবে, এমন কল্পনা করা যায় না। সাধারণ লোকে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই এখনও এই নূতন জাতিটা যে কি, ইহার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য কি, ইহা বুঝেন না। সুতরাং, তাঁহারা, স্বরাজটাকে যে কি, ইহাও ভাল করিয়া এখনও ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না।

আর এই স্বাদেশিকতার প্রকৃতি এখনও সকলে বুঝেন নাই বলিয়া, স্বরাজ সম্বন্ধে নানা লোকে নানারূপ কল্পনা করিতেছেন। এমন হিন্দু স্বদেশ-ভক্তের কথা জানি, যাঁহারা সত্যই, ভারতের নূতন যুগে, পুনরায় একটা হিন্দু-রাজ্যের আশায় বসিয়া আছেন। কবে আবার হিন্দুগণ ভারতের একছত্র অধীশ্বর হইবে, ইহাঁরা সেই চিন্তাই করিয়া থাকেন। স্বরাজ বলিতে ইহাঁরা হিন্দুরাজ বুঝেন। এই "স্বরাজ"-রাষ্ট্রপতি হইবেন, হিন্দু। এই স্বরাজ্যে, প্রজা হিন্দু-ধর্ম্ম পালন করিবে। হিন্দু-রাষ্ট্রে, হিন্দু-সম্রাটের অধীনে, পুনরায় ভারতে "সনাতন" বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, হইবে; আবার হিন্দু-আচার প্রবর্ত্তিত হইবে; হিন্দু সাধনার প্রকট-মূর্ত্তি স্বরূপে, ভারতের সমাজ, বিশ্ব-সমাজে আপনার উচ্চ-আসন অধিকার করিয়া বসিবে।

সেইরূপ, এমন মুসলমানও আছেন, যাঁহারা মোস্‌লেম-সমাজের লুপ্ত বৈভব, হৃত-গৌরব, নষ্ট-প্রতাপ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার আশায়, ভারতে পুনরায় মুসলমানের রাষ্ট্রীয়-আধিপত্য দেখিতে চাহেন। ইহাঁরা স্বরাজ বলিতে মুসলমান-রাজ বুঝেন। রুম্ হইতে চীন-সীমান্ত পর্য্যন্ত এখনও মোস্‌লেম-সমাজ বিস্তারিত রহিয়াছে। কিন্তু, এ সকল মোসলেম-রাজ্য দুর্ব্বল ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়া আছে। ভারতবর্ষে যদি আবার একটা মুসলমান প্রভু-শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা হইলে, সমগ্র মোস্‌লেম-সমাজকে সখ্য-বদ্ধ করিয়া, একটা বিরাট সর্ব্ব-মোস্‌লেম-সঙ্ঘ বা pan-Islamic federation গড়িয়া তোলা একেবারে অসাধ্য হইবে না। কিছু দিন হইতে আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্ত মুসলমানদিগের অন্তরে এই ভাবটা জাগিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং, ইহাঁরা যে ভারতে একটা মোস্‌লেম-রাজ প্রতিষ্ঠা হউক, এরূপ ইচ্ছা করিবেন, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। এ সকল মুসলমানই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা মুসলমান আগে, ভারতবাসী পরে—Muslims first, Indians next। অর্থাৎ, মুসলমান-সমাজের সঙ্গে ইহাঁদের সম্বন্ধ, ভারতবর্ষের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, তাহার উপরে। এ সকল কথা আমার কল্পিত নহে। স্বদেশী-আন্দোলনের আরম্ভ হইতেই, ভারতের সর্ব্বত্র এমন বহুতর লোকের সঙ্গে আলাপ, পরিচয় এবং আত্মীয়তা জন্মিয়াছে, যাঁহারা এদেশে আবার একটা হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। ইহা তাঁহাদের নিজেদের মুখেই শুনিয়াছি এবং এই কথা লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে অনেক তর্কবিতর্কও করিয়াছি। আর মুসলমান নেতৃবর্গের কথায় এবং আচরণে, কখনও কখনও বা তাঁহারা প্যান-ইসলামের য আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিয়াছেন, তাহা হইতেও ইহা বুঝিয়াছি যে, তাঁহাদের

সকলের না হউক, অন্ততঃ অনেকেরই ভারতে স্বরাজ্যের লক্ষ্য, ইংরাজ-রাজ্যের স্থলে, আবার একটা মোস্‌লেম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দেখা।

তারপর, হিন্দু-মুসলমানের কথা ছাড়িয়া, দেশে যে সকল দেশীয় রাজা আছেন, তাঁহাদের দিকে চাহিয়াও এ কথা বলা যায় না যে, "হিন্দুমুসলমান মিলিয়া ভারতে যে নূতন জাতি গড়িয়া উঠিতেছে", তাহার প্রকৃতি যাহা, সেই প্রকৃতির অনুযায়ী যেরূপ রাজ, সেই-রূপ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্যই, দেশের এই বর্ত্তমান অশান্তি জাগিয়াছে। এ সকল দেশীয় রাজ্যেও, ইংরাজই প্রকৃত রাজা, দেশীয় রাজারা স্বল্পবিস্তর সাক্ষীগোপাল হইয়া আছেন। স্বরাজ বলিতে ইহাঁরা যদি কিছু বস্তু বুঝেন, তাহা হইলে নিজেদের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছা-তন্ত্র শাসন-শক্তিই বুঝিয়া থাকেন।

সর্ব্বশেষে, ইংরাজ যাহাদের হাত হইতে মোগলের রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া, বর্ত্তমান ব্রিটীশ রাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—পশ্চিমে শিখ ও দক্ষিণে মহারাষ্ট্রা—ইহাঁরাও যে একেবারে সে পূর্ব্ব আশা বিস্মৃত হইয়াছেন, তাহাই বা বলি কি করিয়া? সুযোগ পাইলে যে,ইহাঁরা নিজেদের ভাঙ্গা-স্বপ্ন আবার গড়িয়া উঠুক, ইহা চাহিবেন না, মানব-প্রকৃতির বিচারে এরূপ বলা যায় না।

আর এ সকল দেখিয়া শুনিয়াই, ধাঁধাঁ লাগে, আমরা যে "স্বরাজ" "স্বরাজ" বলিয়া চীৎকার ও আস্ফালন করিতেছি, সে স্বরাজ কার "রাজ"?

সাধ্য নির্ণয় না হইলে, সাধনায় সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা থাকে কি?

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ডাক।

[গান]

আকাশ যে ঐ ডাকে তোরে
শুন্‌লি নে, শুন্‌লি নে!
বাতাস যে ঐ ডাকে তোরে
শুন্‌লি নে, শুন্‌লি নে!

ঐ যে আলো,—সোনার ধারায়
ঐ যে গো ঐ সাঁঝের তারায়
কাঁপিয়ে আকাশ, ডাকে তোরে
শুন্‌লি নে, শুন্‌লি নে!

ঐ যে গো ঐ সাঁঝের ফুলে
সবুজ পাতায়, নদীর কূলে
সুর উঠেছে, দুলে দুলে;
শুন্‌লি নে, শুন্‌লি নে!

সুন্দর ঐ ডাকে তোরে
বিশ্বভুবন ব্যাকুল করে'—
ওরে বধির, মধুর বীণা
শুন্‌লি নে, শুন্‌লি নে!!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

হিমালয়ের ধ্যান।

[শিমলা হইতে সাত মাইল দূরে, পর্ব্বত শৃঙ্গে লিখিত]

ওহে গিরিরাজ! তুমি কি ধ্যানে মগ্ন হয়ে বসে আছ? তোমার এই শীতল নিস্তব্ধ অরণ্যে বসে মনে হচ্ছে, সংসারের গরম বাতাস যেন তোমার প্রাণ স্পর্শ করে না। তোমার ঐ পদতলে প্রশস্ত দেশ 'লু' পবনে ঝল্‌সে যাচ্ছে, ; তুমি ভ্রূক্ষেপেও তার পানে চেয়ে দেখ না। ঐ তেত্রিশ কোটী নরনারী অন্নহীন, বস্ত্রহীন, সুখহীন, শান্তিহীন হয়ে অন্তর্জ্বালায় জ্বলে মরছে; কিন্তু, হে পর্ব্বত, পদের সে জ্বালা তোমার হিম দেহ ছুঁতে পারে না। দাসত্বের কষাঘাতে দেশ জেগে উঠেছে—নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে মানুষের প্রাণ আলোড়িত হচ্ছে। কিন্তু, হে হিমালয়! সে আলোড়ন তোমার প্রাণকে একটু বিচলিত ক'রে তুলতে পাচ্ছে না। তবে, হে পর্ব্বত, সত্য সত্যই কি তুমি পাথরে গড়া? তুমি কি মৃত, জড়? প্রাণহীন, বুকহীন, হৃদয়হীন একটা প্রকাণ্ড স্তূপ-বিশেষ? যদি তুমি তাই, তবে প্রকৃতির সুন্দরতম সাজে কেন সেজে গুজে বসে আছ? কোন্ রাজা তোমার মতন সূর্য্যকরে রঞ্জিত বরফের ঐ সোনার মুকুট পরে সিংহাসনে বসে রাজত্ব করে? কার মাথার উপর অনন্ত প্রসারিত নীলিমার রাজ-ছত্র বিস্তারিত? কার গলায় ঐ মনোহর অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লতার হার? যদি তোমার বুক নাই, তবে তোমার বুকের উপর ঐ অসংখ্য প্রাণভরা তরুরাজি উদ্‌গত হয়ে নির্জ্জনে কেমন করে প্রাণের লীলা দেখাচ্ছে। যদি তুমি পাথর—যদি তোমার মনের ভিতর ভাবের তরঙ্গ খেলে না,—তবে ঐ সাদা রাঙ্গা ফুলগুলো ফুটিয়ে কেন প্রেমের স্ফূর্ত্তি দেখাচ্ছে? হে পর্ব্বত! তুমি কি সত্য সত্যই সহানুভূতি- ও সমবেদনা-হীন, নিরেট পাথরের ঢিবি? যদি তাই হও, তবে তোমার নেত্রে অবিরত ঐ নির্ঝরের জল কেন বহিতেছে? নেত্রনীর করুণার মূর্ত্তি ধরে, গঙ্গা যমুনার অবতার হয়ে, আর্য্যাবর্ত্তে কেন প্রবাহিত হচ্ছে; আমাদের মুখে দুমুঠো অন্ন দিয়ে, এখনও আমাদের প্রাণটাকে হাড়ের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে? কে বলে, তুমি প্রাণ-হীন? কে বলে, তুমি প্রেম-হীন? গঙ্গা যমুনা যার দান, তার কি পাথরের প্রাণ? তুমি দাতা; তোমার দত্ত জল আমাদের দেশ শ্যামল শস্যে পরিপূর্ণ করে। কিন্তু সে শস্য কি আমাদের ভাণ্ডারে থাকে? তা তো সাগরের জলে ভেসে ভেসে বিদেশে যাচ্ছে; আর আমরা বুভুক্ষু, ক্ষুধার জ্বালায়, 'হা অন্ন! হা অন্ন!' করে দ্বারে দ্বারে ফিরছি!

হে রাজন্! তোমার বক্ষে মুখ লুকিয়ে এ অরণ্যে কাঁদিতে এসেছি। এ ক্রন্দন কি তবে অরণ্যের রোদন হবে? ঐ দেখ, সমতল ছেড়ে তোমার এই উচ্চ শৃঙ্গে চড়লাম; কিন্তু দাসত্ব তো ঘুচ্‌ল না! এ পাহাড়ে আমরা কুলি, আমরা বাবুর্চ্চি, আমরা খিদ্‌মদগার। হে পর্ব্বত! হে পর্ব্বত! একবার চক্ষু মেলে দেখ, এ পর্ব্বতে আমাদের স্থান কোথায়? ঐ সুন্দর সুন্দর গৃহগুলিতে কারা বাস করে? আর আমাদের বাসস্থলী কোথায়? ঐ আবর্জ্জনা-পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর নোংরা ক্ষুদ্র কুঠরিগুলিতে। তোমার বুকের উপর আঁকা বাঁকা পথে, কারা বুটাঘাতে পাহাড় বিকম্পিত করে বিচরণ কচ্ছে? আর আমরা তাদের জীব-

কান্তি দেখে, ভয়ে পথ ছেড়ে এক পাশে সরে দাঁড়াচ্ছি? হে পর্ব্বত! তুমি কি আমাদের পাহাড়? তোমার কোন্ পাথরখানাকে আমরা আমাদের বল্‌তে পারি! তোমার কোন্ গাছটার একটা ক্ষুদ্র ডালও নোয়াইয়া, আমরা হাত দিয়ে তার একটা ছোট ফুলও তুলতে পারি? পিপাসার জল, তাও পরের হাতে। আমাদের প্রভুরা জলাধার খুলে এক ফোঁটা জল না দিলে, এ পাহাড়ে আমরা পিপাসায় মরে যাই। সে জল ফোঁটাও বিনা পয়সায় পাবার যো নাই। তবে, হে হিমালয়! আমরা কি তোমার? তুমি কি আমাদের? তোমার বুকে কাঁদিতে এলাম। কিন্তু প্রাণ খুলে, মুখ খুলে, মুক্ত কণ্ঠে কাঁদিবারও অধিকার নাই। ঐ উপরে সাহেবের বাংলো, শব্দ গেলে এখনি বন্দুকের শব্দ হতে পারে। হে পর্ব্বত! যদি তুমি আমাদের নও—যদি তোমার সঙ্গে আমাদের পর পর ভাব, তবে আমাদের দেশের মাথার উপর এত বড় স্থান জুড়ে কেন বসে আছ? এক সময় তুমি প্রাচীরের ন্যায়, দুর্গের ন্যায়, আমাদের রক্ষা করিতে। তোমার সে দুর্গত্ব গত হয়েছে। তবে আমাদের মাথার উপর ভেঙ্গে পড় না কেন? এই হতভাগ্য জাতিকে তোমার পাথরের কবরে চিরতরে কবরিত কর না কেন? আমাদের অস্তিত্বে কি লাভ! অনস্তিত্বই সুখ; অনস্তিত্বই শান্তি!

তোমার এই তপোবন শূন্য পড়ে আছে। এ বনে আর ঋষিগণ তপ করেন না। এ বন এখন শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গীদের 'পিক্‌নিকের' স্থান হয়েছে। ঋষিদের আশ্রম, অতীতের উপকথা হয়ে পড়েছে। সে সকলের স্থলে, হোটেল, থিয়েটার, সিনেমা, নাচ-ঘর বুক ফুলিয়ে বিরাজ কচ্ছে। হে হিমালয়! তুমি পবিত্রতার পুণ্য-তীর্থ ছিলে। সে তীর্থে এখন মেয়ে পুরুষ, নৃত্য-গীতে রাত্রি কাটাচ্ছে। হে হিমালয়! হে পুণ্যালয়! পুণ্য কোথায়? প্রাণ পুণ্য চায়; কিন্তু, হেথায় যে পাপের পিশাচ-মূর্ত্তি! হে হিমালয়! পাথরের বুক খোলো ও এই হতভাগ্য পথ-ভোলা পথিককে ঐ বুকের ভিতর লুকিয়ে রাখ।

> "চাই না সভ্যতা, চাষা হয়ে থাকি,
> দাও ধর্ম্ম-ধন, প্রাণে পূরে রাখি।"

হে ধর্ম্মের আলয়! যে ধ্যানে তুমি মগ্ন, ঐ ধ্যানের একটু আভাষ দাও। তোমার বুকে পিশাচের নৃত্য হইলেও, তুমি তাহা চোখ মেলে দেখ না। হে গিরিবর! তোমার ঐ মহা ধৈর্য্যের এক কণা দান কর। হে ঋষি! তোমার চরণে বসে ধৈর্য্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হ'তে চাই। হে অচল! এই অশান্ত মনটাকে শান্ত করে, তোমার মত অটল কর। তুমি যাঁর দর্শন পেয়ে চুপ করে রূপ দেখ্‌ছ, হে মহারূপিন্! তোমার এই সুন্দর অরণ্যে একবার তাঁর রূপে মুগ্ধ কর।

যওষধিষু যো বনস্পতিষু

আজ এই অসংখ্য বনস্পতির অন্তরালে কে তুমি লুকিয়ে আছ, একবার তোমার অনন্ত রূপ দেখাও। এ সান্ত প্রাণ অনন্তে ডুবে যাক্। হিমালয়ের গাছ, হিমালয়ের পাথর পর্য্যন্ত অনন্তের ধ্যান কচ্ছে; তারা ভাষাহীন ভাষায় অনন্তের সুসমাচার প্রচার কচ্ছে। হে ক্ষুদ্র

প্রাণ! তুমি কেন ঐ অনন্তে ডুবে যাও না? দেশের প্রাণ অশান্ত—দেশের প্রাণ উদ্বেলিত। দেশ কি চায়, পায় না?

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি

দাস হই, গোলাম হই, গরীব হই, ভূমা ভারতের সম্পত্তি। এই হিমালয়ের অরণ্যে সেই ভূমা, ভূমা মূর্ত্তিতে স্ফূর্ত্তিমান্। ওরে তপ্ত প্রাণ! ঐ ভূমার ধ্যান কর। ওহে দেশবাসী নরনারীগণ! তোমরা ঐ ভূমার ধ্যান কর। ভারতের শীর্ষে হিমালয় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ কচ্ছে, ভূমা-মন্ত্রে দীক্ষিত হও। নাল্পে সুখমস্তি। কেন বৃথা চেঁচামেচি? শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

দীন-উপায়ন।

[দেশ-বন্ধু চিত্ত-দম্পতির করকমলে]

শক্তিসহ, শক্তিমন্ত, দাঁড়াও সম্মুখে!
ছিলে তুমি ব্যবহার-তত্ত্ব শিরোমণি—
উঠেছিলে বৈবয়িক শৈল শির' পরে।
লালু, মনু, উমেশের প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে;
দম্ভের মণিময়মালা খচিত মুকুট
ছিল শীর্ষ অলঙ্কার; আমিত্ব তোমার
জগতেরে দেখাইত আত্ম-গরিমায়।
নারদের বীণাচোরা, গুর্জ্জর ভূষণ
কি রাগিনী আলাপি!— খসিল মুকুট—
খসিল সে গরবের গৌরবের মণি,
আত্ম-অনুরক্তি হল শতধা চূর্ণিত,
পর্য্যুসিত হল দম্ভ বৈষ্ণব বিনয়ে!
পরাইল দিব্যাঞ্জন নবীন গৌতম
তাই আজি দেখিতেছ, দিব্য আঁখি মেলি,
জল নয়—জল নয়—ও যে মরীচিকা!
ও নহে মঙ্গল-রাখি—সাপের বন্ধন,
ও নহে জীবনী-শক্তি নেশার আবেশ!
জাগাও, প্রবুদ্ধ কর, হে ত্যাগী মহান্,
বন্ধন মোচন কর, দেও সান্দ্র প্রাণ
পরমুখাপেক্ষী আজি ভারত-সন্তান।

হরিয়াছে তস্করতা শিল্পির তুলিকা,
পণ্য বিথিকায় নাই স্বদেশ-গরিমা,
রক্তে মাংসে বিজড়িত—দাসত্ব জড়িমা,
আর্জ্জব নাহিক প্রাণে, সত্যে নিষ্ঠা নাই,
পৌরুষের মেরুদণ্ড—বেদের প্রণব
উচ্চারিয়া কা'র আর শিহরে বিগ্রহ?
কি দিয়াছে—কি দিয়াছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা?
বিলাসেতে প্রবণতা, ব্যক্তিত্বে সংশয়,
রক্ত-পিপাসুর পদ করিতে ক্ষালন
অর্দ্ধ-ভুক্ত কৃষকের শ্রম-জল দিয়া।
অস্ত্র-শূন্য গৃহস্থলী—পাছে পশু-বল
পশ্চিমের মত উঠে করিয়া গর্জ্জন
মাখিতে পরের রক্ত, করিতে লুণ্ঠন
ধর্ম্ম-ধ্বজী শাসকের—ন্যায়ের মন্দির।
এসো কর্ম্মি, এসো ত্যাগী, নিত্যানন্দ-প্রাণ,
দেও ঢেলে মা'র ভক্তি—উঠুক্ জাগিয়া
মোহ মদিরায় যারা আছে অচেতন।
ওই শোন, দূরে বাজে নারদের বীণা;
সত্য আজ অনৃতের ছিড়িয়া কর্পট,
আপনায় জ্যোতি লয়ে হবে বহির্গত।

বাহুগ্রস্ত শশিবৎ ওই অত্যাচার
হয়েছে পাণ্ডুর কায়—নিষ্প্রভা-মণ্ডিত।
নহেক ভারত-ভূমি শৌণ্ডিক-আলয়—
নহে ইহা বিলাসের রম্য উপবন,
আত্ম-সুখ-স্পৃহা হেথা করে না অটন—
যুবতীর যৌবনের রূপ পরখিয়া।
এখনো সে সাম-গাথা, ঋষির ওঁঙ্কার
শ্রুতিমূলে প্রবেশিয়া রচে বিচিত্রতা।

প্রতিবেশী হজরৎ মেকনের বাণী
এখনো প্রত্যুষে নিতু রণিয়া রণিয়া
মোস্‌লেম ভ্রাতৃবর্গে করে ধর্ম্ম-প্রাণ।
হে অতিথি, কর্ম্মী তুমি,—নর-কহিনুর,
ভক্তি পুষ্পে যতি, তোমা করি বিশোভিত
জাগাইয়া দেও, দেব! নিদ্রিত ভারত।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮]

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

শিব-শক্তি ও গায়ত্রী

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের যাহারা দ্বিজ এবং সনাতন-ধর্ম্মে বিশ্বাস রাখেন, তাঁহারা সকলেই শাক্ত, অর্থাৎ, শক্তির উপাসক। তাঁহাদের যখন উপনয়ন হয়, তখন তাঁহাদের পুনর্ব্বার জন্ম আমরা স্বীকার করি; সেই জন্যই তাহারা দ্বিজ। তখনই তাহাদের সাধনার প্রারম্ভ; ইংরাজী কথায়—spiritual birth. সেই সাধনার মূল-মন্ত্র, গায়ত্রী। গায়ত্রী ত্রিধা। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মাণী, তিনি সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার শক্তি। তিনি বিষ্ণু-শক্তি, জগৎ-পালক বিষ্ণুর শক্তি। তিনি রুদ্রানী, সংহার-কর্ত্তা রুদ্রের শক্তি। এই তিন শক্তির যাঁহারা সাধনা করেন, তাঁহারা দ্বিজ; এবং শক্তি-উপাসক বলিয়া, তাঁহারা শাক্ত।

এখন দেখা যাক, তাহাদের উপাসনাই বা কি এবং গায়ত্রী-মন্ত্রের বাচ্য-শক্তি এবং বাচক-শক্তিই বা কি? মন্ত্র-বিদ্যা সম্বন্ধে বিশদভাবে বলিবার সময় অদ্য হইবে না। তথাপি গায়ত্রী-মন্ত্রটার কি উদ্দেশ্য, এবং তৎ-সাধনার কি ফল, সেটা স্বল্পতঃ বলা, মন্ত্র-বিদ্যার উপক্রমণিকা বলিয়া গ্রহণ করিলে বাধিত হইবে। যাহাতে আমরা বাহ্য-জগত অথবা সংসার বলি, তাহাতে আমরা কি দেখিতে পাই?—জন্ম, স্থিতি, প্রলয়। এই জন্ম স্থিতি প্রলয় অনুক্ষণ হইতেছে। ইহারই ধারাকে আমরা সংসার বলি। গচ্ছতীতি জগৎ, সংসরতীতি সংসারঃ।

যেমন বাহ্য জগতে জন্ম-স্থিতি-প্রলয়, সেই প্রকার অনুক্ষণ অন্তর্জগতেও জন্ম-স্থিতি-প্রলয় ঘটিতেছে। এই অন্তর্জগতের, জন্মের বাচক, 'অা'কার। এই অন্তর্জগতের স্থিতি-বাচক হইতেছে, 'ই'-কার। এই অন্তর্জগতের লয়-বাচক হইতেছে, 'উ'-কার। ইংরাজীভাষায়, life, whether external or internal, is a series of pulsation। পণ্ডিত হাক্‌সলি সাহেব সেইজন্য বলিয়াছেন,—'Life is pulsation'। 'অ,' 'ই,' 'উ' তিনই মাতৃকা-শক্তি। 'অ,' জন্মবাচক; 'ই,' স্থিতিবাচক; 'উ,'প্রলয়বাচক। কিন্তু, এই যে জন্মস্থিতিপ্রলয়, যদি একবার জন্ম, সেই জন্ম-গঠিত বস্তুর স্থিতি এবং সেই বস্তুর প্রলয় হইত, এবং পুনরায় জন্মস্থিতিপ্রলয় না হইত, তাহা হইলে 'অ,' 'ই,' 'উ' পূর্ণরূপে জগৎ-বাচক হইতে পারিত। কিন্তু আমরা

প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, এই জন্ম স্থিতি প্রলয় পুনঃ পুনঃ হইতেছে। অতএব এই তিনকে একত্র করা আবশ্যক। এই তিনকে একত্র করিলে, 'ও'কার পাইলাম। কিন্তু এখনও বাহ্যজগৎ কি অন্তর্জ্জগৎ পরিপূর্ণ করিতে পারি নাই। সেই পরিপূর্ত্তির জন্য, নাদ-বিন্দুর আবশ্যক। এই নাদ-বিন্দু 'ও'-কারে যুক্ত হইলে, 'ওঁ'কার পাইলাম। ইহাই দ্বিজদিগের প্রণব। এই প্রণব, ব্রহ্মের প্রতীক। এই প্রণব, ব্রহ্ম-বাচক। এই প্রণব ব্রহ্মোপাসনার মূল-মন্ত্র। সেই জন্য শ্রুতিতে কথিত আছে,—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম॥

আমাদের মন্ত্র, মন্ত্রণার জন্য, চিন্তার জন্য; অল্প কথায়, বহু বিষয় চিন্তা করিবার সঙ্কেত। যেমন, 'মাধ্যাকর্ষণী-শক্তি' কথাটি, সেই শক্তির বহুক্রিয়ার বাচক, সেই প্রকার মন্ত্র, বহু বিষয়ের বাচক, পরিচায়ক, চিন্তার আধার।

এখন দেখা যাক্, গায়ত্রী মন্ত্র কি বস্তুর বাচক। সেই মহা-মন্ত্র ত' সকল দ্বিজই জানেন। সেটী এই—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ॥

এই মন্ত্র কি বলিতেছে এখন দেখা যাক। ইহার প্রথমেই প্রণব। সেই প্রণব পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্ম-বাচক; in which everything lives and moves and has its being. তারপর, ভূ ভুর্বঃ স্বঃ; অর্থাৎ, ভূলোক; ভুবর্লোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষ; এবং স্বরলোক অর্থাৎ স্বর্গলোক। এখন এই 'লোক' কথাটীর অর্থ বোঝা প্রয়োজন। এটা কোন বিশেষ স্থান নহে; এটা অবস্থার পরিচায়ক। অর্থাৎ, stage of existence of manifestation। মন্ত্রেতে তিনটী লোকের কথা বলিলেন বটে; সেই তিনটী লোক কিন্তু উপলক্ষণ মাত্র। এই তিনটী হইতে বুঝিতে হইবে, সকল 'লোকে'র-ই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে এবং তাহাদেরই চিন্তা করিতে হইবে। বিশেষতঃ, সপ্তলোকের কথা চিন্তা করিতে হইবে। সেই সপ্ত-'লোক' কোথায় পাইতেছি? সে সপ্তলোক গায়ত্রীর ব্যাহৃতিতে পাইতেছি। তদ্‌যথা—ওঁঃ ভূঃ, ওঁ ভুর্বঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং। এই সপ্ত-লোক সপ্তাবস্থার পরিচায়ক। ইহার সঙ্গে পঞ্চ কোষের যে সম্বন্ধ, সেটা লিখিবার সময় হইবে না; পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। তাহা হইলে হইল এই, প্রথমত ব্রহ্মের চিন্তা; তৎপরে সপ্তলোকের চিন্তা। সেই সপ্ত-লোক কোথা হইতে আসিল? তাহারা ব্রহ্ম হইতে প্রসূত হইল। তাহারা ব্রহ্ম-শক্তি হইতে উদ্ভূত। সেই জন্য, 'তৎসবিতুঃ' অর্থাৎ সেই সপ্তলোকের প্রসব কারণের। আর সেই প্রসব কারণটি কিপ্রকার?—সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যশালী। তাঁহার 'বরেণ্যং' (পূজনীয়ং) পূজার জন্য, 'দেবস্য', 'ভর্গঃ,' (তেজঃ, শক্তিঃ) 'ধীমহি,' (চিন্তয়াম), আমরা চিন্তা করিতেছি, ধ্যান করিতেছি; যে ভর্গঃ, 'নঃ' (অস্মাকং) 'ধিয়োয়ঃ' (বুদ্ধীঃ) 'প্রচোদয়াৎ' (প্রেরয়েৎ)—যে শক্তি আমাদিগকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে আমাদিগকে অনুযুক্ত

করিতেছেন। সর্ব্বলোক-প্রসবিতা, সর্ব্বব্যাপী, সেই পূর্ণ-মঙ্গল পরম দেবতার জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। এখনও কিন্তু গায়ত্রী সম্পূর্ণ হইল না। পুনর্ব্বার প্রণব উচ্চারণ করিতে হইবে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যখন মোক্ষ হইবে, তখন আবার সেই ব্রহ্মেই লীন হইতে হইবে। অতএব, সোজা কথায়,—সেই জগৎকর্ত্তা, জগৎপাতা, জগৎসংহর্ত্তা, যাঁহা হইতে সমস্ত লোক উদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহার মহাশক্তি আমরা চিন্তা করিতেছি। সেই মহাশক্তি আমাদিগকে সম্যক অনুভূতি দিবেন, যাহাতে আবার সেই শান্তিময় নিকেতনে, ব্রহ্মেতে পুনরায় লীন হইতে পারি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গায়ত্রী, ব্রহ্মার শক্তি, বিষ্ণুর শক্তি এবং রুদ্রের শক্তি। তাহার উদ্দেশ্য এই, আমাদের ত্রি-সন্ধ্যায়, সময় অনুসারে, প্রাতঃকালে তিনি ব্রহ্মাণী, মধ্যাহ্নে বিষ্ণুশক্তি এবং সায়াহ্নে তিনি রুদ্রাণী। প্রাতঃকালে, জগতের সৃষ্টি বিষয়েই বিশেষ চিন্তা। মধ্যাহ্নে, জগতের পালন বিষয়েই বিশেষ চিন্তা। এবং সায়াহ্নে, নাশ সম্বন্ধেই বিশেষ চিন্তা।

অতএব, দ্বিজমাত্রই, জন্মতঃ, শক্তির উপাসক, শাক্ত।

শ্রীব্যোমকেশ শর্ম্মা-চক্রবর্ত্তী।

ভূদেব স্মৃতি-পূজা।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয়কে আমি ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া মনে করি। ইহাতে মতভেদ থাকিতে পারে। কেন না, 'ভিন্ন রুচি হিলোকঃ'। তবে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী স্বীয় সমাজ-বৎসল দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই আশা করি আমার সঙ্গে এক মতাবলম্বী হইবেন। আকৃতি প্রকৃতিতে, কাজে কর্ম্মে, সমস্ত বিষয়েই তিনি অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। ভূদেব বাবু দেখিতে এক জন অতি 'সুপুরুষ' ছিলেন। তাঁহার শরীরের গঠন সৌষ্ঠব এবং বল-বত্তা দেখিয়া তাঁহার এক জন সহপাঠী নাকি বলিয়াছিলেন—'ভাই, তোমার শরীরটী দেখিলে আমার হিংসা হয়।' উত্তরে ভূদেব বলিয়াছিলেন—'এই প্রশংসাটুকুতে আমার কিছুই দাবী নাই; ইহাতে আমার জনক জননীরই প্রশংসা করা হইল। তুমি এই কথাতেই, তাঁহারা যে সদাচার-সম্পন্ন ছিলেন, ইহা প্রমাণ করিলে। কেন না "আচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ"—মাতা পিতা সদাচার পালন করিলেই, অভিপ্সিত সন্তান সন্ততি জন্মিয়া থাকে।" বস্তুতঃই, তাঁহার জনক ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় এক জন ঋষি-কল্প ব্যক্তি ছিলেন; যেমন পণ্ডিত, তেমন বিচক্ষণ ছিলেন। "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্য-লক্ষণম্"। বাঙ্গালাতেও বলে, স্ত্রী পুত্র জল, তিনই কর্ম্মের ফল। তাঁহারই তপস্যার ফলে, ভূদেবের ন্যায় পুত্ররত্ন লাভ হইয়াছিল। এদিকে, ভূদেবও ভাগ্যবান্, যে এইরূপ পিতা পাইয়াছিলেন—শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে। ফলতঃ, সৎ পিতা ও সৎ পুত্র, উভয়েরই পরস্পরের সুকৃতির পরিণাম।

ভূদেবের পিতৃদেবের বিচক্ষণতা সম্বন্ধে একটি কাহিনী বলিব। ইহাতে আমরাও কিঞ্চিৎ

শিক্ষা-লাভ করিব। সকলেই বোধ হয় জানেন যে, হিন্দু কলেজের প্রথম অবস্থায়, যখন ছাত্রেরা ইংরেজী শিক্ষা পাইতে আরম্ভ করিল, তখন মদ খাইয়া ও নিষিদ্ধ-মাংস ভোজন করিয়া, ইঁহারা অর্জ্জিত বিদ্যার সার্থকতা প্রদর্শন করিতেন। এইরূপ সামাজিক ব্যভিচার তাঁরা যে চুপে চাপে করিতেন, তা নয়। মদ খাইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া, চীৎকার পূর্ব্বক বলা চাই—'আমি মদ খাইয়াছি'! নিষিদ্ধ-মাংস খাইয়া, হাড়গুলি প্রতিবেশী হিন্দুর বাড়ীতে ফেলা চাই। ইহারই নাম ছিল, সৎ-সাহস। এই সময়েই ধর্ম্ম-বিশ্বাসী, প্রাচীনদের নাম হয়—"ওল্ড্ ফুল্।" সে যাহা হউক; ভূদেবের সহাধ্যায়ীদের মধ্যে কেহই, এই স্রোতের বেগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। পারিয়াছিলেন কেবল তিনিই এবং তাহাও তদীয় পিতৃদেবের বিচক্ষণতার গুণে। সেই কথাটাই বলিতেছি।

ভূদেবের উপর গৃহ-দেবতার সায়ন্তন আরতির ভার ছিল। তিনি তাহা করেন নাই। পিতা রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া, আরতি হয় নাই জানিয়া, স্বয়ং তাহা করিলেন। সেই রাত্রিতে কিছুই না বলিয়া, পরদিন পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে ঠাকুরের আরতি হয় নাই কেন?" পুত্র উত্তর করিলেন "উহা পৌত্তলিকতা।" ঐরূপ অপ্রত্যাশিত উত্তরেও, পিতা পুত্রকে কোনও রূপ তিরস্কার করিলেন না। কেবল বলিলেন, "বিশ্বাস না হয় করিও না; ভক্তি ব্যতীত, অশুচি মনে, ঠাকুর ঘরে যাইতে নাই; তুমি আরতি না করিয়া ভালই করিয়াছ। ঠাকুর দেবতার সঙ্গে কপটতা চলে না। এরূপ মন কিন্তু তোমার বেশীদিন থাকিবে না।" অতঃপর পিতা ব্যবস্থা করিলেন, ভোরে উঠিয়া পিতা পুত্রে গঙ্গা-স্নানে যাইবেন; রাস্তায় কথা-বার্ত্তা চলিবে।

পুত্র ভাবিয়াছিলেন, নূতন মতের জন্য উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়; তাহার জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। দেখিলেন, ওরূপ কোনও কিছুই হইল না। পুত্রের মনে কথাটা লাগিয়া গেল—"বিশ্বাস না হইলে, করিও না"। এরূপ উদার কথা তো মিসনারীরাও বলেন না। ঋষি-কল্প অগাধ শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন পিতা, এমন উদারমতি হইয়াও, দেবদেবীর অর্চ্চনা, ভক্তি সহকারে সর্ব্বদা করিয়া থাকেন। স্ব-ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে, এরূপ পিতার মনে আঘাত দেওয়া হইবে। এই ভাবিতে ভাবিতে পুত্রের চক্ষে জল আসিল। তখন সেণ্ট্ পলের উক্তি স্মরণ হইল—"পিতা মাতার উদ্ধার-সাধনের জন্য আমি নরকে যাইতেও প্রস্তুত আছি।"

যাহা হউক, পরদিন হইতে নিয়মিত গঙ্গাস্নান আরম্ভ হইল। পিতাপুত্রে নানা বিষয় কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ধর্ম্ম-বিষয় কোনও কথাই হইত না। এইরূপ কিছুদিন গত হইলে পর, এক দিন পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কৃষ্ণ বন্দ্যো'র (রেভারেণ্ড কে, এম, ব্যানার্জি) সঙ্গে একত্র বসিয়া অখাদ্য খাইয়াছ, লোকে বলিতেছে; একথা কি সত্য!" দেখুন পিতা কত বড় অপবাদটা এতদিন চাপিয়া রাখিয়াছিলেন! পুত্র উত্তর করিলেন—"না আমি খাই নাই; যে খাদ্য আপনার সম্মুখে বসিয়া খাইতে পারিব না, আমি তাহা কদাপি খাইব না।" এই হইয়া গেল; গঙ্গা-স্নান মাহাত্ম্যে তথা সৎ পিতার বিচক্ষণতায়, ভূদেবের বিকার কাটিয়া গেল। আমরা আজ 'পুষ্পাঞ্জলি'

'পারিবারিক প্রবন্ধ, 'আচার প্রবন্ধ,' 'সামাজিক প্রবন্ধ,' 'বিবিধ প্রবন্ধ,' ইত্যাদি পাইলাম। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ 'বিশ্বনাথ বৃত্তি', 'ভূদেব-বৃত্তি' পাইলেন।

একটি বিপরীত দৃষ্টান্ত না দিলে, এই ব্যাপারের গুরুত্ব বোঝা যাইবে না। এখানেও, পিতা, সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ; পুত্র, ইংরেজিতে কৃত-বিদ্য হইতেছেন। পিতা শুনিলেন, পুত্রের ধর্ম্মালোচনার দিকে ঝোঁক হইয়াছে এবং সংস্কারক-দলের লোকদের সঙ্গে মেলা-মেশা হইতেছে। তখন পুত্রের নিকটে পিতা, সংস্কৃত নাস্তিক দর্শনের রীতি অবলম্বনে, নাস্তিকতা প্রচার করিয়া বলিয়াছিলেন,—বিদ্যাসাগর মহাশয় আস্তিক নহেন, 'ইত্যাদি'। বুদ্ধিমান্ পুত্রের নিকটে ইহার ফল যাহা হইল, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি পিতা এবং পৈত্রিক ধর্ম্মশাস্ত্র, উভয়েরই উপর বীতশ্রদ্ধ হইলেন। মার্কিন পণ্ডিত থিয়োডোর পার্কারের ভক্ত হইয়া পড়িলেন এবং ব্রাহ্মসমাজে আগ্রহে যোগদান করিলেন। অতপর, পুত্র বাড়ীতে আসিলেন, আর ঠাকুর-পূজা করিব না, এই দৃঢ় সংকল্প লইয়া। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া, ঠাকুর ঘরে পাঠাইবার জন্য লাঠি ধরিলেন। পুত্র অটল রহিলেন। অবশেষে, পিতাই হার মানিলেন; পুত্রকে আর কদাপি ঠাকুর পূজা করিতে হইল না।

এই পুত্রই সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়। এই বিবরণ তদীয় 'আত্মচরিত' হইতে সংগৃহীত। আমরা যে পণ্ডিত শিবনাথকে হারাইলাম, কেবল তাহাই নহে; পণ্ডিত শিবনাথ ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া, সনাতন ধর্ম্ম ও সমাজের, মূর্ত্তিপূজা, বর্ণ-বিচার, ইত্যাদি ব্যাপারের ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'যুগান্তর' উপন্যাসে একটি আদর্শ ব্রাহ্মণ পরিবারের অতি সুন্দর চিত্র রহিয়াছে; ঐ পরিবারের কর্ত্তার নাম 'বিশ্বনাথ তর্কভূষণ'।

এই পিতা-পুত্র-সংবাদ একটু ইচ্ছা করিয়াই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইল। আজ আমাদের অনেকের গৃহেই পিতা পুত্রে বিসংবাদের কারণ ঘটিয়াছে। ছেলেরা উপদেশ পাইতেছে, ষোল বৎসর বয়সের অধিক হইলেই, আর পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকের অপেক্ষা করিবে না। আপন বিবেক-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়াই চলিবে। হে ভূদেব, স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ কর, যেন, আমাদের এই সমাজ, তোমার আদর্শ ও উপদেশ অনুসারে কল্যাণের পথে পরিচালিত হয়।

ভূদেবের মাতাঠাকুরাণীও পরমাসাধ্বী ছিলেন। একদিন ছেলে পিতার পাদুকা পায়ে দিয়াছিল। মাতা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ওরে করেছিস্ কি? এতে যে অধর্ম্ম ও অকল্যাণ হইবে।" তিনি স্বয়ং পতির উদ্দেশে বারংবার প্রণাম করিলেন এবং ঐ পাদুকা পুত্রকে মাথায় করিয়া বহাইয়া অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন! সাধে কি ভূদেব এমন পিতৃমাতৃ ভক্ত হইয়াছিলেন।

বিদ্যা বিষয়েও ভূদেব ছাত্রাবস্থায়ই সমপাঠীদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। যখন শিক্ষকতা করেন, তখন তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক রূপে সমাদৃত হইয়াছিলেন। অনেকে সুবহু বিদ্যার্জ্জন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ঐ বিদ্যার ফল লোক-সাধারণের ভোগে আসে না। যদি শিক্ষকতাও করেন, তথাপি, স্বীয় ছাত্র ভিন্ন, অপরে তাঁহাদের কাছে কোনও উপকার প্রাপ্ত হন না। ভূদেব যেমন স্বোপার্জ্জিত প্রভূত

ধন পরোপকারার্থে নিয়োগ করিয়াছেন, সেইরূপ অগাধ বিদ্যাও সাধারণের উপকারার্থে প্রচারিত করিয়াছেন। তাহার অক্লান্ত লেখনী বঙ্গভাষায় অনেক অভাব পূরণ করিয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাস, পুরাবৃত্ত সার (অর্থাৎ প্রাচীন মিসর, গ্রীস্, ইত্যাদির ইতিবৃত্ত) শিক্ষা-বিষয়ের প্রস্তাব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রভৃতি শ্রেণীর গ্রন্থ। তাঁহার পারিবারিক, সামাজিক, আচার, প্রবন্ধাবলী, পুষ্পাঞ্জলি, স্বপ্ন-লব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থরাজি বাস্তবিকই অমূল্য। প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য পাঠ্য। পাশ্চাত্য-মোহ-ক্লিষ্ট হিন্দুর পক্ষে এগুলি ভেষজ-স্বরূপ। সাহিত্যের হিসাবেও এগুলি এত উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থাবলী যে, যখন সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে কতিপয় সাহিত্যসেবী গিয়া, তাঁহাকে পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণার্থে অনুরোধ করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"ভূদেব বাবু জীবিত থাকিতে, আমি এই পদ গ্রহণ করিতে পারিব না।"

সাংসারিক পদ পদার্থ সম্বন্ধেও তিনি পরম সৌভাগ্যবান্ ছিলেন। ৫০৲ টাকা বেতনে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় দ্বিতীয় শিক্ষক রূপে সরকারী কার্য্য প্রবেশ লাভ করেন। আর যখন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন তিনি ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারী; বেতন ১৫০০৲ টাকা। তখন ক্রফ্‌ট্ সাহেব ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি তিন মাসের বিদায় জন্য আবেদন করিলে, গবর্ণমেণ্ট ভূদেব বাবুকেই উক্ত পদে একটিনির জন্য মনোনীত করেন। সাহেব মহলে—অর্থাৎ ইউরোপীয় ইন্‌স্পেক্টার, প্রিনসিপাল্, প্রফেসারগণের মধ্যে—হুলস্থূল পড়িয়া যায়। তাঁহারা কোনও ক্রমেই ক্রফ্‌ট্ সাহেবকে সেবার বিদায়ে যাইতে দিলেন না।

এত উচ্চপদস্থ হইয়াও, তিনি সাহেব সুবার সঙ্গেই 'খানা খাওয়া' দূরে থাকুক, ইংরেজী কায়দায় পোষাকও পরিতেন না। অথচ, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি, বিচার শক্তি প্রভৃতির দ্বারা, ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ সতত সন্তুষ্ট ছিলেন। শুনিয়াছি, ক্রফ্‌ট্ সাহেব, তাঁহার পরামর্শ না নিয়া, কোনও কাজই করিতেন না। বড় বড় সুকঠিন রিপোর্ট, তাঁহার দ্বারাই লিখিত হইত। এদিকে দেশের উপকারের কোনও সূত্র পাইলে, ভূদেব তাহা কদাপি পরিহার করেন নাই। বিহারে আরবি অক্ষরে উর্দ্দূর প্রচলন ছিল। তাঁহারই প্রযত্নে ঐ প্রদেশে কায়েথি অক্ষরে হিন্দীর প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এ ছাড়া, তিনি অনেক নূতন পুস্তক হিন্দীতে প্রণয়ন করাইয়া, হিন্দী-সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ বিহার-বাসিগণ তাঁহার স্মৃতি-কল্পে "ভূদেব হিন্দী মেডেল্ ফণ্ড্" সংস্থাপন করিয়াছেন। যে ছাত্র মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় হিন্দী-রচনায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে, তাহাকে একটি রৌপ্য পদক এবং হিন্দী পুস্তক পুরস্কার-স্বরূপ প্রদান করা হয়।

তিনি কতদূর ভবিষ্যদ্দর্শী ছিলেন তাহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

এই হিন্দীভাষা সম্বন্ধেই তিনি বলিয়াছিলেন—"ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশ-ব্যাপক। অতএব, অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই, কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎকালে,

সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।" সামাজিক প্রবন্ধ, ভবিষ্যৎ বিচার, ভারতবর্ষের কথা, ভাষা বিষয়ে; ২২৫ পৃষ্ঠা। হিন্দু মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ইংলণ্ডেও যেমন, ধর্ম্মভেদ জাতীয় ভাবের ব্যাঘাত করিতেছে না, ভারতবর্ষেও সেইরূপ হইয়া আসিতেছে। এখানকারও হিন্দু এবং মুসলমান ক্রমে ক্রমে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে এক মত হইয়া মিলিবে।" সামাজিক প্রবন্ধ, জাতীয় ভাব, ভারতবর্ষে মুসলমান; ১৩ পৃষ্ঠা।

আজ দেশে যে একটি নূতন ভাবের কথা শুনা যাইতেছে, নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলিতে যেন তাহারই পূর্ব্বভাস দৃষ্ট হইতেছে—"শাস্ত্রে বলে, পৃথিবী নাগরাজ বাসুকির শিরোদেশে এবং বাসুকি স্বয়ং কূর্ম্মপৃষ্ঠে অবস্থিত। কূর্ম্মের প্রকৃতি কি! কূর্ম্মের প্রতি কোনও রূপ অত্যাচার করিলে, কূর্ম্ম অপর কোনও প্রতিকার চেষ্টা করে না। আপন মুখভাগ ও হস্তপদাদি সঙ্কুচিত করিয়া লয়, এবং নিজ আভ্যন্তরিক অপরিসীম ধৈর্য্যের প্রতি অবলম্ব করিয়া থাকে। কূর্ম্মই সহ্য। অতএব সহ্য ভ্রষ্ট হইও না। কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে অপসৃত হইও না। অপসৃত হইলে, একেবারে রসাতল দেখিবে। অর্থাভাব জন্য কষ্ট হইয়াছে! আরও হইবার উপক্রম হইয়াছে! মনে কর, কিছুকাল অর্থকৃচ্ছ্র বাড়িতেই চলিল। তোমরা কি করিবে? কূর্ম্মের প্রকৃতি ধারণ করিবে। হাত পা মুখ সব ভিতরে টানিয়া লইবে। ভোগসুখলিপ্সায় বিসর্জ্জন দিবে। দেব-সেবা, অতিথি-সেবা পর্য্যন্ত ন্যূন করিয়া ফেলিবে। রাজ-দ্বারে ন্যায়-প্রার্থনা করিতে গিয়া অনর্থ অর্থ-ব্যয় করিবে না। গৃহ-বিচ্ছেদ গৃহেই মিটাইয়া লইবে। এইরূপে বল সঞ্চয় কর। কূর্ম্ম-প্রকৃতিক হও। তোমাদের বল কেমন অধিক, ভক্তি কেমন দৃঢ়, তাহা সপ্রমাণ কর। যে প্রহার করে তাহার বল অধিক, না, যে প্রহার সহ্য করে তাহার বল অধিক। যে সহ্য করিতে পারে তাহারই বল অধিক।"—পুষ্পাঞ্জলি, সঞ্জীবনী-মূর্ত্তি; ৫৮ পৃষ্ঠা।

এই যে আমাদের সম্মুখে তাঁহার প্রতিকৃতি রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই ভূদেবকে একজন ঋষি-কল্প ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। পরন্তু, প্রকৃতভাবে তাঁহার মহত্বের পরিচয় লাভ করিতে হইলে, তদীয় গ্রন্থাবলী পাঠ করা উচিত; প্রত্যেক হিন্দুর নিকটে আমার ইহাই ভূয়োভূয়ঃ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

শ্রীপদ্মনাথ দেব-শর্ম্মা।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮।

স্মৃতির সুরভি (২)।

[১২৮ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি]

একদিন বিকালে আমাদের "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে" বেড়াইতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, ব্যোমকেশ বাবু কি কাজে ব্যস্ত আছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমি আপনার বাড়ীতে বেড়াইতে যাইব। কখন আপনাকে অবসর মত পাওয়া যাইবে, বলুন তো?" তিনি বলিলেন, "ভা'য়া, এই "পরিষৎ-মন্দিরই আমার গৃহ—বৈঠকখানা! সকাল সন্ধ্যা, যখন আপনার ইচ্ছা, এখানেই আসিবেন, তাহা হইলে আমার দেখা পাইবেন।

আর অবসর? সে তো আমার জীবনে নাই!" বাস্তবিক, তাঁহার মত "সাহিত্য-পরিষৎ" কে এমন আপনার করিয়া আর কে লইয়াছিল? তাঁহার মত সমস্ত অবসর সময় এমন করিয়া "পরিষৎ"-সেবায় কে উৎসর্গ করিয়াছিল?

* * *

ময়মনসিংহের "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের" অধিবেশন হইতে, প্রত্যেক বৎসর "সম্মিলনের" সময়, ব্যোমকেশ বাবু আমার কবিতা পাঠের ভার লইয়াছিলেন। এজন্য চুঁচুড়ার অধিবেশনে, তাঁহাকে কিছু বেগও পাইতে হইয়াছিল। "স্মৃতির সুরভি"তে সে অপ্রিয় আলোচনায় আবশ্যক নাই। চট্টগ্রামের "সাহিত্য-সম্মিলনের" পূর্ব্বে তিনি আমাকে একবার লিখিলেন, "ভাই, এবার আপনার দেশে আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিব।" কিন্তু নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে তাঁহার এ ইচ্ছা আর পূর্ণ হইল না। তিনি সে সময়ে অসুস্থ হাওয়াতে, আমার জন্মভূমিতে আমাকে আর আশীর্ব্বাদ করিতে আসিতে পারিলেন না। তথাপি, এ রোগযাতনার মধ্যেও, তিনি আমার কথা ভুলেন নাই। সম্মিলন-ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট তাঁহার একখানা পত্র পাইলাম। তাহাতে লিখিয়াছেন, "আপনার কবিতা পাঠের জন্য আমি নলিনীকে নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইলাম। বিধাতা আমার সাধ পূর্ণ করিলেন না।" কি গভীর মমতা। "সম্মিলনে" তাঁহার অভাব, আমাকে বিশেষভাবে ব্যথা দিল।

* * *

শ্রদ্ধাস্পদ হীরেন্দ্রবাবু ও আমি একদিন জজ্ বরদা বাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তিনি তখন কলিকাতার "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে" পড়িবার জন্য তাঁহার "শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্"-কবিতাটী প্রস্তুত করিতেছিলেন। তিনি আমাদিগকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সেবার "সম্মিলনে" পাঠার্থ আমি যে "মাঙ্গলিক"-নামক একটী কবিতা লিখিয়াছিলাম, তাহার একখণ্ড তাঁহাকে উপহার দিলাম। তিনি আমার কবিতাটী পড়িয়া বলিলেন, "আপনার কবিতা চিরকালই মধুর, সে সম্বন্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু আপনি "সম্মিলনের" সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথকে "মহর্ষি-সন্তান" বলিয়া কবিতার মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি কি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরকে বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, ব্যাস, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির ন্যায় "মহর্ষি" মনে করেন?" আমি বলিলাম, "তাহা নয়। তবে তিনি আমাদের তুলনায় "মহর্ষি" বটেন।" তিনি তখন হাসিমুখে বলিলেন "ঠিক বলিয়াছেন!" তিনি নূতন কোনো কাব্য লিখিতেছেন কিনা, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমি হেমচন্দ্রের বিশেষ ভক্ত। তাঁহার নামে আমি "হৈমী"-নামক একখানি বহি রচনা করিয়াছি। এ বহিখানি এখন প্রেসে গিয়াছে, প্রকাশিত হইলে আপনাকে একখণ্ড পাঠাইয়া দিব।" তারপর একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "এবার 'সাহিত্য-সম্মিলনের' জন্য আমি যে কবিতাটী লিখিয়াছি, তাহা আপনারা একটু শুনুন।" এই বলিয়াই তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

হে হর, তোমার মহিমার পার
বিদিত কাহার, নিখিলে?
ফুটিবে কিরূপে তোমার স্বরূপ
অজ্ঞে স্তুতি রচিলে?
ব্রহ্মারও যদি বাক্য-বিভব
তোমা পানে চাহি মূর্চ্ছা-নীরব,—
কিম্বা অপরাধ, যাহা অসম্ভব
সাধনে যদি না মিলে?
মূঢ় মম এই স্তোত্র-রচনা,
স্বমতি-বন্ধ্যা, বিফল-বচনা,
দীন এ প্রয়াস, পরাণের আশ,
দিওনা চরণে ঠেলে!
—ইত্যাদি।

কি উদাত্ত গভীর কণ্ঠ তাঁহার! তিনি যখন সুদীর্ঘ কবিতাটী শেষ করিয়া নীরব হইলেন, তখন যেন তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে তাহা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! সঙ্গে সঙ্গে রুদ্র দেবতার বিরাট তাণ্ডব-মূর্ত্তি আমাদের মানস-নেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল!! আমরা শ্রদ্ধা-মুগ্ধ হৃদয়ে তাঁহার নিকটে বিদায় লইলাম। ফিরিবার সময়, গাড়ীর মধ্যে, হীরেন্দ্রবাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বরদা বাবুর কবিতাটী আপনার কেমন লাগিল?" আমি বলিলাম, "ভাব-গাম্ভীর্য্যে কবিতাটী খুব ওজস্বিনী হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বরদা বাবুর পঠন-ভঙ্গী এত চমৎকার যে, এখনও আমার কানে ঝঙ্কৃত হইতেছে! তাঁহার পড়িবার গুণে কবিতাটী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উহাতে যে বড় লালিত্য আছে, তাহা আমার বোধ হইল না। আপনি কি মনে করেন?" তিনি বলিলেন, "আমারও তাই মত।"

* * *

একদিন বিকালে আমাদের "পরিষৎ-মন্দিরে" ব্যোমকেশ বাবুর কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন ভদ্রলোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ব্যোমকেশ বাবু আমা-দিগকে পরস্পর পরিচয় দিলেন। চিনিলাম, ইনিই বহু ভাষা-বিৎ পণ্ডিত বিদ্যাভূষণ সতীশচন্দ্র। তিনি হাসিয়া বলিলেন—এইটীই আমার সহিত তাঁহার প্রথম কথা—"জীবেন্দ্র বাবু! আপনি যে ছেলেমানুষ! আমরা যে আপনাকে চল্লিশের কোঠায় মনে করিয়া ছিলাম!" আমিও হাসিমুখে তাঁহাকে জানাইলাম, তিনি আমাকে যত "ছেলেমানুষ" মনে করিতেছেন, বাস্তবিক আমি তত 'ছেলেমানুষ' নই—আমি 'চল্লিশের কোঠার' কাছা কাছিই আসিয়াছি। তিনি আবার হাসিয়া বলিলেন, "যাঁহার চেহারা দেখিয়া বয়স অল্প মনে হয়, তিনি দীর্ঘজীবী হন। আপনিও দীর্ঘজীবী হইবেন।"—আমি তৎক্ষণাৎ গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "সে আশীর্ব্বাদ করিবেন না! জীবন যে বড় অশ্রু-মাখা!"

তারপর কতবার কত স্থানে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। প্রতিবার তাঁহার উদার ও সরল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ ও সুখী হইয়াছি। একদিকে তিনি যেমন অগাধ বিদ্যার আধার ছিলেন, অপরদিকে তেমনি অমায়িক ও অহঙ্কার-শূন্য ছিলেন। এককথায়, পাণ্ডিত্য, সারল্য ও ঔদার্য্য তাঁহার নির্ম্মল জীবনকে ত্রিবেণী-সঙ্গমে পরিণত করিয়াছিল।

* * *

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত দেখা করিতে গিয়াছি। তিনি সেইমাত্র কলেজ

হইতে ফিরিয়াছেন। "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ করিলেন। চট্টগ্রামে "সাহিত্য-পরিষদের" কার্য্য কিরূপ চলিতেছে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার অনৈক প্রবীণ বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দুই বন্ধুতে মিলিয়া কি যে সরল অট্টহাসি! প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, সে হাসি আর থামিতেই চায় না! কোন কথা নাই, বার্ত্তা নাই, কেবল হাসি—কেবল হাসি!! হাসির কারণ তেমন কিছুই নহে, অনেক কাল পরে দুই বন্ধুতে দেখা হইয়াছে, এই আনন্দ! হায়, এইরূপ আনন্দ ও হাসি আজকাল বড় দুর্ল্লভ হইয়া পড়িতেছে! সভ্যতার খাতিরে আমরা এখন ওজন করিয়া কথা বলি, ওজন করিয়া হাসি; বুঝি বা তেমন আনন্দ প্রকাশ করিবার মত আমাদের বুকের বিশালতাও কমিয়া আসিতেছে!! যাহা হউক, তাঁহাদের হাসি থামিলে রামেন্দ্র সুন্দর কাগজ পেন্সিল হাতে লইয়া আমায় বলিলেন, "জীবেন্দ্রবাবু! সাহিত্য-পরিষদের জন্য আমি আপনার নিকটে কয়েকজন নূতন সদস্য চাই। আপনি নাম বলুন, আমি লিখিতেছি।" সাহিত্য-পরিষদের হিত-কামনা তাঁহার যেন অন্য কোন চিন্তা নাই—কথা নাই!

* * *

সুবিখ্যাত জুয়েলার্স মণিলাল কোম্পানী প্রতি বৎসর, পয়েলা বৈশাখ নূতন খাতা খোলা উপলক্ষে আনন্দোৎসব করিয়া থাকেন। এ উৎসবে সাহিত্য সেবকগণ বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। এক বৎসর আমি সে সময়ে কলিকাতায় ছিলাম এবং এ উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলাম। যথারীতি গান বাজানা ও প্রবন্ধাদি পাঠ শুনিয়া ভোজনকক্ষে নীত হইলে দেখিলাম, আমার টেবিলের পার্শ্বে অপর দুই জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক উপবিষ্ট আছেন। তন্মধ্যে একজন আমার সুপরিচিত বাণী-সেবক বাণীনাথ। অপর ভদ্রলোককে আমি চিনি না। বাণীবাবু বলিলেন, আপনি কি "নব্য-ভারত"-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন বাবুকে চিনেন না? আপনি যে সর্ব্বদা তাঁহার কাগজে লিখিয়া থাকেন।" তাঁহার কথায় আমি যেমন আনন্দে বিস্ময়ে সচকিত হইলাম, দেবীপ্রসন্ন বাবুও যেন একটু চমকাইয়া আমার পানে চাহিলেন; বাণীবাবু তাঁহাকে আমার নাম বলিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহের সহিত গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "জীবেন্দ্রবাবু। আমরা শুনিয়াছি, আপনি কলিকাতায় আসিয়াছেন, ও হীরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে আছেন। আমার পুত্রবধূ আপনার সহিত আলাপ করিলে খুব সুখী হইবেন। কখন আপনার জন্য গাড়ী পাঠাইব, বলুন তো?" আমি বলিলাম, "আপনার গাড়ী পাঠাইবার দরকার নাই। আমি নিজেই আগামী কল্য বিকালে আপনার বাড়ী যাইব! এই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ সত্য-প্রিয় মহাপুরুষ প্রথম সাক্ষাতেই আমাকে কেমন আপনার করিয়া লইলেন! তাঁহার বজ্রের মত কঠোর হৃদয়ে এমনি কুসুমের মত কোমলতা ছিল!

* * *

কর্ম্মবীর দেবীপ্রসন্ন বাবু অকস্মাৎ লোকান্তরিত হইবার মাসখানেক আগে তাঁহার সহিত আমার শেষ দেখা হইয়াছিল। আমি একদিন বিকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া

দেখিলাম, তাঁহার ক্ষুদ্র আপিস ঘরটীতে তিনি একাকী বসিয়া আছেন। বড় বিমর্ষ, যেন কতই শ্রান্ত ক্লান্ত। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলাম, "আপনি এই গরমে একা এই অন্ধকার ঘরে বসিয়া কি করিতেছেন ? কিছু অসুখ হয় নাই তো ?" তিনি বলিলেন "না, আমার অসুখ করে নাই। আমি একজন পীড়িত বন্ধুকে দেখিতে গিয়াছিলাম, এই মাত্র সেখান হইতে আসিতেছি। তাঁহার জীবনের আশা নাই। আমার সমবয়সীরা একে একে চলিয়া যাইতেছেন, আমার মনও পরলোক-যাত্রার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।" হায়, তখন কে জানিত, তাঁহার এ কথাগুলির মধ্যে নির্ম্মম সত্য লুকান আছে ? অল্পক্ষণ চুপ্ করিয়া আবার বলিলেন, "আপনার কি বড় গরম লাগিতেছে ? পাখা খুলিয়া দিতেছি। উহা সর্ব্বদা মাথার উপরে ঘুরিলে, সর্দ্দি লাগিবে বলিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি।" তারপর বহুক্ষণ নানাবিষয়ে আলাপ করিয়া, তিনি আমাকে বলিলেন, "যান, এবার আপনি বৌমার সহিত দেখা করিয়া আসুন।" কিছুক্ষণ পরে আমি যখন তাঁহার পুণ্য-নিকেতন "আনন্দআশ্রম" হইতে বাহির হইতেছি, তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "জীবেন্দ্র বাবু। একখানি নূতন "নব্যভারত" লইয়া যান। ইহাতে আপনার লেখাও আছে।" তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, এই তাঁহার স্বহস্ত-প্রদত্ত শেষ-উপহার !

*　　*　　*　　*

মিত্রোত্তম বিভূতি বাবু ও আমি রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের সহিত দেখা করিতে গিয়াছি। তিনি উপর তলায় ছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি নীচে আসিয়া বলিলেন, "জীবেন্দ্রবাবু কাহার নাম ? কে সারদাবাবুর পত্র লইয়া আসিয়াছেন ?" সেখানে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, তাঁহারা আমাকে দেখাইয়া দিলেন। সেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ, আলাপ। শেষ আলাপও বলা যাইতে পারে। কেননা, তারপর তাঁহার সহিত পত্রালাপ ভিন্ন আর চাক্ষুষ আলাপের সৌভাগ্য ঘটে নাই। যাহা হউক, কয়েকটী কাজের কথার পর আমি তাঁহাকে "সাহিত্য সভা" এবং "সাহিত্য সংহিতা"র কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "উভয়ই মন্দ চলিতেছে না। আপনাকে আমাদের "সাহিত্য সভার" বিশিষ্ট সদস্য করিয়া লইব এবং আপনাকে "সাহিত্য-সংহিতা" পাঠাইতে বলিব। আপনি তাহাতে লিখিবেন।" তাঁহার এই অযাচিত স্নেহে মুগ্ধ হইলাম। তারপর আমি যে কাজের জন্যে তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম, সে বিষয়ে তিনি আমাকে এতদূর সাহায্য করিলেন যে, আমি তাহা জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না।

*　　*　　*

একদিন বিকালে আমি ও বিভূতি বাবু "সাহিত্য"-নায়ক সমাজপতি মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি সে সময়ে নীচের ঘরটীতে বসিয়া সবান্ধবে তাস খেলিতেছিলেন। তামাকের ধোঁয়ায় কক্ষটী আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল ; এমন কি, আমার নিশ্বাস লইতেও কষ্ট হইতেছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এ ধোঁয়ার রাজ্যে বসিয়া কি করিতেছেন ?" তিনি সবিস্ময়ে আমার মুখের পানে . চাহিলেন ; তিনি আমাকে চিনিতেন না। বিভূতিবাবু তাঁহাকে আমার নাম বলিলে, তিনি আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ

করিয়া, সহাস্যে বলিলেন, "জীবেন্দ্র বাবু! আপনি বুঝি ও রসে বঞ্চিত!" তখন মহা হাসি তামাসার ধূম পড়িয়া গেল। "সাহিত্যের" তেজস্বী সুরেশচন্দ্র, যাঁহার তীব্র-মধুর কষাঘাতে যথেচ্ছাচারী লেখক-বৃন্দ সন্ত্রস্ত, তিনি শিশুর মত কি সরল ও রহস্য-প্রিয়! হাসির ফোয়ারা একটু থামিলে, তিনি আমাকে বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি, আপনি আমাদের হীরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে উঠিয়াছেন। আমি রোজই ভাবি, আপনার কাছে যাইব; আজ কাল করিয়া আর ঘটিয়া উঠে না। তা, আপনি আসিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন। আমি কাল দুপুরে ঠিক আপনার কাছে যাইব, আপনি বাসায় থাকিবেন তো?" আমি সম্মতি জানাইয়া সকৌতুকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি আগে আমার লেখায় খুব গালাগালি দিতেন, এখন আবার এত প্রশংসা সুরু করিয়াছেন কেন?" তিনি তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে উত্তর দিলেন, "গালাগালি দিয়া দেখিলাম, আপনি কিছুতেই দমেন্ না; তাই এখন প্রশংসা করিয়া আপনাকে উৎসাহ দিতেছি।" আমি বলিলাম, "আমি যে নিন্দা-প্রশংসা দুইটাই সমান মনে করি—দুইটাই সমানভাবে উপেক্ষা করিতে চেষ্টা করি। নিন্দা প্রশংসার অতীত না হইলে যে নিষ্কামভাবে মায়ের পূজা হয় না!" তিনি আমার এ কথায় হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। কেন? ইহার উত্তর আজ কে দিবে?

* * *

একদিন সন্ধ্যাবেলা হেদোর পুকুর পাড়ে বেড়াইতেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একজন ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবেন্দ্রবাবু! আপনি কখন কলিকাতায় আসিলেন? কোথায় আছেন?" এ অপরিচিতের দেশে এমন পরিচিতের মত কে সম্ভাষণ করিতেছেন? সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চিনিতে পারিলাম, সুসঙ্গের সুধী-শ্রেষ্ঠ মহারাজ কুমুদচন্দ্র আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহাকে এ ভাবে এখানে দেখিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। তারপর সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে কত রাজ্যের কত কথা আরম্ভ হইল; কালিদাস, মাঘ, ভারবি হইতে সেক্ষপীয়র, মিল্টন, টেনিসন প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় কোন কবিই আমাদের সে আলোচনায় বড় বাদ গেলেন না। মহারাজের সংস্কৃত উচ্চারণ বড়ই সুন্দর ছিল। তিনি যখন কালিদাস প্রভৃতি হইতে শ্লোকাংশ আবৃত্তি করিতেছিলেন, তখন আমি মুগ্ধ-চিত্তে শুনিতেছিলাম। দেখিতে দেখিতে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল; তাঁহার সহিত সদালাপে এতক্ষণ যেন আত্মহারা ছিলাম। যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম, হেদোর পাড়ে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে; সান্ধ্য-ভ্রমণ-কারীরা দলে দলে বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছেন। আমরাও পরস্পর বিদায় লইলাম। কে জানিত, এই বিদায়ই শেষ বিদায়; অল্পকাল পরেই, বিদ্যা ও বিনয়ের অবতার, মহারাজ বাহাদুর আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন!

*

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ, হরি ওঁ।

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

দলনী।

[সমালোচনা]

আজ আমরা এমন একটা সতী-নারীর চিত্র পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব, যাহাতে শৈবলিনী-সমালোচনা-কলুষিতা লেখনী ধন্যা হইবে।

কঠোর-হৃদয় নবাব মীরকাসেমের মত বীরের চিত্ত-দলনী বলিয়াই কি "দলনী" এই নাম-করণ? কিম্বা, যৌবনেই এমন সুন্দর কুসুমটী দলিত হইয়া গেল বলিয়া, "দলনী" এই নাম-করণ? দলনী, নবাব মীরকাসেমের ধর্ম্ম-পত্নী; শত যুবতী-সঙ্গ-কলুষ নবাবের প্রগাঢ় প্রেমের অধিকারিণী। বালিকাকৃতি যুবতী দলনী মীরকাসেমের বিশাল দেহের পার্শ্বে মহামহীরুহের সংলগ্না ক্ষুদ্র লতার মত ছিল।

দলনী আদর্শ সতী নারী। রাজোদ্যানের গোলাপ, দেবপূজার শতদল। সে যখন ক্ষুদ্র মস্তকে বিলম্বিত, ভুজঙ্গরাশি-তুল্য নিবিড় কুঞ্চিত কেশরাশি দোলাইয়া, সুগঠিত চম্পক-সুকুমার অঙ্গের সঞ্চালনে অন্তঃপুর মধ্যে রূপের তরঙ্গ ছুটাইয়া, ক্ষুদ্র বীণাটি করে লইয়া, তাহাতে মধুময় ঝঙ্কার তুলিত; ধীরে ধীরে, অতি মৃদুস্বরে, শ্রোতার ভয়ে ভীতা হইয়া, প্রেমগীতি গাহিত; তখন সে রাজোদ্যানের গোলাপ। তারপর, মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলকমলিনীর ন্যায়, মুখ ফোটে ফোটে, ফোটে না; সেই দলনী যখন "যদি আমার বধের আজ্ঞা দেন, তথাপি সেই প্রভুর কাছে আমি যাইতে চাহি" এই কথা বলিয়াছিল; ভূম্যাসনে বসিয়া, ঊর্দ্ধ মুখে, ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে, গলদশ্রুলোচনে, রাজরাজেশ্বর প্রভুর অনুমতিতে বিষ ভোজন করিয়াছিল; তখন সে দেবপূজার শতদল।

দলনী বিষ ভোজন করিলেও, তাহা তাহার আত্মহত্যা নহে। যে আত্মহত্যাকারীর গতি অন্ধতামিশ্র নরকে—সে আত্মহত্যাকারিণী দলনী নহে। পতিই দেবতা, পতিই তার নারী-জীবনের প্রভু; সেই পতি-দেবতার লিখিত-আজ্ঞা পালন করিতে তাঁর দাসী বাধ্য। এ আজ্ঞা, সেই রাজরাজেশ্বরের স্বহস্ত দত্ত দণ্ড! এ দণ্ড অবহেলা করিতে সতী নারী পারে না। আজ্ঞা পালনের জন্যই এই বিষ-ভোজন। ইহা আত্মহত্যা নহে।

দলনী বিনয়ার্জ্জবাদি-যুক্তা পতিপ্রেমমুগ্ধা "মুগ্ধা" নারী। স্বভাবতঃ মুগ্ধা নারী বলিয়াই সে, নবাবান্তঃপুরে বাস করিয়াও, কোন প্রগল্‌ভতা, কোন চাতুর্য্যই শিক্ষা করে নাই। মুসলমান নবাবদিগের অন্তঃপুরে এরূপ কুসুম খুব অল্পই ফোটে। এ যেন গোবরে পদ্মফুল। গীত গাহিতে বলিলে, সেই লজ্জাবনতমুখী হওয়া, বীণার তার অবাধ্য হওয়ায় সেই মহা গোলযোগ বাঁধা; ভীরু কবির কবিতা কুসুমের ফুটিতে যাইয়া না ফোটা; নবাব-অন্তঃপুরে এক অভিনব সৃষ্টি।

দলনী মীরকাসেমকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত! আপনার সত্বা তাঁহাতে মিশাইয়া দিয়া, বাদশাহের বাদশাহ ভাবিয়া ভক্তি করিত। আপনাকে বাঁদীর বাঁদীমত মনে করিয়া গর্ব্বিত হইত। স্বামীর জন্য স্নেহে আকুলি বিকুলি করা, গুলেস্তা পড়িতে আরম্ভ করিয়া আবার সেই ফেলিয়া

দেওয়া, আপনা-ভোলা ভালবাসারই পরিচায়ক। স্বামী আসিয়াছেন শুনিয়াই বা কি আত্মহারা ভাব! বক্ষ, তালে তালে নাচিতে থাকে; ধমনী, নাচিয়া নাচিয়া উঠিতে থাকে; বীণার তার, অবাধ্য হইয়া যায়; সুর, কোন মতেই উঠে না।

দলনী বালিকাকৃতি, অতি কোমল প্রকৃতি নারী মাত্র। স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায়, তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি লোপ পায়; হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। অন্ধকারময়ী রাত্রিতে, ছদ্মবেশে দাসী সঙ্গে, অমনি ভ্রাতা গুরগণ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। যুদ্ধ থামাইবার জন্য অমনই কাঁদিতে বসে। বালিকাকৃতি কাঁচা-বুদ্ধি বলিয়াই সে, এই নবাব-পত্নীর পক্ষে যাহা অসম সাহসিক, তাহা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। স্বামী পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় রমাও একদিন গঙ্গারামের রাত্রে অন্তঃপুরে যাওয়া আসায় দোষ দেখিতে পায় নাই। পতির অমঙ্গলাশঙ্কায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা হইয়া, জনক-নন্দিনী সীতাও একদিন লক্ষণকে, যাহা অকথ্য, তাহা বলিয়াছিলেন। কেহ বা অকথ্য কথা বলিল, কেহ বা অকর্ত্তব্য কার্য্য করিল।

দলনী পতিপরায়ণা সাধ্বী। ভ্রাতার সহিত সাক্ষাতে চলিয়াছে। ইহাতে তাহার পক্ষে, ধর্ম্মের চক্ষুতে, অকর্ত্তব্য কার্য্য না হইলেও, নবাব-পত্নীর পক্ষে অকর্ত্তব্য কার্য্য। গোপনে, আপনার গণ্ডী ছাড়াইয়া যাওয়াই যে অন্যায়। অগ্নি, বালক বলিয়া, দগ্ধ করিতে ছাড়ে না। দলনী বালিকা-বুদ্ধিতে করিয়াছে বলিয়া, অন্যায়ের দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবে কেন? গুরগণ খাঁ যে ভ্রাতা—ইহা নবাব বা আর কেহই জানিত না। তথাপি এই নির্জ্জন-সাক্ষাৎ, রাত্রে অন্তঃপুর ছাড়িয়া গুরগণ খাঁর গৃহে, এই গোপন-সমাগম, যে-ই দেখিত, সে-ই এই কার্য্যটিকে অভিসারিকার কুৎসিত অভিসার বলিয়াই বুঝিত। দলনীর এত বড় দুঃসাহস, এত বড় বুকের পাটা। সু-মনোবৃত্তি হইতে উদ্ভূত হইলেও, কার্য্যটিতে অতি বড় দুঃসাহস প্রকাশ পাইয়াছে।

দলনী অবশ্য দুঃসাহস ভাবিয়া এই কার্য্য করে নাই। তাই সে অত নির্ভীক। সে মনে প্রাণে অন্যায় করিতে জানে না। তাই সে ভয়ও পায় নাই। গুরগণ খাঁর মুখে অসঙ্গত কথা শুনিয়া, তাই সে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিতে পারিয়াছিল—"ভুলিয়া যাইও না, মীরকাসেম আমার জীবনে মরণে, প্রভু"।

"দ্বিতীয় নুরজাহান হইবে"—ভগ্নীর প্রতি ভ্রাতার এই উত্তর! দলনী গলদশ্রুলোচনে কাঁদিতে লাগিল। এই ঘৃণিত প্রস্তাবে দলনীর নারী-হৃদয় আহত হইল। কুসুমকোমলা প্রকৃতিতে সতীত্বের গর্ব্ব, সতীত্বের তেজ ফুটিয়া উঠিল। তখন ক্রোধে কম্পিতা হইয়া, সেই কোমলা নারী ভ্রাতাকে তিরস্কার করিল।

সতী নারী কুসুমের মত যতই কোমল হউক, তাহার মধ্যেও একটি বিদ্যুতের প্রখর জ্বালা বিদ্যমান থাকে। আঘাত পাইলেই তাহা ফুটিয়া থাকে। জনক-তনয়া সীতা, হনুমানের নিকট রামের অভিজ্ঞান চিহ্ন দেখিয়া, তাহার সহিত ফিরিতে সম্মতা হন নাই। সীতারামের রমাও, সহস্রলোকের সম্মুখে, রাজসভায় দাঁড়াইয়া, আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে কুণ্ঠিতা হন নাই। অন্তঃপুর-দ্বার রুদ্ধ হইলে, দলনীও কুল্‌সমকে বলিতে পারিয়াছিল—"এখানে দাঁড়াইয়া ধরা পড়িব, সেই উদ্দেশ্যেই এখানে দাঁড়াইব; ধৃত হওয়াই আমার কামনা। যে ধৃত করিবে, আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে? প্রভুর কাছে? আমি সেইখানেই যাইতে চাই। অন্যত্র আমার

যাইবার স্থান নাই। তিনি যদি আমার বধের আজ্ঞা দেন, তথাপি মরণকালে তাঁহাকে বলিতে যাইব যে, 'আমি নিরপরাধিনী'।

দলনী স্বর্গ গঙ্গার মত পবিত্রা। পারিজাতের মত তাহার মনও পবিত্র। সে দলনী, নিজের মনে, ইংরাজের উপর স্বাভাবিক কোন ক্রোধ পোষণ করে না। কোনরূপ বিরক্তি বা ঘৃণা তাহার জন্মিবার কথা নহে। তথাপি ইংরাজের উপর তাহার একটি ক্রোধ ও বিরক্তির ভাব ছিল। মীরকাসেমের ক্রোধ বা বিরক্তির ভাব ছিল বলিয়াই, দলনীর ছিল। পতির যে শত্রু, সতীনারীর সেও শত্রু। ভিতরে ভিতরে ইংরাজের উপর মীরকাসেমের ভয় ছিল; দলনীর তাই ইংরাজের সহিত যুদ্ধ বাধিবার নামেই, এত ভয়। আপনার মুক্তির জন্য, দলনী সামান্য রক্তারক্তিতে ভয় পাইবে, দলনী এমন ভীরু ছিল না। ইন্দুবালার মত তেজোহীনা কোমলা ছিল না। শত্রুর উপর সমবেদনা করিবে, এমন অপার্থিব 'করুণা' লইয়া সে জন্মগ্রহণ করে নাই।

পতির উপর দলনীর বিশ্বাস যেমন প্রগাঢ়, তাহার ভালবাসার উপর বিশ্বাসও তেমনই প্রগাঢ়। মহম্মদ তকির হস্তে, স্বামীর পরোয়ানা দেখিয়াও, তাহার বিশ্বাস জন্মে নাই। "স্বামী আমার স্নেহময়, এরূপ আজ্ঞা তিনি কখনই দিতে পারেন না। এ জাল পরোয়ানা।"

তারপর, পাপিষ্ঠ তকি যখন দলনীর নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনাই প্রকাশ করিল, তখন দলনী বুঝিল, এ পরোয়ানা জাল নহে। স্বামী পাপিষ্ঠ তকির দ্বারা প্রতারিত হইয়াই এই পরোয়ানা দিয়াছেন। বস্তুতই মীরকাসেমকে বিশ্বাস করান হইয়াছিল যে, দলনী ব্যভিচারিণী। ধরা পড়িয়া বন্দিনী হইয়াছে। কাজেই বিষ-ভক্ষণে তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেন। বিচারক-হিসাবে কাজটি অবিমৃষ্যকারিতা-দুষ্ট হইয়াছে। আর পতি হিসাবেও, কাজটি নির্দ্দয় নির্ব্বোধের মত হইয়াছে।

স্বামী প্রতারিত হইয়াছেন, দলনী অবিশ্বাসিনী। এই বিশ্বাসেই বিষ-ভোজনে প্রাণদণ্ড আজ্ঞা দিয়াছেন। তখন দলনী ভাল করিয়া পরোয়ানা দেখিল, স্বামীর স্বাক্ষরটির পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। "প্রভুর আজ্ঞা, পালন করিতেই হইবে। রাজরাজেশ্বর, বাদশাহের বাদশাহ, পতিদেবতার আজ্ঞা, তাহার দাসী পালন না করিয়া পারে না"। তখন, তকির নিকট বিষ লইয়া, আজ্ঞা-পালনের জন্য বিষ ভোজন করিল। পতির আজ্ঞা; দোষ গুণ বিচার করায় তাহার অধিকার নাই। দলনী কোন দ্বিধা না করিয়া সেই পতি-দত্ত দণ্ড গ্রহণ করিল। অন্যায়ের শতগুণ দণ্ড হইল। দুই দিন পরে. স্বামীর সে রাজ্যচুতি, ভগ্নহৃদয়ে সে প্রস্থান, নৈরাশ্যে সে মৃত্যু—দলনীর আর দেখিতে হইল না। সিরাজের জলন্ত অভিশাপ, সে অখণ্ডনীয়। দলনী স্বর্গীয়া দেবী। সে অভিশাপের ফল, তাহার না দেখাই ভাল। তাই দলনী অগ্রেই প্রস্থান করিল।

আত্ম-সম্মানে ঘা পড়িলে, নারীহৃদয় আহত করিলে, সতীত্বের মাণিক অপহরণের চেষ্টা পাইলে, সতী সাধ্বী কোমলা নারী, ব্যাঘ্রীবৎ ভীষণা হইয়া উঠে। মহম্মদ তকি যখন দলনীর নিকট ঘৃণিত প্রস্তাব করিল, তখন সেই খর্ব্বাকৃতি নারী, তকির মত বীরপুরুষের বুকে প্রচণ্ড পদাঘাত করিল। আহত কুকুরের মত সেই কামুক পলায়ন করিবার পথ পাইল না।

দলনীর মৃত্যুকালে কেবল এই দুঃখ রহিল যে, প্রভুর সম্মুখে বসিয়া প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে পাইল না। মৃত্যু সময়ে, দলনী আসনে ঊর্দ্ধমুখে, ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে, জোড় করে বসিয়া আছে;

বিস্ফারিত পদ্মপলাশ চক্ষু হইতে জলধারা বক্ষে আসিয়া পড়িতেছে। আহা, স্বর্গের অম্লান কুসুম ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল। বিষ ভোজনের দৈহিক যন্ত্রণা, দলনীর নিকট তখন অতি তুচ্ছ। সতী সাধ্বী আত্ম-বিসর্জ্জনের পুণ্যে স্বর্গে স্থান পাইল। পতি প্রেমের বলে সে সতীকুঞ্জে আশ্রয়-লাভ করিল।

দলনী ছাড়িয়া গেল। পিছনে পিছনে রাজলক্ষ্মীও নবাবকে ত্যাগ করিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী ও দলনী, এই দুইটাই মিরকাসেমের প্রাণ ছিল। রাজলক্ষ্মীর বিশ্বাসঘাতকতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া, মূর্খ নবাব শেষে বুঝিয়া গেল, দলনীই তাহার তদ্গতপ্রাণা প্রেমময়ী পত্নী। নিজের দোষে কি রত্নই সে জলাঞ্জলি দিল। দলনীর জন্য নবাব শেষে কত কান্নাই কাঁদিল।

মহম্মদ তকি মীরকাসেমের বিচারে প্রাণদণ্ড পাইয়া, বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করিল। মাতার অভিশাপ হাতে হাতে পাইল। শুনিতেছি যে, আজকালকার ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ করিতেছেন, মহম্মদ তকি, বিশ্বাসঘাতকতা দূরে থাক, প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী সেবকই ছিল। আমরা ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতে বসি নাই যে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব। কবির সৃষ্ট চরিত্র আমরা যেমন পাইয়াছি, সেই মতই সমালোচনা করিলাম।

শ্রীরামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী।

স্বরাজ।

[১৫২ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি]

(১৩)
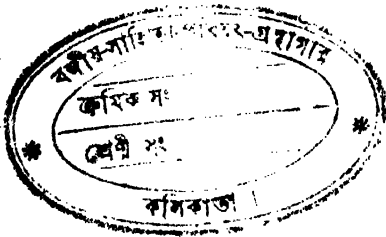
অরাজক-পন্থীর আদর্শে গঠিত সমাজে মানুষ শ্রম করিবে, বেতন পাইবে না। শ্রম, মানুষের প্রকৃতি-গত ; শ্রমে মানুষ স্বভাবতঃ আনন্দ পায়। শ্রমে ধন-লাভ হয় বলিয়াই যে মানুষ শ্রম করে, তাহা নয়। শ্রম, মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রমেই মানুষের আনন্দ। অত্যধিক শ্রমে মানুষের বিরক্তি। অত্যধিক শ্রম, মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায়। শ্রমজীবিদিগকে বেতনের প্রলোভন দিয়া, অত্যধিক শ্রম করান হয়। তাহাতে ধনীর আরও ধন-বৃদ্ধি হয়। শ্রমজীবি অতি সামান্য বেতন পায়। ফলে, বৈষম্য বাড়িয়া চলিয়াছে। অত্যধিক শ্রম দূর করিতে হইবে। আর, বেতন-ব্যবস্থা পৃথক্-সম্পত্তি-মূলক। ধন-বৈষম্য দূর করিতে হইলে, পৃথক্-সম্পত্তি সমাজ হইতে দূর করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে, বেতন-ব্যবস্থাও দূর করিতে হইবে। তাহাতে, মানুষসকল অলস ও শ্রম-বিমুখ হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোনও কারণ নাই। বসুন্ধরার নিকট হইতে খাদ্য বা পানীয় বা সুখ-সাধন আদায় করিবার জন্য, মানুষ শ্রম আপনা আপনি করিবে। অরাজক-পন্থীর আদর্শে গঠিত সমাজে, মানুষ ধনও সুখ-সাধন ভোগ করিবে। বেতন-ব্যবস্থা থাকিবে না বটে, ভোগের ব্যবস্থা ত থাকিবে। যাহার যতটা প্রয়োজন, তাহার ততটা ভোগের ব্যবস্থা করা হইবে।

অরাজক-পন্থী বলেন যে, সমাজের মূলভিত্তি হইবে, মানব-মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—

সহযোগিতা (co-operation)। মানুষ দল বাঁধিয়া সমাজে থাকিতে চায়। দশের সহিত সমাজে বাস করাই, তাহার স্বভাব। সহযোগিতা বর্জ্জন করিলে সমাজ গড়ে না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ, সত্যের আংশিক প্রকাশ দেখিয়া, সর্ব্বত্র জীবন-সংগ্রাম খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন ও সে সংগ্রামে যোগ্যতমের জয় (survival of the fittest) ঘোষণা করিয়াছেন। বিবর্ত্তন-বাদের এই জীবন-সংগ্রাম ও সংগ্রামে যোগ্যতমের জয়, আংশিক সত্য মাত্র। ইহা পূর্ণ সত্য নহে। সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতা (competition) যদি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, সহযোগিতা (co-operation) তাহার তেমনই সহজ ও স্বাভাবিক। ভয় বা ঈর্ষ্যা যদি মানুষের স্বভাবগত, প্রেমও মানুষের তেমনই স্বভাবগত। রাস্তায় তোমার ও আমার উভয়ের যাতায়াতের স্থান থাকিলে, পথ চলিবার সময় তুমি যে আমাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেও না, তাহা শুধু পুলিশের ভয়ে নয়। রাস্তায় চলিয়া যাইতে আমি পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলে, তুমি যে তাড়াতাড়ি আসিয়া আমাকে হাতে ধরিয়া তোল, তাহাও কি পুলিশের ভয়ে? কেহ হয়ত বলিবে যে, তাহা মানুষের প্রশংসার প্রলোভনে। তাহাই কি সব সময়ে ঠিক্! তোমার আমার জীবনে এমন অনেকবার হইয়াছে যে, যাহাকে হাতে ধরিয়া তুমি তুলিয়াছ, সে তোমাকে চিনিত না। আজও হয়ত সে তোমাকে চেনে না। তুমি তাহাকে তুলিয়া দিয়া, তাহার পায়ের উপর তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া, তোমার নিজের কাজে তুমি চলিয়া গিয়াছ। সে ছাড়া অপর কেহ দেখিতেও পায় নাই যে, তুমি তাহাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়াছ। সে তোমার নামও জানিতে পারে নাই। তুমি, আমি, সকল মানুষ এরূপ করে কেন? করে, কারণ সহযোগিতা স্বাভাবিক। সর্ব্বত্র যদি প্রতিযোগিতা ও যোগ্যতমের জয় হইত, তবে শিশু কি এ সংসারে এত যত্ন পাইয়া বড় হইতে পারিত? পিতৃ-মাতৃ-হীন অসহায় শিশুকে ঘরে আনিয়া তুমি যে মানুষ করিতেছ, তাহাতে তো যোগ্যতমের জয় প্রমাণিত হয় না। তাহাতে প্রমাণিত হয়, মানুষ সামাজিক জীব; প্রেম ও সহযোগিতা তাহার স্বভাবগত।

এই স্বাভাবিক সহযোগিতার উপর সমাজ গড়িয়া তোল। লোকে শ্রম করিবে; শ্রম করিয়া বেতন চাহিবে না। ধন, সুখসাধন, যতটুকু যাহার প্রয়োজন ভোগ করিবে। মুদ্রার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজনীয় খাদ্য বা পানীয় কিনিবে না। শ্রম দ্বারা খাদ্য, পানীয়, সুখসাধন, সব উৎপন্ন করা হইবে ও যাহার যতটা প্রয়োজন ভোগ করিবে। সমাজে শাসন থাকিবে না, পুলিস থাকিবে না, সৈন্য থাকিবে না, কারাগার থাকিবে না; ফাঁসিকাঠ ত থাকিবেই না। ধন-বৈষম্য দূর হইয়া গেলে, সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে না। আমার যাহা প্রয়োজন তাহা যদি সময় মত পাই, আমার চুরি বা ডাকাতি করিবার আবশ্যকতা থাকে না। এ কি সমাজ লইয়া মানুষ আছে? ধন-বৈষম্য অক্ষুন্ন রাখিতেছে; অপরাধ প্রবৃত্তি মনে জাগাইয়া রাখিবার সকল আয়োজন সমাজে রাখিতেছে; আবার, শাসন ভয়ে, অপরাধ-প্রবৃত্তি দমনের চেষ্টা করিতেছে। একদল লোক সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি পোষণ করিতেছে, অপর একদল লোক, অপরাধী দলকে ধরিয়া, বল বা শক্তি দ্বারা শাসন করিবার জন্য, সময় বুদ্ধিও শক্তির অপব্যবহার করিতেছে। আর সমাজের সকল

লোকে মিলিয়া, অপরাধ-প্রবৃত্তি যাহাতে সর্ব্বদা মানব মনে জাগ্রত থাকে তাহার ব্যবস্থায়, ঐ ধন-বৈষম্যের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিতেছে। কাহারও বা শাসন হইতেছে, কাহারও বা শাস্তি হইতেছে না। আর অধিকাংশ সমাজ-দ্রোহী, শাসনের পরে, কারা-মুক্ত হইয়া, পুনরায় অপরাধ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ধন-বৈষম্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, অপরাধ-প্রবৃত্তি মনে জাগ্রত রাখিবার সার্থকতা কি? তাহার পরে, আবার কারাগার ও ফাঁসিকাঠের ভয় দেখাইয়া, অপরাধ-প্রবৃত্তি দমনের নিস্ফল চেষ্টারই বা সার্থকতা কি? বৈষম্যের কারণ দূর কর; কারগার ও ফাঁসি-কাঠ আপনিই দূর হইবে। আর বৈষম্য দূর করিবার পরেও যদি মানুষ মানুষকে আঘাত করে বা বধ করে, তাহার জন্য ভয় পাইবার কিছু নাই। পুলিস, সৈন্য, কারাগার, ফাঁসিকাঠ রাখিয়াও ত চুরি, ডাকাতি, জখম, খুন নিবারিত হয় নাই। সমাজকে ভাঙ্গিয়া সাম্যের নূতন আদর্শে, প্রেম ও সহযোগিতার ভিত্তিতে, অরাজক-সমাজ গড়িয়া তোল। যত দিন সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন চুরি, ডাকাতি, জখম খুন কিছু চলুক। এখনই কি তাহা নিবারিত হইয়াছে? অন্ততঃ মহত্তর উন্নত সমাজ-গঠনের পথে অগ্রসর হওয়া যাক্। অরাজক-পন্থীর এই কথা কি ব্যাধিতের নিরর্থক স্বপ্ন-মাত্র?

(১৪)

এই বল-বিবর্জ্জিত, সহযোগিতা-মূলক, প্রেম-মধুর সমাজের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কোথায়ও মানুষ ইহা গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। শাসন ও শক্তি প্রয়োগ নাই, আর সমাজের প্রত্যেকের সম্মতির উপর নির্ভর—আধুনিক ইতিহাসে এরূপ সমাজ প্রতিষ্ঠার ছোটখাটো চেষ্টা মাঝে মাঝে হইয়াছে। কিন্তু এরূপ সমাজ টেঁকে নাই। ইহা যদি এতই সহজ ও স্বাভাবিক, তবে ইহা জন্মে নাই কেন? শক্তি-মূলক রাষ্ট্র ত কেহ পরামর্শ করিয়া, যুক্তি-তর্কের পর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, চুক্তি করিয়া গড়ে নাই। জনসমাজের ইতিবৃত্তে, একদিন একপক্ষে একজন মানুষ ও অপরপক্ষে বহুসংখ্যক মানুষ একত্র মিলিত হইয়া, এই চুক্তি করিল যে, সেই একজন মানুষ রাষ্ট্রপতি হইবে আর বহু মানব রাষ্ট্রের প্রজা হইবে, এরূপ প্রমাণ ত পাওয়া যায়-ই না, এরূপ অনুমান করিবারও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মানবেতিহাসে এমন কিছু পাওয়া যায় না, যাহা হইতে অনুমান করা চলে যে, একদিন এক বা একাধিক লোক একপক্ষে ও বহু মানব অপরপক্ষে মিলিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, একটা রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে হইবে; তাহাতে এক বা একাধিক রাষ্ট্রপতি থাকিবে; রাষ্ট্রপতি সুশাসন করিবে; আর প্রজাগণ রাজভক্ত হইয়া চলিয়া, শান্তিরক্ষা করিবে; আর যে সব প্রজা, রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, তাহাদের শাসন হইবে; শাসনের জন্য বল বা শক্তি প্রয়োগ করা হইবে; শক্তি-প্রয়োগের জন্য সেনা থাকিবে। ইতিহাসের সাক্ষ্যে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মানব সমাজের শৈশবাবস্থায়, জ্ঞানী শক্তিশালী গুণী লোক, দলপতি বা রাষ্ট্রপতি হইয়াছেন। তাঁহাকে অপরে মানিয়া নিয়াছে।* রাষ্ট্র আপনা আপনিই জন্মিয়াছে। কেহ পরামর্শ করিয়া, চুক্তি করিয়া, সৃষ্টি করে নাই। দল বাঁধিয়া, সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে করিতে মানুষের মধ্যে শক্তি-মূলক রাষ্ট্র স্বভাবতঃই উদ্ভূত হইয়াছে। প্রারম্ভে, বিচার, তর্ক, যুক্তি ও চুক্তির কোনও প্রমাণ পাওয়া

যায় না। সহযোগিতা-মূলক অরাজক-সমাজ যদি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক হয়, তবে ইহা স্বভাবতঃ গড়িয়া উঠিল না কেন? এত রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল, অরাজক-সমাজ আজ পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠিল না কেন? সভ্যতার শৈশবে মানুষ বর্ব্বর ছিল। শিকারী মানুষের মধ্যে এরূপ সমাজ গড়িয়া না ওঠা, বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। কিন্তু, আজ দুই সহস্র বৎসরের অধিককাল, বুদ্ধ গৌতমের মৈত্রী-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। তাহার পরে, যীশুর প্রেমের বার্ত্তা মানুষের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়াছে। তবুও এ সমাজ টেঁকে না কেন? আজও মানুষের স্বভাবে তবে এমন কিছু আছে, যাহাতে এ সমাজ টিঁকিতে পারিতেছে না। পরন্তু, রাষ্ট্র, মূলধন ও পৃথক্ সম্পত্তির বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করিয়া, এই বল-বিবর্জ্জিত, সহযোগিতা-মূলক অরাজক-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসে, অনেকে নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া বল ও শক্তির সাহায্যে, রাষ্ট্রপতিদিগের রক্তপাত করিয়াছে। সমাজ হইতে শক্তি-প্রয়োগ দূর করিবার জন্য, তাহারা সেই শক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে। পুরাতন সমাজ ভাঙ্গিবার জন্য এই সংস্কারকদল যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে, রাষ্ট্র তাহার শতগুণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া, সংহারক সংস্কারকদিগকে বিনাশ করিয়াছে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, মানুষের স্বভাবে এমন কিছু আজও রহিয়াছে, যাহার দরুণ, শক্তিকে বাদ দিয়া, সমাজ-সংস্কার বা সমাজ-সংরক্ষণ কোনটাই চলিতেছে না।

জন-মানব-শূন্য কোনও দেশে গিয়া, অরাজক-পন্থী একদল মানুষ, দলের প্রত্যেকের সম্মতির উপর নির্ভর করিয়া, শাসন-বিবর্জ্জিত সমাজ গঠন করিতে চেষ্টা করিলে, বরং তাহা সহজ হইতে পারে। কিন্তু যে দেশে পৃথক্ সম্পত্তির ভিত্তিতে শক্তি-মূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত আছে, সে দেশে বল-বিবর্জ্জিত সহযোগিতা-মূলক অরাজক-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে, বল বা শক্তির সাহায্য ছাড়া, চেষ্টা সফল হইবে, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। যাহারা পৃথক্ সম্পত্তি ভোগ করিতেছে, যাহারা মূলধন খাটাইয়া সুদ পাইতেছে, রাষ্ট্র বজায় থাকিলে যাহারা উত্তরাধিকার সূত্রে মূলধন ও সুদ ভোগ করিবার আশা রাখে, যাহারা জমিতে স্বত্ব-স্বামীত্ব দাবি করিয়া জমিতে অপরের শ্রমে উৎপাদিত ফসল ভোগ করিয়া আসিতেছে, যাহারা বহু-মানবের উপর প্রভুত্ব করিতেছে, রাষ্ট্র বজায় থাকিলে যাহাদের অর্থ মান বা প্রতিপত্তি বজায় থাকে, এরূপ অতি অল্পলোকই, বিনা রক্তপাতে, তাহাদের ধন মান বা প্রতিপত্তির ভোগ বা ভোগের আশা বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইবে। ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের অধিকারী কৃষকগণও তাহাদের স্বীয় স্বীয় ভূমিখণ্ডে তাহাদের স্বত্ব স্বামিত্ব আর থাকিবে না, এ প্রস্তাবে সহজে সম্মত হইবে না। সাধারণ শ্রমজীবিগণ যদি বা ইহাতে সম্মত হয়, সুনিপুণ কারিকর শ্রম-জীবিগণ (skilled workmen) ইহাতে সম্মত হইবে না; কারণ তাহারা জানে যে, তাহারা এক মত হইয়া জোট করিলেই, ধনীর নিকট হইতে ইচ্ছামত উচ্চ বেতন সহজে আদায় করিতে পারে। বল-বিবর্জ্জিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া, এইজন্য একদল অরাজক-পন্থী, গত্যন্তর না দেখিয়া, অবশেষেই বলের ঐ শরণাপন্ন হইয়াছে ও আদর্শের জন্য হাসিমুখে প্রাণ-বিসর্জন করিয়াছে।

বৈষম্য হইতে সাম্যে উপনীত হইতে, পথে মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি। মানুস জন-মানবশূন্য নূতন দেশ বাছিয়া নিয়া, তথায় সাম্যবাদীর শাসন-মুক্ত বল-বিবর্জ্জিত সমাজ স্থাপন

করিতে চাহে না। মানুষ চাহে যে, এই শক্তি-মূলক রাষ্ট্রগুলিকে সহযোগিতা-মূলক সমাজে পরিণত করিতে হইবে। সুতরাং, বৈষম্য হইতে সাম্যে উপনীত হইবার পথে, বল বা শক্তির পৈশাচিক লীলা, অনিবার্য্য। এ পথ পার হইয়া আসিতে পারিলে, তবে ত বল বা শক্তির হাত হইতে নিস্তার। পথে কত কাল কাটাইতে হইবে, কে জানে? পথ পার হইয়া আসিয়া, সাম্যের সমাজেই বা মানুষ কতকালে বল বা শক্তির হাত হইতে নিস্তার পাইবে, তাহা কে জানে? সহযোগিতা-মূলক সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা কতকাল সাম্যের আলয় থাকিবে, কে বলিতে পারে? রাষ্ট্রবাদী বলেন যে, পথে কত কাল কাটিবে তাহা যদি অনিশ্চিত; পথে বল, শক্তির পৈশাচিক লীলা যদি সুনিশ্চিত; পথ পার হইয়া আসিয়া, সহযোগিতামূলক সমাজে পৌঁছিলে সেখানে সাম্য যদি স্থির স্থায়ী ও অচল ন-ই হয়; তবে, তোমার অরাজক-সমাজ ত আলেয়া। তবে শক্তি-মূলক রাষ্ট্র কি দোষ করিল? সেখানে ত উপস্থিত ব্যবহার বা আইনের বন্দোবস্ত করিয়া, বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, বল বা শক্তির প্রতাপ খর্ব্ব করা হইয়াছে। অন্যান্য উপায়ে, সেখানে বৈষম্য-জাত অত্যাচার নিবারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আর মানুষ যখন প্রেমের ধর্ম্মে বাড়িয়া, সতেজ হইয়া, দিব্যালোকের দিকে ধীর নিশ্চিত পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইবে, তখন ত আর সাম্যে প্রতিষ্ঠিত বল-বিবর্জ্জিত সমাজ, আলেয়ার আলো থাকিবে না।

ইহার উত্তরে, রুশ্ ভূমির অরাজক-পন্থী টল্‌ষ্টয় আজ পঁচিশ বৎসর হইল বলিয়াছেন যে, শক্তি-মূলক রাষ্ট্রকে, শাসন-মুক্ত সহযোগিতা-মূলক সমাজে পরিণত করা হইবে, বল বা শক্তির সাহায্য ব্যতীত। শক্তির সাহায্য যদি একবার নিয়াছ, শক্তির সাহায্য তোমাকে চিরকাল নিতে হইবে। অরাজক-পন্থিদের বল বা শক্তির উপদ্রবে, বর্ত্তমান শক্তিমূলক রাষ্ট্রের অন্তর্দ্ধান, সহজ-সাধ্য হইবে না। যদি-ই বা বলের সাহায্যে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, তাহার স্থানে ভবিষ্যতে যে সমাজ গড়িয়া উঠিবে, তাহাও শক্তি-মূলক হইয়া দাঁড়াইবে। তাহা রক্ষা করিবার জন্য চিরকাল ঐ বল বা শক্তিরই সাহায্য প্রয়োজন হইবে। টল্‌ষ্টয় বলেন যে, এই শক্তি-মূলক রাষ্ট্র ভাঙ্গিতে হইবে। শাসন-মুক্ত, বল-বিবর্জ্জিত অরাজক-সমাজ গড়িতে হইবে। কিন্তু বল বা শক্তির তিলমাত্র সাহায্য লওয়া হইবে না। রাষ্ট্র তোমাদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করিবে; তোমরা কিন্তু বল প্রয়োগ করিতে পারিবে না। অশুভের বিনিময়ে অশুভ প্রতিদান করিতে পারিবে না। অশুভকে বলদ্বারা রোধ করিবে না (resist not evil)। ইহা যীশু-প্রচারিত প্রেমের ধর্ম্মের অনুজ্ঞা। রাষ্ট্র-শক্তি তোমাদিগকে ধরপাকড় করিবে, তোমাদের বিচার হইবে, বিচারে তোমাদের কারাবাস বা ফাঁসির আদেশ হইবে। তোমাদের কর্ত্তব্য, এই সকল অশুভের পরিবর্ত্তে, সরল শুভ-ইচ্ছার প্রতিদান; বিচারে যোগ না দেওয়া; কারাদণ্ড বা ফাঁসির আদেশ, হাসিমুখে দৃঢ়চিত্তে বরণ করিয়া লওয়া। তোমরা যদি এইরূপ অশুভের প্রতিদানে শুভ দিতে পার, রাষ্ট্রের ভিত্তি আপনি শিথিল হইয়া যাইবে। শক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশাল রাষ্ট্র আপনা আপনি ধসিয়া পড়িবে। রাষ্ট্র-শক্তি যখন তোমাদিগকে নির্য্যাতন করিবার চেষ্টা না করে, তখন তোমাদের কি কর্ত্তব্য? ঐ শক্তি-মূলক রাষ্ট্রের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের

পোষণ হয়, তোমাদেরই সহকারিতায়। তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমরা আর রাষ্ট্রের শিক্ষালয়ে শিক্ষকতা করিবে না, বা তোমাদের সন্তানদিগকে তথায় শিক্ষালাভের জন্য পাঠাইবে না। রাষ্ট্রের সৈন্য ত, তোমরাই। তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে, আর সৈনিকের কাজ করিবে না; সমর-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে যাইবে না; কেহ সৈনিক হইবে না, পুলিস হইবে না, বিচারক হইবে না, সাক্ষী হইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইবে না, ব্যবহার-জীবী হইবে না, পঞ্চায়েৎ সালিস হইবে না, জুরি (juror) হইয়া বিচারের সহায়তা করিবে না। তোমরা প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা কর, তোমরা ভূম্যধিকারী থাকিবে না, বণিক্ থাকিবে না, মুদ্রাযন্ত্র রাখিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে না, সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারী থাকিবে না। কারণ, প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে, সকলই শক্তি-মূলক রাষ্ট্রের সহায়ক ও বৈষম্য-পোষক। তোমরা ব্যবস্থাপক সভায় যাইবে না, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন সমিতিতে যোগ দিবে না। এক কথায় বৈষম্য প্রতিষ্ঠিত, শক্তি-মূলক রাষ্ট্রের যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহার সহায়তা বা পোষণ করিতে পারিবে না। সকলে বদ্ধপরিকর হইয়া এই প্রতিজ্ঞা পালন কর; দেখিবে, শাসন, ও শাসনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি-মূলক রাষ্ট্র অন্তর্হিত হইবে। বৈষম্য হইতে সাম্যে উপনীত হইতে পথে বল বা শক্তির পৈশাচিক লীলা একেবারে নিবারিত না-ও হইতে পারে; কিন্তু, তাহার জন্য তোমাদের দায়িত্ব থাকিবে না।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

কটকে মহাত্মা গান্ধী।

বিগত ২৩ শে মার্চ্চ, মহাত্মা গান্ধী কটকে আগমন করিয়াছিলেন। সেই দিবস ও তৎপর দিবস সন্ধ্যার সময় শুষ্ক "কাঠজুরী" নদীর বালুকাময় বিস্তীর্ণ গর্ভে দুইটী বিরাট সভা আহুত হইয়াছিল এবং তাহাতে মহাত্মা হিন্দীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রথম দিবস তিনি অসহযোগ নীতির মত ও উদ্দেশ্য সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা করেন, এবং দ্বিতীয় দিবস বিশেষ ভাবে ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতাতে বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুল কলেজ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া, অসহযোগনীতি অবলম্বনের আবশ্যকতা ছাত্রদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মুসলমানদিগের "কদম্-রসুল" এ ও হিন্দুদিগের "বিনোদবিহারী" মন্দির প্রাঙ্গনে তিনি আরও দুইটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। ২৪ শে মার্চ্চ, তিনি কটক পরিত্যাগ করেন। কাঠজুড়ী নদীগর্ভে তিনি যে দুইটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন আমি সেই দুইটী শুনিয়াছিলাম; তাঁহার অপর বক্তৃতা আমি শুনি নাই। তাঁহার বক্তৃতার ভাষা অতি সহজ ও সুমিষ্ট; তাহাতে অপরের প্রতি বিদ্বেষ নাই, কোন তীব্র সমালোচনা নাই, অযথা বাক্যাড়ম্বর নাই। কুৎসিত অশ্লীলতা তাঁহার বাক্যকে অপবিত্র করে না; অসহিষ্ণুতার তীব্র হলাহল তাঁহার বক্তৃতাকে বিষাক্ত করে না; একটী দিব্য শুভ্র পবিত্রতা তাঁহার সকল কথার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় মনকে পবিত্র করে। যাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করেন ও তাঁহার অসহযোগ

নীতির মত প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত মহাত্মার পার্থক্য দেখিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়।

দ্বিতীয় দিবসের বক্তৃতার পর মহাত্মার আহ্বানে শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেই সকল প্রশ্ন ও মহাত্মার প্রদত্ত উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথমেই একটী ছাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"যে সকল ছাত্রের গৃহ গড়জাত করদ রাজ্যে অবস্থিত, তাহারা যদি অসহযোগনীতি অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাদিগের পৈত্রিক সম্পত্তি রাজারা বাজেয়াপ্ত করিবেন। এরূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য।" মহাত্মা তাহার উত্তরে বলিলেন—"কোনও হিন্দু রাজা পুত্রের দোষে পিতার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না। যদি সত্য সত্যই এরূপ ঘটে, তথাপি অসহযোগনীতি অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য।" তৎপরে, অপর একটী ছাত্র বলিল—"ডাক্তারী পড়িতে তো কোনও দোষ নাই, কারণ তাহা দ্বারা সমাজের সেবা করা যায়। ডাক্তারী পড়াও কি ছাড়িতে হইবে!" মহাত্মা বলিলেন—"ডাক্তারী পড়িবার কোনও আবশ্যকতা নাই। ত্রিশকোটী লোক এখন দারিদ্র্য-দুঃখে প্রপীড়িত; তাহাদের জন্য ঔষধ প্রস্তুত করা আবশ্যক; ডাক্তারী পড়িয়া কি হইবে? আমি দিল্লীতে এক ইউনানী চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছি; যদি কাহারও চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিবার ইচ্ছা হয়, তবে সে সেই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তী হইতে পারে।" কেন যে ডাক্তারী শিক্ষা না করিয়া, ইউনানী শিক্ষা করিতে হইবে, এবং কটকের ছেলের পক্ষে দিল্লী যাইয়া শিক্ষালাভ করা সম্ভবপর ও সুবিধাজনক কিনা, আর সমগ্র ভারতবর্ষের ছাত্রদের পক্ষে সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করা সম্ভবপর কিনা, তিনি এ সকল বিষয় কিছুই বলেন নাই।

তৎপরে, আমি তাঁহাকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন সকল করিয়াছিলাম। আমি যখন আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতেছিলাম, তখন মহাত্মার শিষ্যবৃন্দ যথেষ্ট অসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন। মহাত্মা তাহাদিগকে নিষেধ করাতে, আমার বক্তব্য প্রকাশ করা সম্ভবপর হইয়াছিল; তিনি না থাকিলে, তাঁহার শিষ্যগণের হস্তে যে আমাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা-ভোগ করিতে হইত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যাহা হউক, আমি তাঁহাকে বলিলাম—

"আমি বহু সন্তানের পিতা এবং আমার সন্তানদিগের মধ্যে অনেকে বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্কুল ও কলেজে শিক্ষালাভ করিতেছে। আমি দুইদিন আপনার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি; সংবাদ-পত্রে আপনার যে সকল মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও পাঠ করিয়াছি। অপরদিকে, ভারতবর্ষের বিগত দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাসও আমি মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি আপনাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই—

"(১) আপনি কি ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ শাসনকে ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের হেতু বলিয়া মনে করেন?

"(২) ভারতের বিগত দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাস, আমাদের পরাধীনতারই ইতিহাস। পুনঃ পুনঃ আমরা বিদেশীর দ্বারা পরাজিত হইয়াছি এবং সুদীর্ঘকাল বিদেশীর শাসনাধীনে বাস করিতেছি। ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে তো এদেশে ইংরাজী-শিক্ষা ছিল না। তবে কেন ভারতের এরূপ দুর্গতি ঘটিয়া আসিতেছে?

"(৩) বর্ত্তমান সময়ে যে সমগ্র-ভারত-ব্যাপী রাজনৈতিক জাগরণ, যে জাতীয়তার ভাব দেখিতেছি, পূর্ব্বে তো কখনও তেমন জাগরণ দেখা যায় নাই। এই জাগরণ, ইংরাজী শিক্ষা ও শাসনের ফল বলিয়াই মনে হয়। তবে, ইংরাজী শিক্ষাকে নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের হেতু বলিয়া মনে করিব কেমন করিয়া ?

"(৪) ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশে অনেক মহাপুরুষকে উৎপন্ন করিয়াছেন ; যেমন রাজা রামমোহন রায়, লোকমান্য তিলক প্রভৃতি ; আপনি নিজেও তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। আপনারা কি ইংরাজী শিক্ষার ফল নহেন! তবে কেমন করিয়া বলিব ইংরাজী শিক্ষা ভারতের কোনই সুফল প্রসব করে নাই! *

"(৫) আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থাও ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। আপনি গতকল্য বলিয়াছিলেন যে, ভারতের বাইশকোটী লোক হিন্দু; কিন্তু, জাতিভেদের ফলে, বাইশ কোটী হিন্দুর মধ্যে, ছয়কোটী অস্পৃশ্য। বিড়াল ঘরে প্রবেশ করিলে, আমরা তাহাকে ঘৃণা করি না; কিন্তু আমাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ছয়কোটি লোককে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে। তাহা ছাড়া, অপরাপর নিম্নজাতির লোকও আছে, অস্পৃশ্য না হইলেও, যাহাদের সামাজিক অবস্থা অতীব হীন। আর তাহাদের সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দূর করিবার জন্য আমার মনে হয়, ইংরাজী শিক্ষার উদার সাম্যভাব, আমাদের সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। আর আমাদের সমাজের এই দুরবস্থা বিদূরিত হইবার পূর্ব্বে, যদি অসহযোগনীতির ফলে, স্বরাজ-লাভ আমাদের পক্ষে সম্ভবপরও হয়, তবে কি আমরা তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইব ?"

* 'রামমোহন ইংরাজী শিক্ষার ফল কি না'—এই প্রশ্নের উত্তর, সোজাসুজি 'না' বলা চলে না। 'ইংরাজী শিক্ষা' এই কথাটিকে আমি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছি ও করিতেছি। আমার মনে হয়, সেই অর্থে রামমোহনকে ইংরাজী শিক্ষার ফল বলিলে, বিশেষ দোষ হয় না। তিনি বোধ হয়, বাইশ বৎসর বয়সের সময় ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে তিনি ইউরোপের সকল প্রকারের উন্নত চিন্তা ও ভাবের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইউরোপের সকল উন্নত সাহিত্য তিনি প্রধানতঃ ইংরাজী সাহিত্যের সাহায্যেই অবগত হইয়াছিলেন। সেই সকল সাহিত্য যে তাঁহার চিন্তা ও ভাবকে বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে লর্ড আমহার্ষ্টকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 'ইংরাজী শিক্ষা' (ঐ বিস্তৃতির অর্থে) না পাইলে, সেইরূপ পত্র লিখিতে পারিতেন না। কেবল তাহাই নহে। রামমোহন ষোল বৎসর বয়সে, এই ইংরাজী শিক্ষালাভ করিবার পূর্ব্বেই, একেশ্বরবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু, রঙ্গপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া, সেই মত তিনি যখন রীতিমত প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার ইংরাজী শিক্ষাই তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য দান করিয়াছিল। তাঁহার অপর সকল প্রকারের সংস্কারের কার্য্যও (যে পরিমাণে এরূপ মহাপুরুষদিগের কার্য্যকে বাহিরের শিক্ষার ফল বলিতে পারা যায়, সেই পরিমাণে) ইংরাজী শিক্ষার ফল। যদি রামমোহনের জীবন হইতে ইহা বাদ দেওয়া যায়, তবে যাহা বাকী থাকে, তাহাতে তাঁহার বিশেষত্ব প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ইংরাজী শিক্ষা না পাইলে, তিনি নানক বা কবীরের মত একজন একেশ্বরবাদী মহাপুরুষ হইতেন মাত্র; রামমোহন হইতেন না। তাঁহার প্রকৃতির ভিতর যে একটী মহান বিরাটভাব প্রকাশিত হইতেছে, তাহা সমগ্র বিশ্বকে আপনার মধ্যে ধারণ করিতে ব্যগ্র। সেই বিরাটভাব ইংরাজী শিক্ষাই তাঁহাকে দান করিয়াছে। এই জন্য রামমোহনকে ইংরাজী শিক্ষার ফল বলিলে কোন দোষ হয় না।—লেখক।

আমার প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বলিয়াছেন—

"আমার বন্ধু যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, অনেক শিক্ষিত লোক সেই মত পোষণ করেন। কিন্তু, এই মতে অনেক ভ্রান্তি ও কুসংস্কার রহিয়াছে। সেই সকল ভ্রান্তি দূর করিয়া, আমাদিগকে স্বরাজ-যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে।

"আমার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ইংরাজী শিক্ষা ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের হেতু কি না? আমি তদুত্তরে জোরের সহিত বলিতেছি, নিশ্চয়ই তাহা অমঙ্গলের হেতু। ইংরাজী শিক্ষার মধ্যে ভাল কিছুই নাই। ঐ শিক্ষা ধ্বংস করিবার জন্য আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছি। যদি ইংরাজেরা এ দেশে না আসিত, তবুও আমরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত অগ্রসর হইতাম। এখন যদি মোগল-রাজ্য থাকিত, তবে অনেকে ইংরাজী শিখিত এবং তাতে সুফলও ফলিত; কিন্তু বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগকে গোলাম করিতেছে।

"আমার বন্ধু বলিয়াছেন, ইংরাজী শিক্ষা অনেক মহাপুরুষ উৎপন্ন করিয়াছে; তিনি রামমোহন, তিলক ও তৎসঙ্গে আমার নামও উল্লেখ করিয়াছেন। আমি অতি ক্ষুদ্রলোক (pigmy); আমার কথা ছাড়িয়া দিন। রামমোহন ও তিলক যে ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করি না; রামমোহন রায়কে আমি অতিশয় শ্রদ্ধা করি এবং তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করি; তিলককেও আমি ভক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রামমোহন, তিলক যদি ইংরাজী শিক্ষালাভ না করিতেন, তবে তাঁহারা যে আরও অধিকতর মহত্ব লাভ করিতেন না, তাহার প্রমাণ কি? ইংরাজী শিক্ষা না পাইয়া, আমাদের দেশে এমন সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদিগের তুলনায় রামমোহন বা তিলককে অতিক্ষুদ্র বামন (mere pigmies) বলিলেই হয়। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের তুলনায় রামমোহন ও তিলক অতীব নগণ্য। একা শঙ্কর যাহা করিয়াছেন, সমস্ত ইংরাজী শিক্ষিত লোক একত্র হইয়া তাহা করিতে পারে নাই। গুরুগোবিন্দ কি ইংরাজী শিক্ষার ফল? ইংরাজী-শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকদিগের মধ্যে কি এমন একজনও আছেন, নানকের সঙ্গে যাঁহার তুলনা করা যাইতে পারে? নানক এমন এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন, যাহার লোকেরা সাহস ও আত্মোৎসর্গের জন্য অদ্বিতীয়। রামমোহন রায়ের শিষ্যদের মধ্যে কি এমন একজনও জন্মিয়াছেন, যাঁহার সহিত স্বদেশ-বীর দলীপ সিংহের তুলনা করা যাইতে পারে? আমি রামমোহন ও তিলককে শ্রদ্ধা করি। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা যদি ইংরাজী না জানিতেন, তবে চৈতন্যের মত মহত্তর কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন। যদি ভারতবাসীকে জাগাইতে হয়, ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা হইবে না। হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত না জানাতে আমি যে কি ধনে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। ইংরাজী শিক্ষা আমাদিগকে মনুষ্যত্বহীন করিয়াছে ও আমাদিগের বুদ্ধিকে খর্ব্ব করিয়াছে। ইংরাজের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবাসী দাস ছিল না। মোগলের অধীনে আমাদের একরকম স্বরাজ ছিল। আকবরের সময় প্রতাপ ও আরংজীবের সময় শিবাজীর উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল। দেড়শত বৎসরের ইংরাজের শাসনে কি কোনও প্রতাপ

বা শিবাজী জন্মিয়াছেন। কিন্তু আমি ইংরাজী-শিক্ষাকে একেবারে ত্যাগ করিতে বলি না; যে প্রণালীতে ইংরাজী-শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সেই প্রণালীই ত্যাগ করিতে বলি।"

মহাত্মা গান্ধী, উপরোক্ত কথা বলিয়া, তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন। তখন আমি পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"অস্পৃশ্য জাতি সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?"

তাহাতে তিনি বলিলেন—"এই বিষয়টি আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। হিন্দু সমাজের এই প্রথা অতীব নিন্দনীয়। কংগ্রেসে এই মত ধার্য্য হইয়াছে যে, ভারত হইতে এই অস্পৃশ্যতা দূর করিতে হইবে। ইংরাজী-শিক্ষা এই প্রথাকে দূর করিতে সমর্থ হয় নাই। আমরা যখন স্বরাজ লাভ করিব, তখন তাহা দূর করিব।

"আমার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, স্বরাজ পাইলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব কি না। রাজ্য এখন তো আমরাই রক্ষা করিতেছি; স্বরাজ পাইলে, তখনও রক্ষা করিতে পারিব না কেন? অবশ্যই পারিব।"

এই সময় একজন উকীল বলিলেন,—"এই অবস্থায় স্বরাজ পাইলে, আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হইতে পারে; দেশে অরাজকতা আসিতে পারে।" মহাত্মা সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,—"তাহা হইতে পারে; বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা অরাজকতাও প্রার্থনীয়। আমি এই ইংরেজের সঙ্গে দীর্ঘকাল সহযোগিতা করিয়াছি, আমার মত কাজে সহযোগিতা কেহই করে নাই; কিন্তু আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, বর্ত্তমান ইংরাজ-শাসন, শয়তানের শাসন; এই শয়তানের রাজ্য ধ্বংস করিতে না পারিলে, ভারতের কল্যাণ নাই।"

এই সময় একজন শ্রোতা দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমরা জানিতে চাই, লালমোহন বাবু মহাত্মার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি না?" এই প্রশ্ন শুনিবামাত্র মহাত্মা গান্ধী বলিলেন—"এইরূপ প্রশ্ন করা উচিত নয়; আমার বন্ধু যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, সেই সকল বিষয় জটিল; এবং আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই সকল বিষয়ের মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর নহে; ধীরভাবে এই সকল বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক।" এই কথার পরে, আমার পক্ষে, সেই সভাতে আর কিছু বলা সম্ভবপর হয় নাই। মহাত্মা তৎপরে আমার প্রশ্ন ও উত্তর, হিন্দিতে তর্জ্জমা করিয়া, ইংরাজী অনভিজ্ঞ শ্রোতাদিগকে বুঝাইয়া বলিলে, সভাভঙ্গ হয়।

আমার বক্তব্য।

মহাত্মার উত্তরে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি কিনা, অনেকেই আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; সেই জন্য এই বিষয়ে আমার মত নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। আমি প্রথমেই বলিতেছি, মহাত্মার উত্তরে আমি তৃপ্ত হইতে পারি নাই। ইংরাজী-শিক্ষা ও ইংরাজ-শাসন ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের হেতু (source of unmixed evil), এই কথা সত্য নহে। তাঁহার কথার মর্ম্ম-গ্রহণে আমি অসমর্থ। বর্ত্তমান সময়ে, সমগ্র ভারতময় যে রাজনৈতিক জাগরণ, যে জাতীয়তা-বোধ দেখা দিয়াছে, পূর্ব্বে কখনও সেরূপ দেখা যায় নাই। ভারতবাসী যে একটী 'নেশন্', এই অনুভূতি ভারতের অতীত-যুগে কখনও জাগ্রত হয় নাই।

রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, পোষ্ট আফিস,, সংবাদপত্র-সর্ব্বোপরি ইংরাজী শিক্ষা, এই সকল মিলিয়া কি ভারতের রাজনৈতিক জাগরণ আনয়ন করে নাই? ভারতকে নব চেতনা দান করে নাই? ইংরাজ দীর্ঘকাল ভারতকে বহিঃশত্রু ও অন্তর্বিবাদ হইতে রক্ষা করিয়াছে; তাহারই ফলে কি আমাদের বর্ত্তমান একতা-বোধ সম্ভবপর হয় নাই? এতবড় একটা স্থূল সত্যকে গান্ধী মহাত্মা কেমন করিয়া অস্বীকার করিতেছেন? তিনি বলিয়াছেন, ইংরাজ না আসিলেও, ভারত, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত, অগ্রসর হইত। ইংরাজ না আসিলেও ভারতের অবস্থা যে উন্নত হইত, তাহা তিনি কেমন করিয়া স্থির করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না। তিনি প্রত্যক্ষকে ত্যাগ করিয়া, অনুমানকেই সত্য বলিয়া মনে করিতেছেন। ইংরাজ-শাসনে, ইংরাজী-শিক্ষার ফলে যে, ভারতে নব-জাগরণ আসিয়াছে, নব উন্মেষ হইয়াছে, তাহা তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এই প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করিয়া, অনুমানের উপর নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত কিনা, তাহা বুঝিয়া দেখিবার ভার, আমরা শিক্ষিত লোকদিগের উপর ন্যস্ত করিতেছি।

ইংরাজ না আসিলেও যে আমরা অগ্রসর হইতে পারিতাম, তাহার প্রমাণ কি? সাড়ে সাত-শত বৎসরের মুসলমান শাসনের ফল, ভারতের ইতিহাসেই বর্ণিত আছে। মুসলমান শাসনের গুণবশতঃ নহে, দোষবশতঃই, একদিকে প্রতাপ ও অপরদিকে শিবাজীকে উত্থিত করিয়াছিল। আবার সেই দোষই, ইংরাজের আগমন সম্ভবপর করিয়াছে। ইংরাজ বাহুবলে ভারত জয় করেন নাই; মুসলমান শাসনের ত্রুটী ও তাহার শেষ অবস্থার অরাজকতায় উৎপীড়িত হইয়া ভারত-বাসী ইংরাজকে সিংহাসন-দানে পূর্ণ সহায়তা করিয়াছে। সেই মুসলমান-শাসন যদি ভারতে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলেও ভারত উন্নতির পথে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত, একথা মহাত্মা গান্ধী কেমন করিয়া সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। ইংরাজ-শাসনে, প্রতাপ ও শিবাজীর অভ্যুদয় হয় নাই, সত্য। কিন্তু, তাহাতে ইংরাজ-শাসনের গৌরবই প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজ যদি মুসলমানের মত হইত, তবে যে বহু শিবাজীর অভ্যুদয় হইত না, তাহা কে বলিতে পারে?

আমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে মহাত্মা কিছুই বলেন নাই। কেন বলেন নাই, তাহা আমি জানি না। এই সকল বিষয়ে যদি তিনি কিছু বলিতেন, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইত যে, এমন সুদীর্ঘ পরাধীনতার ইতিহাস জগতে আর নাই। গ্রীক্, শক, হুন, কুশান, পাঠান, মোগল, ডচ্, ফরাসী, ইংরাজ, যখন যে আসিয়াছে, তখনই তাহারা এদেশে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছে। ভারত কদাচিৎ বিদেশীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এরূপ দুর্গতির কারণ কি? এমন দুর্গতির ইতিহাস জগতে কি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়? ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই দুর্গতির মূল কারণ বাহিরে নহে, ভিতরে! ভারত-সমাজের গঠন-প্রণালীর মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহাতে ভারতবাসীকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে; যাহাতে এক 'নেশনে' পরিণত হইতে দেয় নাই; এবং যাহার ফলে, ভারত চির-পরাধীন। সেই কারণ প্রধানতঃ হিন্দুসমাজের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। হিন্দুর বর্ণাশ্রম প্রথমতঃ ভেদবুদ্ধি ও তৎপরে ঘৃণা ও বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্ম্ম, হিন্দুসমাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছে। ফলে, ভারত-সমাজ ছিন্ন-ভিন্ন

হইয়া রহিয়াছে। একতার দৃঢ়বন্ধনে ভারত-সমাজ কোনকালেই আবদ্ধ হয় নাই। ভারত কোন কালেই 'নেশন্' হয় নাই। হিন্দুরা এই বিচ্ছিন্নতাকেই হিন্দুধর্ম্ম মনে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। বর্ণাশ্রম-বিভাগের উপর হিন্দুর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, দেশ হইতে তাহাকে দূর করা অতিশয় কঠিন হইয়াছে। কারণ, ধর্ম্ম মানব-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম ভাব। মানুষ সহজে ধর্ম্মকে ত্যাগ বা সংশোধন করিতে সমর্থ হয় না। প্রকৃত ধর্ম্মের কাজ, মানবকে মুক্তিদান করা; ক্ষুদ্রতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহাকে উদার প্রেমের ভূমিতে লইয়া যাওয়া। কিন্তু, ভারতে বর্ণাশ্রম, ক্ষুদ্রতাকেই ধর্ম্মের ভিত্তি করিয়াছে; ঘৃণাকেই তাহার প্রাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে; সেই জন্যই সে ভারতকে ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়াছে। সকল দেশেই এমন এক একটী সময় আসে, যখন ধর্ম্মান্ধতার সঙ্কীর্ণতা সমাজের উন্নতির ব্যাঘাত ঘটায়। সেই সময়, সেই সঙ্কীর্ণতাকে ভাঙ্গিয়া যাহারা অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারাই কল্যাণ-লাভ করিয়াছে। ইউরোপের ইতিহাস তাহাই প্রমাণ করিতেছে। আমরা আজ পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমের সংকীর্ণতা দূর করিতে সমর্থ হই নাই। সেই জন্যই আমাদের দুর্গতির অন্ত নাই। যতদিন এই অন্ধতা ও সঙ্কীর্ণতার হস্ত হইতে ভারত মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ না হইবে, ততদিন তাহার দুর্গতি ঘুচিবে না। ইংরাজি-শিক্ষা সেই মুক্তির বার্ত্তা আনয়ন করিয়াছে; ইংরাজি-সাহিত্য ভারতবাসীর মনকে সঙ্কীর্ণতার হস্ত হইতে মুক্ত করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে, প্রাচীন-রীতি অনুসারে, সংস্কৃত শিক্ষাও যথেষ্ট চলিতেছে; বহু টোল, মঠ ও আশ্রমে সেই শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে। সংস্কৃত শিক্ষিত ও ইংরাজী শিক্ষিত লোকের মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে মত ও আচারের যে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এই দেশের এত ক্ষতি করিয়াছে, ইংরাজি শিক্ষা তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে; আর, প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষা, ফলতঃ তাহাকেই ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। ইংরাজি শিক্ষিত ও সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রাপ্ত লোকদিগের আচার ব্যবহার দেখিলেই, এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

আমি বলিয়াছিলাম, ইংরাজি-শিক্ষা অনেক মহৎ লোক উৎপন্ন করিয়াছে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রাজা রামমোহন, লোকমান্য তিলক ও মহাত্মা গান্ধীর নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম। ঐ সকল লোক যে মহৎ, তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, "ইংরাজী শিক্ষা না পাইলে, রামমোহন ও তিলক যে আরও বড় হইতেন না, তাহার প্রমাণ কি?" মহাত্মার এই জবাব শুনিয়া আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। রামমোহন, তিলক বা গান্ধী ইংরাজী শিক্ষা না পাইলে কি হইতেন, তাহা কেমন করিয়া স্থির করা যাইবে? ইংরাজী শিক্ষা না পাইলে; তাঁহারা যে নগণ্য হইতেন না, তাহারই বা প্রমাণ কি? মহাত্মা নিজে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি সংস্কৃত বা হিন্দী ভাষাতে শিক্ষিত হন নাই; সেজন্য তিনি দুঃখও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র ভারত আজ তাঁহাকে যে উচ্চ-আসন প্রদান করিয়াছে, ভারতের অতীতকালে কোনও লোকের ভাগ্যে এরূপ ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। হিন্দু তাঁহাকে ভগবানের অবতার, মুসলমান তাঁহাকে পয়গম্বর বলিয়া ভক্তি করিতেছে। আমেরিকার কোনও সংবাদপত্র তাঁহাকে বর্ত্তমান সময়ে জগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। আরও শুনিতেছি,

যে তিনি ঋষি-শ্রেষ্ঠ টলষ্টয়ের শিষ্য ; ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে তিনি টলষ্টয়ের আদর্শকেই অবলম্বন করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি, ইংরাজী-শিক্ষা কি তাঁহাকে এই সম্পদ দান করে নাই? তাঁহার হৃদয়-মনকে বিকশিত করে নাই? ইংরাজী কি তাঁহার জীবনে বৃথা হইয়াছে? তিনি কি তাঁহার মত ও ভাব ইংরাজী শিক্ষা হইতে লাভ করেন নাই? যে অস্পৃশ্যতাকে দূর করিবার জন্য তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, ইংরাজী শিক্ষা কি তাঁহাকে সেই বিষয়ে সাহায্য দান করে নাই? তবে, কেমন করিয়া বলিব যে, ইংরাজী শিক্ষা ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের হেতু? যে শিক্ষা ভারতে একজন গান্ধী উৎপন্ন করিয়াছে, যে শিক্ষা বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকে জন্ম দিয়াছে, সেই শিক্ষা কি বিফল হইয়াছে?

এতদ্ব্যতীত, ইংরাজী শিক্ষা ভারত-সমাজের সকল বিভাগেই নব জীবন আনয়ন করিয়াছে। কথাটা একটু ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। বেকনের (Lord Bacon) পরে যে বিজ্ঞান-মূলক শিক্ষা ইউরোপে প্রবর্ত্তিত হইয়া তাহাকে মুক্তিদান করিয়াছে, অন্ধ কুসংস্কারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে উন্নত করিয়াছে, মধ্যযুগীয় খৃষ্টধর্ম্মের ভীষণ অন্ধকার হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে, এবং নব নব বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বসকল আবিষ্কার করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে, যাহার ফলে ইউরোপ ও আমেরিকা আজ অসীম শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, বর্ত্তমান ভারতের পিতৃ-স্থানীয় রাজা রামমোহন ভারতে সেই শিক্ষা-প্রবর্ত্তন করিবার জন্য, লর্ড আমহার্ষ্টকে পত্র লিখিয়াছিলেন। ভারতের হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্ম, পুরাণ, গৃহ্যসূত্র, স্মৃতি ও দেশাচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সকল সাহিত্য ও দেশাচারে ভারতে কি ঘটিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। জাতিভেদ, বাল্য-বিবাহ, নারীর অবরোধ ও অজ্ঞতা,—টিকটিকি, হাঁচি, তাগা, মালা, বৃহস্পতির বারবেলা, ডাকিনী যোগিনী ইত্যাদি,—মিলিয়া ভারতে যে অন্ধকার সৃজন করিয়াছে, সংস্কৃত বা আরবী শিক্ষাতে তাহা দূর হইবার নয়। সেই জন্য রামমোহন ইংরাজী-শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

যাঁহারা ইউরোপের শিক্ষার ক্রমবিকাশের ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন বিজ্ঞান-মূলক-শিক্ষা ইউরোপে কি মহৎ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে। তাহাকে অন্ধকারের হস্ত হইতে মুক্তিদান করিয়াছে। ইউরোপের খৃষ্টানগণ ডাইনীতে (witch-craft) বিশ্বাস করিতেন। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহারা লক্ষ লক্ষ নরনারীকে জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক-শিক্ষা এইরূপ অশেষ কুসংস্কার হইতে মুক্তিদান করিয়াছে; আর সেই মুক্তির ফলে, আজ ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য অদ্ভুত ভাবে উন্নত হইয়াছে। আমাদের দেশেও যাঁহারা এই শিক্ষার সংসর্গে আসিয়াছেন, তাঁহারাও উন্নতিলাভ করিতেছেন। এই শিক্ষার প্রভাবে, বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ স্যার জগদীশ চন্দ্র, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যগণ জগতের মুখ উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই শিক্ষা, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র ও জগৎ-বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবি, ও অপরদিকে, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, রমেশচন্দ্র, ও অপরাপর সাহিত্যিক দিগকে সৃজন করিয়াছে। আনন্দমোহন, তারকনাথ পালিত, সুরেন্দ্রনাথ, দাদাভাই নওরোজী, রানাডে, তিলক, গোখলে, পরাঞ্জপে, চিত্তরঞ্জন, লাজপৎ রায় প্রভৃতি মহামনা

রাজনৈতিকগণ এই শিক্ষারই ফল। আবার অপরদিকে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র শিবনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও সমাজ-সংস্কারকগণ এই শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত। এই শিক্ষা ভারতের নারী-সমাজের অবস্থাও উন্নত করিয়াছে; তরুদত্ত, রমাবাই, সরোজিনী নাইডু, সরলা দেবী, কামিনী রায় প্রভৃতি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জিজ্ঞাসা করি, এত অল্প সময়ের মধ্যে, এত অধিক সংখ্যক মহামনা লোক কি কোনও যুগে, অপর কোন শিক্ষার ফলে, ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ?

মুসলমানগণ সাড়ে সাত শত বৎসর ভারতে রাজত্ব করিয়াছে। মহাত্মা বলেন, সেই সময়, ভারত কতক পরিমাণে স্বাধীন ছিল; তাই প্রতাপ ও শিবাজীর অভ্যুত্থান হইয়াছিল। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তাঁহারা কি ভারতকে মুক্তিদান করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন ? শিবাজীর পরেই, মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া, ধ্বংসের মুখে পতিত হইয়াছিল। আর, প্রতাপের বীরত্বের ফলে, ভারতে কি স্থায়ী ফল হইয়াছে; ভারতের অন্ধকারই বা কতদূর অপসারিত হইয়াছে ? শিবাজী ও প্রতাপ মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন। আজ কিন্তু গান্ধী, মুসলমানদিগকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। শিবাজী বা প্রতাপ কি তাঁহাকে এই শিক্ষা-প্রদান করিতেছেন ? জাতিভেদের বিষময় ফল হইতে, দেশকে কি তাঁহারা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? অনুদার ধর্ম্মান্ধতা হইতে কি তাঁহারা ভারতকে মুক্তিদান করিয়া ছিলেন ? যদি তাঁহারা তাহা করিতে সমর্থ হইতেন, তবে আজ ইংরাজের আগমন সম্ভবপর হইত না। ইংরেজ-শাসনে শতদোষ থাকিলেও, সে ভারতে মুক্তির বার্ত্তা আনয়ন করিয়াছে; ভারতবাসীর মনের অন্ধকার দূর করিয়াছে; পুরাতনের মোহ ত্যাগ করিয়া, নবীনকে সে বরণ করিতে শিখাইয়াছে; সে তাহার চিন্তাকে স্বাধীন ও হৃদয়-মনকে মুক্ত করিয়াছে। এত বড় কাজ পূর্ব্বে কেহই করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, ইংরাজ-শাসন ও ইংরাজী-শিক্ষা ভারতের নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলই করিয়াছে ?

মহাত্মা গান্ধী একস্থানে বলিয়াছেন যে, তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর ভিতর ইংরাজী সাহিত্যও থাকিবে। তিনি বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীরই বিরোধী; ইংরাজী সাহিত্যের বিরোধী নহেন। মহাত্মার সকল কথার অর্থ, সহজে বোধগম্য হয় না। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী যে কিরূপ আকার ধারণ করিবে, তাহা ভারতবাসী আজিও বুঝিতে পারে নাই। সেই শিক্ষা-প্রণালীকে নির্দ্দিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া মূর্ত্তিদান করিবার পূর্ব্বেই, তিনি বর্ত্তমান বিদ্যা-মন্দির সমূহ চূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালী যে বর্ত্তমান প্রণালী অপেক্ষা উন্নততর হইবে, তিনি তাহার কোনই প্রমাণ প্রদান করেন নাই। অগ্রে উৎকৃষ্টতর প্রণালীর শিক্ষা প্রবর্ত্তিত না করিয়া, বর্ত্তমান বিদ্যা-মন্দির সমূহকে ধ্বংস করিবার, তাঁহার কি অধিকার আছে, জানি না। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে যে দোষ নাই, তাহা কেহই বলে না। দোষ থাকিলে, তাহাকে সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও উন্নত করা আবশ্যক। ধ্বংস করিবার অধিকার কাহারও নাই। গান্ধী মহাশয় ভারতে শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করেন নাই। সেই জন্যই বা তিনি নির্ম্মম হইয়া, বর্ত্তমান শিক্ষা কেন্দ্র-সমূহকে ধ্বংস

করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যে নূতনত্ব থাকিতে পারে; কিন্তু, কতদূর সমীচীনতা আছে, ভাবিবার বিষয়।

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার শিষ্যগণ দেশের প্রচলিত শিক্ষা-কেন্দ্র সমূহকে ধ্বংস করিবার আবশ্যকতা প্রমাণ করিবার জন্য, সর্ব্বদাই একটা কথা বলিয়া আসিতেছেন, সেই কথার অর্থ আমরা আজও বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহারা বলেন, বর্ত্তমান শিক্ষা নাকি ভারত-বাসীর মনে দাস-ভাব (slave mentality) উৎপন্ন করিতেছে। এই slave mentality কথাটার অর্থ পরিষ্কার করিয়া বুঝা আবশ্যক। মহাত্মা অনেক সময় বলেন—read English as an Indian nationalist would do। এই কথাতে মনে হয় যেন তিনি মনে করেন যে, ইংরাজী-শিক্ষা ভারতবাসীর জাতীয়তার ভাব বিনাশ করিতেছে। এই কথা কি ঠিক? ভারতে যেমন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন; সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী শিক্ষিত ব্যক্তিও যথেষ্ট আছেন। ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসীরা কি, সংস্কৃত ইত্যাদি শিক্ষা-প্রাপ্ত ভারতবাসী অপেক্ষা নিজের দেশকে কম ভালবাসেন? কাহারা ভারতে স্বাধীনতার জন্য যত্ন করিতেছেন? জাতীয় মহাসমিতি কাহারা স্থাপন করিয়াছেন? কাহারা প্রকৃতপক্ষে Indian nationalists? যাহারা Indian National Congress স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা কি Indian nationalists নহেন? আর Indian National Congress কি ইংরাজী-শিক্ষার ফল নহে?

আরও একটা কথা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য, মানবের বিচার-শক্তিকে প্রখর করা; মনকে মুক্ত করা। সে যাহাতে স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া, সকল বিষয়ের ভালমন্দ সকল দিক দেখিয়া, মন্দকে বর্জ্জন ও ভালকে গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ শক্তি তাহাকে দেওয়া, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বিচার না করিয়া, কোন বিষয় গ্রহণ করা, মানবের দাস-ভাবের (slave mentality) লক্ষণ। তাঁহার কথা শুনিয়া যেন এই মনে হয় যে, ইংরাজী-শিক্ষা ভারতবাসীর মনের সেই বিচার-শক্তি, সেই মুক্তভাব প্রদান করিতেছে না, যাহা পাইয়া সে সকল বিষয় বিচার করিতে সমর্থ হয়; এই শিক্ষা যেন শিক্ষিত লোকের মনকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেছে; তাহার মনে অন্ধকার সৃজন করিতেছে; পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষ সে দেখিতে পাইতেছে না; অবিচারিতভাবে সে সকল বিষয় গ্রহণ করিতেছে। জিজ্ঞাসা করি, যথার্থই কি ইংরাজী শিক্ষা ভারতবাসীকে অন্ধ করিতেছে? তবে মুক্তির বার্ত্তা ভারতে আনয়ন করিল কোন্ শিক্ষা? সংস্কৃত শিক্ষা কি ভারতবাসীকে সেই মুক্তি দান করিতেছে? বিচার না করিয়া কোন বিষয় গ্রহণ করা যদি মানসিক দাসত্বের লক্ষণ হয়, তবে ত্রিশকোটি ভারতবাসীর মধ্যে কয়জন সেই দাসত্ব হইতে মুক্ত? কয়জন ভারতবাসী ভারতের আচার, ব্যবহার, কুসংস্কার, ধর্ম্ম, সামাজিক ব্যবস্থা সকল, স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া, গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের কয়জন লোকের সেই শক্তি ও শিক্ষা আছে? স্বদেশের অশেষবিধ কুসংস্কার ও অন্ধ-ধর্ম্ম ও অন্যায় আচার ব্যবহার, অবিচারে গ্রহণ করিলে কি দাস-ভাব প্রকাশ পায় না? সেই দাসত্ব কি ভারতবাসীর অতি পুরাতন ভাব নহে? অবিচারে দেশাচারের দাস হইয়াও কি Indian nationalists হওয়া যায় না? Nationalist হইলেই

কি rationalist হয়? এই কথাই কি সত্য নহে যে, ইংরাজি শিক্ষাই কতক পরিমাণে তাহাকে বিচার-শক্তি দান করিতেছে—তাহাকে rational করিতেছে?

তিনি বলিয়াছেন "ইংরাজী শিক্ষা না পাইয়া এমন সকল লোক ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের তুলনায় রামমোহন ও তিলক অতি ক্ষুদ্র এবং নগণ্য। শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীর প্রভৃতির তুলনায়, রামমোহন ও তিলক বামন মাত্র (mere pigmies)"। মহাত্মার এই সকল কথার মধ্যে সুযুক্তির অভাব। এই স্থানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আমি কোনরূপ তুলনা করি নাই; পুরাতন কালে, ভারতে মহামনা লোক সকল জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমন কথাও বলি নাই; তাহাদের সঙ্গে বর্ত্তমান কালের মহৎ লোকদিগের তুলনাও করি নাই। এইরূপ তুলনা বাঞ্ছনীয় নহে। তথাপি মহাত্মা তুলনা করিয়াছেন বলিয়া, সেই বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। তিনি বলেন, শঙ্কর বা রামানুজ, রামমোহন বা তিলক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। কি কারণে তিনি তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠতর মনে করেন, তাহা তিনি বলেন নাই, বা বলিবার আবশ্যকতা মনে করেন নাই। কেহ যদি বলেন যে, রামমোহন শঙ্কর অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ, আর তিলকের তুলনায় রামানুজ নগণ্য, মহাত্মা গান্ধীর তুলনায় নানক বা কবীর অতিশয় ক্ষুদ্র, তবে সেই কথার জবাব কি? কোন্ মাপকাঠিতে মাপিয়া, তিনি শঙ্করকে রামমোহন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা না জানিয়া, মহাত্মার এই উক্তিকে অবিচারিত ভাবে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। দুইজনের মধ্যে তুলনা হইলে, উভয়েই এক জাতীয় এবং সমসাময়িক লোক হওয়া আবশ্যক। শঙ্কর ও রামানুজ উভয়েই দার্শনিক; উভয়ের মধ্যে তুলনা সম্ভবপর। কিন্তু, শঙ্কর বড়, কি আর্য্যভট্ট বড়; রামানুজ বড় কি স্যার জগদীশচন্দ্র বড়; এই কথা স্থির করিব কেমন করিয়া? একজন দার্শনিক, অপরজন বৈজ্ঞানিক। এইরূপ স্থলে, ছোটবড় নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। ইংরাজী-শিক্ষার ফলে, ভারতে যে সকল মহৎলোক উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত, অতীতকালের লোকদিগের তুলনা করিতে যাইয়া, মহাত্মা এই সকল কথা বোধ হয় চিন্তা করেন নাই। তিনি অতীতকালের কয়েকজন ধর্ম্ম প্রচারকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইংরাজী শিক্ষার ফলে এইরূপ লোক উৎপন্ন হয় নাই। ইংরাজী-শিক্ষার পূর্ব্বে, ভারতে মহৎলোক জন্মগ্রহণ করেন নাই, এমন কথা কেহই বলিবেন না। কিন্তু, ইংরাজী-শিক্ষা যে সকল মহৎলোক উৎপন্ন করিয়াছে, তাঁহারা যে অতীতকালের মহৎ লোক অপেক্ষা হীন, এই কথা গান্ধী মহাশয় প্রমাণ করিতে পারেন নাই। আর তাহা বোধ হয় প্রমাণ-সাধ্যও নহে।

তাহার পর জীবন উৎসর্গ করিবার কথা; মৃত্যুকে বরণ করিবার কথা। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—"শিখ-সম্প্রদায় হইতে কত লোক ধর্ম্মার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। এখন সেই রূপ লোক দেখিতে পাওয়া যায় না; রামমোহন বা তিলক সেই রূপ লোক প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য জীবন দিতে পারে এমন লোক এখন কোথায়!"

জীবন-দান করিতে হইলে, এক দিকে জীবনদাতার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বল চাই, অপর দিকে, ভীষণ অত্যাচার ও জীবন-হন্তা চাই। খৃষ্টের লক্ষ লক্ষ শিষ্যকে ধর্ম্মের জন্য জীবন দিতে হইয়াছে। তাহার এক কারণ খৃষ্টানদিগের প্রবল ধর্ম্মানুরাগ; অপর দিকে,

তাহাদের উপর, বিরুদ্ধ-পক্ষের ভীষণ অত্যাচার। এই দুইটী কারণ একত্রিত হইলে তবে জীবন-দান সম্ভবপর হয়। পূর্ব্বে, জগতে মানুষকে সহজেই বধ করা হইত; এখন আর সেইরূপ অত্যাচার জগতে নাই। সেই জন্যই জীবন-দানের সম্ভাবনা ও আবশ্যকতা জগৎ হইতে চলিয়া যাইতেছে। সেই জন্য martyr হওয়া এখন সহজ নহে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার শিষ্যদিগের সম্বন্ধে এখন যে উদারতা ও সহিষ্ণুতা দেখাইতেছেন, মুসলমান আমলে সেইরূপ উদারতা ও সহিষ্ণুতা সম্পূর্ণই অসম্ভব ছিল। মুসলমানের অত্যাচারেই শিখের আত্ম বলিদান আবশ্যক ও সম্ভবপর হইয়াছিল। এখন ততদূর অত্যাচার হয় না। ইহাতে ইংরাজ-শাসনের গৌরবই প্রকাশ পাইতেছে। এখন মানুষকে বধ করা হয় না বলিয়া কি মনে করিতে হইবে যে, এখনকার লোকদিগের অত্যাধিক বল ও নৈতিক বল নাই! রামমোহন, তিলক ও গান্ধীকে শূলে চাপাইয়া হত্যা করা হয় নাই বলিয়া কি মনে করিতে হইবে যে, এই সকল মহাপুরুষদিগের জীবন-দান করিবার শক্তি ছিল না, বা নাই! স্বদেশী-আন্দোলনের সময় কি বঙ্গের যুবকগণ জীবন-দান করেন নাই! আবশ্যক হইলে কি এখনও শত শত লোক জীবন দিতে পারে না? সেই আশা আছে বলিয়াই তো গান্ধীর এই আন্দোলন সম্ভবপর হইয়াছে. তাহা না হইলে তো সকলই বৃথা। তবে কেমন করিয়া বলি যে ইংরাজী-শিক্ষার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক-শক্তি লুপ্ত হইয়াছে!

সর্ব্বশেষে, মহাত্মা গান্ধী স্বীকার করিয়াছেন যে, বর্ণাশ্রমের ফলে যে ছয় কোটী লোককে অস্পৃশ্য করিয়া রাখা হইয়াছে, এই ব্যাপারটা হিন্দু সমাজের অতীব গুরুতর অপরাধ; এই দোষ দূর করা আবশ্যক। কংগ্রেস্ কি ইংরাজি শিক্ষার ফল নহে! কংগ্রেস কি ভারতে রাজনৈতিক জাগরণ আনয়ন করেন নাই? সাড়ে সাতশত বৎসরের মুসলমান শাসন কি ভারতে কংগ্রেসের মত জাতীয় মহাসমিতি গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল! ইংরাজী-শিক্ষা যদি আর কিছু না করিয়া কেবল মাত্র জাতীয় মহাসমিতি গঠন করিয়াই ক্ষান্ত হইত, তাহাতেই তাহার সার্থকতা যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণিত হইত ও তাহার মহিমা ভারত ইতিহাসে চিরদিন ঘোষিত হইত। যাহা হউক, জাতিভেদের মূলে যে অত্যাচার, হৃদয়হীনতা ও স্বার্থপরতা বর্ত্তমান আছে, তাহা মহাত্মা গান্ধী জানেন। এই অত্যাচার কি ডায়ার ও ওডায়ারের অত্যাচার অপেক্ষা হীন? মান্দ্রাজের অস্পৃশ্যজাতির সংখ্যা, ষাট লক্ষ। তাহারা গত নভেম্বর মাসে সভা করিয়া একবাক্যে বলিয়াছে যে, ডায়ার কয়েকজনমাত্র লোককে খুন করিয়াছে ও কয়েকজনকে বুকে হাঁটাইয়াছে, তাহাতেই মহাত্মা গান্ধী ইংরেজ রাজ্য ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের ষাট লক্ষ লোককে সমাজ, শত শত বৎসর ধরিয়া, রাজপথে বুকে হাঁটিয়া যাইবারও অধিকার প্রদান করিতেছে না, মহাত্মা গান্ধী তাহার কি প্রতিকার করিতেছেন। তাহারা যে প্রস্তাবটি ধার্য্য করিয়াছে, নিম্নে তাহার কতক অংশ প্রদত্ত হইল—

"And this meeting is firmly convinced that General Dyer was an angel of mercy*compared with the caste-system or *Varnashrama Dharma* which resulted in racial segregation and conseqently living death of sixty millions of men and women for so many centuries, and that Colonel Frank Johnson, who ordered Indians to crawl on their bellies through certain streets in Amritsar, was the soul of compassion

compared with those *Varnashsama Dharmists* who could not allow members of our community even to crawl on their bellies through their streets, and calls upon Mr Gandhi and his co-workers to have moral courage to remove those grosser and greater social wrongs of ages, before trying to redress lesser political wrongs of yesterday and seeking to destroy the British Government, which has been and still is, on the whole, the justest and best Government which India has or can have at the present imperfect stage of her national evolution."

উদ্ধৃত মন্তব্যটীর প্রত্যেক বাক্য কি নির্দ্দেশ করে? যে উকীল ওকালতি ত্যাগ করে নাই, রাজনৈতিক আন্দোলনে সে নায়ক হইতে পারিবে না বলিয়া মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যে জাতিভেদ ত্যাগ করে নাই, তাহার বিরুদ্ধেও তেমনি আদেশ দেখিতে চাই। যতদিন ভারতে বর্ণাশ্রম মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত না হইবে, ততদিন স্বরাজ স্থাপনের আশা, সুদূর পরাহত। গান্ধী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, বর্ত্তমান সামাজিক দুর্গতি দূর হইবার পূর্ব্বে যদি অসহযোগ-নীতির ফলে স্বরাজ লাভ করি, তবে কি তাহা রক্ষা করিতে পারিব? তিনি তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীই তো এখন রাজ্য রক্ষা করিতেছে, স্বরাজ পাইলে তাহা কেন রক্ষা করিতে পারিবে না? মহাত্মার এই কথারও মর্ম্ম আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে অক্ষম। আমরাই যদি রাজ্য রক্ষা করিতেছি, তবে অসহযোগ-নীতির আবশ্যকতা কি? ইংরাজ যদি আজ চলিয়া যায়, আমরা কি বহিঃশত্রু হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারিব? পারস্য, আফগানিস্থান, চীন, জাপান কি ভারতকে আক্রমণ করিবে না? পারস্য বা আফগানিস্থান যদি এদেশকে আক্রমণ করে, তবে এদেশের মুসলমানগণ কি তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবে না? ভারতের মুসলমান তাহাদের খলিফার জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে কি ভারতের রাজনৈতিক আকাশে মেঘের সঞ্চার হইতেছে না? মুসলমান, খলিফাকে যে পরিমাণ ভালবাসে, ভারতকে কি সেই পরিমাণ ভালবাসে? হিন্দুর স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে, মুসলমান কি খলিফার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে? চীন বা জাপান আসিলে, কি ভারত আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? যে দেশের বাইশ কোটি লোক মৃতপ্রায়, যে দেশের দুর্গতির সীমা নাই, সেই দেশ, এক বৎসরের মধ্যে, স্বরাজ লাভ করিবে, এ কথা আলাউদ্দিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের গল্পের মত। শিক্ষিত ভারতবাসী এই সকল কথা ভাবিয়া দেখিবেন।

শ্রীলালমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ব্রহ্মতেজ।

সে বৎসরে,
পদ্মার দুকূলগ্রাসী বিপুল খর্পরে
সঁপি ঘরবার,
বাহিরিল পথে, বিপ্র হরিদাস, সহপরিবার,
স্মরি দুর্গানাম,
—অজানা পথের যাত্রী, অসহায়, অনশনকাম।

দিবা দ্বিপ্রহরে।
বিশুষ্ক, বিদীর্ণ, দগ্ধ, পঙ্কল, প্রান্তর।
মাথার উপরে দীপ্যমান্
অধৃষ্য সহস্ররশ্মি, অগ্নিবর্ষী, খর বিবস্বান,
সমুজ্জ্বল Monocle ধূর্জ্জটির ললাট নয়নে।
ব্যথিছে চরণে

রৌদ্রদীপ্ত, তপ্তবালু, রাজবর্ত্ম খরক্ষুরধার।
মূহ্যমান্ জগত সংসার,
বিশাল অম্বরে নাহি বারিবিন্দুলেশ,
জন-কোলাহল-শূন্য বিষণ্ণ প্রদেশ—
বিরল বসতি
দিগন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রে নাহি ছায়া, নাহি বনস্পতি
শুধু মাঝে মাঝে,
দু-চারিটী তালতরু নিস্পন্দ বিরাজে,
মধ্যাহ্ন আলোকে
প্রকট বিস্ময়-চিহ্ন ছায়ান্বেষী পথিকের চোখে।

অনভ্যস্ত গুরু শ্রম, তাহে অনাহার।
সুখের কোমল ক্রোড়ে লালিত, পালিত, সুকুমার
কয়টী পরাণী
বিষম দুর্গম পথ কেমনে বাহিবে নাহি জানি;
ব্রাহ্মণীর রোগক্লিষ্ট দেহযষ্টিখানি
ভাঙ্গি পড়ে পড়ে
কণ্ঠে লগ্ন অবসন্ন শিশুকন্যা, না নড়ে না চড়ে
স্খলিত-জড়িত গতি তন্দ্রালস তিনটি বালক,
নাবালক।
বিক্ষত চরণ হতাশ্বাস
হরিদাস
অগত্যা নিকটে ক্ষুদ্র কুটীর নেহারি
দাঁড়াইল দ্বারদেশে দিবসের আশ্রয় ভিখারী।

গৃহবাসী ফকির মণ্ডল,
কৃষিবল,
মাঠ হতে কিছুক্ষণ ফিরিয়াছে ঘরে,
জ্বলন্ত উদরে
এখনো পড়েনি অন্ন, শুষ্ককণ্ঠে পড়ে নাই জল,
ঘর্ম্মধারা মুছে নাই অঙ্গ হতে, পরাণ বিকল
ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, অবসাদে।
বচসা করিতেছিল, পত্নীসনে নিরত বিবাদে।
সহসা বাহিরে
হেরি পথশ্রান্ত অতিথিরে,
ভুলে গেল আপনার ব্যথা,
কলহের কথা
নিবারে জঠর বহ্নি, শান্ত করি অন্তরের দাহ,
প্লাবিল দু-আঁখি তার বুকভরা করুণা-প্রবাহ।

ছুটে এসে
ভূমিতে ঠেকায়ে মাথা, প্রণমিল চরণ উদ্দেশে,
সকলেরে ভক্তি-নত-শিরে,
গলবস্ত্রে, করযোড়ে, আমন্ত্রিল দরিদ্র কুটীরে।
বসাইল রোয়াকের ছায়ে
মাদুর বিছায়ে,
দুলাইল ঘন ঘন তালবৃন্ত, শ্রান্তি অপহারী,
আনি দিল সুশীতল বারি,
পান, চূণ, খদির, গুবাক,
নূতন কলিকা ভরি সাজিল তামাক,
কলাপাতে বানাইল নল,
সুবিমল,
গোশালা মার্জ্জনা করি একপ্রান্তে পাতিল উনান
জোগাইল রন্ধনের যত অনুষ্ঠান,
আনি দিল কাঠ, পাতা, তেল্‌নুন, দুগ্ধ ঘৃত ডাল,
মোটাচাল,
কৃষকের হৃদিরক্তে রক্তিম সে,
পুষ্ট শ্রদ্ধারসে।—
সমর্পিল রিক্ত-প্রায় করিয়া ভাণ্ডার
দীন উপহার।
কিন্তু তাহে শান্তি নাহি মানে,
ছুটে গেল গ্রামান্তরে ফলমূল আদির সন্ধানে।
বাড়াইতে অতিথির সুখ
সর্ব্বস্ব সঁপিতে চায়, চিত্ত উন্মুখ,
স্বার্থে নির্ম্মম
নবজাত শিশু লাগি মাতৃস্তন সম।

গত-প্রায় দিন।
হরিদাস সপুত্রক সবেমাত্র আহারে আসীন,
সফেন, সবাষ্প অন্নে তখনো আতপ্ত কলাপাত,
এমন সময়ে অকস্মাৎ—
দু-চারিটী ডাব হাতে, উৎফুল্ল ফকির
একেবারে সম্মুখে হাজির!

ব্রাহ্মণেরে ভদবস্থ হেরি
তখনি পালাল কিন্তু, ক্ষণমাত্র না করিয়া দেরি।
বৃথা চেষ্টা হায়!
কৃষকের ঘন কৃষ্ণকায়
জাগাইল ক্ষিপ্রগতি বজ্রবহ্নি বিপ্রের মাথায়।

অধমের স্পর্দ্ধা স্মরি ক্রুদ্ধ হরিদাস
টানিয়া ফেলিতে চায়, সেই দণ্ডে, তণ্ডুলের রাশ।

ব্রাহ্মণী অমনি তার হাত চাপি ধরে,
বলে সকাতরে—
"রক্ষা কর, দেহে তব সহিবে না এত অবহেলা,
পড়ে এল বেলা,
শীর্ণকায়
পথশ্রমে বিগলিত প্রায়,
দুই দিন গেছে উপবাস,
মাথা খাও, ছেড়ো না ক এ সময়ে মুখের গরাস।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ব্রাহ্মণ
দেখাইল যেই পথে ফকির করিলা পলায়ন।
কহিলা ব্রাহ্মণী—
"তাহাতেও দোষ নাহি গণি,
শূদ্র নরাধম
আসিয়াছে নেত্রপথে, সত্য বটে, হারায়ে সংযম,
কিন্তু সে ত নিমেষের তরে।

চেহারা তাহার কিছু আঁকা নাই তোমার অন্তরে।
মনে কর এসেছিল পথের কুক্কুর,
দুয়ারে মারিয়া উঁকি, তাড়া পেয়ে হয়ে গেছে দূর।
কুক্কুর (ই) বা ভাবিবে না কেন ?
শৃগাল কুক্কুর হতে অন্ত্যজের প্রভেদ কি হেন ?"
কহে বিপ্রবর—
"মিছা তর্ক কর, প্রিয়ে, নাহি রাখ শাস্ত্রের খবর।
'ছোটলোক কুত্তার সামিল', লোকে কহে,
সত্য তারা কুত্তা কেহ নহে।
কুকুর বিড়াল হলে নাহি ছিল ক্ষতি,
এ যে গো মানুষ! এই কুষক দুর্ম্মতি,
হাসে, কাঁদে, কথা কয়, চিন্তা করে ইহ পরকাল
ব্যথারে এড়ায়ে চলে সুখের কাঙাল,
অপমানে ভাঙি, পড়ে, আদরে পলকে যায় গলি,
স্বার্থে হয় আত্মহারা, পরঅর্থে দেয় আত্মবলি,
শোকে বাষ্পভরাকুল, হর্ষে করে অশ্রুবিসর্জ্জন,
বিধাতার অপূর্ব্ব সৃজন!

অন্তরেতে নারায়ণ
চির-বিরাজিত।
কিন্তু হায় স্কন্ধে নাই যজ্ঞ উপবীত

বিষ-ভরা parcel! হইলে কি হয় ?
মোটেই যে সূতাবাঁধা নয়।
ষ্ট্যাম্প্-চিহ্ন-হীন যেন দলিল এ দু-লাখ টাকার!
একেবারে অস্পৃশ্য, অসার!
হেন নরে নিরখি সম্মুখে,
ভাতগুলা গিলি কোন্ মুখে ?"

"কেন ক্ষতি কিবা ?
কলিকালে কেবা বল শাস্ত্র মেনে চলে নিশিদিবা ?
ইহা ছাড়া,
আপদ সময়ে শাস্ত্র মানিবার নাহি কোনো তাড়া।
নাচারের অনাচারে দোষ কেবা বাছে ?
কথাইত আছে
'ওষুধার্থে সুরাপান।'
না হয় ওষুধ ব'লে,—ক্ষীণ তুমি, রোগীর সমান,—
একমুঠো ভাত দাও পেটে,
প্রায়শ্চিত্ত কোরো পরে।
এত করে
রাঁধিলাম খেটে,
ফেলে দিয়ে চলে যাবে ? প্রাণে তব নাহি দয়া, মায়া ?"
বলিতে লাগিল বিপ্রজায়া।

হরি কহে "আরে রহ রহ
কি যে ছাই বাতুলের মত কথা কহ!
আজিকে পূজিব শাস্ত্র, কাল তারে দিব জলে ফেলে,
একি তুমি ছেলে খেলা পেলে ?
তুমি কি বলিতে চাও, শুনি ?
যত ঋষি মুনি,
সবাই ছিলেন তাঁরা গাঁজাখোর নাকি ?
বিশ্বজনে দিয়েছেন ফাঁকি,
রচি দুটো মিথ্যা-ভরা শাস্ত্রের বচন ?
শূদ্রের লোচন
বর্ষিছে সহস্র বারি
বিষময় বিষম চৌম্বক-শক্তি। জান কি তা, নারি ?
যার সাথে মিশে
প্রাণময় অন্ন হয় পরিণত বিষে,
এবং তা খেলে পরে হতে পারে শরীর খারাপ!
বাপ্!
আমি কি করিতে পারি হেন মহাপাপ!"

ব্রাহ্মণী ভনয়,—
"শরীর খারাপ হয়!
হলই বা কিছু!
না খেয়ে শুকিয়ে ম'লে এমনি বা পিছু
শরীর কি ভাল হবে?
মিছা তবে
কেন বা ভোগাও?
অন্ন কিছু খাও।
ছেলেরা ছোঁবেনা অন্ন, তুমি যদি উপবাসী থাক,
শাস্ত্র এবে রাখ,
কেন আর বধ কর অকারণে এতগুলা প্রাণী!"

উত্তরিলা দ্বিজোত্তম,—ধীরোদাত্ত বাণী!—
"প্রেয়সি এ অসম্ভব।
যায় যাক্ সব,
যায় যাক্ বন্ধুজ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয়।
যায় যাক্ ধনজন, বিত্ত হতে প্রিয়
সম্ভ্রম সম্মান।
যাক্ প্রাণ।
যায় যাক্ পুত্র কন্যা, প্রাণের অধিক,
সুখে সাথী অসৎসর, দুঃখের সরিক,
ধর্ম্মে গুরু, কর্ম্মে মন্ত্রী, নর্ম্মে সখী সখা,
ভার্য্যা প্রিয়তমা
যায় যদি যাক্।
সহ্য করে রহিব নির্ব্বাক।
কিন্তু শাস্ত্র ভঙ্গ করা! হে ব্রাহ্মণি,অসাধ্য আমার।

শুনি সমাচার
পালিবারে একাদশী, (অবশ্য সে শাস্ত্রের
খাতির,)
স্বহস্তে কাটিলা নিজ সন্তানের শির
রাজা রুক্মাঙ্গদ।
শাস্ত্ররূপ অমূল্য সম্পদ
রক্ষা করিবারে,
আমিও মরিব, আর মারিব সবারে
—অনাহারে।

উঠিলেন বিপ্রবর! ভূমিতে লুটাল ছেলেগুলা।
পশ্চিম বনান্ত পারে নিবে গেল দিবসের চুলা।
অকস্মাৎ ছুনয়নে বসুন্ধরা অন্ধকার হেরে
ফুটি উঠে লক্ষতারা, স্বেদবিন্দু, নভোভাল ঘেরে
নিস্তব্ধ প্রকৃতি শুধু শান্তিহারা ঘুরে সান্ধ্যবায়,
বংশ-বন-মর্ম্ম মাঝে বহিয়া বহিয়া গুমরায়
'হায়, হায়! হায়, হায়! হায়, হায়! হায়!

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

উপাধি রহস্য।

[প্রথম প্রস্তাব]

ভাষা দ্বিবিধ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অতি আদিম যুগে যখন মানব তাহার "ব্যক্ত ভাষার" সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই; সেই তামস-যুগে পূর্ণ "ভাষা জ্ঞানের" অভাবে, সে অন্যান্য সৃষ্ট-বস্তুর উপাধি প্রদানে বা নামকরণে সম্পূর্ণ অপারগ ছিল। পরে যখন তাহার ভাষা-জ্ঞান বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং নিত্য নূতন নূতন শব্দ দ্বারা ভাষা জননীর উৎকর্ষ-সাধনে প্রবৃত্ত হইল সেই শুভ-মুহূর্ত্ত হইতে, পার্থক্য বুঝাইবার নিমিত্ত, যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর পৃথক পৃথক "উপাধি প্রদান" বা "নামকরণ" করিতে আরম্ভ করিল; একই মানব সমাজকে নানাবিধ উপাধি প্রদান করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। এই পার্থক্য সংসূচিত করাই "উপাধি প্রদানের" এক মাত্র নিয়ামক বা মুখ্য উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমরা দেখিব যে মানব

সমাজে যে নানাবিধ উপাধি প্রদান করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। এই পার্থক্য সূচিত করাই "উপাধি প্রদানের" এক মাত্র নিয়ামক বা মুখ্য উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমরা দেখিব যে, মানব সমাজে যে নানাবিধ উপাধির প্রচলন রহিয়াছে, উহা কি ভাবে আমাদের সমাজের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। "উপাধি রহস্য" সম্যক্‌রূপে উদ্‌ঘাটন করা, আমার ন্যায় অল্প-বুদ্ধি লেখকের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব কার্য্য হইলেও, বামন হইয়া চাঁদ ধরিব, এই ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়, অদ্য এই বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। জানি না, পাঠকের মনোরঞ্জন, করিতে সমর্থ হইব কি না।

২। মানবেতর জীব বা বস্তুর নামানুসারে, প্রাচীন আর্য্য-সমাজে উপাধি প্রদান প্রচলন হয়। তাই আমরা আমাদিগের বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্র সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বকালে, ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে মানবেতর জীব—অর্থাৎ বানর, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গো, মহিষ, পক্ষী, হংস, ময়ূর, নাগ বা সর্প—এবং অন্যান্য সৃষ্ট-বস্তু অর্থাৎ, সূর্য্য, চন্দ্র, বন বা অরণ্য প্রভৃতি উপাধি-বিশিষ্ট লোক বর্ত্তমান ছিল। মানব-সমাজে উপাধি প্রদানের ইহাই আদিম প্রথা। এই উক্তির সমর্থন জন্য ও আপনাদের অবগতির জন্য আমরা শাস্ত্রাদি হইতে কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। জগন্মান্য সামবেদ বলিতেছেন—

"প্রহং সাসস্তৃপলা বগ্ন, গচ্ছ
অমাদস্তং বৃষগণা অরাসুঃ।—সামবেদ ৬০ পৃঃ। তত্র সায়ণ ভাষ্যং—হংসাসঃ শত্রুর্ভিস্তমানা হংসাইব আচারন্তো বা বৃষগণা এতন্নামকা ঋষয়ঃ অমাৎ শত্রুনাং ত্রাসিতাঃ সন্তঃ অস্তং যজ্ঞ গৃহং প্রায়াসুঃ প্রগস্থন্তি।

অর্থাৎ, যাহারা শত্রুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াও, প্রতিহিংসা না করিয়া, হংসের ন্যায় সহ্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নাম "হংস"। তাঁহারা, অথবা "বৃষাস্য" ঋষিরা শত্রু দ্বারা ত্রাসিত হইয়াও যজ্ঞ গৃহে গমন করেন।

তথাহি ভাগবতম্—
"আদৌ কৃতযুগে বর্ণোন্নৃণাং হংসইতি স্মৃতঃ।"

একারণে, এখনও আমরা সাধু লোকদিগকে "হংস" বা "পরমহংস" উপাধিতে বিভূষিত করি। হরিবংশ প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহে ও বিবৃত রহিয়াছে—"দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ। শিষ্টাঃ সোমায় রাজ্ঞেহথ নক্ষত্রাখ্যা দদৌ প্রভূঃ॥ তাসু দেবাঃ খগা নাগা গাবো-দিতিজদানবাঃ গন্ধর্ব্বাপ্সরসাশ্চৈব জজ্ঞিরেহন্যাশ্চ জাতয়ঃ॥ ৫৯—১অ। প্রজাপতি দক্ষ, আপনার ষাট কন্যার মধ্যে সাধ্যা প্রভৃতি দশটী কন্যা প্রজাপতি ধর্ম্মকে, অদিতি ও দিতি প্রভৃতি ত্রয়োদশটি কন্যা কশ্যপকে এবং নক্ষত্র নামা অবশিষ্ট সাতাইশ কন্যাকে চন্দ্র-বংশের আদি মহারাজ সোম বা চন্দ্রকে প্রদান করেন। তাঁহাদিগের গর্ভে দেব, দানব, দৈত্য, খগ বা পক্ষী, নাগ বা সর্প, গো বা বৃষভ আখ্যাধারী দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাগণ জন্ম-গ্রহণ করেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—

সর্পা হৈ এতৎ সত্র মাসত।

গাজে বৈ এতৎ সত্র মাসত॥

অর্থাৎ, সর্প বা সর্প-উপাধি-বিশিষ্ট এবং গোগণ বা গো-আখ্যাধারী মানবগণ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

অবশ্য আপনারা প্রশ্ন করিবেন যে বেদাচার্য্য পূজ্যপাদ সায়ণ তাঁহার ঋগ্বেদ ভাষ্যের ভূমিকায় এই সকল মন্ত্র তুলিয়া দিয়া বলিয়াছেন—

নমু বেদে ক্বচিৎ এবং শ্রূয়তে বনস্পতয়ঃ

সত্র মাসত সর্পা মাসত ইতি।

তত্র বনস্পতীনাং অচেতনত্বাৎ সর্পানাং চেতনত্বেঽপি

বিদ্যারহিতত্বাৎ ন তদনুষ্ঠানং সম্ভবাত।

বনস্পতিদিগের চেতনা নাই বলিয়া এবং সর্পদিগের চেতনা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাহীনতার জন্য যজ্ঞ-অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে। মহাত্মা সায়ণাচার্য্যের এই অভিমত অবশ্য খুব যুক্তিযুক্ত (rational), তদ্বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই, তবে আমরা ইহাতে সম্পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিলাম না। কেন? এখানে "সর্প" অর্থ বিষধর সর্প নহে; পরন্তু "সর্প" উপাধি-বিশিষ্ট মানব-শ্রেণী এবং "বনস্পতি" শব্দের অর্থ "বন" বা "অরণ্য" উপাধি-বিশিষ্ট মানবদিগের রাজা এরূপ অর্থের বিনিয়োগ করিলে আরও যুক্তিযুক্ত হইত এবং ঋক্‌নাদি উদ্ধৃত বচনের সহিত বেশ সামঞ্জস্য থাকিত। মহাত্মা সায়ণাচার্য্যের উপর দোষারোপ করিয়া কেন আমরা এরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে সমুৎসুক? কারণ, প্রাচীনকালে 'সর্প' বা 'নাগ' উপাধির লোক ছিলেন, তাঁহারাই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন। এখনও "নাগ" উপাধির লোকের অভাব নাই। 'সর্প' উপাধির লোক যে তদানীন্তন যুগে বর্ত্তমান ছিল, মহাত্মা ব্যাসদেবের উক্তিই ইহার সমর্থন করে। তিনি বলিয়াছেন যে—

পুত্রোঽয়ং মম সর্পাং জাতঃ

মহা তপস্বী স্বাধ্যায়-সম্পন্নঃ।

আমার এই পুত্রটী আমার সর্পজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে সমুৎপন্ন। এ অতি মহা তপস্বীঃ ও অতীব স্বাধ্যায়-সম্পন্ন। বলা বাহুল্য যে, বিষধর সাপের পেটে মনুষ্যের তপঃ স্বাধ্যায়-সম্পন্ন বেদজ্ঞ সাপ জন্মিয়া থাকে না। পরীক্ষিতকে যে সর্পে নিহত করিয়াছিল, আমরা মনে করি, তিনি এই "সর্প"-উপাধিধারী কোন ব্যক্তির দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। আর, বর্ত্তমান সময়ে, 'বন' বা অরণ্য প্রভৃতি উপাধি সাধু এবং মঠের মহান্তদিগের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই।

৩। আমরা আর অধিক প্রমাণ অধ্যাহৃত না করিয়া, কেবলমাত্র দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, আমাদের বক্তব্য বিষয়টী পরিস্ফুট করিব। হরিবংশের অন্যত্র বিবৃত রহিয়াছে—

শকা যবন কাম্বোজাঃ পারদাশ্চ বিশাম্পতে।

কোলি সর্পা মহিষাশ্চ দার্দাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ॥

সর্ব্বৈতে ক্ষত্রিয়াস্তাত ধর্ম্মস্তেষাং নিরাকৃত।

বশিষ্ঠ বচনাৎ রাজন্ সগরেণ মহাত্মনা॥ ১—১৪

হে মহারাজ! শক, যবন, কম্বোজ, পারদ, কোলি, সর্প, মহিষ, দরদ, চোল এবং কেরল-গণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। মহারাজ সগর বশিষ্ঠের বচনানুসারে ইহাদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করেন। বোধ হয়,

এখানে উল্লেখ করিলে, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, এই মানুষ 'মহিষ' বংশেরই দলপতি মহিষাসুর দেবীযুদ্ধে দেবীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের বিবৃতি ও এ বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করে।* কিন্তু পরে ভ্রান্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমরা সেই মানুষ-মহিষে লেজ, শৃঙ্গ দিয়াছি ; ইহাতেও পরিতুষ্ট না হইয়া, দেবীর খড়্গাঘাতে সেই সেনাপতি পরুষ মহিষটার পৃষ্ঠদেশ দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহারই জরায়ু-শূন্য উদর হইতে একটা খড়্গপানি মনুষ্য বালক বহির্গত করিয়াছি ? (মার্কণ্ডেয় পুরাণের শেষাংশের বিবৃতি দ্রষ্টব্য।)

যাহা হউক, এতক্ষণ আমরা পুরাণাদি শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম যে, মানবেতর জীব বা বস্তুর নামানুসারে মানব-সমাজের "উপাধির" প্রচলন হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা আমাদের ঐতিহাসিক-গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করিব।

"এই সময়ে নাস্তিক মতের অত্যন্ত প্রাবল্য হওয়াতে বৈদিক-ধর্ম্ম উচ্ছন্ন-প্রায় হইয়াছিল। তারপর, ময়ূর বংশের ধুরন্ধর অবধি রাজপাল পর্য্যন্ত ৯ জনেতে ৩১৮ বৎসর * * * ৫ পৃষ্ঠা। রাজাবলী।

বর্ত্তমান সময়েও যে ঐ সকল উপাধিমান লোকের অভাব আছে, তাহা নহে। "সিংহ" উপাধি ক্ষত্রিয়, রাজা, কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয়, এবং তাম্বুলিক প্রভৃতি জাতিতে বর্ত্তমান। কৈবর্ত্ত-গণের মধ্যে "হাতী", এবং কায়স্থদিগের মধ্যে "বাঘ" উপাধি প্রচলিত! পাবনা ও রাজসাহী প্রভৃতি অঞ্চলে, "ভেড়া" ও "পাঠা" উপাধির লোক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়! বরিশালের নমঃশূদ্রগণের মধ্যে "মহিষ" উপাধি রহিয়াছে! রঙ্গপুরে 'শিয়ালু" মৈকালু" উপাধির প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার কায়স্থ বৈশ্য জাতির মধ্যে "নাগ" উপাধি ছিল ; এখনও গন্ধবণিকদিগের মধ্যে "নাগ" উপাধির বহুল প্রচলন রহিয়াছে। চন্দ্র, নদী, গিরি, পর্ব্বত উপাধি-বিশিষ্ট লোক যথেষ্ট রহিয়াছে, তাহাও আপনাদের অবিদিত নাই। মুসলমানদিগের মধ্যেও "সের" "বাজ" (শ্যেন পক্ষী) বখুরা প্রভৃতি নামের অভাব নাই। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যেও Lion, Fox, Elephant, Lamb, Sheep, Bull, Bullock, Hog, Peacock, Patridge, Bird, Wood, Hill, Mountain প্রভৃতি উপাধির বহুল প্রচলন রহিয়াছে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই উপাধিগত সাম্য সেই আদিম প্রথার সূচনা করিয়া দিতেছে। মানবজাতি যে "এক নিদান সমুথ" এই উপাধি-রহস্য সম্যক-রূপে উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে, ইহা আমরা কতকটা উপলব্ধি কবিতে সমর্থ হইব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লেখকের পক্ষে এই মহতী কার্য্য সম্পাদন করা সম্ভবপর নয়। তবে ভবিষ্যতে, ভারতে চাতুর্বর্ণ্য-প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে উপাধিগুলি কিরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইয়া, সমাজে প্রসার লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। সে যাহা হোক, উপরিউদ্ধৃত প্রমাণের দ্বারা আপনারা এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, মানবেতর প্রাণী বা অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর নামানুসারে মানব-সমাজে উপাধি প্রচলন হইয়াছিল।

শ্রীললিতমোহন রায়।

* বষ্ঠতলে দৈত্যাপতে কেশরে নগরোত্তমম্ * * * নগরং মহিষস্য চ।

নববধূ-বরণ

এস লক্ষ্মি ! বধূরূপে বরিয়া তোমায়
পরাই সিঁদুর রেখা ললাটে সীঁথিতে,
প্রকোষ্ঠে 'এয়োতি' চিহ্ন লোহের বলয়।
চিরজন্ম পর ইহা মাগি বিভুপদে।

এস সতি সাথে লয়ে শ্রেষ্ঠ আভরণ—
শীলতা, সতীত্ব, দয়া, তিতিক্ষা সন্তোষ !
সুখী হ'তে সুখ দিতে এসো সাথী করে
প্রাণ ভরা স্নেহ আর ঈশ্বরে বিশ্বাস।

ভগ্নপ্রাণ জীর্ণ দেহ পিতা আমাদের
মাতৃহারা আমরা যে স্নেহের ভিখারী ;
সেবিও শ্বশুরে যত্নে, তুষিও স্বজনে
দেবর ননদ আর যত নরনারী।

সৌভাগ্য, সম্পদ, সুখ উঠুক উথলি
পরমেশ পদে আজি এই ভিক্ষা করি।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

"কোচবেহার" প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা নব্যভারতে প্রকাশিত "কোচবেহার" প্রবন্ধে অনেক ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হয়। নিম্নে কতকগুলির লিপিবদ্ধ করা হইল।

৬৩ পৃষ্ঠার ভ্রম—

"বক্তিয়ারের পুত্র মহম্মদের কামরূপ আক্রমণ কালে, কোচবেহার রাজ্য আসামের অধীন ছিল।"

এই উক্তির কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। তখন আসাম বলিয়া কোন দেশ ছিল না। আহম বংশীয় রাজগণের আধিপত্য সে সময় বর্ত্তমান আসামে স্থাপিত হয় নাই। "কোচ বিহার" নামকরণও তখন পর্য্যন্ত হয় নাই।

৬৪ পৃষ্ঠার ভ্রম—

"তিনি (যে ব্রাহ্মণ কামতাপুরে ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) পরে কোচবেহারের একজন প্রধান জমিদার হইয়াছিলেন।"

গোবরাছড়ার মুস্তফী মহাশয়দের একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী ঐ ধন প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ কোচবেহার ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কোচবেহারের কেহই আর তাঁহার সংবাদ রাখেন না। তাঁহার জমিদার হওয়ার কথা অশ্রুত পূর্ব্ব।

"কোচবেহার রাজবংশের সভা-পণ্ডিত কোনও ব্রাহ্মণ-রচিত যোগিনী-তন্ত্র নামক তন্ত্রে এই সমস্ত বর্ণিত আছে।"

যোগিনী-তন্ত্র শঙ্করাচার্য্য কাপালিক বিরচিত। শঙ্করাচার্য্য কাপালিক কোচ বেহারের কোন রাজার সভা-পণ্ডিত ছিলেন, ইতিহাসে এরূপ কোথাও প্রকাশ নাই।

"বিশ্ব সিংহের দুই পুত্র, মহারাজা নরনারায়ণ অপর নাম মল্ল এবং শুক্লধ্বজ বা চিলা রায়।"

কোচবেহারের ইতিহাসে (রাজোপাখ্যান) বিশ্বসিংহের তিন পুত্র এবং দরঙ্গ বংশাবলীতে অষ্টাদশ পুত্রের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুই পুত্রের সংবাদ কোনও নাই।

"গোয়ালপাড়া জেলার পর্ব্বত জেয়ারের বনে আঠারকোঠায় ইহাদের রাজধানী ছিল।"

আঠার কোঠা" বর্ত্তমান কোচবিহারের অন্তর্গত পরবর্ত্তী কালে আঠার কোঠায় অস্থায়ী রাজধানী স্থাপিত ছিল।

"নরনারায়ণ কাছাড় পর্য্যন্ত অধিকার করেন ও ভূটানের দুয়ার দখল করেন।"

নরনারায়ণের পিতা মহারাজ বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক ভূটান অধিকৃত হইয়াছিল।

৬৫ পৃষ্ঠার ভ্রম—

"লক্ষ্মীনারায়ণ আকবর বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহাতে রাজার আত্মীয় ও প্রজাগণ রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে।"

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এই প্রকারের উক্তি করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকই তাহা বলেন না। তাহার বিস্তারিত আলোচনা এস্থলে সম্ভব নহে। প্রকৃতপক্ষে, আত্মীয়গণের বিরুদ্ধাচরণে বিরত হইয়া, লক্ষ্মীনারায়ণ বাদসাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

"প্রাণ নারায়ণের পৌত্র মহেন্দ্রনারায়ণ, ১৬৮২ হইতে ১৬৯২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।"

মহেন্দ্র নারায়ণ, প্রাণ নারায়ণের পৌত্র ছিলেন না; প্রপৌত্র ছিলেন।

"কাজির হাট ও কাকিনা বর্ত্তমান কাকিনারাজ্যের জমিদারি।"

কাজির হাট, কাকিনার জমিদারী কখনও ছিল না, এখন ও নহে।

৬৬ পৃষ্ঠার ভ্রম—

"মহীনারায়ণের পুত্র শান্ত নারায়ণ ছত্র-নাজীর হইলেন।" শান্ত নারায়ণ, মহীনারায়ণের পুত্র ছিলেন না। পৌত্র ছিলেন।

"শান্ত নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রূপনারায়ণ ১৬৯৩ হইতে ১৭১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।"

রূপনারায়ণ শান্তনারায়ণের জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন না।

"এই বলরাম পুর, পঞ্চ ক্রোশ খ্যাত এবং কোচবেহারের মধ্যে হইলেও রাজ্য শাসন বহির্ভূত ছিল।"

উল্লিখিত ঘটনার প্রায় একশত বৎসর পরে "চৌকোশী" বলরাম পুরের সৃষ্টি হয়। "পঞ্চক্রোশ" বলিয়া কোন কথা নাই। চৌকশী কখনও কোচবিহার রাজের শাসন বহির্ভূত ছিল না। চৌকশী বলরামপুর নাজীরবংশের জায়গীর ছিল।

"মহেন্দ্রনারায়ণের পুত্র উপেন্দ্র নারায়ণই ১১৭৪ হইতে ১৭৬৩ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।"

উপেন্দ্র নারায়ণ, মহারাজ রূপনারায়ণের পুত্র ছিলেন। মহেন্দ্র নারায়ণ দূর সম্পর্কিত ছিলেন। উপেন্দ্রনারায়ণ রাজার রাজত্ব কাল ১৭১৪ হইতে ১৭৬৩ খৃঃ পর্য্যন্ত।

"অতঃপর ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ ১৭৬৫ হইতে ১৭৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

১৭৬৫ হইতে ১৭৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব করেন নাই। মধ্যে রাজেন্দ্র নারায়ণও ও ধীরেন্দ্রনারায়ণ ৪।৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন।

"ভূটানের দেবরাজার ভাগিনেয় জীমপে বিশসহস্র সৈনাসহ কোচবেহারে আগমন করিয়া ধীরেন্দ্রনারায়ণকে রাজা করেন। নাজীর দেও কে তাড়াইয়া দেন।"

প্রকৃত বিবরণ ইহার বিপরীত। ভূটীয়াগণকে তাড়াইয়া দিয়া, নাজীর দেও ধয়েন্দ্র (ধীরেন্দ্র নহে) নারায়ণকে রাজা করিয়াছিলেন।

"কোম্পানীর সৈন্য আসিয়া ভূটিয়াদিগকে তাড়াইয়া দেয় কিন্ত এই অবধি কোচবেহার রাজ্য ইংরেজ ও ভুটীয়া উভয়ের অধীন হইল। ১৮৬৪ সালে ভূটীয়াগণ দুয়ার হইতে বিতাড়িত হইলে কোচবেহার তাহাদের পাশ ছিন্ন করে।"

এই মন্তব্যের কোন মূল নাই। ১৭৭৩ খৃঃ কোম্পানীর সহিত কোচবিহার রাজের সন্ধি সূত্রে কোচবিহার রাজ্য কোম্পানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিগণিত হয়। সেই অবধি ভুটানের সহিত কোচবিহারের রাজনৈতিক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়।

"হরেন্দ্র নারায়ণ রাজা হইয়া ১৭৮৩ হইতে ১৮২৯ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।"

মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ ১৮৩৯ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন।

৬৭ পৃষ্ঠার ভ্রম—

"নলডাঙ্গার কাশীকান্ত লাহিড়ী খাসনবীশ পূর্ব্বোক্ত সন্ধির (১৭৭৩ খৃঃ) মূল কারণ ও তিনিই কোচবিহারের প্রকৃত শাসন কর্ত্তা ছিলেন।

সন্ধির মূল কারণ নাজী দেও খগেন্দ্র নারায়ণ ছিলেন। কাশীকান্ত রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার হস্তে রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব ছিল না।

"হিন্দু ও মুসলমান একমাত্র হিন্দুআইন দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহার কারণ এই যে কোচবিহারের মুসলমানগণ হিন্দু বংশ জাত ও সকলেই 'নস্য' উপাধি বিশিষ্ট। নস্য অর্থ নষ্ট।"

কোচবিহারের মুসলমানগণ হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত হয় না. কেবল মাত্র উত্তরাধিকার সাহায্যে মুসলমানগণ হিন্দু আইন দ্বারা বিচারিত হয়। যদি কেহ উত্তরাধিকার সম্পর্কেও স্বীয় বংশে মুসলমান আইন প্রয়োগ হইবে বলিয়া লিখিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তাহার বংশধরগণ মুসলমান আইন অনুসারে পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। কোচবিহারের মুসলমানগণ হিন্দু বংশ জাত ও 'নস্য' নষ্ট শব্দজাত কিনা তাহার আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক। প্রবন্ধ লেখক এ সম্বন্ধে কোন স্বাধীন আলোচনা করেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১ জন ইতিহাসিকের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র।

"ইহার (শিবেন্দ্র নারায়ণ) সন্তান না থাকায় নাজীর দেও বংশ হইতে নরেন্দ্র নারায়ণকে দত্তক গ্রহণ করেন।"

নরেন্দ্র নারায়ণ নাজীর দেওর বংশীয় নহেন। ইনি মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

৬৮ পৃষ্ঠার ভ্রম—

"১৮৬৩ হইতে ১৯১১ খৃঃ পর্য্যন্ত ভূপেন্দ্র নারায়ণ রাজত্ব করেন।"

নৃপেন্দ্র নারায়ণের স্থলে ভূপেন্দ্র নারায়ণের নাম একাধিক বার ব্যবহৃত হইয়াছে।

নবাবিষ্কৃত প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে প্রবন্ধের আরও অনেক স্থলের প্রতিবাদ হইতে পারে। শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণের তত্বাবধানে কোচবিহারের ইতিহাসের নূতন সংস্করণ হইতেছে। তাহার সহিত তুলনা করিলে, প্রবন্ধের বহু অংশ আপত্তিকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। উহা এখনও অপ্রকাশিত বলিয়া প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত হইবে না। কোচবিহারের ইতিহাসের মৌলিক আলোচনার জন্য প্রবন্ধ লেখককে দায়ী করা হইতেছে না। তিনি সাবধানে নকল করিয়া গেলেই এতটা হইত না।

শ্রীআমানত উল্ল্যা আহম্মদ।

['কোচবেহার' প্রবন্ধের প্রতিবাদ পত্রস্থ হইল। কোচবেহারের ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক উপায়ে, এ পর্য্যন্ত গবেষণা হইয়াছে বলিয়া, আমাদের জানা নাই। এজন্য, মূল-প্রবন্ধে অল্প অল্প ভ্রম থাকা, অসম্ভব নয়। যাহা হউক, স্থূল ইতিহাস ও কোচবেহার-রাজ্যের আরম্ভ কালের ঘটনা বিষয়ে বিশেষ মতভেদ লক্ষিত হইতেছে না। তাই, এ বিষয়ে আর বাদ-প্রতিবাদ 'নব্যভারতে' প্রকাশিত হইবে না। ন, স।]

ছাত্রদের অধিকার

রাজনীতির কথা বলিতেছিনা। খুব সাধারণভাবেই কথাটার আলোচনা করিতে চাই।

স্বাধীনতা-স্পৃহা মানবাত্মার সুস্থ অবস্থাই সূচিত করে। যেখানেই ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, সেখানেই বুঝিতে হইবে, ইহা আত্মার সুস্থ অবস্থা নহে, আত্মাটী রোগাক্রান্ত হইয়াছে; এখন এই রোগ সংস্কারজই হউক, আর বিকারজ, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ও সুনিশ্চিত প্রভাব জাতই হউক। এই রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, ইহা যে কারণ প্রসূত, তাহার মূলোৎপাটন করা। রোগোৎপত্তির কারণ নিরাকরণ না করিয়া, শত রকমের ঔষধ সেবন করাইলেও নিরাময় হওয়া অসম্ভব।

স্বাধীন মানুষকে পরাধীনতা রাক্ষসীর করালগ্রাসে পাতিত করিবার জন্য আজ পর্য্যন্ত যত গুলি দৈব ও পার্থিব বিষাক্ত বাষ্প আবিষ্কৃত হইয়াছে, লৌকিক প্রথা বা conventionই যে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। কালকূট বিষের সদ্য প্রাণঘাতিনী শক্তি, মানুষের মনে ভীতির উদ্রেক করিয়া থাকে; তাই মানুষ নিয়তই তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলে; কিন্তু যে বিষ মানব শরীরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে মরণের কোলে টানিয়া লয়, যে বিষ সুদক্ষ চিকিৎসকের ও সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া একটু একটু করিয়া নিজের প্রভাব বিস্তার করে, সে বিষ যে তীব্র হলাহল হইতেও মারাত্মক।

স্বাধীনতার স্পৃহা পাছে বা উশৃঙ্খলতারূপ অপদেবতার হাওয়াস্পর্শে ভূতগ্রস্তের খেয়ালে পরিণত হয়, এই ভয়েই মানুষ, ভূমিষ্ঠ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই, নিয়ম কানুনের অসংখ্য রক্ষা-কবচ পরিয়া বসিয়া থাকে। জন্ম গ্রহণের পর মুহূর্ত্ত হইতে আমরণ, সে কেবল দিনের পর দিন, সর্ব্বাঙ্গে রক্ষা-কবচই ধারণ করিতেছে। এই রক্ষা-কবচের বোঝার চাপে, একদিকে যেমন তাহার তরুণ দেহটি রক্ষা করা দায় হইয়া উঠে, তেমনি, অপর দিকে, এই নিত্য নূতন নিয়ম পদ্ধতির শৃঙ্খলের চাপে পড়িয়া, তাহার স্বাধীনতা-প্রার্থী আত্মাশিশুটীও আর যেন রক্ষা পাইতে চায় না। পর-প্রবর্ত্তিত এই লৌহ-বেষ্টন অতিক্রম করিয়া, বাহিরের মুক্ত হাওয়ার পরশ লাগিবার যখন সময় হইয়া উঠে, তখন তাহার জীবন দেউটী নিবু নিবু প্রায়। এই অবস্থাই প্রতি নিয়ত সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে।

স্বাধীনতার গান আমরা যতই গাইনা কেন, পারতপক্ষে কিন্তু, প্রায় কেহই আমরা অপরকে স্বাধীনতা দিতে চাই না। ব্যক্তিগত অধিকার লইয়া আজ জগৎময় তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। পূর্ব্ব-প্রচলিত রীতিনীতির দুর্ভেদ্য প্রাচীর কোথায়ও ধসিয়া পড়িয়াছে, কোথায় ও বা পতনোন্মুখ হইয়াছে। সকল দেশের সকল শ্রেণীর মানবের মধ্যেই একটা প্রবল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে যে, সেও জগৎ-স্রষ্টারই স্বহস্ত-সৃষ্ট মানব—সকল মানবের যাহা প্রাপ্য, তার ও তাহাই প্রাপ্য তার এক তিল কমেও সে সন্তুষ্ট হইতে চায় না। সে উপযুক্তই হউক, আর অনুপযুক্তই হউক, পিতৃধনে, অপর ভাইদের মত, তাহারও সমান অধিকার। এ অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার ন্যায্য অধিকার তাহার স্রষ্টারও যে নাই।

আজ তাই সকল দেশেই অধিকার দাবী করিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে। যে ভারত জাগিয়াও ঘুমাইতে ভাল বাসে, আজ সে ভারতেও সর্ব্বত্রই প্রাণের স্পন্দন দৃষ্ট হইতেছে। অপরের উচ্ছিষ্ট অন্ন বা চরণ-স্পৃষ্ট সলিল গ্রহণই এত কাল যাহারা পরমার্থ-লাভের এক মাত্র উপায় মনে করিত, অপরের পাদুকা বহন ও চরণ-সেবার জন্যই যাহারা সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিত, আজ তাহারাও পাশ ফিরিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। আজ তাহারাও কি এক সোনার কাটির শুভ-স্পর্শে রাক্ষস-অধ্যুষিত রাজপুরীর মাঝে জাগিয়া উঠিয়াছে। নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। কিন্তু তন্দ্রার ঘোর এখনও কাটে নাই। রাজপুত্রের মধুর স্পর্শ ব্যতীত সে ঘোর ত কাটিবার নয় কিন্তু রাজপুত্র কোথায়?

সুবর্ণ বণিক জাগিয়াছে, মাহিষ্য জাগিয়াছে, তন্তুবায় জাগিয়াছে, কর্ম্মকার কুম্ভকার জাগিয়াছে, মেথর-ধাঙ্গর জাগিয়াছে, সহিস কোচম্যান জাগিয়াছে, বাড়ীর ঝি-চাকর জাগিয়াছে; কিন্তু জাগেনাই শুধু দুই ব্যক্তি—কে তারা?

এক জনের নাম, "শিক্ষক"; আর অপরের নাম—"ছাত্র"।

'ছাত্র' জাগে নাই, এত বড় অপবাদটা ছাত্র-মহল যে কিছুতেই ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লইবে না, তা আমরা বেশ ভালরূপেই জানি। বাস্তবিক পক্ষেও তাহারা যে একেবারেই জাগে নাই, তাও তো নয়? তবে তাহারা জাগিয়া বিছানায়ই পড়িয়া আছে; তন্দ্রাঘোরে শুধু একবার এপাশ, একবার ওপাশ করিতেছে; এই নড়াচড়াটুকুই তাদের জাগরণের সাক্ষ্য দিতেছে, এই পর্য্যন্ত। নচেৎ, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই।

শিক্ষকগণ জাগিবেন, সেত দূরের কথা; তাঁহারা যে আজও বাঁচিয়া আছেন, তার একমাত্র সাক্ষী তাঁদের বজ্রমুষ্টি-প্রহৃত ছাত্রবৃন্দ; নচেৎ সকলে হয়ত এতদিন তাঁহাদের আদ্যশ্রাদ্ধ, সপিণ্ড-করণ, এমন কি গয়ার পিণ্ডদানেরও ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিত। ভারত-সাগরের বুকের উপর দিয়া যে প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া চলিয়াছে, তার ধাক্কায় সাড়া দেয় নাই, এমন কোনও প্রাণীই ত প্রায় দেখিলাম না। তবে জানি না, এই শিক্ষক-নামক জীব কোন্ দেবতার বা অপ-দেবতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি! মেথর ধাঙ্গর—যাদের নামোচ্চারণেও নাকি অনেকের অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিয়া পড়িবার উপক্রম হয়, হায়রে অদৃষ্ট, তাহারাও এ সুযোগে নিজ নিজ মাহিয়ানাটা বাড়াইয়া লইল। আর ধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা শিক্ষিতাভিমানী শিক্ষক মহাশয়গণ, আপনারা সেই সওয়া নয় সিকি মাহিয়ানার গৃহ-শিক্ষকতা এবং একশত সিকি মাহিয়ানা বিদ্যালয়ের শিক্ষকই রহিয়া গেলেন। এক শত কথাটার উপর জোর দিয়া, সিকি কথাটা আস্তে বলিলাম, শুধু মান বাঁচাইবার জন্য।

বর্ত্তমান যুগে, শিক্ষক মহাশয়গণের 'অধিকার' বলিয়া কিছুই নাই। তবে নিজ নিজ গৃহে কাহারও কাহারও থাকিলেও বা থাকিতে পারে। সন্দেহের কথা! সুতরাং তাঁদের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। ছাত্রদের কথাই বলা যাউক।

'মানসিক দাসত্বের' জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে গলা আঁকড়াইয়া আমরা যতই গাল দিই না কেন, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব পদার্থটি সপ্তম স্বর্গরূপ বিদ্যালয়েই যে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। আর ইহাও সত্য যে, সেই অমৃতের স্রষ্টা হচ্ছেন—পতিতপাবন, অধমতারণ, মহাগুরু, কল্পতরু, শিক্ষক মহোদয়গণ! শিক্ষক মহোদয়গণ ক্ষমা করিবেন; কথাটা কিন্তু নিখুঁত সত্য।

ছাত্রদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রেই দেখিতে হইবে, যাহাতে তাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ও কাজ করিতে পারে। অধিকাংশস্থলেই, ছাত্রগণকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে, কাজ করিতে, কিম্বা কথা বলিতে দেওয়া হয় না। তাহাদেরও যে, ভালমন্দ, ন্যায়ান্যায়, সুবিধা অসুবিধা, বা দুঃখ কষ্ট বোধ আছে, প্রায় কোথায়ও তাহা আমলেও আনা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন কোনও একখানা বেঞ্চিতে পাঁচ জনের বসিতেই বেশ একটুকু কষ্ট হয়, সেই বেঞ্চিতে ছয়জনকে বসিতে হইলেও, তাহারা মুখ ফুটিয়া তাহাদের অসুবিধার কথা বলিতে পারে না, এবং বলিলেও, তার ফলাফলটা প্রায়ই খুব সুখকর হয় না; অথবা, দারুণ গ্রীষ্মের দিনেও পাখার বন্দোবস্ত নাই দেখিয়া তাহারা তাহাদের অসুবিধার কথা জ্ঞাপন করিতে পারে না; বলিলে, অধিকাংশস্থলেই তিরস্কৃত বা প্রহৃত হইয়া থাকে। (যদিও পাখাগুলি চলে তাহাদের প্রদত্ত অর্থের সাহায্যেই)। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত প্রহৃত হইয়াও তাহারা জোরে কাঁদিতে পারে না, পাছে বা প্রধান-শিক্ষক মহাশয় শুনিয়া একটা কৈফিয়ৎ তলব করিয়া ফেলেন; নির্য্যাতিত বা তিরস্কৃত

হইয়াও, কি কারণে যে নির্য্যাতিত বা তিরস্কৃত হইল, তাহা জানিবার অধিকার প্রায় কোথাও তাহাকে দেওয়া হয় না।

শৈশব হইতে এই দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে যাহারা লালিত পালিত হয়, তাহাদের স্বাধীনতা-স্পৃহা যে অঙ্কুরেই ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহাদের নিকট হইতে দেশ অধিক কি প্রত্যাশা করিতে পারে?

এই দূষিত হাওয়ার মধ্যে বাস করার দরুণ তাহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি দিনদিনই বিকৃতি-প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং, একদিকে যেমন মানসিক-দাসত্ব-রূপ ক্রমিক বিষ-প্রয়োগের দ্বারা আমরা তাহাদের মধ্যে অনেকের প্রকৃত মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটাইতেছি, তেমনি অপরদিকে কাহারও কাহারও বা সর্ব্ববিষয়ে উদাসীনতার সৃষ্টি করিয়া সমাজকে দিনদিনই ক্ষীণবল করিয়া তুলিতেছি। আবার এই বিষের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আর একদিকে এক মহা অনিষ্টেরও সূত্রপাত হইয়াছে। এই বিষাক্ত বাষ্প মনোমধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া, কাহারও কাহারও এমনই অবস্থান্তর ঘটাইয়াছে যে, ভালমন্দ যে কোন বিষয়ই তাহারা এখন আর বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না; কুক্কুর-দষ্ট ব্যক্তির জলাতঙ্কের মত, এখন তাহারা যে কোনও অনুষ্ঠানেই প্রতিবাদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

এইরূপে আমাদের কার্য্যের এই ত্রিবিধ ফলে সমাজের শক্তি দিন দিনই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

আমাদের মতে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ও শিক্ষকদের এমন একটি মিলনের স্থান বা সমিতি থাকা উচিত, যেখানে সমবেত হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের প্রতিনিধিগণ শিক্ষক মহাশয়দের নিকটে অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, সরল ও অকপটচিত্তে, বিনীতভাবে তাহাদের অভাব অভিযোগ নিবেদন করিতে পারিবে। সেখানে শিক্ষকগণকে শিক্ষকের আসন হইতে নামিয়া আসিয়া অভিভাবক বা হিতৈষী বয়োজ্যেষ্ঠ সুহৃদের আসনে বসিতে হইবে। সেখানে, শিক্ষকগণ সর্ব্বদাই ছাত্রদিগকে তাহাদের ন্যায্য অধিকারের পূর্ণ সীমা কোথায়, সে অধিকার-লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা কি, ইত্যাদি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিবেন এবং তাহাদের অভাব অভিযোগের সম্পূর্ণ ন্যায্য মীমাংসা করিবেন। স্বাধীনতার বীজ শৈশব হইতেই তাহাদের কোমল হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হওয়া প্রয়োজন। তবেই ভবিষ্যতে আমরা তাহাদের নিকট কিছু আশা করিতে পারিব। নচেৎ কোনরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। দশ বার বৎসর যাহারা অম্লান বদনে সকল প্রকার নির্য্যাতন, অত্যাচার ও অবিচারই সহ্য করিয়া আসে, তাহারা বয়োপ্রাপ্ত হইয়া, অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবে বা ন্যায্য অধিকার দাবী করিবে, এরূপ আশা করা, আকাশ-কুসুম হইতেও দুরাশা।

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

সঙ্গণিকা।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা। প্রেস এবং সংবাদ পত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল আইন প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা, বর্ত্তমান অবস্থায়, কতদূর পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা বিচার করিবার জন্য নিখিল-ভারত-ব্যবস্থাপক-সভা হইতে একটা কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সে সংবাদ পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলাম। সম্প্রতি তাঁহাদের সুবিবেচিত সংস্কার-ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়া সেই কমিটি রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। মোটামুটি, এই কমিটির পরামর্শ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রেস এণ্ড রেজিষ্ট্রেসন এক্ট কিছুটা পরিবর্ত্তিত হইলেই, সকল প্রকার বে-আইনীর সম্ভাবনা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে, ১৯০৮ এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দের 'ইণ্ডিয়ান প্রেস এক্ট' ও নিউজপেপার সাইটমেণ্ট টু অফেন্‌সেস্ এক্ট সমূলে রদ

করিবার কোন বাধাই থাকিতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস, কমিটির এই প্রস্তাব সরকার বাহাদুরের সাগ্রহে বরণ করিয়া লওয়া উচিত। এই সকল 'দমন' আইনের দ্বারা লাভ যতদূর না হইয়াছে, দেশের মধ্যে শাসন প্রণালীর উপরে যে প্রগাঢ় অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, উত্তরোত্তর তাহা মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে; শাসক ও শাসিতের মধ্যে আজ এক ক্ষোভ-মূলক অনাস্থা আসিয়া পড়িয়াছে। কমিটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সংস্কৃত হইলে, সেই আইনের বলে, সরকারের আমলাবর্গ যদি কোন পত্র বা গ্রন্থকে রাজদ্রোহিতা দোষে দুষ্ট বিবেচনায় সাধারণে প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন ও তাহা বাজেয়াপ্ত করেন, তাহা হইলে সেই নির্দ্ধারণ বা ব্যবস্থা বা আদেশের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ যে কোন ব্যক্তি সেই সকলের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক মহামান্য প্রধান বিচারালয়ে নিরপেক্ষ ন্যায় বিচারের দাবী করিতে পারিবেন। এই প্রস্তাবে আমরা আশ্বস্থ হইয়াছি। বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ বা প্রবন্ধ যে প্রকৃতই রাজদ্রোহিতা দোষে দুষ্ট, আদালতের সম্মুখে তাহা প্রমাণের ভার, (onus of proving) সরকারের উপরই ন্যস্ত করা উচিত, কমিটি এই প্রকার নির্দ্ধারণ করিয়া আমাদের আরো কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। এই রিপোর্টের উপর আমলাতন্ত্রের বিষ নজর পড়িয়া থাকিলে, আমরা আশ্চর্য্য হইব না। তবে ভরসা, ব্যবহারিক-কুল-তিলক বর্ত্তমান বড়লাট বাহাদুরের বিচক্ষণতা ও ন্যায় বিচারের উপর। এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটা কথা বলিবার আছে। এই সকল দমনকারী বিধির ফলে, বহু মুদ্রাযন্ত্র, বহু সংবাদ পত্র, বহু গ্রন্থের প্রচলন রহিত হইয়াছে। যাহা গিয়াছে, তাহার আর প্রতিকরে না-ও থাকিতে পারে; কিন্তু, আমাদের বিবেচনায় এই সকল আইনের দ্বারা সহিত্য জগতের যে সকল অমূল্য রত্ন-রাজিকে বিলুপ্তির রাজ্যে প্রেরণ করা হইয়াছে, সে গুলি পুনরুদ্ধারের আয়োজন অনতিবিলম্বেই করা উচিত। এই প্রয়াসে সরকার বাহাদুরেরও সহায়তা লাভ বাসনা করিলে, নিতান্তই কি দুরাশা হইবে?

* * * *

চা বাগানের কুলিগণকে লইয়া পূর্ব্ববঙ্গে নিদারুণ এক মর্ম্মপীড়ক অভিনয় হইয়া গিয়াছে। একদিকে, তাহাদের মনে কি গভীর বেদনা ছিল, যাহার প্ররোচনায় তাহারা ধ্রুবকে ত্যাগ করিয়া, রোগশোক, জ্বালাযন্ত্রণা, দুঃখ কষ্ট, অত্যাচার অবিচার, অনাহার নিগ্রহকে বরণ করিয়া লইয়া, নিরাশ্রয় অবস্থায় অজানা ভবিষ্যতের দিকে অবলীলাক্রমে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা স্মরণে হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া পড়ে। গভর্ণমেণ্ট তাহাদের এই ব্যবহার, সহযোগিতা-বর্জ্জন-নীতির নেতৃবর্গের উত্তেজনার ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও, মন প্রবোধ মানে নাই। পক্ষান্তরেই আমাদের, নিজের দেশের লোক যখন আমাদের শাসন-ব্যবস্থার উচ্চ আমলা হইয়া বসেন, তখন যে তাঁহারা আমলা-সাধারণের-প্রচলিত অবিমৃষ্যকারিতা মুক্ত হন না, চাঁদপুরে কুলীদিগের উপরে নৃশংস অত্যাচারে, তাঁহার জলন্ত প্রমাণ দেখিয়া, হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি। বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক-সভায়, তাঁহাদের দোষ-ক্ষালনের চেষ্টায় বহু 'সওয়াল জবাব' হইয়াছিল। কিছুতেই কিছু হয় নাই; হইবারও নয়। আমলা-তন্ত্রের উপরে দেশের দশের অনাস্থা, শত সহস্রগুণে আজ বৃদ্ধি হইয়াছে; তাহা সহজে বিমোচিত হইবার নয়।

খড়িয়াল খুনের বিচার-ফল, এই অনাস্থাকে আরো বদ্ধমূল করিয়াছে। সুযোগ্য বিচক্ষণ বিচারক মাননীয় বাকল্যাণ্ড সাহেবেবের নিরপেক্ষতার সহিত মামলার ঘটনাবলী জুরিগণকে বুঝাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও, পাঁচ মিনিট কালের মধ্যে মনস্থির করিয়া, জুরিগণ, অধিকাংশের মতে, আসামীকে নির্দ্দোষী সাব্যস্থ করিয়া ন্যায়-বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। জুরিগণের মধ্যে যাঁহারা একমত হইয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যা; যতজন ইংরাজ বণিক ছিলেন, তাহার সমতুল্য। জুরিদের মধ্যে ছিলেন, একজন মাত্র বাঙ্গালী; আসামীকে নির্দ্দোষী বলিতে পারেন নাই, একজন মাত্র জুরি। এই প্রকার ঘটনা আজকাল যে একেবারে অসাধারণ তাহাও বলা চলে না। ইহাতেই বা কি মনোমালিন্য হ্রাস হইতে পারে? বৈষম্য ঘুচিতে পারে? আস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে?

*　*　*　*

রাজসাহীর জেল হইতে বহু কয়েদী পলায়ন করিলে স্থানীয় আমলা-বর্গের মধ্যে এক মহা হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। সেই সময়ে, কয়েদীদিগকে পুনরায় ধরিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টার কালে, স্থানীয় নির্দ্দোষী অধিবাসীগণের উপরেও অল্প বিস্তর অত্যাচার হইয়া পড়ে, গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত বৃত্তান্তে প্রকাশ। এই সকল ব্যাপারের প্রকৃত ঘটনা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য, স্থানীয় কংগ্রেস সভা, একটা বে-সরকারী-কমিটি গঠিত করিয়া, তাহার উপর তদন্তের ভার অর্পণ করেন। এই কমিটি স্থানীয় তদন্তের ফলে, তাঁহাদের মন্তব্য যথা সময়ে প্রকাশিত করেন এবং কলিকাতার কতিপয় দৈনিক সংবাদ-পত্রে তাহা প্রকাশিত হয়। সেই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন, প্রাদেশিক-কংগ্রেস-কমিটির তদানীন্তন সম্পাদক, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী। রিপোর্টটি তিনি সদস্যরূপে স্বাক্ষর করেন এবং সম্পাদকরূপে সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ করেন।

রাজসাহী জেলার জজ, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান-সিভিল-সার্ভিস-ভূক্ত, গ্রেহাম সাহেব। তিনিও কয়েদীদিগকে ধরিবার প্রয়াসে যে আয়োজন হয়, তাহার অন্যতম উদ্যোগী ও সহযোগী ছিলেন।

কংগ্রেস কমিটির রিপোর্টে নাকি কোন মন্তব্য আছে, যাহার দ্বারা এই গ্রেহাম সাহেবের মানহানি হইয়াছে। এই সর্ত্তে, কলিকাতা পুলিশকোর্টে, তিনি শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয় ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মুদ্রাকরের নামে নালিশ করিয়াছেন। মোকদ্দমার দিন সন্নিকট; তাই, এবিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা সমীচীন হইবে না। তাহা আইন-বিরুদ্ধ।

কেবল একটা কথা না বলিলেই নয়; ইহাতেই বা বৈষম্য কতদূর নিরাকৃত হইবে? কাকস্য পরিবেদনা!

*　*　*

বাঙ্গালায় পুলিশ বিভাগ সংস্কার। বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক-সভার বিগত অধিবেশনে, অধিকাংশের মতে, বঙ্গের পুলিশ-বিভাগ-সংস্কার বিচার কল্পে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমলাতন্ত্রের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায়, এই সকল কমিটির উপরে, আমাদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই। তবে, আমরা একথা বলিতে বাধ্য যে, পুলিশ-সংস্কার না হইলে, পুলিশের ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে, দেশের লোকের পুলিশের উপরে প্রকৃত মিত্রভাবের মমতা না বসিলে, অধুনাতন

খাদ্য-খাদক, উৎপীড়িত-উৎপীড়ক সম্বন্ধ না ঘুচিলে, রাষ্ট্র-শাসন যন্ত্র নির্ব্বিবাদে চলিতে পরিবে না। কোথায় কোন দেশ আছে, জানি না, যেথানে, প্রজার মনে, পুরকোট্টপালের উপর, ভারতের মত চিরন্তন বিরাগ দেখা যায়। দোষ, দেশের লোকের মোটেই নয়; বিনা কারণেও নয়। এই বিরাগই ক্রমে সমগ্র শাসন-প্রণালীর উপর একান্ত অশ্রদ্ধার রূপ ধারণ করিয়া, প্রচলিত রাষ্ট্রীয় শক্তির মান, ইজ্জৎ, মর্য্যাদা, গৌরবকে একেবারে ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। রাজায় প্রজায় আর সে পবিত্র পূজা পূজারী ভাব, পিতা-পুত্র ভাব, রক্ষিত হইতেছে না। সেই জন্যই, আমরা সর্ব্বদা পুলিশ-বিভাগের কঠোর সমালোচনা করিয়া আমলা-তন্ত্রের বিরাগ-ভাজন হইয়া থাকি। আমলা-তন্ত্রের স্মরণ রাখা উচিত, রাষ্ট্র এবং শাসন-প্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এ বাসনা তাঁহারা ব্যতিত, অপরেও করিবার অধিকার রাখিতে পারে; দেশ ত তাঁহাদের নয়-ই, দেশের রাজাও কেবল তাঁহাদেরই নিজস্ব নয়; রাজা এবং রাজ-শক্তিকে গুরু গৌরবে গৌরবান্বিত দেখিবার বাসনা যে কেবল তাঁহাদেরই একচেটিয়া, তাহা নয়; দেশে, রাজার এমন অনেক ভক্ত প্রজা আছে, যাঁহারা খোসামুদি বিবর্জ্জিত হইয়া, অনাবিল ভাবে, তদীয়রাজ্য ও রাজত্বের শ্রী-বৃদ্ধি কামনা করেন। আমলা-তন্ত্রের এ চেতনা কবে হইবে?

* * *

রেল ষ্টিমারের ধর্ম্মঘট বিষয়ে, একদিকে গভর্ণমেণ্ট ও রেল ষ্টিমার কোম্পানী; অপর দিকে, কর্ম্মচারী-বৃন্দ ও অসহযোগনীতির পৃষ্ঠপোষক নেতৃবৃন্দ, এই দুইয়ের পরস্পরের মধ্যে কোন দলের শক্তি অধিক বলশালী ও দৃঢ়,—বর্ত্তমানে যেন তাহার বিচারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। মাঝে পড়িয়া মারা যাইতেছে, নিরীহ প্রজাসাধারণ, যাহাদের কর্ম্মের জন্য, সামাজিকতার জন্য, ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য, অন্নচিন্তার জন্য, এদেশে ওদেশে গতায়াত করিতে হয়। ইহাদের যে দারুণ কষ্ট হইয়াছে, যে প্রকারে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইতেছে, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, ও কাহারো ভ্রূক্ষেপও নাই। সুনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র মাত্রেই, গতায়াতের সুব্যবস্থা রাজ্য সুশাসনের অন্যতম নিদর্শন। আজ পূর্ব্ববঙ্গে আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়েতে এবং অন্যত্র সে ব্যবস্থা মোটেই নাই। গভর্ণমেণ্ট কি অছিলায় তাহা প্রতিবিধানের কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইয়া, অবলীলাক্রমে নির্লিপ্তভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধিতে তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কিছুই নাই, তাহা আমরা মানিয়া লইতে অক্ষম। অথবা, যদি কেহ বলেন, গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা বা আইনতঃ অধিকার নাই, সে কথায়ও সত্যের অপচয় হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। জনসাধারণের সুখ সচ্ছন্দতা রক্ষা করিবার জন্য, শুধু যে গভর্ণমেণ্টের এবিষয়ে তৎপর হওয়া যুক্তিসিদ্ধ, তাহা নহে; গতায়াতের সুব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের সাহচর্য্য ও চেষ্টা, প্রজামাত্রেই ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ দাবী রাখে। শাসন-সংস্কার ফলে, যখন গভর্ণমেণ্টের সকল বিভাগ প্রজা-তন্ত্রের সম্পূর্ণ অধিকারভুক্ত হইবে; শাসন-মন্ত্রীগণ এইরূপভাবে, কোন-মতেই, এইরূপ অবস্থায়, তাঁহাদের দায়িত্ব-শূন্যতার ওজর করিতে পারিবেন না। তবে, এ বিষয়টী এখনও আমলা-তন্ত্রের সম্পূর্ণ অধিকার-ভুক্ত। আমলা-তন্ত্রের রাজত্বে ন্যায়ান্যায়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচারের মাপকাটিও অন্য!
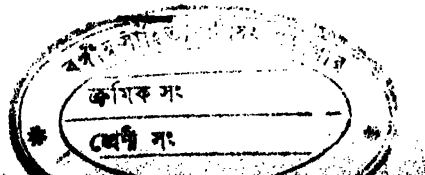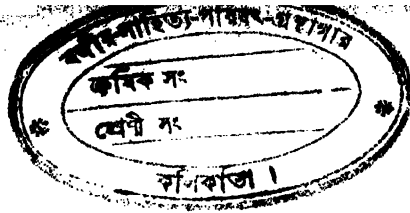
ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি অনুরাগ।

[বিশেষ উৎসব উপলক্ষে লিখিত]

"ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের অনুরাগ বাড়ে কিসে" এইটীই আজকার আলোচ্য বিষয়। আজ সকলে একত্রিত হইয়া, এক প্রাণে ইহার আলোচনা করিতেছেন। কত অনুরাগী ভক্ত, বিশ্বাসী ভাই বোন হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া এই তত্ত্বটীর প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। আপনাদের আগ্রহ, উৎসাহ, কার্য্য ও ধর্ম্মজীবন সুফল প্রদান করিবে, এই আশা অনেকের মনে জাগিয়াছে। আমি দূরে থাকিয়াও অসুস্থ শরীরে সেই আশায় আশান্বিত হইতেছি, সেই উৎসাহ আমার জীর্ণ শরীরকেও কথঞ্চিৎ বল প্রদান করিতেছে। প্রাণে ইচ্ছা হইতেছে যে ছুটিয়া যাই ও অনুরাগের প্রবাহে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া স্নাত ও পবিত্র হইয়া আসি। কিন্তু, দেহ দেহীকে সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করিতেছে না। এ কারণ সশরীরে যাওয়া অসম্ভব। দেহটা এখানে, মনটা আপনাদের নিকটে।

আহা! মনে হইতেছে যে, আজ যদি ভক্ত তুকারামের ব্যাকুলতা ও আগ্রহ পাইতাম, তবে আমার জীবনও সফল হইয়া যাইত। ভক্ত তুকারাম প্রতি বৎসর ভক্ত মণ্ডলীর সহিত পণ্ঢরপুরে যাইতেন। এক বৎসর পীড়িত হওয়াতে, তিনি বার্ষিক উৎসবে যাইতে পারেন নাই; কেবল ছট ফট করিতেছিলেন; যাত্রীদিগের সহিত কয়েকটী অভঙ্গ লিখিয়া নিজের মনোবেদনা জানাইয়া পাঠাইয়া দিলেন ও তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। আমার প্রাণে কি সেই ব্যাকুলতা আসিয়াছে! কিন্তু তবু পূর্ণ আশা করিতেছি যে এই নূতন উৎসবে নূতন ভাব আসিবে, পুরাতন জীবন পরিবর্ত্তিত হইবে, অসাড় ভাব, অচেতন অবস্থা, অর্দ্ধমৃত ভাব, অবিশ্বাস, অপ্রেম, অমিল, অশ্রদ্ধা, অপবিত্রতা দূরীভূত হইবে ও পবিত্রতা, সরলতা, শ্রদ্ধা, প্রেম আসিয়া সকল হৃদয়কে প্লাবিত করিবে।

ব্রহ্ম কৃপা ধন্য! যে কৃপা আজ আমাদিগকে নিজ নিজ অবস্থায় পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিতে দিল না; আমাদিগের অবস্থা শোচনীয় হইতেছে, বুঝাইয়া দিতেছে; এই অবস্থা দূর করিবার জন্য আগ্রহ দিয়াছে ও সকলকে একত্র করিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিতেছে যে—আর নয়, নিজের শক্তি সামর্থ্যে কিছু হইবে না, ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর কর; আপনাকে ছাড়িয়া গা ভাসাইয়া দেও; ভয় নাই, ভয় নাই, ডুবিবে না, তিনি হাত ধরিয়াছেন; ঐ শোন তাঁহার অভয় বাণী; ব্রহ্মকৃপা আশাবাণী শোনাইতেছেন, সেই আশার আহ্বান পাইয়া আমরা কাঙ্গালের মত আকুল প্রাণে তাঁহার দ্বারে আসিয়াছি।

এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে নব প্রাণনার উৎসব বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবে ও ব্রাহ্মসমাজে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে। ভগবানের প্রতি অনুরাগ, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ ও সকল মানবের সহিত অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবে। ঐ শোন, হৃদয়নাথ আহ্বান

করিয়া স্পষ্ট স্বরে বলিতেছেন—"তোমাকে চাই; তোমার কাজ কর্ম্ম কিছু চাহি না। ছুটিয়া চল!" তিনি অপেক্ষা করিতেছেন। তাহাকে স্পর্শ করিয়া অনুরাগে বিভোর হও।

এই মত্ততাই ত অনুরাগ। অনুরাগ যে কি, তাহা বাক্যে বুঝান যায় না। হৃদয়ের ভাব কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়? ভাষা ত অন্তরায়। অনেক সময় ভাষা দুর্বোধ্য; আবার কত সময়, ভাষা ভাবকে চাপিয়া রাখে বা বিপরীত অর্থ করিয়া দেয়। শিশু কি মার প্রতি ভালবাসা কথায় প্রকাশ করে? মা কি তাঁহার ভালবাসা বাক্যে বলিতে চেষ্টা করেন? ক্ষুদ্র মুখখানির হাসিতে যে শক্তি, মার স্পর্শে যে শক্তি, তাহা কি সহস্র বাক্য-বিন্যাসে প্রকাশ পায়। কোনও দম্পতি কি প্রাণের অনুরাগ কথায় নিবদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট হন? দেশ হিতৈষণা কি কথায়, না, প্রাণের ব্যথায়? মানব-প্রীতি প্রবন্ধে, না জীবনে?

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগ কি কোন তেজস্বিনী ভাষায় নিবদ্ধ হইতে পারে? কখনই না। ভগবান দেখিতেছেন যে, তাঁহার প্রদত্ত অনুরাগ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছে কি না? ব্রাহ্মমণ্ডলী সেই অন্তর্নিহিত অগ্নির উত্তাপ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইলেই অনুভব করিবেন। নিজেকে ভুলিয়া অপরের হইয়া যাওয়াই ত অনুরাগ—এই অনুরাগ প্রাণে স্বভাবতঃই জন্মায়; কোন ক্রিয়ার দ্বারা উহা উৎপন্ন করা যায় না। অনুরাগের বস্তু নিকটস্থ হইলেই আপনি অনুরাগ জন্মায় ও প্রসারের অনুকুল অবস্থা পাইলেই বৃদ্ধি পায়। অতএব অনুরাগ বৃদ্ধির উপায়, আলোচনা দ্বারা কি প্রকারে বুঝাইব। যদি ভাল বাসিতে পারি, তবে উহার উৎপত্তি, স্থিতি ও বর্দ্ধনশীলতার পরিচয় জীবনে দিতে পারা যায়। অনুরাগ সংক্রমণ করে, ছড়াইয়া পড়ে, অগ্নির মত উত্তাপ ও আলোক সহজেই ব্যাপ্ত হয়।

(১) অগ্নির ধর্ম্ম, উত্তাপ; অগ্নির নিকটে গেলেই, শৈত্য দূর হয়, জড়তা পরিহার হয়, নির্জ্জীবতা অন্তর্হিত হয়, মৃত ভাব পলায়ন করে; সমস্ত শরীর উত্তপ্ত হইয়া যায়। অনুরাগেও তাহাই হয়।

(২) অগ্নির দ্বিতীয় ধর্ম্ম, আলোক প্রদান। অনুরাগও প্রাণকে উজ্জ্বল করে। দূরকে নিকটে আনিয়া দেয়; অজ্ঞেয়কে, অদৃশ্যকে চক্ষের সন্মুখে উপস্থিত করে; নিত্য অনিত্যকে, সার ও অসারকে স্পষ্ট করিয়া দেয়; আত্মীয় পর বোধ থাকে না; সমস্ত অবিশ্বাস চলিয়া যায়; সন্দেহ সংশয় দূর হয়।

(৩) অগ্নির সদৃশ অনুরাগ পরিবর্ত্তন ঘটায়; যাহার প্রাণে অনুরাগ আসে, সে নিজে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় ও অপরকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে।

(৪) অনুরাগ আপনাকে হারাইতে সমর্থ করে। অনুরাগের বশে, মা নিজেকে ভুলিয়া সন্তানের হইয়া যান; স্বামী স্ত্রীর ও স্ত্রী স্বামীর হইয়া যান।

(৫) অনুরাগ কদাচ নিষ্ক্রীয় থাকিতে দেয় না; সকল সেবার মূলে অনুরাগ।

(৬) যেখানে অনুরাগ সেখানে সহিষ্ণুতা। অনুরাগের খাতিরে সকলি সহ্য করিতে পারা যায়। যাহাকে ভালবাসি তাহার জন্য অপমান, নিন্দা, নির্য্যাতন, ক্লেশ দুঃখ সকলি সহিতে পারা যায়।

(৭) অনুরাগ মুক্ত, স্বাধীন ; কোন বাধা মানে না ও বন্ধভাবে থাকে না।

সঙ্গীত সাতটী সুরে প্রকাশিত হয়, কিন্তু স্বয়ং অপ্রকাশিত ; সেইরূপ অনুরাগ উপরোক্ত সাতটি লক্ষণে পরিচিত, কিন্তু উহা সাতটী লক্ষণের উপরে অনির্ব্বচনীয় এক বস্তু। অনুরাগ হইলে, উহা বৃদ্ধির উপায় চিন্তা করা যাইতে পারে। কিন্তু যে প্রাণে অনুরাগ নাই, তথায় উহাকে উৎপন্ন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত ; উহা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা বৃথা। যদি অনুরাগ বর্ত্তমান থাকে, তবে উহার কার্য্য সহজেই হইবে। নিম্নলিখিত উপায় কয়টী অবলম্বন করিলে অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারে—

প্রথম—অনুরাগের বস্তুকে প্রাণের নিকটে রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয়—অনুরাগের বস্তুর গুণ দেখা ও গুণ কীর্ত্তন করিতে হইবে।

তৃতীয়—অনুরাগের বস্তুর মঙ্গল কামনা সর্ব্বতোভাবে করিতে হইবে।

চতুর্থ—অনুরাগের বস্তুর সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে।

পঞ্চম—অনুরাগের বস্তুর জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে হইবে।

অনুরাগ বৃদ্ধির সাধারণতঃ এই উপায়। কিন্তু অনেক কারণে, অনুরাগ হ্রাস হয়। সাবধানতার সহিত সেই কারণগুলিকে পরিহার করিতে হইবে। সেই উপায় নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রথম—সমালোচনা, ছিদ্রান্বেষণ, দোষ ধরিবার ইচ্ছাকে দমন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়—দোষ দেখিলে উহা সমর্থন না করিয়া সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে।

তৃতীয়—দোষ কীর্ত্তন করিবে না ও দোষ কীর্ত্তনে যোগ দেওয়া উচিত নহে।

চতুর্থ—সংশোধনের কার্য্যে প্রেমের সহায়তা লইতে হইবে। ঋষি টলষ্টয় ইহাকে spiritual chloroform নামে অভিহিত করিয়াছেন।

পঞ্চম—যাঁহাদের সাহায্যে সংশোধন করা হইতেছে, তাঁহাদের সকলেরই প্রেমানুগত হওয়া উচিত।

অনুরাগের বিষয় যথাসম্ভব বলিলাম, এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। ব্রাহ্মসমাজ বলিলেই ব্রাহ্মদিগের মণ্ডলী বা ব্রাহ্মদিগের সমাজ বুঝি। ব্রাহ্ম কে ? যাঁহারা ব্রহ্মের সন্তান, ব্রহ্মের অনুরাগী ; ব্রহ্মের সেবক, ব্রহ্ম পূজায় তৎপর। যাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন ও তাঁহাকে নিজের পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহার উপাসনা দেশে প্রচলিত করিতে উদ্যোগী, তাঁহারা ব্রাহ্ম। যাঁহারা বিবেকে ব্রহ্মবাণী শুনেন ও সেই বাণীর অনুসারে জীবনের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম। যাঁহারা সংসারে, পরিবারে, সমাজে, জীবনে ব্রহ্মকে প্রথম স্থান দিতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম। যদি "ব্রাহ্ম" ও "ব্রাহ্ম সমাজ" এই অর্থে গ্রহণ করা হয়, তবে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি অনুরাগ কি তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া কেহ "ব্রাহ্ম" হইতে পারে না। ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ, প্রধান প্রয়োজন। অনুরাগের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু "ব্রহ্ম" ব্রাহ্মের পক্ষে প্রধান। কি প্রকারে, কোন্ নিয়মে, কোন্ সাধন দ্বারা মণ্ডলীর মধ্যে অনুরাগ বৃদ্ধি হয় তাহা বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে ব্রহ্মই এই মণ্ডলীর প্রাণ। অতএব—

১। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মপূজা, ব্রহ্মানন্দরস পান, এই মণ্ডলীর প্রথম কার্য্য। ব্রহ্মভক্তি, ব্রহ্মানুরাগ যে যে উপায়ে বর্দ্ধিত হয়, তাহা করিতে হইবে।

২। যাহারা ব্রহ্ম অনুরাগী, ব্রহ্মভক্ত তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হওয়া ও তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি রাখা ও প্রকাশ করা, দ্বিতীয় কার্য্য।

৩। সকল ব্রাহ্মকে এক পরিবারের লোক মনে করিতে হইবে ও যাহাতে এই ভাব চির-স্থায়ী হয়, তাহা করিতে হইবে।

৪। ব্রাহ্মসমাজ যে সকল জনহিতকর কার্য্যে হস্ত দিবেন, তাহাকে নিজের কাজ মনে করিয়া করিতে হইবে। যদি মতভেদ হয়, তবে প্রেমের সহিত বুঝাইতে চেষ্টা করিতে হইবে ও সহিষ্ণুতার সহিত অপেক্ষা করিতে হইবে। মণ্ডলী পরিত্যাগের ভাব মনে স্থান পাইবে না।

৫। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি না হইলে, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকের উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিতেছে, ইহা অনুভব করিতে হইবে।

৬। সমবিশ্বাসীর সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহার সমূহ চেষ্টা করিতে হইবে ও তজ্জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে।

৭। নিজের পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যাহাতে ব্রহ্ম-অনুরাগ প্রসারিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; নিজের চরিত্রে, ব্যবহারে, ব্রহ্ম-অনুরাগ প্রদর্শিত করিতে হইবে। এমন কোন কার্য্য করা উচিত নয় যাহা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের উপর দোষারোপিত হয় বা কলঙ্ক আসে।

৮। সন্তানাদি পরিবারবর্গ ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছেন অনুভব করিলে, মহা শোকগ্রস্ত হইতে হইবে ও তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে হইবে।

৯। ব্রাহ্মসমাজ ভগবানের কৃপার নিদর্শন। আমাদিগের নিজের, পরিবারের, দেশের, ও জাতির উদ্ধার ও কল্যাণের জন্য ইহা আসিয়াছে। এই ধর্ম্ম ও সমাজ ভিন্ন কল্যাণের আর কোন উপায় নাই, এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিতে হইবে।

১০। আত্মার কল্যাণ প্রথম; পারিবারিক, আর্থিক, সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি উহাকে অতিক্রম করিয়া নহে; কিন্তু এ সকল, আত্মার উন্নতির অন্তর্নিহিত। আধ্যাত্মিক উন্নতি, ইহাদের বিপরীত পথে নহে।

১১। মিলনই এ জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; ইহলোকে সকলের সহিত মিলিত হইতে হইবে ও পরলোকে এই মিলনের ভাব সহায়তা করিবে ও মিলিত করিবে।

১২। সেবা, মিলনের প্রধান উপায়। সেবার মধ্যে স্বার্থ ও অহং ভাব থাকিবে না। জগতের সেবায় শরীর, মন, প্রাণ, অর্থ ও সমস্ত শক্তি অযাচিত হইয়া ঢালিয়া দিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সকল সাধুকার্য্য নিজের কার্য্য বলিয়া করিতে হইবে; ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার ভাব থাকিবে না।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ এক সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; তাহাই

বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজের অনুন্নতির কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইলেই ব্রাহ্ম নামের অধিকারী হওয়া যায়, কিম্বা ব্রাহ্ম পিতামাতার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলে ব্রাহ্ম হওয়া যায়, এই ভুল মত অনেকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহাঁরা ব্রহ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা ততটা প্রয়োজনীয় মনে করেন না। সুতরাং ব্রহ্ম-পূজা ও ব্রহ্মধ্যানের দিকে দৃষ্টি থাকে না। পারিবারিক সুবিধাই লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে; ত্যাগের ভাব হ্রাস হইতেছে ও স্বার্থের ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে সমাজে এক বিপ্লব উপস্থিত হইবার আশঙ্কা হয়। ধর্ম্মভাব যাহাতে শিথিল না হয়, তাহার চেষ্টার প্রয়োজন। এই বিশেষ উৎসব তাহারই চেষ্টা। ভগবানের চরণে ভিক্ষা, তিনি আমাদের জ্ঞানকে উজ্জ্বল করুন, প্রেমকে জাগাইয়া তুলুন ও আমাদের সমস্ত ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অধীন করুন।

হে স্নেহময়ী জননী! এতগুলি সন্তানকে ডাকিয়া আনিয়াছ, তোমার প্রেমের প্রসাদ দিবে বলিয়া। দেও মা! তোমার অনুরাগ দেও! হৃদয় ভরিয়া দেও, সকলে ভাগ করিয়া লই। তোমার অনুরাগ জগতকে বিলাইব। কেহ বঞ্চিত থাকিবেন না, কেহ একা একা ভোগ করিব না। চিরদিনের তরে মাতিব, মাতাইব। সুখে আনন্দ করিব। তোমার গুণ গাইব। আমরা আর কি বলিব। নিস্তব্ধ হইয়া তোমার চরণে মাথা রাখিতেছি। তুমি স্পর্শ কর ও আশীর্ব্বাদ কর। ওঁ॥

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

এপার ওপার।

এ পারেতে সাঁঝের পাখী আপন নীড়ে যাচ্চে ফিরে!
ও পারেতে ভোরের পাখী গাইছে সুখে প্রভাতীরে,
এ পারেতে তরী খুলে যাচ্ছে ভেসে কোন অকূলে,
ও পারেতে নেচে গেয়ে হাজার যাত্রী ভিড়্‌চে তীরে!
এ পারেতে রাত্রি আসে, ও পারেতে উষা হাসে,
এ পারেতে নাম্‌চে আঁধার, ও পারেতে জ্বল্‌ছে হীরে।
এ পারেতে নিচ্চে বিদায়, ও পারেতে বুকে জড়ায়
এ পারেতে কেবল রোদন, ও পারেতে মিলন ঘিরে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষা জগতে যৎকিঞ্চিৎ।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব]

গতবারে আমি অভিভাবকদের কথা বলেছি; এবার নিজেদের কথা একটু বলব। আমরা যারা শিক্ষকতা করি, তাঁরা যে সবাই ভাল আর নিখুঁৎ নন, তা মাষ্টার মশাই হরেন্দ্র বাবুর কাছ থেকেই গতবারে শুনেছি। পাঠশালার নিদ্রাতুর গুরুমশাই, আর ইস্কুলের গম্ভীর মুখ হেডমাষ্টার মশাই এবং সঙ্গে গল্পখোর আমরা, সকলেই বিশেষরূপে পরিচিত আছি। এঁরা এক একটা ছাপমারা জাতি বা type।

গল্পের পাঠশালার গুরুমশায়ের মত, তাম্রকূট-সেবা-পরায়ণ, নিদ্রালু গুরুমশাই যে বাস্তব-জীবনে স্কুলে ও দেখা যায় না, তা নয়। আমি জানি একজনকে, যার মাঝে মাঝে ক্লাশ পালিয়ে বাইরে গিয়ে হুক্কা দেবীর মান-ভঞ্জন না করে না আস্‌লে চল্‌তই না। ছাত্রেরা জান্‌ত, গুরুমশাই পেট-রোগা; কিন্তু একদিন "সাধুর একদিন" এল, আর গুরুমশাই ধরা পড়ে গেলেন। সেদিন তাঁর মত বেচারা আর কেউ ছিল না। একজন শিক্ষয়িত্রীকে জানি, যার তামাক খাওয়া অভ্যাস ছিল না বটে, কিন্তু পড়াতে পড়াতে ঘুমের ঘোরে ঢোলা অভ্যাস ছিল। এঁর আওয়াজ ছিল ভারী কোমল আর মিঠে; কাজেই ইনি যখন নিদ্রা কাতর হয়ে পড়তেন, তখন এঁর গলার সুরে এমন এক মোহিনী শক্তি দেখা দিত, যার ফলে এঁর ছাত্রীরা যদিও কোমল শৈশবে তাঁরা থাকৃতেন না, এঁর পদাঙ্কানুসরণ করে ঘুমের রাজ্যে উপস্থিত হতেন। মাষ্টারমশাই ক্লাশে ঘুমাচ্ছেন, নাকও একটু একটু ডাকৃছে; ছাত্রীরা পরম আরামে, নিশ্চিন্ত ভাবে টুকটাক খেল্‌ছে, কি সেলাই করছে এমন সময় বিদ্যালয়ের কার্য্য-পরিদর্শিকা যিনি, তিনি এসে উপস্থিত হলেন। ছাত্রীরা ব্যস্ত হয়ে, কন্যাকুমারীকা খুঁজ্‌তে ম্যাপের দিকে ব্যগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। একজন একটু দুষ্টু, চেঁচিয়ে বল্লে, "ও পণ্ডিতজী, কুমারীকা কোথায় পাচ্ছি না যে; আপনি ত ঘুমোতে লেগেছেন।" পণ্ডিত চমকিয়ে উঠেই এক হুঙ্কার দিয়ে উঠিলেন "কুমারীকা কোথায় জান না, মূর্খ? হিমালয় জান, হিমালয় থেকে কুমারীকা পর্য্যন্ত—সিধা আঙ্গুল নামিয়ে যাও"। পরিদর্শিকা এতে খুব সন্তুষ্ট হয়ে, পণ্ডিতজীর বিষয়ে যে খুব প্রশংসাজনক রিপোর্ট লিখ্‌লেন না এ, বলা বাহুল্য।

অনেক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আছেন, যারা মনে করেন ছাত্র ছাত্রীদেরই সম্বন্ধে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর প্রতি ব্যবহার বলে একটা জিনিস আছে, তাঁদের সম্বন্ধে ছাত্র ছাত্রীদের প্রতি ব্যবহার বলে যেন কোনও একটা কথা নাই। তাঁরা যেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি; সুতরাং, তাঁরা যা বলেন বা করেন তা নির্ভুল এবং ছাত্র ছাত্রীকে তা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করতে হবে। আমি জানি একজনকে, যিনি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ঠিক মত করতেন না; সাহিত্যের অধ্যাপনা তিনি করতেন, কিন্তু বাড়ীতে নিজে ভাল করে আপনার অধ্যাপনার বিষয় দেখে আস্‌তেন না। ফলে, তিনি অনেক ভুল করতেন—ব্যাখ্যায় এবং শব্দার্থে। ছাত্রীদের মধ্যে একজনের কোনও কারণে কোনও শব্দার্থ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, সে অন্য কোনও অধ্যাপিকার কাছে সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ উপস্থিত হয়। ইনি যে অর্থ করেন বালিকাটার তা মনের মত হয় এবং তারপর সে এঁকে অনেক গুলি কথার অর্থ এবং শ্লোকের অর্থ জিজ্ঞাসা করে। তারপর দিন, অধ্যাপনার কাজ যখন প্রথম

জন আরম্ভ করেন, তখন এই বালিকাটী বলে "আপনার কৃত অর্থ আমার ঠিক মনে না হওয়ায়, আমি অমুককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি অভিধান দেখে এই বলে দিলেন ; আপনার কি মনে হয় না এইটা ঠিক ?" অধ্যাপিকা মহা বিরক্ত হয়ে উঠে বল্লেন "কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা ! আমি বলে দিলাম মানে, তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আবার অমুকের কাছে যাওয়া, আর অভিধান দেখা। আমি যা বলব তাই কোথায় নির্ব্বিচারে মেনে নেবে, না এই সব ফাজ্‌লামি। মেয়েটার নামে প্রধান আচার্য্যার কাছে নালিশ নিয়ে তিনি এলেন। দ্বিতীয়া অধ্যাপিকাটীরও নামে অকারণ হিংসার অভিযোগ করতেও বাদ দিলেন না ; অথচ তিনি জান্‌তেনই না যে এই অধ্যাপিকার পাঠ তিনি বুঝিয়ে দিলেন।

এঁরা নিজেদের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে এত ব্যস্ত যে যেটা এঁরা জানেন না বা ভুলে গিয়েছেন, সেটা স্বীকার করতে এঁরা লজ্জা বোধ করেন, পাছে "আমি জানি না" বা "আমি আজ এখন বোঝাতে পার্ব্বনা, আমায় একটু দেখে নিতে হবে" বল্লে ছাত্র বা ছাত্রী তাঁকে সব-জান্‌তা নয় বলে চিনে ফেলে অশ্রদ্ধা করে ফেলে। জীবন্ত বিশ্বকোষ হওয়াই যেন জীবনের চরম সার্থকতা। ছাত্র ছাত্রীরা তাঁদের অন্যান্য কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করলে, এঁরা ভয়ানক চটে উঠেন। আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন একদিন আমাদের এক শিক্ষক বল্লেন "তোমরা পড়ার বই এর বাইরে যদি কিছু জানতে চাও, আমায় জিজ্ঞাসা করো, আমি বলে দোবো।" ইনি মাঝে মাঝে এম্‌নি করে আমাদের general information এ শিক্ষাদান কর্‌তেন। সকলে নানা রকম প্রশ্ন কর্‌তে লাগল, ইনি প্রসন্নমুখে উত্তর দিতে লাগলেন ; মাঝে মাঝে "কি বোকা ! এটাও জান না ! এতো খুবই সহজ" এরকম বলে আমাদের শিশুমনের ক্ষুদ্রত্ব এবং অল্পজ্ঞানকে আমাদের কাছে পরিস্ফুট করে তুল্‌তে লাগ্‌লেন। আমি খুব উৎসাহ সহকারেই এঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "আচ্ছা, আকাশ কেন নীল ?" আমার আট বৎসর বয়সের মস্তিস্কটা এ প্রশ্নের সমাধানের জন্য কিছু দিন আগে থেকেই ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ মাষ্টার মশাই এর হাসিমুখ একেবারে গম্ভীর হয়ে গেল এবং তিনি গর্জ্জন করে উঠলেন—"ফাজিল" ! তাঁর বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে ছিল, কথাটার উচ্চারণ এবং চীৎকার ঠিক সেই রকমই হয়েছিল। শিশু আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর দিকে চেয়ে রৈলাম এবং নিজের অপরাধ কিছু না বুঝেও দণ্ড-গ্রহণ কর্‌লাম। কিন্তু ক্লাশের অপেক্ষাকৃত বড় অন্য শিশুরা হাসাহাসি কর্‌ল যে, মাষ্টার মশাইকে এবার কিন্তু কঠিন প্রশ্নই করা হয়েছে, যাহোক।

এই ধরণের লোকেদের মধ্যেই বেশীর ভাগ ছাত্র ছাত্রীদের ভুল নিয়ে কঠোর তামাসা করার প্রবৃত্তি বেশী দেখা যায়। শিক্ষার্থী যে, সে যদি নির্ভুলই হবে, সব প্রশ্নেরই ঠিক ঠিক উত্তর দেবে, সে শিক্ষার্থী হয়ে আসবে কেন ? সে তো শিক্ষকের সঙ্গে শাস্ত্রের লড়াই সুরু করে দিবে—এটা এঁদের মনে আসে না। কতবার তারা ভুলে যাবে, কতবার তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, অসহিষ্ণু বা ধৈর্য্য-হারা হলে যে চল্‌বে না, এটা আমরা খুব অল্প সময়েই মনে রেখে কাজ করি।

আমার একজন সহকারিণী একদিন আমায় এসে বল্লেন "—শ্রেণীর মেয়েগুলি ভয়ানক বোকা ! কাল আমি ওদের এত করে পড়া বুঝিয়ে দিলাম, ওরা বুঝ্‌ল না। আজ বল্‌ছে, কিচ্ছু

বোঝে নি—আমি ওদের এই বই পড়াতে পারব না। অত ধৈর্য্য আমার নেই।" অপর একজন আমায় বল্লেন "তোমার ধৈর্য্য আছে কি ? তুমি পড়াবার ভারটা নেও না।" বইটা, বিশেষতঃ সে অংশটা তাদের পক্ষে বাস্তবিক কঠিন ছিল—আমি চেষ্টা করলাম এবং যদিও তারা বলল "বুঝেছি" আমার মন সন্দেহ-মুক্ত হ'ল না। কিছুদিন পরে আমি প্রশ্ন করে দেখলাম আমার সন্দেহ ঠিক ; আমি তখন অপর একজনের শরণাপন্ন হলাম ! আমি ছাত্রীদের মাতৃ-ভাষায় অংশটা তাদের বুঝিয়ে দিতে অক্ষম, অথচ ইনি তা পারেন, কাজেই এঁকে বল্লাম "আপনি একটু দেখবেন, এরা বোঝে না বলে আমার মনে হচ্ছে।" ইনি বোঝালে পরে, আমি এদের মুখ দেখেই বুঝলাম যে, এরা বুঝেছে। আমি খুসী হয়েই বল্লাম—"এখন বুঝেছ ত ? এতদিন তো কিছুতেই বুঝছিলে না।" আমার সহকারিণীটি বল্লেন "তুমি খুসী হয়ে যাচ্ছ ? তোমার বোঝানোকে যে ওরা খেলো করল, তা দেখলে না ? আমার ত রাগ হচ্ছে।"

এঁদের মধ্যে কেহ কেহ আছেন যাঁরা সুরুতে খুব মিষ্টি করেই বলেন "দেখো, না বোঝো যদি, আমায় বলবে, আমি যতক্ষণ তোমরা না বোঝো বুঝিয়ে দোবো।" এবং প্রথমবার যখন বোঝান, তখন অতি স্নেহের সহিত "বুঝলে ত—এঁ্যা" ইত্যাদি বলেই বোঝান। আমার বাল্যকালে, এই রকম একজনের সঙ্গে আমার পরিচয়ের ফলে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হয়ে গিয়েছিল, তা দূর হতে দশ বৎসর সময় লেগেছিল। অঙ্কের শিক্ষয়িত্রী বলেছিলেন "যতবার জিজ্ঞাসা কর্ব্বে, আমি বুঝিয়ে দেবো। না বুঝলে ভয় পেয়ো না, জিজ্ঞাসা কোরো।" একদিন দুর্ভাগ্যক্রমে আমি শূন্য শ্লেটখানি ধরে বল্লাম "আমি বুঝি নি।" শিক্ষয়িত্রী বল্লেন "এদিকে এসো"। তাঁর গলার স্বরে তখন মিষ্টত্ব নেই বল্লেই হয়। আমি ত দুরু দুরু বুকে উঠে গেলাম। তিনি বল্লেন—"হাঁটু গেড়ে এইখানে বোসো।" তারপর বোর্ড মোছা ঝাড়নটা দিয়ে, আমার কাণ না ধরে, চীৎকার করতে করতে বল্লেন— "কেন বোঝো নি—হুঁ" আর কাণখানা ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে অঙ্ক বোঝাতে লাগলেন ; সে গানের তালের ঠেকা হ'ল, "আর বোলবে বুঝি নি—আর বোলবে ?" আমার অপমান-কাতর মন তখন বলছে "হে ধরণী দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি"। আমি ত সেদিন অঙ্ক বুঝলামই না। পরন্তু যতদিন স্কুলে ছিলাম, অঙ্কশাস্ত্রটাকেই ভালবাসতে পারি নি। কতজন এরকম আছেন যাঁরা পরম নিশ্চিন্ত ভাবে শিশু চিত্তের বিশ্বাস এবং নির্ভরকে এইরকম নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করেন—অথচ এঁরা হচ্ছেন শিশু-চিত্ত-গঠন-কারী শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী !

ক্লাশে যে পড়া পারে না, সে যে কেন ওরকম, তা খোঁজ করা যে শিক্ষকেরই কর্ত্তব্য, এটা অনেক শিক্ষক মনেই আনেন না। একটুখানি প্রশংসা যে অনেক সময় কাজের উৎসাহ আনে, উপহাস যে শিশু-চিত্তকে এমন নির্ম্মমভাবে আঘাত করতে পারে, যে তার সকল কর্ম্ম-চেষ্টাকে নিষ্প্রভ করে দেয়, এসব কথা অনেকে খেয়ালেই আনেন না। আমি জানি একজনকে,— যাঁর কাছে বিদেশী ভাষায় কথা বলতে গিয়ে, প্রথম শিক্ষার্থী drink এর যায়গায় eat বলেছিল, তাই নিয়ে তিনি এতবার তাকে উপহাস করেছিলেন যে, মর্ম্মান্তিক আহত হয়ে, সে বেচারা সে ভাষাতে কথা বলা ছেড়েই দিয়েছিল।

আরেক দল আছেন যাঁরা শুচিবায়ু-গ্রস্ত। এঁরা সকল কিছুতেই পাপের অঙ্কুর দেখ্‌তে পান এবং তাকে সমূলে উৎপাটিত কর্‌বার জন্য বিধিমত চেষ্টা করতে ক্রুটী করেন না। এঁরা এটা জানেন না যে, যেখানে শিশু-চিত্তে পাপের কোনও ধারণাই আসে নাই, কোনও অশুচি-চিন্তা আসেই নাই, সেইখানে এঁদের এই ব্যবহার দ্বারাই কৌতুহল জাগিয়ে তুলে, অশুচিতা বা অশ্লীলতার দিকে দৃষ্টি আনেন। একবার কল্‌কাতার কোনও মিশনারী স্কুলে একটী পাঁচ ছয় বৎসরের ছোট ছেলে সমপাঠিকা একটী ঐ বয়সী মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেছিল "ভাই, কাল আমার কাকার বিয়ে হয়ে গেল, কত মজা হয়েছিল, আমার কেমন কাকীমা এল, চকচকে সাদা সিল্কের কাপড় পরে (ছেলেটী খ্রীষ্টান); তোকে আমি অমনি কাপড় দোবো তুই আমাকে বিয়ে কর্ব্বি?" মেয়েটী উত্তর দিল "যাঃ, লাল কাপড় দিস্ ত বিয়ে কর্ব্ব, নৈলে নয়"। ছেলেটী লাল কাপড় দিতেই রাজী হ'ল; কিন্তু শিক্ষয়িত্রী অত্যন্ত রেগে গিয়ে দুটী শিশুকেই কঠিন দণ্ড দিলেন এই বলে "ফের, এইসব অশ্লীল কথা! বিয়ে করা আবার কি?" দণ্ড এত কঠিন হয়েছিল যে ক্ষীণ দেহা মেয়েটী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং সারারাত বিকারের ঘোরে চেঁচিয়েছিল "আমি কখ্‌খনো বিয়ে কর্ব্ব না—বিয়ে অতি খারাপ কাজ!—এর কাকা বড্ড খারাপ কাজ করেছে।" এইখানে কিছুদিন আগে একটী বিধবা এসে তাঁর শিশু-কন্যাকে দিয়ে গেলেন এই বলে যে তিনি অসহায়া, কন্যাকে শাসনে রাখ্‌তে পারেন না, সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটীর কাপড় চোপড়, দেহ যে রকম ময়লা, কথাবার্ত্তাও তেম্‌নি রুচি-হীন। অনেক সময়েই সে অন্য কোনও শব্দ অজানা থাকার দরুণ এমন শব্দ প্রয়োগ করে যা সভ্য সমাজে আমরা ব্যবহার করি না। একে সংশোধনের ভার নিলেন প্রায় সকল শিক্ষয়িত্রী-ই। কথায় কথায় একে চোখ রাঙান, কঠিন শাসন, উপদেশ এবং উপহাস চল্‌তে লাগ্‌ল। "ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, এমন কথা মুখে আন! কাণে আঙুল দিতে হয়" এতো চল্‌তেই লাগ্‌ল, সময় সময়ে অনেককে ডেকে সে কি বলেছে তা বলে ধিক্কারের হাসি এবং তামাসা চল্‌তে লাগ্‌ল। মেয়েটী অবাক্‌, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকৃত; কখনো কখনো সকলকে হাস্‌তে দেখে হাস্‌ত। সে সর্ব্বদাই শুন্‌ত "তোর কাপড় যেমন ময়লা, শরীর তেমন ময়লা, মনও তেম্‌নি ময়লা।" আমি একদিন অতি সঙ্কুচিত ভাবেই প্রস্তাব কর্‌লুম "আমার কাছে একে কয়েক দিন দেবেন কি? দেখি, আমি কিছু কর্‌তে পারি কি না।" আমায় সকলেই একবাক্যে আশ্বাস দিলেন "কিছু করার ও বাইরে। তবে আমি ওকে দেখ্‌তে পারি।" লজ্জাবতী খুসী হয়েই বল্লেন "আমি ত এঁদের শিশু পরিচালনা সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে গেলেই এঁরা হাসেন, এখন দেখা যাক্‌ তোমায় দেখে যদি এঁরা বোঝেন।" আমি ত প্রথমেই তার দেহ খানা পরিষ্কার করার দিকে মন দিলাম। সে দুএক দিনেই নিজেকে পরিষ্কার রাখ্‌তে শিখ্‌ল এবং সে বিষয়ে বেশ যত্নবতীই থাক্‌তে লাগ্‌ল। আমার হাতের মধ্যে তার হাতখানা পরম নিশ্চিন্ত ভাবে দিয়ে, আমায় সে একদিন জিজ্ঞাসা কর্‌ল "তুমি আমার 'সহেলী' না?" আমি বল্লাম "হাঁ"। তখন সে বল্ল "দেখো, আমি এখানে এসে অবধি ভাব্‌ছি এ কোন্ যায়গায় এলাম, সব্বাই আমার উপর বিরক্ত; আমায় শ'তান শ'তান বলে। আমার ভাল লাগ্‌ছিল না। তুমি আমায় ভাল বাস্‌বে?" আমি বল্লাম "আমি তোমায় ভালবাসি"। সে দৌড়িয়ে গিয়ে সকলকে এ

সু-খবর শোনাতে গেল এবং সকলে যখন উপহাসের হাসি হেসে উঠ্‌ল তখন সে যা কথা উচ্চারণ কর্‌ল তা' শ্রুতিমধুর নয় এবং যে ব্যবহার কর্‌ল তা' সুখদায়ক নয়। সবাই মিলে তাকে ঠেলে ঠেলে আমার কাছে নিয়ে এলেন; "যা তোর সহেলীর কাছে যা, বল্‌ গিয়ে যে সব কথা এখানে বলেছিস্‌—দেখিবি তখন কত আদর ভালবাসা পাস্‌।" অপরাধী সে যখন নতশিরে আমার কাছে এলো, তাকে বল্লাম "তুমি যখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে, তোমার দেহ কি এত পরিষ্কার থাকৃত? তোমার কাপড় এরকম সুন্দর থাকৃত?" সে বল্ল "না"। আমি বল্লাম "এখানে যেমন দেহ কাপড় পরিষ্কার রাখ্‌তে হয়, মনও তেম্‌নি রাখ্‌তে হয়, কথাও তেমনি রাখ্‌তে হয়। নোংরা যারা তারা ঐ রকম বলে। পরিষ্কার যে, সে বলে না।"

"আমি নোংরা কথা বলেছি, তুমি আমায় 'দণ্ড' দিবে?" "হাঁ, তুমি ঐ কোণটায় গিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়াও; সঙ্গিনীদের সঙ্গে খানিকক্ষণ খেলা বন্ধ।" আমার সহকারিণীরা অনেকেই এত অল্পদণ্ডে বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লেন। একজন বল্লেন "হাঁ, এম্‌নি করে বুঝি ছেলে শাসন করতে হয়? এতে কি কখনো ছেলে দুরস্ত হয়? আমি হলে আজ ওকে জুতোপেটা কর্ত্তুম"। আমি শান্তভাবেই বরং একটু ক্লান্ত সুরেই বল্লাম "সেই ত! আমি যে আমি, আপনি নই"। মেয়েটী কোণে দাঁড়িয়ে রৈল, আমি ঘরে চুপ করে একটা চেয়ারে বসে রৈলাম। সে খানিক্ষণ পরে বল্ল "তুমি বাইরে যাবে না?" আমি বল্লাম "আমি কি করে যাই তুমি রয়েছ যে"। "তুমি কতক্ষণ থাকৃবে?" "যতক্ষণ না তোমার আপশোষ হবে, নোংরা কথা বলেছ বলে।" একটু পরেই ফোঁস্‌ ফোঁস্‌; তারপর জোরে জোরে কান্না। "তোমারও তা হলে 'দণ্ড' হ'ল যে। আমি আর এমনি কর্ব্ব না"। অথচ একে কাঁদাবার এবং ক্ষমা চাওয়াবার জন্য আমার সঙ্গিনীরা কত রকম কঠিন পন্থা অবলম্বন করেও একে টলাতে পারেন নি।

আরেক জনকে আমি জানি, যাঁর কথায় কথায় চড় চাপড় দেওয়া অভ্যাস। ইনি পুত্রবতী। আমি এঁকে এরকম করা আমি পছন্দ করি না বলাতে, তাঁর মাতৃত্বের দোহাই দিয়ে তিনি যে সন্তান-পালন সম্বন্ধে বেশী জানেন, তা প্রমাণ করতে চেষ্টা কর্‌লেন। আমি বল্লাম "আপনার বক্তব্য, আপনি আপনার সন্তানদেরও মারেন, এই ত! তাদের যখন মারেন, তখন আপনার মনটা যে রকম ব্যথায় ভরে ওঠে এবং পরে তাদের যত রকম আদর করেন, এদেরকে মার্‌তে গেলে আপনার সেরকম মনে হয়, না, পরে সেরকম আদর করেন? সত্যি বলুন ত"। তিনি বল্লেন "না, তা হয় না বা করি না"। আমি বল্লাম "তবে নিজের ছেলের দোহাই দিয়ে পরের ছেলেকে মেরে শিক্ষা দিতে যাবেন না, অন্ততঃ আমার কাছে নয়।"

যাঁরা মারেন না বা বোঝান না কিন্তু শিশুটিকে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে বসে আধ ঘণ্টা ধরে চোখ বুঁজে ভগবানকে ডাকৃতে থাকেন, অবাক হত ভম্ব শিশুটিকে সুমতি দেবার জন্য, ভগবান তাঁদের ব্যাপার দেখে কি ভাবেন, জানি না। আমার হাসিও পায় এবং মন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। যে নিরাকার ভগবানের সত্বা ভাল করে উপলব্ধি করতেই পারে না, তার চোখের সামনে রুদ্রের বজ্র-সমুদ্যত মূর্ত্তির একটা ভীষণ কল্পনা জাগিয়ে তুলে, মঙ্গল-স্বরূপকে জুজুতে পরিণত করাটা গভীর অন্যায় বলেই মনে হয়। জানি না, আজ কত বিপথ-যাত্রী এই সাক্ষ্য দিবে যে, শৈশবের এই

জুজুর উদ্যত বজ্রকে তার মিথ্যাচরণের উপর সম্পতিত না হতে দেখে, তার নামবার পথ সুগম হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু তাও হয় দেখেছি।

আজকার এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার দিনে, গুরু শিষ্যের সম্বন্ধে সখ্যভাব এসে গিয়েছে, বিশেষতঃ যেখানে শিষ্য 'প্রাপ্তেষু ষোড়শ বর্ষে' হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু অনেকে সে কথা ভুলে যান এবং সেই জন্যই শিষ্য-চিত্তের উপর বিশেষ প্রভাব রাখ্‌তে পারেন না এবং যে সম্মান শ্রদ্ধা হারাবার ভয়ে নিজেকে দূরে দূরে রাখেন, তাতে শিষ্য-চিত্তে স্থানই নিতে পারেন না। আমি অনেক স্থলেই দেখেছি, বন্ধু গুরুর প্রতিই ছাত্র-চিত্ত বিশ্বস্ত, সশ্রদ্ধ ও স্থির-প্রেম কিন্তু শ্রদ্ধা-লোলুপ তোমা-হতে-অনেক-উচ্চে-স্বর্গে-আছি-প্রকৃতি বিশিষ্টদের প্রতি বিমুখ-চিত্ত এবং সময়ে সময়ে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা-হীন।

এই সমস্ত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী ছাত্র ছাত্রীকে না জেনে অন্যায় রূপে শাস্তি দিয়ে পরে অন্যায় টের পেয়েও স্বীকার কর্‌তে লজ্জা পান। কিন্তু এটা যে কিসের লজ্জা, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুতেই আসে না। কলাম্বোতে থাকৃতে, আমি একবার বুঝ্‌তে ভুল করে, একটী ছাত্রীকে সকলের সামনেই তিরস্কার করেছিলাম। কারণ, যে কাজটা তার নামে আরোপিত হয়েছিল, অতিশয় গুরুতর দোষের কাজ হয়েছিল। পরে আমি টের পেলাম যে সে নির্দ্দোষী। একটা ভুলের বোঝা তার উপর পড়েছে। তখন আমি সকলকে একত্রিত করে সকলেরই সাম্‌নে আমার দুঃখ জানিয়ে ক্ষমা চাইলাম। আমার কাজ যে আমার সঙ্গিনীদের অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকেছিল, তা নীচের ঘটনাতেই জানা যাবে। আমার এক সহকর্ম্মিণী অপর কোনও কলেজে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার প্রিন্সিপ্যালকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "ভারতবাসীরা বড় অদ্ভুত প্রকৃতির নয় কি?" তিনি বল্লেন "কেন?"

"আমাদের প্রিন্সিপ্যাল ভারী মজার। তিনি আজ এক ছাত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।"

"কেন?"

"অন্যায় করে শাস্তি দিয়েছিলেন বলে! ভারতবাসীরা মজার নয় কি?"

উত্তরে প্রিন্সিপ্যালটী বলেছিলেন "আমি এই ভারতবাসীরই বংশ জাত বলে গৌরব অনুভব কর্‌ছি।" আমার সহকর্ম্মিণী চুপ হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় একজন আমায়ই বলেছিলেন "আপনি কেন ক্ষমা চাইলেন?" আমি বল্লাম "ক্ষমা চাওয়া কি? অন্যায় করেছি তা স্বীকার কর্‌লাম, তাতে দোষ কি?"

"দোষ হয়নি ত! আপনি যে প্রিন্সিপ্যাল।"

"অতএব আমার অন্যায় হয় না। কিম্বা হলেও তা গ্রাহ্য কর্‌তে হবে না?" বন্ধুটী বল্লেন "আপনার সঙ্গে ত কথা ক'য়ে পার্ পাবার যো নাই। যা' খুসি করুন।

এইত গেল গুরু-শিষ্য সংবাদ। বারান্তরে গুরু-গুরু সংবাদ সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার ইচ্ছা রৈল।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস !

পারি না বিষ্ণুপ্রিয়া !
মনে করি বটে সংসারে রই, প্রবোধ মানে না হিয়া।
একটি মোহের মধুর আবেশে রচিয়া একটি গেহ ;
মদিরা-মত্ত মাতাল মতন ভুলুক চিত্ত দেহ।
একটি কুসুম একটু গন্ধ একটি শোভন মুখ,
একটি প্রাণের প্রীতির সুধায় তৃপ্ত থাকুক বুক !

ভাবি এই কত বার।
রোধিতে কিন্তু পারিনা আমার মুক্ত বক্ষ-দ্বার।
ভিড় করে সেথা ঢুকিছে বিশ্ব উতরোল আহ্বান
মন্দ্রিত সেথা পাগল করার উন্মাদময় তান,
সেই অনুরাগে ভেসে যায় সাধ ভাসে যে নিখিল ধরা,
আমি কোন ছার কেমনে বুঝাব কি তান সকল-হরা !

কেন গো ছাড়িব ঘর ?
অখিল ভবন আমারি আপন কেহ নাই কোথা পর !
তোমারি মতন সবারে এখন মর্ম্মে ধরিতে সাধ,
তুমিই প্রথমে জানালে তো, দেবি, ভালবাসিবার স্বাদ !
শোণিত লোলুপ শ্বাপদের মত এখন চিত্ত মোর
প্রণয় লালসে লালায়িত সদা জ্বলিছে পিয়াসা ঘোর !

যাহাদের ভালবাসি—
তাহাদেরি লয়ে সংসার করা তারে বল সন্ন্যাসী ?
কোটী জীব যার আপন স্বজন ভুলে থাকা তার সাজে ?
আপনারি সুখে আপন পুলকে স্বার্থেরি ছোট কাজে !
তারা যে আমার পথের ধূলায় ব্যথিত ক্লান্ত ভীত,
তীব্র দুখের অনল জ্বালায় সদাই জর্জ্জরিত !
কেমনে রহিব ঘরে ?
আমার প্রেমিক পাগল পরাণ কাঁদে যে সবারি তরে !

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

সাধু অঘোরনাথ।

মহা প্রেমিক শ্রীচৈতন্যের প্রধান সঙ্গী পরমভক্ত অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া, উক্ত গ্রামখানিকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। এই অদ্বৈতাচার্য্যের বংশে, শান্তিপুরে, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ এবং বৈদ্যবংশে তাঁহার বাল্য ও যৌবনকালের পরম বন্ধু সাধু অঘোরনাথ জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রামের সুনাম রক্ষা করিয়াছেন। শান্তিপুরের এই দুই ধার্ম্মিক পুরুষের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ ভক্ত, অঘোরনাথ যোগী; বিজয়কৃষ্ণ অসীম সুন্দরের অপরূপ সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন; অঘোরনাথ সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া প্রেম-স্বরূপের সঙ্গে যোগে যুক্ত হইয়া থাকিতেন। বিজয়কৃষ্ণ দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন; তাঁহার শিষ্য সেবকও ছিল বিস্তর; এই জন্য তাঁহার বৃহৎ জীবনচরিত মুদ্রিত হইয়াছে; দেশের অনেক পুরুষ ও নারী উহা পাঠ করিয়া যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু অঘোরনাথের অকালে মৃত্যু হওয়ায় এবং তাঁহার শিষ্য সেবক না থাকায়, তাঁহার কোনরূপ উৎকৃষ্ট জীবনচরিত প্রকাশিত হয় নাই; অনেক দিন পূর্ব্বে ভক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা মহাশয় অঘোরনাথের ছোট একখানি জীবন চরিত লিখিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সেই গ্রন্থ ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ আছে। তাহার বাহিরেও যে উহার প্রচার আছে, কই, আমরা ত উহার কোনই প্রমাণ পাই নাই। অথচ এই সাধুপুরুষের সাধনের কাহিনী ও জীবনের চিত্তাকর্ষক ঘটনা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরই জানা প্রয়োজন। অঘোরনাথের ন্যায় একজন সাধক ও ত্যাগীপুরুষ হিন্দুসমাজে, খ্রীষ্টানসমাজে, ব্রাহ্মসমাজে, অথবা যে কোন সমাজেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, ইহার দুই চারিটা মত ও কার্য্যের সঙ্গে লোকের মতের অনৈক্য থাকে ত থাকুক না কেন, আসলে এই শ্রেণীর সাধু ও ত্যাগী পুরুষের জীবনই সকলের একটা সম্পত্তি; এই সকল জীবনের আধ্যাত্মিক শক্তিই ত হৃদয়ে হৃদয়ে মহৎভাব উদ্দীপিত করিয়া তোলে। আমি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই এই রচনাটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

অঘোরনাথ ১২৪৮ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ শান্তিপুরে একটি সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র রায় কবিভূষণ মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ও একজন সুবিজ্ঞ কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসা-শাস্ত্রে এরূপ ব্যুৎপত্তি ও এ রকম আশ্চর্য্য নাড়ী-জ্ঞান ছিল যে, তিনি নাকি রোগীর হাত ধরিয়া নাড়ী টিপিয়াই, কোন্ দিন তাহার মৃত্যু হইবে, বলিয়া দিতে পারিতেন। সেজন্য তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ত ছিলই; তাহা ছাড়া, তিনি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যোগ-সাধন করিতেন বলিয়া, যোগীপুরুষ রূপেই লোকের অতিশয় শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অঘোরনাথ পিতার সাধুতাও ধর্ম্মভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াই যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য, শৈশবকাল হইতেই তাঁহার নির্ম্মল প্রকৃতির মধ্যে কোমল, মধুর এবং আধ্যাত্মিক ভাব লক্ষিত হইত। তিনি ছেলেবেলা হইতেই শান্ত, শিষ্ট, ক্ষমাশীল ও দয়াবান্। তিনি বাল্যকালে কাহারো জন্য কিছু করিতে না পারিলেই, অতিশয় দুঃখিত হইতেন;

কিছু করিতে পারিলে আর সুখের সীমা থাকিত না। এজন্য বালক অঘোরনাথের প্রতিবেশীরা প্রায়ই তাঁহার হাতে হাটবাজার করিবার পয়সা দিতেন; তিনি সমস্ত জিনিস কিনিয়া, লোকের বাড়ী বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতেন। এজন্য তাঁহার ঘরের লোকেরা ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেন—"তুই কি লোকের চাকর, যে তাহাদের জিনিস কিনিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে দিয়া আসিস্"? অঘোরনাথ ঐ রকম তিরস্কার শুনিয়া শুধু হাসিতেন।

অঘোরনাথ পাঠশালায় বাঙ্গলা, তাহার পরে টোলে সংস্কৃত শিখিয়া, আঠার বৎসর বয়সের সময়ে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া সংস্কৃত ও ইংরাজী পড়িতে লাগিলেন। তখন তাঁহার টোলের সহাধ্যায়ী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ও সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত। গোস্বামী মহাশয় ত তাঁহার বাল্যকালের বন্ধুই ছিলেন; তাহা ছাড়া, পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী, পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অঘোরনাথের সঙ্গে এক শ্রেণীতেই পড়িতেন। এই পাঁচটি যুবা পুরুষের মধ্যে একটি অতি আশ্চর্য্য ভালবাসা জন্মিয়াছিল। পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ্যাবস্থার বিষয়ে বলিয়াছেন, "বিদ্যালয়ে আমার বন্ধু যখন পড়িতেন, তখন হইতেই তিনি বিনম্র, সরল ও প্রেমিক হৃদয় ছিলেন। বয়স্যগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহা তিনি মিটাইয়া দিতেন। কাহারও পীড়া হইলে সাধ্যানুসারে সেবা শুশ্রূষা করিতেন, সকলকেই ভালবাসিতেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৩০৬ সালের 'নব্যভারতে' একটি রচনার মধ্যে লিখিয়াছেন—

"বিজয়, অঘোর, শিবনাথ, উমেশ ও আমি এই পাঁচ জনের মধ্যে এক সময়ে সুদৃঢ় প্রণয় বন্ধন ছিল। সংস্কৃত কলেজের ঘোর নাস্তিকতার সময়, আমরা পাঁচ বন্ধু "ভাগবন্ত" বলিয়া উপহসিত হইতাম। সেই ঠাট্টা বিদ্রূপের মধ্য দিয়া আমাদের ভগবদ্ভক্তি দিন দিন উপচিত হইতে লাগিল। বিজয় আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং তিনি আমাদের দলের একরূপ নেতা ছিলেন। আমরা নির্য্যাতন ভয়ে কয়জনে মিলিত হইয়া উপাসনা করিতাম। তখন ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিমার্জ্জিত মনে করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে নিয়মিতরূপে যাইতাম।"

এই পাঁচ বন্ধুর মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ অনেকদিন পূর্ব্বেই ব্রাহ্মসমাজের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মসমাজের এক অভিনব আধ্যাত্মিক জ্যোতি স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দুই বৎসর হিমালয়ে ধর্ম্মসাধনের ফলে ঋষি-জীবন প্রাপ্ত হইয়া, কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হইয়া, তাঁহার সাধন-লব্ধ সত্য সকল উৎসাহের সহিত প্রচার করিতেছিলেন। তখন তাঁহার এক একটি বাক্য আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ধর্ম্মার্থী যুবকদিগের হৃদয়ে গিয়া পড়িত এবং তাহাদের অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিত। এই সময়ে, একদিন, বিজয়কৃষ্ণও ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়া এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ শুনিয়া, উচ্ছ্বাস পূর্ণ হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে, মহর্ষিকেই ধর্ম্ম-গুরুরূপে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কাজেই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার জন্য তাঁহার চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তখন তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ অঘোরনাথও ব্রাহ্মসমাজের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ইহার ফল হইল এই যে, ১২৬৭ কি ১২৬৮ সালে, বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোরনাথ উভয়ে মিলিত হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া ডাক্তারি পড়িতেছিলেন; অঘোরনাথও আর অধিক দিন সংস্কৃত কলেজে পড়িতে পারিলেন না; ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচারের বাসনাই তাহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি কলেজ ত্যাগ করিয়া কিছুদিন গৃহে বাস করিয়াই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি পত্রিকায় স্বরচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে, পূর্ব্ববঙ্গের পরম হিতৈষী খ্যাতনামা ডেপুটি কালেক্টর ব্রজসুন্দর মিত্র, প্রসিদ্ধ স্কুল ইনস্পেক্টার রায় দীননাথ সেন বাহাদুর প্রভৃতির অনুরোধে, অঘোরনাথ ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও ব্রাহ্ম স্কুলের মাষ্টার হইয়া উক্তস্থানে গমন করিলেন। এই সময় তিনি ২৩ বৎসর বয়সের একটি যুবা পুরুষ; কিন্তু এই যুবা পুরুষের উপরই ঢাকার সর্ব্বশ্রেণীর লোকের একটি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার উদয় হইল। তাঁহারা দেখিলেন, অঘোরনাথ ধর্ম্মকেই সত্যবস্তু ও সকলের চেয়ে বড় জিনিস বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন; তাই ধর্ম্মের উপরে তাঁহার এমনই অটল বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার এমনই হৃদয়ের প্রেম যে, তিনি অম্লান বদনে সুখের ও স্বার্থের পথ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের সেবায় আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্যই প্রস্তুত হইতেছেন।

অঘোরনাথ ঢাকায় মাত্র এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাহার পরেই তিনি কলিকাতায় আসিয়া বিবাহ করিলেন। এই বিবাহ ব্যাপারেও তাঁহার ধর্ম্ম নিষ্ঠা ও সৎ সাহসেরই পরিচয় পাওয়া গেল। এখন ত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কতই অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে; হিন্দু সমাজেও অসবর্ণ বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন কোন্ বৈদ্যের ছেলে সাহস করিয়া কায়স্থের মেয়ে বিবাহ করিবে? তাহা হইলে ত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে। কিন্তু অঘোরনাথ সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশের ছেলে হইয়াও নির্ভীকচিত্তে একটি কায়স্থ বংশীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

অঘোরনাথ বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়া তাহার পরে কি করিলেন? তিনি কি অর্থোপার্জ্জনের, স্বার্থ সাধনের ও সাংসারিক সুখের জন্যই আপনার সময় ও শক্তি অর্পণ করিলেন! না, তাহা নহে। বিবাহের পরেই ফকির হইয়া, দারিদ্র্য ও সকল রকম সাংসারিক কষ্টকেই তিনি বরণ করিয়া লইলেন। যোগ-সাধন ও ঈশ্বরের সেবাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে সাধন ও ঈশ্বরের সেবার জন্য তিনি যে পরিশ্রম ও ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেও নয়ন অশ্রু সিক্ত হইয়া যায়। যিনি যথার্থই ভক্ত, যিনি ঈশ্বরকেই প্রভুরূপে বরণ করিয়া লইয়া তাঁহার সেবাব্রতে ব্রতী। তিনি যে ঈশ্বরের জন্য ছাড়িতে পারেন না এমন সুখ নাই, করিতে পারেন না এমন কাজ নাই, সেই কথাটি সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আমরা এখন অঘোরনাথের যোগ-সাধনের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। পরে, ঈশ্বরের সেবার জন্য এই ধার্ম্মিক পুরুষের আত্মত্যাগের চিত্তাকর্ষক কাহিনীই বর্ণনা করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অঘোরনাথের পিতা একজন সাধক ও যোগী পুরুষ ছিলেন।

পুত্র, পিতার প্রকৃতি হইতেই, যোগের একটি অনুকূল অবস্থা লাভ করিয়া ছিলেন; তাঁহার অন্তরের মধ্যেই যোগের একটি নিগূঢ় শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল। এখন সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হইতে লাগিল। অঘোরনাথের পক্ষে সাধন এমন স্বাভাবিক ও ধ্যান এমন সুখের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল যে, তিনি কলিকাতায়ই থাকুন আর ধর্ম্ম প্রচারার্থে নানা স্থানে ভ্রমণই করুন, একটু নির্জ্জন জায়গা এবং কর্ম্মের মধ্যে একটুকু অবসর পাইলেই, আপনার প্রিয়তম দেবতার নিরুপম সত্তার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন। শুধু তাহাই নহে। সময় সময় তিনি যোগী ঋষিদিগের প্রিয় স্থান হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিতেন; সেখানে তাঁহার সমস্ত সময় যোগসাধনে ও শাস্ত্রঅধ্যয়নেই অতিবাহিত হইত।

১৮৭৫ সালে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন অনুভব করিলেন, বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া, সহরের কোলাহল হইতে একটু দূরে গিয়া, গভীরভাবে ধর্ম্ম সাধন করা প্রয়োজন; নচেৎ ধর্ম্মের একটি নিরাপদ জায়গায় এবং সাধনের একটি উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হওয়া অসম্ভব। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই অঘোর নাথ ও অন্যান্য ধর্ম্ম প্রচারকদিগকে সঙ্গে লইয়া বেলঘরিয়ার নির্জ্জন উদ্যানে গমন করিলেন। তথায় তাঁহারা স্বহস্তে রন্ধন ও গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস, কেশবচন্দ্র ও অঘোরনাথ প্রভৃতির সাধনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, স্বয়ং বেলঘরিয়ার উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কেশব চন্দ্রকে বলিলেন—"বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দর্শন কর? সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চাই।"*

এই যে শুভমুহূর্ত্তে কেশব চন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গীদের সহিত পরমহংস মহাশয়ের মিলন হইল, এই মিলনের পরেই তাঁহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রেমের সম্পর্ক মধুর ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

অতঃপর ১৮৭৬ সালের ১৩ই ফাল্গুন বিজয়কৃষ্ণ ও অঘোর নাথ এই দুই বন্ধু মিলিত হইয়া ভক্তি এবং যোগ সাধনের জন্য বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিলেন। এই ব্রত উদযাপনের নিমিত্ত ইহার নিয়ম ও বিধি সম্বন্ধে তৎকালে যে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক রচিত হইয়াছিল, তাহা এই—

প্রাতঃসংস্মরণং স্নানং নামশ্রবণমেব চ।
উপাসনা চ শ্লোকাদের্যোগসম্বন্ধিনস্তথা॥
পাঠশ্চ বিবিধগ্রন্থাৎ রন্ধনং দানমেব চ।
অন্নানং সুদরিদ্রায়, সেবা চ পশুপক্ষিণাম্॥
তরুগুল্মাদিকানাঞ্চ ভোজনং পঠিতস্য চ।
শ্লোকাদোর্হি ব্যুদ্দিশ্য পরেষাং পঠনং পুনঃ॥
সৎপ্রসঙ্গস্তপস্যা চ ধ্যানং দেশে চ নির্জ্জনে।
সঙ্গীতঞ্চ স্তবশ্চৈব ভক্তশীর্ব্বাদযাচনম্॥
যোগাভ্যাসো নিশীথেঽত্র সংযমে যোগসিদ্ধয়ে॥

—'আচার্য্য কেশবচন্দ্র'। মধ্যবিবরণ। ৮০৪ পৃঃ।

যোগ শিক্ষার্থী প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়াই সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকে স্মরণ করিবেন। তাহার পরে প্রাতঃস্নান করিয়া ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইবেন।

---

* 'আচার্য্য কেশবচন্দ্র'। মধ্যবিবরণ। ৭৭১ পৃঃ।

উপাসনান্তে বিবিধ ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিবেন; রন্ধন হইলে, দরিদ্র ও পশু পক্ষীদিগকে অন্নদান এবং তরুলতার সেবা করিয়া আহার করিতে বসিবেন। তাহার পরে প্রাতঃকালে পঠিত যোগবিষয়ক উপদেশগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া সংপ্রসঙ্গ করিবেন। অবশেষে নির্জ্জনে ধ্যান ও তপস্যা। রাত্রির প্রথম ভাগে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় যোগাভ্যাস করিতে হইবে।

অঘোরনাথ যোগসাধনের এই ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রতি দিনই নিয়মানুসারে প্রত্যেকটি কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার এমনই নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল যে, সাধনের অতি তুচ্ছ একটি নিয়মও ভাঙ্গিতে চাহিতেন না; শরীর প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইলেও না। এইরূপ সংকল্পের বল ও মনের দৃঢ়তা না থাকিলে সাধনে কি তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া একজন সাধু পুরুষের মধ্যে গণ্য হইতে পারিতেন?

অঘোরনাথ একবার মসুরী পর্ব্বতে গমন করিয়া কিছু দিন যোগ সাধন করিয়াছিলেন; তাঁহার সেই সময়ের সাধন সম্বন্ধে ভক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মহাশয় গিয়াছেন—

এই সময়ে অঘোরনাথ পর্ব্বতে যে কয়েকদিন ছিলেন, কেবল নির্জ্জনে ধ্যান ও যোগসাধনে অতিবাহিত করিতেন। প্রাতে আসিয়া সুদূর অরণ্য মধ্যে নির্ঝর-তীরে গিরি গুহাভ্যন্তরে বসিয়া ব্রহ্মধ্যান আরম্ভ করিতেন; সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাসায় ফিরিতেন। বিরলে একাকী ব্রহ্মসম্ভোগ তাঁহার একটি অতিশয় সুখের ব্যাপার ছিল। গিরি গুহায় ব্রহ্মোপাসনা করিয়া গভীর যোগানন্দ এবং ভক্তির যে সকল বর্ণনা করিতেন, তাহা শ্রবণে সকলের চিত্ত বিমুগ্ধ হইত।

অঘোরনাথ যে শুধুই যোগ সাধন করিতেন, তাহা নহে; তাঁহার জীবনে সুমধুর ভক্তির ভাবটিও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। এ বিষয়ে স্বয়ং কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর উপর হইতে একটি উপদেশের মধ্যে বলিয়াছেন—

ভাই অঘোর হিমালয়ের বুকের ভিতরে যেখানে মানুষের চক্ষু কর্ণ যায় না, সেখানে যোগধ্যানে সময় কাটাইতেন।

* * অঘোর কি কেবল পাহাড়েই থাকিত? যখন কীর্ত্তন হইত, অঘোর সর্ব্বাগ্রে যাইত। পাশে দাঁড়াইয়া সে কর্ত্তাল বাজাইত, তখন কি অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ পাইত? অঘোর কাঁদিত, হরি হরি বলিয়া মুগ্ধ হইত। * * হরির প্রিয় তিনি সাধুভক্ত। যে "ধ্রুব প্রহ্লাদ" বই খানি তিনি লিখিয়াছেন, পৃথিবীতে নিজেই সেই ধ্রুব প্রহ্লাদ ছিলেন। ছেলে মানুষের মত তিনি, এই দুটি ছেলের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, সেই আদর্শে তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল।"

এখন অঘোর নাথের সেবার কাহিনী। সেবা শব্দটি উচ্চারণ করিলে পীড়িত লোকদের শুশ্রূষার কথাই আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া থাকে। কিন্তু অঘোরনাথ মনে করিতেন, রোগের জ্বালা, দারিদ্র্যের ক্লেশ ও শোকের যন্ত্রণার চেয়েও নরনারীর অধর্ম্মের ও পাপের যে দুর্ব্বিসহ যাতনা, তাহাই অত্যন্ত ভয়ানক; এবং ধনৈশ্বর্য্যের সুখের অপেক্ষা সুদুর্লভ ধর্ম্মলাভের যে আনন্দ, তাহাই অতিশয় গভীর। অতএব ঈশ্বরের সেবক হইয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হওয়া—যে সকল দুর্ব্বলচিত্ত নরনারী পাপের পথে চলিয়াছে, তাহাদিগকে পুণ্যের দিকে আকর্ষণ করা এবং যাহারা ঈশ্বরকে ভুলিয়া রহিয়াছে, তাহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিয়া তোলাই সুমহৎ সেবার কার্য্য। অঘোর নাথ এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার স্বার্থও সুখের

বাসনা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিলেন এবং ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সুদূর সিন্ধু প্রদেশ হইতে আসাম পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এই ধর্ম্ম-প্রচারের বিবরণ উপন্যাসের ঘটনার ন্যায় অতীব চিত্তাকর্ষক। সেই জন্য উক্ত বিষয়ে আমি অল্প গুটিকয়েক ঘটনার উল্লেখ করিব।

বোধ হয় ১৮৬৬ সাল হইতেই কেশবচন্দ্রের এবং তাঁহার মণ্ডলীর লোকদিগের ধর্ম্মপ্রচারের স্পৃহা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে মানব সমাজের ও মানব জীবনের এক মহৎ আদর্শ মায়ামূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল এবং হৃদয়ে হৃদয়ে আশ্চর্য্য কুহক বিস্তার করিয়াছিল। সেই জন্য তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেশ দেশান্তরে, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁহারা মানবসমাজকে এবং স্বীয় স্বীয় জীবনকে তাঁহাদের মহৎ আদর্শের অনুরূপই গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন। এই জন্যই স্বয়ং কেশবচন্দ্র ধর্ম্মোৎসাহে প্রমত্ত হইয়া বাঙ্গালাদেশে, পঞ্জাবে, বেহারে ও যুক্ত-প্রদেশে গমন করিয়া শিক্ষিত ভারতবাসী এবং অনেক ইংরাজের সম্মুখে বক্তৃতার অগ্নি বর্ষণ করিতেছিলেন। কে না জানে, তখন তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসী ও ইংরাজ কিরূপ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। এই কেশবচন্দ্রই ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও যোগী অঘোরনাথকে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য পূর্ব্ববঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। দুই বন্ধু পূর্ব্ববঙ্গের বিস্তর শিক্ষিত যুবককে যে কি আশ্চর্য্যভাবে ধর্ম্মেরদিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই আলোচনার যোগ্য।

আমরা অনেকেই জানি, গীতার সমন্বয় ভাষ্য, বেদান্ত সমন্বয়, কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক পণ্ডিত ৺ গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয় জ্ঞানে ও ধর্ম্মে এ দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তিনি তরুণ বয়সে রঙ্গপুরের পুলিসের ক্ষুদ্র একটি কার্য্য করিতেন। তাহার পরে অঘোরনাথ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যখন রঙ্গপুর সহরে উপস্থিত হইলেন, তখন সেই ধার্ম্মিকপুরুষের জীবনের ও উপদেশের প্রভাবে, কোথায় বা রহিল গৌরগোবিন্দের পুলিসের চাকুরি, কোথায়ই বা গেল তাঁহার অর্থোপার্জ্জনের স্পৃহা? তিনি সংসারের স্বার্থ পায়ে ঠেলিয়া, ফকির হইয়া, অঘোরনাথের সঙ্গেই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবশেষে জ্ঞানালোচনায়, সাধনায় ও ধর্ম্মপ্রচারেই তাঁহার সমস্ত জীবন কাটিয়া গেল এবং দারিদ্র্যই তাঁহার মস্তকের ভূষণ হইয়া দাঁড়াইল।

একবার অঘোরনাথ সুগায়ক ও সুলেখক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া শ্রীহট্ট এবং আসাম অঞ্চলে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের চিত্তাকর্ষক প্রচার বিবরণ সম্বন্ধে ত্রৈলোক্য নাথ তাঁহার স্বরচিত "সাধু অঘোরনাথ" গ্রন্থের একটি স্থানে লিখিয়াছেন—

"অঘোরনাথের ধর্ম্মজীবন ও বৈরাগ্যই যে আমাকে তাঁহার সঙ্গী করিয়া দেশে দেশে লইয়া গিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ব্যাগ হস্তে লইয়া ধর্ম্মপ্রচারে যাওয়া তাঁহার পক্ষে বৈরাগ্য-বিরুদ্ধ মনে হইত; এজন্য তিনি পিঠবোঁচ্‌কা পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া পথে চলিতেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রায় দশ ক্রোশ করিয়া পথ আমরা হাঁটিতাম। মধ্যাহ্ন রবিতাপে অঘোরনাথের মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ হইয়াছে, গাত্রে ঘর্ম্ম ছুটিতেছে অথচ তিনি দুস্তর অলঙ্ঘ্য গিরি, পর্ব্বত, নদ, নদী, কানন অতিক্রম করিয়া দ্রুতপদে অবিশ্রান্ত চলিতেছেন। উদরে

অন্ন নাই, চরণে ছিন্ন পাদুকা, পরিধেয় মলিন বসন হাঁটুর উপরে উঠিয়াছে, পৃষ্ঠদেশে বস্ত্রের গাঁঠোরি ঝুলিতেছে, সেই অবস্থায়ই পথে চলিতেছেন।* * কিসের জন্য এত আগ্রহ ও ব্যাকুলতা? এইজন্য যে, ভারতের সীমা হইতে সীমান্তরবাসী নরনারীদিগকে ব্রহ্মোপাসনার অমৃত বিলাইয়া তাহাদিগকে সুখী করিবেন, জগতে সত্যের জয় ঘোষণা করিবেন। * * একদিন মধ্যাহ্নকালে এক ক্ষুদ্র পান্থশালায় উপনীত হওয়া গেল। মুদির দোকানে চিঁড়া ভিজাইয়া আহারে বসিব, এমন সময় বিকটদর্শনা যমকিঙ্করীর ন্যায় এক গণিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং অভিমান ও ক্রোধভরে তাহার রক্ষকের সহিত বিবাদ করিতে লাগিল। যে স্থানে আমরা ভোজন করিতে বসিয়াছি, তাহার উপরিভাগে সেই হতভাগিনীর দুর্গন্ধময় মলিন কন্থারাশি এবং অপবিত্র শয্যাদি স্থাপিত ছিল। গণিকা ক্রোধভরে তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, আমাদের মস্তকের ও খাদ্যের উপরে ধূলা, মাটি, জঞ্জাল পতিত হইয়া আহারের সমূহ ব্যাঘাত করিল। * * একদিন মধ্যাহ্নকালে পথে কোথাও আর মুদির দোকান মিলিল না; ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর শ্রান্ত হইল; নিকটে একটি মসজিদ দেখিয়া আমরা তথায় প্রবেশ করিলাম। তৎসন্নিহিত এক মুসলমান গৃহে আমাদের জন্য কিঞ্চিৎ অন্ন-ব্যঞ্জনের সংস্থান হইল। পলাণ্ডুযুক্ত কিছু জলীয় পদার্থ আর অন্ন আমরা পাইলাম। আমার তাহাতে রুচি হইল না, কিন্তু অঘোরনাথ তাহাই অমৃততুল্য জ্ঞান করিয়া আহার করিলেন। জাতির প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া গৃহবাসিনী ভোজ্যপাত্র ধৌত করিবার জন্য আমাদিগকে বাধ্য করিলেন; অগত্যা তাহাও করিতে হইল। * * শ্রীহট্টে যেদিন পৌঁছান গেল, সেদিন রাত্রে একটি ভদ্রলোকের গৃহে আশ্রয় পাইলাম, কিন্তু পরের দিন তিনি স্থান দিতে সাহস করিলেন না; শেষে এক স্বতন্ত্র স্থানে সকল বন্দোবস্ত হইল, একজন কুলি আমাদের রন্ধন করিত। কিন্তু ধর্ম্মের কথা শুনিবার জন্য নাগরিকেরা অনেকে দলবদ্ধ হইয়া আসিতেন।"

অঘোরনাথ একবার ধর্ম্ম প্রচারের জন্য মতিহারি হইতে সারণ যাইবার সময়ে ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলেন; তখন তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তিই তাঁহাকে আশ্চর্য্য ভাবে রক্ষা করিয়াছিল। এই বিষয়ে অঘোরনাথ নিজেই তাঁহার এক বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আমরা সেই পত্রের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"প্রিয়বন্ধু, আজ আপনাকে প্রণাম ও আলিঙ্গন করি। আমি পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। * * যেখানে এই ব্যাপার হয়, সেই স্থানটি ছাপরা হইতে নয় ক্রোশ অন্তরে। তাহার নাম ইসবাপুর, বিখ্যাত চোরের গাঁ—পরে শুনিলাম। আমি সাম্পনি গাড়ীতে আসিতেছিলাম। ঠিক্ সন্ধ্যার সময় এখানে উপস্থিত হইলাম। আর কোন পথিক রহিল না, কেবল আমিই সেখানে থাকিলাম। দোকানদারেরা দোকান তুলিয়া গেল। একখানি তাড়ি ও মদের দোকান আছে, তাহাতেই জনকয়েক লোক থাকিল। * * রাত্রি দুইটা হইবে, চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নিশীথ সময় প্রকৃতির নিস্তব্ধতা; আমি সেই সময় উঠিয়া বসিলাম। মনটা ভাবের তরঙ্গের ভিতর ডুবিয়া গেল। বেশ সম্ভোগ করিতেছি। এমন সময় একটা ডাকাতে হাঁক উঠিল; সহসা আমার মন সে রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিল, সর্ব্বশরীর ডোল হইয়া উঠিল। বোধ হয় দশ বার জন লোক ডাকাতি রকমের হাঁক দিতে দিতে তাড়ির দোকানের নিকটে আসিল। সেই হাঁকে বাস্তবিক পেটের পীলে চমকে যায়। আমার মন সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া ভয়ে দুঃখে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। খানিক একান্ত নির্ভরের সহিত দয়াময়কে ডাকিতে লাগিলাম। কিছুপরে ডাকাতদের মধ্যে গোলমাল উঠিল। কেহ গালি দিতেছে, কেহ বা আস্ফালন করিতেছে ও বলিতেছে "শালা ছোটা হায়, হাম্ একলা এক লাঠিসে শির তোড় দেঙ্গে।" খানিক পরেই একজন বলিয়া উঠিল "বস্, আবি লোটো।" * * "তু দয়াল দীন হোঁ, তু দানী হোঁ ভিখারী" আর "ঠাকুর ঐ সো নাম তোমরা" এই দুই হিন্দি ভজন গাইতে গাইতে কখন যে অজ্ঞান হইয়াছিলাম, তাহাও আমি জানি না। শেষে আমার বাহিরে যে কোন্ অবস্থা হইয়াছে, তাহাও আর মনে ছিল না। প্রিয়সখার সহবাস ও দর্শন সুখের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলাম।"

অঘোরনাথ হিন্দি ভজন গাহিতে গাহিতে ঈশ্বরের মধ্যে আত্মহারা ও অচৈতন্য হইয়া

গেলেন ; তখন অমন যে দুর্ব্বৃত্ত পাষাণ প্রকৃতি ডাকাতের দল, তাহারাও অবাক্ হইয়া গেল এক জন ডাকাত বলিয়া উঠিল—"আরে উয়ো ভকত হ্যায়।" ডাকাতেরা ভগবানের এই ভক্তকে হত্যা ত করিলই না সকলে শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যে, ডাকাতেরা অঘোরনাথের একটি টাকা অথবা একটি সামগ্রী অপহরণ করিতে ইচ্ছা করিল না ; সকলেই গৃহে প্রস্থান করিল।

আমরা শুনিয়াছি অঘোরনাথের বক্তৃতা করিবার শক্তি খুব সামান্যই ছিল ; তিনি যে এক জন প্রতিভাশালী লোক ছিলেন, তাহাও নহে। কিন্তু সাধনের দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াই তিনি শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন ; তাই ধর্ম্ম প্রচারার্থ নানা স্থানে গমন করিয়া আশ্চর্য্য ভাবে নর নারীর চিত্ত আকৃষ্ট করিতেন ; তাঁহার উন্নত ধর্ম্মজীবন, তাঁহার অপূর্ব্ব সরলতা, তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য, তাঁহার আশ্চর্য্য আত্মত্যাগ, তাঁহার সুপবিত্র প্রেম দর্শন করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর লোকই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। তিন বৎসর পূর্ব্বেই আমি একদিন পূজনীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে, অঘোরনাথের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছিলাম। শাস্ত্রী মহাশয় শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

অঘোরনাথ ত আমার গুরু ; তাঁহার কাছে ধর্ম্মবিষয়ে এতই উপকার পাইয়াছি যে, আমি প্রতিদিনই আমার উপাসনার সময়ে তাঁহাকে স্মরণ করি।

অঘোরনাথের বাঙ্গলা সাহিত্যের উপরেও যথেষ্ট অনুরাগ ছিল ; তিনি সুলেখক ছিলেন ; কিছুদিন "সুলভসমাচার" নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদনের কার্য্যও তাহাকে করিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন অঘোরনাথ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া শাক্যসিংহের একখানি জীবনচরিত রচনা করিয়াছিলেন। এক সময়ে ঐ গ্রন্থখানির যথেষ্ট সমাদর ছিল। তাঁহার রচিত ধ্রুব প্রহ্লাদ বইখানিরও প্রশংসা করা যাইতে পারে।

অঘোরনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বে পঞ্জাব অঞ্চলে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত প্রদেশের নানা জায়গায় উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ডেরাস্মাইল খাঁ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ঐ স্থানটি সিন্ধু নদীর পরপারে ও ভারতবর্ষের সীমান্ত প্রদেশে। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন ঐ প্রদেশে যাইতে হইলে সাহাপুর হইতে উটের পিঠে চড়িয়া ১২০ মাইল অতিক্রম করিতে হইত। এই সুদীর্ঘ পথটি, যে কি দুর্গম, তাহা স্মরণ করিলেও অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে। এই পথে কেবলই ধূ-ধূ মরুভূমি ; যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই পর্ব্বতাকৃতি স্তূপীকৃত বালুকারাশি ; পিপাসায় বুকের ছাতি ফাটিয়া গেলেও কোথাও এক বিন্দু জল পাইবার যো নাই। রৌদ্রের এমনই উত্তাপ যে, দিনের বেলায় কাহারই পথে চলিবার যো নাই, রাত্রিকালেই চলিতে হয়। অঘোরনাথ এই পথেই উটের পিঠে চড়িয়া অতিশয় ক্লেশ সহ্য করিয়া ডেরাস্মাইল খাঁ গমন করিলেন। তাঁহার মনে বড়ই ভয় ছিল, ধর্ম্ম-প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে না জানি সেই অপরিচিত স্থানে কতই নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের নামের এমনই শক্তি যে, সেই অপরিচিত স্থানেই অঘোরনাথের ভক্তিরসাত্মক সুমধুর ধর্ম্ম কথা শুনিয়া বিস্তর পুরুষ ও নারী তাঁহার

প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একটি সংস্কৃতজ্ঞ বৃদ্ধ হিন্দুও তাঁহার বিদুষী ভগিনী অঘোরনাথকে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিতেছিলেন। এমন কি, উক্ত প্রদেশের মুসলমান পাঠানেরাও অঘোরনাথের বক্তৃতা শুনিতে কুণ্ঠিত হন নাই

কিন্তু হায়, ইহাই এই সাধুপুরুষের ধর্ম্ম-প্রচারের শেষ কথা; দুরন্ত কাল আর তাঁহাকে কোন কার্য্য করিবার সুযোগ প্রদান করে নাই। মরুভূমির দুর্গম পথের দারুণ ক্লেশ তাঁহার শরীর আর সহিতে পারিল না। তিনি ডেরাস্মাইল খাঁ হইতে ১২৮৮ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ লক্ষ্ণৌসহরে উপস্থিত হইয়াই রুগ্ন শয্যায় শয়ন করিলেন।

পূর্ব্বেই তাঁহার বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হইয়াছিল; পথের কষ্টে সেই রোগই অতিশয় ভয়ানক আকার লইল। ২৩শে অগ্রহায়ণ বুধবার অঘোরনাথ বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন; কিন্তু সেদিনও একটি ধর্ম্মার্থী লোকের নিকট ঋগ্বেদের সাতটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন; তাঁহার সঙ্গে যোগতত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল। ২৪ শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার অঘোরনাথের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল; সেদিন তিনি আর কথা বলিতে চাহিলেন না। তাঁহার প্রাণের দেবতার সঙ্গেই যোগযুক্ত হইয়া সুগভীর আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে, রাত্রি দুইটার সময় তখন চিকিৎসক বলিয়া উঠিলেন—

আর কি, সকলই শেষ হইয়া গেল!

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

চার্ব্বাক্ দর্শন।

মানব-সভ্যতার বিশেষ উন্নতির সময় দর্শন শাস্ত্রের অভ্যুদয় হয়। সত্যান্বেষী মন ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আপনাকে নিবদ্ধ রাখিয়াই তুষ্ট হয় না। অনন্তের প্রত্যেক বিভবের বৈচিত্র্যের সহিত স্বাধীন ভাবে বিবরণ করিয়া জগৎব্রহ্মাণ্ডের অসীমতা উপলব্ধির আনন্দ উপভোগ করে। দর্শন শাস্ত্রই মানবের মনুষ্যত্ব নিকষের মানদণ্ড। ভারতবর্ষ এবিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর সমগ্র মনুষ্যজাতি যখন বর্ব্বরতার উলঙ্গ প্রকটনে ব্যাপৃত তখনই ত ভারতবাসী চিন্তা ও জ্ঞানানুশীলনের সর্ব্বশেষ বিষয়, বিচারের উজ্জ্বল কিরণপাতে জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছিল। আজ ইউরোপ যাহা ভাবিতে পারিয়া আনন্দে ভূমণ্ডল কলরবে মুখরিত করিতেছেন এবং সত্যের সন্ধান পাইয়াছি বলিয়া আপনাকে ধন্য এবং বরেণ্য মনে করিতেছেন, বহুসহস্রাব্দী পূর্ব্বেই ভারতের সে জ্ঞান গবেষণার শেষ নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

অতি প্রাচীন কালে, ভারতীয় দার্শনিক সত্য গুলি (ideas of philosophical truths) অতি মিশ্রাকারেই মানব-মনে বিরাজ করিত। ক্রমশঃ, সেইগুলি ধারা নিবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে। এ কারণে, ভারতের কোন্ শ্রেণীর দর্শনের প্রথম অভ্যুদয় হয়, তাহা সঠিক ভাবে অবগত হইবার উপায় নাই। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, অন্ততঃ পক্ষে বৈদিক

যুগের শেষ ভাগে, ভারতের দার্শনিক চিন্তা স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। ঋক্ বেদের শেষ গাথায় (দশম, ১৪) অথর্ব্ববেদে এবং যজুর্ব্বেদের কোন কোন অংশে এই সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। তাহার পর, উপনিষদেই জ্ঞান কাণ্ড উজ্জ্বলরূপে স্বীয় নিরবচ্ছিন্নতা প্রকাশ করে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেও যে ভারতীয় দর্শনের নয়টি বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল তাহা প্রায় সকল দার্শনিকই একবাক্যে স্বীকার করেন। আমাদের আলোচ্য চার্ব্বাক দর্শনও এই সময় নিজ নামে পরিচিত ছিল।

চার্ব্বাক্ দর্শনের অন্য নাম, লোকায়ত। খুব সম্ভব, ভারতের কোন দর্শনই হঠাৎ একজন দার্শনিক কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই। ভ্রাম্যমান ভাবরাশিকে যে যে ব্যক্তি সংগৃহীত করিয়া সূত্রাকারে সঙ্কলিত করিয়াছেন, প্রায় সেই সকল ব্যক্তির নামেই দর্শন শাস্ত্রগুলি আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। চার্ব্বাক্ দর্শনের সূত্রগুলি মহর্ষি বৃহস্পতি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হয়। এই বৃহস্পতি যে কে এবং বৃহস্পতি-রচিত মূলসূত্র গুলিই বা কি,, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ঋগ্বেদ-ভাষ্য প্রণেতা সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা সূরী মাধবাচার্য্যই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৃহস্পতি-সূত্রের কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার "সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে লিপি-বদ্ধ করেন। চার্ব্বাক দর্শনের সাধারণ জ্ঞান এই পুস্তক হইতেই আমরা সংগ্রহ করিয়া থাকি। অধুনা Asiatic Societyর প্রযত্নে বৃহস্পতি-সূত্রের আরও কিছু কিছু অংশ সংগৃহীত হইতেছে। কাজেই আশা হয়, চার্ব্বাক দর্শনের জ্ঞান, কালে আরও বিশদ হইবার সম্ভাবনা চার্ব্বাকের মতগুলি প্রায় সকল দর্শনই যুক্তি-বলে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, চার্ব্বাক দর্শনও অন্যান্য দর্শনের ন্যায় অতীব প্রাচীন। চার্ব্বাক মত প্রত্যেক মানবেরই দৈনন্দিন জীবনের সহিত অজ্ঞাতসারে বিজড়িত থাকিলেও, ইহা পণ্ডিত সমাজে চিরকালই অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছে। সেই কারণেই, বৃহস্পতি-সূত্রের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। প্রতিপক্ষের হস্তে পতিত হইয়া চার্ব্বাক এতবৎ কাল শুধু বিদ্রূপ ও অবজ্ঞার উপহারই প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের নিকটই চার্ব্বাক "লোকায়ত" সংজ্ঞা (the way of the most common people) প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপেই বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি ঔলকা 'কণাদ' নৈয়ায়িক মহর্ষি গৌতম 'অক্ষপাদ' প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেন যে দেবগুরু বৃহস্পতির সহিত চার্ব্বাক দর্শনের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, তাহার ঠিক মীমাংসা কঠিন। তবে এ সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিংবদন্তীটি এই—সুন্দ ও নিসুন্দ অসুরদ্বয় অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও বলশালী হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাদিগকে পরাভূত করিবার জন্য দেবগণের মায়ায় তিলোত্তমার জন্ম হইল; এদিকে অসুরগণের বুদ্ধির বিকার ঘটাইবার জন্য, মহর্ষি বৃহস্পতি চার্ব্বাক্-সূত্র প্রণয়ণ করিলেন; অসুরগণ চার্ব্বাক প্রচারিত মিথ্যা ভোগের মোহে মুগ্ধ হইয়া, গৃহ বিবাদ করিয়া উৎসন্ন হইল এবং দেবগণের এইরূপ কৌশলে শত্রু নিপাত হইল। তাহা হইতেই প্রতিপাদিত হইল যে, চার্ব্বাক দর্শন অধ্যয়ন করিলে মানুষ বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া যায়; কেবল মাত্র মিথ্যা ভোগ সুখের অন্বেষণ করে। মনে হয়, জড়বাদের প্রতি ঘৃণা জন্মাইবার জন্যই চৈতন্য-বাদিগণ উল্লিখিত উপাখ্যানের কল্পনা করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে চার্ব্বাক দর্শনের বিশিষ্টতার বিষয়ে আলোচনা করিব।

বর্ত্তমান যুগে ইউরোপীয় agnostic এবং materialistic movementএর সহিত চার্ব্বাক দর্শনের বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। প্রাচীন গ্রীসের জড়-বাদী Leucippus, Democratis, Empedocles, রোমান কবি Lucratius এবং তাহাদের মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ চার্ব্বাকের ন্যায় যুক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে, জড়বাদী Lamathrea, Holbackvogt, Moleoschatt, Buckner, Fuerback এবং Strauss চার্ব্বাকের ন্যায় জড়-পদার্থ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি ঘোষণা করিয়াছেন। চার্ব্বাক যে জড়-বাদ প্রচার করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার এত অপযশ, তাহা নহে। বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করার অপরাধেই চার্ব্বাকের অনন্ত অব্দব্যাপী বিড়ম্বনা। সাংখ্য-দর্শন জড়-বাদী (materialistic and atheistic) এবং জৈমিনী-দর্শনও নিরীশ্বর-সেবী। তথাপি ঐ সকল দর্শন বেদের প্রমাণ স্বীকার করে বলিয়া, আস্তিক দর্শনের পর্য্যায়ে স্থানলাভ করিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক ধর্ম্মপ্রচার করিলেও, বেদাবমাননার জন্য ঘৃণিত নাস্তিক পর্য্যায়ে উপেক্ষিত হইতেছে।

দর্শনশাস্ত্রের ঐতিহাসিক ধারা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আবহমান যুগ ধরিয়াই চিন্তারাজ্যে একটি প্রবল দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে। এই দ্বন্দ্ব Empiricism এবং Rationalismএর দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ মানবের চিন্তা জড় বা চৈতন্য কাহাকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিবে। এই সমস্যার কুহক কিন্তু আজও মিটিয়া যায় নাই। প্রাচীন গ্রীকদর্শনে Heracletus প্রভৃতি বলিলেন, সকলই পরিবর্ত্তনশীল; আর অমনি Permenides প্রভৃতি বলিয়া উঠিলেন, ধ্রুব পদার্থ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি। দ্বৈত, অদ্বৈত, প্রভৃতি বহু বিপরীত মতামতই আজ পর্য্যন্ত মানব মনকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। চার্ব্বাক বলিলেন জড়ই সত্য পদার্থ, চৈতন্য জড়েরই বিকার মাত্র। যথা—

অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমিবার্য্যনিলানলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে॥
কিম্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্রেভ্যো মদশক্তিবৎ।
অহং স্থূলঃ কৃশোঽহ সমীতি সমানাধি করণ্যতঃ॥
দেহস্থৌল্যাদি যোগাচ্চ স এবাত্মা ন চাপরঃ।
মম দেহোঽয়ং ইত্যুক্তিঃ সম্ভবে দৌপচারিকী॥

—সর্ব্বদর্শন সংগ্রহঃ।

দার্শনিকতা হিসাবে চার্ব্বাকের মতগুলি বিশেষ সুদৃঢ় নহে। তাহার প্রায় সব সত্যটুকুই উপমান বা analogyর উপর প্রতিষ্ঠিত। উপমান, অনুমান শ্রেণীর প্রমাণের অন্তর্গত; কিন্তু চার্ব্বাক সেই অনুমান আদৌ গ্রহণ করেন না। চার্ব্বাকের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। অন্নখণ্ডের সহিত শর্করা সংযোগ করিলে যেমন মদের মাদকতা-শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ মস্তিষ্ক অর্থাৎ চতুর্ভূতের সহায়তায় চৈতন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। বর্ত্তমান জড়বাদিগণ বলেন, যকৃৎ যেমন পিত্ত উৎপাদন করে, মস্তিষ্কও তেমনি চিন্তারাশির উৎপত্তি করিয়া থাকে। (The brain secrets consciousness as the liver secrets the

bile.) তাঁহারা কেন যে ভাবিয়া দেখেন না যে, মদ-শক্তি ও চৈতন্য একপ্রকার পদার্থ নহে। মদ-শক্তি শক্তি হইলেও তাহা জড়-শক্তি; তাহার সহিত চৈতন্যের কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য নাই। সে কারণ, তাঁহাদের উপমান (analogy) দৃশ্যতঃ লোভনীয় হইলেও, কার্য্যতঃ তাহা বিচার-সহ নহে। চৈতন্য যদি ভূত বা ভৌতিকের ধর্ম্ম হইত, তবে ভূত বা ভৌতিকের ধর্ম্ম তাহার বিষয় হইত না,—যেমন রূপ কখনও নিজের বা পরের রূপ দেখে না। দর্শন-সারথি শঙ্কর আরও বলিয়াছেন যে, যদি আত্মা এবং দেহের একই গুণ হইবে, তবে মৃত-দেহে আত্মার গুণ থাকে না কেন? অবয়ব প্রভৃতি গুণ যতক্ষণ দেহে থাকে, ততক্ষণই থাকে; কিন্তু মৃত্যুর পর ত জীবনী শক্তি থাকে না। রূপ প্রভৃতি অন্যে অনুভব করিতে পারে, কিন্তু অনুভূতি, স্মৃতি প্রভৃতির আত্মার গুণ, আত্মা স্বয়ং ভিন্ন, অন্যে অনুভব করিতে পারে না। পঞ্চভূত জ্ঞানের বিষয় বটে কিন্তু জ্ঞান পঞ্চভূতের গুণ নহে। পঞ্চভূত পঞ্চভূত জানিতে পারে না। যেমন নর্ত্তকী নিজের স্কন্ধের উপর নৃত্য করিতে পারে না, কিম্বা অগ্নি আপনাকে পুড়াইতে পারে না। সর্ব্বাবস্থায় আত্মার নিত্যতাই ইহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে।

তবে চার্ব্বাকের যুক্তি-শাস্ত্র অর্থাৎ Epistunology অথবা Logic বড়ই চমৎকার। ভারতীয় সমুদায় দর্শনই কতকগুলি সাধারণ মত পোষণ করিয়া থাকে। যথা—আত্মা, পুনর্জন্ম বা সংসারের অসারতা, তজ্জন্য মোক্ষ, আত্মার অবিনশ্বরতা, কর্ম্মফল, ত্রৈ-গুণ্য, এবং অনুমানাদি প্রমাণ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিন সহস্র বৎসর দ্বন্দ্ব বিতণ্ডা করিয়াও চার্ব্বাক ইহার কোন দিকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। চার্ব্বাক চিরকালই স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছেন। ভারতের সাধারণ গ্রাহ্য চারিটি প্রমাণের মধ্যে কেহ কেহ উপমাণকে অনুমানের প্রতি-প্রসব জ্ঞান করিয়া, তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন; যথা—প্রত্যক্ষ (perception) অনুমাণ (inference) এবং শব্দ (authority)। কিন্তু চার্ব্বাক প্রত্যক্ষ ভিন্ন কোন প্রমানই স্বীকার করেন না। চার্ব্বাক প্রত্যক্ষের পোষকতার যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া অনুমাণাদি প্রমাণ লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া চার্ব্বাক দর্শনকে শুধু মূর্খতার আধার বলা যায় না। মূর্খের হৃদয়ে যুক্তি নিপুণতা এত গভীর ভাবে প্রকাশি পাইতে পারে না। বর্ত্তমান ইউরোপীয় Empiricist দর্শনের মত, চার্ব্বাক deductive Logic অস্বীকার করেন।

Deductive Logic বিশ্বজনীন সম্বন্ধ বা universal pervatian এর আশ্রয় লইয়া বিচার করিয়া থাকে। ইহাকে ব্যাপ্তি বা universal proposition নামে অভিহিত করা হয়। Major term কে ব্যাপক বা সাধ্য বলা হয় এবং middle term কে ব্যাপ্য, লিঙ্গ, সাধন হেতু প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়; Minor term বা পক্ষই (the subject of inference) আমাদের সিদ্ধান্তের বিষয়। ব্যাপ্তিতে ব্যাপকের সহিত ব্যাপ্যের যে বিশেষ সম্বন্ধ অর্থাৎ middle term এর সহিত (major term) এর যে বিশেষ সম্বন্ধ থাকে—তাহাকে ব্যাপ্তির উপাধি বলে। যদি ব্যাপক (major term) ব্যাপ্য (middle term) কে নিরন্তর ভাবে ব্যাপিয়া রাখিতে পারে (Distributed middle) তবেই আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। যথা—

পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।

এই Enthemym কে Sillogism এ পরিণত করিবে।

(যেখানে ধূম আছে সেখানে অগ্নি আছে
পর্ব্বতে ধূম আছে
সুতরাং পর্ব্বতে অগ্নি আছে।

এখানে ধূমের সহিত অগ্নির নিরন্তর সম্বন্ধ (universal pervations) আছে। অর্থাৎ অগ্নি আছে বলিয়াই ধূম আছে। বাপ্তিটী নির্ভুল। সে জন্য আমাদের সমুদায় সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইল। এখানে major term অগ্নি middle term ধূমকে নিরন্তর রূপে ব্যাপিয়া আছে। এবং সেই middle term ধূম minor term পর্ব্বতের সহিত বর্ত্তমান। সুতরাং পর্ব্বতে অগ্নি আছে। ধূম অগ্নির বিকার ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

আর যদি বলি "পর্ব্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ" তাহা হইলে এই দাঁড়াইল যে যেখানে অগ্নি আছে সেখানেই ধূম আছে। একথার দোষ এই যে ধূম ত অগ্নিকে ব্যাপিয়া রাখিতে পারে না। অগ্নি থাকিলেও ধূম না থাকিতে পারে। যথা লোহিতো গুপ্ত অয় গোলক অগ্নিময় হইলেও তাহাতে ধূম নাই। আমাদের ভ্রমময় ব্যাপ্তি আমাদিগকে বিপথে চালাইতেছে। কেন এরূপ হয়?

কারণ আমরা ভুলিয়া যাই যে, ধূম সর্ব্বতোভাবে অগ্নির স্বরূপ নহে। তৃতীয় একটি আর্দ্র পদার্থই ধূমের উৎপত্তি করিতেছে। এই আর্দ্রতারূপ উপাধিই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে। এই উপাধির জ্ঞানই আমাদিগকে বিপথ হইতে রক্ষা করিবে। পূর্ব্ব দৃষ্টান্তে এই উপাধি বর্ত্তমান ছিল এ দৃষ্টান্তে তাহা বর্ত্তমান নাই। কাজেই এ বিভ্রম। এখন বুঝা গেল যে উপাধি (condition) সর্ব্বদাই ব্যাপক এর (major term) সহিত বিচরণ করে কিন্তু ব্যাপ্য বা middle termএর সহিত না থাকিলেও না থাকিতে পারে। আর ব্যাপক (major term) উপাধি সঙ্গে না লইয়া কদাচিৎ পথে বাহির হয়। ইহাই অনুমান বা Inferential knowledge.

আমরা এখন বুঝিবার চেষ্টা করিব যে চার্ব্বাক কেন অনুমানকে অস্বীকার করিতেছে। যদি ব্যাপ্তি সম্পূর্ণ উপাধি বর্জ্জিত হইত তবে আমাদের যাবতীয় সিদ্ধান্ত সফল হইত। কিন্তু এই উপাধি না থাকিলে ব্যাপক এবং ব্যাপ্যের—স্থির সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করা যায় না। চার্ব্বাক বলে "তস্মা দ বিণা ভাবস্য দুর্বোধতয়া নানু মানস্যাবকাশঃ।" অর্থাৎ অতীত এবং অনাগত কে যখন কেহ জানে না তখন ব্যাপ্তি জ্ঞান বা অবিনা ভাবের জ্ঞান (knowledge of universal pervation) সম্ভবপর নয়।

অনুমান সিদ্ধজ্ঞান এই ব্যাপ্তি জ্ঞান হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ব্যাপ্তি জ্ঞান ত দর্শন স্পর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে এ বিশ্বজনীন ব্যাপ্তির জ্ঞান কিরূপে লাভ হইল? অবশ্যই ইহা প্রত্যক্ষ দ্বারা লাভ হয় না। কারণ যদি বহিঃপ্রত্যক্ষ দ্বারা এ জ্ঞান লাভ হইবে তবে পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগাযোগ জ্ঞাপন করিবে। তাহা হইলে এ জ্ঞান অতীতে বা ভবিষ্যতে পৌঁছিতে পারিল না। শুধু বর্ত্তমান লইয়া সীমাবদ্ধ থাকিল। অতএব বহিঃপ্রত্যক্ষ আমাদিগকে ব্যাপ্তি জ্ঞান দিতে পারে না।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান কোন জাতি বিষয়ক জ্ঞানও দিতে পারে না। আর যদিও দিতে পারে তবে সে জাতি জ্ঞান হইতে আমরা ত ব্যক্তির জ্ঞানে পৌছিতে পারি না। ব্যক্তিতে আমরা বহু বিশিষ্টতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকি। কিন্তু জাতি কি সেই সকল বিশিষ্টতার কথা বলিয়া দিতে পারে? মনুষ্য এই জাতিবাচক পদার্থে যাহা বুঝিয়া থাকি তাহাতে ত অর্ব্বাচীনের অজ্ঞানতা খুঁজিয়া পাই না। তবে মনুষ্য জাতি দেখিয়া কি উপায়ে অর্ব্বাচীনে পৌছিব? অন্তঃ প্রত্যক্ষ দ্বারাও এ জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। কারণ মন বহিরিন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কৈ মন ত পদার্থের চতুর্থ অবয়ব (fourth dimension) বা অষ্টম বর্ণের (eighth colour) কল্পনা করিতে পারে না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে এই ব্যাপ্তি জ্ঞান উপলব্ধি করিতে হইলে আর একটী ব্যাপ্তি পূর্ব্বেই ধরিয়া লইতে হইবে। এরূপে অনন্ত ব্যাপ্তি আসিয়া যে অনবস্থ দোষের সৃষ্টি করিবে! (Petitio principii).

তবে কি বলিব এই ব্যাপ্তি জ্ঞান, শব্দ বা বেদ সিদ্ধ? আমরা ত কেহই জানি না, কোন্ বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কথা বলিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদের কথা মানিতে হইলেও অনুমান দ্বারা তাহার সম্ভাব্য বিচার করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই দেখাইলাম, অনুমান কেমন ভ্রম-সঙ্কুল। প্রায় সমুদায় প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তার বিষয়েই কত মতবাদ ও বিতণ্ডা চলে। তাহা ব্যতীত শব্দ ত কোন অনন্ত পদার্থ নহে। পদার্থের বিনিময়ে নাম-বাচক শব্দ প্রয়োগ মাত্র। কাজেই শব্দ, প্রকৃত ব্যাপ্তি-জ্ঞান আনিয়া দিতে পারিল না। অনেক সময় শব্দ কত অযুক্তি এবং ভ্রম সঙ্কুলতায় পূর্ণ থাকে। সে সকল শব্দকে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। আর যদি শব্দই ব্যাপ্তি জ্ঞানের কারণ হইবে, তবে ত কাহার নিকট না শুনিলে 'অগ্নিতে হাত পুড়ে এবং আমার হাত পুড়িয়াছে' এই জ্ঞান আদৌ জন্মিতে পারে না।

উপমান দ্বারাও ব্যাপ্তি সাধিত হয় না। কেন না উপমানও একটি নাম মাত্র। সেই নামধারী বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া উপমানসিদ্ধ জ্ঞান লাভ হয়। পরন্তু, তুলনা অনুমানের অবস্থান্তর মাত্র। কিন্তু আমরা চাই উপাধিহীন ব্যাপ্তি (universal relation)। ব্যাপ্তি না পাইলে যে আমাদের অনুমান-সিদ্ধ-জ্ঞান আদৌ লাভ হইবে না। সুতরাং আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে ব্যাপ্তির কোন অস্তিত্ব নাই। তাহা হইলে এই দাঁড়াইল যে, আমরা অনুমানের পথে অগ্রসর হইতে অক্ষম। মানব মন সমুদায় উপাধি তন্ন তন্ন করিয়া না জানিয়া, কোন সাহসে উপাধি আছে কিম্বা নাই এই কথা বলিবে; মানবের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেবলমাত্র অনুমান দ্বারা একটি সম্ভাব্য বা অসম্ভাব্য স্থির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তবে ত আবার সেই অনবস্থ দোষ বা যুক্তির নাগরদোলা (*petitio principii*) আসিয়া উপস্থিত হইবে।

এখন কি উপায়ে এ সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে? 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' হইলেও স্থল বিশেষে এরূপ অনুমান মিথ্যা হইতে পারে। যেমন শীতকালে নদীতে ধূম্রাকার কুয়াসা দেখিয়া অগ্নি আশঙ্কা করা। তাই চার্ব্বাক বলেন যে, প্রকৃত সত্য প্রত্যক্ষ দ্বারাই নিরূপিত হইতে পারে। "না প্রত্যক্ষং প্রমাণম্"।

এ কথার উত্তরে সাংখ্যকারিকার বলেন—

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয় ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥"

অর্থাৎ দূরত্ব, সামীপ্য, ইন্দ্রিয়াদির বিকৃতি, মনের অনবধানতা, সূক্ষ্মতা, ব্যবধানতা, অভিভব ও সমশ্রেণীত্ব হেতু আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মিতে পারে না। চার্ব্বাক একবার বিশেষ কোন উত্তর না দিয়া, পূর্ব্ব কথারই সূত্র ধরিয়া বলেন যে, অতীতের এবম্বিধ ঘটনা আমাদের স্মৃতিপটে থাকে বলিয়াই পরবর্ত্তী সময়ের এতাদৃশ ঘটনার সত্য বিষয়ে আমরা সন্দিহান হই। আমরা আশার পথে চাহিয়া থাকি, যদি বা আমাদের বর্ত্তমানের দ্রষ্টব্য সঠিক্ হয়। এখানে কোন ব্যাপ্তি-জ্ঞানের যোগাযোগ সম্বন্ধ নাই। অগ্নির দাহিকা শক্তি আজ আছে, কিন্তু কল্য যে থাকিবে বা লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে ছিল, তাহা কে বলিবে? কাজেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কোন বিষয়েরই সত্যাসত্য ঘোষণা করা যায় না।

এই ত চার্ব্বাকের কথা। Bacon, John Stuart Mill প্রভৃতিও এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহারাও বলিয়াছিল যে per simple Enumeration অর্থাৎ একটির পর একটি করিয়া পদার্থকে দেখিয়া, তাহাদের এক রূপ্যতার স্মৃতিই আমাদিগকে জ্ঞান-রাজ্যে আনয়নএর। যথা—

A is X; A_1 is X; A_2 is X

∴ all A's are x

এইরূপেই আমরা জানিতে পারি যে, মানুষ মরণশীল, বায়স কৃষ্ণবর্ণ, হংস শ্বেতবর্ণ। যদি আমাদের প্রত্যক্ষের জীবনে ইহার ব্যাভিচার দেখি, তবে অবশ্যই আমাদের জ্ঞান চূর্ণ হইয়া যাইবে। আমরা নূতন জ্ঞান স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। আমাদের জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি সাপেক্ষ, (empirical)।

এখানে আমরা চার্ব্বাকের সহিত empiricistগণের একটু পার্থক্য দেখিতে পাই। John Stuart Mill প্রভৃতি অন্ততঃ এক প্রকারের অনুমান স্বীকার করিয়াছেন—inference by induction। তাঁহারা তাঁহাদের inductionএ 'A'এর সহিত 'X'এর অবিনা সম্বন্ধ (necessary connection) আছে কিনা, তাহা তাঁহাদের যুক্তি-প্রক্রিয়া অর্থাৎ methods দ্বারা যাচাই করিয়া লইয়া তবে অনুমান সিদ্ধ করেন। কিন্তু চার্ব্বাক তাহাতে সম্মত নহেন। চার্ব্বাকের নিকট প্রত্যক্ষই একমাত্র জ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়ই জ্ঞানাধিগমনের একমাত্র উপায়। আমরা আজ রামকে, কাল শ্যামকে, পরশ্ব হরিকে মরিতে দেখিয়া মৃত্যুই মানুষের পরিণতি বলিয়া ধরিয়া লইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারি। মানুষের দুর্ব্বল মন psychologically এরূপ ভাবিতে পারে। কিন্তু logic কোন সাহসে এই মৃত্যুকে সাধারণ বলিয়া ঘোষণা করিবে? আমরা যাহা psychologically করি, তাহাকে কি logical কর্ত্তব্যের আসনে তুলিতে পারি? চার্ব্বাক major premios হইতে ব্যাপ্তি বা অবিনা সম্বন্ধকে (universal pervation) নির্ব্বাসিত করিয়া, অনুমানকে অনবস্থ-দোষ-দুষ্ট

(petitio principii) বলিয়া যতই কটূক্তি করুক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সকলকেই অনুমান মানিয়া লইতে হয়। বাচস্পতি মিশ্র সত্যই বলিয়াছেন যে, যদি চার্ব্বাক অনুমানকে পরিত্যাগ করিবেন, তবে মদ্যের মদশক্তিবৎ কি প্রকারে ভূতচতুষ্টয়ের সমবায়ে চৈতন্য কল্পনা করেন? অনুমান না থাকিলে যে মানুষ পশু-পদবীতে পড়িয়া যাইবে। অনুমানেই মানবের rationalityর প্রতিষ্ঠান। চার্ব্বাককে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতে হয়।

চার্ব্বাকের এবম্বিধ যুক্তি প্রণালী, ইহাঁকে ধর্ম্ম বিষয়েও অন্ধ করিয়াছে। চার্ব্বাক্ আত্মা মানেন না; কাজেই তাঁহার পুনর্জন্ম বা মুক্তির কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এ কারণে জীবন-ব্যাপী ভোগ সুখই তাঁহাদের চিন্তার বিষয়। প্রত্যক্ষ দ্বারা ঈশ্বরকে জ্ঞাত হওয়া যায় না। তাই চার্ব্বাক ঈশ্বরের মহিমায় বঞ্চিত। চার্ব্বাকের মতে "লোক সিদ্ধঃ রাজা পরমেশ্বরঃ।" চার্ব্বাক মতে মানবের শারীরিক বন্ধন ভিন্ন আত্মার কোন বন্ধন নাই। সে কারণ মানুষ কেবল রাজার নিকট মস্তক নত করে এবং মোক্ষের বাসনা জন্মিলে, আত্মম্ভরী রাজার দাসত্ব পাশ ছেদন করিতে চেষ্টা করে। ঠিক এই ভাবেই Augustus Comte বলিয়াছিলেন যে, Henceforth mans knee shall never bend except before a woman। চার্ব্বাক মতে শরীর ত্যাগেই মানবে মোক্ষ; তাই তাঁহারা বলেন—"দেহচ্ছেদঃ মোক্ষঃ"।

ভারতের সর্ব্ব দর্শনই পাঞ্চজন্য ঘোষে সংসারের দুঃখের গীতি গাইয়া আসিতেছিল। ভোগকে শুধু মরীচিকা, শুধু প্রবঞ্চনা বলিয়া আসিতেছিল। এই নিদারুণ নৈরাশ্য (pessimism) কৌপীনবন্তকে খলু ভাগ্য বন্ত বলিয়া মানুষের বাস্তব জীবনকে কর্ম্মহীন, উৎসাহহীন আলস্য পরতন্ত্র এবং উদাসীন করিয়া তুলিতেছিল। "নির্দগ্ধশালী বীজের মত জীবনটাকে পুড়াইয়া থাক্ করিতে পারিলেই যেন সর্ব্বার্থ সাধন হইল।" চার্ব্বাক এই নৈরাশ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আশার বর্ত্তিকা লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। ভয়ে, দুঃখ শোক চরণে দলিয়া, মানুষের কর্ম্ম শক্তি জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানুষকে একটা অনুপ্রাণনার সঞ্জীবন ধারা দিবার জন্যই, নৈরাশ্যকে দূরে রাখিয়া দুঃখ ও শোকের পাশাপাশি ভোগ ও সুখকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তণ্ডুলে তুষ সংযুক্ত থাকে বলিয়া তণ্ডুল পরিহার্য্য নহে। জগতের দুঃখ রাশিকে যত উপেক্ষা করিতে পারিবে, ততই ভোগের দ্বারা লভ্যের অঙ্ক পূরণ করিতে পারিবে। ইহা "দুঃখ ত্রয়া ভিখাতাৎ জিজ্ঞাসা" নহে; কিন্তু মানুষের মত আশাময় জীবনযাত্রা বটে। আসে দুঃখ আসুক। অনাগত ভয়ে ত্রস্ত হইয়া "গৃহীতৈব কেশেষু মৃত্যুণা ধর্ম্মমাচরেৎ" করিয়া কি হইবে? Epicurus বলিয়াছিলেন—"Gods are either non-exfistent or absolutely indifferent about the affairs of man"। অতএব কর্ম্মই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

ভারতের Hedonistic দার্শনিক "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" চার্ব্বাক-মত প্রচার করিলেও তাহার একটু দুর্ব্বলতা ছিল। ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া মানুষ অনেক মোহজালে জড়িত হইয়া পরে। সেই কারণে কুলীশ কঠিণ Kant কেও বিধাতার আসন পাতিয়া দিতে হইয়াছিল। চার্ব্বাক বলিলেন—"কণ্টকজন্যাদি দুঃখম্ নরকম্" এবং "অঙ্গনা লিঙ্গনাদি জন্যং সুখং পুরুষার্থঃ"।

চার্ব্বাক আরও বলিলেন যে, যাহারা সুখ পরিহার করিয়া দুঃখকে বরণ করিয়া লয়, তাহারা অবশ্যই মূর্খ।

ত্যজ্যং সুখং বিষয় সঙ্গম জন্ম পুংসাম।
দুঃখো পসৃষ্টমিতি মূর্খ বিচারণৈষা॥

জানিয়া শুনিয়া যাহারা জ্যোতিষ্টমাদি যজ্ঞ করিয়া অশেষবিধ কষ্ট স্বীকার করে এবং অর্থের বৃথা ব্যয় করে তাহারা প্রবঞ্চিত।

অগ্নিহোত্রস্ত্রয়োবেদা স্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠণম্।
বুদ্ধি পৌরুষ হীনানাম্ জীবিকা ইতি বৃহস্পতিঃ॥

চার্ব্বাকের শেষ উপদেশ—

যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনম্ কুতঃ॥

গ্রীকদেশে Sophist গণের কার্য্যাবলী ইউরোপের জার্ম্মান দেশে Illuminationist এবং ফরাসী দেশে Positivist গণের জাগারণ কতকটা এই প্রকার হইয়াছিল; মানুষের কর্ম্ম শিথিল অসারতা অনেকটা অপনোদনের জন্য; কিন্তু, যেখানে ভগবানের আসন নাই, সেখানে স্থানে স্থায়িত্ব নাই। তাই ভারতের মানুষ কিন্তু আজও বলিতেছে—

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়ণায়।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চৌধুরী।

অনধীনতা না স্বাধীনতা ?

আমরা যে স্বরাজ চাহিতেছি, তাহা কি কেবল মাত্র একটা অনধীনতার অবস্থা, না স্বাধীনতার অবস্থা? আমাদের ভাষায় এই "অনধীনতা" শব্দটি নাই। ইংরাজিতে যাহাকে ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স (independence) কহে, এখানে তাহাকেই বাঙ্গালাতে "অনধীনতা" কহিতেছি। ইংরাজি ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স (independence) শব্দটি অভাবাত্মক। ডিপেণ্ডেন্সের অথবা অধীনতার অভাবকেই ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স কহে। প্রকৃত পক্ষে, ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স শব্দে একটা নিরাকার শূন্য অবস্থা বুঝায়। আমাদের দেশের বহুতর স্বরাজ-পন্থীরা এই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, বলিয়া আশঙ্কা হয়।

বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধে আমরা ইংরাজের অধীন হইয়া আছি। সুতরাং এ অবস্থাটা একটা অধীনতার অবস্থা। ইংরেজের অধীনতা মুক্ত হইলেই, আমরা ইন্‌ডিপেণ্ডেণ্ট্ (independent) হইব। এই অবস্থাকে যদি স্বরাজ বলেন, তাহা হইলে ইংরাজ-রাজের উচ্ছেদেই স্বরাজ হইয়া যায়। যে মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান ইংরাজ শাসনের অবসান হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের স্বরাজ লাভ হইবে।

ইহাই কি স্বরাজ? এভাবে প্রশ্নটা তুলিলে, অনেকেই কহিবেন—"তা ঠিক নয় বটে; কিন্তু ইংরাজ-রাজকে না সরাইয়া ত আমাদের স্বরাজলাভ হইবে না; অতএব ইংরাজ-রাজের উচ্ছেদ স্বরাজ লাভের অবশ্যম্ভাবী পূর্ব্ববৃত্ত কর্ম্ম।" কেহ কেহ হয়ত এমনও কহিবেন যে "এই স্বরাজ ত আমাদের আছেই; জীবের মুক্তি যেমন নিত্যসিদ্ধ, আমাদের স্বরাজও সেইরূপ। বেদান্ত কহেন, কোনও ক্রিয়ার দ্বারা মুক্তিলাভ করা যায় না। মুক্তি "জন্যবস্তু"—অর্থাৎ কার্য্য বিশেষের ফল-নহে। জীব মায়াবশে আপনাকে বদ্ধ বলিয়া ভাবিতেছে। এই মায়া বা অবিদ্যা বা অজ্ঞান, জীবের আত্মজ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে বলিয়া, নিত্যমুক্ত-স্বভাববান যে জীব, সেও আপনাকে বদ্ধ বলিয়া অনুভব করিতেছে। এই আবরণ মোচন করিলেই, এই অজ্ঞানতা দূর হইলেই, জীবের নিত্যসিদ্ধ মুক্ত অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। সেইরূপ, আমাদের স্বরাজও নিত্যসিদ্ধ। আমরা প্রকৃত পক্ষে ত স্বাধীনই আছি; কেবল মোহবশতঃ ভাবি, ইংরাজ আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যেদিন এই মোহ কাটিবে, সেই মুহূর্ত্তেই ইংরাজের শাসন "অরুণ 'উদয়ে আঁধার যেমন' তেমনি, আপনা হইতে নষ্ট হইবে; আর সেই মুহূর্ত্তে আমরা স্বরাজ পাইব।"

যাঁরা এরূপ ভাবেন, স্বরাজ বলিতে তাঁরা একটা ভিতরকার অবস্থাই বুঝেন, বাহিরের কোনও বিশেষ আকারের বা প্রকৃতির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা অবস্থা বুঝেন না। চিত্তবাবু বরিশালে যে স্বরাজের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, আর গান্ধি মহারাজও মাঝে মাঝে যে সকল কথা কহেন, তাহা হইতে স্বরাজের এই মর্ম্মই পাওয়া যায়।

স্বরাজ যদি এই আন্তরিক ভাব বা অবস্থাই হয়, তাহা হইলে বাহিরের কোনও প্রকারের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ইহার কোনও সম্পর্কই থাকে না। ইংরাজ রাজ্য-শাসন করুক, তাহাতে ত আমার চিত্তের এই সহজ-সিদ্ধ স্বাধীনতার সঙ্কোচ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বাহিরের বিষয় ও সম্বন্ধ সকলকে যদি আমি আমার মন হইতে সরাইয়া রাখিতে পারি, হংস যেমন জলে চরিয়াও জলে ভিজে না, সেইরূপ আমিও ইংরাজের আইনকানুনের মধ্যে বাস করিয়াও তাহা হইতে যদি একান্ত নির্লিপ্ত থাকিতে পারি, সে অবস্থায়, ইংরাজ-শাসনের অস্তিত্বে আমার স্বরাজত্বের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না।

এই যে ভিতরকার স্বরাজ, এই স্বরাজ-লাভ করিবার প্রকৃষ্ট পথ ত নন্-কো-পারেষণ বটেই। নন্-কো-পারেষণ বা অসহযোগ অর্থ আমরা ইংরাজের শাসন-যন্ত্রের সঙ্গে কোনও প্রকারের সাহচর্য্য করিব না। এই সাহচর্য্য করিলেই তাহার ফলাফলে জড়াইয়া পড়িব। ইংরাজের সাহচর্য্য করিয়া আমাদের যতটুকু লাভ হইবে, তাহার লোভে আমরা এই শাসনের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িব। এই লাভের হানি হইবার আশঙ্কায় আমরা সতত কাতর হইয়া রহিব। অর্থাৎ ইংরাজ শাসনের অধীন হইয়া থাকিব। এই ভাবেই জীব বহির্বিষয়ের সঙ্গে জড়াইয়া আত্মহারা হয়। এই পথেই জীবের দেহাত্মধ্যাস জন্মে, দেহকে আত্মা বলিয়া ধারণা হয়। এই দেহাত্মধ্যাসের নামই মায়া। এই মায়াই জীবের বন্ধ-হেতু। এইখানেও সেই কথা। ইংরাজের শাসন-শক্তি আমাদের অন্তরে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহারই ফলে ইংরাজ আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আর ইংরাজ-শাসনের সুখদুঃখের ভাগী হইতেছি বলিয়াই ত ইংরাজ-শাসন আমাদের চিত্তকে দখল করিয়া আছে। এই শাসন-যন্ত্রের সঙ্গে আমরা সাহচর্য্য করিতেছি বলিয়াই,

তাহার ফলাফল আমাদিগকে আশ্রয় করিতে পারিতেছে। সুতরাং এই সাহচর্য্য নষ্ট হইলে, ইংরাজ শাসনের ফলাফলের সঙ্গে আর আমরা জড়াইয়া পড়িব না। তখন আমাদের যে নিত্যসিদ্ধ স্বরাজ বস্তু, তাহা স্বতঃই লাভ হইবে। আর এই স্বরাজ-লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মার বা চিত্তের উপরে ইংরাজ রাজের বর্ত্তমান প্রভাব আর থাকিবেনা। আমরা তখন স্বাধীন হইব।

এই স্বরাজ বস্তু বৈদান্তিক মুক্তির মতন একান্ত অন্তরঙ্গ বস্তু। ইংরাজ শাসনের ভয় ও লোভ এই দুটি হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে পারিলেই এই স্বরাজ-লাভ হইবে। এই জন্যই চিত্ত বাবু কহিয়াছেন, স্বরাজ কোনও শাসন-ব্যবস্থা বা system of administration নহে।

কিন্তু দেশের লোকে সত্যই কি স্বরাজ বলিতে এই অন্তরঙ্গ বস্তু বুঝে? অন্ততঃ গান্ধি মহাত্মার আবির্ভাব ও চিত্ত বাবুর নবজীবন লাভের পূর্ব্বে, আমরা কেহই স্বরাজ বলিতে এই বৈদান্তিক মুক্তি বুঝি নাই। আর বৈদান্তিক মুক্তির তাৎপর্য্য যাহারা বুঝেন, তাঁরা ইহাও বলিবেন যে, এই স্বরাজ লাভের জন্য বর্ত্তমান "শয়তানী" ব্রিটিশ রাজের উচ্ছেদ সাধন অত্যাবশ্যক নহে। এই স্বরাজ যাঁর লাভ হইয়াছে, তিনি বামদেব ঋষির মতন—আমিই ইংরাজ হইয়াছি ভাবিয়া, এই ইংরাজ শাসনকেই আত্মশাসন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। কারণ ভূমাকে যে প্রাপ্ত হয়, তার যে সবাই আপন। তার নিকটে আবার আত্মপর, স্বদেশী-বিদেশী, ভেদ-প্রতিষ্ঠিত কোনও সম্বন্ধ ত থাকে না।

দেশের লোকে স্বরাজ বলিয়া যে বস্তুর পশ্চাতে ছুটিয়াছে, তাহা এই একান্ত অন্তরঙ্গ বস্তু নহে। তারা আর কিছু বুঝুক আর নাই বুঝুক, এটা অন্ততঃ খুব দৃঢ় করিয়াই বুঝিয়াছে যে, ইংরাজের শাসন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তাদের স্বরাজ আসিবে না। ফলতঃ, আপাততঃ ইহাই মনে হয় যে, ইংরাজ-শাসনের উচ্ছেদকেই ইহারা স্বরাজ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে।

২

এই সেদিন "অমৃতবাজার পত্রিকা" গণতন্ত্র স্বরাজের কথার আলোচনা করিতে যাইয়া কহিয়াছেন, ও সকল কথা এখন তোলা কেন? আগে ইংরাজের অধিকার হইতে নিজের দেশটা জয় করিয়া লও—re-conquer the country—তার পর এই দেশের শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্র বা, অন্যবিধ আকার ধারণ করিবে, সে কথার বিচারের সময় আসিবে। এখন ইংরাজের অধিকার হইতে দেশটাকে নিজের অধিকার কিসে আইসে, তাহাই কেবল আমাদের ভাবিবার ও করিবার কথা। "অমৃত বাজার পত্রিকার" মনীষী লেখকের মতে, ইংরাজ-রাজের উচ্ছেদ বা অবসানই "স্বরাজ"। ইহা একটা অভাবাত্মক বস্তু। স্বরাজ অর্থ ঠিক স্বাধীনতা নহে, কিন্তু অনধীনতা মাত্র। এখানে স্বরাজ শব্দ ইংরাজি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স শব্দেরই অনুবাদ। সেলফ্-গভর্ণমেণ্টের—self-government এর প্রতিশব্দ নহে।

প্রয়াগের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' (Independent), নামক ইংরাজি দৈনিক পত্র, গান্ধি মহারাজের মুখপত্র বলিলেও হয়। এই পত্রে সর্ব্বদা মহাত্মার মতামত অভিব্যক্ত ও সমর্থিত হইয়া

থাকে। এই "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্" পত্রও গণতন্ত্র স্বরাজের আলোচনা করিতে যাইয়া, "অমৃতবাজারের" মতেরই কতকটা অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। ইনিও এ সময়ে এ সকল বিষয়ের আলোচনার বিরোধী। "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্" কহিতেছেন, ইংরাজ-রাজ গিয়া যদি হিন্দুরাজ বা মোছলেম রাজ, বা শিখরাজই হয়, তাতেই বা আসিয়া যাইবে কি? হিন্দু, মুসলমান্, শিখ—এরা ত আমাদেরই লোক। এদের রাজ ত আমাদেরই রাজ হইবে। অর্থাৎ, ইংরাজ রাজের উচ্ছেদ হইয়া, তাহার স্থলে, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ভারতের যে কোন সম্প্রদায়ের, বা জাতির, বা প্রদেশের শাসনই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, তাহাই আমাদের স্বদেশীয় রাজ হইবে। সুতরাং তাহাই ত স্বরাজ। ইহাতে ভয় পাইবার কি আছে!

এরূপ ভাবে যাঁহারা এই বিষয়টির বিচার-আলোচনা করেন, বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা সপ্রমাণ হয়, ইহা স্বীকার করি। আর দেশের মধ্যে যে এই অসহিষ্ণুতা সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহাও জানি এবং বুঝি। কিন্তু এই অসহিষ্ণুতা নিবন্ধন, ভবিষ্যতের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া, আশু প্রতীকারের আশায়, যার-তার আশ্রয় গ্রহণ করা, নীতিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে।

"অমৃতবাজার পত্রিকা" কহিতেছেন, আগে ইংরাজের হাত হইতে নিজের দেশটাকে উদ্ধার করিয়া আন, তারপরে শাসন-ব্যবস্থার কথা ভাবিও। কাড়িয়া আনিবে কারা? কাড়িয়া আনিতে হইলে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে? এ সকল কথা কি ভাবিতে হইবে না? কেবল যোগ-বলে—soul force দিয়া,—কি ইংরজেকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া বা সরাইয়া দিতে পারিব? যাঁহারা এরূপ যোগ-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া স্বরাজলাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের সঙ্গে সাধারণ বুদ্ধি বিবেচনা লইয়া কোনও কথা বলা চলে না। কিন্তু যোগ-বলে কাম্য বস্তু লাভের জন্য এককোটি টাকা, এককোটি কন্‌গ্রেসের সভ্য, বিশলক্ষ চরকা সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় কি? অন্ততঃ ভারতের প্রাচীন যোগ-শাস্ত্রে এরূপ কথা কহে বলিয়া এ পর্য্যন্ত শুনি নাই। যোগীজনের অনিমা প্রাপ্তির জন্য চাপিবার যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না; লঘিমা প্রাপ্তির জন্য দেহাভ্যন্তরে বেলুনের মতন, হাইড্রজন গ্যাস ঢুকাইতে হয় না; দূরে যাইবার জন্য বিমান-পোত বা মটরগাড়ীর আবশ্যক হয় না; কাম্যবস্তুলাভের জন্য, কোন ও প্রকারের বাহিরের উপায় অবলম্বন করিতে হয় না। ইচ্ছামাত্র যোগীজনের ঈপ্সীত লাভ হয়। ইহাই ত যোগের বাহাদুরী। আমাদের দেশের শাস্ত্র-সাধনায় ইহাকেই ত এতাবৎকাল যোগবল বলিয়া আসিয়াছে। যে soul force এর সফলতার জন্য কোটি রজত মুদ্রা, কোটি সভ্য ও বিশলক্ষ চরকার প্রয়োজন, যাহার জন্য স্তূপাকার বিদেশী বস্ত্রের আহুতির আবশ্যক, সে বস্তু আমাদের যোগশাস্ত্র জানে না। সুতরাং যোগবলে যে স্বরাজলাভ হইবে, একথা কেহ বিশ্বাস করেন কি না সন্দেহ।

আর যদি যোগবলে স্বরাজলাভ না-ই হয়, তবে ইংরাজের অধিকার হইতে দেশটা জয় করিবে কে, বা কাহারা? এই জয় করিতে হইলে কিরূপ সাজসরঞ্জামের আবশ্যক হইবে? আর যে বা যাহারা এ কার্য্য করিবে, সিদ্ধির পরে, তাদের পক্ষে কিরূপ নীতি বা পন্থা অবলম্বন করার সম্ভাবনা,—এসকল কথা এক্ষেত্রে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে।

৩

ইংরাজ নিজের শক্তিতে দেশটা অধিকার করিয়া আছে। এই শক্তিকে পরাভূত ও বিধ্বস্ত না করিয়া, আমরা দেশটা পুনরুদ্ধার করিতে পারিব কি? দেশটা re-conquer করা অর্থই, নিজেদের শক্তি দ্বারা ইংরাজের শক্তিকে নষ্ট করা।

ইংরাজ যে শক্তির দ্বারা আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে কতকটা মায়িক,—একান্তই কায়িক নহে—একথা অস্বীকার করা অসাধ্য ও অনাবশ্যক। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, ইংরাজ আপনার প্রতাপ-প্রতিষ্ঠা করিয়াই এই অদ্ভুত মায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। রাজার ধনবল ও জনবল—কোষ ও দণ্ড—দেখিয়া, প্রকৃতি-পুঞ্জের অন্তরে যে শ্রদ্ধা ও ভয় প্রতিষ্ঠিত হয়, আমাদের প্রাচীনেরা, তাহাকেই "প্রতাপ" কহিতেন। ইংরাজিতে ইহারই নাম প্রেষ্টিজ। ইংরাজ-রাজের অশেষ ধন এবং অপরিসীম সিপাহী সান্ত্রী আছে, এই ধনের জোরে, এই সকল সৈন্যসামন্তের সাহায্যে, ইংরাজ সসাগরা ভারতভূমির অধীশ্বর হইয়া আছে,—ইংরাজের রাজ্যে এই জন্য লোকে বে-আইনি কাজ করিতে ভয় পায়; এই জন্যই দুর্ব্বলে ইংরাজের দোহাই দিয়া প্রবলের প্রতিপক্ষে দাঁড়াইতে পারে। এ সকল ভাব হইতেই এই অদ্ভুত মায়ার সৃষ্টি হইয়াছে। আজ যদি দেশের প্রকৃতিপুঞ্জের এ ধারণা নষ্ট হইয়া যায়, আজ যদি লোকে ইহা বুঝে যে ইংরাজের কোষ শূন্য হইয়াছে, তাহার সেনাবল নষ্ট হইয়াছে, তবে ইংরাজের বর্ত্তমান প্রতাপ আর থাকিবে না। প্রতাপ নষ্ট হইলে লোকের ভয়ও ভাঙ্গিয়া যাইবে। ভয় ভাঙ্গিলে, ইংরাজ যে অদ্ভুত মায়াজাল বিস্তার করিয়া, একদল মুষ্টিমেয় লোক লইয়া, দূরদূরান্তর হইতে আসিয়া, এই বিশাল দেশটাকে হেলায় পদানত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আর সম্ভব হইবে না। সুতরাং যে মায়া-প্রভাবে ইংরাজ আমাদিগকে শাসন করিতেছে, কেবল মন্ত্র প্রভাবে, কেবল যাদুবলে, কেবল মুখের কথায়, বা মনের কল্পনায় বা সংকল্পে সে প্রভাব নষ্ট হইবে না। রোজা ডাকিয়া, বাগবাজারের পক্ষেও এই বিরাট, এই নিরেট ইংরাজ-শাসনের হাত হইতে দেশটাকে re-conquer বা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নহে।

অশেষ উৎপাত উপদ্রব করিবার শক্তি আছে বলিয়াই ইংরাজ এরূপ নিরুপদ্রবে ভারতে রাজত্ব করিতেছে। এ শক্তি তার যতদিন থাকিবে, ততদিন দেশটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া বা re-conquer করা অসম্ভব, অসাধ্য, কল্পনাতীত। ইংরাজ-প্রভুশক্তির পশ্চাতে যতটা সুসম্বদ্ধ, সুশিক্ষিত, সুপটু পশুবল রহিয়াছে, অন্ততঃ সে পরিমাণে সুসম্বদ্ধ, সুশিক্ষিত, সুপটু ও সশস্ত্র জনবল বা সেনাবল যতক্ষণ না সংগৃহীত হইতেছে, ততক্ষণ দেশটা re-conquer বা আবার নিজেদের অধিকারে আনার কল্পনা পর্য্যন্ত সাধারণ বুদ্ধির অতীত। আর যে সেনা-নায়ক বা যে সেনাদল এ কার্য্য করিবে, সে কি ইংরাজের শাসনদণ্ডটি কাড়িয়া লইয়া, আমাদের হাতে তুলিয়া দিবে, না নিজের কব্জার ভিতরেই আঁকড়াইয়া ধরিবে? যাঁরা এই re-conquer এর কথা তুলিয়া, স্বরাজের প্রকৃতি কি হইবে,—অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান সাধনার সাধ্য কি,—এবিষয়ের আলোচনার মুখ চাপিয়া দিতে চাহেন, তাঁরা কেবল ইংরাজকেই তাড়াইতে চাহেন, তার পরে যা হয় হউক, সে ভাবনা ভাবিতে রাজি নহেন।

তাঁরা অনধীনতা বা independence চাহেন, স্বাধীনতা বা self-dependence যে কি ইহা বুঝিতে চাহেন না।

৪

অনধীনতা লাভ করিতে হইলে, ভাঙ্গাই চাই, ভাঙ্গাই যথেষ্ট। যে বন্ধনটা আছে, যে শিকলটা গলায় বড় বাজিতেছে, তাহা কাটিতে বা ভাঙ্গিতে পারিলেই হইল। তারপর যা হয় হউক। স্বাধীনতার পথ কিন্তু কেবল ভাঙ্গার পথ নয়, সঙ্গে সঙ্গে গড়ার পথও। পরের অধীনতা নষ্ট করিয়া, স্ব'এর বা নিজের অধীনতার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—স্বাধীনতার সাধক ইহাই চাহেন। অধীনতার প্রাণ শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার অর্থ বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে একটা সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা, ও সে সম্বন্ধকে রক্ষা করিবার উপায় বিধান করা। ইংরাজ একটা রাষ্ট্র-শৃঙ্খলা, একটা শাসন-যন্ত্র, প্রজাবর্গের পরস্পরের মধ্যে কতকগুলি সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করিয়া, নিজের ইচ্ছা ও শক্তি বলে সে সম্বন্ধকে রক্ষা করিতেছে। ইংরাজের অধীনতা এই শৃঙ্খলাকে আশ্রয় করিয়া, আমাদিগকে আসিয়া ঘেরিয়া রাখিয়াছে। আমরা যখন স্বাধীন হইব, তখনও আমাদের নিজেদের উপরে নিজেদের এই অধীনতা, একটা রাষ্ট্র-শৃঙ্খলা, একটা শাসন-যন্ত্র, একটা রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া রহিবে। সুতরাং, এই শৃঙ্খলার সূত্রপাত, এই যন্ত্রের ছাঁচ, এই রাষ্ট্র সম্বন্ধের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা যদি এখন হইতে আমরা না করি, বা না করিতে পারি, কাহাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের স্বাধীনতার বা স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে? সে অবস্থায় আমরা কেবল মাত্র অনধীনতাই লাভ করিতে পারিব, স্বাধীনতা ত পাইব না।

কি জীব, কি সমাজ, কিছুই একটা অভাবাত্মক বস্তুর উপরে, একটা শূন্যেতে, স্থিতিলাভ করিতে পারে না। যদি ইংরাজের অধীনতা ঘুচিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের স্বাধীনতার আশ্রয় প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে, ইংরাজের শৃঙ্খল-মুক্ত হইতে না হইতে আর কাহারও শৃঙ্খলে আমরা বাঁধা পড়িবই পড়িব। সে কেহ স্বদেশীও হইতে পারে, বিদেশীও হইতে পারে, কে হইবে, কে জানে?

এদেশে দেশীয় কয়েদিদিগকে হাতে কড়া ও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া পথ দিয়া লইয়া যায়। এই দড়িটা শ্বেতাঙ্গ জোহনের, কিম্বা কৃষ্ণকায় জনার্দ্দন সিংহের হাতে আছে, কয়েদি বেচারি এ বিচার করিয়া কোনও সান্ত্বনা পায় কি?

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

স্বরাজ

(১৫)

১৮৯৪ সালে দ্বিতীয় নিকোলাস্ যখন রুশ্ সাম্রাজ্যের সিংহাসনারোহণ করেন, তাঁহার রাষ্ট্রে শক্তিবাদী বিপ্লব পন্থীর (Terrorists) অভাব ছিল না। আবার রাষ্ট্রের আইন মানিয়া, নিরুপদ্রব, বৈধ আন্দোলনদ্বারা জন সাধারণের জন্য ক্রমে ক্রমে একের পর আর এক অধিকার লাভের চেষ্টায় নিরত রাষ্ট্রনীতি-কুশল (gradualists) স্বদেশ-সেবকেরও অভাব ছিল না। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় "সাহিত্য সভা" লোকশিক্ষা বিস্তারে ব্যাপৃত ছিল। "সাহিত্য সভা" রুশ রাষ্ট্রশক্তির

প্রতিকূল গণ্য হওয়াতে শাসনের তাড়নায় ১৮৯৬ সালে লোপ পায়। তদুপলক্ষে টলষ্টয় জনৈক রুশ মহিলাকে ১৮৯৬ সালে যে পত্র লেখেন তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত সহযোগিতা-বর্জ্জন-বাদের সারমর্ম্ম দিয়াছি। ঐ পত্র কিন্তু সম্রাট নিকোলাসের জীবিতকালে রুশ দেশে মুদ্রিত বা প্রকাশিত হইতে পারে নাই। সেজন্য য়ুরোপে বা রুশ দেশে সহকারিতা-বর্জ্জন-বাদ অপ্রচারিত ছিল না। টলষ্টয় যখন কিছু নূতন কথা বলিতেন বা লিখিতেন য়ুরোপীয় সকল ভাষায় তাহা অনূদিত হইয়া সকল দেশে প্রচারিত হইত। এবার টলষ্টয় ঘোষণা করেন যে শক্তি মূলক রাষ্ট্রের তিরোধানের একমাত্র উপায় পূর্ব্বোক্ত নিরুপদ্রব, শক্তি হইতে মুক্ত, প্রেমে সুপ্রতিষ্ঠিত সহকারিতা-বর্জ্জন। বল বা শক্তির শাসন মানব সমাজ হইতে দূর করিবার জন্য বল বা শক্তির শরণাপন্ন হওয়া মূর্খতা। আবার, রাষ্ট্রের আইন মানিয়া জনসাধারণের জন্য ক্রমশঃ অধিকার লাভের চেষ্টাও আত্মপ্রতারণা। লক্ষ্যে উপনীত হইবার ঐ একমাত্র পথ—নিরুপদ্রব সহযোগিতা-বর্জ্জন। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

টলষ্টয়ের প্রদর্শিত সহযোগিতা-বর্জ্জনের এই পথটীকে বল বা শক্তির উপদ্রব হইতে মুক্ত রাখিবার প্রয়াস, শুধু সুবিধাবাদীর কৌশল এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। বল-প্রয়োগ টলষ্টয়ের ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। টলষ্টয়ের ধর্ম্মের প্রথম অনুজ্ঞা, প্রেম। টলষ্টয়ের ধর্ম্মের শেষ অনুজ্ঞাও প্রেম, সর্ব্বভূতে প্রেম। শক্তির সাহায্যে অশুভের সহিত সংগ্রাম টলষ্টয়ের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। শক্তির সাহায্যে অশুভকারীর প্রতি শাস্তি বিধান টলষ্টয়ের ধর্ম্মে স্থান পাইতে পারে না। তাঁহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, প্রেমের জয়। তাঁহার সাধনা, অশুভের বিরুদ্ধে শক্তি-প্রয়োগ-পরিহার (The Law of love and its Corollary the Law of Non-resistance)। মানবের সকল আচরণের সেই এক মাপ-কাটি—নিজে যেরূপ আচরণ অপরের কাছে পাইতে চাও, অপরের প্রতিও সেই আচরণ তোমার কর্ত্তব্য। মনে কর, তোমার সম্মুখে এক দস্যু আসিয়া অসহায় এক শিশুকে হত্যা করিতে উদ্যত। দস্যুকে বধ করিয়া শিশুটীকে রক্ষা করিতে তুমি সক্ষম। আর দস্যুকে হত্যা না করিলে শিশুটীর প্রাণরক্ষা অসম্ভব। তখন তোমার কর্ত্তব্য কি? টলষ্টয় বলেন যে তখনও দস্যুহত্যা তোমার পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ। তোমার স্কন্ধে একটী পর্ব্বত বহন করা তোমার দৈহিক জীবনের পক্ষে যেমন অসম্ভব, বলপ্রয়োগও তোমার নৈতিক জীবনের পক্ষে তেমনই অসম্ভব। যাহা তোমার নৈতিক জীবনের জন্য অসম্ভব (morally imposible) তাহা তুমি করিতে পার না। অসহায় শিশুটীকে বাঁচাইবার জন্য কোনও পর্ব্বত তোমার স্কন্ধে বহন করিবার কথা ত তোমার মনে আসে না। তবে দস্যুর প্রতি বলপ্রয়োগ তোমার মনে আসিতে দেও কেন? যুক্তিতর্ক দ্বারা অসৎ মিথ্যার সহিত আপোষ করিয়া বলপ্রয়োগ তুমি করিতে পার না। দস্যুকে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে পার। দস্যু ও শিশুর মধ্যে পড়িয়া তুমি প্রাণ হারাইতে পার। কিন্তু একটী কাজ তোমার জন্য সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ—তাহা ঐ দস্যুর প্রতি বলপ্রয়োগ। সেইরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সহকারিত্ব বর্জ্জনের পথ বল-বিবর্জ্জিত হওয়া চাই-ই চাই। এখানেও যুক্তিতর্ক দ্বারা অসৎ, অশুভ, মিথ্যার সহিত আপোষ করিতে পারিবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি টলষ্টয়ের মতে শক্তি-মূলক রাষ্ট্র অশুভ, পাপ। তাহার সহিত আপোষ অসম্ভব।

সুতরাং তাহার সহকারিতা অসম্ভব। বৈষম্য-পোষক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সভা, শিক্ষালয়, ভজনালয়, বিচারালয়, সেনা-নিবাস, কারবারের স্থান, কামান বন্দুকের কারখানা, ছাপাখানা ইত্যাদি সব হইতে দূরে থাকিতে হইবে। কি করিতে পারিবে না তাহার ক্ষুদ্র এক তালিকা পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। সে তালিকা সম্পূর্ণ নয়। টলষ্টয়ের অরাজক সমাজে উপনীত হইবার প্রধান আয়োজন সংযম, চিত্তশুদ্ধি, স্বার্থত্যাগ। দৈনিক জীবনে মাদক দ্রব্য, তামাক পর্য্যন্ত, সেবন করিতে পারিবে না। আহারের জন্য জীবহিংসার প্রশ্রয় দিতে পারিবে না। কামাদি রিপুর সেবা ত নিষিদ্ধই। মোটা খাইবে, মোটা পরিবে। আর মাঝে মাঝে উপবাস। উপবাস ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি ও সংযমঅভ্যাস অসম্ভব। অন্নসংস্থানের জন্য প্রত্যেকে ভূমি কর্ষণ করিয়া কিছু আহারের সামগ্রী উৎপন্ন করিবে। পরিধানের জন্য কিছু বস্ত্র-বয়ন নিজহাতে করিবে। শুধু যে দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য দৈহিক শ্রম প্রয়োজনীয়, তাহা নহে। তাহার জন্য ব্যায়ামই যথেষ্ট হইতে পারিত। তোমার শারীরিক শ্রমদ্বারা আহার্য্য সামগ্রী উৎপন্ন করা (Bread labour) তোমার কর্ত্তব্য। তোমার সন্তান সন্ততির শিক্ষার জন্য প্রথম মন্ত্র— প্রেম ও সাম্য। নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্রতম সেবক যে তাহাদের ভাই, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদিগকে ভূমি কর্ষণ করিতে দিবে। নিজের জুতা ত তাহারা নিজে পরিষ্কার করিবেই, মলমূত্র আবর্জ্জনা নিজ হাতে পরিষ্কার করিতে তাহাদিগকে শিখাইবে। তবে তাহারা সত্য সত্যই বুঝিতে পারিবে যে ভগবানের রাজ্যে প্রভু ভৃত্য নাই, সেখানে সব ভাই ভাই। খাওয়া পরা ও অন্যান্য সকল বিষয়ে বালক বালিকাদিগকে বিলাসভোগ পরিহার করিতে শিখাইবে। তাহাদিগের ভাইকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না করিলে বিলাস সামগ্রী উৎপন্ন হয় না ইহা বুঝিলে তাহারা আপনা আপনি বিলাসভোগ পরিহার করিবে। কি করিবে না তাহা যেমন এক কথায় টলষ্টয় বলিয়া দিলেন, অরাজক সমাজে উপনীত হইবার জন্য কি করিবে তাহাও এক কথায় বলা হইয়াছে। করিবে না—শক্তিমূলক বৈষম্য-বর্দ্ধক রাষ্ট্রের কোনও প্রকারে সহকারিত্ব। আর করিবে—ভগবানে ও বিশ্বমানবে প্রীতি। শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে জাতি-বর্ণ-দেশ-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকে ভাল বাসিবে ঠিক যেমন নিজেকে ভালবাস। অভাবপক্ষে তোমার কর্ত্তব্য সহকারিত্ব বর্জ্জন। ভাবপক্ষে তোমার কর্ত্তব্য ভগবানে ও বিশ্বমানবে প্রীতি। এই প্রীতি সাধনের পথে অগ্রসর হইয়া তোমাকে সংযত-বাক্ ও বিরুদ্ধমত-সহিষ্ণু হইতে হইবে। তবে নিরুপদ্রবে শান্তির সহিত অরাজক সমাজে উপনীত হইতে পারিবে। বিরুদ্ধ-মত সহিষ্ণু হইবে, কিন্তু তোমার নিজের আচরণ সর্ব্বদা সত্য থাকিবে। শক্তিমূলক রাষ্ট্র পাপ, তাহার সহিত সহকারিত্ব অসম্ভব। কিন্তু সহকারিত্ব বর্জ্জন করিলে রাষ্ট্রশক্তি এখন তোমাকে নির্য্যাতন করিবে, তোমার কর্ত্তব্য তখন প্রীতির সহিত তাহা সহ্য করা। রাষ্ট্রশক্তি তোমার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তোমাকে শাস্তি দিতে পারিবে না, কারণ সম্পত্তি ত তুমি নিজে হইতে পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিবে। সুবিচারের দোহাই দিয়া রাষ্ট্র-শক্তি যখন তোমার দৈহিক স্বাধীনতা হরণ করিতে চাহিবে, তোমার কর্ত্তব্য তখন হাসিমুখে স্বাধীনতার হরণকারীর প্রতি প্রীতিদান ও রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের ফলে তোমার দৈহিক স্বাধীনতা বিসর্জ্জন। ব্যবহারজীবির সাহায্যে বা অন্য উপায়ে আত্মরক্ষা করিবে না। বিচারে তোমার প্রাণদণ্ড হইলে,

তোমার কর্ত্তব্য বিচারক, পুলিস, কারারক্ষক সকলকে প্রীতিদান ও হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন। প্রেম ও সহিষ্ণুতা এ উভয়ই তোমার কর্ত্তব্য। এই রূপ প্রীতির সহিত রাষ্ট্রের শাসন ও দণ্ড সহ্য করিলে রাষ্ট্রের ভিত্তি শিথিল হইবে। তোমার অপরাজিত প্রীতিতে রাষ্ট্রের বল পরাজিত হইবে। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তির নিকট বল বা শক্তি (force) হার মানিবে। আর সাধারণ লোক যাহারা দোমনা ছিল তাহারা আসিয়া সহকারিত্ব বর্জ্জন ও প্রীতির পথ অবলম্বন করিবে। একটী কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। শুধু সহিষ্ণুতায় জগাই মাধাই উদ্ধার হয় না। যেমন সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তেমনই অপরাজেয় প্রীতির প্রয়োজন। প্রীতিশূন্য, বিদ্বেষপূর্ণ দৃঢ়তার সহিত নির্য্যাতন সহ্য করিলে সহকারিত্ব বর্জ্জনে জয় লাভের সম্ভাবনা কম। সহগুণ ত যুদ্ধে শত্রু নিপাতে বদ্ধপরিকর সৈন্যেরও আছে। তাহার সহগুণে জগাই মাধাই উদ্ধার হয় না। বিদ্বেষের প্রতিদান বিদ্বেষই হইয়া থাকে। শুধু কেবল তোমার প্রীতির প্রতিদানে শুভ পাইবে। প্রীতির অভাবেই পৃথিবীতে রাষ্ট্র, পৃথক্ সম্পত্তি প্রভৃতি পাপের উৎপত্তি। প্রীতির অভাবে আধুনিক সভ্যতার যত অশুভ, যত পাপ আসিয়া জুটিয়াছে। টলষ্টয়ের মতে আধুনিক সভ্যতা শয়তানের লীলা। ধর্ম্মসঙ্ঘ (church), জাতীয়তা (nationalism) স্বদেশানুরাগ (Rationalism), শ্রমবিভাগ (division of labour), কল-কারখানা, রেল-জাহাজ, চিকিৎসাবিদ্যা, মুদ্রাযন্ত্র, শিল্প (art), সাহিত্যানুরাগ, নরনারীর তুল্যাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে আন্দোলন (Feminism), সমাজতন্ত্রবাদ (socialism)—এ সকলই সুকৌশলে বিন্যস্ত শয়তানী ফাঁদ। এক কথায় বলিতে গেলে, আধুনিক সভ্য সমাজে নরক গুলজার। ভগবানে ও বিশ্বমানবে অজেয় প্রীতি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া রাষ্ট্রের সহকারিত্ব বর্জ্জন কর। এ পৃথিবীতে স্বারাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

রুশদেশে তখন ১৪ কোটী লোকের মধ্যে ১২ কোটী ছিল কৃষিজীবী। টলষ্টয় বলিতেন যে এই রুশ দেশীয় কৃষিজীবিগণ ধর্ম্ম-প্রাণ। তাহাদের সহিত একত্র ভূমি কর্ষণ করিয়া, একত্র বাস করিয়া, তাহাদের বিরোধ আপোষে মিটাইয়া টলষ্টয়ের ধারণা হইয়াছিল যে এই ধর্ম্ম-প্রাণ শ্লাভ্‌জাতীয় (slav) কৃষকদলই ভূসম্পত্তিরূপ বিশ্বব্যাপী মহাপাপের ক্ষয় করিবে। এই মহাপাপের নাশ হইলে শক্তিমূলক শাসনরূপ পাপও দূর হইবে। আর য়ূরোপের যত দেশ বা জাতি আছে তাহার মধ্যে রুশ দেশীয় কৃষকগণই এই পাপ নিরাকরণে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম।

(১৬)

স্বারাজ্য সংস্থাপনের এই নূতন পথে চলিতে যদি রুষ দেশের সব লোক সত্য সত্যই চেষ্টা করিত তবে তাহাকে ব্যাধিতের স্বপ্নের ন্যায় নিরর্থক বলা সাজিত না। কিন্তু শুধু রুশদেশের সকলে এই নূতন পথে চলিয়া স্বারাজ্য সংস্থাপনের প্রয়াস পাইলে সে প্রয়াস সফল হইত না। রুষ দেশের বাহিরেও মানুষ আছে আর এই বাষ্পশক্তি ও তড়িৎশক্তির যুগে তাহাদের সহিত রুশ দেশবাসীর কোনও সম্পর্ক নাই এরূপ বলা চলে না। রুষ দেশের বাহিরের লোকেরাও এই নূতন পথে চলিতে সত্য সত্য চেষ্টা করিলে তবে রুষদেশে নিরুপদ্রবে

স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু পৃথিবীর বার আনা লোককে এক মত করিয়া এই টলষ্টয়প্রদর্শিত প্রীতি ও সহকারিত্ব-বর্জ্জনের পথে চলিতে সম্মত করা কবির কল্পনা মাত্র। তাহা বাস্তব জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কার্য্যতঃ রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা চালিত হইয়া রুষদেশীয় ধর্ম্মপ্রাণ কৃষকগণ টলষ্টয়ের উপদেশ অগ্রাহ্য করিল ও ভ্রাতৃহত্যার জন্য কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। সহকারিত্ব-বর্জ্জনবাদ প্রচারিত হইবার পরে তাহারা ১৯০৪ সালে এক বার ও ১৯১৪ সালে আর এক বার বিশ্বমানবে অজেয় প্রীতির মহামন্ত্র ভুলিয়া গিয়া নরশোণিতে ধরাতল রঞ্জিত করিয়াছে। ১৯০৪ সালে টলষ্টয় তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ভ্রাতৃহত্যা মহাপাপ। জাপানের লোকের সহিত যুদ্ধ করিও না। ঈশ্বরের আদেশ নরহত্যা করিবে না। নরহত্যাকে যুদ্ধ নাম দিলেও তাহা মহাপাতকই থাকে, তাহা পুণ্য হইতে পারে না। টলষ্টয়ের সম্মানার্হ ধর্ম্মপ্রাণ কৃষকগণ কিন্তু টলষ্টয়ের কথায় কাণ দিল না। তাহারা রাষ্ট্রশক্তির নিকট হার মানিল। বর্ব্বর-সুলভ শিকার-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে তাহারা মাতিয়া উঠিল।

রুশ দেশের বাহিরেই মানুষ-শিকার চলিতে লাগিল, এরূপ নহে। সহকারিত্ব বর্জ্জন-বাদ প্রচারের পূর্ব্বেও যেমন, পরেও তেমনই সম্রাটের শাসন দণ্ড ভীষণ প্রতাপ দেখাইতে লাগিল। সহস্র সহস্র লোকের দণ্ড হইতে লাগিল—কাহারও বা প্রাণ দণ্ড, কাহারও বা কারাবাস, কাহারও বা নির্ব্বাসন। যে কারণেই হউক, বৃদ্ধ টলষ্টয়ের প্রতি দণ্ডবিধান রাজপুরুষদিগের নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু শক্তিবাদী বিপ্লবপন্থিদের (revolutionaries) ত কথাই নাই, সংস্কারপন্থিগণও (gradualists) সম্রাটের শাসনদণ্ডের প্রবল প্রতাপ বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। দলে দলে সমাজ-তন্ত্র-বাদী (socialists) নির্ব্বাসিত হইতে লাগিলেন। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কিছুটা সহকারীত্ব-বর্জ্জন অনেকেই করিলেন। স্বার্থত্যাগ, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা—ইহার অভাব হইল না। সুখস্বার্থ বিসর্জ্জন ত সহজ কথা, প্রাণ বিসর্জ্জনেও অনেকে ইতস্ততঃ করিলেন না। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে টলষ্টয়ের প্রচারিত শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে অজেয় প্রীতির পরিচয় বড় একটা পাওয়া গেল না। সম্রাট্ ও রাজপুরুষদিগের মধ্যে ত নয়ই, স্বাধীনতা-প্রয়াসী বিপক্ষ দলেও নয়। সংস্কার-পন্থী, বিপ্লব-পন্থী, সমাজ-তন্ত্র-বাদী (socialist) গণ-তন্ত্রবাদী, সমাজ-তন্ত্র-গণতন্ত্রবাদী (social democrat), ভদ্রলোক, শ্রমজীবী কৃষিজীবী কেহই প্রীতিমন্ত্র ধারণ করিতে সত্য প্রয়াস করিল না। সুতরাং বল বা শক্তির লীলা উভয় পক্ষে চলিতে লাগিল। জগাই মাধাই উদ্ধার আর হইল না।

১৯১৪ সালের যুদ্ধের পূর্ব্বেই সহকারিত্ব-বর্জ্জন-বাদ রুশীয় জনগণকে বিশ্বমানবের প্রীতির সাধনে নিযুক্ত করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু আর এক কাজ অনেকটা করিয়া গিয়াছিল। রাষ্ট্রের, শুধু রাষ্ট্রের কেন, বহুমানবের সমবেত সুনিয়ন্ত্রিত উদ্যোগমাত্রের (organisations) ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়াছিল। গড়িবার কাজ করিতে পারে নাই, কিন্তু ভাঙ্গিবার ব্যবস্থাটা দিয়াছিল। বাঁধন জমাট করিতে পারে নাই কিন্তু বাঁধন আলগা করিয়া দিয়াছিল।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

"ভারতের স্বর্গভূমি" বা "মানবজাতির স্বর্গভূমি"।

(ঐতিহাসিক তত্ত্ব)

প্রবন্ধের শিরোনাম দেখিয়া অনেকেই হয়ত মনে করিতেছেন, যে আমি কাশ্মীরের প্রসঙ্গের অবতারণাই এখানে করিব। কারণ কাশ্মীরই সকলের নিকট ভারতে "ভূস্বর্গ" বলিয়া পরিচিত। কিন্তু আমার লক্ষ্য কাশ্মীর নহে, আমার লক্ষ্য আমাদের মাতৃভূমি বঙ্গদেশ। ইহাতেও অনেকেই প্রশ্ন করিতে পারেন যে, স্বদেশকে "স্বর্গ" বলিয়া বর্ণনা ইহা মানব-মাত্রেরই প্রকৃতিগত, তবে বঙ্গদেশকে "স্বর্গ" বলিয়া বর্ণনা করায় গতানুগতিকতাই মাত্র হইবে, ইহাতে অধিক বৈশিষ্ট্য আর কি হইবে? আমরা এরূপ কোন ভাবাবেগের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এস্থলে প্রবন্ধের সূচনা করি নাই, পরন্তু আমাদের মাতৃভূমি সম্বন্ধে অতীব গৌরবময় নিরপেক্ষ প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিতেই উপস্থিত প্রবন্ধের সূচনা করিয়াছি।

সুদূর অতীতকালেই বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধির ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত প্রাচীন রাজধানী গৌড় খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই যে পরম সৌষ্ঠব শালী নগরীরূপে পরিণত হইয়াছিল—ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরেই তৎসম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রদান করে। ইহা বৈভবে ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লীরই তুল্যস্পর্দ্ধী হইয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের উক্তি এই :—

"Historic Gour, which was it is computed a magnificent city five or six centuries before Christ. Gour was to Bengal what Delhi was to Hindusthan." History of the Portuguese in Bengal p. 19 by J. J. A. wampos.

বঙ্গদেশের পণ্যসম্ভার যে পুরাকালেই বিদেশে অপূর্ব্ব উপাদেয় দ্রব্যরূপে সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাও ইতিহাসেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রোমক মহিলাগণ বঙ্গদেশের মখ্‌মল্ কাপড় পরিধান করিয়াই আপনাদের পরিচ্ছদের পারিপাট্য সাধন করিতেন। কেবল তাহাই নহে বঙ্গদেশের মসলা দ্রব্য ও অপর পণ্য বস্তুও, রোমকদিগের দ্বারা বিশেষরূপে সমাদৃত হইত ও অসম্ভব উচ্চমূল্যে ক্রীত হইত। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের নিজের সাক্ষ্যই এখানে উদ্ধৃত হইতেছে :—

'There were times when the muslins of Dacca shipped from Satgaon clad the Roman ladies and when spices and other goods of Bengal that used to find their way to Rome through Egypt were very much appreciated and fetched fabulous prices." Ibid p. 22

রোমকেরা পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতাগুরু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই রোমকেরা যে সমস্ত বস্তু মনোরম ও মূল্যবান্ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন তৎসমস্ত যে পৃথিবীর মধ্যে অপূর্ব্ব বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহা সহজেই অনুধাবনা করা যায়।

রোমকেরা যেরূপ বঙ্গদেশের বাণিজ্যদ্রব্যজাত অপূর্ব্ব ও অমূল্য বলিয়া বিবেচনা করিত, তাহাতে পরবর্ত্তী পর্টুগীজ বনিকগণমধ্যেও যে অনুরূপ ধারণারই পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহা

কিছুই বিচিত্র নহে। পর্টুগীজদিগের উল্লিখিত ধারণা সম্বন্ধে তাহাদিগের ইতিহাস লেখক লিখিতেছেন :—

"Regarding the trade and wealth of Bengal, the Portuguese had the most sanguine expectation which did not indeed, prove to be far from true." Ibid p, 25.

"বঙ্গদেশের বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধে পর্টুগীজগণ অতিমাত্রায় উৎসাহপূর্ণ প্রত্যাশা পোষণ করিতেন; এই প্রত্যাশা বস্তুতঃ সুদূরপরাহত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই"।

স্বনামধন্য পর্টুগীজ নাবিক্ ভাস্কোডিগামা পর্টুগীজরাজ সমীপে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রদান করেন, তাহাতে বঙ্গদেশের অতুল বাণিজ্য বিভবের উল্লেখই পাওয়া যায়।

"The country could export quantities of wheat and very valuable cotton goods. Cloths which sell on the spot for twenty-two shillings and six pence fetch ninenty shillings at Calicut. It abounds in silver." Ibid p, 25.

"এই দেশ প্রভূত পরিমাণে গম ও অতীব মূল্যবান্ কার্পাসজাত পণ্যদ্রব্যসকল রপ্তানি করিতে সমর্থ। যে সমস্ত বস্ত্র এইস্থানে বাইশ শিলিং ছয় পেন্সে বিক্রীত হয়, কালিকাটে এ সমস্তেরই নব্বই শিলিং মূল্য পাওয়া যায়। এইদেশে প্রচুর রৌপ্য পাওয়া যায়।"

পর্টুগীজদগের অন্যতম প্রধানাধ্যক্ষ আল্‌বুকার্ক পর্টুগালের রাজার নিকট যে সমস্ত পত্রাদি প্রেরণ করিতেন তৎসমস্তেও বঙ্গদেশের অপার ঐশ্বর্য্যের কথা উল্লেখ থাকিত :—

"From time to time Albuquesque had witten to King Manoel about the vast possibilities of trade and commerce in Bengal." Ibid p, 25.

"সময় সময় আল্‌বুকার্ক বঙ্গদেশের ব্যবসায়বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনার বিষয় রাজা মেনোয়েলের নিকট লিখিয়া জানাইতেন।"

বৈদেশিকদিগের উপরিউক্ত বিবরণ সকল হইতে বঙ্গদেশ যে কি জন্য অপূর্ব্বদেশ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

কেবল বৈদেশিকের নিকটেই বঙ্গদেশ অপূর্ব্ব দেশ রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল তাহা নহে; কিন্তু ভারতবাসীর নিকটও যে বঙ্গদেশ অপূর্ব্বদেশ রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণই বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভারতীয় অশেষ ঐশ্বর্য্যশালী মোগলসম্রাটগণ যে বঙ্গদেশকে অপূর্ব্ব দেশেরও অধিক"স্বর্গভূমি" বলিয়াই মনে করিতেন তাহার অকাট্য ঐতিহাসিক নিদর্শনই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের দ্বারা বঙ্গদেশ স্পষ্টরূপেই "ভারতের স্বর্গভূমি" "মানবজাতির স্বর্গভূমি" বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এস্থলে আমরা সেই প্রমাণটী উদ্ধৃতকরা একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি :—

"A memoir by monsieur Jean Law, chief of French factory at Cossimbazar says :—In all official papers, firmans, parwanas of Moghal Empire, when there is question of Bengal, it is never named without adding "Paradise of India," an epithet given to it par excellence" Cf. Hill's Pengal in 1856-57, vol. iii. p., 160. Aurangzeb is said to have styled Bengal "the Paradise of nations." Ibid p, 19.

"কাশিমবাজারের ফরাসী কারখানার অধ্যক্ষ জিন্ ল কর্ত্তৃক লিখিত স্মৃতিলিপিতে উক্ত হইয়াছে—"মোগল্ সাম্রাজ্যের সরকারী সকল কাগজপত্রে, ফার্ম্মানে ও পরওয়ানায় যখনই

বঙ্গদেশের প্রসঙ্গ উপস্থিত দেখা যায়, তখনই "ভারতের স্বর্গ" এই কয়টী কথা ইহার সহিত সংযুক্ত না করিয়া কখনও ইহার উল্লেখ করা হয় না। এই সংজ্ঞাটী ইহার বিশেষ উৎকর্ষ জ্ঞাপনার্থই এতৎপ্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে"।

"ইহা কথিত আছে যে আরঙ্গজেব বঙ্গদেশকে "মানবজাতির স্বর্গ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।"

বঙ্গদেশের এই "স্বর্গ" আখ্যা যে অযথা প্রযুক্ত হয় নাই পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকও তাহা অকুণ্ঠিতভাবেই স্বীকার করিয়াছেন :—

"When the Portuguese actually established commercial relations in Bengal, they realized to their satisfaction what a mine of wealth they had found. Very appropriately indeed, did the Mughals style Bengal, "the Paradise of India." Ibid 25.

"যখন পর্টুগীজেরা বঙ্গদেশে বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন করিলেন তখন তাঁহারা যে কি সম্পদের আকর প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া প্রীত হইলেন। মোগলেরা যথার্থই বিশেষ সুসঙ্গত রূপেই বঙ্গদেশকে "ভারতের স্বর্গ" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন।

এস্থলে এই নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্বই আমাদের নিকট সুপরিস্ফুট হইতেছে যে বঙ্গদেশের "স্বর্গভূমি" আখ্যা বঙ্গবাসীদিগের দ্বারা প্রদত্ত হয় নাই। পরন্তু ইহা ভারতের একচ্ছত্র মোগল সম্রাটদিগের দ্বারাই প্রদত্ত হইয়াছিল। যে মোগল সম্রাট্গণ আপনাদিগকে "দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরোবা" বলিয়া পরমেশ্বরের সমকক্ষতাস্পর্দ্ধী হইয়াছিলেন; যাহারা পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের অন্যতম তাজমহল ও অনুরূপ প্রাসাদাবলী নির্ম্মাণ করতঃ দিল্লীকে দ্বিতীয় ইন্দ্রপ্রস্থ বা ইন্দ্রপুরীতে পরিণত করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গদেশকে "স্বর্গভূমি" অভিধা প্রদান করিবেন এবং পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকও তাহা অম্লানবদনে অনুমোদন করিবেন ইহা বঙ্গদেশের কম আস্পর্দ্ধার বিষয় নহে। ইহাতে বঙ্গদেশের অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা কেবল সুদৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নহে— ইহা অপূর্ব্ব মহিমাও ধারণ করিয়াছে। বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য কবিও যে ইহাতে কিরূপ নন্দনকাননেরই শোভা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটী হইতেই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে :—

"Here by the months; where hallowed Ganges ends, Bengal's beauteous Eden wide extends." Lusiadas, canto vii, Stanza xx, by Camoes: Mickle's Trans quoted in the History of the Portuguese in Bengal" by J. J. A. Campos-front page.

এইরূপে যখন আমরা আমাদের স্বদেশকে আজ রূপক স্বর্গ মাত্র না বুঝিয়া একরূপ স্বর্গ বলিয়াই বুঝিতে পারিতেছি; তখন ইহাতে আমাদের মধ্যে স্বদেশ ভক্তির অভিনব অনুপ্রাণনা আসিবে বলিয়া আশাকরা কি একান্তই দুরাশা হইবে?*

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

* J. J. A. Campos প্রণীত সম্প্রতি প্রকাশিত সুলিখিত "History of the Portuguese" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থের "Bengal, The Paradise of India" শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ের মর্ম্মগ্রহণে প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে। লেখক।

উপাধি রহস্য

দ্বিতীয় প্রস্তাব

প্রাচীন ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার বহুকাল পরে জাতিগুলি যখন জন্মগত হইয়া দাঁড়াইল, উক্তযুগে পূর্ব্বযুগের রীতির কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তদানীন্তন সামাজিকগণ এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের নাম বা উপাধি ব্যক্ত করিলেই তিনি কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত তাহা বুঝা যাইবে। তাই মহর্ষি শঙ্খ বলিতেছেন :—

"মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণোক্তং ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতঃ।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য জুগুপ্সিতং।

২।৩২ অ

বংশগত উপাধি

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের নাম মাঙ্গল্য সংসূচক, ক্ষত্রিয়ের বলসংযুক্ত, বৈশ্যের ধনসংযুক্ত এবং শূদ্রের "দাস" বা নিন্দিত শব্দসংসূচক রাখা উচিত। এই সকল ব্যক্তিগত সংজ্ঞা হইতেই বংশগত উপাধির প্রচলন হইয়াছিল। আমরা উদাহরণ দ্বারা আমাদের এই উক্তিটি স্ফুটীকৃত করিব। যেমন লোকমান্য পূজ্যপাদ্ ৺ বলবন্তরাও গঙ্গাধর তিলক। এখানে "বলবন্তরাও" কথাটি ভারতপূজ্য মহাত্মা তিলকের নিজ নাম এবং গঙ্গাধর তাহার পিতৃদেবের ব্যক্তিগত সংজ্ঞা আর "তিলক" কথাটি তাঁহাদিগের আদিবংশ প্রবর্ত্তয়িতার ব্যক্তিগত সংজ্ঞা। ঐরূপ হরিপদ "বল" বা "ত্রাতা", রামহরি "বসু" বা "দত্ত" ইত্যাদি কথিত হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে 'হরিপদ' ও 'রামহরি' প্রভৃতি সংজ্ঞা উহাদিগের christian name এবং "বল" বা "ত্রাতা" এবং "বসু" ও "দত্ত" শব্দগুলি যথাক্রমে তাঁহাদিগের Surname। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইতেছে যে "বলবন্তরাও তিলক"নামা কোন ব্যক্তির এবং "হরিপদ" ও "রামহরি" যথাক্রমে "বল" বা "ত্রাতা" এবং "বসু" বা "দত্ত" নামা ব্যক্তি বিশেষের অধঃস্তন সন্তান। এইরূপ বীজী পুরুষের নামানুসারে উপাধির প্রচলন হইলে পর তৎপরবর্ত্তী যুগের সমাজতত্ত্ববিদগণ দেখিলেন যে পার্থক্য সংসূচিত করিবার জন্য সমাজের পক্ষে ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে; তজ্জন্য তাঁহারা এই রীতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া এই নিয়ম প্রচলন করেন যে, ব্রাহ্মণের নামান্তে "শর্ম্মা" বা "দেব", ক্ষত্রিয়ের নামান্তে "বর্ম্মা" বা "ত্রাতা" বৈশ্যের ও শূদ্রের নামান্তে যথাক্রমে "ধনবাচক ও দাস" শব্দ ব্যবহার বিধেয়। তাই যমসংহিতায় উক্ত হইয়াছে

শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতি দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাস শূদ্রবৎ কারয়েৎ॥

বর্ত্তমান ভৃগুোক্ত মনুসংহিতায়ও দেখিতে পাই

শর্ম্মবৎ ব্রাহ্মণস্যস্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্।

ব্রাহ্মণের শর্ম্মার্থ অর্থাৎ শর্ম্মা বা দেব, ক্ষত্রিয়ের রক্ষার্থ (বর্ম্মা বা ত্রাতা), বৈশ্যের পুষ্টার্থ (বসু, ভূতি, দত্ত) শূদ্রের পৈষ্যার্থ অর্থাৎ নিন্দিত দাস শব্দ ব্যবহার করাই বিধিসঙ্গত। বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রবাক্য অনুমোদিত উপাধিগুলি বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরাজমান—ব্রাহ্মণার্থ প্রতিপাদক "দেব" শব্দ তথাকথিত শূদ্রজাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ক্ষত্রিয়ার্থ প্রতিপাদক "বল" "পাল" "পালিত" "সূর" "সিংহ" চন্দ্র ইত্যাদি এবং বৈশ্য শোণিত সম্পর্ক বিঘোষী "বসু" "দত্ত" "নন্দি" প্রভৃতি উপাধিগুলিও বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের (বিশেষতঃ বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে) তথাকথিত শূদ্রজাতির মধ্যেই বহুলপরিমাণে প্রচলিত রহিয়াছে। সুদূর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বসবাস নিবন্ধন ও ভারতের বিভিন্নস্থানে পরিভ্রমণ করতঃ ভিন্ন ভিন্ন সমাজের লোকের সম্পর্কে আসিয়া আমরা ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে সমগ্র হিন্দুস্থানে বিশেষতঃ পাঞ্জাব, মথুরা, গয়া, বারানসী, উৎকল এবং বাঙ্গলা (১) ও বিকানীর প্রভৃতি দেশে ক্ষত্রিয়োচিত "চন্দ্র" "সিংহ"

"করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা চ গৌতমঃ।
আত্রেয়ো রথশর্ম্মা চ নন্দশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ।
কৌশিকো দাসশর্ম্মা চ পতিশর্ম্মা চ মুদ্গলঃ।

—সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সংস্করণ

প্রভৃতি উপাধিধারী ও বৈশ্যোচিত উপাধিবিশিষ্ট "দত্ত, সেন, গুপৎ (গুপ্ত), ধর, কর, নন্দী বহু ব্রাহ্মণের বসবাস রহিয়াছে। শাস্ত্রবাক্যশাসিত হিন্দুসমাজে এইরূপ উপাধিগত বৈষম্য ঘটিবার কারণ আমরা দেখিতে পাই। প্রথমতঃ পূর্ব্বকালে অনুলোম বিবাহজাত সন্তানগণ পিতৃস্বজাত্য ভজনা করিতেন এবং তাঁহাদিগের উপাধি পিতৃসদৃশ হইত। সুতরাং অনুলোমজের উপাধি তত্তৎ পিতৃবর্ণানুযায়ী হইত বটে কিন্তু মুখ্য ও গৌণ ভেদে কিছু তারতম্য ছিল (২)। তাই ব্রাহ্মণ হইতে অনুলোমক্রমেজাত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তান ও মুখ্য ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীতে জাত ব্রাহ্মণ) এই ত্রিবিধ ব্রাহ্মণের পার্থক্য সংসূচিত করিবার জন্য এই রীতি প্রচলন করেন যে দ্বিবর্ণসম্ভূত মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠগণ মাতৃ ও পিতৃকুলের উভয়বিধ উপাধি ব্যবহার করিবেন। এ কারণ আমরা বর্ত্তমান সময়েও দ্বিবর্ণ উপাধিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের সত্ত্বা দেখিতে পাই। বাঙ্গলার বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের করশর্ম্মা, ধরশর্ম্মা, নন্দিশর্ম্মা, পতিশর্ম্মা, পাঞ্জাব, মথুরা, গয়া, কাশী, বিকানীর ও উৎকল প্রভৃতি স্থানের দত্তশর্ম্মা, সেনশর্ম্মা, সিংহশর্ম্মা, গুপৎশর্ম্মা, ধরশর্ম্মা, করশর্ম্মা, চন্দ্রশর্ম্মা ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন। এইরূপ দ্বৈধীভাবাপন্ন উপাধি দেখিয়া মনে হয় যে উঁহারা সকলেই দ্বিবর্ণসম্ভূত তজ্জন্যই তাঁহাদিগের নামান্তে মাতৃকুলের ক্ষত্রিয়োচিত "চন্দ্র ও সিংহ" এবং বৈশ্যোচিত "দত্ত, ধর, কর" ইত্যাদি এবং পিতৃকুলের "শর্ম্মা" শব্দটি উপাধিস্বরূপ ব্যবহার করিতেছেন।

প্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজে মুখ্য ও গৌণভেদে পার্থক্য সংসূচিত করিবার জন্য যে রীতি প্রচলন হইয়াছিল ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয় সমাজেও ঠিক সেই রীতি গৃহীত না হইলেও, বর্ত্তমান ক্ষত্রিয় জাতির সাধারণ—"ধর্ম্ম, ত্রাতা, রাণা, রাও, সিংহ, খান্না, কপূর, টন্নন, মেহেরা, নেহেরা, তাড়োয়ার, মল,

(১) বাঙ্গলায় বৈদিকব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ধর, কর, রথ, নন্দি, পতি প্রভৃতি উপাধি বর্ত্তমান।

(২) মৎরচিত "অনুলোম বিবাহের উৎপত্তি ও প্রসার" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ৩৮৫ পৃঃ

ধাওয়ান" প্রভৃতি—বলসংযুক্ত ক্ষত্রিয়ার্থ প্রতিপাদক পদগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় যে, মুখ্য ক্ষত্রিয়গণ ঐ সকল উপাধি ধারণ করিতেন এবং গৌণ্য ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য ও উগ্রগণ পাল, পালিত ইত্যাদি ক্ষত্রিয় শোণিতসম্পর্ক বিঘোষী শব্দদ্বারা আপনাদের পার্থক্য সংসূচিত করিতেন। কেন আমরা এরূপ অনুমান করিতে অভিলাষী? কারণ বর্ত্তমান সময়ে ভারতে কোন স্থানে (অবশ্য আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি সন্ধান লইয়া যত দূর জানিতে পারিয়াছে) "পাল বা পালিত" প্রভৃতি (৩) উপাধিবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়জাতির সত্ত্বা দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক প্রাচীন বৈশ্যসমাজে মুখ্য ও গৌণ্যভেদে ঠিক এইরূপ রীতি প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা আমাদের এই যুক্তির সারবত্তা সপ্রমাণ করিব। যদি হরেকৃষ্ণ "বসু বা দত্ত" এরূপ কথিত হয় তাহা হইলে শাস্ত্রোক্ত বাক্যানুসারে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে হরেকৃষ্ণ "বসু বা দত্ত" মুখ্য বৈশ্যও হইতে পারেন অথবা গৌণ বৈশ্য করণ (৪) এই উভয়বিধ জাতি হইতে পারেন। কারণ ধনসংযুক্ত "বসু বা দত্ত" শব্দ উভয়বিধ জাতিতেই প্রযোজ্য। এইরূপ শব্দবিপর্য্যয়ে জাতিগত পার্থক্য ঠিক সংসূচিত হইতেছে না দেখিয়া পরবর্ত্তীযুগের সমাজতত্ত্ববিদগণ এই রীতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া এই নিয়ম করেন যে মুখ্য বৈশ্যগণই নামান্তে "গুপ্ত" শব্দ (৫) ব্যবহার করিবেন।

একারণ এখনও আমরা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ বনিকজাতির মধ্যে "গুপ্ত" উপাধিটি সীমাবদ্ধ দেখিতে পাই। দ্বিতীয় কারণ—প্রতিলোম বিবাহ (৬)। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এই প্রতিলোম বিবাহকে নিকৃষ্ট বিবাহ এবং ঐ সকল প্রতিলোমজাত সন্তানগণকে শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াও প্রখ্যাপিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রতিলোমজগণও গুণ ও কর্ম্মানুসারে উচ্চবর্ণে উন্নীত হইতেন, শাস্ত্রে ইহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই (৭)। সুতরাং পরবর্ত্তী যুগে তাহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যোচিত উপাধি ধারণ করিয়াছেন, ইহাও আমরা অনুমান করিতে পারি। আরও একটি কথা, প্রতিলোমজগণ শূদ্রধর্ম্মা হইলেও পিতৃকুলের উপাধিতে পরিচিত হইতেন। যেমন একালের মহাত্মা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মসমাজ ও মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠাপিত আর্য্যসমাজের কোন "সিংহ ও দত্ত" উপাধিধারী ক্ষত্রিয়

(৩) তবে পরবর্ত্তীযুগে ইহাও দেখিতে পাই যে "পালিত" আদি ক্ষত্রিয়শোণিত বিঘোষী শব্দ বৈশ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। "রাজন্য বিশাংবা" এই সূত্রের টীকায় মহামহোপাধ্যায় বৈদ্যকুলতিলক শ্রীপতি দত্ত তাঁহার কলাপ পরিশিষ্ট ৯২ পৃষ্ঠায় 'পালিত' আদি শব্দগুলিকে বৈশ্যোচিত উপাধি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

(৪) "শূদ্রাবিশোস্তু করণ" অমরকোষ।

(৫) "গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্য শূদ্রয়ো।" বৈশ্যগণ ব্যবসাবাণিজ্যদ্বারা সমাজ রক্ষা করিতেন বলিয়াই তাঁহাদের উপাধি 'গুপ্ত।"

(৬) প্রতিলোম বিবাহের বিষয় বারান্তরে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

(৭) শুক্রকন্যা দেবযানীর গর্ভে ও যযাতির ঔরসে যদুর জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবগণ যদু বংশে প্রসূত। জাতিতে সূত অতএব ইঁহারা শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু সেই শূদ্রযোনি শ্রীকৃষ্ণ কি কেবল গুণবলে ক্ষত্রিয়কুলে আসন পাইয়াছিলেন না? এখনও কি পনর আনা হিন্দু "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেছেন না?

ও বৈশ্য সন্তান ব্রাহ্মণতনয়ার পানিগ্রহণ করিলে তদ্ গর্ভজাত সন্তান "সিংহ ও বৈশ্য উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন।

তৃতীয় কারণ—হিন্দু সমাজের মধ্যে নির্গমণ অর্থাৎ উচ্চবর্ণ স্বকর্ম ত্যাগজনিত শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ালোপ হেতু ব্রাত্যতা বা শূদ্রত্ব গ্রহণ।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন অনেকে খৃষ্টিয়ধর্ম্ম গ্রহণ করায় বা অন্য কারণবশতঃ শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় Shelly Bonnerjee, হরিশ মুখোপাধ্যায় Harris Mokerjee, নরেশ পাল Noris Paul, মাখন সেন Maken Saynne প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াও বংশগত উপাধির মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তেমনি আর্য্যশাসনকালে সামাজিক নিষ্পেষণে, বৌদ্ধ ও মুসলমান রাজত্ব সময়ে শূদ্রাচার অবলম্বন করায় অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যসন্তান শূদ্র হইয়া যাইলেও তাঁহারা তাঁহাদের নামান্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যোচিত উপাধি ত্যাগ করেন নাই। তাই আমরা ঐ সকল উপাধি বর্ত্তমান তথাকথিত শূদ্রজাতির মধ্যে ঐ সকল উপাধি দেখিয়াই বাঙ্গালার রঘুনন্দন তাঁহার "শূদ্রাহ্নিকাচার" তত্ত্বে ধনসংযুক্ত "বসু" আদি শব্দ শূদ্রের নামকরণ হইবে এইরূপ লিখিয়াছিলেন (৮)।

চতুর্থ কারণ—আগমন অর্থাৎ বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে গুণ ও কর্ম্মানুসারে নীচবর্ণ উচ্চবর্ণে প্রবেশ লাভ করায় জাতিগত উপাধির যে কিছু বৈষম্য ঘটে নাই তাহাও আমরা বলিতে পারি না। এতৎসম্বন্ধে মংরচিত "প্রাচীন ভারতে জাতি বিভাগের উৎপত্তি ও প্রসার" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলে সামাজিকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি সংমিশ্রণের ফলে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে উপাধিবিভ্রাট ঘটিয়াছে, ইহা উল্লেখ করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমি যখন "প্রাচীনভারতে জাতিবিভাগের উৎপত্তি ও প্রসার" শীর্ষক প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মিরাট শাখায় পাঠ করি, উহার আলোচনাপ্রসঙ্গে তদানীন্তন সভাপতি অশেষ-শাস্ত্রবিৎ শ্রদ্ধেয় ৺ কালীপদ বসু বি, এ মহোদয় বলিয়াছিলেন "বাপুহে! প্রাচীন ভারতে গুণ ও কর্ম্মানুসারে উচ্চবর্ণ নীচবর্ণ ও নীচবর্ণ উচ্চবর্ণ প্রাপ্ত ত হইতেনই, কিন্তু পরানুগ্রহেও অনেক নীচজাতি উচ্চজাতি হইয়াছেন তাহার প্রমাণেরও অভাব নাই। দেখ! স্কন্দ পুরাণে আছে:—

"অব্রাহ্মণ্যে তদা দেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেষ্যভার্গবঃ।
স্বচাকং প্রবলং কত্তুং যজ্ঞসূত্রমকল্পয়ৎ॥
স্থাপয়িত্বা স্বকীয়ে স ক্ষেত্রে বিপ্রান প্রকল্পিতান।
জামদগ্ন্যস্তদোবাচ সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা॥"

তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে "পূর্ব্বকালের কথা ত ছাড়িয়া দাও বর্ত্তমান সময়েও ইহার অভাব নাই। দেখ, গত ১৮৯১ খৃঃ সেনসস্ রিপোর্টের সময় উক্তকার্য্যে আমি নিযুক্ত ছিলাম। ঐ সময়ে এই মীরাট ডিভিসনে "তাগা ও ভার্গব" জাতি যাহারা পূর্ব্বে অব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে পরিচিত ছিলেন তাহারাই তাগা ব্রাহ্মণ ও ভার্গব ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয় এবং তদবধি তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতেছেন এবং এখনকার ব্রাহ্মণ সমাজেও গৃহীত হইয়াছেন। দেখ! কেবল যে এই সকল দেশে এইরূপ হইতেছে তাহা নহে অন্যান্য প্রদেশেও ইহার অভাব নাই। দেখ! রিজলী সাহেবের গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছেঃ—

Members of other castes gaining admission into the Kayastha community some of these statements are curiously precise and specific. It is said for example, that a few years ago many Magh families of Chittagong settled in the western

(৮) শূদ্রাদীনাং নামকরণে বসু ঘোষাদিকপদ্ধতিযুক্ত নাম করণস্থ চ প্রতীয়তে, বৈদিক কর্ম্মণি শূদ্রানাং পদ্ধতিযুক্ত নামাভিধানং ক্রীয়তে।" ৫০৩ পৃঃ।

districts of Bengal assumed the designation of Kayastha and were allowed to intermarry with true Kayastha families. An extreme case is cited in which the descendants of a Tibetan missionery have somehow found their way into the caste and are now recognised as high class Kayastha.

আলোচনা প্রসঙ্গে আমার বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত এম, এস্-সি মহাশয়ও বলিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বগ্রামের (বরিশালের) কয়েকঘর বারুইজাতি কায়স্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আমরাও কোলাচল মল্লিনাথের' প্রতিদ্বন্দ্বী মহামহোপাধ্যায় ভরতসেন মল্লিক মহাশয়ের "চন্দ্রপ্রভা" পাঠে অবগত হই, যে মহারাজ বিমলসেন ভূমির রাজা ছিলেন; তাঁহার অধস্তন সন্তান নাথসেন শিখরভূমির অন্তর্গত পাহাড়খণ্ডের রাজা হয়েন। নাথসেনের পুত্র বিজয়সেন, বিজয়সেনের পুত্র রাজা চন্দ্রসেন। চন্দ্রসেনের রাজা চন্দ্রবান প্রভৃতি আঠারটি পুত্র হয়, তন্মধ্যে তাঁহার অষ্টপুত্র শূদ্রকন্যা বিবাহ করিয়া কায়স্থ হইয়াছেন (১)। আর কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও তদীয় "রাজমালা" গ্রন্থের একস্থানে লিখিতেছেন—

"বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গের আর একটি শ্রেণী, যাহারা ভদ্রলোকদিগের "সেবক" বা "ভাণ্ডারী" বলিয়া পরিচিত এবং শূদ্র আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে, তাহারা মুক্তকণ্ঠে আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। আদমসুমারির কর্ত্তাগণ ইহাদিগকে কায়স্থ শ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন। ত্রিপুরা জিলায় ইহাদের সংখ্যা প্রকৃত কায়স্থ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। চৌদ্দ গ্রামের পাল্কীবাহক বেহারাগণও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে"।—৪৭০ পৃঃ

ইহা ব্যতীত বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে যে কত সংমিশ্রণ-ব্যাপার নিত্য সাধিত হইতেছে ও হইয়াছে তাহাও চেতস্বান সামাজিকগণ অবগত নহেন। যাহা হউক যদি এই সকল উক্তির কোন মূল্য থাকে তাহা হইলে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে উপাধিবিভ্রাট ঘটিবার ইহাই অন্যতম কারণ।

বংশগত উপাধির উৎপত্তি ও উহার ক্রমপরিবর্ত্তনের বিষয় আমরা যাহা যাহা বলিলাম উহা হইতেই সামাজিকগণ তথ্য নির্ণয় করিয়া লইবেন। এখানে আমরা বিদ্যাগত বৃত্তি বা কার্য্যগত উপাধির বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বিদ্যাগত উপাধি।

প্রত্যেক সভ্য সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিদ্যাগত উপাধি গুলি জাতিনির্ব্বিশেষে ব্যক্তিবিশেষকে প্রদান করা হয়। কিন্তু ভারতীয় মধ্যযুগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যা হইতে সমাগত বিদ্যারত্ন, বিদ্যাভূষণ, শিরোমণি, বাচস্পতি, আচার্য্য, কবীন্দ্র, উপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায়, তর্করত্ন, বিদ্যাবাগীশ, শাস্ত্রী, ভট্টাচার্য্য, চোবে বা চতুর্ব্বেদী, দোবে বা দ্বিবেদী, ত্রিবেদী প্রভৃতি উপাধিগুলি ব্রাহ্মণবর্ণ (মুখ্য ও গৌণ) ব্যতীত অন্য কোন জাতিই ব্যবহার করিতে পারিতেন না। কি স্বার্থপরতা! এই পাপেই ভারত রসাতলাদপি রসাতলে গিয়াছে!! এই বিদ্যা হইতে সমাগত 'উপাধ্যায়' (বিভিন্নগ্রামে বসবাস নিবন্ধন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায় হইয়াছে মাত্র। গুর্জ্জর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে উপাধ্যায় উপাধিও বিরাজমান।) "আচার্য্য" মাদ্রাজে এই আচার্য্য শব্দের অপভ্রংশে "আচারিয়া" ভট্টাচার্য্য, চৌবে, দৌবে, ত্রিবেদী উপাধিগুলি কোন পূর্ব্বপুরুষ হইতে পুরুষানুক্রমে সমাগত হইয়া পরবর্ত্তীবংশে সঞ্চারিত হইয়াছে মাত্র। এই সকল অবান্তর উপাধিগুলির ব্যবহারে বংশগত উপাধিগুলি একেবারে

(১) "চন্দ্রপ্রভার" ২১০ পৃষ্ঠায় সংস্কৃত শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। স্থানাভাববশতঃ এখানে উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।

অন্তর্হিত হইয়াছে। বিদ্যা হইতে সমাগত উপাধি বংশগত উপাধিতে পরিণত হওয়া বোধ হয় ভারত ব্যতীত অন্য কোন দেশে হইয়াছে কিনা তাহার প্রমাণ অতীব বিরল।

বৃত্তি বা কার্য্যগত উপাধি—আর্য্যশাসনকালে শাস্ত্রোক্ত বৃত্তি গ্রহণ করায় যেমন একই জাতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছেন, তেমনি বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করায় ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বাংলার "শৌণ্ডিক" জাতির সাধারণ উপাধি সাহা, এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের "সাহাই" শব্দের প্রতি সামাজিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শৌণ্ডিকগণ জাতিতে বণিক বা সাধু তজ্জন্য উহাদিগের জাতিগত উপাধি "সাধুর" অপভ্রংশে "সাহা" বা "সা" কিম্বা "সৌ" অথবা "সাহাই" উপাধি বিরাজমান। এইরূপ আর একটি জাতি বংশপরম্পরায় লবণের ব্যবসা করিতেন বলিয়া উহাদিগের জাতিগত উপাধি "নুনিয়া" হইয়া গিয়াছে। এরূপ ব্যবসাগত উপাধি প্রচলনপ্রথা পাশ্চাত্য জগতেও বিরল নহে। উহাদিগের Smith, Blacksmith, Goldsmith প্রভৃতি উপাধি জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে!! যাহা হউক এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি উপাধি যেমন—"পাত্র," "মহাপাত্র" "মহোধিকারী" "সর্ব্বাধিকারী" "রায়" "মণ্ডল," "মহামণ্ডল," "চিতনভিস্," "মহালনবিশ," "ভাণ্ডারী" "ভাণ্ডার কায়স্থ," "পুরকায়স্থ," "শিকদার," "পাটাদার," "তরফদার" "সরকার," "চৌধুরী," "মল্লিক," "বিশ্বাস," "ভৌমিক," "হাজারী," "বকসি," "মজুমদার," ইত্যাদি রাজা বা নবাবপ্রদত্ত সম্মানসূচক উপাধিগুলি বিবিধজাতির মধ্যে বংশপরম্পরাক্রমে ব্যবহৃত হইয়া পরিশেষে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে বহুবিধ জাতির বংশগত উপাধি থাকা সত্বেও অবান্তর উপাধি দ্বারা নিজেদের পরিচয় প্রদান করেন। বাংলায় বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের (রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণও বৈদ্যের দীক্ষাগুরু) বংশগত উপাধি থাকা সত্বেও তাঁহারা সকলেই "ভট্টাচার্য্য" উপাধিতে বিভূষিত। বাংলার বৈদ্যগণ সেন, দেব, গুপ্ত, দত্ত, কর দাশ (১০) ইত্যাদি নানাবিধ বংশগত উপাধির সহিত "গুপ্ত" (১১) শব্দ যোজনা করিয়া দিয়া পরিচয় প্রদান করেন; আবার কেহ কেহ নষ্ট কুষ্টি উদ্ধার করিয়া বর্ত্তমান সময়ে নামান্তে "শর্ম্মা" শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। পক্ষান্তরে পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশের অনেক ব্রাহ্মণ "শর্ম্মা" বর্জ্জিত উপাধি ব্যবহার করিতেছেন! আবার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে একদম উপাধিশূন্য নামও অনেকে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন!!

ভারতে যেমন মূলবর্ণ চতুষ্টয় হইতে সহস্র সহস্র জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। তেমনিই প্রদেশ ও ভাষাগত পার্থক্যনিবন্ধন লক্ষ লক্ষ উপাধিরও সৃষ্টি হইয়াছে। সেগুলির সম্যক্ আলোচনা করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্রলেখকের পক্ষে অসম্ভব। আশা করি আমার ন্যায় সমানধর্ম্মা যদি কেহ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে এতদ্বিষয়ে হয়তো তিনি আরও তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন। যাহা হউক আমার সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ এই প্রবন্ধপাঠে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে বর্ত্তমানসময়ে হিন্দুসমাজের মধ্যে যে সকল বিভিন্ন উপাধিবিশিষ্ট লোক আমরা দেখিতে পাই উহাদিগের অধিকাংশই মূলতঃ অনার্য্য শূদ্র নহেন, পরন্তু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্ভূত।

শ্রীললিতমোহন রায়।

---

(১০) "দাস ও দাশ শব্দে প্রভেদ কি?" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

(১১) বাংলার বৈদ্যদিগের মধ্যে দুই একটি শাখায় "গুপ্ত" উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা বলেন যে "গুপ্ত" উপাধি তাহাদিগের বংশগত। অবশ্য উহা বংশগত উপাধি না হইতে পারে এমত নহে, তবে আমরা মনে করি যে উশনা যখন উহাদিগের (অম্বষ্ঠদিগের) বৃত্তি বাণিজ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তখন বৈশ্যোচিত "গুপ্ত" শব্দটি পার্থক্য সংসূচিত করিবার জন্য উহাদের নামান্তে ব্যবহৃত হইতেছে।

* * * * * *

যে দুঃসহ সংবাদ লইয়া আজ আমি 'নব্যভারতে'র পাঠকপাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত হইতেছি, তাহা ব্যক্ত করিতে আমার লেখনী থামিয়া যাইতেছে, হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। 'নব্যভারতে'র প্রাণ, কর্ম্মী প্রভাতকুসুম আর ইহজগতে নাই। বিগত ১২ই ভাদ্র, রবিবার, বেলা দশটার সময় তিনি দিব্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। সম্বৎসর পূর্ণ হয় নাই, ৺ দেবীপ্রসন্ন বৈদ্যনাথ ধামে দেহরক্ষা করেন। তখন কেহই ভাবেন নাই যে 'নব্যভারত' বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু যথার্থ যোগ্যপুত্র প্রভাতকুসুম পিতার এ কীর্ত্তি অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সাগ্রহযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। শুধু যে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন তাহা নহে—তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনায় নিরপেক্ষতা ও প্রবন্ধের উৎকর্ষতার জন্য 'নব্যভারত' সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। যেমনই, যত বড়ই কাজ হউক না কেন তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার এমন ক্ষমতা বাংলা দেশে সাধারণতঃ কাহারও মধ্যে দেখি নাই। বিধাতাও তাঁহাকে সার্থকতা ও সফলতা দ্বারা মণ্ডিত করিতেছিলেন। স্বকীয় বৃত্তিতেও তিনি প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দেশের কত কাজে হাত দিয়াছিলেন, কি অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রম তিনি করিতেন। কিন্তু তাঁহার মুখে কখনও অবসাদের ছায়া মাত্র লক্ষ্য করি নাই। ট্যাক্সি সমিতির সভাপতিরূপে তিনি কেমন সুযোগ্যতার সহিত ধর্ম্মঘটকারী ও কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে আপোষ করাইয়া দিয়াছিলেন! Prisoner's Aid Societyর সম্পাদকরূপে অন্যের উপেক্ষিত দেশের কতবড় একটা কাজ তিনি করিতেছিলেন! তিনি যেমন Labour Problem বুঝিতেন, খুব কম লোকই সেরূপ বুঝিতে পারেন। কত আশা তাঁহার ছিল, দেশের সেবা করিবার জন্য কত উপায়ই তিনি চিন্তা করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু হায়! মঙ্গলময়ের অলঙ্ঘ্য বিধানে তাহা আর কার্য্যে পরিণত হইল না।

যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিয়াছেন তাঁহারাই জানেন তিনি কিরূপ মিষ্টভাষী ছিলেন; তাঁহার হৃদয় কেমন কোমল ছিল, তিনি কিরূপ দেশভক্ত ছিলেন! আজ পঞ্চদশ বৎসর তিনি নীরবে, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কাজ করিতেছিলেন। প্রভাতকোরক প্রস্ফুটিত হইতে না হইতেই ঝরিয়া পড়িল। করুণাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক!

শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়

কেহ যদি তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া পাঠান আমরা সাদরে তাহা গ্রহণ করিব। দুই সপ্তাহের মধ্যেই যেন তাহা আমাদের হস্তগত হয়। 'নব্যভারত' রীতিমতই বাহির হইবে।

Yours truly

প্রভাত-স্মৃতি।

[প্রভাতকুসুমের অকালবিয়োগ, নব্য-ভারতের পৃষ্ঠায় শোকাশ্রুতে অঙ্কিত হইতেছে। পিতার কীর্ত্তিকে স্থায়ী ও উজ্জ্বল করিবার জন্য প্রভাতকুসুম যাহা করিয়াছেন, নূতন বৎসরের নব্য-ভারত তাহার সাক্ষী। নব্য-ভারতকে উন্নত করিবার জন্য প্রভাতকুসুমের মনে যে আগ্রহ ও সংকল্প ছিল, তাহা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারে জীবন্ত আছে। নব্য-ভারত যাঁহার প্রগাঢ় যত্নে পালিত ও অলঙ্কৃত হইতেছিল, তাঁহার স্মৃতিতে এমাসের পত্রের কিয়দংশ উৎসর্গীকৃত হইল।

যাঁহারা প্রভাতকুসুমের অসাধারণ ও অকৃত্রিম সৌহৃদ্যে মুগ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অনেক মর্ম্মস্পর্শী কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন; কিন্তু সকল লেখা পত্রস্থ করা অল্পপরিসর কাগজের পক্ষে সম্ভবপর নয়। যাঁহাদের করুণ বিলাপ ও সহানুভূতির কথা শোকার্ত্তদের প্রাণে প্রাণে মুদ্রিত রহিল কিন্তু পত্রস্থ হইল না, তাঁহারা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবেন না জানি. তবুও কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাদের অনুরাগ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিতেছি। শ্রীবিঃ]

স্মৃতি।

বিনামেঘে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইয়াছে। ৩৬৫ দিনের একটী একটী দিন করিয়া সাড়ে আঠার বৎসর ধরিয়া যাহা জমিয়া উঠিয়াছিল এক নিমেষে তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। সেই বাল্যজীবনে—এতদিন যাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম—একজন সঙ্গী আসিয়া জীবন-তরীকে যে ভিন্ন স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, যাঁহাকে আশ্রয় ও যাঁহার উপর নির্ভর করিয়া সংসার-স্রোতে নানাভাবে ভাসিতেছিলাম, আমার সেই নির্ভর, সেই আশ্রয় আজ ছিন্ন, ভগ্ন হইয়া গিয়াছে আজ আমি সংসার পথে একাকিনী! এক মুহূর্ত্তেই কয় বৎসর স্বপ্নে মিলাইয়া গেল।

কি বলিব! কি ভাবিব! আজ আমার মনের ভিতর সব ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। যেখানে অবিরাম ভালবাসার রস সঞ্চিত হইতেছিল, হঠাৎ তাহার বিরামে মন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। অতীত আজ চোখের সামনে স্বপ্নের মতন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আজ মনে পড়িতেছে, হঠাৎ সংসারের আহ্বানে বাল্য ক্রীড়া ফেলিয়া আসিয়া দেখিলাম, বুকভরা স্নেহ লইয়া, এই সংসার পথের দরজায়, এক সঙ্গী হাত বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শ্বশুরমহাশয় আমায় ডাকিয়া বলিলেন,—"তুমি তোমার ঐ ফুল্লনয়নে এমন কি অঞ্জন লেপন করিয়াছ, যাহাতে পৃথিবীর আর সকল সৌন্দর্য্য তোমার নিকট মলিন হইয়াছে, কেবল বালারুণের নিষ্কলঙ্ক কিরণ রঞ্জিত প্রভাত-কুসুম সকল সৌন্দর্য্যের সার হইয়াছে! তুমি ঐ মুখে কি দেখিয়াছ, আজ ব্যক্ত কর। তুমি কি সকল সৌন্দর্য্যকে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছ? ধীর ভাবে বিচার কর, চিরকালের জন্য পৃথিবীর আর সকল শোভা ভুলিতে পারিবে কি না? ঐ ললাটে তোমার অ-দৃষ্ট সুখ দুঃখ লিপি লিখিত আছে তাহা আজ পাঠ কর। এবং বিচার কর, তুমি আমার বাবার সহিত একাত্মক হইবার গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিতে পারিবে কি না?"

গুরুতর ব্রত গ্রহণের কথা শুনিয়া বালিকা-হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভীতচিত্তে চক্ষু

তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মাধুর্য্য-মণ্ডিত স্নিগ্ধ সেই দুই নয়ন যেন আমার উপর অমৃত বর্ষণ করিতেছে! সেই স্নিগ্ধ দুই চক্ষে ও বিশাল হৃদয়ে আমার মত অভাগিনীর জন্য কত যে স্নেহ প্রেম সঞ্চিত ছিল, তাহার পরিমাণ তখনও জানি নাই। সকল কথা ভাল বুঝিতেও পারিতাম না। কম্পিত পদে দুরু দুরু বক্ষে অগ্রসর হইয়া দেখি, সে বিশাল হৃদয়ে স্নেহরাশি উছলিত হইয়া উপচিয়া পড়িতেছে। ধরিবার জায়গা নাই!

সংসার তখন কি সুন্দর! পুষ্পাস্তীর্ণ পথে চলিতেও যদি বা ফুলের কাঁটা পায় বিঁধিয়া যায় শ্বশুর শাশুড়ী, সর্ব্বোপরি স্বামী যেন বুক পাতিয়া দিতেন। মানুষ কি এত পায়! না মানুষ এত দেয়?

বিবাহ কি, তখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই। তবে ইহা বুঝিলাম, এই সংসারে এমন একজন সঙ্গী পাইয়াছি, যিনি ভালবাসার অপেক্ষাও রাখেন না, পাওয়ার আগেই অজস্র দান করেন।

ইহাতেই একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেলাম। আনন্দে মগ্ন হইয়া ভাবিলাম বিধাতার কি অপার দয়া! বিনা সাধনায়, সর্ব্বরকমে অযোগ্যা আমি, আমার ভাগ্যে, আমা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, এমন প্রেমে উদ্বেলিত-হৃদয় স্বামী পাইয়াছি। ছেলেমানুষের মতন আত্মহারা-ভাবে মগ্ন হইয়া থাকিতাম।

এখন মনে হইতেছে, অল্প কয়দিনের জন্য বিধাতা অতি বড় সৌভাগ্যের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। আজ অস্বীকার করিব না, কত বড় মহৎ ও উদার হৃদয়ের অধিকারিণী হইয়াছিলাম মনে করিয়া মনে মনে কতদিন কত গর্ব্ব অনুভব করিয়াছি! কিন্তু হায়! আজ যে জীবনে এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই যে, সেই মহাপ্রাণ ইচ্ছামত বিকশিত হইবার জন্য কতই না প্রয়াস পাইয়াছেন! এই সবে আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া সেই বিকাশের আরম্ভের সূচনা করিতেছিলেন; "সাংসারিক নানা অসুবিধায় এতদিন ইচ্ছা মত চলিতে পারি নাই, এখন কি করিয়া নিজের জীবনকে উন্নত করিতে পারি, পরিবারকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারি ও মানুষকে কত ভালবাসিতে পারি দেখাইব।" কি আকুল আকাঙ্ক্ষা! ভাষার বোধ হয় শক্তি নাই সে আকাঙ্ক্ষার গভীর ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে পারে। কত জায়গায় কত লোক ভুল বুঝিয়াছে, তাহাতে দুঃখ করিয়াছেন, কিন্তু ফিরিয়া আঘাত করেন নাই বা বিদ্রোহী হন নাই। আমার মনে মনে একটা আনন্দ জাগিয়া উঠিতেছিল যে, এবার লোকে জানিতে পারিবে, বুঝিতে পারিবে, ঐ প্রাণটা কতখানি বড় ও ঐ অন্তরে কত প্রেমের ভাণ্ডার লুকান রহিয়াছে! কিন্তু বিধাতার এ কি কঠোর বিধান! বিকাশের আয়োজনের আরম্ভেই তাঁহাকে নির্ম্মম হস্তে তুলিয়া লইয়া গেলেন। এ সংসারে আর ফুটিতে দিলেন না! মনে বড়ই সংশয় হইতেছে, সত্যই কি ইহা বিধাতার বিধান!

হৃদয়টি তাঁহার এত কোমল ছিল যে, অনেক সময় কেহ কেহ তাঁহাকে নারীপ্রকৃতি বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। বাস্তবিকই সাধারণতঃ পুরুষের ভিতর এমন কোমল প্রকৃতি খুব কমই দেখা যায়। লোককে ভালবাসিয়া, আদর করিয়া, খাওয়াইয়া, মিষ্টকথা বলিয়া কি তৃপ্তি পাইতেন যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াছেন সকলেই জানেন। সম্প্রতি সেই ভাব বাড়িয়া চলিয়াছিল।

তাই তাঁহার জীবনের নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিতেছিলেন। বুঝিবা বিধাতা তাহা পূর্ণতর করিবার জন্যই ডাকিয়া লইয়া গেলেন!

পরিচিত অপরিচিত যাহারই সঙ্গে তাঁহার কথা হইয়াছে কি মধুর সম্বোধন করিতেন! কথা ও কি সুন্দর ভাবে বলিতেন! ভৃত্যদিগকে কি স্নেহের আহ্বানে ডাকিতেন! বাবা ভিন্ন সম্বোধন করিতেন না। বাজারে গিয়াছেন—বাজারে যাওয়ায় তাঁহার একটা আনন্দ ছিল—দাদা বাবু তাদের সকলের! ভৃত্যেরা বাড়ী আসিয়া বলিয়াছে, তিনি বাজারে গেলে কে তাঁহাকে কোন জিনিস দিবে ব্যস্ত হইয়াছে। দুঃখী গরীব লোকের জন্য মনে একটা খুব সরস সস্নেহ ভাব ছিল। বলিতেন "ওদের কাছে যেমন প্রাণ পাওয়া যায় আমরা সেইরূপ প্রাণের পরিচয় দিতে পারি না।" একবার আমরা ষ্টীমারে সুন্দরবন দিয়া ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত যাই। তখন সেই ষ্টীমারের খালাসীদের নিয়া কি যে করিতেন! প্রায়ই ওদের বালতি ভরা ভরা মাছ কিনিয়া দিতেন। একদিন এক ষ্টীমার-ষ্টেশনে একজন লোক দুইটা খুব বড় বড় চিতল মাছ আনিয়াছিল। দুইটি মাছে আধমণের উপর হইল। দুইটা মাছই কিনিলেন, বলিলেন "বেচারীরা সর্ব্বদাই ছোট ছোট মাছ খায়, বড় মাছ কিনিয়া খাইতে পায় না, আমরা খানিকটা নিয়া বাকী মাছটা ওদের দিয়া দিই, কি বল?" বলিয়া খালাসীদের মাছ দুইটা দিলেন ও খাওয়ার পরে—"কি হে কেমন মাছ খাইলে?" বলিয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন। কলিকাতা পৌঁছিবার আগের দিন একটা ভেড়া কিনিয়া তাদের দিয়া বলিলেন "তোমরা সকলে মিলিয়া খাইও।" যখন আমরা চলিয়া আসি খালাসীদের কি দুঃখ। তার পরে কতদিন যখনই সেই ষ্টিমারটা কলিকাতায় আসিত সেই খালাসীরা তাঁহাকে দেখিতে আসিত।

এবার বাড়ীর সামনের রোয়াক ভাঙ্গিয়া সমান করিয়া নিয়াছিলেন। আশা ছিল,—বলিতেন—"এখানে আমার (taxi driver) মটরচালকদের সভা (meeting) করিব millhandsদের সভা করিব। তাদের ও কাছাকাছি চারিধারের লোকদের ম্যাজিক লণ্ঠন দেখাইব।" কত কি করিব, কত আশা আকাঙ্ক্ষা! কত সময় বলিতেন—"জান, আমার বয়স বেশী হইলে practice ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতার কাছাকাছি কোন জায়গায় থাকিব! সেখানে আমাদের বাড়ী—যত গরীব দুঃখীর মা-বাপের বাড়ী হইবে। কত লোক আছে, যাদের দেখবার কেউ নাই, আমরা তাদের ঔষধ দিব, মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইব। তাদের দুঃখ কষ্ট যতদূর পারি দূর করিব। তাদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে, একটু আধটু লেখাপড়া শিখাইতে, culture দিতে চেষ্টা করিব। কি বল?" এইরূপ কত কল্পনায় জল্পনায়, কত রাত যে, তাঁর ভোর হইয়াছে। আজ যে কত গরীব দুঃখী জেলে দোকানী পসারী পানওয়ালা—কত নাম করিব তাঁর জন্য কাঁদিয়া আকুল হইতেছে! মিস্ত্রীরা আসিয়া কাঁদিতেছিল আর বলিতেছিল 'কাজ অনেক করিয়াছি এমন মনিব দেখি নাই।' ঐ সহানুভূতি হইতে কয়েদী সাহায্য সমিতির (Prisoner's aid society) কাজ নিয়াছিলেন। সেটা যে তাঁর কত বড় প্রিয় কাজ ছিল! জেল পরিদর্শক (Jail visitor) হওয়ার পর বলিয়াছেন, "হয়তো এ কাজে পরে মেয়েদেরও দরকার হইতে পারে। যদি হয় তোমাকে কিন্তু আমার সঙ্গে নিব।"

কাহারও জন্ত কিছু করিতে পারিলে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেন। তাহাতে তাঁহার বড় ছোট জ্ঞান ছিল না। কাহারও মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়াছেন, আর কথা নাই, সেখানে গিয়া হাজির। অর্থ, সামর্থ্য কোনটীরই কোন দিন কৃপণতা করেন নাই। কাহারও বাড়ী বিয়ে বা কোন উৎসব, সাজান হইবে খাওয়ান হইবে একবার তাঁহাকে বলিলেই হইল। আর কাহারও ভাবিবার দরকার নাই। যে কোন কাজ হাতে নিয়াছেন কি শৃঙ্খলা ও নিপুণতার সহিত করিতেন। বড় বড় বিষয়ের (organisation) সুব্যবস্থা হইতে রান্নাঘরের রান্না কোনটীতেই নিপুণতার এতটুকু অভাব ছিল না। লোক জন বাড়ীতে খাইবেন নিজে কি আগ্রহ করিয়া রান্না করিতে যাইতেন! রান্না করিয়া আদর করিয়া খাওয়াইতে কি ভালই না বাসিতেন! যেমন প্রেমপ্রবণতা তেমনি কর্ম্মপ্রিয়তা! কাজ ছাড়া থাকিতেই পারিতেন না। আর কি খাটিতেই না পারিতেন! ধনের প্রতি তাঁহার কোন দিনই আসক্তি দেখি নাই। বলিতেন "আমি টাকা পয়সাকে "খোলাম কুচির" মতন জ্ঞান করি।" বাস্তবিক করিতেনও তাহাই। তাঁহার গোপন দান কতছিল! কত ছেলেকে পড়ান, কলেজের বেতন দেওয়া, বই দেওয়া, কত করিতেন। কেহ অভাবে পড়িয়া চাহিলে কখনই ফিরাইয়া দেন নাই। কত সময় কত দান করিয়াছেন আমিও জানি নাই। পরে তাদের বা অন্যের নিকট শুনিয়াছি। দান করিয়া বলিতে ভাল বাসিতেন না।

স্বদেশীর যুগে জাতীয় বয়ন বিদ্যালয়ে ও ১৯০৬ সালে যখন শিল্পপ্রদর্শনী হয় তখন ও গত দুইবার Congress Pandalএ কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করিয়াছেন! গতবৎসরের Congress Pandal তিনি না হইলে এত অল্প সময়ে হইয়া উঠিত হইত কি না সন্দেহ একথা অনেকে বলিয়াছেন। ২০ দিন কি অসম্ভব খাটুনীই না খাটিয়াছিলেন! সেখানে কতদিন সেখানকার কনট্রাক্টারদের সঙ্গে তাঁহাদের রুটি তরকারী খাইয়া রহিয়াছেন। তাহাদের সঙ্গে কাজ করিয়া তাদের ও নিজের লোকের মতন করিয়া ফেলিয়াছিলেন! কয় রাত তো একেবারে ঘুমান নাই। যে কাজ লইতেন, তাহাতে একেবারে ডুবিয়া যাইতেন। বলিতেন "যে কোনরূপ কাজ হউক, ভাল করিয়া, সুন্দর করিয়া না করিলে আমি যেন তৃপ্তি পাই না।" চিঠিপত্র বা মোকদ্দমার কাগজ (Brief) যে লিখিতেন, রাশি রাশি কাগজ লিখিয়া গিয়াছেন কোথাও একটু অপরিষ্কার বা কালিপড়া বা যা তা করিয়া লেখা একটুও নাই। মনে হয় যেন সমানে সব জায়গায় ধরিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে লিখিয়াছেন। কলাবিদ্যার (Fine arts) উপর খুব অনুরাগ ছিল। ছবি আঁকা ফটো তোলা খুব সুন্দর পারিতেন। নানা কাজে আজকাল ছবি আঁকিতে ও ফটো তুলিতে প্রায় সময় পাইতেন না, কিন্তু উহার চর্চ্চা করিতে খুব ভালবাসিতেন। আজ ২০ বৎসর Photographic Societyর সভ্য আছেন। যখনই সময় পাইয়াছেন ওখানকার (Competition) প্রতিযোগিতায় ছবি দিয়াছেন। দুইতিনবার পুরস্কারও পাইয়াছেন। কোথায় কোন লাইন, কোথায় কোন shade, কত ক্ষুদ্র জিনিসে ও যে সৌন্দর্য্য দেখিতেন তাহার সীমা নাই। Engineeringএর দিকেও বেশ অনুরাগের পরিচয় দিতেন। বাড়ীটাতে কত জায়গায় বদ্‌লাইয়াছেন সমস্তই নিজে একা করিয়াছেন। কাহারও সাহায্য নেন

নাই। Albert Hallএর একটি Plan করিয়াছিলেন সেটী সম্পূর্ণ নিজের মস্তিষ্ক-প্রসূত। ডাক্তারীর উপর তো একটি প্রবল আসক্তি ছিল। রোগীর সেবার হাতটাও বড় কোমল ও আরামদায়ক ছিল। কত ডাক্তারী বই যে কিনিয়াছেন ও পড়িয়াছেন! Medical Collegeএর উপরের classএর ছেলেদের পাইলেই ডাক্তারীর আলোচনায় বসিয়া যাইতেন। আমি কত সময় বলিয়াছি—'তোমার ব্যারিষ্টার না হইয়া ডাক্তার হওয়াই ছিল ভাল।' বলিতেন—"আগে বুঝিতে পারি নাই, নতুবা ডাক্তার হইলে বোধ হয় ভালই হইত। কত ইচ্ছা করে এ শাস্ত্রের কিছু কিছু সহজ করিয়া লিখিয়া সাধারণের জন্য ছাপাই। এবার নব্যভারতে এটা করিব।" এই সমস্তই তাঁহার জ্ঞানানুরাগের পরিচায়ক। তাঁহার লাইব্রেরীটী যেমন জ্ঞানের প্রতি অনুরাগের তেমনি কর্ম্মনিপুণতার ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার বিশেষ নিদর্শন। উহা তাঁহার সমব্যবসায়ী সকলেরই গৌরবের জিনিস ছিল!

কি সন্তানবৎসল পিতা ছিলেন, সন্তানদের উপর তাঁহার কি অতুলনীয় স্নেহ ছিল তাহা অবর্ণনীয়। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে একটী সন্তান বাহিরে গিয়া অসুস্থ হয়। যদিও ভয় পাওয়ার মতন তেমন কিছু হয় নাই তবুও আমি ভীত হইয়া টেলিগ্রাম করি। রাত দশটার সময় সেই টেলিগ্রাম আসে। তখন আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া খাওয়া দাওয়ার পর শুইয়াছেন। টেলীগ্রাম পাইয়া তখনই বাহির হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার ঠিক করা ও তাঁহার নির্দ্দেশ মত ঔষধপত্রাদি কিনিতে কিনিতে রাত প্রায় শেষ হইয়া যায়। সকালে ডাক্তার নিয়া রওয়ানা হইয়া যান। পীড়া তত মারাত্মক হয় নাই, আমি তাই নিজেকে একটু সঙ্কুচিত বোধ করিয়াছিলাম। শ্বশুর মহাশয় ও আমাকে অনুযোগ দিয়া চিঠি লিখিলেন। তিনি বলিলেন "কেন তুমি সঙ্কুচিত হইতেছ? অসুখ বেশী হয় নাই ভগবানের অশেষ দয়া। বেশী তো হইতে পারিত। কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইও না। যখনই ভয় পাইবে আবার টেলিগ্রাম করিবে।" এই আসা যাওয়া ডাক্তার খরচে তাঁহার সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল! কোন দিনও ইহার জন্য এতটুকু দুঃখিত হন নাই। পাছে শ্বশুর মহাশয় জানিলে আমাকে কিছু বলেন সেই জন্য ইহা ঘুণাক্ষরেও কাহাকেও জানিতে দেন নাই। আজ মনে হইতেছে কে আর এমন করিয়া ভাবিবে বা করিবে। এই কয়দিন পূর্ব্বে ছোট ছেলেটীর ডিপথিরিয়া হইয়াছিল—সে দিন কোর্টেএ বিশেষ কাজ, না গেলেই না হয়, তবুও যাইতে দেরী হইয়া গেল। গিয়া কাজের বন্দোবস্ত করিয়া এক ঘণ্টার ভিতর ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসিয়া বলিলেন "এই এক ঘণ্টা—পথে আধ ঘণ্টা ও কোর্টে আধঘণ্টা যে কি করিয়া কাটাইয়াছি বলিতে পারি না। আমার যেন সময় আর পথ ফুরাইতে ছিল না।" দুই দিন পর আবার একদিন সে দুপুরে খুব বেশী অস্থির হইয়া পড়ে। আমি ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে আসিবার জন্য বলিতে খোকাকে অফিসএ পাঠাই। তিনি তখনই চলিয়া আসেন। বিকালবেলা আমাদের এক আত্মীয় আসিয়া আমাকে বলিলেন, "এরূপ করিয়া officeএ খবর পাঠাইবেন না। আমি তখন সেখানে ছিলাম, তিনি যে কি ব্যস্ত হইয়া আসিলেন বলিতে পারি না। এমন করিয়া ব্যস্ত করিতে নাই।" আজ শুধুই মনে হইতেছে, আমি নিজে কোন বিষয় ভাল বুঝিনা বলিয়া সকল বিষয়ে তাঁহাকে কি ব্যস্ত কত বিরক্তই না করিয়াছি! কিন্তু কোনও দিনই বিরক্ত হন

নাই। কিন্তু আজ সেই চিন্তা কোথায় গেল? ছেলেদের একটু কান্না শুনিলে যে অস্থির হইয়া যাইতেন আজ সেই ব্যাকুলতা কোথায় গেল? আজ যে তাঁহার অবুঝ শিশুরা "বাবা কোথায়? বাবা কখন আসিবে?" বলিয়া অস্থির করিয়া তুলিতেছে। তাঁহার সঙ্গে না হইলে যে তাদের খাওয়া হইত না আজ এই সব তিনি কি করিয়া নির্ব্বিকার ভাবে সহিয়া আছেন? আফিস হইতে ফিরিয়া কাপড় ছাড়ার সবুর হইত না, একটী পিঠে একটী কোলে নিয়া বসিলেন। কখনও কাঁধে নিয়া বেড়াইতেছেন। একটু ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই। কি আনন্দই না তাহাতে পাইতেন! খোকা বড় হইতেছে এবার matric পাশ করিয়াছে কি যে তাঁহার আনন্দ হইয়াছিল বাড়ীতে তাকে laboratory করিয়া দিব, তার জন্য কত কি করিব! তারপর তাকে নিয়া তুমি আমি বিলাত যাইব। কত কি কল্পনা! খুকুমা বলিতে যেন অজ্ঞান হইয়া যাইতেন। কতদিন আমি মুগ্ধনেত্রে তাঁহার খুকুর প্রতি আকর্ষণ চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি। অসুখে পড়িয়াও সমানে খোঁজ নিয়াছেন ৯টা বাজিয়া গেল কিনা, Babyর পড়া হইয়াছে কিনা, সে স্কুলে গেল কি না? যাওয়ার ঘণ্টা আগেও যে তাকে তার পড়া হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কে আর এখন এমন আকুল আগ্রহে খোঁজ লইবে? তামাসা করিয়া কত সময় বলিয়াছি "খুকু যেন তোমার নেশা।"? সর্ব্বদাই বলিতেন"ছোট্কুকে হারাইয়া ওকে পাওয়ায় আমি ওর মায়ায় একেবারে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। এক এক সময় মনে হয়, ও যখন বড় হইবে, শ্বশুরবাড়ী যাইবে, আমি ওকে ছাড়িয়া কি করিয়া থাকিব? ওযে আমার কত বড় গর্ব্বের জিনিস!! ওকে Cambridge এ পাঠাইয়া পড়াইবেন কত কিছু আশা যে করিয়া রাখিয়া ছিলেন! হায়! সে সব আশাই যে এমন করিয়া শূন্যে মিলাইবে কখনও যে স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই।

তাঁহার অসুখের সময় খুকু তাঁহার জন্য কত যত্ন করিয়া স্কুলের পথে নামিয়া কয়টা আপেল ও নাসপাতি কিনিয়া আনিয়াছিল! সে বেচারী তো জানেনা কি খাইতে পারেন আর না পারেন নিজের মনে যা ভাল মনে হইয়াছিল,আনিয়াছিল। আমি তাকে বলিয়াছিলাম"খুকু তুমি কিজান না বাবা কি ফল খান?" একথাটী বলাতে তিনি খুব দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"বেচারী ছেলেমানুষ কি জানিবে? মাগো তুমি যে অত করিয়া আনিয়াছ তাতেই বাবার খাওয়া হইয়াছে।" বলিয়া তাকে যে কত আদর করিলেন! এখন সব কথাতেই অশ্রুজল বাধা মানিতে চাহেনা, মনে হয় ওই যে ক্ষুদ্র মনের বিকাশ হইবার যে আদরের জায়গাটী খালি হইয়া গেল তাহা কে পূরণ করিবে?

ছোট ছেলেটীর কথা বলিয়া বলিতেন "বড়কুবাবাকে আমি নিজে পড়াই নাই তাই এখন বড় দুঃখ হয়। আমি পড়াইলে সে পড়ায় আরো ভাল হইতে পারিত। সুনুবাবার বেলায় আর এভুল করিব না, তাকে আমি নিজে পড়াইব। ছোট মেয়েটীর কথায় বলিতেন, টুনটুনের মন বড়ই কোমল। তাহাকে মানুষ করিতে কিন্তু আমাদের খুব সাবধান হইয়া চলিতে হইবে। আজ কি সবই তাঁহার চিন্তার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে?

যখন ছেলেরা বড় হইবে সে কি সুখের দিন বলিয়া কত কল্পনা করিতেন! সেই সব কল্পনা আজ কোথায় মিলাইয়া গেল! কত বলিতেন, আমি বুড়ো হইলেও দেখো কখনই বুড়ো হইবনা আমি চিরকাল এম্নি যুবাই থাকিব। সে কামনা ভগবান এ কি ভাবে পূর্ণ করিলেন!

যেমন নিজের ছেলেদের তেমনি আত্মীয় স্বজনদের ছেলেদের উপর ও কি স্নেহ ছিল! যুবক সম্প্রদায়ের জন্য ঐকান্তিক গভীর প্রীতি ও স্নেহ ছিল। তিনি সকলের দাদা ছিলেন। শুধু মুখের নয়, সত্যই তিনি নিজেকে তাদের বড় ভাই বলিয়া মনে করিতেন। তাই তাদের জন্য কি যে করিবেন ভাবিয়া পাইতেন না। বাড়ী নূতন করিয়া মেরামত করিতেছেন তাহার মধ্যে ছেলেদের একটা ঘর বা ছাদের দরকারটা তাঁর মনে বিশেষ ভাবে জাগরূক ছিল। "তাঁদের যখনই দরকার, আমার গৃহ তাদের জন্য উন্মুক্ত। খবরের কাগজ রাখিব, তারা আসিয়া পড়িবে, আড্ডা দিবে, যাহা ইচ্ছা করিবে যেন নিজের বাড়ীর মতন ভাবিতে পারে। তুমি মধ্যে মধ্যে একটু আধটু চা খাবার ইত্যাদি দিও।" আজ যে কতজন তাঁহাদের অগ্রজ-হারা হইয়া সংসারে নিজেকে আশ্রয়হীন মনে করিতেছেন ও অশ্রুজলে ভাসিতেছেন তাহা কি তাঁহার মনে একটুও বাজিতেছে না?

বন্ধু-প্রীতির কথা আর কি বলিব! হৃদয়টাই অত্যন্ত কোমল ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। যাহাকে পাইতেন হৃদয়ে ধরিতে চাহিতেন। বন্ধুদের তো কথাই নাই! এই অল্পদিন পূর্ব্বেই তাঁহার এক প্রাণ-প্রিয় বন্ধু রুগ্ন শয্যায় শুইয়াছিলেন, অসুস্থ হওয়ার একদিন পূর্ব্বেও তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার জন্য তাঁহার যে কত চিন্তা ভাবনা আকুলতা দেখিয়াছি। বাল্যকালের বন্ধুদের কথা, সেই সময়ের কত স্মৃতির কথা বলিতে বলিতে তাঁর বুক ভরিয়া উঠিত! কেহ একটু ভালবাসা বা সহানুভূতি জানাইলে একেবারে গলিয়া যাইতেন, তাঁহার জন্য তাঁহার কোন কাজ অসাধ্য ছিল না। পিতার বন্ধু হিসাবেও যাহাকে যাহা বলিয়া ডাকিয়াছেন, তাহাদের ঠিক তাহাই বলিয়া ভাবিয়াছেন। নিজের আপনার জন হইতে বেশী ছাড়া কম করিয়া দেখেন নাই। আজ সেই সবই কি এত সহজে তুচ্ছ করিতে পারিলেন! তাঁহাদের যে আজ ডান হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে আজ কেহ পুত্রশোকে কাতর হইয়া কেহ কনিষ্ঠ সহোদর হারাইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন তাহা কি দেখিতেছেন না?

চরিত্রবল তাঁহার যে কতখানি ছিল বাহিরে অনেকে তাহার পরিচয় পাওয়ার বিশেষ সুযোগ পান নাই। জীবনে যে সংযম দেখিয়াছি সাধারণতঃ বেশী লোকের তাহা দেখা যায় না।

সর্ব্বদা সব কাজে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিস ব্যবহার করিতে ভাল বাসিতেন। প্রথম শ্রেণীর জিনিস ভিন্ন মন উঠিত না, অন্তরও সেইরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে পূর্ণ করিতে চাহিতেন। প্রায়ই দেখিয়াছি লোকের সমালোচনা করিতে গিয়া সর্ব্বদা লোকের ভাল দিক দেখিতে চেষ্টা করিতেন।

নব্যভারত যেন তাঁর নেশার মতন হইয়া উঠিয়াছিল! আগামী বৎসর নব্যভারতের চল্লিশবৎসর হইবে তাহাকে নূতন সাজে সাজাইয়া কত রকমে উন্নতি করার ইচ্ছা ছিল। বলিতেন "যদি আমার একটী অযোগ্য ভাই থাকিত, তাহাকে তো খাওয়াইতে পরাইতে যত্ন করিতে হইত। নব্যভারতকে আমি তাহাই ভাবি। ইহাকে মরিতে দিব না। অসুখের ভিতর নব্যভারতের Proof নিয়া কি ব্যস্ত হইয়াছেন! "কতটা ছাপা হইল! ১৫ই বাহির হইবে তো? দেখো যেন আমায় ভুল বুঝাইওনা।" সমানে বলিয়াছেন। মনস্থির করিয়া বসিতে পারি না তবুও তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া এক একবার Proof

নিয়া বসিয়াছি। আজ তো আর সেই তাড়াও পাইতেছি না, সেই আগ্রহের অনুরোধ শুনিতেছি না।

নব্যভারতের প্রবন্ধ বাছাই (Selection) করিবার সময় যদি আমি সাম্‌নে বসিয়া রহিয়া পড়িয়া পড়িয়া শোনাইয়াছেন। দুজনে দুজনকে সাহায্য করিতেছি এই আনন্দে শিশুর মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। যদিবা গৃহকার্য্যে বা অন্য কোন কাজে উঠিয়া যাইতে চাহিয়াছি কি দুঃখিত হইয়াছেন বলিবার নয়।

সঙ্কলিকা নব্যভারতে থাকা উচিত আমি বলিলাম। তিনি বলিলেন "বাবার মতন কি আ আমার লেখা হইবে? বাবার গৌরব বাবারই থাক্. আমার ওতে হাত দিয়া কাজ নাই। আমি বলিলাম "না-ই বা ভাল হইল, তুমি লেখ ত; ভাল না হয় না দিলেই হইবে।" তারপ তো লিখিলেন। ভালই হইয়াছিল। ভাল বলাতে সে কি তৃপ্তি, আজও আমার মনে হই চোখে জল আসিতেছে। যখন ছাপা হইয়া আসিল বার বার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বা বারই বলিতে লাগিলেন, "তুমি সত্যিই বলিতেছ, বেশ হইয়াছে?" আমি তাঁহার উচ্ছ্বসি আনন্দ দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলাম। এমন ছেলে মানুষী দেখি যেন আমার স্নেহ উথলিয়া উঠিল, চোখে মুখে বোধ হয় কিছু প্রকাশ পাইয়াছিল। তি আনন্দে গদগদ হইয়া বলিলেন—"দেখ নলিনি, আমার বড় দুঃখ হয় তোমরা তোমাদের নিজেকে জান না। তোমরা যে পুরুষকে কি শক্তি দিতে পার, ঐ একটু কথায়, ঐ একটু দৃষ্টিতে তা যদি তোমরা জানিতে, তবে আমরা যে কত বড় হইতে পারি, তাহা বলিবার নয়।" আ মনে হইতেছে একটু সামান্য কথায় বা দৃষ্টির পরিবর্ত্তে যে কতখানি হৃদয় পাইতাম তাই বি গর্ব্ব হইয়াছিল? তাই কি তাহা চিরদিনের মতন কোথায় হারাইয়া ফেলিলাম!

বাড়ীর ছোট খাট কাজ করিতেও কি আনন্দ পাইতেন! সময়ে কুলাইত না তাই রবিবারটীতে বাড়ীর কত কাজ করিব বলিয়া রাখিয়া দিতেন! সমস্ত কাজই বি নিপুণতার সঙ্গে করিতেন! এবং সেইজন্যই সব কাজই নিজ হাতে করিতে ভালবাসিতেন অন্য কাহাকেও দিয়া বিশ্বাস বা নির্ভর ছিল না! ঘরে ছবি টাঙ্গাইবেন তাও নিজে কিন্ত সাম্‌নে আমাকে থাকিতে হইবে। খুঁটি নাটি কাজ করিবেন আমি সাম্‌নে থাকিব ইহাতে কি তৃপ্তি পাইতেন বলিবার নয়। যদি একটু সেখান হইতে নড়িয়াছি অভিমানে ভরিয়া উঠিতেন! আজ তাই ভাবিয়া পাই না সেই এত অল্পে অভিমানী লোক কি করিয়া এমন দূরে যাইতে পারিলেন! ইহা তো তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না! প্রায়ই বলিতেন "আমি তোমায় যেমন ভালবাসি তোমার নামে তোমার কথা মনে হইলে যেমন পাগল হইয়া উঠি আমার জানিতে ইচ্ছা হয় সকলের কি এমন হয়! আমার মনে হয় আমার বয়সে হিসাবে উচ্ছ্বাস বোধ হয় বেশী। আমার ও অনেক সময় তাহা মনে হইত। উচ্ছ্বাসের মাত্রা সময় সময় এত বেশী হইয়া পড়িত যে আমি বাধা দিতে বাধ্য হইতাম! একটু বাধা দিলে সেই মুখখানি, সেই আনন্দে উজ্জ্বল চোখ দুটী কি বিষণ্ণ কি ম্লান হইয়া পড়িত! আজ তাহা মনে পড়িয়া তীক্ষ্ণ শেলের মতন বুকে বিদ্ধ হইতেছে। না বুঝিয়া কত আদরের সমাদর করি নাই, এমন কি অনাদর করিয়াছি। তাহা যে এইখানেই শেষ হইবে তাহা তো স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই।

ব্যস্ত হইয়া আমাদের এখান হইতে পাঠাইয়া দিলেন ও বাড়ী মেরামতে লাগিলেন। কি কি করছ যদি জানতে চেয়েছি—লিখেছেন "এসো, দেখবে একেবারে (surprise) আশ্চর্য্য করে দেবো।" আসিয়া বলিলাম "এ—করেছ কি? এক বৎসরও হ'ল না এতটা না—ই করিতে?" বলিলেন—"বলোনা, বলোনা তুমি ও কথা বলোনা। আর যে যা বলে বলুক, আমি কার জন্যে করিয়াছি? কেন করিয়াছি? তোমারই জন্য অনেক আশা বুকে করিয়া করিয়াছি। তোমার জন্য এতদিন কিছুই করিতে পারি নাই—মনে বড় দুঃখ ছিল। এবার তোমায় দেখাইব যে ভোগ করিতেও জানা চাই। যে ভোগ করিতে জানে না, তার ত্যাগে মহত্ব নাই। তার ত্যাগ ত্যাগই নয়। আমার বড় ইচ্ছা ছিল সব কাজ শেষ করিয়া, ঘর মনের মতন করিয়া সাজাইয়া আমার হৃদয়ের রাণীকে আনিয়া অভ্যর্থনা করিব। কিন্তু শেষ হওয়ার আগেই তোমরা আসিয়া পড়িলে। প্রায়ই বলিতেন এখন হইতে প্রায়ই দুদশ জন করিয়া বন্ধুদের ডাকিব তুমি তাহাদের আদর যত্ন (entertain) করিবে। আমি কিন্তু আমার ঘরে কাজেই থাকিব, মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া যাইব, আর ভাবিব, "ঐ যে তুমি সকলকে ভালবাসিতেছ, আদর করিতেছ, সেই স্নেহের উৎস কোথায়? তাহার মূল আমাতে। উহা কেবল আমার, কেবল আমার একার, উহার সবখানি শুধু আমারই, উহাতে তোমার নিজের বলিয়া কিছুই নাই।" কতদিন এই একই কথা বার বার কত বারই যে বলিয়াছেন! এমন আবেগে উচ্ছ্বাসে বলিতে থাকিতেন, আমি তন্ময় হইয়া ডুবিয়া যাইতাম। কতবার বলিয়াছেন, "স্বর্গ কি আর অন্য কোথাও—না এইখানেই! আমি ইহাপেক্ষা আর কোন স্বর্গ কামনা করি না।" এত সুখ বুঝি সয় না তাই পেয়ালা যখন কানায় কানায় ভরপূর তখনই তাহা ভাঙ্গিয়া গেল?

আমার সংসারের গতি কেমন একটু ভাসা ভাসা ধরণের। মগ্ন হইয়া সেইরূপ সুগৃহিণীর মতন কিছু করিতে পারি না। তাই তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল—আমারও মনের প্রাণের কামনা ছিল—এবার তিনি দেখাইয়া দিবেন, আমি বেশ ভাল করিয়া সংসার করিব। তাঁহারও আমাকে ছাত্রীরূপে কিছু শিখাইতে বড়ই আনন্দ হইত! তাই এবার সব দিকেই দুজনে মিলিয়া জীবনপথে অতি মধুর ভাবে চলিবার নিবিড় আয়োজন চলিতেছিল।

কিছুদিন যাবৎ তাঁহার সবদিকেই উন্নতির আকাঙ্ক্ষা যেন বাড়িয়া চলিয়াছিল। ধর্ম্মের দিকেও বেশ একটী প্রবল আকর্ষণ দেখা যাইতেছিল। উপাসনা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করিতেন। ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। "বলিতেন ছোটবেলা হইতে ব্রাহ্মসমাজের কোলে মানুষ হইয়াছি ইহার যদি ঝাঁট দেওয়া কাজও হয় তাও করিতে ভাল লাগে।" Congregationএর সহ-সম্পাদক হইয়া অর্থ দিয়া শক্তি দিয়া ইহার সেবা করিয়াছেন। অথচ অন্যধর্ম্মের প্রতি উদারতা খুব বেশী ছিল। যাহাতে হিন্দুসমাজের লোকেরা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিতে কোনরূপ আঘাত না পান বা গান গাহিতে তাঁহাদের কোথাও বাধা না লাগে সর্ব্বদা সেই বিষয়ে ভাবিতেন ও বলিতেন। "ব্রাহ্মধর্ম্ম" বইখানি আজকাল প্রায়ই পড়িতেন। ইহার মধ্যে অসুখ যে দিন একটু কম মনে হইয়াছিল সেই দিন বার বার বলিয়াছেন "ব্রাহ্মধর্ম্ম আর চশমাটী

দাও।" এবার ঠিক করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "বাড়ীটা ঠিক করিয়া গুছাইয়া বসিয়া নিতে পারিলেই—রোজ সকালে সকলকে নিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে কিছু কিছু পড়িব। জীবনটা খুব সুনিয়ন্ত্রিত (methodical) করিয়া চলিব আর আমরা "দুটি প্রাণীতে মিলিয়া সব কাজ করিব। এতদিন সংসারের অন্যকর্ত্তব্যে তোমাকে আমি যত চাহিয়াছি পাই নাই, তাই আমার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। এবার তুমি আমায় সবটা দিয়ে দাও।" পূর্ব্বে আমাকে শ্বশুর মহাশয়ের আহ্বানে ও অনেক সময় নানা কাজে যাইতে ও ব্যস্ত থাকিতে হইত, তাই তাঁহার আমাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা যেন মিটিত না। এখন সে সাধ পূর্ণ করিবার জন্য কি যে করিতেন! এবার আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসার পর রোজ বলিতেন—"তুমি এবার তোমাকে আমার ভিতর ডুবাইয়া দাও! একেবারে সবটা ডুবাইয়া দাও। নিজের বলিয়া কিছু রাখিও না। দেখিবে তুমি আমি কি সুখে দিন কাটাইব। আবার আমরা নববিবাহিতের মতন জীবন কাটাইব। সেই ত আমার আদর্শ। মানুষ কখনও কি এ জীবনকে পুরাণো মনে করিতে পারে? আমার মনে হয়, যত দিন যাইতেছে আমি পাগল হইয়া উঠিতেছি, নূতনত্ব বিচিত্রতা আমার বাড়িয়া যাইতেছে। আমার সম্মুখে কি সুখ কি আনন্দ, ভাবিতেও আমি শিহরিয়া উঠি। জীবন যদি এমন না হইল, তবে আর জীবন কিসের?" সকলই কি শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া এমন করিয়া দিবার ও পাইবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল?

যখনই কোন মৃত্যুসংবাদ শুনিয়াছেন, বলিয়াছেন "বল ত আমরা কে আগে যাইব? আমি আগে যাইব না। বাবা জ্যেঠামহাশয় সকলেই দীর্ঘায়ু। আমিও অনেকদিন বাঁচিব। আমি কখনও তোমাকে এখানে ফেলে আগে যাইতে চাহি না। লোকে শুনিলে কি বলিবে জানি না, হয়ত স্বার্থপর বলিবে, কিন্তু আমি ছেলেদের নিয়া বেশ থাকিতে পারিব। এই সংসার বড় নিষ্ঠুর, এখানে তোমায় একা ফেলে যাইতে পারিব না।" একদিন নয় কতদিন যে একথা বলিয়াছেন! আমিও তাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু যাওয়ার সময় সে প্রতিশ্রুতি, সে মনের প্রাণের কামনা সব কোথায় ভাসিয়া গেল! একটিবারও কি তাহা মনে আসিল না?

গত কয়েক বৎসর হইতে আমাকে ডাকিতে যাইয়া প্রায়ই mother শব্দ ব্যবহার করিতেন। বলিতেন, "তুমি যখন তোমার ছেলেদের সঙ্গে আমায়ও খেতে দাও, আমার তখন মনে হয় আমাকেও তুমি মাতৃরূপে খেতে দিচ্ছ। স্বামী যখন বয়স্থ হয়, আমার মনে হয়, স্ত্রীর কাছথেকে মাতৃস্নেহ চায়। আর মাতৃত্বে পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়াই নারীজীবনের আদর্শ। তোমাতে আমি তাহাই চাই, আর তুমি আমার সন্তানদের মা—তাই আমি তোমায় mother বলিয়া ডাকি। তাঁহার এই ডাকে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার এক স্নেহময় কাকাবাবু ও (প্রচারক) আমায় dear mother বলিয়া ডাকেন। আজ কয়দিন ধরিয়া আমার উৎকর্ণ কান থাকিয়া থাকিয়া সেই আকুল আগ্রহ আবেগভরা mother, নলিনি, আরো কত যে আদরের ডাক শুনিবার জন্য যেখানে সেখানে থমকিয়া দাঁড়াইতেছে! হায়! কোথায়! প্রাণ যে অধীর হইয়া লুটাইয়া পড়িতেছে, চিরদিনের মতন সেই সুমিষ্ট বাণী কি নীরব হইয়া গিয়াছে?

একসঙ্গে খাইতে ও খাওয়াইয়া দিতে বড়ই ভালবাসিতেন। রবিবার দিন তো ছেলেদের ও আমাকে এক সঙ্গে বসিতেই হইত। তিনি সকলকে খাওয়াইয়া দিবেন। রবিবার দিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিলে প্রায়ই যাইতে চাহিতেন না। বলিতেন, সপ্তাহের মধ্যে একদিন সকলে একসঙ্গে খাই, এইটাতেই আমি বেশী সুখ পাই। রবিবার দিন নিমন্ত্রণ নিওনা। তাঁহার এক স্নেহময়ী খুড়ীমাকে বলিতেন, "খুড়ীমা, আমি যে নলিনীকে এত আদর করি এ কি অন্যায় করি ?"

কত কথা—কথা যে ফুরাইতে চাহেনা, কত আর লিখিব? অসুখের ভিতরও অন্যের ভাবনা! আমি তাঁহার এক বন্ধু ডাক্তারকে ডাকিতে চাহিয়াছিলাম। বলিলেন "তুমি কেন লোককে কষ্ট দিতে চাও? বৃথা ওকে কষ্ট দিও না। প্রথমে তাঁহার অসুখ ডেঙ্গু মনে হইয়াছিল, শেষ কালে যখন বাড়িয়া উঠিল তখন 'I want to live নলিনি I want to live' কতবার বলিয়াছেন। 'চারিটী ছেলে একলা কি করিয়া মানুষ করিবে? খোকা, Save your father' এইরূপে কতভাবে বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা ও আকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। পরে মুখ ফুটিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন, 'দয়াময়, আমায় সারাইয়া দাও, বাঁচাইয়া দাও।' এত কাকুতি মিনতি এত আকুল আকাঙ্ক্ষা কিছুই কি সেই দয়াময়ের চরণপ্রান্তে পৌঁছিল না? মনে হয় মানুষ ত এত নিষ্ঠুর হইতে পারে না তিনি দয়াময় হইয়া কি করিয়া এমন নির্মম হইলেন?

অসুখের প্রথমেই আমার মনে কি এক উৎকণ্ঠা ও আকুলতা আসিয়াছিল বলিতে পারি না। উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে, চিন্তায়, এই কয়দিন সমানে সমস্তরাত মনে প্রাণে আকুল ভাবে একমাত্র বিপদভঞ্জনকেই ডাকিয়াছি। ঔষধ পথ্য দিবার সময় মনে মনে জপিয়াছি "দেখো দয়াময় দেখো, তুমি দয়া করিয়া এই ঔষধে পথ্যে ইহাকে আরোগ্যের পথে লইয়া যাইও।" সমস্তরাত কখনও তাঁহার শয্যাপার্শে, কখনও বা সাম্‌নের ঘরে অবিরাম অবিশ্রাম বলিয়াছি, "তুমি ত দয়াময়, তুমি ত বিঘ্নহারী দেখো, যেন কোন ভুলক্রুটি না হয়। তুমি কর্ণধার হইয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যেও।" যিনি আসিয়াছেন তাঁহাকেই বলিয়াছি আপনি প্রার্থনা করিবেন। কোথায়! কোথায়! আজ তীব্র আঘাতে ধরাশায়ী হইয়া মনে হইতেছে তিনি মহামহিমাময় রাজরাজেশ্বর, আমাদের আকুল প্রার্থনা কাতর ক্রন্দন বুঝি রাজ রাজেশ্বরের সিংহাসন তলে পৌঁছিতে পারে না।

যাহার নিকট পৃথিবী এত সুন্দর এত মধুর ছিল, যাহার বাঁচিবার এত সাধ ছিল, যাহার এ পৃথিবীতে কাজ করিবার জন্য উৎসাহ উদ্যমের অবধি ছিলনা, তাঁহার নাকি কাজের প্রারম্ভে এইভাবে জীবনের শেষ হয়! ইহাকে তো কিছুতেই শেষ বলিতে প্রাণ চায় না! প্রাণ যে বড়ই আকুল হইয়া উঠিয়াছে! হে পরম রহস্যময় বিশ্বদেবতা! একমুহূর্ত্তে একি করিলে? এক নিমেষে তুমি রাজাকে পথের ভিখারী কর, তাই যে করিলে! সংসারের সমস্ত আলো যে এক মুহূর্ত্তে আমার চোখে নিবিয়া গিয়াছে! পৃথিবীর সকলই পূর্ব্ব নিয়মে চলিতেছে, শুধু আমারই চোখে তাহার আলো নাই। একেবারে তাঁহাতে ডুবিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, এই কি তাহার পথ করিয়া দিলে? এ কি রকম পথ? এ বন্ধুর পথে যে কি করিয়া চলিব জানিনা, প্রাণ যে ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িতেছে, হৃদয় যে রক্তাক্ত হইয়া যাইতেছে! তোমার কি ইচ্ছা তুমিই জান,

আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিনা। অসহনীয় দাহনে যে জলিয়া মরিতেছি, মনে হয় আমার সব কর্ত্তব্য বুঝি উপযুক্ত রূপ করিতে পারি নাই, তাই বুঝি এ শাস্তি দিয়াছ! অসহায় শিশুদের মুখের দিকে যে তাকাইতে পারিনা! তাহারা যে কিছুই বুঝে না, তুমি যদি ঐ কুসুম কোমল হৃদয়ে এই তীব্র কঠোর আঘাত দিয়া থাক, তবে তুমি তাদের পিতৃহারা প্রাণে পিতা হইয়া অধিষ্ঠিত হও। আর আমার কথা কি বলিব! তুমিই কঠোর বিধান করিয়াছ, কেন করিয়াছ তুমিই জান। এ বুক ফাটা দুঃখের সান্ত্বনা আমি তোমার কাছে চাহিনা। ইহা আমার হৃদয়ে অহর্নিশি জ্বলিতে থাকুক, তাহাকে আমার দগ্ধ তৃষিত হৃদয়ে চিরজীবিত রাখ এই তোমার চরণে ভিক্ষা।

শোকাশ্রু।

একি সর্ব্বনাশ ও মা একি সর্ব্বনাশ!
কার কথা কহি লোকে,
মগ্ন আজি মহাশোকে,
আর্ত্তনাদ উঠে কেন অবনী আকাশ?
সহসা কি আসে কাণে,
শত বজ্র বাজে প্রাণে,
কাঙালের মণিরত্ন—হতাশে আশ্বাস,
কি শুনিতে কি শুনিনু—একি সর্ব্বনাশ!

২

সে যে চিরজীবী "খোকা" দেবের কুমার,
বাপ মা'র পুণ্যফলে
সে এসেছে ধরাতলে,
কুলের গৌরব বাছা, বঙ্গ-অলঙ্কার!
"নব্য-ভারতে"র তরে
খাটিছে যে শত করে,
সে যে দেশ-সেবা-ব্রতী, বন্ধু অভাগার!
সে যে কৃতী, কীর্ত্তিমান,
মহান, উদার প্রাণ,
কত কর্ম্মে কর্ম্মী সদা, মূর্ত্তি যোগ্যতার!
সে যে গো রাজার মত,
প্রভাব অপ্রতিহত,
প্রবর্ত্তক নিয়ামক সে যে সবাকার,
চিরজীবী "খোকা" বরপুত্র বিধাতার।

তার কথা কহে কেন অমঙ্গল রবে?
অন্ত কাজ অবহেলি,
সকল কর্ত্তব্য ফেলি,
সে কি পারে কোথা যেতে—তাহা কেন হবে?
সুধিব না কারো কাছে,
সে আছে—ভালই আছে,
তারি মুখ চেয়ে আছে, ঘরে পরে সবে,
এ নিঠুর অবিচার সে করেছে কবে?

৪

তারি প্রাণে প্রাণময় তাহারি সংসার,
আছে তারি পানে চেয়ে,
ছোট ছোট ছেলে মেয়ে,
প্রিয় জায়া—সে কথা যে নহে সহিবার!
বিগত আশ্বিন মাসে,
পিতৃ-দেব সে প্রবাসে
সাধিলা সমাধিযোগ যোগী অবতার!
সব সঁপি সুত-করে,
ঘুমাইলা চিরতরে
আজ্ঞাবহ পুত্র নিল পিতৃকার্য্য-ভার,
সব কাজ অসমাপ্ত, এখনো যে তার!

৫

কোন ব্যাধি পশিল সে সোণার শরীরে,
　　কোন কাল রাহু হায়,
　　গ্রাসিল সে চন্দ্রমায়,
সে রবি ঢাকিল কোন জলদ তিমিরে ?
　　কে নিঠুর কে পাষাণ,
　　কেড়ে নিল কচি প্রাণ—
আমরা যে কোটিপ্রাণ দিব বুক চিরে,
অভাগ্য আমরা যাই, সে আসুক ফিরে ।

৬

এখনো যে ফোটেনি সে প্রভাত-কুসুম,
　　অরুণ আলোক মাখি,
　　এখনো খোলেনি আঁখি,
সোণার নলিনী তার আঁখিভরা ঘুম !
　　আদরের ধন ক'টি,
　　হেসে হ'ত কুটি কুটি
সরল বালক আজি নীরব নিঝুম !
　　শত মুখে লোকে ডাকে,
　　কে লুকি' রেখেছে তাকে,
হেন অসময়ে তার কেন এত ঘুম ?
　　অন্ধকার রাজ্যখানি,
　　কোথা রাজা কোথা রাণী,
কোথা সে আনন্দাশ্রমে উৎসবের ধূম --
কোথা তুমি, কোথা তুমি, প্রভাতকুসুম !

শ্রীবীরকুমারবধ-রচয়িত্রী ।

শ্রদ্ধার অঞ্জলি ।

'আনন্দআশ্রম' এবং 'নব্যভারতে'র প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য ৺দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী লোকান্তরিত হইবার সম্বৎসরের মধ্যেই তাঁহার একমাত্র পুত্র অক্লান্তকর্ম্মী প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী বিগত ১২ই ভাদ্র বেলা দশ ঘটিকার সময়ে অপরিণত বয়সে জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকিতেই আনন্দআশ্রম'ক অনাথ ও শ্রীহীন করিয়া শান্তিধামে গমন করিয়াছেন। জানি না কতদিনে আবার তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানেরা 'মানুষ' হইয়া পিতা ও পিতামহের আনন্দআশ্রমে আনন্দ-বাজার বসাইবে।

স্বর্গীয় প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী উলুপুরের সুবিখ্যাত বসু রায় চৌধুরী বংশে, তাঁহার মাতুলালয়, বরিশালের অন্তর্গত বানরীপাড়ায়, ১২৮৪ সালের ২৭শে মাঘ জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে তাঁহার পিতা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য সহোদরগণ এবং সকল আত্মীয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার এক বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার পিতা অস্বচ্ছল অবস্থার মধ্যেই স্ত্রীপুত্রকে নিজের কাছে আনিয়াছিলেন। শিশু জীবনে তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। পরে যখন তাঁহার পিতা ধন সম্পদের অধিকারী হইলেন, তখনও আনন্দআশ্রমে প্রতিপালিত পাঁচজনের মতই তাঁহার আহার বিহারের বন্দোবস্ত ছিল, পিতা মাতার একমাত্র পুত্র হইলেও তাঁহারা তাঁহাকে ভোগ বিলাসের অভ্যাস শিক্ষা দেন নাই। কর্ত্তব্যপরায়ণ, বিশ্বাসী ও সংযমী পিতামাতার শিক্ষাধীনে তিনি প্রথম হইতেই অতিথিবৎসল, কষ্টসহিষ্ণু ও কর্ম্মী হইয়াছিলেন। প্রভাতকুসুম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। এফ এ পড়িতে পড়িতেই আইন অধ্যাপনার

জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিলাতে পাঠান। একমাত্র পুত্রকে সুদূর বিদেশে পাঠাইয়া পিতামাতা উৎকণ্ঠার সহিত কালযাপন করিতেন। তাহার পরে সেই পুত্র ব্যারিষ্টার হইলেন। আমরা সেই নূতন ব্যারিষ্টারকে হাওড়া ষ্টেশন হইতে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া সঙ্গে লইয়া কি আনন্দেই আনন্দআশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম! তারপর তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী নির্ব্বাচন। পাত্রী আর মনোমত হয় না, অবশেষে কুমিল্লার তৎকালীন 'গভর্ণমেণ্ট প্লীডার' ৺কৈলাস চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ফুল্লনলিনী মামার মনোনীত হওয়ায় আমরা তাঁহাকে পাত্রীরূপে দেখিতে যাই। তার পরে বিবাহের আয়োজন, বধূবরণ, শুভবিবাহ, আনন্দআশ্রমে নববধূর শুভাগমন সে সকল মনে হয় সে দিনের কথা। তখনকার অতি সুখের দিনে কেহ কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলাম এত শীঘ্রই মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে প্রভাতকুসুমের জীবন লীলা শেষ হইয়া যাইবে? আজ যে তাঁহার প্রাণের অধিক 'নলিনী' আমাদের কত আদরের ভালবাসার বৌদিদি পতিশোকে পাগলিনী হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছেন, আজ যে তাঁহার নয়নের মণি সন্তান চতুষ্টয় পিতৃশোকে মুহ্যমান হইয়া রহিয়াছে! কত লোক কত ভাবে তাঁহার জন্য ক্রন্দন ও হাহাকার করিতেছেন! তাঁহার সঙ্গে কাহারও স্বার্থ সম্বন্ধ মাত্র ছিল কাহারও রক্তের সম্বন্ধ কাহারও বা অকৃত্রিম ভালবাসার সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকলের হৃদয় শোকে মুহ্যমান; বিশাল পুরী একেবারে অন্ধকার। এই সেদিন তিনি স্ত্রী পুত্রকন্যাদিগকে কুমিল্লায় পাঠাইয়া দিয়া বাড়ী ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নিজের মনোমত করাইয়াছেন। হলঘরে chamber আনিবেন কোনটা প্রসূন কোনটা বা আদরের কন্যা প্রণতির পাঠ গৃহ, কোনটা বা অতিথি অভ্যাগতের জন্য এইরূপ সকল গৃহের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। সবে মাত্র সাজসজ্জা আনিয়া আপনার ইচ্ছামত সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কোন বাসনা ত তাঁহার পূর্ণ হইল না, কিছু যে ভোগ করিতে পারিলেন না!

তাঁহাকে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্রে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মসমাজের বা যে কোন পরিবারের যে কোন অনুষ্ঠান যত বৃহৎই হউক না কেন তাঁহাকে তাহার সুব্যবস্থার ও রন্ধন করাইবার ভার দিয়াই সকলে নিশ্চিন্ত হইতেন; তিনি তাহা সুসম্পন্ন করাইয়া তবে বিশ্রাম বা আহার করিতেন। নিজগৃহে ছোটখাট নিমন্ত্রণ ব্যাপারে তিনি নিজহস্তে রন্ধন করিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইতেন, পুরুষদের মধ্যে এরূপ রন্ধন নৈপুণ্য দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার একটা বিশেষ গুণ ছিল অন্যের কুব্যবহারে আঘাত পাইলে প্রতিদানে তাহাকে কখনও আঘাত করিতেন না। প্রকাশ্য ভাবেই হয়ত কেহ তাঁহার নিন্দা করিয়াছে কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভাব বৈলক্ষণ্য দেখি নাই। সামান্য দোষ ত্রুটীর জন্য আমি কত সময়ে তাঁহাকে অনুযোগ করিয়াছি কিন্তু তাহাতে বিরক্ত না হইয়া তাঁহার দোষ আছে কি না তাহাই আমাকে বুঝাইয়া বলিতেন, রাগ করাত দূরের কথা। তিনি কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু পাঠে গভীর অনুরাগ থাকায় অবসর সময়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি শিশু বয়সে তিনি রুগ্ন ছিলেন কিন্তু আমার যতদিনের কথা মনে পড়ে, তাঁহাকে

সবল ও সুস্থ দেখিয়া আসিতেছি। অবশ্য ২।৩ বার যে রোগ হয় নাই এমন নহে; তাহার মধ্যে নারায়ণগঞ্জে কলেরার আক্রমণই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার এই পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য তাঁহাকে অক্লান্ত পরিশ্রমে সাহায্য করিত সন্দেহ নাই তথাপি স্বীকার করিতে হইবে তাঁহার খাটিবার শক্তি অসাধারণ ছিল এবং নানা ভাবে খাটিয়াই গিয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পরে পিতৃকীর্ত্তি ও অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখিতে সস্ত্রীক প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া আসিতেছিলেন। পিতৃপ্রতিষ্ঠিত নব্যভারত সুচারুরূপে পরিচালিত করিবার জন্য কি কঠিন পরিশ্রমই না করিতেন। জটিল মোকদ্দমার মীমাংসা chamber এর কাজ, নব্যভারতের সম্পাদকতা, পুত্রকন্যাদের আহার বিহারের তত্ত্বাবধান, রোগ হইলে মাতার ন্যায় তাহাদের শুশ্রূষা, সংসার সুব্যবস্থা একজন ব্যক্তি কতদিকে খাটিতেন ভাবিলে অবাক্ হইয়া যাই। তিনি কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন এবং কোনও কাজে পশ্চাৎপদ হন নাই। ট্যাক্সি সমিতির সভাপতিরূপে, Prisoner's aid societyর সম্পাদকরূপে, ১৯১৭ এবং ১৯২০ সনের কংগ্রেস সভামণ্ডপ নির্ম্মাণের কর্ত্তৃপক্ষরূপে তিনি তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি পিতৃমাতৃভক্ত, পত্নীগত প্রাণ, সন্তানবৎসল ছিলেন। স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য তিনি অম্লান বদনে বহুক্লেশ সহ্য করিতেন। তাঁহার ধন জনের অভাব ছিল না কিন্তু নিজহাতে সন্তানগণের অনেক কাজই করিতেন। আফিস হইতে ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন, হয়ত ছোটছেলেটি অসুস্থ হইয়াছে কিম্বা তার বড় মেয়েটীর আহার হয় নাই কান্না জুড়িয়া দিয়াছে, অমনিই সন্তান বৎসল পিতা তাহাদের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। চারিটী অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান এবং সংসার অনভিজ্ঞা পত্নী কেবলমাত্র যাহাকে অবলম্বন করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল, সে অবলম্বন টুকু হইতে বিধাতা কেন যে তাহাদের বঞ্চিত করিলেন, কে এই প্রশ্নের উত্তর দিবে? আমরা শোকে অন্ধ ও স্বার্থহানিতে ব্যথিত হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ে সন্দিহান হইয়া অধীর হইয়া পড়ি। রোগাক্রমণের পর বারবার তিনি বলিয়াছেন 'I want to live' আমরা তাই আক্ষেপ করিতেছি তাঁহার ত যাবার এতটুকুও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু শেষ সময়ে যে ইচ্ছা হয় নাই, তাই বা কেমন করিয়া বলি? তাঁহার প্রশান্ত বদনমণ্ডলে কাতরতার চিহ্নমাত্র ছিল না। শেষ সময়ে অধরপ্রান্তে মধুর হাসিটুকু কি তাঁহার শান্তি ও প্রসন্নতার পরিচয়ই দিতেছে না? মনুষ্য মাত্রেরই ভুল ত্রুটী থাকে কিন্তু নশ্বরদেহ চিতায় ভস্মীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অমরলোকযাত্রীর যত দোষত্রুটী সকলই বিনষ্ট হয়; যেটুকু ভাল, যেটুকু বিশেষত্ব শুধু সেইটুকু উজ্জল হইয়া উঠে। শ্রাদ্ধবাসরে সেইজন্যই প্রিয়জনের গুণাবলী স্মরণ ও গুণানুকীর্ত্তন করিয়া সকলে তৃপ্তিলাভ করে। এবং ইহার মধ্য দিয়াই আমরা হারাণোধনকে পাইতে চাই।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

ছিন্ন কুসুম।

রজনীতে ফোটা ফুল ঝরে যায় প্রাতে,
প্রভাতের ফুল ঝরে সাঁঝের বেলায়;
প্রভাত-কুসুম তার জীবন প্রভাতে
ঝরিয়া পড়িল কিরে আজি অবেলায়?

কত সাধ কত আশা হৃদয়েতে তার
কেমনে করিবে সেবা দেশ-জননীর
আহরিয়া প্রেম-ভরে বিচিত্র সম্ভার
যজ্ঞ অনুষ্ঠিবে সহ সহ-ধর্ম্মিণীর!

রচিয়া নূতন করি পুরাতন ঘর
সাজাল তাহারে, বুকে ভরি ভালবাসা
সন্তানের জননীর মন্দিরে সুন্দর
বরিয়া রাখিবে তারে ছিল কত আশা।

বীণাপাণি-বীণাতারে নবতর সুর
ঝঙ্কারি তুলিবে তারা মোহিতে জগৎ,
সেবিবে শ্রমিক দীনে কুলি ও মজুর,
নব প্রাণে জাগাইবে নবীন ভারত।

এত সাধ, এত আশা, আগ্রহ আকুল
এক পলে হয়ে গেল একেবারে শেষ?
বুকভরা গন্ধ—ঝরে, আধ ফোটা ফুল
ভাসে না পবনে তার সৌরভের লেশ?

প্রেম নাকি মৃত্যুঞ্জয়, আশা অন্তহীন?
জীবন বাঁচিয়া থাকে জীবনের কাজে,
কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা শুভ রহে চিরদিন—
তাহারে বাঁচাও তবে এ সবার মাঝে।

বিধবা সাবিত্রী হও বাঁচাও পতিরে,
পুত্র কর মৃত্যু হতে পিতৃদেবে ত্রাণ।
বন্ধু সখা যত আছ সুকর্ম্ম-সাথীরে
কর্ম্মের মাঝারে কর নবজন্ম দান।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

একদিনের দেখা।

যখন প্রভাতকুসুম বাবুর সহিত আমার প্রথম দেখা হয়, তখন ভাবি নাই, এই প্রথম দেখাই তাঁহার সহিত আমার শেষ দেখা হইবে।

গত ফাল্গুন মাসে একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই। স্বর্গীয় দেবীবাবু আমাকে স্নেহ করিতেন, তাঁহার স্নেহ স্মরণ করিয়াই তদীয় একমাত্র পুত্রের সহিত পরিচিত হইবার একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মে। প্রভাতকুসুম অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে, বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার, সে অবস্থায় তাহার যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার বাড়ী গিয়াছিলাম, পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আমার কল্পনা শুধু কল্পনাই মাত্র, বাস্তবের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

নব্যভারত আফিসে যাইয়া দেখিলাম, যে চেয়ারখানাতে দেবীবাবু বসিয়া কাজ করিতেন, সেইখানে একটী সাদাসিধে ছাঁচের, সৌম্যমূর্ত্তি যুবক, এবং অদূরে চৌকির উপর একটী প্রৌঢ় ভদ্র লোক বসিয়া আছেন।

'প্রভাতবাবু বাসায় আছেন কি ? জিজ্ঞাসা করা মাত্র প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী তাঁহার নিকটবর্ত্তী লোকটীকে দেখাইয়া বলিলেন, ইনিই প্রভাতকুসুম। প্রভাতকুসুমকে দেখিয়া বুঝিলাম, স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্নের আশীর্ব্বাদ পুত্রকে কবচস্বরূপ রক্ষা করিয়া আসিতেছে, এমন কি বিলাতের জলবায়ুও কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে নাই। সত্য সত্যই অমি একটুকু বিস্মিত হইলাম।

আমি তাহার স্নেহভাজন ছিলাম, সম্প্রতি আমার একমাত্র কন্যা "মালিকা" তাঁহাদের কুলের কুলবধূ হইয়াছে শুনিয়া তিনি যেন এক মুহূর্ত্তেই আমাকে নিতান্ত আপনজন মনে করিয়া ফেলিলেন। "নব্য ভারত" সম্পর্কে অনেক কথা হইল। নিজেই বলিতে লাগিলেন "আর্থিক হিসাবে "নব্য ভারত" দ্বারা আমি বিশেষ লাভবান নই। তবে মনে করি বাবা যদি একটী অক্ষম পঙ্গু ছেলে রাখিয়া যাইতেন তাহার ভারও আমাকে বহন করিতে হইত। নব্য ভারতকে আমার ভাইটীর ন্যায় যথাসাধ্য যত্নে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। পরলোকগত পিতার কীর্ত্তিস্তম্ভ অটুট রাখিতে ভক্তিমান পুত্রের আন্তরিক আগ্রহ দেখিয়া মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম।

প্রভাত বাবু "নব্যভারতের" বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের উৎকর্য সাধনে সঙ্কল্প করিয়াছেন জানিয়া আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম যে উহা স্বর্গগত মহাপুরুষ দেবীপ্রসন্নের আদর্শ নয়। Plain living and high thinking এই আদর্শ নিয়াই নব্যভারত এত দিন তাহার বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আমার কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া বিনীতভাবে বলিলেন "বাবার শক্তি আমি কোথায় পাইব ? তাহার নামে যাহা হইত আমার শত চেষ্টায়ও তাহা হইবার নয়। তাই আজ কালের রুচি অনুযায়ী পত্রিকার কাগজ একটুকু ভাল করা এবং গঠনটি একটুকু সুন্দর করা আমার অভিপ্রায়। তবে গল্প বা ছবি দ্বারা কখনও নব্য ভারতের অঙ্গ প্লাবিত দেখিবেন না আমি নব্যভারতের পূর্ব্ব আদর্শ অক্ষুন্ন রাখিতেই চেষ্টা করিব। নব্যভারতে এমন প্রবন্ধ ছাপাইব না, যাহা অদ্ধনিদ্রিতও অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় পড়া যায়, পিতার আদর্শ রক্ষা করিতে পুত্রকে যত্নবান দেখিয়া সুখী হইলাম।

প্রভাত বাবু তাহার স্বর্গীয় পিতার প্রতি কতকটা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মনে মনে পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার আর একটী কথায় প্রকাশ পাইয়াছিল। দেবী বাবুর শ্রাদ্ধদিনে নিমন্ত্রিত লোকদের মধ্যে কোন কোন লোককে দেবী বাবুর ছবি দেওয়া হইয়াছিল। ছবি অনেক ছিল, তবু সকলকে কেন ছবি দেওয়া হইল না, কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে প্রভাত বাবু বলিয়াছিলেন, "বাবার ছবি আমার প্রাণের জিনিষ, উহা লুচি মণ্ডার ন্যায় অযাচিতভাবে দিবার জিনিষ নয়। যদি কেহ অবহেলা করিয়া ছবি ফেলিয়া যান তবে প্রাণে বড় আঘাত দিবে। ছবি অনেক আছে যাঁহারা আগ্রহ করিয়া ছবি নিবেন, তাঁহারাই নিতে পারেন। না চাইতে এসব জিনিষ দেওয়াকে আমি মনে করি "Parading Sorrows" এ ক্ষেত্রে আমি তাহা পারি না।"

একদিনের পরিচয়েই যাঁহাকে স্মরণ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না তাঁহার পরিজনবর্গকে সান্ত্বনার কথা আর কি বলিব ? ভগবানের মঙ্গলময় বিধান আমাদের বুঝিবার

সাধ্য নাই। কর্ম্মী প্রভাত কুসুমকে হয়ত তিনি অধিকতর উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছেন। অন্ধ আমরা না বুঝিতে পারিয়া তাহার জন্য শোকাকুল। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র অক্লান্ত মনে দেশের কাজ করিয়া, পিতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, দিব্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন ইহাই আমাদের শোকে সান্ত্বনা।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু রঞ্জন ঘোষ।

শোকে।

দাদা চলে গিয়েছেন, আজও ঘুরে ফিরে শুধুই মনে হচ্ছে, এ কেমনে হ'ল! এ কি হ'ল! এমন লোহের মত দৃঢ় শরীর, এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, এমন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম-পটু বজ্রকঠোর দেহ, কেমন করিয়া মাত্র আট নয় দিনের জ্বরে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িল! আজও যেন এ কিছুতেই বিশ্বাস ক'রে উঠতে পার্ছি না!। আশঙ্কার কারণ আছে, তা শুনেছিলাম। একটু একটু বুঝেও ছিলাম; তবুত মন একবার ও বল্ছিল না যে এত শীঘ্র দাদা তাঁর সোনার সংসার ফেলে চলে যাবেন। এতশীঘ্র তাঁর এত সাধের আয়োজন শেষ হয়ে যাবে!

নূতন ক'রে, স্বাধীন ভাবে যে আদর্শ জীবন যাপন করিবার আয়োজন কর্ছিলেন, সে জীবন নাটকের একটি অঙ্ক এমন কি একটি গর্ভাঙ্কও অভিনয় কর্বার পূর্ব্বেই যে কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির নির্ম্মম বিধানে অকস্মাৎ যবনিকা পতিত হইবে, কে তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল! কত সাধ করিয়া, কি নিপুণতার সহিত, কি ই বা ক্ষিপ্রতার সহিত বাড়ী ঘর দুয়ার সব নূতন করে, নিজের পছন্দ মত তৈয়ারী করাইয়া ছিলেন! হায়, সে বাড়ীতে দুদিন ও বাস করিয়া যাইতে পারিলেন না! হঠাৎ যেন একটা ভূমিকম্পে সব চুরমার করে দিয়ে গেল!

কি বুক ভরা আশাই তাঁর ছিল! কি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়াই না তিনি চলিয়া গেলেন! বাড়ীখানাকে মনের মত করিয়া সাজাইবেন; খোকাকে Laboratory (রসায়ন পরীক্ষা আগার) করিয়া দিবেন; খুকু খোকার এখানকার পড়া শেষ হলে সকলকে নিয়ে একবার বিলাত যাবেন, দেশের জন্য কত খাটিবেন, নব্যভারতকে আরও কত সুন্দর করিয়া চালাইবেন, এমন কত আশাই তাঁর ছিল! এত কাজ এত আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিয়া তিনি কেমন করিয়া চলিয়া গেলেন! তাঁর ত এখনও যাবার সময় হয়েছিলনা। তিনিও ত যেতে প্রস্তুত ছিলেন না! তবে এ কেমন করে হ'ল! I want to live, I want to live রোগ-শয্যায় এ কথা কতবারই না বলেছেন! শনিবার সকালেও খোকাকে (প্রসূনকে) বলেছেন, 'Save father, that's all" যতই সেই সব কথা মনে পড়্ছে, ততই প্রাণ কেঁদে উঠছে, এত আশা, এত সাধ, এত আকাঙ্ক্ষা ওঃ, সকলের কি অপূর্ব্ব পরিনির্ব্বাণ।

১৯শে আগষ্ট শুক্রবার মধ্য রাত্রে জ্বর হইল। পর দিন সকালেই জ্বর বেশী। ডাক্তার আসিলেন, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিলেন। সোমবার রাত্রিতে ডাক্তারগণ সন্দেহ করিলেন, বোধহয় একটু নিউমোনিয়ার আশঙ্কা আছে। মঙ্গলবার আর একজন ডাক্তারকে আনা হইল। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। বুধবার দিন পেটটা খারাপ হইল। সকলেই ভয় পাইলাম। কিন্তু দাদা বলিলেন, তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন? বৌদিকে একটুকু অনুযোগ ও করিলেন। পরদিন বৃহস্পতিবার বেশ ভালই দেখা গেল। সকলেই মনে করিলাম, বিপদ কাটিয়া গেল। দাদাও বেশ স্বাভাবিক ভাবেই কথা বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। নব্যভারতের কত ফর্ম্মা ছাপা হইল, প্রূফ দেখা হল কি না, ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ খবর নিতে লাগিলেন!

এত সাধের নব্যভারত! রোগশয্যায়, মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও নব্যভারত যেন ঠিক সময়ে বাহির হয় বার বার একথা বলেছেন। শনিবার দুপুরে পর্য্যন্ত আমায় জিজ্ঞাসা করেছেন, "তোমার বৌদি বুঝি প্রূফ্ দেখ্ছেন?" হায়, নব্যভারতের বন্ধন, প্রাণ-প্রিয় পত্নী ও ছেলে মেয়ের স্নেহের বন্ধন বা সমস্ত ভারতের সেবার বন্ধন, কিছুতেই দাদাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না!!

শুক্রবার শেষ রাত্রি হইতে রোগবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দিল। তখনই দুইজন ডাক্তার আসিলেন; পরদিন আরো কয়জন ডাক্তার একত্র হইলেন, তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা যত্ন চেষ্টার এবং শুশ্রূষাকারীগণের শুশ্রূষার কিছুরই ত্রুটি হইল না। কিন্তু যাকে ভগবান ডেকে নেন, তাকে কোন্ পার্থিব শক্তি ধরে রাখ্তে পারে? অসীমের ডাক যখন আস্‌ল, তখন কোন ও সসীম শক্তি তাকে ধরে রাখ্তে পার্‌ল না। কিছুতেই কিছু হইল না। ১২ই ভাদ্র রবিবার বেলা সাড়ে দশটার সময় আমাদের কতশত জনের দাদা, সকল চিকিৎসা সকল সেবা, সকল যত্ন, সকল আদর উপেক্ষা করিয়া তাঁর কত আদরের, কত যত্নের, কত স্নেহের পত্নী, পুত্রদ্বয়ও কন্যাদ্বয়কে অকূল শোকের পাথারে ভাসাইয়া মধ্যাহ্ন-রবির প্রখর কিরণ সহ্য করিতে না পারিয়া যেন প্রভাতের কুসুমটিরই মত দেবতার পায় অর্ঘ্য হইয়া ঝরিয়া পড়িলেন। মৃত্যুকালিম মুখ খানা তাঁহার চির অভ্যস্ত হাসিতে মাধুর্য্য-মণ্ডিত হয়ে শোভা পাচ্ছিল! যখন পত্নী পুত্র আত্মীয় অনাত্মীয়গণের হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ সেই গৃহের প্রাচীর ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছিল, তখনও সেই চির শান্ত চিরধীর মুখ খানায় সেই চিরদিনের স্নেহ মাখান মধুর হাসিটি ভক্তকবি তুলসী দাসের অপূর্ব্ব দোঁহাটাই মনে জাগাইয়া দিতেছিল—

তুল্‌সী যব্ তোম্ জগ্ মে আয়া জগ্ হাসে তোম্ রোয়,
এসা করনা কর্ যাও ভাই, তোম্ হাসে জগ্ রোয়।

সত্যিই আমাদের দাদা এই ৪৪ বৎসরের মধ্যে এত কাজই করিয়া গিয়াছেন, যাহাতে তিনি হাস্তে হাস্তেই চলে গিয়েছেন, আর আমরা সব তাঁহার জন্ম কেঁদে আকুল হচ্ছি!

দাদা চিরদিনই খুব ধীর এবং স্থির ছিলেন। রোগশয্যায় রোগের নিদারুণ ক্লেশেও তাঁর সেই ধৈর্য্যের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। কেমন শান্ত ও ধীর ভাবে তিনি সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। শুক্রবার সন্ধ্যা পর্য্যন্তও বাঁচবেন বলেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। শুক্রবার শেষ

রাত্রে আমায় বল্লেন, "Harendra I am not going to live." আমি বল্লাম, "কেন ও কথা বল্‌ছেন?" অমনি কথাটা ঘুরিয়ে বল্লেন, "না, ও কিছু না।" শনিবার সকালে হাতমুখ ধুয়ে, নিজেই হাত জোড় করে প্রার্থনা করলেন। "ভগবান, আর ত সহ্য করতে পারি·না; সব শেষ করে দাও; আমার রোগ সারিয়ে দাও; আমায় ভাল করে দাও!" শনিবার রাত ৩টা পর্য্যন্তও বেশ জ্ঞান ছিল। তার পর হইতে একটু একটু করিয়া জ্ঞান লোপ পাইতে লাগিল। রবিবার সকালেও খুকুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "Baby, have you finished your French lesson." কি আগ্রহের ও যত্নের সহিতই তিনি খুকুকে পড়াইতেন এবং তার পড়াশোনায় উৎসাহের কথা বলিয়া কতই না তার প্রশংসা করিতেন! হায়, তেমন করিয়া ত আর কেউ তাকে পড়াইতে পারিবে না!

দেশের ইংরেজী বাঙ্গলা সকল পত্রিকাতেই তাঁর কর্ম্মজীবনের অনেক কথা লিখিয়াছে। সুতরাং আমি সেসব কথা লিখিতে ইচ্ছা করি না। আমি শুধু দাদা কোথায় বড় ছিলেন, তা-ই বলিতে চাই। সব হয়ত বলিতে পারিব না, তবু যতটা পারি, চেষ্টা করিয়া দেখিব।

দাদাকে আমি প্রথম চিনি বা তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাই "কেশব একাডেমীর" স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক মন্মথকুমার দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর দিনে। কি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সেই মৃতদেহের বেশাদি পরিবর্ত্তন করিলেন এবং কেমন অম্লান বদনে মৃতদেহ বহন করিয়া চলিলেন। আমার স্মরণ হয় না, আজ পর্য্যন্ত অন্য কোনও ব্যারিষ্টার বা বিলাত ফেরত কোনও ব্যক্তিকে নিজের বিশেষ নিকট আত্মীয় ব্যতীত অপর কাহারও মৃতদেহ বহন করিতে দেখিয়াছি।

এই ভয়ঙ্কর শঙ্কট কালে হা হুতাশ করিবার লোক অনেকই দেখিয়াছি; কিন্তু এমন বুক দিয়া পরের বাড়ীর মৃতদেহের শেষ কার্য্য সুসম্পাদিত করিতে অপর কাউকে দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ হয় না। আমরা জানি এইকার্য্যে অনেক সময়েই দাদাকে নিজের পকেট হইতে বেশ দুটাকা খরচ করিতে হইত। দাদার মত শ্মশান-বান্ধব এ জীবনে আর দেখি নাই।

আর আজ মনে পড়ে মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত লেখক স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ট্রামে শোচনীয় মৃত্যুর কথা। সেই দারুণ শীতের রাত্রিতে ভবানীপুরে রাস্তায় দাঁড়াইয়া সেই ট্রামপিষিত দেহের ধীরভাবে যথাযথ বন্দোবস্ত করার কথা। পর দিন দাদার এক আত্মীয় দাদার পিঠ্ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "সাবাস্ বেটা, দুটো মুখের আপশোষ্ সকলেই করতে পারে, কিন্তু বুক্ দিয়া পকেটের পয়সা খরচ করিয়া পরের উপকার করতে বেশী লোক পারে না। বেঁচে থাক্ লোকের উপকার হবে।" হায়! সে সব প্রাণের আশীর্ব্বাদে ও দাদাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না!! এরূপ যখন যেখানে মৃত্যুর বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে, দাদাকে সেখানে সেবার জন্য উপস্থিত দেখিয়াছি। অহঙ্কার বলে একটা জিনিষ দাদার মধ্যে কখনও দেখি নাই। তাঁর মনটা খুবই বড় ছিল, পরের দুঃখের বোঝা তিনি সর্ব্বদাই ঘাড় পাতিয়া লইতেন।

৺ দেবী বাবুর মত দাদাও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে পারিতেন। ১৯০৬ সনে যখন কলিকাতায় বির্জ্জিতলার মোড়ে জাতীয় শিল্প প্রদর্শনী ও কংগ্রেস হইয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে আমি তাহার মধ্যে একজন কর্ম্মচারী ছিলাম। তখন দেখিয়াছি, দাদার কাজ করিবার শক্তি! একমাস প্রায় বাড়ীতেই আসিলেন না! সারাদিন রাত না খেয়ে দেয়ে তিনি কাজ করতে পারতেন। আর কি-ই বা ছিল তাঁর কর্ত্তব্য নিষ্ঠা! তিনি একজন Assistant Secretary ছিলেন। কিন্তু তিনি যা পরিশ্রম করতেন, তার অর্দ্ধেকও অন্যে করতেন না। গতবারে কলিকাতায় যে Special কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, তখন ও ১৫।১৬ দিন দাদা কতই না খাটিয়াছেন! এই ১৫।১৬ দিন বাড়ীতে আসেন নাই, এমন কি প্রতিদিন আহার পর্য্যন্ত করিতে সময় পান নাই! যে কাজ যখন তিনি করিতেন একেবারে প্রাণ ঢেলে দিয়ে করতেন; কি সুন্দরই ছিল, তার বন্দোবস্ত, কি তীক্ষ্ণ ছিল তাঁর সুরুচিজ্ঞান, আর কেমন ধীর স্থির ভাবে কাজটি তিনি করে ফেলতেন!

অনেককেই দেখি কাজ করিতে গেলে হাক্ ডাক দিয়া সোরগোল করিয়া তুলেন। আর যতটা কাজ করেন; হৈচৈ করেন, তার অনেক গুণ বেশী। কিন্তু দাদার কাজে তা হবার যো ছিল না। দাদা যে কাজ করছেন, খুব কম লোকই তা টের পাইত। সমস্ত কাজের plan-টি এমন সুন্দর ভাবে তাঁর মাথার মধ্যে থাকত যে ঠিক ঠিক সময়ে আপনি সব বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে দেখা যাইত। মনে হইত যেন সব কলে করা হয়ে যাচ্ছে।

সব কাজেই তাঁর খুব সুন্দর শৃঙ্খলা ছিল। আধাখেচ্‌ড়া করিয়া কাজ তিনি আদৌ করিতেন না। আর হুটোপুটি জিনিষটা তিনি আদৌ ভালবাসতেন না। সেইজন্য কখনও কোন কাজে তাঁকে বিচলিত হইতে দেখি নাই, সর্ব্বদাই মনে হইত তিনি যেন পূর্ব্ব হইতেই সব ভেবে চিন্তে রেখেছেন। দাদার পছন্দটি ছিল একেবারে নিখুঁত। ঠিক যে জিনিষটি যেমন হইলে যেখানে মানায়, তার একচুল ও ব্যতিক্রম হইতে পারিত না।

দাদার আর একটা অদ্ভুত গুণ ছিল। আমার যতটা মনে হয় ইহা তাঁহার চিন্তাশীলতারই পরিচায়ক। তবে ইহা যে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানচর্চ্চার ফল, তাহাও সুনিশ্চিত। যখন যে কোনও প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতেই দাদার অসাধারণ অভিজ্ঞতা দেখিয়া আমরা কতদিন চমৎকৃত হইয়াছি। চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা যখন উঠিত, তখন তিনি এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেন যে, নূতনলোক শুনিলে তাঁহাকে ডাক্তার মনে না করিয়া পারিত না। বাণীর শ্রদ্ধেয় মথুর বাবুর পুত্র সুধাংশুর Gallstone operation এর সময় ডাঃ ৺সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় দাদাকে একজন L. M. S. বলে মনে করেছিলেন। এরূপ Photography সম্বন্ধে খুব অভিজ্ঞতা ছিল। সবজিনিষই তিনি খুব সুন্দররূপে তন্নতন্ন করিয়া দেখিতেন। ময়রাগণ বাসি লুচি ইত্যাদি দিয়া কি করে, চপের দোকানে বাসি মাংসের কিরূপে ব্যবহার হয়, ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যথেষ্ট খবর রাখিতেন। "seeds oils" সম্বন্ধে যে পুস্তিকা তিনি লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে জানা যায় তিনি ঐসব বিষয়েরও কত খবর রাখিতেন। কংগ্রেসের কাজের সময় আমাদের বলিয়াছেন, দেখ এই লোকগুলি রাত ৩টার পর কাজ করে; তখন ইহাদের অন্যকাজ থাকে না, তাই অল্প মজুরীতে পাওয়া যায়। এইরূপে

তিনি বিবিধ বিভাগে বিবিধ রকমের খবর রাখিতেন। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর কথা অনেক দিন তাঁর সঙ্গে হইয়াছে। সর্ব্বদাই দেখিতাম তিনি যেন সবই পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া রাখিয়াছেন।

আজকাল দাদার ধর্ম্মভাব ও বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। দেবালয়ে যে দিন উপাসনা করিবার কথা থাকিত, সেদিন পূর্ব্ব হইতে কি নিষ্ঠার সহিত সব কাজ করিতেন এবং কেমন ব্যাকুলতা লইয়া উপাসনা করিতে যাইতেন!

কি আমুদে লোকই তিনি ছিলেন। যেখানে যখন থাকিতেন, সকলকে মাতাইয়া রাখিতেন। যাহারা তাঁর সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পান নাই, বা পাইলেও মিশেন নাই, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দাদার সম্বন্ধে খুব উঁচু ভাব পোষণ নাও করিতে পারেন. কিন্তু যাঁহারা মিশিয়াছেন, তাঁহারা জানেন কি সোণার মানুষ ছিলেন তিনি, আর কি সরল ও উদার প্রাণ ছিল তাঁহার!

রন্ধন কার্য্যে দাদার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। আমিষ নিরামিষ কত রকমের রান্নাই যে তিনি জানিতেন, তার সংখ্যা করা যায় না। কত রান্ধুনে বামুনই দাদার নিকট রন্ধন কার্য্যটি শিক্ষা করিয়াছে। এসব কার্য্যের বন্দোবস্ত করতেন তিনি অতি সুন্দর রূপে। অমুকের মেয়ের বিবাহ, অমুকের ছেলের বৌভাত, অমুকের পিতৃশ্রাদ্ধ, অমুকের মাতৃশ্রাদ্ধ, এসব বন্দোবস্তের ভার প্রায়ই পড়িত দাদার ঘাড়ে। আজকাল ত প্রায় ব্রাহ্ম সমাজের সর্ব্বত্রই এসব কাজে দাদার পরামর্শ বা বন্দোবস্ত ছিল; বড় ছোট ধনী দরিদ্র যিনিই দাদাকে ডাকৃতেন না কেন, তিনি অম্লান বদনে তাঁর বাড়ীতে যাইতেন এবং সুবন্দোবস্ত করিয়া লোকজনকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া আসিতেন। ইহাতে দাদার মান, বা অহঙ্কার আদৌ ছিল না। সময় সময় এজন্য নিজের আত্মীয় স্বজনের অনুযোগ ও সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি লোকের সেবা করিবার সুযোগ পাইলে কখনও তাহা হইতে পশ্চাদ পদ হয়েন নাই। কত পিতা কত বিধবা মাতাকে আমরা দেখিয়াছি, দাদার হাতে কিছু টাকা দিয়া বলিয়াছেন, "প্রভাত, এই আমি দিতে পারবো; ইহা দিয়ে যেমন করে হয়, তুমি কাজটা সম্পন্ন করে দাও।" দাদার মাথায় বড়, ছোট, মাঝারি, আড়ম্বর পূর্ণ, অনাড়ম্বর, কত plan ই ছিল; অল্প টাকায় কি করে সব গুছিয়ে করতে হয়, তা তিনি যেমন জানতেন, এমন আর কাউকে দেখিনি। এসব কাজেও অনেক সময় তাঁকে নিজের পকেটের টাকা খরচ করতে হত। দাদার ইহাতে position এর হানি হতে পারে, এমন কেহ বলিলে, তিনি হাসিতেন ও বলিতেন, "তা হউক, ওদের কত উপকার হয় তা ত তোমরা ভাবতে পার না?" এ কতবড় মনের পরিচায়ক! যে সকল বামুন দাদার সহিত কাজ করিত, তারা তাঁকে কি না ভালবাসিত এবং ভক্তি করিত। সেদিন ও কুঞ্জঠাকুর দাদার কথা বলিতে বলিতে কেমন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিল। বেচারী ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদছিল, আর বলছিল, "এমন দাদা আর পাবোনা।" ইংরেজীতে একটা কথা পড়িয়া ছিলাম "A man is best known by his servants" ভৃত্যগণ তাঁকে যত জানে এমন আর কেহ জানিতে পারে না।" দাদার ভৃত্যবর্গ দাদার জন্য কাঁদিয়াই আকুল। কাঙ্গালীকে (ভৃত্য) দাদা আদর করিয়া ডাকিতেন 'কাঙ্গাল!' মৃত্যুর পূর্ব্বের দিন সন্ধ্যার সময় ও বলেছেন "কাঙ্গাল, আমার পা টা আস্তে আস্তে টিপে দে

ত বাপ, কাল খুব ভোরে ঘোড়াকে দানা দেবার আগেই একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবি।" বেচারা কাঙ্গালী শ্মশানে পর্য্যন্ত কি কান্নাটাই কেঁদেছে, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতিরও কি কান্না! সত্যই মনে হচ্ছে, "তোম্ হাসে, জাগ্ রোয়।"

সচরাচর দেখা যায় যাহারা বাহিরের কাজ বেশী করেন, তাহারা নিজেদের গৃহস্থালীর প্রতি অনেকটা উদাসীন থাকেন। কিন্তু দাদা সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। ব্যড়ীর প্রত্যেকটি কার্য্য তিনি নিজে দেখ্‌তেন। ছেলে মেয়েদের কি যত্নই না তিনি কর্‌তেন! সর্ব্বোপরি যত্ন করিতেন তাঁর প্রাণ-প্রিয়া পত্নীর! কি ভালবাসাটাই যে দাদা ইঁহাকে বাস্‌তেন, তা দেখে আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে থাকতাম্। রোগশয্যায় ও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁকে ডাক্‌তেন। তাঁর একটু কাতরতা যেন সহ্য করিতে পারিতেন না। হায়! আজ তাঁর আমরণ দুর্ব্বিসহ ক্লেশের কথা তিনি কেমন করিয়া ভুলিয়া গেলেন, সেই স্নেহময় প্রাণে ত কোন ও দিন এতটুকু নিঠুরতা দেখি নাই!

লোকজনকে খাওয়াইতে যে তিনি কি ভাল বাসিতেন! এই খাওয়ানকে তিনি একটা বড় তপস্যা মনে করিতেন। কতদিন বলিয়াছেন, "দেখ, ১১ই মাঘ লোকজন উপাসনার জন্য আসে; তাঁরা উপাসনা করেন; আর আমি তাঁহাদের খাওয়া দাওয়ায় ব্যবস্থা করি; এতে কি আর আমার উপাসনা হয় না?" সেদিনও আমায় ঠাট্টা করে বলেছেন, কি হে, আজকাল আর খাওয়াচ্ছ দাওয়াচ্ছ না যে।" তৃপ্তিমত লোককে খাওয়াইয়া যে তাঁর কি তৃপ্তিই হইত! আগে নানা অসুবিধায় ইচ্ছামত বন্ধু বান্ধবদের আনিয়া আদর করিয়া খাওয়াইতে পারেন নাই এবারে বাড়ীটা ঠিক ঠাক হলে ইচ্ছামত দুদশ জন বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াইবেন, একথা কতদিনই বলেছেন! হায়, সব শেষ! সব শেষ! Man proposes God disposes (মানুষ ভাবে এক, ভগবান করেন আর) ওঃ, কি নিম্মম সত্য!!!

আজ বুক ভরা শোক লইয়া শুধু এই বলিতে ইচ্ছা হয়, "হে বিশ্বের বিধাতা, কি নির্ম্মম তোমার বিধান! কি কঠোর তোমার বিধি!! কি মর্ম্মন্তুদ তোমার কার্য্যাবলী!!!

শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র বসু।
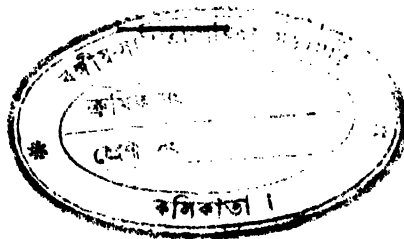
৺প্রভাতকুসুম রায়।

যখন কলিকাতা আসিয়া শুনিলাম, মহাত্মা দেবীপ্রসন্নের সুযোগ্য একমাত্র পুত্র প্রভাত কুসুম আর ইহধামে নাই; অল্প কয়েক দিন হয়, স্নেহাধার জনক জননীর সহিত মিলিত হইবার জন্য মানবের অজ্ঞাত প্রদেশে ছুটিয়াছেন। তখন যে কিরূপ স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম, তাহা অনুভব করাই সম্ভব, ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। যাঁহার দ্বারা স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্নের কীর্ত্তি কলাপ সুরক্ষিত ও আরব্ধ কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইবার আশা পোষণ করা হইয়াছিল; হঠাৎ তাঁহার তিরোধানে দেবীবাবুর অনুরাগী জনের কি প্রকার নিরাশা ও নিরানন্দ উদ্ভূত হওয়া স্বাভাবিক তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রভাতকুসুম, প্রভাত জীবন অতিক্রম করিয়া যৌবন মধ্যাহ্নেই ঝরিয়া পড়িলেন; এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। কত আশা, কত ভরসা, কত উচ্চ কল্পনা, কত অনুষ্ঠান, কর্ম্মী প্রভাত কুসুমের সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে মিলাইয়া গেল, লোক-লোচনের আর গোচরীভূত হইল না। বলিতে পারি না, ইহার অভাবে বঙ্গের কতটা ক্ষতি হইল,—ক্ষতি যে হইয়াছে ইহা নিশ্চয়। এই মাত্র কর্ম্ম-জগতে প্রবিষ্ট হইয়া সুবাস ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; বন্ধু বান্ধবেরা আশাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার কার্য্য প্রণালী দেখিতেছিলেন; কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না। বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে অকালেই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইলেন।

প্রভাতকুসুমের জীবন ঘটনা-বহুল না হইলেও তাঁহার জীবনে আমরা যে সমস্ত সদ্‌গুণ লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে আমাদের দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল, তিনি পিতার স্থান পূর্ণ করিতে সক্ষম হইবেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী ও পিতৃ কীর্ত্তি রক্ষায় সমধিক উৎসাহী ও যত্নবান-ছিলেন। দেবীবাবুর মৃত্যুর পরে সুসম্পাদিত "নব্যভারত' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নব্যভারতকে প্রবন্ধ-গৌরবে মণ্ডিত করিতে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়া ছিলেন। সে চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নাই, ইহা জোর করিয়া বলা যায়।

প্রভাতকুসুম স্পষ্টভাষী ও স্বাধীন চেতা ছিলেন। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা আত্মীয় স্বজন প্রেমাস্পদ ও ভক্তিভাজন ব্যক্তি বর্গের অন্যায় কার্য্যের বা অসঙ্গত উক্তির অন্ধভাবে সমর্থন করে। তিনি এশ্রেণীর লোক ছিলেন না। কতবার দেখিয়াছি, তাঁহার পূজনীয় জনকের কথারও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বিনীত ভাবে প্রতিবাদ করিয়াছেন—বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

তাঁহার শিষ্টাচার ও মধুর ব্যবহার উল্লেখ যোগ্য। দেবীপ্রসন্নবাবুর শ্রাদ্ধ দিবসে যখন আমরা তাঁহার ভবনে উপস্থিত ছিলাম, দেখিলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনি কি ভাবে কিরূপ মধুর ও বিনয় মাখা ভাষায় অভ্যর্থনা করিতেছেন। শ্রাদ্ধ-দিবসে তাঁহার হৃদয় যেন শ্রদ্ধায় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল! প্রভাতকুসুমের সে শ্রদ্ধা প্রকাশের স্মৃতি এখনও ভুলিতে পারি নাই।

তিনি স্বদেশভক্ত ছিলেন। সুযোগ ঘটিলে তিনি সাধ্যানুসারে স্বদেশের কাজ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। জাতীয় মহাসমিতির সহিত তাঁহার সংশ্রব ছিল। যখন যে কর্ম্মের ভার তিনি পাইয়াছেন, যোগ্যতার সহিত তাহা নিষ্পন্ন করিয়া কর্ম্মপটুতার পরিচয় দিয়াছেন।

সেবাধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল কিন্তু তাহা দেখাইবার সুযোগ ঘটিল না।

স্নেহে, মমতায়, প্রেমে ও ভক্তিতে তাঁহার অন্তর শোভিত ছিল। মনুষ্যোচিত গুণগ্রামের তাঁহাতে অভাব ছিল না। অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কুসুম জানিনা কোন কর্ম্মফলে, অতৃপ্ত বাসনা লইয়া অসময়ে অনিচ্ছায় প্রেমময়ী পত্নী, স্নেহাস্পদ সন্তান ও বন্ধুবান্ধবগণকে অশ্রুধারায় প্লাবিত ও মর্ম্ম বেদনায় পীড়িত করিয়া বৃন্তচ্যুত হইল!

ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারে শান্তিবারি বর্ষিত হউক। তাঁহার স্মৃতি আমাদের নিকট মধুর হইয়া থাকুক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

শ্রদ্ধায় স্মরণ।

আনন্দ-আশ্রম আজ নিরানন্দে পূর্ণ। দেখিতে দেখিতে বৎসরের মধ্যে পিতা পুত্র দুইই চলিয়া গেলেন। আনন্দ-আশ্রমে যাহাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া ইহারা চলিয়া গেলেন তাহারাই যে শুধু আজ শোকাকুল তাহা নহে, যাহারা একবার আনন্দ-আশ্রমের সহিত পরিচিত হইয়াছেন তাঁহারাও আজ শোকে ম্রিয়মাণ। আনন্দাশ্রমে পদার্পণ করিয়া কে মনে করিয়াছেন তিনি ঐ পরিবারের একজন নন? পরকে আপন করিতে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান করিতে আনন্দাশ্রমের সৃষ্টি। পিতা এই আশ্রমকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন এবং পুত্র ও এই আশ্রমের মর্য্যাদা অটুট রাখিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। আনন্দ-আশ্রমের পবিত্র প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত একমাত্র পুত্রের হস্তে আশ্রমের ভার রাখিয়া গত বছর এই সময় ৬৯ বৎসর বয়সে পিতা দেবীপ্রসন্ন দেবগৃহে দেহ রক্ষা করিলেন। তাহার শোক আত্মীয় স্বজনগণ এবং দেশ এখনও ভুলিতে পারে নাই। এত লোককে পিতার মৃত্যুতে শোকাতুর দেখিয়া পুত্র কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলেন এবং পিতার কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। না জানি অমরধামে এই অল্পকাল মধ্যে পিতা আবার কোন আশ্রম প্রস্তুত করিয়া তাহার উপযুক্ত সেবকের প্রয়োজন হওয়ায় প্রেম-মন্ত্রে দীক্ষিত আপন পুত্রকে আহ্বান করিলেন। বিধাতার ইঙ্গিতনিহিত সেই আহ্বান প্রাপ্ত হইয়া, এ সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করতঃ দেবীসমা ভার্য্যা, সরল অফুটন্ত পুষ্পসম পুত্র কন্যাগণ এবং প্রেমে মুগ্ধ আত্মীয়গণকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া কর্ম্মী প্রভাতকুসুম অমর ধামে ছুটিয়া গেলেন। যাহারা প্রাণসম প্রিয় ছিল তাহাদিগের প্রতি একবার ফিরিয়া তাকাইলেন না। এ সংসারের কর্ত্তব্য ও মায়ার বন্ধন তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না! হায়! আজ তাঁহার পরিবারস্থ সকলের কি অবস্থা! একবার ভাবিতে গেলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে! ভগবানের

ব্যবস্থা আমরা বুঝিতে পারি না! যাহারা এ সংসারের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে পৃথিবী হইতে চলিয়া যান তাহাদের জন্ম শোক করিবার বিশেষ কারণ থাকে না, কিন্তু যাহারা জীবনের মধ্যাহ্ন সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে এ সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য অসমাপ্ত রাখিয়া হঠাৎ সব মায়া ডোর ছিন্ন করিয়া ইহধাম হইতে চলিয়া যান তাহাদের বিয়োগজনিত দুঃখ আমরা সহজে ভুলিতে পারিনা। যাহাদিগকে তিনি সহোদর জ্ঞানে স্নেহ করিতেন আমি তাহাদের মধ্যে একজন, তাই এই নিদারুণ সংবাদে বজ্রাহত হইয়াছি। আমার ন্যায় অনেকেই তাঁহার নিকট অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ পাইয়াছেন, এই শোক সংবাদে তাঁহাদেরও অশ্রু ঝরিতেছে।

অনুমান ৯।১০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়, এবং পরিচয় হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই ঘনিষ্টতা হয়। আস্তে আস্তে তাঁহার এত স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়াছিলাম যে আমি বুঝিতে পারিতাম তিনি আমাকে তাহার ছোট সহোদরের স্থান দিয়াছিলেন। আমিও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় ভক্তি করিতাম এবং ভালবাসিতাম। এই ভালবাসাতে বড়ই আনন্দ পাইতাম। তিনি অতি স্নেহশীল ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই লোককে আপন করিয়া নিতেন। তাঁহার অমায়িকতাও স্নেহ পরায়ণতা দেখিয়া অনেক সময় অবাক হইয়াছি। পুত্র কন্যাগণকে তিনি কিরূপ ভাল বাসিতেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা শুধু অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। সন্তানগণসহ অনেক সময় একথালায় আহার করিতে দেখিয়াছি। সন্তানগণও পিতাকে অত্যন্ত ভালবাসিত এবং কখনও অবাধ্য হয় নাই। সন্তানগণের শিক্ষার প্রশংসা অনেকেই করিতেন। সন্তানগণকে ডাকিবার সময় 'বাবা' 'মা' শব্দ সর্ব্বদা তিনি ব্যবহার করিতেন। সহধর্ম্মিণীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার বড়ই মধুর ছিল। তাঁহার মতের উপযুক্ত শ্রদ্ধা দিতেন। প্রায় সকল কার্য্যেই বৌদির পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি জানিতেন বৌদির ভিতরে কি শক্তি আছে এবং তাঁহার হৃদয় খানি কত বড়।

রোগীর শুশ্রূষায় তাহার অদ্ভুত শক্তি দেখিয়াছি। হৃদয় যেমন সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল তেমন রোগীর সেবায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। বহুলোকের রোগ শয্যার পার্শ্বে তাঁহাকে দেখিয়াছি। আনন্দাশ্রমে কেহ রুগ্ন হইয়া আশ্রয় লইলে তাহার শুশ্রূষা নিজেই করিয়াছেন। পণ্ডিত রসিকলাল রায় ও কটকের ব্যারিষ্টার ৺সুকুমার রায়ের রোগ শয্যায় তিনি কিরূপ শুশ্রূষা করিয়াছেন তাহা আজ ও আমার স্মরণ হয়। কাহারও কোন বিপদের সংবাদ পাইলেই ছুটিয়া যাইতেন, অনেক বিপন্নকে আনন্দাশ্রমে আশ্রয় দিয়াছেন। একবার যাহারা আশ্রয় পাইয়াছেন তাহারা যে ঐ পরিবারের লোক নয় পরে কেহ তাহা বুঝিতে পারিতেন না। বাড়ীতে সকলের এক প্রকার খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময় বাড়ীতে যাহারা থাকিতেন তাহাদের সহিত একস্থানে বসিয়া আহার করিতেন। নিজে বাজারে গিয়া প্রায়ই মাছ তরকারি কিনিয়া আনিতেন। যাহাতে বাড়ীর সকলে তৃপ্তির সহিত আহার করিতে পারেন, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

দেশসেবা ও জনসেবায় প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। দেশহিতকর নানাবিধ অনুষ্ঠানের ভিতর লিপ্ত থাকিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে তাহা করিয়া যাইতেছিলেন। কোন কার্য্য হাতে গ্রহণ করিলে তাহাতে ডুবিয়া যাইতেন এবং শৃঙ্খলার সহিত তাহা সমাপন করিতেন। কলিকাতা

কংগ্রেসের গত দুই অধিবেশনের বন্দোবস্তের কৃতকার্য্যতা তাহার একান্ত পরিশ্রমের ফল। মটরগাড়ীসমিতির সভাপতি রূপে অনেক দিন কার্য্য করিয়াছেন এবং তাহার স্থির বুদ্ধি ও দক্ষতা দ্বারা চালকদিগের অনেক দুঃখ দূর করিয়াছেন। শ্রমজীবীদিগের তিনি সহায় ছিলেন। ১৯০৬ সনে Industrial Exibition, এর সম্পাদক রূপে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কয়েদিদিগের সাহায্য সমিতির (Prisoner's aid society) সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়া দেশের লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কয়েদিগণকে অনেক সময় রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছেন। তিনি ভাল রান্না করিতে জানিতেন। এজন্য অনেক সামাজিক নিমন্ত্রণে তাঁহাকে খুব খাটিতে হইত, কাহারও অনুরোধ এড়াইতে পারিতেন না। পরিশ্রম করিতেও কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। জনসভার সম্পাদকরূপে কার্য্য করিতে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। ফরিদপুরের সুহৃদসভার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য এবং সহঃ সম্পাদক ভাবে অনেক দিন কার্য্য করিয়াছেন। পারিতোষিক বিতরণের সময় পারিতোষিক ঠিক করিতে সমস্ত রাত্র একভাবে বসিয়া কার্য্য করিতে দেখিয়াছি। আমি তাহার সহিত ৮।৯ বৎসর সুহৃদসভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে কাজ করিয়াছি। সেখানেও তাহার সুবিবেচনা ও স্থির বুদ্ধির পরিচয় পাইয়াছি। ফরিদপুরের উন্নতি অন্তরের সহিত কামনা করিতেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ম্যালেরিয়াগ্রস্থ ফরিদপুরবাসীগণের Lantern lecture দ্বারা উপকার করিবার একটি প্রস্তাব করেন। সুহৃদ-সভা এ প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছিল কিন্তু তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি এজগৎ হইতে চলিয়া গেলেন। সুহৃদ-সভার পারিতোষিক বিতরণের জন্য একবার আমরা একসঙ্গে ফরিদপুর গিয়াছিলাম। অনুমান ১২ বৎসর পূর্ব্বে পুরাতন রিপন কলেজ গৃহে ফরিদপুরবাসীগণের একটি সম্মিলন হয়। তিনি এই সম্মিলনে খুব উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

তাঁহার বাহিরের কোন আড়ম্বর ছিল না। সকলের সহিত সমান ভাবে মিশিতেন। যে কেহ যে কোন সময়ে তাহার সহিত দেখা করিতে পারিতেন। তাঁহার ন্যায় একজন হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টারকে ঐরূপ ভাবে সকলের সহিত মিশিতে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইত। এইরূপ দেশীয় ভাব তাঁহার ন্যায় পদস্থ অন্য কোন বাঙ্গালীর ভিতর দেখিতে পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। ব্যবসা-ক্ষেত্রে তাঁহার খ্যাতি ছিল, সরল ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা তিনি বাহিরের লোকের যেরূপ ভালবাসার পাত্র হইয়াছিলেন সেরূপ সমব্যবসায়ীগণেরও প্রীতি ও ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। Bar Libraryর সম্পাদকের কার্য্য উপর্য্যপরি ৫।৬ বৎসর করিয়াছেন এবং তাহাতে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। Justice Ghose সেদিন হাইকোর্টে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা একটুও অতিরঞ্জিত নহে—"A man of most untiring energy who entered into the joys and sorrows of every member of the Bar. He had known him as Secretary of the Prisoners' aid society in which position his services were highly appreciated. He was one of the secretaries of the Calcutta Industrial Exhibition of 1906 and was mainly responsible for the success of that organisation. He was also one of the secretaries of the last two Indian National congress held in calcutta. In Industrial matters in which he

latterly took an interest, his influence was always on the side of law, order and sobriety of judgment. In his death not only had the profession lost a sincere friend but the public had lost a most capable citizen.

বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল। পিতার মৃত্যুর পর 'নব্যভারত' চালাইবার ভার স্বহস্তে নিয়াছিলেন। এই এক বৎসরের মধ্যেই কাগজের বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, দেশের উপকার হয় এইরূপ প্রবন্ধ দ্বারা কাগজ পূর্ণ করিবেন। এজন্য প্রবন্ধের জন্য অনেক বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে ধরিয়াছিলেন; এবং কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ইহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। নব্যভারত সম্বন্ধে তাহার সহিত অনেক সময় আমার কথা হইয়াছে। আমার বিশ্বাস তাঁহার আদর্শমত কাগজ খানি চালাইতে পারিলে উহা প্রথম শ্রেণীর কাগজ বলিয়া গণ্য হইত। নব্যভারতের জন্য গত এক বৎসর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

তিনি খুব পিতৃভক্ত ছিলেন। পিতার আদেশ কখনও অবহেলা করিতে দেখি নাই। পিতার সহিত কোন বিষয়ে মতভেদ হইলেও পিতার মত অনুসারে কার্য্য করিতেন। বহুলোকে পিতাকে ধরিয়া তাঁহাদ্বারা কাজ করাইয়া লইতেন। কোন এক সময় ভুল ধারণা করিয়া পিতা তাঁহার প্রতি কোন অবিচার করিয়াছিলেন, তিনি নীরবে তাহা সহ্য করিয়াছেন। পিতার সহিত কখনও তর্ক করিতে দেখি নাই। পিতা তাঁহার মৃত্যুসময় বোধ হয় সে ভুল বুঝিয়াছিলেন! মনে হয় পুত্রকে তাহা জানাইবার জন্যই অমরধামে পুত্রকে ডাকিয়া লইলেন। পুত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার অনুতাপের ভার দূর করিলেন।

গত ৯।১০ বৎসরের বিশেষ যোগে তাহার ভিতর যাহা দেখিয়াছি তাহার কয়েকটী কথা সংক্ষেপে বলিলাম। মৃত্যু আমাদের নিশ্চিত, তবু শোককে আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। আজ তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং সন্তানগণের অশ্রু কে মুছাইবে? তাঁহারা যে অভাবে আজ অভাবগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা এ সংসারে আর পূরণ হইবে না। ভগবানকে নির্ভর করা ব্যতীত এ শোকে সান্ত্বনা নাই। বন্ধু বান্ধবগণের শোকাশ্রু তাহাদের অশ্রুর সহিত মিশিতেছে। এ শোকের সান্ত্বনা এই যে, দেশে নানাশ্রেণীর বহুলোক আজ তাঁহার জন্য শোকাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহার স্মৃতি বহুলোকের হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে। এই সকল হৃদয়ে তিনি বহুকাল বাঁচিয়া থাকিবেন। এখন তাঁহার আত্মার অনন্ত উন্নতি কামনা করা ব্যতীত আমাদের আর কিছু করিবার নাই, তিনি যে রাজ্যে গিয়াছেন সেখানে যেন নিরবচ্ছিন্ন বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন ভগবান তাহাই করুন, আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি তিনি গ্রহণ করুন, একদিন আসিবে যখন ব্যবধান ঘুচিয়া যাইবে এবং সেই অমরধামে সকলের মিলন হইবে, ভগবান এ বিশ্বাস দৃঢ় করুন।

বরিশাল। শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত।
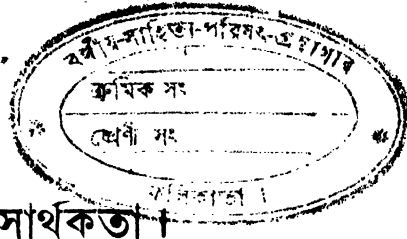
সার্থকতা

হেথা তব কর্ম্ম শেষ—সেথা প্রয়োজন,
তাই তব স্বর্গ হ'তে এল নিমন্ত্রণ !
চ'লেগেলে তুমি কর্ম্মী সে অপূর্ব্ব দেশে
তব নব কর্ম্মক্ষেত্রে, বিজয়ীর বেশে
গৌরব মুকুট পরি'—ওগো মহাপ্রাণ
ষষ্ঠিবর্ষ নহে কভু জীবনের মান ।
হয় তাহা নিরূপিত ধর্ম্মে কর্ম্মে দানে—
দেশের মঙ্গলে আর দশের কল্যাণে ।
প্রভাতে ফুটিয়া ফুল ঝরিছে সন্ধ্যায়,
তার পরিচয় শুধু কর্ম্ম-মহিমায় !
তার সার্থকতা শুধু সৌরভ-সম্পদে,
তার সার্থকতা শুধু দেবতার পদে !
তেমতি অল্পায়ু তব সুন্দর জীবনে,
কি ঐশ্বর্য্য রেখে গেলে নীরবে গোপনে !

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় ।

জলছবি ।

মাটির বুকে, অল্প একটু খানি ঠাঁই জুড়ে পড়ে থাকে জলাশয়, যেন সকলের কাজে আসবার জন্যেই । তার নিজের যেন কিছুই নেই—অভাবও না, ইচ্ছেও না ।

রোদের তাপে জল শুখিয়ে গিয়ে তার বুকের মাটি যখন ফেটে যায়, তখন তার জন্যে কাঁদে মানুষ । আবার বর্ষায় যখন তার কূল ছাপিয়ে যায়, তখন তার জন্যে আনন্দ করেও মানুষ !

বসন্ত দিনে, ঐ নিথর জলের বুকে রঙ্গিন ছায়া ফেলে, পাতা ভরা গাছের সারি ধীর বাতাসে দোল খেতে থাকে ; দুপুর বেলায় স্তব্ধতা ঘুচিয়ে দস্যি ছেলের দল, তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে অস্থির করে তুলতে চায় ; তবু এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ করেনা সে, যাতে মনে হ'তে পারে 'অনুভূতি' বলে একটা কিছু ওর আছে । এমন কি শান্ত সন্ধ্যায়, কর্ম্ম শ্রান্ত দেহ লতাটী ডুবিয়ে দিয়ে গ্রামের বধূটি যখন অবসাদ মেটায়, কিম্বা প্রিয় সখীর কানে কানে সব চেয়ে গোপন কথাটি বলে, বুকের নীচে কলসী রেখে, গভীর জলের দিকে এগিয়ে যায়—তখনও না ! পায়ের ধাক্কা লেগে যে জলটুকু ছলকে ওঠে, সে যেন জলের শব্দ নয় ; ঐ মেয়েটির রুদ্ধ হাসিরই প্রতিধ্বনি । সে থাকে স্তব্ধ । তার চার পাশের মাটির সীমানার মতই ।

কিন্তু ওর অর্থ কি ? রক্ত রাঙ্গা পাপ্ড়ি গুলি মেলে দিয়ে, নিবিড় কালো বুকের তল হ'তে ধীরে ধীরে ঐ যে বেরিয়ে এল ! ও কোন বেদনার ভাষা ? আর তারই পাশে ফুটে আছে শান্তি ভরা ও কার শুভ্র হাসির শ্বেত শতদল !

২

পাষাণ পুরীর প্রাচীর ঘেরা আঙ্গিনায় হিমানীর বুকে পাষাণের মতই অচল হয়ে অচেতনে ঘুমিয়েছিল নির্ঝরিণী। জমাট কুয়াসার আবরণ সরিয়ে দিয়ে রবির আলো, মোহন স্পর্শ খানি তার সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে দিল।

পাখীর গানে আকাশ ভরে গেছে। সবুজ ওড়নার ভিতর হ'তে মুকুল গুলি তাদের অমলিন মুখ বাড়িয়ে দিল। দমকা হাওয়া নির্ঝরিণীর গায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে তার কানে কানে কি বলে গেল কে জানে! চমকে উঠে, হাজার হাত উঁচু প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে পড়ে, নির্ঝরিণী বল্‌ল চল্‌-চল্‌-চল্‌।

মাটি বুক পেতে তাকে ধরতে গিয়ে বল্‌ল—ওকি? কোথা যাও? ওগো তটিনী, একটু দাঁড়াও।

মাটিকে দুপাশে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তটিনী হেসে উঠ্‌ল খল্‌-খল্‌-খল্‌। তার হাসির তালে তালে শত শত উপল খণ্ড নাচ্‌তে নাচ্‌তে আনন্দে মাতাল হয়ে ছুটে চলল—বাধা বাঁধন ভাঙ্গল!

মাটি তাকে ধরে রাখতে পারল না। কিন্তু তার গলায় যে ঐশ্বর্য্যের মালা গাছি পরিয়ে দিল, যমুনার কালো বুকে তাজমহলের ছায়া-ছবিখানিতে সেই ইতিহাসই ত লেখা আছে।

এমন কত ছবি তার বুকে আঁকা হয়ে গেল। কত স্পর্শ তাকে আকুল করে, পাগল করে দিল। সে চল্‌ল বিরামহারা হাসির সুরে নাচের তাল মিলিয়ে, তরুণ রবির সোনার আলো, তখন রুদ্রের দীপ্ত চোখের মত জ্বলে উঠেছে! বিশ্বচরাচর নিশ্বাস রুদ্ধ করে পড়ে আছে যেন চেতনা হীন! বাঁকের মুখে ত বনের শ্যামল ছায়াটুকুর কাছে এসে তটিনীর গতি যেন একটু শিথিল হয়ে এল! যেন আর সে বইতে পারে না! ঐখানটায় একটুখানি জুড়িয়ে নিতে চায় সে।

ছোট ছোট ঢেউগুলি আনন্দের গান ভুলে ক্লান্তি ভরে কূলে এসে লুটিয়ে পড়ছে! বাতাস ও যেন মরে গেছে কিন্তু তটিনীর থামা হলনা! সে ছুটল আপনার চলার বেগে আবর্ত্তের সৃষ্টি করতে করতে।

মাটি বারে বারে তার কোমল বুক খানি পেতে দিয়ে বলে—ওগো একটু দাঁড়াও। আমার বুকেই যে তোমার ঠাঁই।

আঘাতে আঘাতে তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে হেসে তটিনী বলে—আমার ঠাঁই?—নাই—নাই। সে কোথাও নাই।

তাকে চল্‌তে হবে। কিন্তু কোথায়? এযে বিরাম বিহীন চলা! দিনের পর দিন চলে যায় তবু এ চলা ফুরায় না যে?

কিন্তু ফুরাল। চলা তার থামল। হাসি গান তার থাম্‌ল। পথের শেষে এসে পৌছল যখন সে সাগরে—

আর কোথাও যাবার নেই! পথ নেই পাখী তাকে গান শুনিয়ে যায় না। বাতাস তেমনি করে স্নিগ্ধ স্পর্শে তাকে আকুল করে তোলে না। বারে বারে মাটিও তাকে আর বুক পেতে বলে না ওগো দাঁড়াও, একটু থাম।

তার প্রাণের সমস্ত হাসি শুকিয়ে গিয়ে জেগে উঠল—কান্না। কিন্তু চলার দুর্দ্দমনীয় বেগ

মরে গেল না! পথ নেই, তাই সে শুধু আপনারই বুকে পড়ে আর ওঠে—আর কারো স্পর্শ সে পায় না, কিন্তু তার বুকে ভরা আছে সেই স্পর্শের স্মৃতি।

এই সাগর তার মরণ। এই খানে এসে তার জেগে কাটাবার পালা। কান্নাই তার কাজ। এই জন্যেই ত সাগরের রং নীল, মরণেরই রূপ। রক্তের চিহ্ন মাত্র ওতে নেই।

হাজার প্রাণের দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলে ভরা যে তটিনীর বুক। সবাই যে তার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্তি পেতে এসেছিল ছুটে। সবাই যে তার বুকে বোঝা নামিয়ে দিয়ে নিজেদের বুক হাল্কা করে নিয়েছে কিন্তু তার বোঝা ত কেউ নামিয়ে নিল না! এত প্রাণের ব্যথার বোঝা বয়ে, হাসি তার মুখে ফোটে কি করে?

ও ভার ত কোথাও নামাবার নয়। এমন ঠাঁই কোথাও আছে কি? ওযে গচ্ছিত রত্ন। ওর একটিকেও ত অবহেলা করবার নয়। তাই প্রাণপণে সবগুলিকেই সে আঁকড়ে ধরে রইল।

এ অনন্ত মরণে ঐ ত তার একমাত্র সান্ত্বনা। ঐ সান্ত্বনা কে বুকে চেপে তার সকল কান্নার মধ্যেও সে বলে হে ঠাকুর তোমায় নমস্কার। ভার আমায় দিয়েছ, সেই সঙ্গে বইবার শক্তি ও দিয়েছ আমায়, নইলে আমাকেই বেছে নিলে কেন? এ আমার মহাসৌভাগ্য! আর কোন সংশয় নেই! আমি বুঝেছি, যে বন্ধনকে অসহ্য মনে হ'য়েছিল, সেই বন্ধনেই আমার মুক্তি লুকিয়েছিল আমি দেখিনি! যাকে মুক্তি ভেবে বন্ধনকে ছিঁড়ে এসেছি সে মুক্তি মরণেরই রূপান্তর।

কান্নার আবেগে মাটির কোলে আশ্রয় নিতে গিয়ে সে দেখ্‌ল—মাটি মরে গেছে। পড়ে আছে তার কঙ্কাল! সে সরসতা নেই! সে হাসিও নেই!

৩

চোখ জিনিসটা যেন বাতায়ন। পাঁজর ঘেরা রুদ্ধ কারার অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসে, প্রাণ সময় সময় এই খান থেকে আপনাকে বাইরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে নিতে চায়।

কিন্তু সে ত সহজ নয়। কারণ এখান থেকে চীৎকার করে ত বলা চলে না—সব কথাই নীরবে কইতে হয়। তাই তার খবর সবাই পায় না।

মানুষের স্বভাব কান দিয়ে জানা। চোখ দিয়ে ত নয়। তাছাড়া সব সময় ওটা সকলের খোলাও থাকে না। তাই কোন শ্রান্ত প্রাণ যদি এই বাতায়ন তলে এসে নীরবে অপেক্ষা করে থাকে, তাহলে তার সে অপেক্ষার একটা সীমাও সাধারনতঃ থাকে না। হয়ত কারো সাড়া পায়ও না সে জীবনে। দাঁড়িয়ে থাকাই সার হয়। দরদীর খবর মেলে না।

কিন্তু যে মুহূর্ত্তে পায়, সে মুহূর্ত্তটিরই বর্ণনা কি দিয়ে হবে? কে পারবে?

ঐ দুটি চোখে চোখে কি বলা হয়ে যায়? ওর সুখের কাছে বিশ্বের আনন্দ যে ম্লান হয়ে যায়। ওর বেদনার কাছে শত বজ্রাঘাত যে ফুলের আঘাত বলে মনে হয়।

ঐ দুটি বাতায়ন হতে প্রাণ যখন বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে বলে—ওগো তুমি ছিলে এই মাটির পৃথিবীতেই? একি তোমায় আমি দেখছি? তখন ঐ দুটি কথার আড়ালে আরো কি লুকিয়ে রাখে ওরা?

ধীরে ধীরে বাতায়ন বন্ধ হয়ে আসে! প্রাণ যেন গলে গিয়ে জল হয়ে বেরিয়ে এসে মাটিতে পড়ে হারিয়ে যায়। তার পর কি রইল বাকি? আলো না অন্ধকার?

৪

তাপ-দগ্ধ মাটি, আপনারই গ্লানির ধূলায় মলিন শয্যা হ'তে, নীল আকাশের গায়ে পারিজাতের মত স্নিগ্ধ জ্যোতিলেখার দিকে স্থির নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে—কি করে ওর স্পর্শ পাওয়া যায়? ওখানে গিয়ে পৌছান যায় কি? ওর স্পর্শে যে তার সমস্ত কলুষ শুভ্র সুন্দর হয়ে উঠ্‌বে।

এই কথাটি ভেবে ভেবে বুকে তার যে কান্না ওঠে, তা বাইরের হাওয়ায় ভেসে যায় না—প্রকাশ পায় না। আপনার বুকেই জমাট বেঁধে, অচল হয়ে পড়ে থাকে।

তার বাইরের সমস্ত রূপ হাসি গানের নীচে ঐ জমাট বাঁধা কান্না, প্রচণ্ড তেজে জ্বল্‌তে থাকে অহরহঃ—সে নেভেনা তাই তার চোখে ঘুম নেই।

জ্যোতিলেখা, নির্ম্মাল্যের ডালি সাজিয়ে, মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। করুণায় তার বুক ভরে যায়। বলে—ওগো মাটি, আমি যে তোমার কোন কাজেই এলাম না! তোমার দীর্ঘ শ্বাস যে আগুনের চেয়েও শুষ্ক! তাই তোমার কাছে গিয়ে পৌছাতে পারিনা—পুড়ে মরে যাই।

মাটি বলে কিন্তু পেতেই যে হবে তোমায়। নইলে আমার জ্বলে মরাই সার হবে। জুড়োতেই যে হবে আমায়।

জ্যোতিলেখা বলে কি করে তা হবে? তুমি যে রেখেছ নিজেকে মরণ জাল দিয়ে ঘিরে।

মাটিবলে—তবে আমিই যাব তোমার কাছে।

উঠ্‌ল মাটি! জমাট বাঁধা কান্না কাল বৈশাখীর দুর্নিবার আবেগ নিয়ে ধূলায় নির্ম্মল আকাশ কে মলিন করে, বজ্র গম্ভীর চীৎকারে দিক কাঁপিয়ে, তড়িৎ অসির আঘাতে অন্ধকারের বুক চিরে চিরে ছুট্‌ল মাটি! জাগ্‌ল কান্না—চাই-চাই চাই

কোথায় সে? কোন অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে আছে সে? খোঁজ তাকে, বার কর তাকে। একেবারে টেনে এনে আপনার তপ্তমরু বক্ষে চেপে ধর, শান্তি হোক!

আরম্ভ হল খোঁজা! ঘুর্ণি হাওয়ার পাকে পাকে নিষ্পেষিত হয়ে তরু গুল্ম লতা লুটিয়ে পড়ল! বনস্পতির পাতা ছাওয়া রঙ্গিন আস্তরণ গেল উড়ে! তটিনীর জলরাশি সীমা ছাড়িয়ে উঠে এল তীরের ওপর! ভীত ত্রস্ত জীব নীড় ছেড়ে নেমে এল বাইরে—অনাবৃত আকাশের নীচে!

কোথায় সে? আরো কত দূর? সূর্য্য কখন মেঘের আড়াল হতে নীল সাগরের ক্ষিপ্ত অতল জলের তলে নেমে গেছে! বাতাস কেঁদে বল্‌ছে—নাই নাই সে নাই দিনের খোঁজা বৃথা এ পৃথিবীতে, এ আকাশে যা আছে তা শুধুই শূন্যতা।

ক্লান্তিভরে মাটি লুটিয়ে পড়ল মাটির শয্যায়। বর্ষণ নাম্‌ল! এ যেন তারই দেহ মনের অবসাদ জল হয়ে ঝরে পড়ছে!

নিশুতি রাত্রি, ঝিল্লি ডাকে না। গাছের শাখাও নড়েনা! শুধু তার ভিজে পাতা হতে বিন্দু বিন্দু জল ধারা ঝরে ঝরে পড়ছে।

হঠাৎ বাতাস নিশ্বাস ফেলে বলে উঠ্‌ল—'ওগো মাটি, বুঝি খোঁজা তোমার সার্থক হয়েছে! চোখ মেলে দেখ—ঐত সে তোমারই বুকের ওপর!

মাটি দেখিল—চোখের জল ঝরে ঝরে তার বুকের যেখানে জমা হ'য়ে রয়েছে, তারই মধ্যে আঁকা আছে ও কার ছবি?

মাটি বল্‌ল—এই কি পাওয়া? কিন্তু আমার যে আর সে তৃষ্ণা নেই! এ পাওয়া যে না পাওয়ারই মত সমান বেদনার।

মাটি পড়ে রইল নিশ্চল নির্ব্বাক। জ্যোতিলেখা তেমনি করেই তাকিয়ে রইল তার দিকে। বাতাস কেঁদে ফির্‌ছে বৃথা—বৃথা—সব বৃথা।

শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ।

স্বাধীনতা ও পরাধীনতা।

(১)

এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে মানব সমাজে অথবা সমাজবদ্ধ মানবের মধ্যে অত্যন্ত বর্ব্বরেরা সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন। যারা পর্ব্বত-গুহায় বাস করে, ঘর বাড়ী বাঁধিতে জানে না; বনের পশু শীকার করিয়া খায়, চাষবাস করিতে শেখে নাই; পারিবারিক বন্ধন যাদের অত্যন্ত শিথিল, নাই বলিলেই হয়;—এরূপ বর্ব্বরেরা জীবনে যে পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করে, অপক্ষাকৃত সভ্যতর সমাজের লোকে সে পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পায় না। এইরূপ বর্ব্বর সমাজে ধর্ম্মের শাসন বা সমাজের শাসন, দুই চারিটা বাহিরের আচারেতেই আবদ্ধ। নিজেদের মধ্যে তারা অকারণে বা অতি সামান্য কারণে সর্ব্বদা মারামারি কাটাকাটি করে। পরস্পরের আততায়িতা হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিবার জন্য নিম্নতম স্তরের বর্ব্বর সমাজে কোনও প্রকারের শাসন-ব্যবস্থা নাই। শরীরের শক্তি ও প্রত্যেকের বুদ্ধির কৌশলই সে অবস্থায় আত্মরক্ষার এক মাত্র উপায়। সমাজের সংহত শক্তি দুর্ব্বলকে প্রবলের হাত হইতে রক্ষা করে না! কেবল অন্য জাতির আততায়িতা হইতে নিজের জাতিকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইলে, সমাজ-শক্তি সংহত হইয়া সমাজ-পতি বা সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত হয়। এক দিক দিয়া দেখিলে এই বর্ব্বর সমাজে লোকে যতটা স্বাধীনতা ভোগ করে সভ্যতর সমাজে তার শতাংশের একাংশও ভোগ করিতে পারে না।

(২)

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বর্ব্বর সমাজের এই স্বাধীনতার সংকোচ আরম্ভ হয়। মানুষ একান্ত একাকীত্বের মধ্যে যতটা স্বেচ্ছাধীন হইয়া চলিতে পারে, আর একজন মানুষের সঙ্গে মিলিয়া বসবাস করিতে গেলেই আর ততটা পরিমাণে নিজের ইচ্ছামত সর্ব্বদা চলিতে পারে না। মানবের মিলন মাত্রেই তার স্বাধীনতার সংকোচ করে। এইজন্য যে চিরদিন অবিবাহিত থাকিয়া নিজের পিতামাতা, ভাইভগিনী হইতে পৃথক থাকে, সে যে-পরিমাণে স্বাধীন, পরিবার

পরিজনকে লইয়া যে থাকে সে কখনই সে-পরিমাণে স্বাধীন থাকিতে পারে না। পরিবারের মধ্যে বাস করিতে গেলেই পরিবারবর্গের প্রত্যেকের রুচি প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছাকে অপর সকলের রুচি, প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছার সঙ্গে স্বল্প-বিস্তর মিলাইয়া চলিতে হয়। এরূপ না করিতে পারিলে পরিবারের মধ্যে কখনও শান্তি থাকিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার পরিবারের সুখ-শান্তি এবং সমবেত শক্তি বৃদ্ধির জন্য নিজের স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করিতে হয়।

কিন্তু এইরূপে নিজের স্বাধীনতার সঙ্কোচ করিয়া মানুষ একটা বৃহত্তর সঙ্ঘের অধীন হইয়া নিঃসঙ্গ একাকীত্বের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্রতর স্বাধীনতার যে-পরিমাণে সার্থকতা লাভ করিতে পারিত, তদপেক্ষা অধিকতর সার্থকতা লাভ করে। মানুষ প্রকৃত পক্ষে কখনই নিতান্তই স্বাধীন নহে। তার জীবনধারণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন, সুতরাং সে খাদ্যের অধীন। শীত আতপ হইতে দেহটাকে রক্ষা করিবার জন্য তার বাসস্থানের প্রয়োজন; সুতরাং সে বাসস্থানের অধীন। শীত নিবারণ কিংবা অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য তার বস্ত্রের প্রয়োজন, সুতরাং সে বস্ত্রের অধীন! প্রজোৎপত্তির জন্য নর-নারীর একত্র বাস করা আবশ্যক; সুতরাং জীবনের এই মুখ্য সার্থকতা সম্পাদনের জন্য পুরুষ স্ত্রীর এবং স্ত্রীর পুরুষের নিকটে স্বল্প বিস্তর পরিমাণে আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। নিতান্ত বর্ব্বর সমাজেও মানুষকে এই অধীনতা গ্রহণ করিতেই হয়। আর এ সকল অধীনতা এতটা পরিমাণেই তাহাকে বহন করিতে হয়, যে নিম্নতর স্তরের বর্ব্বর সমাজে আর এক দিক দিয়া দেখিলে মানুষ যে-পরিমাণে পরাধীন হইয়া রহে, সভ্যতর সমাজে সে পরিমাণে পরাধীনতা ভোগ করে না।

(৩)

সমষ্টির ভিতর দিয়া ব্যষ্টির জীবনের প্রসার ও শক্তি-বৃদ্ধি সভ্যতার মূল লক্ষণ। যে সমাজে যে পরিমাণে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সমাজের শৃঙ্খলা ও শাসনের সাহায্যে নিজেদের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সার্থকতা সাধন করিতে পারে, সেই সমাজই সর্ব্বাপেক্ষা সু-সভ্য। একে অন্যের সাহচর্য্য করিয়া সভ্য-সমাজের লোকেরা প্রত্যেকের স্বাধীনতাকে এক দিকে সঙ্কুচিত করিয়া আবার আর একদিকে তাহাকে বাড়াইয়া দেয়। আমাকে যদি আমার প্রতিদিনের আহার্য্য নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে হইত,—অর্থাৎ আমি ভাত খাই আমাকে যদি আমার নিজের প্রয়োজনীয় ধানের চাষ করিতে হইত; মাছ খাই যদি প্রতিদিন মাছ ধরিয়া আনিতে হইত; শাক শব্জী খাই যদি নিজের হাতে সেগুলি বুনিতে ও কাটিতে হইত; তেল নুন ঘি, রাঁধিবার কাঠ বা কয়লা হাঁড়ি বা কলসী প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র নিজেকে প্রস্তুত করিতে হইত; আমার বস্ত্রের প্রয়োজন, যদি নিজেকে সুতা কাটিয়া তাঁতে ফেলিয়া বস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইত; আমার বাসগৃহের প্রয়োজন যদি নিজেকে বাসগৃহের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়া ঘর বাঁধিতে হইত; কেবল মাত্র জীবনধারণের জন্য যাহা অত্যাবশ্যক প্রতিদিন যদি সেগুলি নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে হইত; তাহা হইলে এই বাহিরের প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া এই দেহ রক্ষা ও দেহের সেবা করিতে গিয়াই আমার সমুদয়, শক্তিও সময় নিঃশেষ হইত। আর সে অবস্থায় আমি কোনও দিন পশুত্বের ভূমি হইতে উঠিয়া উচ্চতর মানবতার

ভূমিতে দাঁড়াইতে পারিতাম না। যে যার সেবা করে সে তার অধীন হইয়া রহে। সে অবস্থায় বাহ্য প্রকৃতি ও নিজের পশুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই আমাকে একান্তভাবে ইহাদের অধীন হইয়া থাকিতে হইত।

(৪)

সমাজবদ্ধ হইয়া যেদিন আমি দশজনের সঙ্গে মিলিয়া পরস্পরে পরস্পরের অধীন হইয়া একে অন্যের ভার বহন করিতে আরম্ভ করিলাম, সেদিন আমি বর্ব্বর-সমাজোচিত স্বাধীনতার বলিদান দিয়াই উচ্চতর স্বাধীনতার অধিকার পাইতে লাগিলাম। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যাহা অসম্ভব ছিল, সমাজের সংহত শক্তিতে তাহা সম্ভব হইয়া উঠিল। এখন আর আমাকে দিনরাত নিজের ভাবনা ভাবিতে হয় না, সমাজের উপর সে ভাবনা দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া আছি। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন লোকে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পরস্পরের কৃতকার্য্যের ফলভাগী পরস্পরকে করিয়া জীবন-ধারণটা সহজ ও স্বল্পায়াসসাধ্য করিয়া তুলিয়াছে। একাকী আমি যাহা পারিতাম না, পরিবারের সমষ্টিগত শক্তির সাহায্যে তাহা করিতে পারিতেছি। কেবল পরিবারের সাহায্যে নিজেকে যে-পরিমাণ স্বাধীন করিতে পারিতাম না, সমাজ-শৃঙ্খল ও সমাজশাসনের অধীনতা স্বীকার করিয়া তদপেক্ষা শতগুণ অধিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি। এই ভাবেই সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্বাধীনতা একদিকে সঙ্কুচিত হইয়া আর একদিকে সম্প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে।

(৫)

এই স্বাধীনতার মূলসূত্র সাহচর্য্য বা আজি কালিকার ভাষায় 'সহযোগ'—ইংরাজিতে যাহাকে co-operation কহে; অসহযোগ বা non-cooperation নহে। সহযোগ মাত্রেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে; কিন্তু আবার সীমাবদ্ধ করিয়াই, তাহাকে বাড়াইয়া ও ফুটাইয়া তোলে। আর অসহযোগ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বাহিরের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াই মূলতঃ তাহাকে নষ্ট করিয়া দেয়। এই কথাটা না বুঝিলে আমরা স্বাধীনতার নামে বর্ব্বরতাকেই বরণ করিয়া লইব।

সহযোগে জীবন, অ-সহযোগে মৃত্যু; সহযোগে সংযম, অ-সহযোগে স্বেচ্ছাচার; সহযোগে ব্যক্তিত্বের বিস্তার; অ-সহযোগে নিরঙ্কুশ ব্যক্তিত্বের দ্বারা সেই ব্যক্তিত্বেরই বিনাশ। স্বাধীনতার সত্য আদর্শ সমাজজীবনে এবং সমাজবন্ধনের মধ্যেই প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার বাহিরে নহে। সমাজবন্ধন সামাজিক শাসনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক শাসন সমাজশৃঙ্খলার উপরে এই শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমাজ শাসনকেই ইংরাজীতে গভর্ণমেণ্ট কহে। আমাদের ভাষায় আমরা ইহাকে রাজা বা রাজ্য কহিয়া থাকি। যেখানে গভর্ণমেণ্ট নাই, অর্থাৎ যেখানে সমাজের সমষ্টিগত শক্তি, সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির প্রবৃত্তি ও কর্ম্মকে সংযত করিয়া না রাখে, সেখানে নিত্য সংগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে সত্য স্বাধীনতা আপনার আসন পাতিবার তিলার্দ্ধ স্থান বা সময় পায় না। যেখানে গভর্ণমেণ্ট নাই, সে অবস্থাকেই অরাজকতা কহে। অরাজকতার অবস্থায় স্বেচ্ছাচারের অত্যাচারে] স্বাধীনতা তিষ্ঠিতে পারে না। সুতরাং সত্য স্বাধীনতা যে চাহিবে, সমাজশৃঙ্খলাকে সে রক্ষা করিবেই করিবে।

সমাজ-শৃঙ্খলা, সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পরস্পরের সম্বন্ধ বা সাহচর্য্যের বা সহযোগের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই সাহচর্য্য এবং সহযোগের উপরেই সমাজের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হয়।

(৬)

সমাজ যখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে নষ্ট করিয়া দেয়, তখন সে স্বাধীনতা উদ্ধারের কল্পে সমাজ-শক্তির সঙ্গে ব্যক্তির লড়াই বাধিয়া যায়। যখন এই সমাজদ্রোহী ব্যক্তি সমাজের অধিকাংশ লোকের সাহচর্য্য বা সহযোগ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তখনই সে এই সংগ্রামে জয়লাভ করে। এই জয়ের দ্বারা সমাজ-শক্তি নষ্ট হয় না, কিন্তু আদিতে যাহা দ্রোহীভাব ছিল, তাহার সঙ্গে আপোষ করিয়া তাহারই মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ এই সংগ্রামের ভিতর দিয়াই ব্যক্তি, সমষ্টির সঙ্গে নিজের একাত্মতা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে বিরোধও স্থায়ী হয় না, চিরদিনের বিচ্ছেদও ঘটে না। এই সংগ্রামে ব্যষ্টি যতদিন পর্য্যন্ত সমষ্টিকে সম্যকরূপে আশ্রয় করিতে না পারে, ততদিন তার স্বাধীনতা লাভ হয় না। সংগ্রামে স্বাধীনতা নাই। যুযুৎসু ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত চলিতে ফিরিতে পারে না; শত্রুর চাল বিচার করিয়া তাহাকে চলিতে হয়। শত্রুর ইচ্ছায় নহে, কিন্তু সতত শত্রুর কর্ম্মের অধীন হইয়া সে পড়ে। স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন বটে। কিন্তু যতক্ষণ না এই সংগ্রামের অবসানে সত্য সন্ধির কিম্বা উভয়পক্ষের মধ্যে প্রকৃত সাহচর্য্য বা সহযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা আপনাকে প্রাপ্ত হয় না। সমাজের অন্তর্গত ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্বন্ধে একথা যেমন সত্য, দুই সমাজের বা জাতির মধ্যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম বাধিলেও তাহা সেইরূপই সত্য হয়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

শিশুপীড়ন।

যারা পশুপীড়ন করে তারা আইন অনুসারে দণ্ডনীয়, কিন্তু সুশিক্ষা ও সুশাসনের দোহাই দিয়া পিতামাতা, শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী নীতি ও ধর্ম্মোপদেষ্টা নির্ম্মমভাবে শিশুপীড়ন করিয়া কোন শাস্তিই পান না। কত পিতামাতা সন্তান হারাইয়া আমরণ বিলাপ করেন "শিক্ষাও শাসনের নামে ছেলে মেয়ের প্রতি কেন এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলাম! তারা দু'দিনের জন্য আমাদের কাছে আসিয়াছিল,—পরিপূর্ণ ভালবাসা দিয়া—বুকে রাখিয়া, কোলে রাখিয়া মানুষ করিলাম না কেন?" কোন কোন শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী ও বোধ হয় শিশুপীড়নলীলা শেষ করিয়া ছাত্রছাত্রীদের প্রতি নিষ্ঠুরতার কথা মনে করিয়া অনুতপ্ত হন। কিন্তু নীতি ও ধর্ম্মোপদেষ্টাদের মনে সর্ব্বদাই এই গর্ব্ব থাকে—"আমরা বালকবালিকগণকে মুক্তির পথে আনিবার জন্য অবিরল বাক্যবাণবর্ষণ করিয়া বালসুলভ চপলতা দূর করিয়া মুখের হাসি ও মনের স্ফূর্ত্তি বিনাশ করিয়াছি, সে জন্য আমরা ভগবানের কাছে পুরস্কার পাইব।"

মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ শিশুপ্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিয়াছেন—শিশুদের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া জোর করিয়া কোনও একটা পথে পরিচালিত করিলে, তাদের শক্তির বিকাশ হয় না, তারা যন্ত্রস্বরূপ হয়—মানুষ হয় না। যাঁরা জোর করিয়া নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগকে ধ্রুব প্রহ্লাদ গড়িয়া তুলিতে চান, তাঁরা শিশুপ্রকৃতির সহিত পরিচিত নন এবং ইহার কুফল কত বড়, সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামির জন্য তাহা ভাবিয়া দেখিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। হাসিতে খেলিতে, আনন্দে স্ফূর্ত্তিতে, বালকবালিকারা নানাপ্রকার শিক্ষায় বাড়িয়া উঠিলে স্বাভাবিকভাবেই অজ্ঞাতসারে নীতিধর্ম্মে মণ্ডিত হইয়া উঠে। শিশুদের মনে জোর করিয়া নীতিধর্ম্ম ঢুকাইতে চেষ্টা করিলে নীতি ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের বিরক্তি ও বিদ্বেষ জন্মে এবং তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। যত প্রকারে শিশু-পীড়ন হয় তন্মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মদণ্ডের শাসন সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকর। আমরা দেখিয়াছি, যারা প্রচারকশ্রেণীর লোকদের হাতে না পড়ে, তারা যৌবনে উচ্চ উদার নীতিধর্ম্মে বিকশিত হইয়া উঠে, তাহাদের শ্রদ্ধা নিষ্ঠার ভাব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয় না। বাল্যকাল হইতেই পিতামাতা শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী প্রভৃতির নিকট হইতে শিশুরা তিরস্কার, প্রহার ও অনেক রকমের অবমাননা সহ্য করিতে করিতে যখন বড় হইয়া উঠে, তখন তাহাদের আনন্দ, উৎসাহ, সাহস, বলবীর্য্য, আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান প্রভৃতি মনুষ্যত্বের সকল উপাদান বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা প্রণালীর কলে পড়িয়া পিষ্ট হইয়া যখন তাহারা বাহির হয় তখন তাহাদের শরীরটি হয় কালীঘাটের কাঠের পুতুলের মত, আর সৃষ্টির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বিচিত্র পবিত্র অমৃতরসপূর্ণ মানবমন একেবারে শুষ্ক নীরস মরুভূমির বালুকণার মত হইয়া যায়। এইরূপে মনুষ্যত্বহীন হইয়া যুবকগণ যখন সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন দাসত্ব ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যের উপযোগিতা তাহাদের থাকে না। ইংল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক চার্লস্ ডিকেন্স্ বোর্ডিংএর সুপারিন্টেন্ডেণ্ট ও স্কুলের শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীদের নানাপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি যখন শক্তিশালী লেখক হইলেন তখন তিনি সেই অত্যাচার কাহিনী জীবন্ত জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে অসহায় বালক বালিকারা মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ করিতে পারে না, অত্যা-চারের প্রতিশোধ লইবার যাহাদের শক্তি নাই, তাহাদের প্রতি যাহারা অত্যাচার করে, তাহারা কাপুরুষ। এই দানবপ্রকৃতির মানব পাশব ব্যবহারের জন্য গুরুতররূপে দণ্ডনীয়। ডিকেন্সের উপন্যাসে শিশুপীড়নের করুণকাহিনী পড়িয়া চোখের জল রাখা যায় না এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতি শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীর প্রতি বিষম ঘৃণার উদ্রেক হয়। ডিকেন্সের লেখনী সার্থক হইয়াছে, ইংল্যাণ্ডের লোকের চোখ ফুটিয়াছে, শিশুদের শিক্ষা প্রণালীতে দণ্ডনীতির পরিবর্ত্তে স্নেহনীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অন্য দেশের সংবাদ ভাল করিয়া জানি না, কিন্তু আমাদের দেশে দেখিতেছি ছেলেমেয়েরা যাহাতে মানুষ হইয়া উঠিতে না পারে তাহার জন্য চারিদিক হইতে বিধি ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে। পিতামাতার শাসন তো আছেই, কিন্তু তাহার মধ্যে ভালবাসা আছে বলিয়া সে শাসন তত মারাত্মক নয়, কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী পুলিসের স্থান অধিকার করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কলে পিষিতেছেন এবং অনুগত

পদানত ভৃত্য প্রস্তুত করিতেছেন, ধর্ম্মোপদেষ্টারা ধর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিতেছেন,—এ অবস্থায় মানুষ হইবার আর পথ নাই। কুড়িবৎসর ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি শিক্ষা-সংস্কার চলিতেছে। বালকবালিকাদের জন্ত কিণ্ডার গার্টেন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তোতা পাখীর মত বই মুখস্থ করিয়া হয়রান হইতে হইবেনা। অতিরিক্ত পড়ার চাপ দেওয়া হইবে না। শারীরিক দণ্ড উঠিয়া গেল। কিন্তু বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও ঐ আদর্শে গঠিত কয়েকটি বিদ্যালয় ব্যতীত যে বিদ্যালয়েই যাই, দেখিতে পাই, ছেলেমেয়েরা রাশি রাশি বইয়ের পড়ার চাপে ভারাক্রান্ত, বিদেশীয় বিজাতীয় ভাষা শিখিতে ও গ্রামার ইত্যাদি কণ্ঠস্থ করিতে করিতে কণ্ঠতালুশুষ্ক হইয়া যাইতেছে; বেত্রদণ্ড উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া—কানমলা, ঘুঁসি, কিল, চড় খাইতেছে এবং গাধা, গরু, মুর্খ, চাষা প্রভৃতি অপমান সূচক গালি নীরবে হজম করিতেছে। দেখিতে পাই স্কুলে যাওয়ার জন্য ছেলেমেয়েরা সকালে প্রায় নটার সময় খায়, তারপর সমস্ত দিন আড়ষ্ট হইয়া ক্লাসে একজায়গায় বসিয়া থাকে, নড়াচড়ার অধিকারও পায় না। টিফিনের সময় একবার একটু নড়ে চড়ে, সে সময়ে সকলের ভাগ্যে খাবার জোটে না। আবার নিয়ম রক্ষার জন্য ড্রিলমাষ্টার বেত হাতে করিয়া মিলিটারি ধরণে ড্রিল শিক্ষা দেন; খালি পেটে ড্রিল করিতে করিতে তাল কাটিয়া গেলে, ড্রিলমাষ্টারের বেত খাইতে হয়। এই দৃশ্য দেখিয়া কে চোখের জল রাখিতে পারে? বলা বাহুল্য এ দৃশ্য আমি ছেলেদের স্কুলেই দেখিয়াছি, মেয়েদের স্কুলে দেখি নাই। ব্রাহ্মসমাজের লোক সংস্কারকের দল, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী, ছাত্রাবাস ও ছাত্রী আবাসের তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়িকা হইয়াছেন এবং উচ্চ কণ্ঠে ধর্ম্ম ও নীতি উপদেশ দিতেছেন তাঁহারাও সকলে বালক বালিকাদের প্রতি স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিতে পারেন না কেন বুঝিতে পারি না। কোন ছাত্রী আবাসের ছাত্রী ষোলআনা বাধ্যতা স্বীকার না করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল বলিয়া, একজন ধার্ম্মিকা ব্রাহ্মিকা তাহাকে স্নানের ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; অনাহারে অনিদ্রায় হতভাগিনীকে সেই জেলখানায় থাকিতে হইয়াছিল। আর একজন ব্রাহ্মিকা পড়া মুখস্থ করে নাই বলিয়া একটি ছাত্রীকে কয়েকঘণ্টা রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন, সে জন্য তাহার জ্বর হইয়াছিল। একজন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বিএগ্রস্ত ধর্ম্মোপদেষ্টা কোন ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রভাতের উপাসনায় অনুপস্থিত ছাত্রকে উপবাস দণ্ড দিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উক্তধর্ম্মাবলম্বী একজন প্রধান শিক্ষক সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর সাত আট বৎসরের ছেলেরা ক্লাসে টুঁশব্দটি করিলে এবং উপাসনার সময় চঞ্চল হইলে শারীরিক দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেন। এই রকম অত্যাচারের আরও অনেক কথা জানি। এখনও অনেক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের প্রতি এই রকমের অত্যাচার হইতেছে। তবে শুনিয়াছি, আজকাল কোন কোন বালিকা বিদ্যালয়ে মেয়েদের প্রতি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সস্নেহ ব্যবহার করা হইতেছে। ছেলে মেয়েদের পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন জানেন, বাড়ী ছাড়িয়া তাহারা যখন বোর্ডিংএ আসে তখন তত্ত্বাবধায়ক তত্ত্বাবধায়িকারা তাহাদের আহার সম্বন্ধে যে সংযমের ব্যবস্থা করেন, তাহার সঙ্গে জেলখানার কয়েদীদের আহারের তুলনা করা যাইতে পারে। শাসনদণ্ড পরিচালক নির্ম্মম শিক্ষকগণ ও মাতৃভাব বর্জ্জিতা শিক্ষয়িত্রী

ও ছাত্রী আবাসের তত্বাবধায়িকাদের হাতে পড়িয়া বালকবালিকাদের কোমলভাব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অনেক শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, বোর্ডিংএর সুপারইন্‌টেন্‌ডেণ্টও মেট্রনদের প্রকৃতিও কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা বৃত্তি নির্ব্বাচনে ভুল করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও ষ্ট্রীট্ প্রীচার, কাহারও পুলিস কর্ম্মচারী, কাহারও বা জেলখানার দারোগা হওয়া উচিত ছিল।

বাল্যবিবাহ রহিত, বিধবাবিবাহ প্রচলিত, জাতি ভেদের মূলোৎপাটন প্রভৃতি সমাজ-সংস্কার এবং প্রতিমাপূজা হইতে নিরত করিয়া নরনারীকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবার জন্য অনেক লোক জীবন উৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া দিব্য আরামে বসিয়া আছেন;—বালক বালিকারা উৎপীড়িত হইয়া মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া যাইতেছে, সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। তাঁহারা বড় বড় কাজে হাত দিয়াছেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য ছোট কাজ করিবার তাঁহাদের প্রবৃত্তি নাই। যাঁহারা কাব্যসাহিত্যরসে তরপূর, সত্য সত্যই সুশিক্ষিত, সদাপ্রফুল্ল ও সুরসিক, যাঁহারা স্নেহপ্রবণ, সহিষ্ণু পিতামাতার মত ছেলেমেয়েদের সকল আবদার সহ্য করিয়া, আদর করিয়া ভালবাসা দিয়া, শিক্ষা দিতে পারেন—তাঁহারা পাড়ায় পাড়ায় বালকবালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষা কার্য্যে ব্রতী হইলে বহুসংখ্যক হতভাগ্য বালকবালিকার উদ্ধার সাধন হইবে। শিশুরা সমাজের ভিত্তি স্বরূপ। তাহারা উৎপীড়িত, উপেক্ষিত হইলে অন্যান্য বিবিধ সংস্কার দ্বারা সমাজকে সুগঠিত উন্নত করিয়া তোলা অসম্ভব। এ বিষয়ে উদাসীন হইয়া—নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে, শিশুপীড়ন-পাপ-কলুষিত অভিশপ্ত সমাজের নিদারুণ অকল্যাণ হইবে, এবং অদূর ভবিষ্যতে জীর্ণভিত্তি উচ্চচূড় মন্দিরের মত আমাদের সমাজমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া আমাদেরই মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

শ্রীবামনদাস মজুমদার।

শিক্ষা জগতের যৎকিঞ্চিৎ (৩য়)

শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষকের এবং শিক্ষায়তনের যে সম্বন্ধ তা সব সময়ে ভাল রূপে রক্ষিত হয় না। সহকর্ম্মীদের জন্য যে বিশ্বস্তচিত্ততা, যে উদারতার প্রয়োজন তার অভাব অনেক যায়গায় লক্ষিত হয়ে থাকে, ঈর্ষ্যা এবং বিদ্বেষ এই সম্পর্ককে অনেক সময় কলুষিত করে ফেলে। এ সবের জন্য দোষী প্রধান শিক্ষক এবং নিম্ন শিক্ষক উভয়েই। অনেক যায়গায় দেখা যায় যে প্রধান শিক্ষক যিনি, তিনি গল্পের আফিসের বড়বাবুর মতই বিবেচনা শূন্য হয়ে হৃদয়-হীনের মত নিম্নতন দিগের উপর অত্যাচার করতে থাকেন, আবার অনেক সময় দেখা যায় যে নিম্নতনেরাও আপনাদের কর্ত্তব্যপালন করেন না, প্রধানের নরম মনের সুযোগ অবলম্বন করে আপনাদের কাজে যথেষ্ট ঢিলা হয়ে যান।

দায়িত্ব বোধ যাঁর বেশী আছে, যিনি নিজেও শ্রম পটু এবং অন্যদের শ্রম-বিমুখ চিত্তকে উদ্যত করে তুলতে সচেষ্ট এমন অধ্যক্ষেরা প্রায়ই নিম্নতনদের পতিত হন এ আমি অনেক দেখেছি।

শিক্ষকদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক তা যে হিংসা দ্বেষে কলুষিত হয়ে নানারকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, ছাত্র ছাত্রীবর্গের মধ্যেও ভেদ আনয়ন করে, এও আমি অনেক যায়গায় দেখেছি। আমাকে এক জন পুরুষ প্রোফেসার বলেছেন যে এ ব্যাপারটা বালিকা বিদ্যালয়েই বেশী পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু ছেলেদের স্কুল সম্বন্ধে আমার স্বল্প অভিজ্ঞতা যে আছে তাতে করে সে গুলি যে একেবারে এ দোষ-বিবর্জ্জিত তা আমি জোর করে বলতে পারি না। একজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এই বিষ-জর্জ্জরিত মন নিয়ে অপর একজনের বিরুদ্ধ সমালোচনা তাদের ছাত্র বা ছাত্রীর সামনে যখন করেন তখন যে তিনি একটা হেয় রকমের বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করছেন তা তাঁর মনে উদয় হয় না বোধ হয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে প্রিন্সিপাল তাঁর পদের সুযোগ অবলম্বন করে নীচের শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীকে সামান্য কারণেই কিম্বা কারণ না থাকা সত্ত্বেও অপমান করেন। গুরুতর কারণ থাকলেও শিক্ষকের পদমর্য্যাদা যে ছাত্রের সামনে রাখা কর্ত্তব্য এবং যে ক্ষেত্রে রাখা একরকম অসম্ভব হয়ে ওঠে সেখানে তার জন্য দুঃখিত হয়েই অবস্থাটা পরম উপভোগ্য একটা কিছু এ রকম ভাব না দেখিয়ে, কোনও রকম অপমান কর্ব্বার উদ্দেশ্যে নয় কিন্তু ছাত্র এবং শিক্ষায়তনের মঙ্গলের জন্যেই কাজটা করা হচ্ছে এই ভাবে, যে যা বলবার করবার তা বলতে এবং করতে হয় তা অনেকে বোঝেন না। অপরের দোষ ত্রুটির দোহাই দেখিয়ে আপনার উপরি-ওয়ালাত্বটা জাহির করাটাই একটা বড় কাজ বলে ভুল করেন।

আমাদের দেশের কয়েকজন ইংরাজ প্রিন্সিপ্যাল অধীনস্থ দেশীয় প্রোফেসারের উপর এরকম ব্যবহার করে বেশ নাম করে নিয়েছেন, খবরের কাগজেও কারো কারো এ বিষয়ে খ্যাতি বেরিয়ে গেছে।

এক একজন প্রিন্সিপ্যাল এরকম আছেন দেখেছি, যাঁরা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীকে কিছু বলেন না কিন্তু ছাত্র ছাত্রীদের কাছে তাঁদের বুদ্ধির স্বল্পতা, ব্যবহারের দোষ সম্বন্ধে বেশ অবজ্ঞার সঙ্গেই আলোচনা করেন।

কটক কলেজে থাকতে একদিন লজিক ক্লাশে formal এবং material truth সম্বন্ধে বোঝাতে গিয়ে বোর্ডে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম যা formally সত্য কিন্তু materially মিথ্যা। ক্লাশ শেষ করে যাবার সময় সেটা মুছে দিয়ে যাইনি। আমাদের ইংরাজ প্রিন্সিপ্যাল ঘরে ঢুকেই এই উদাহরণটা পড়ে আমার বুদ্ধি এবং আমার শিক্ষা-মাতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে এমন সব মন্তব্য প্রকাশ করেন যে নিষ্ফল ক্রোধে জর্জ্জরিতা আমার ছাত্রীবৃন্দ অশ্রুমুখী হয়ে ওঠেন। আমি ক্লাশে এসে তাঁদের চেহারা দেখে তাঁরা মারামারি করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করে সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হই। তখন আর কিছু না বলে ক্লাস শেষ করে ছুটির সময় গিয়ে প্রিন্সিপ্যালকে নিতান্ত নিরীহের মত জিজ্ঞাসা করলাম যে আমার পড়ান সম্বন্ধে তাঁর কিছু বলবার আছে কি না। তিনি তাতে বল্লেন

"না"। আমি তখন বল্লাম "ছাত্রীদের কাছে যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে যে আপনার আমার পড়ান সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার আছে?" তাতে তিনি বল্লেন "হাঁ, লজিক যা তুমি পড়াচ্ছ তা ত সব ভুল। বোর্ডে যা লিখেছ সেটা ত যে লজিক জানে না, সেও জানে যে মিথ্যা।" আমি তাতে বল্লাম "আমার লজিক পড়ানোর সময় সেটা শুনে যদি আপনি বলতেন যে আমি ভুল পড়াচ্ছি ত মানতুম। আপনি ত আমার পড়ান শোনেননি। তারপর ওটা যে মিথ্যা সেই কথাই আমি ছাত্রীদের শিখিয়েছি, সত্য বলে শেখাইনি। আমার বুদ্ধি এবং আমার শিক্ষাপীঠ সম্বন্ধে তাদের কিছু বল্‌বার আগে আমায় বল্লেই বোধ হয় ভাল হত, এত বড় ভুলের তামাসার বোঝাটা আপনার বইতে হ'ত না।" এই ইংরাজ মহিলার এই ছিদ্রান্বেষণ-পরতার জন্য আমরা তাঁর সদ্‌গুণ আছে তা অনেক সময়ই বিস্মৃত হয়ে যেতাম।

এটা অনেক সময় দেখা যায় যে, অল্প বেতনে যাহাদের নিম্নশিক্ষকের পদে নিযুক্ত করি তাঁহাদের অনেকের বুদ্ধি এবং বিবেচনা শক্তি খুব উঁচুদরের নয়। বিদ্যাশিক্ষায়ও এঁরা খুব অনেকদূর অগ্রসর হয়ে তারপর কাজে এসে লাগেন না। কিন্তু তাই বলেই যে কথায় কথায় এঁদের প্রতি "তুমি কি জান" বা "তুমি কিচ্ছু জান না আবার এর মধ্যে বল্‌তে এসেছ" এরকম কথা প্রয়োগ করা ভাল নয়। স্কুলের শিক্ষক-সমিতির অধিবেশনে অনেক প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীকে এরকম ভাব অবলম্বন কর্‌তে দেখা গিয়ে থাকে। এঁরা ভুলে যান যে নিম্নতন যদি তাঁরই মত বুদ্ধি বা শক্তিসম্পন্ন হন্‌ তবে তার নীচে কাজ করবার জন্য আস্‌বেন কেন?

আমি কোন কোন প্রিন্সিপ্যালকে এরকম ব্যবহার কর্‌তে দেখেছি যেন তিনিই জগতে এক মাত্র কর্ম্মী বা শক্তিসম্পন্ন, তাঁর তিলেক অদর্শনে সমস্ত গণ্ডগোল হয়ে যাবে। এঁর সহকর্ম্মীরা সকলেই অকর্ম্মা, তাঁহাদের উপর কোনও কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকার যো নাই, কাজেই এঁরা সদাই ব্যস্ত, কাহারো কোনও অনুরোধ রক্ষা করা কিম্বা বন্ধুবান্ধবের কিছু সময় দেওয়া এঁদের সাধ্যাতীত। এ রকম একজন বাস্তবাগীশ কোনও প্রিন্সিপ্যালকে আমি একবার একটা কাজ কর্‌তে অনুরোধ কর্‌তে গিয়েছিলাম। তিনি আমায় দেখেই "আমার মর্কার সময় নাই আমি কখন যে কি করি। এই যে কাজ আমার ঘাড়ে, এ ফেলে কি কিছু আর কর্ব্বার যো আছে" বলে এমন চীৎকার জুড়ে দিলেন যে আমি প্রায় থতমত খেয়ে গেলাম। আমি তাঁকে বল্লাম "একদিন দুঘণ্টার জন্যও আপনি কলেজটা কোনও সহকর্ম্মীর হাতে সঁপে দিয়ে আস্‌তে পারেন না? আমিও ত দেখুন আস্‌ছি। একটা দিনে আর কি হয়? রোজকার কথা ত বলা হচ্ছে না আর এটাও ত একটা খুব বেশী ভারী কাজ"। তিনি তাতে চেঁচিয়ে মেচিয়ে বল্লেন "আরে তুমিও যেমন। আমার সহকর্ম্মীরা কি আর তেমন? তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া মানেই সব লণ্ডভণ্ড হওয়া। কত বড় কলেজ এটা!" আমি তখন বল্লাম "আপনার সহকর্ম্মীদের মধ্যে কেহ ত অনেকদিন আপনার সঙ্গে কাজ কর্‌ছেন?" তিনি উত্তর দিলেন "হাঁ, ১২।১৪ বৎসর কেউ কেউ আমার সঙ্গে কাজ কর্‌ছে।" "তবে আপনি কি কাজ কর্‌লেন? ১২।১৪ বৎসরে একজন বুদ্ধিমান্‌ লোককে সর্ব্বদাই আপনার সাহচর্য্য দিয়ে আর কর্ম্মপ্রণালী দেখিয়ে যদি কি করে কাজ কর্‌তে হয় তাই না শেখাতে পার্‌লেন তবে আপনার কর্ম্মক্ষমতার প্রশংসা ত খুব কর্‌তে পার্‌লাম না। আমার ছোট্ট কলেজ হলেও আমি ত ২।৪ জনকে এমন

করে শিখিয়ে নি, যে, আমি যদি দুঘণ্টার জন্য বাহিরে যাই বা কয়দিন না থাকি ত খুব সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ না হলেও, কাজটা বেশ চলে যায়। ধরুন, আপনার যদি অসুখই করে তবে ত কলেজটা আপনার অনুপস্থিতিতে গোল্লায় যাবে। লোক তৈরী করার দিকে মন দেওয়াটা আপনার একটু উচিত ছিল নাকি?" এর পর থেকে সেই বাস্তবাগীশ লোকটী আমার কাছে আর কোনও দিন আপনার সহকর্ম্মীদের সম্পূর্ণ অপটুত্ব সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। আমার কাজটা ঠিক আমার মত ক'রে আরেকজন করে না, এবং অনেক সময় আমার অবর্ত্তমানে অন্যে যা করে তাতে আমার মনে পূর্ণ তৃপ্তি আসে না, মনে হতে পারে যে আমি করলে আরও ভাল হ'ত কিন্তু তাই বলেই আমি না করলে যে কাজটা একেবারে অচল হ'য়ে পড়্‌বে, আর কেউ তাকে কর্‌তে পার্‌বে না, এত বড় আত্মম্ভরিতা নিয়ে যে প্রিন্সিপ্যাল কাজে লাগেন তিনি যে কর্ম্মক্ষেত্রে খুব সিদ্ধিলাভ করেন তা নয় এবং তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে তার মনের গতির জন্যই তিনি সহকর্ম্মীদের আন্তরিক সহযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হন।

নিম্নশিক্ষকেরা প্রায় সকলক্ষেত্রেই অতি অল্প বেতন পান। তাঁদের ঐ সামান্য আয়ে অনেক স্থলেই বড় সংসার প্রতিপালন কর্‌তে হয়। ভদ্রলোকের ভদ্রয়ানা এই আয়ে রক্ষা করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তা আমাদের দেশের কেরাণী বাবু এবং মাষ্টার মশাইরা যেমন বোঝেন আর কেহই বোঝে না। এই কারণেই মাষ্টার বাবুরা অনেক সময়ে দায়ে প'ড়ে আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানহীন হন, শত অপমান, শত পীড়ন বহন করেও আপনাদের কাজটাকে প্রাণপণ বলে প্রায়ই আমরণ আঁকড়িয়ে ধরে থাকেন। তাঁদের এই ভীষণ সংগ্রামের ফলে কর্ত্তব্যবুদ্ধি অনেক সময় লোপ পেয়ে যায় বা যেতে পারে এই মনে করে উপরি-ওয়ালারা কখনো কখনো তাঁদের আপনাদের হাতের পুতুল করে তুলতে চেষ্টা করেন। আমি জানি একজন নিম্নশিক্ষকের কথা, যাঁকে তাঁর প্রিন্সিপ্যাল রীতিমত চেষ্টা এবং পরিশেষে ভয় প্রদর্শনের দ্বারা এমন একটা কাজ করাতে চেয়েছিলেন সেটাকে মানুষ মাত্রেই হেয় বলে বিবেচনা কর্‌বে। এই ব্যক্তিটী কিছুতেই স্বীকার না করায় তাঁর প্রিন্সি-প্যালের অত্যন্ত বিরাগ ভাজন হন। তিনি তাঁকে বলেছিলেন "তুমি কি জান না আমি তোমার কি কর্‌তে পারি! তুমি যদি এ কাজটা না কর ত আমি তোমার নামে রিপোর্ট কর্ব্ব।" তিনি উত্তরে বলেছিলেন "হাঁ, আমি জানি আপনি আমার প্রিন্সিপ্যাল। কিন্তু তাই বলেই ত আপনার কাছে আমি আমার বিবেক বুদ্ধিকে বাঁধা দেই নাই। আপনার যা ইচ্ছা হয় কর্ব্বেন।" সৌভাগ্যক্রমে এঁর পিছনে পরাক্রমশালী বন্ধুরা ছিলেন কাজেই এঁর চাকুরীটী বজায় থেকে গিয়েছিল। তবে পদে পদে নানারকমে এঁকে অনেক গ্লানি সহ্য কর্‌তে হয়েছিল। কিন্তু কত জনে সহায় অভাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যায় কর্‌তে বাধ্য হন তার খবর কে রাখে?

তবে সব সময়েই যে প্রিন্সিপ্যাল অবিবেচক, হৃদয়-হীন ও নির্ম্মম হন এবং তার Staff মেম্বাররা সকলেই ভাল এরকম নয়। অনেক স্থলে দেখা যায় এঁদের সততার অভাবে প্রিন্সিপ্যালকে অতিশয় কষ্ট পেতে হয়। অনেক সময় এঁরা এমন অবিবেচক নির্ম্মম হন যে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়।

আমি কোনও একটা প্রাইভেট কলেজের কথা জানি যেখানে কলেজের কোনও বিশেষ

সঙ্কটের সময় কয়েকজন অধ্যাপক দল বেঁধে এসে বলেছিলেন "আজই আমাদের মাহিনা না বাড়িয়ে দিলে আমরা ক্লাশে অধ্যাপনার কাজে যাব না।" তাঁরা বেশ ভাল রকমেই জানতেন যে তাঁরা যদি শ্রেণীতে সেদিন না যান ত কলেজটার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। সেইদিন আইনের ভয় দেখিয়ে তাঁদের কাজে যেতে বাধ্য করা হয়। পরে তাঁদের মাহিনা বাড়ে নাই এবং ঐ মাহিনায় তাঁরা তারপর অনেকদিনই কাজ করেছিলেন, হয়ত আজও করছেন।

এ রকম শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী খুবই দেখা যায় যে অধ্যাপনার বিষয় বাড়ীতে চিন্তা করে আসেন না এবং ক্লাশে এসে পড়ায় গোঁজামিল দেন। আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে এ প্রকার culpable negligence এর দরুণ আইন করে শাস্তি বিধানের উপায় থাকা উচিত বলে সময় সময় মনে হয়।

আমার এক সহকর্ম্মিণী আমি নিম্নশ্রেণীর পাঠ ও বাড়ীতে দেখে আসি শুনে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করেছিলেন। ইনি যখন বি, এ, পাশ তখন নিজে নিশ্চয়ই এত বিদুষী যে, বাড়ীতে কিছু দেখে আসা অনাবশ্যক মনে করেন। তাঁর ক্লাশ পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখ্‌লুম তিনি playing croquets এর অর্থ বলে দিয়েছেন তাস খেলা। তাঁকে ডেকে আমি বল্লাম "আপনি মেয়েদের এ অর্থ বলে দিয়েছেন? এতো নয়। আমি আজ অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম যে।" তিনি বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বল্লেন "আমি ও খেলার বিষয় কিছু জানি না। Alice বলে একটা মেয়ে খেল্‌ছিল বলে মনে কর্‌লাম তাস খেলা। আমি অত অভিধান দেখি না।" তাঁকে অবিশ্যি বুঝিয়ে দিতে হয়েছিল যে অভিধান দেখাটা একটা আবশ্যকীয় ব্যাপার। এ রকম যে কত সপ্রতিভের কাছে আমাদের শিশুরা কত গোঁজামিল, কত ভুল প্রমাদ শিক্ষা করে যায়, তার হিসাব কজন রাখি! এই জাতীয় অলস, পরিশ্রমবিমুখ লোকেরাই কৌতূহলী ছাত্রের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত এবং বিমুখ হয়ে পড়েন তাও দেখেছি।

সুপরিদর্শনের অভাবের সুযোগ নিয়ে, কত যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বৎসরের প্রথম দিকে নিজের কাজে ঢিলা দিয়ে শেষে তাড়াতাড়ি কোনও রকমে, তাঁদেরই দোষে কর্ম্মবিমুখ হয়ে গেছে যে ছাত্র ছাত্রীর মন, তাকে জোর করে খানিকটা বিদ্যা গিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেন তার সংখ্যাও বড় কম নয়। এই সব ছাত্র ছাত্রীকে নিয়ে পরে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কাজ যে কি কঠিন হয়ে ওঠে তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। যাঁদের দোষে শিশুদের গোড়াপত্তনী কাঁচা হয় তাঁরা যে শুধু শিশু এবং পিতামাতার কাছেই অপরাধী, তা নয়, সহকর্ম্মী, শিক্ষায়তন এবং মানব-সমাজের কাছেও গুরুতর অপরাধে অপরাধী। তাঁদের দোষেই সহকর্ম্মীদের প্রাণপণ যত্ন অনেক সময় নিষ্ফল হয়ে পড়ে। পরিদর্শনের ত্রুটীর জন্য এই সমস্ত গোলমাল বিশৃঙ্খলার হাত এড়াবার জন্য আমি আমার নিম্নস্থ প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীকে দৈনন্দিন কাজের হিসাব রাখার জন্য একটা খাতা দি। এই খাতাতে তাঁরা প্রতিদিন কতটা কাজ হ'ল, কি কারণে যতটা করতে চান ততটা কাজ হয় নাই, এই সবের একটা হিসাব রাখেন; আমি সপ্তাহের শেষে সে হিসাবটা পরীক্ষা করি। মাসের পূর্ব্বে তাঁরা মাসের কাজের যে একটা তালিকা করেন মাসান্তে সেই তালিকাটার সঙ্গে কৃত কাজের হিসাবটা মিলালেই শ্রেণীর শিক্ষালাভ-পটুতা এবং শিক্ষকের শিক্ষাদান প্রণালীর একটা মোটা ধারণা জন্মে এবং দোষ ত্রুটী সংশোধনের উপায় চিন্তা করা

অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে ওঠে। একজন পণ্ডিতের কাজের হিসাব একটু বেশীরকম সন্তোষজনক হয়ে উঠ্‌ছিল। একবার দেখলাম যে সপ্তাহের মধ্যে যেদিন ছুটী ছিল কোনও কারণে সেইদিনও তিনি অনেকখানি পড়িয়ে ফেলেছেন শূন্য ক্লাশকেই। তাঁর কৈফিয়ৎ চাওয়াতে তিনি বল্লেন "আমি যেদিন যতখানি পড়াব মনে করি, তার হিসাব দি। ওদিন ছুটী না থাক্‌লে যতখানি পড়াতাম তার হিসাব দিয়েছি।" তাঁকে তখন আবার বিশেষ করে সমঝিয়ে দিতে হল যে আশার হিসাব চাওয়া হয় নাই, কৃত কাজের হিসাব চাওয়া হচ্ছে।

একদল লোক আছেন যাঁরা কারণে ও অকারণে আপনাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে তৎপর। তাঁরা সর্ব্বদাই মেজাজটা রোখা করে আছেন পাছে প্রিন্সিপ্যাল বা কমিটি তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করেন। আমি কন্যামহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ কর্‌তে না কর্‌তেই এই রকম একটা মনের সাক্ষাৎলাভ করি। ইনি আমি এসেছি সংবাদটা পাওয়া মাত্র ধরে নিলেন তিনি যে সব সুন্দর আইডিয়া এবং বন্দোবস্ত এই বিদ্যালয়টীকে উপহার দিবেন তার প্রশংসা তাঁর কাছে না গিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হবে। তাঁর এই ন্যায্য অধিকারে যাতে আমি কোনও রকমে অন্যায় দাবী নাধরে বসতে পারি তার জন্য আট ঘাট বাঁধতে তখ্‌নি আরম্ভ করে দিলেন, বিদ্যালয়ের কমিটীর কাছে মস্ত এক আবেদন পাঠিয়ে। আমি যে তাঁর 'প্রাপ্যটা নেবোই এ বিষয়ে তিনি এত নিশ্চিত ছিলেন যে আমাকে প্রিন্সিপ্যাল কর্‌লে তিনি কাজ কর্ব্বেন না এমন ভয়ও দেখালেন। অনেকদিন পরে কোনও কারণে এই নিয়ে কথা হওয়ায় তিনি বল্লেন যে "আমি ত আপনাকে জান্‌তাম না, তাই ও রকম সব লিখেছিলাম।" ইনি নিজেকে খুবই বুদ্ধিমতী বলে বিবেচনা করেন, আমি তাই গম্ভীর ভাবেই বল্লাম "না জেনে আমার বিষয়ে ওরকম লেখা এবং কমিটির মেম্বরদের হঠাৎ খুব বেশী পক্ষপাত দোষে দুষ্ট মনে করাটা আমাদের কাছে খুব বুদ্ধির কাজ বলে কিন্তু ঠেক্‌ল না।"

কলাম্বোয় থাক্‌তে একবার এই প্রকৃতির একটী লোক আমাদের কলেজে কাজপ্রার্থী হয়ে আসেন। তিনি এসেই আমায় বল্লেন "আমি শুনেছি, আপনি মেটার্নিটী লীভ্ দিয়ে দিয়ে থাকেন; আপনাকে আমি অনেকগুলি প্রশ্ন তাই কর্‌তে চাই।" তিনি একটা লম্বা কাগজ বার কর্‌লেন, তাতে ছোট ছোট অক্ষরে প্রায় গুটিপঞ্চাশ প্রশ্ন লিখে এনেছিলেন তার অনেক বাদ সাদ্ দিয়ে মোটামুটি তাঁর বক্তব্য এই দাঁড়াল যে, "তিনি কুমারী, তাঁর মেটারণিটী লীভের প্রয়োজন হবে না কিন্তু যদি তাঁর টাইফয়েড বা এ রকম কোনও দুরন্ত রোগ হয় তাহলে আমি তাঁর কি ব্যবস্থা কর্ব্ব?" আমি বল্লাম "আপনাকে রোগশয্যা থেকে ধরে এনে ক্লাশের চেয়ারে বসিয়ে দোবো না এটা নিশ্চয়ই। Sick leave পাবেন। "আপনি —কে Maternity leave দিয়েছেন পুরা মাহিনায়, তার পর ছোট্ট বেবীকে নিয়ে যাতে তিনি কাজ চালাতে পারেন তার ব্যবস্থা করেছেন শুনলাম, আমার বেলা কি কর্ব্বেন? "মাতৃত্বের বেলা আমি ১মাস মাত্র পুরা মাহিনায় ছুটী দেবার বন্দোবস্ত করেছি। রোগের বেলা আধা মাহিনায় তিনমাস দি; আপনার বেলা তাই হবে। "ধরুন, আমার যদি টাকার দরকার হয়, রোগের সময়।"

আমি অগ্রিম মাহিনা ও দি, ২৷৩ বার আমার দিতে হয়েছে, সেটা ধারের মত দেওয়া হয়

পরে দরকার বুঝে মাসে ২ মাহিনা থেকে কেটে নিই কিম্বা একবারেই ফিরিয়ে নি।" "আমি যদি মরে যাই?" —আমার তখন বিরক্ত বোধ হচ্ছিল আমি উঠে বল্লাম "টাকাটা Bad debts এর তালিকায় ফেলে আপনার Funeral এ যাব। হয়ত কলেজ থেকে একটা wreath এর বন্দোবস্ত ও করে দিতে পারব।" তিনি তাতে আমার উপর মহা চটে কাজের সম্বন্ধে আর কিছু না বলে প্রস্থান করলেন। হয়ত এরকম ব্যবহার আমার উপরি ওয়ালার হৃদয়-হীনতারই পরিচয় দেয় কিন্তু এ গুলি নিম্নতনের হৃদয়ের যে ভাবের পরিচয় দেয় তাত খুব প্রীতিকর নয়।

আবার একদল আছেন যাঁদের ঈর্ষ্যা তাঁদের এমন ভাবে পরিচালিত করে অন্য লোকের হাসি পায়। দরদীর কাছে যে শুধু তাঁরা, যাঁকে ঈর্ষ্যা করছেন তার দোষ কীর্ত্তন করেন তা নয় তাঁরা চান কেহই সে লোকটীকে ভাল না বলে এবং ভাল না বাসে। ছাত্র ছাত্রীরাও যাতে অন্য লোকটীকে ভাল না বাসে তার চেষ্টা ত করেনই এবং ভালবাসছে জানলে সেটা আপনাদের প্রতি একটা অন্যায় মনে করে তার জন্য রাগ এবং দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন। আমি এক জনকে গাল ফুলিয়ে একথা কোনও ছাত্রীকে বলতে শুনেছি "তুমি তো—কে ভালবাস, তাহলে তুমি তো আমাকে দেখ্‌তেই পার না।" ছাত্রী বেচারী ত অবাক হয়ে গেল; এবং কিছুক্ষণ পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করল –"কে ভালবাস্‌লে কি এঁকেও ভালবাসা যায় না?" আমি বল্লাম, "কেন যাবে না? খুব যায়।" তারপর আমি সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের ডেকে বলে দিলাম যে "আমি এ রকম ধরণের কথা হয় তা চাই না। আমি এটা অত্যন্ত অন্যায় মনে করি যে ছাত্র ছাত্রীদের সরল মনে এরকম একটা ঝগড়ার ভাব আনিয়ে দেওয়া। কোনও দুইজনের মধ্যে খুব অবনিবনা থাক্‌তে পারে কিন্তু তাতে করে কেনেও তৃতীয় সেই দুজনার সঙ্গেই ভাব থাকা অসম্ভব জিনিস নয় যখন, তখন সেই ভাবটাকে নষ্ট কর্ব্বার অধিকার আমি এই দুজনার কাকেও দিতে পারি না।"

এই প্রকৃতির লোকেরা কখনো কখনো যার প্রতি বিরক্ত তাকে নিজেরা কিছু বলেন না কিন্তু নিজেদের প্রিয়পাত্রদের দ্বারা তাকে নানারকমে খোঁচা দেন, কখনও কখনও যেখানে অন্য লোকটী সরল প্রকৃতির, সহজেই আস্থাবান্, সেখানে এরকম খোঁচা মর্ম্মান্তিক বেদনাদায়ক ও হয়ে ওঠে দেখেছি। আমি একজনকে জানি যিনি করকোষ্ঠি গণনায় খুব বিশ্বাস করেন, লোকটী বেশ সরল প্রকৃতির এঁকে শিক্ষায়তনের অধিকাংশই এঁর সরলতা এবং অমায়িকতার জন্য পছন্দ করত; একজন সহকর্ম্মিণীর কিন্তু কিছুতেই ভাল লাগ্‌ত না যে, সকলে আর কাহাকেও প্রশংসা করে। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর একটী ছাত্রীর সঙ্গে এই সহকর্ম্মিণীটির বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে এবং তারপরই এই ছাত্রীটি এসে এঁর করকোষ্ঠি গণনা করে এমন কথা বলেন যা বিশ্বাস করে বেচারী অনেক দিন পর্য্যন্ত মর্ম্মন্তুদ যাতনা ভোগ করেন। এই ছাত্রীটিকরকোষ্ঠি গণণা এবং নখদর্পণ জানেন বলেই সকলের ধারণা ছিল। এবং সেই জন্যই তিনি ইচ্ছা করে এঁকে এই সব মিথ্যা বলে বেদনা দেন, শুধু আপনার প্রিয়পাত্রীকে সুখী কর্ব্বার জন্য।

শিক্ষায়তনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা প্রায়ই সময় অসময়ে তাহার নিন্দা করা এবং কর্ম্ম সম্বন্ধীয় গোপনীয় বিষয় সমূহের প্রকাশ করে দেওয়া এই দুই রূপ ধারণ করে।

এই সমস্তই প্রায় নিজের দায়িত্ববোধহীনতা এবং কর্ম্মের পবিত্রতা এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করার অক্ষমতা হতেই প্রসূত। শিক্ষাদান ব্যাপারটা যতদিন ব্যবসার মধ্যে পরিগণিত থাকবে, ততদিন এর মধ্যে এই রকম অনেক বিশৃঙ্খলা এবং অনেক আবর্জ্জনা জড় হতে থাকবে; কারণ এগুলি প্রায় সবই ব্যবসায় বুদ্ধির রেষারেষি প্রণোদিত। তবে শিক্ষকতা ব্যবসা যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁরা যদি এটা উপলব্ধি করতে পারেন যে, এই ব্যবসাটা শুধু দিলাম কত তার হিসাব রাখার ব্যবসা, পেলাম কত'র নয়, তা হলে বোধ হয় ত আবর্জ্জনার স্তূপ অনেকটা কমে যেতে পারে।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

বকের বদনাম

যে বলাকা-পক্ষ-পবন-বিধূনিত নভোমণ্ডলের চিত্র সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই বিসকণ্ঠী বিহঙ্গের ভূমিতে বিচরণশীল জীবনলীলা পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহার দেহের সৌন্দর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারে বটে; কিন্তু সে যে সমাজবদ্ধ মানবের কত বড় উপকারী বন্ধু, অথচ অকারণে এত অপবাদ সহ্য করিয়া আসিতেছে, তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না; এবং বুঝিতে পারিলে আমাদের বিস্ময়ের সীমাও থাকে না। সাধারণতঃ বিহঙ্গ মাত্রেরই দেহ সৌষ্ঠব অথবা সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আমাদিগের মনোহরণ করে বলিয়া আমরা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হই; কিন্তু প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গনে, বনে জঙ্গলে, জলাশয়ে মাঠে, তরু কোটরে তাহার দৈনন্দিন জীবন যাত্রা লক্ষ্য করিতে পারিলে বিহঙ্গ চরিত্রের যে দিকটা আমাদিগকে চমৎকৃত করে, সেই utilityর অথবা economyর দিক হইতে যে শিক্ষা অর্জ্জন করা যায় সেই সম্বন্ধে, এস্থলে এই বককে অবলম্বন করিয়া কয়েকটি কথার অবতারণা করিতেছি। বক আমাদের বাংলা দেশে অত্যন্ত পরিচিত পাখী। কিন্তু বোধ হয় এক হিসাবে এখনও আমাদের কাছে সে অনেকটা অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে। সে যে অযাচিত ভাবে কৃষিজীবী বাঙ্গালীর কত উপকার করিয়া আসিতেছে তাহার খবর আমরা রাখি না। শুধু যে সে সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ ঔদাসিন্য আছে তাহা নহে; আমরা আমাদের অজ্ঞতার জন্য কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করি না; বক না থাকিলে অন্নগত প্রাণ বাঙ্গালীর কি অবস্থা হইত তাহা একবার ভাবিবার অবসর পর্য্যন্ত আমাদের নাই। পরন্তু আমরা বক চরিত্রের কঠোর সমালোচনা করিতে প্রস্তুত; এবং যে সকল ভণ্ড কুলাঙ্গার বঙ্গ সমাজের অনিষ্ট করে তাহাদিগকে বক ধার্ম্মিক বলিতে কুণ্ঠিত হই না। এমনই করিয়া বকচরিত্রের উপর একটা কলঙ্ক আরোপিত হইয়া আসিতেছে। আধুনিক পক্ষিতত্ত্ববিৎ সেই কলঙ্ক ভঞ্জন করিতে পারিয়াছেন কি না এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য।

বককে আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই জলাশয়ের সন্নিকটে, ধানের ক্ষেতে। খানাডোবা ঝোঁপ ঝাপের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া ধ্যানমগ্ন মুনির মত নিশ্চল ভাবে সে এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে; আহার্য্য বস্তু সম্মুখীন হইলেই সহসা তাহার ধ্যান ভঙ্গ হয়। সে তৎক্ষণাৎ গ্রীবা বাড়াইয়া হয়ত দুই এক পা অগ্রসর হইয়া তাহার চঞ্চুর তীক্ষ্ণ অগ্রভাগদ্বারা অপেক্ষাকৃত বড় বড় শিকার বিদ্ধ করিয়া ফেলে অথবা স্বল্পায়তন মৎস্য ভেক মুষিকাদি একেবারে গলাধঃকরণ করিয়া দুই এক গণ্ডূষ জল পান করে। বকের এই হিংস্র স্বভাবটাই কেবলমাত্র যাহাদের চক্ষে পড়ে, তাঁহারা স্থির করেন যে, বক বড় অপকারী জীব। কিন্তু তাহার অপকার করিবার ক্ষমতার একটা সীমা ত আছেই; এমন কি আপাততঃ যাহা অপকার বলিয়া মনে হয় তাহাও অনেকটা আমাদের বুঝিবার ভুল। বক সন্তরণ করিতে জানিলেও গভীর জলাশয়ে সাঁতার দিয়া অথবা ডুব দিয়া মৎস্য ধরিবার চেষ্টা আদৌ করে না। তবে স্বল্পতোয় জলাভূমিতে সে মৎস্যের অন্বেষণ করে; সুতরাং সে যে খুব অধিক সংখ্যায় মৎস্য সংহার করিয়া

থাকে ইহা মনে করা ভুল। মাছের শক্র অনেক ;—বোধ করি আমরাই সব চেয়ে বড় শক্র। এই জন্ত মৎস্যহননজনিত ব্যাপার লইয়া বককে দোষী করিলে চলিবে না। আরও মনে রাখিতে হইবে যে মৎস্য তাহার বিবিধ খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে অন্যতম ;—সরিসৃপ, ভেক, মূষিক, ছুঁচো, কাঁকড়া, চিংড়ি, শামুক গুগ্‌লি, ঝিনুক, পোকামাকড়, পতঙ্গ, কেঁচো, জোঁক, পাখীর ছানা প্রভৃতি কত কি যে সে ভক্ষণ করে তাহার হিসাব রাখা কঠিন। অতএব যদি কেহ বলেন যে বক প্রধানতঃ মৎস্যাসী এবং সেই জন্ত মানুষের পক্ষে বিশেষ অপকারী, সে কথা আমরা অবাধে মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই। দেখিতেছি যে আমাদের দেশের পুসা কৃষিকলেজ হইতে মিঃ ম্যাক্সওয়েল-লিফ্রয় সম্পাদিত ভারতবর্ষীয় পাখীর খাদ্যসম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কয়েকটা বকের অন্ত্র পরীক্ষা করিয়া লেখক মিঃ মেসন্ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, অধিকাংশ, বক মাছ ব্যাঙ প্রভৃতি স্বল্পতোয় জলাশয়ে প্রাপ্তব্য খাদ্য খাইয়া জীবন ধারণ করে, সুতরাং তাহারা মানুষের উপকারী নহে ; তবে দুই এক শ্রেণীর পতঙ্গভুক্ স্থলচর বককে উপকারী বলা যাইতে পারে।",স্থানবিশেষে কয়েকটা মাত্র পাখী দেখিয়া এইরূপ অভিমতপ্রকাশ করা কতদূর সঙ্গত তাহা বিচার সাপেক্ষ। ইঁহারা হয়ত দেখিলেন যে অন্ত্রমধ্যে যে সকল কীটপতঙ্গের ভুক্তাবশেষ পাওয়া গেল তাহাদের মধ্যে অনেকগুলা সাধারণতঃ মানুষের পক্ষে উপকারী ; অতএব তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া মানুষের অপকার সাধন করিতেছে। কিন্তু অন্যত্র জলাশয় প্রান্তর মধ্যে অপকারী কীটাদির বাহুল্য বশতঃ বকের পাকস্থলীর মধ্যে অধিকসংখ্যক উক্ত মন্দ কীট দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। এইজন্য ভক্ষিত কীটের প্রতি কেবল মাত্র লক্ষ্য রাখিয়া বকের স্বভাব সম্বন্ধে পাকা মত প্রকাশ করা এখনও পর্য্যন্ত সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। আর মাছ সাধারণতঃ ঋতু বিশেষে এত অপর্য্যাপ্ত ডিম্ব প্রসব করে যে বকের শত্রুতাসাধন সত্ত্বেও মৎস্য জাতির বিশেষ কোনও সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব শুধু এই ব্যাপারের আলোচনা প্রসঙ্গে বকের economic value সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতে আমরা একটু ইতস্ততঃ করি।

কারণ, এই economic মূল্য যাচাই করিতে হইলে আরও অনেকগুলি বিষয় ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। সম্প্রতি একখানি সাময়িক পত্রিকায় জনৈক লেখক মিসর দেশে তুলার চাষ ও বকের যে কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিলাসী মানব-সমাজের জন্য বকের পালক এত অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা কিছুদিন পূর্ব্বে মিসরে দেখা গেল যে তথায় Egret বক প্রায় লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। তখন গভর্ণমেণ্টের জনৈক বিশেষজ্ঞ গ্রামে গ্রামে সভাসমিতি আহ্বান করিয়া প্রচার করিলেন,—যে কীটে তোমাদের তুলার চাষ নষ্ট হয় সেই কীটকে এই বকেরা বিনাশ করে। পয়সার লোভে যাহারা ইহাকে বধ করিয়া ইহার পালক সংগ্রহ করে তাহারা দেশের অর্থ শোষণ করে। তোমরা একবার এবিষয়ে দৃষ্টিপাত কর।" ইহাতে সুফল ফলিল। দুই বৎসরের মধ্যে তথাকার চিড়িয়াখানার কয়েকটি পালিত বক হইতে প্রথমে পনরটি শাবক পাওয়া গেল। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে এই পনরটি বক হইতে গত ছয় সাত বৎসরের মধ্যে পাঁচ হাজার Egret বক জন্মলাভ করিয়া এখনও জীবিত আছে ; এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ সেই পনরটি বক ও এখন পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করিতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে যে ক্ষুদ্র বকের উপনিবেশ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল এখন সেখানে প্রায় দুইলক্ষ বক বিচরণ করিতেছে। এই দুই লক্ষপাখী গত বৎসরে তুলার কীট ধ্বংস করিয়া দুই কোটী টাকার তুলা রক্ষা করিয়াছে। তবেই দেখা গেল যে শুধু তুলার দিক হইতে এই বকের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রত্যেকটির বাৎসরিক utilityর অন্ততঃ দশ টাকা দাঁড়ায়।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ (Charles Waterton) বহুপূর্ব্বেই বকের উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁহার

অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অনেকগুলি পুকুর ছিল; তাহাতে তিনি মাছ ছাড়িয়া ছিলেন। নিকটস্থ একটা ছোট নদীর পাড় হইতে কতকগুলা বড় বড় মূষিক মাটির ভিতর দিয়া সুড়ঙ্গ করিয়া পুকুরে প্রবেশ করিত। এইরূপে চারিদিকে বড় বড় গর্ত্ত করিয়া সেই মৎস্যাধার জলাশয়গুলার এমন অনিষ্ট করিল যে তিনি মনে করিলেন যে সমস্ত জল বাহির করিয়া না ফেলিলে পুকুরও রক্ষা হইবে না মাছও রক্ষা হইবে না। জল বাহির করিয়া ফেলা হইল; কিন্তু মূষিকের উৎপাত কমিল না। কিছুদিনের মধ্যে সেখানে বক আসিয়া বাসা বাঁধিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুর প্রায় অদৃশ্য হইল।

আমাদের বাংলা দেশে অনেক নদীর বাঁধ আছে; এবং সেই বাঁধ থাকার দরুণ অনেক গ্রাম রক্ষা পায়। সেই বাঁধ রক্ষা করিবার জন্য সরকার হইতে বহু অর্থ ব্যয় করা হয়। কিন্তু আমাদের অলক্ষ্যে কর্কটাদি (Crustacian) জীব সেই বাঁধের ভিতর গর্ত্ত করিতে থাকে। যদি তাহা যথাকালে নিবারিত না হয় তাহা হইলে বিষম অনিষ্টের সম্ভাবনা। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে জলাশয় সান্নিধ্যে প্রায়ই বকের আবির্ভাব হয়; এবং কর্কট প্রভৃতি সংহার করিতে বকের মত আর কেহ পটু নয়।

এমনই করিয়া বক মানবশত্রুর উচ্ছেদ সাধন করে। সে যে মানুষের কোনও অনিষ্ট করে না একথা বলিতেছি না কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আবার বকেরও অনেক শত্রু আছে যাহারা সর্ব্বদাই তাহার প্রাণসংহারে অথবা ডিম্ব নষ্ট করিতে উদ্যত;—মানুষ তাহাদের অন্যতম, বোধ হয় তাহাদের মধ্যে প্রধান। অতএব ইহাকে কিয়ৎপরিমাণে হিংস্র ও অপকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার উপকারিতার মাত্রা কিছুমাত্র হ্রাস হয় না।

আবার গবাদি পশুর সহিত বকের সম্পর্ক লক্ষ্য করিয়া দেখিলে কৃষিজীবী মানুষের পক্ষে বকের উপকারিতা যে কত অধিক তাহা বুঝাইতে বেশী প্রয়াস পাইতে হয় না। আমরা সকলেই দেখিয়াছি যে গোমহিষের গায়ে এক রকম পোকা হয়, যাহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা নানা প্রকারে সেই কীট হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করে। বক অথবা কাক সেই পোকাগুলাকে যেরূপে নিঃশেষ করিয়া ফেলে তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক। এইরূপ কীটের অত্যাচার হইতে বক শূকরকে ও হস্তীকে রক্ষা করে। পশুর রক্তশোষক জোঁককেও বক নষ্ট করে। গরু, ভেড়া মাঠের উপর দিয়া চলিবার সময় যে সকল পতঙ্গ ভূমি হইতে উর্দ্ধে উঠে, বক তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই খাইয়া ফেলে। এই পতঙ্গ, আমাদের ক্ষেত্রে শস্যগুলার মহা শত্রু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বক ব্যাঙ খায়। কেহ কেহ মনে করেন যে এই ভেকনাশ ব্যাপার মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে, কারণ ভেক যে সকল কীট ভক্ষণ করে তাহাদের অধিকাংশই অপকারী। সে সকল কীট বহুল পরিমাণে প্রশ্রয় পাইলে আমাদের বাগান প্রভৃতি নষ্ট করিতে পারে। অতএব ভেক কতকটা আমাদের বাগান রক্ষা করে। তাহাকে সংহার করা কিছুতেই আমাদের পক্ষে শুভ নহে। এসম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ জীবতত্ত্ববিদ্ বলিতেছেন যে, এখন পর্য্যন্ত আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিনা যে ভেকের কোনও উপকারিতা আছে কিনা। ভেক যে সকল কীট ভক্ষণ করে তাহার অধিকাংশই বিশেষ অপকারী কিনা সন্দেহ। অতএব ব্যাঙ খাওয়ার দরুণ বককে মানুষের শত্রু সাব্যস্ত করা ঠিক যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমরা বলিতে চাহি, বক-জাতীয় কোন কোন পাখী মানুষের অনিষ্ট করে বলিয়া, যে সকল বকই অপকারী তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না,—অন্ততঃ এখন পর্য্যন্ত আমাদের যতদূর বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও পরীক্ষণ হইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহভাবে বকচরিত্রের কলঙ্ক সত্য বলিয়া সাব্যস্ত করা চলে না।

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

স্বরাজ।

(১৭)

রুশদেশের কৃষিজীবিগণ ধর্ম্মপ্রাণ, টলষ্টয়ের এই সাক্ষ্য উপেক্ষণীয় নহে। আধুনিক অরাজক-সমাজ-বাদের জন্মভূমি রুশদেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা স্বদেশানুরক্ত, দৃঢ়সঙ্কল্প ও স্বার্থত্যাগী, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? আধুনিক অরাজক-সমাজ-বাদের প্রধান গুরু বাকুনীন (Bakounine), ক্রোপোট্কিন (Kropotkin) ও টলষ্টয় (Tolstoi) তিন জনেই রুশদেশে অভিজাত বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনজনই নির্য্যাতন মাথায় তুলিয়া নিয়া, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা জীবনে প্রচার ও পালন করিয়াছিলেন। ১৮৫০ সালের জানুয়ারী মাসে একবার ও ১৮৫১ সালের মে মাসে আর একবার বাকুনীনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল। কোনবারই প্রাণনাশের হুকুম তামিল হয় নাই বটে, কিন্তু সাক্সনী, অষ্ট্রিয়া ও রুশদেশের কারাগারে বাস করিতে করিতে প্রাণনাশ অপেক্ষা ভীষণতর যন্ত্রণা, স্বাস্থ্যনাশ, তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু নিজে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা হইতে বাকুনীন ভ্রষ্ট হন নাই। অরাজক-সমাজ-বাদীদের কথা ছাড়িয়া দি। ও দলের সহস্র সহস্র যুবক, অনলে পতঙ্গের ন্যায়, রাষ্ট্রশক্তির তীব্র প্রকোপে ঝাঁপ দিয়াছিল। রাষ্ট্রবাদী বিপ্লব-পন্থী (Revolutionary) বোল্‌শেভিক্ দলের লেনীন (Lenine), ট্রট্স্কী (Trotzky) প্রভৃতি নায়কগণের মধ্যে কারাবাস বা নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করেন নাই এমন কেহ নাই বলিলেই হয়। শুধু বিপ্লব-পন্থিদের কথা বলিতেছি কেন, সংস্কার পন্থিগণও (Gradualists, Liberal) মাতৃভূমির সেবায় স্বার্থত্যাগে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহারাও কারাবাস ও নির্ব্বাসন দণ্ড মাথায় পাতিয়া নিয়া স্বদেশসেবা করিয়াছেন। সেই জন্য বলিতেছিলাম যে রুশদেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ স্বদেশানুরক্ত, দৃঢ়সঙ্কল্প ও স্বার্থত্যাগী ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কি শ্রমজীবী, কি কৃষিজীবী, কি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক—প্রীতিপ্রণোদিত হইয়া রাষ্ট্রের সহকারিতা বর্জ্জন তাহারা জীবনে পালন করিতে পারে নাই। এ কথায় এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, কাহারও মনে প্রীতি ছিল না বা কেহ প্রীতি প্রণোদিত হইয়া রাষ্ট্রের সহকারিতা-বর্জ্জনের চেষ্টা করে নাই। প্রীতি প্রণোদিত হইয়াই হউক, বা দ্বেষ-প্রণোদিত হইয়াই হউক, সময়ে সময়ে সহকারিতা বর্জ্জন অনেকেই দলে দলে করিয়াছে।

সকল অবস্থায় বল-বিজয়ী প্রেমের অনুজ্ঞা পালন করিতে না পারিবার কারণ মানুষের প্রকৃতিতেই নিহিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে সকল মানুষের প্রকৃতিতে দেবভাব ও পশুভাব উভয়ই আছে। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। ইহার অর্থ এ নয় যে, আমার প্রকৃতিতে দেবভাব আছে ও তোমার প্রকৃতিতে পশুভাব। আমার

প্রকৃতিতে দেবভাব ও পশুভাব উভয়ই প্রকৃতিতেও তাহাই। আমি দেবভাবে পূর্ণ, আবার পরক্ষণে হয়ত পশুভাবে বিচলিত। তোমাতে ও আমাতে দেবভাবের বা পশুভাবের মাত্রার তারতম্য নাই, এমন নয়। তোমাতে ও আমাতে, এদেশের মানুষে ও বিদেশের মানুষে প্রকৃতিগত দেবভাবের প্রকার ভেদও আছে। সকল মানুষে দেবভাব শুধু একই প্রকারের নহে। আবার মানুষের প্রকৃতিতে যে পশুভাব তাহারও প্রকার-ভেদ আছে। কিন্তু মানুষ মাত্রেই ক্ষুধা তৃষ্ণার অধীন, বস্ত্র ও বাসগৃহ অধিকাংশ মানুষেরই প্রয়োজনীয়। আর সকল দেশের সাধারণ মানুষের বেলায় ইহাও সত্য যে পুরুষ স্ত্রীসঙ্গঅভিলাষী। এই সব প্রয়োজন লাভ করিবার সময় বাধা পাইলে মানুষের প্রকৃতিগত পশুভাব তাহাকে কি আন্দাজ বিচলিত করিতে পারে, তাহা সভ্য সমাজে বাস করিয়া আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। মনস্তবিদ্গণ আরও বলেন যে, শুধু এই কয়েকটী প্রয়োজন লাভ করিতে পারিলেই মানুষ শান্তদান্ত হইয়া নির্ব্বিবাদে কাল কাটাইবে, তাহা নয়। মানুষের সঞ্চয় প্রবৃত্তি আছে। মানুষ প্রতিবেশীর নিকট সুনাম পাইতে চায়। অনেকের মনে আবার অপরের উপর প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আবার প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা মানুষকে কর্ম্মক্ষেত্রে ধাবিত করিতেছে। অন্নবস্ত্র লাভ হইলেও এ সকল প্রবৃত্তি মানুষকে চুপ করিয়া থাকিতে দেয় না। মানব প্রকৃতির এই বিচিত্র গঠনের বিষয় প্রকৃত সরলভাবে স্বীয় স্বীয় জীবনে আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে মানুষের পশুভাবকে সকল সময়ে তাহার দেবভাবের নিকট নতশির রাখা কি দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং কোন দেশেই সাধারণ মানবের মধ্যে অজেয় অলৌকিক প্রীতির অপ্রতিহত একাধিপত্য বিস্তার আজও সম্ভব হয় নাই, আর মানব সমাজ হইতে বল বা শক্তির (force) নির্ব্বাসনের এখনও দেরী আছে। যতদিন সমাজ হইতে বল বা শক্তি বিদূরিত না হয়, ততদিন কোনও না কোনও আকারে শক্তিমূলক রাষ্ট্রও সমাজে আসিয়া দেখা দিবে। নতুবা তথায় বল বা শক্তির অত্যাচারের সীমা নির্দ্দেশ কে করিবে?

রুশদেশের ধর্ম্মপ্রাণ কৃষিজীবিগণ ও স্বদেশানুরাগী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ টলষ্টয়ের প্রদর্শিত অলৌকিক অজেয় প্রীতির পথে চলিতে পারিল না। কিন্তু সময়ে সময়ে দল বাঁধিয়া অসহযোগের পথে চলিয়াছে। প্রীতিপ্রণোদিত হইয়াই হউক বা দ্বেষপ্রণোদিত হইয়াই হউক, রাষ্ট্রের সহস্র সহস্র লোক একযোগে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অসহযোগ সঙ্কল্প পালন করিলে, যে কোনও রাষ্ট্রের ভিত্তি শিথিল হইবে। ভিত্তি একবার শিথিল হইলে সে রাষ্ট্র ছোট খাট ধাক্কাও সামলাইতে পারে না। তখন সে রাষ্ট্রকে ধূলিসাৎ করিতে প্রচণ্ড বল বা শক্তির প্রয়োজন হয় না।

১৯১৪ সালের ২রা আগষ্ট রুশসম্রাট্ দ্বিতীয় নিকোলাস্ পরম উৎসাহে জার্ম্মাণী আক্রমণ করেন। তারপরে তিন সপ্তাহ রুশ সেনানীর বীরত্ব ও জয়বার্ত্তা চারিদিকে প্রচারিত হইল। ১৯১৪ সালের ২৮শে আগষ্ট টানেনবুর্গে রুশসেনানী জার্ম্মানীর নিকট লাঞ্ছিত ও পরাজিত হইলেও তাহার পরে সাত মাস কালে রুশসেনানী বিজয় গৌরবে প্রমত্ত ছিল। ১৯১৫ সালের জুন হইতে জার্ম্মানীর গোলাবারুদের ধোঁয়াতে রুশসেনানীর সমরোৎসাহ আর তেমন জলে নাই।

যুদ্ধ সুরু হইবার দুইমাস পরেই লেনীন প্রমুখ একদল বোল্‌শেভিক রুশসেনানীকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য উপদেশ দেন। আড়াই বৎসর যুদ্ধের প্রায় দুইবৎসর কাল রুশ-সেনানী যুদ্ধে নিরুৎসাহ। ১৯১৭ সালের মার্চ্চ মাসে রাজধানী পেট্রোগ্রাডে তখন জনগণ ক্ষুধা-ক্লিষ্ট ও রণক্লান্ত। তখন প্রথমে কারখানার শ্রমজীবিগণের মধ্যে ও পরে সেনানিবাসে যোদ্ধাগণের মধ্যে অসহযোগ দেখা দিল। ক্রমে ব্যবস্থাপক সভায় সংস্কার পন্থিদের (Liberls|) মধ্যে ও অসহযোগ দেখা দিল। সামান্য কিছু রক্তপাতের পর ১৯১৭ সালের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বহুকালের পুরাতন রাষ্ট্র বহুধারার স্রোতে ভাসিয়া গেল। অসহযোগ তাহার মধ্যে একটী মাত্র ক্ষীণ ধারা। সহজেই রাজতন্ত্র দূর হইয়া প্রজাতন্ত্র উপস্থিত হইল। তার কিছু পরে ডুমা বা ব্যবস্থাপক সভায় কৃষি-জীবী প্রতিনিধিগণের নায়ক কেরেন্‌স্কী (Keransky) প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের নায়ক হইলেন। নিকোলাসের পালা শেষ হইয়াছে, এবার কেরেন্‌স্কীর পালা। বল বা শক্তির সাহায্যে এক রাষ্ট্র নষ্ট হইল আর এক রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা চলিল। আবার সেনানিবাস সমূহে অসহযোগ দেখা দিল। এক বিপ্লবের পর আর এক বিপ্লব আসিল। কেরেন্‌স্কীর নূতন রাষ্ট্র আটমাসও টিঁকিল না। এবার লেনীনের প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র আসিল। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর এই সমাজতন্ত্রবাদী নূতন রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়। টলষ্টয় বলিয়াছিলেন, বল বা শক্তির সাহায্যে যে রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তাহার স্থানে ভবিষ্যতে যে সমাজ গড়িয়া উঠিবে, তাহাও শক্তি মূলক হইয়া দাঁড়াইবে। শক্তির সাহায্য যদি একবার নিয়াছ, শক্তির সাহায্য তোমাকে চিরকাল নিতে হইবে। নিকো-লাসের শক্তিমূলক রাষ্ট্রের স্থানে আসিয়াছিল কেরেন্‌স্কীর শক্তিমূলক প্রজাতন্ত্র। আবার অসহ-যোগের পথে তাহার স্থানে আসিল লেনীনের শক্তিমূলক বোল্‌শেভিক প্রজাতন্ত্র। তারপরে লেনীনের সেনানিবাসেও অসহযোগ সময়ে সময়ে দেখা দিয়াছে। কিন্তু লেনীনের সেনাশক্তি এখনও প্রবল বলিয়া আজ প্রায় চারি বৎসর বোল্‌শেভিক্ সমাজতন্ত্রবাদী রাষ্ট্র টিঁকিয়া আছে।

সকলেই বলিতেছে যে বোল্‌শেভিক রাষ্ট্র আজও রুশদেশে সমাজতন্ত্র (socialism) প্রতি-ষ্ঠিত করিতে পারে নাই। সম্রাটের আমলে ছিল বারকোটি কৃষিজীবী ও একলক্ষ ত্রিশ হাজার ১৩০,০০০ ভূম্যধিকারী; এখনও পূর্ব্বের ন্যায় সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ জন কৃষিজীবী কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেই আজ ভূম্যধিকারী। এই কোটি কোটী ভূম্যধিকারী কিন্তু রাষ্ট্র হইতে পৃথক্ সম্পত্তি (Private Property) দূর করিয়া দিতে বড়ই নারাজ। ইতি মধ্যেই রুশদেশে কৃষি-জীবিদের মধ্যে একশ্রেণী ধনী ও অপর শ্রেণী দরিদ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজতন্ত্র সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই; করিবার তেমন অবসর ও পায় নাই। আর রুশদেশে বিপ্লবের ফলে সমাজ তন্ত্রই প্রকৃত পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা তাহারও আলোচনা করিবার এখন সময় আসে নাই। কিন্তু সাধারণ প্রজার স্বাধীনতা যে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় নাই তাহা সুনিশ্চিত। নব-সংস্থাপিত রাষ্ট্রে প্রজাদিগদ্বারা রাষ্ট্রের নিয়ম সকল পালন করান রাষ্ট্রের পক্ষে সুসাধ্য নয়। সেই জন্য অনেক নগণ্য সাধারণ প্রজা রাষ্ট্রের নিয়ম অমান্য করিয়াও শাস্তি পায় না। ইহাতে যতটুকু স্বাধীনতা ততটুকু স্বাধীনতা বাড়িয়া থাকিতে পারে। নতুবা প্রজার স্বাধীনতার মাত্রা হ্রাস পাইয়াছে। নূতন রাষ্ট্রের প্রাণরক্ষার জন্য, যখন ও যেখানে প্রয়োজন, শক্তিমূলক শাসন

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বিরাজ করিতেছে। বোল্‌শেভিক 'লালপল্টন' (The Red Army) প্রলয়ঙ্করী শক্তির অভিনয় দেখাইতেছে।

অসহযোগের স্বভাব ভাঙ্গা, গড়া নয়। "ভাঙ্গিলে গড়িতে পারে সে বড় সুজন"। অসহযোগ সে "সৌজন্যের" দাবী করিতে পারে না। রুশদেশেও পারে নাই। অসহযোগের অবশ্যম্ভাবী ফল নির্দ্দিষ্ট কাজে লোকের মন বসে না। বারমাস ত্রিশদিন ছুটী পাইবার ইচ্ছা মনে জাগে। বোল্‌শেভিক রাষ্ট্রেও ইহার পরিচয় অতিমাত্রায় পাওয়া গিয়াছে। সম্রাটের আমলে এক নিয়ম ছিল যে প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত সুস্থ পুরুষ কয়েক বৎসরের জন্য সৈনিক হইয়া কাজ করিতে বাধ্য। সে নিয়ম (military conscription) রদ করা হইয়াছে। এখন নিয়ম হইয়াছে যে রাষ্ট্র যত জনকে কাজ দিতে পারিবে ততজনকে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কারখানায় আসিয়া শ্রমজীবী হইতেই হইবে (Industrial Conscription)। তারপরে কারখানা ছাড়িয়া পালাইয়া গেলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে। সৈন্য দল ছাড়িয়া পালাইয়া গেলে (Desertion) যেমন শাস্তি পায়, কারখানা ছাড়িয়া পালাইয়া গেলে (Labour Desertion) শ্রমজীবিদের সেইরূপ শাস্তি হয়। এইরূপ কড়া শাসনের ব্যবস্থা করিয়া অতিরিক্ত ছুটির বাসনা খর্ব্ব করা প্রয়োজন হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ জাতির ইতিহাসেও শক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রগঠন করিতে হইতেছে। আবার বলি রাষ্ট্রের মূলভিত্তি শক্তি বা বল (Force)।

(১৮)

১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর পেট্রোগ্রাডে শ্রমজীবী ও সৈনিকদিগের প্রতিনিধি-সঙ্ঘের (soviet of workmen's and soldiers' delegates) অধিবেশনে লেনীন বিপ্লব-বার্ত্তা ঘোষণা করিবার সময় বলেন—"এখন পর্য্যন্ত একবিন্দু রক্তপাত হয় নাই। আমার জ্ঞানমত একজনও হত বা আহত হয় নাই।" তখন কথাটা সত্য ছিল।

তারপর "লাল পল্টনের" অভিনয়।

১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে পেট্রোগ্রাডে আর এক প্রতিনিধি সভায় (Constituent Assembly) বোল্‌শেভিক দলকে শুনিতে হইল যে চীৎকার উঠিয়াছে—"তোমাদের হাত ভাইয়ের রক্তে মাখা। আর রক্তপাত চাই না।" সভার দক্ষিণ পাশ হইতে যখন এই চীৎকার উঠিতেছিল তখন লেনীন উত্তর দিলেন—"আমরা শক্তির সাহায্যে ভীষণ প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছি বলিয়া অভিযোগ করিতেছ। জিজ্ঞাসা করি, আমরা কবে টল্‌ষ্টয়ের শিষ্য ছিলাম?"

শুধু যে "লাল পল্টন" রাষ্ট্ররক্ষার জন্য সহস্র সহস্র চোর বা রাষ্ট্রদ্রোহী বা রাষ্ট্রদ্বেষীদিগকে গুলি করিয়া মারিয়াছিল তাহা নয়। কৃষিজীবিগণকেও ঐ এক লক্ষ ত্রিশ হাজার ভূম্যধিকারিদিগকে জমি হইতে তাড়াইবার জন্য সময়ে সময়ে রক্তপাত করিতে হইয়াছিল। কারখানার মালিকগণ (capitalists) সব সময়ে বিনা রক্তপাতে "কারখানা কমিটি"র (Factory Committee) হাতে কারখানা ছাড়িয়া দেয় নাই। আবার সকল শ্রমজীবির সমান বেতন হওয়া চাই বলিয়া শ্রমজীবিগণ দাবী করাতে অনেক স্থলে শ্রমজীবিদিগের প্রতিনিধিগণ প্রাণভয়ে "কারখানা কমিটি" (Factory Committee) পূর্ব্বমালিকদিগের (Capitalists) হাতে ফেরৎ দিতে চাহিয়াছে। অনিপুণ, নিপুণ ও সুনিপুণ শ্রমজীবিদিগের সকলের সমান বেতন

না হইলে যেমন নিকোলাসের শাসন বিপর্য্যস্ত করিয়াছি, যেমন কেরেন্‌স্কীর শাসন বিপর্য্যস্ত করিয়াছি, তেমনি লেনীনের শাসনও বিপর্য্যস্ত করিতে দ্বিধা করিব না—একথাও লেনীনকে শুনিতে হইয়াছে। তারপর আবার লেনীনের "লালপল্টন"—

রাজতন্ত্র গিয়াছে, প্রজাতন্ত্র আসিয়াছে। নিকোলাস্ রোমানোফ্ গিয়াছে, জনগণ-নির্ব্বাচিত লেনীন আসিয়াছে। একলক্ষ ত্রিশহাজার অভিজাত ভূম্যধিকারীর পরিবর্ত্তে এখন কোটী কোটী কৃষক ভূম্যধিকারী। ধনী পুরুষ এখন রাস্তায় সংবাদপত্র বিক্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। অভিজাত মহিলা শীতকালে রাস্তায় বরফ ঝাঁটাইয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে। শ্রমজীবিদের মধ্যে কেহ কেহ মাসে দশহাজার রুব্‌ল্ (Rouble) উপার্জ্জন করিতেছে। সম্রাটের আমলে যাহারা রাস্তায় রাত্রি যাপন করিত, তাহারা অনেকে এখন বোল্‌শেভিক রাষ্ট্রের নিয়মানুসারে অভিজাতের প্রাসাদে নিদ্রা যায়। কিন্তু বৈষম্য আজও দূর হইল না। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আজও রুশদেশে সহস্র সহস্র নিরুপায় লোকের প্রাণনাশ করিতেছে। প্রতিপত্তিশালীর অত্যাচার আজও দূর হয় নাই।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

নিঃসঙ্গের স্বপ্ন।

মহাপ্রলয়ের ঝঞ্ঝা বিশ্ববক্ষোপরে
রুদ্র-তাণ্ডবের হেন মথি' চরাচরে
বয়ে' গেছে অকস্মাৎ! সপ্ত সিন্ধুনীর
আন্দোলি আস্ফালি গর্জ্জি উচ্ছ্বাসি গভীর
উন্মত্ত দানব প্রায় প্লাবি' দশদিশ
ধরিত্রীর শ্যাম-শোভা হায় জগদীশ!
নিঃশেষে মুছিয়ে গেছে! ঘুচে গেছে আজ
বিপুল সংসার সাথে দুঃখ দৈন্য লাজ
প্রাণের বন্ধনরাশি! পাখী নাহি গায়
বহে না সমীর আর চেতনা-বন্যায়
মাতায়ে চৌদিক হর্ষে! স্তব্ধ চারিধার
শব্দহীন অচঞ্চল কূটস্থ আত্মার
বিকল্প সমাধি সম!
একাকী কেমনে
আমি শুধু পড়ে আছি বিশাল ভুবনে
কালের সাক্ষীর মত, মহাশূন্যতায়
পূর্ণ করি হৃদি ভারে! হেরি ক্ষিপ্ত প্রায়
সম্মুখে পশ্চাতে ঊর্দ্ধে উভ পার্শ্বে মম
দুস্তর অনন্ত শুধু রুদ্র রোষ সম
আমারে ঘেরিয়া আছে! ক্ষুদ্র শান্ত আমি
অনন্তের পারাবারে ডুবি দিন-যামি
হইতেছি রুদ্ধ-শ্বাস! এত নীরবতা
সীমাহীন দিগন্তের নিঝুম স্তব্ধতা
অসহ্য আমার পাশে! গুমরিয়া প্রাণ
মরিতেছে মুহুর্মুহুঃ! করিছে সন্ধান
স্বধর্ম্মী কোথায় আছে! নাই, কেহ নাই,
ভীষণ সংহার-দৃশ্যে পূর্ণ দশ ঠাঁই
বিরাট শ্মশান হেন!
হে শ্মশানেশ্বর!
হে বিশ্ব-প্রলয়-পতি ত্রিশূলী শঙ্কর!
একি ভ্রান্তি তব নাথ! সব গেছে হায়,
বজ্রাঘাতে চূর্ণ হয়ে প্রলয়-বাত্যায়
ধূলিরেণু সম উড়ি' সাগর উচ্ছ্বাসে
ভাসি' তৃণখণ্ড প্রায়! শুধু তব পাশে

হয়েছিল ক্লান্তি বড় দুর্ভাগ্য অক্ষমে
মথিতে সে ঘূর্ণিচক্রে ! একদা অধমে
নিষ্ঠুর জগৎ যথা ক্ষণেক ফিরিয়া
চাহিত না হেলা ভরে, পাই না ভাবিয়া
তার সাথে মৃত্যু কিবা করে পরিহাস
তেমতি উপেক্ষি' হায়। সে কি মৃত্যু ত্রাস
তব সম মৃত্যুঞ্জয় !
ক্ষম ক্ষমাময় !
বৃথা দুষিতেছি তোমা ! নিঃসঙ্গ হৃদয়
একান্ত সন্তপ্ত আজি ! অভিশপ্ত প্রাণ
ভুঞ্জে কর্ম্মফল নিজ ! বাজাও ঈশান !
ভৈরব বিষাণ তব ব্যোম হতে ব্যোমে
তুলি' ঘোর প্রতিধ্বনি, কোটি সূর্য্য-সোমে
রোমাঞ্চিয়া যুগপৎ ! নাচ চন্দ্র চূড় !
সে মহা নির্ঘোষ-তালে চির-মূর্চ্ছাতুর
তমাচ্ছন্ন চিত্তে মম অপূর্ব্ব-মধুর
মদোন্মত্ত ভঙ্গিমায় ! হয়ে যাক্ দূর
সব শ্রান্তি অবসাদ ! ত্রস্তে মুছে আঁখি
চেয়ে দেখি সবিস্ময়ে নহিয়ে একাকী
কি আনন্দ স্বপ্নাতীত ! সর্ব্ব শেষে আজ
তুমি আর আমি শুধু আছি বিশ্বরাজ !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বৈষ্ণব কবিতা। *

বাঙ্গলার বৈষ্ণব কবিতা গীতি কবিতা অর্থাৎ lyrics নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এজন্য বাঙ্গলার বৈষ্ণব-কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ গীতি-কবিতা কাহাকে বলে, তাহা দেখা আবশ্যক। গীতি-কবিতা ইয়োরোপীয় নাম। পূর্ব্বে আমাদের দেশের কবিতা, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য অথবা দৃশ্যকাব্য, এই তিন পর্য্যায়ভুক্ত ছিল। ইংরেজী আমলে খণ্ড-কাব্যের অন্তর্গত কতগুলি কবিতাই গীতি-কবিতা নামে অভিহিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মনের ভাবোচ্ছাস পরিস্ফুট রূপ ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই গীতি-কবিতার সৃষ্টি। এই সকল কবিতার গীতি-কবিতা নাম প্রাপ্ত হইবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ গীত হইবার উদ্দেশ্যে তৎসমুদায়ের রচনা হইত। গীত হইবার উদ্দেশ্যে যে কবিতা, তাহার সাফল্য জন্য সুন্দর শব্দ-বিন্যাস, ও সুশ্রাব্য ছন্দোবন্দন ও সুমধুর কণ্ঠধ্বনি আবশ্যক। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, শব্দ ঝঙ্কৃত কবিতা গীত না হইয়া কেবল পঠিত হইলেও মনমুগ্ধ করে। ফলতঃ এখন ছন্দগ্রথিত ভাবোচ্ছাসপূর্ণ ক্ষুদ্র কবিতা মাত্রেই গীতিকবিতা নাম লাভ করিয়াছে।

আমরা বলিয়াছি যে, গীতি-কবিতার সাফল্যের জন্য শব্দ ও ছন্দ আবশ্যক। কিন্তু শব্দ ও ছন্দই গীতিকবিতার সর্ব্বস্ব নহে। রস এবং সৌন্দর্য্যই গীতি কবিতার প্রাণ।

রস কাহাকে বলে ? যে বর্ণনা দ্বারা অভিলষিত পদার্থে প্রগাঢ় প্রেম, প্রিয়-বিয়োগ-জনিত চিত্ত-বিহ্বলতা, কর্ম্মে অবিচলিত উৎসাহ এবং রাগ দ্বেষ বিমুক্ত মন প্রভৃতির অভিব্যক্তি হয়, তাহাই রস সঞ্জাত। যে গীতিকবিতায় এই রসোদ্ভাবন হয়, তাহা পাঠে হৃদয় কখনও হর্ষে উছলিতে থাকে, কখনও শোকে দহিতে আরম্ভ করে, কখনও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে

* টাঙ্গাইল সাহিত্য সংসদের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পঠিত। এই সভায় শ্রীযুক্ত সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আবার কথনও ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া উঠে। আর সৌন্দর্য্য? এই রসোদ্ভাবন হইতেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে। প্রেমিকা আক্ষেপ করেন,

লাথ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তৈঁ ও হিয় জুড়ন না গেল।

তিনি প্রার্থনা করেন,

মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণ নাথ হৈও তুমি।

তিনি অভিলাষ করেন,

(আমায়)　নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ

প্রেমিক বলেন,

চম্পক বরণী হরিণ নয়নী
চলে নীল শাড়ী　নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।

আবার

তাকায়ে মেরেছে বাণ যেখাণে পরাণ

প্রেমিক প্রেমিকা

দোঁহ কোড়ে দোঁহ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
তিল আধ না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥

মাতা পরাণপুত্তলীকে গৃহে প্রত্যাগত দেখিয়া বলেন

এতক্ষণ কোথা, হিয়া দিয়া ব্যথা
গেছিলে কোন বা বনে।
এখানে এ ধর, গৃহ মাঝে ছিল,
পরাণ তোমার সনে॥
আঁখির তারাটি গেছিল খসিয়া
এবে আঁখি আসি বসি।

বালক সখা,

যেই ফল মিষ্ট লাগে, অমনি দেয় শ্যামের বদনে,
আবার বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় বলেন

নাবল নাহক ওসব কথা
কহিতে পরাণ ফাটে।
হিয়া জর জর পুড়ায় অন্তর,
অধিক জলিয়া উঠে।

প্রেমিক প্রেমিকার এই প্রেম, মাতার এই স্নেহ, সখার এই অনুরাগ মনোরম, এই সকল

ভাবের সন্নিপাতে তাঁহাদের হৃদয়ে যে সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাহা আমাদিগকে আনন্দে আপ্লুত করে; আমাদিগকে মুগ্ধ করে। ইহা মানবের অন্তঃসৌন্দর্য্য।

ঐ অন্তরের সৌন্দর্য্য আপনা আপনি ফোটে, কবির ইন্দ্রজালে তাহা শব্দ ও ছন্দের মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। কিন্তু রস কি মাত্র নয়টি? মানব প্রকৃতিতে ভাবের অসীম খেলা, কত বৈচিত্র্য, কত রূপ, কত বর্ণ, কত গন্ধ, কে তাহার গণনা করিবে? মানুষ কি, জগতের মাঝে মানুষের স্থান কোথায়, সৌন্দর্য্য, ভালবাসার সহিত মানুষের সম্পর্ক কি, এই সকল ভাব মানুষের চিত্তে প্রবাহিত হইতেছে। সমস্ত মথিত করিয়া এক অব্যক্ত পরমরূপ, পরম রস উছলিয়া উঠিতেছে। তাহাতে কবিচিত্ত স্পন্দিত হয়; তিনি যে অনুভূত রূপ এবং রস ধরিবার ও বুঝিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। কিন্তু "খাঁচার মাঝে অচিন পাখী কমনে আসে যায়।" "ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর।" এই খোঁজে তিনি ইন্দ্রিয় মন, আত্মা, সান্ত জড়ত্বের সীমার অতীত উর্দ্ধতর লোকে উন্নীত করিয়া অনন্তের দিকে প্রসারিত করিয়া দেন। ইহাতে অরূপের রূপ লীলায় কত গান, কত ছন্দ ধ্বনিত হইয়া উঠে। কিন্তু সমস্তই দূরাগত সুকণ্ঠোত্থিত সঙ্গীত লহরীর মত মিষ্ট ও প্রীতিকর, হৃদয় স্পর্শ করিয়া যায়, কিন্তু ধরিবার বুঝিবার নহে।

এই যে ভাবের প্রবাহ, তাহা চিরকাল কবিচিত্ত স্পন্দিত করিতেছে। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক কবিকুলের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রাচীন কবিকুল যেভাব স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেন, তাহাই তাঁহারা প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশিত করিতেন, তাঁহারা মনের ভাবোচ্ছাসকে সংযত করিয়া তাহার ঘনীভূত রূপকেই ভাষায় বাহির করিতেন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ও আছে, যথা রাগাত্মিক পদ ও বাউলের গান, এই সমস্ত জটিল ও অস্পষ্ট। আধুনিক কবিবৃন্দ আপনাদের মনে যে ভাবের উচ্ছ্বাস উঠে, তাহা সংযত করিতে অভ্যস্ত নহেন; যাহা কিছু দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত স্পন্দিত হয়, তাহাই তাঁহারা পরিপাটী ভাষায় নিবদ্ধ করিয়া থাকেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, আধুনিক কবিতার অধিকাংশই অস্পষ্ট সহজ বোধ্য নহে। প্রাচীন ও আধুনিক কবিদের মধ্যে এইরূপ পার্থক্য আছে বলিয়া পাশ্চাত্য সমালোচকগণ তাহাদিগের কবিতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা, প্রাচীন কবিতা (Classical poetry) এবং আধুনিক কবিতা (Romantic poetry) আমাদের বক্তব্য এই যে উভয় শ্রেণীর কবিতাই আমাদের প্রিয়। প্রাচীন কবিতার ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের স্পষ্টতা এবং আধুনিক কবিতার ভাষার পরিপাট্য ও ভাবের উচ্ছ্বাস, সমস্তই আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

গীতি কবিতার কবি অন্তরের সৌন্দর্য্যের ন্যায় বাহ্য দৃশ্যে যে সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট, তাহার চিত্রও অঙ্কিত করেন। কবির বাহ্য সৌন্দর্য্যের আদর্শ আমরা দেখাইতেছি। ঐ প্রশস্ত সমতল ভূমি শস্য শ্যামল হইয়া শোভা পাইতেছে, বিজন বনরাজি গাম্ভীর্য্য মণ্ডিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বিস্তীর্ণ মরুভূমি সূর্য্য কিরণে জলিতেছে, পর্ব্বত মালা একটীর পর আর একটী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে, বিপুল কায়া স্রোতস্বিনী কলনাদে সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে, প্রস্রবণ ধারা পর্ব্বত গাত্রে আহত হইয়া স্ফটিক চূর্ণের মত পড়িতেছে।

বাহ্য দৃশ্যের আর এক সৌন্দর্য্য :—ঐ গৃহস্থ বধূ বাঁকা পথে কলসী কাঁখে চলিয়াছে। বামেতে শুধু মাঠ ধূ ধূ করিতেছে দক্ষিণে বাঁশবন শাখা হেলাইয়া রহিয়াছে, দুধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা দীঘির কালজলে সাঁঝের আলো ঝলিতেছে, তীরে অমিয় মাখা স্বরে কোকিল কুহরিতেছে। আঁধার তরু শিরে চাঁদ আকাশ আঁকা দেখা যাইতেছে। পশ্চিমা মজুরের ছোট মেয়ে ঘটিবাটি থালা লইয়া ঘষামাজা করিতেছে, পিত্তলকঙ্কণ পিতলের থালি পরে ঠন ঠন বাজিতেছে, নেড়া মাথা, কাদা মাখা, উলঙ্গ ছোট ভাইটি দিদির আদেশে পোষা প্রাণীটীর মত উচ্চ পাড়ে স্থির ধৈর্য্যভরে বসিয়া রহিয়াছে। *

কবি গীতিকবিতায় এইরূপ নানা ছবি অঙ্কিত করেন। তাহার তূলিকাস্পর্শে এই সমস্ত শোভা এই সমস্ত সৌন্দর্য্য শব্দ ও ছন্দের মধ্যে ফুটিয়া উঠে।

গীতি কবিতার রস ও সৌন্দর্য্য বলিতে কি বুঝায়, আমরা তাহা দেখাইলাম। এই রস ও সৌন্দর্য্য ভাষার মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া মানস নয়নে দেখা দেয়। ভাষা স্বচ্ছ ও সরল হইবে, তাহার ভিতর দিয়া রস ও সৌন্দর্য্য দেখা যাইবে। সুন্দর ভাব সুন্দর ভাষাতেই ব্যক্ত হইতে পারে। বস্তুতঃ ভাব ও ভাষা পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে।

গীতি কবিতার এই সমস্ত লক্ষণ ধরিয়া বৈষ্ণব কবিতার বিচার করিতে হইবে। বৈষ্ণব কবিতা উৎকৃষ্ট, উপভোগ্য, তাহার ভাষা কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে, আর তাহার ভাব আকুল করে প্রাণ। বৈষ্ণব কবির ভাষা স্বচ্ছতরল স্রোতধারার ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে, জীবনের হিল্লোলে উচ্ছ্বসিত, মুখরিত। এইভাষা কোথাও হর্ষে গদগদ ভাষিণী, কোথাও দুঃখে অশ্রুময়ী, কিন্তু সর্ব্বত্রই কুসুমিত কলেবরা!

বৈষ্ণব কবিতা দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। রাগাত্মিক পদ ও বাউলের গান এবং রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক পদ। রাগাত্মিক পদ ও বাউলের গান দেহতত্ত্ব এবং সাধন বিষয়ক এবং একই শ্রেণীভুক্ত। এই পদ ও গান অস্পষ্ট, অর্থ পরিগ্রহ দুষ্কর। দুই কারণে এইরূপ হইয়াছে। এই সকল সাধকের হৃদয়ে যে ভাবরাজির খেলা হইয়াছে, তাহা অস্পষ্ট ; মৃগ কস্তুরীর গন্ধে মোহিত হয়, কোথা হইতে সে গন্ধ আইসে, কিসের গন্ধ, তাহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া সে তাহার সন্ধানে ছুটিয়া বেড়ায়। এই সকল সাধক ও সেইরূপ আপনাদের হৃদয়ে অস্পষ্ট ভাব অনুভব করিয়াছেন, সে অনুভূতিতে তাহাদের হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা সে সমস্তের মূর্ত্তি প্রদান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। এজন্য তাহাদের পদ ও গান অস্পষ্টতা দোষ যুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে সহজ ভজনের কথা বলা হইয়াছে। এই ভজনকথা বহিরঙ্গকে বলা নিষিদ্ধ বলিয়া তাহা এমন ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, ঐ পথের পথিক ভিন্ন অন্যে সবটুকু বুঝিতে না পারে। টীকাকারেরা এই ভাষাকে "সন্ধ্যা ভাষা" অর্থাৎ আলো আঁধারের ভাষা বলিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অর্থাৎ চৈতন্ম পন্থীরা সহজ ভজনকে রসের ভজন বলেন। তাহাদের মতে চণ্ডীদাস প্রভৃতি "পঞ্চরসিক" সহজ মতের প্রবর্ত্তক। চণ্ডীদাস একজন বাউল ছিলেন এবং তাঁহার রাগাত্মিক পদ প্রসিদ্ধ। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে সহজ ভজন চণ্ডীদাস অপেক্ষা অনেক প্রাচীন বলিয়া দেখা যায়। মহামহো-

* চন্দ্রিকা।

পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, সহজ ভজন অথবা সহজ যান পথ বৌদ্ধদিগের সৃষ্টি। বুদ্ধদেবের পবিত্র নির্ম্মল ধর্ম্মের অধোগতি হইলে বৌদ্ধেরা সে ধর্ম্মকে "সুখবাদে" পরিণত করিয়া ভোগের কোঠায় আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহাই সহজ ভজন অথবা সহজ যান।

এখন আমরা রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক পদাবলী সম্বন্ধে লিখিতেছি। পদাবলীর প্রকৃত রস গ্রহণ করিতে হইলে ভিতরে প্রবেশ করা আবশ্যক। ভিতরে প্রবেশের চাবি আছে। এই চাবি সকলের পক্ষে সুলভ নহে। তজ্জন্য ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বাহির হইতে বৈষ্ণব-পদাবলী যে ভাবে দেখা যায় তাহাই আমরা প্রথমে বলিয়া লইতেছি। স্ত্রীপুরুষের প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, প্রতি অঙ্গলাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ।

রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গলাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

* * * *

দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥

রাধাকৃষ্ণের প্রেম পরিতৃপ্তির যে বর্ণনা বৈষ্ণব কবিতায় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অধিকাংশ স্থলেই সাতিশয় অশ্লীলতা দুষ্ট, ইহা অনেক স্থলে এরূপ অশ্লীল যে, পতি পত্নীতে ও এক সঙ্গে বসিয়া পাঠ করা কঠিন। এই সকল স্থানে দেহ বৃত্তি স্বপ্রকাশ এবং ব্যর্থ লালসাজাত মান অভিমান উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত। কিন্তু এই ইন্দ্রিয় সম্ভোগ কামুকের দৈহিক মিলন হইতে উচ্চে। কামুকের ইন্দ্রিয় সম্ভোগে দুই দিন অগ্রপশ্চাৎ অবসাদ আসিয়া থাকে। এখানে অবসাদ আইসে নাই। পক্ষান্তরে তাহা হইতে প্রেমের অপূর্ব্ব প্রগাঢ়তা এবং আত্মবিসর্জ্জন উদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রেমও আত্ম বিসর্জ্জনের চিত্র অতি উজ্জ্বল, মনোজ্ঞ ও প্রীতিকর।

নায়ক শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় অতি কোমল; তিনি প্রীতিদ্বারা পশু পক্ষীকেও বশীভূত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গোঠে গোবৎস হারাইয়া অধীর হইয়া মর্ম্ম বেদনা প্রকাশ করেন। এ বোল বলিতে ফুকরি ফুকরি নয়নে গলায় ধারা। তাঁহার বাঁশীর স্বরে গাভীকুল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; দুগ্ধ স্রাবি পড়ে বাটে; প্রেমের তরঙ্গ উঠে। স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একদিন নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী চমকি চাহিয়া গেল। সে রূপরাশি তাঁহার পাঁজর কাটিয়া হিয়ার ভিতরে বাণ বিদ্ধ করিল। তাহার সমস্ত কলেবর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল, তিনি রাই রাই করি ফুকরি ফুকরি ভূতলে পতিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে প্রতিক্ষণেই ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, চন্দ্র দিবা ভাগেই দীনহীন অর্থাৎ কান্তি সৌন্দর্য্য বিরহিত থাকে, কিন্তু রজনীতে নিজের বিলুপ্ত সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে দিবারাত্রি উভয়ই সমান; তিনি ক্রমেই অধিক কৃশ ও মলিন হইতে লাগিলেন, তাঁহার অঙ্গুরীয় হাতে বালার ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তিনি অর্দ্ধেক বাক্য কহেন, তাহার নেত্র দুইটী ঝরণার মত (অবিশ্রান্ত) ঝরিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ

মানুষ চিনিতে অসমর্থ, চোখে নিমেষ নাই, কাঠের পুতুলির মত চাহিয়া রহিয়াছেন, নাকের আগে তুলা ধরিলে তাহা ক্ষীণ শ্বাসে কম্পিত হইয়া উঠে এবং তাহাতে তাহার জীবন আছে বলিয়া বুঝা যায়।* তাদৃশ গভীর মর্ম্ম পীড়ার পর শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হইলেন, তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

তুমি সে আঁখির তারা।
আঁখির নিমিখে　　কতশত বার
নিমিখে হইয়ে হারা॥

তারপর আবার বিরহ! এই বিরহে দগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

হাতদিয়া দেখ বড়াই মোর কলেবর।
ধান দিলে খৈ হয় বিরহ অনল॥
জিভা খণ্ড খণ্ড হল রাধা রাধা বলি।
তাহার বিচ্ছেদে মোর বুক হ'ল সলি॥
আমি মৈলে মরিব বড়াই তার নাহি দায়।
রাধা বিনে মোর মনে আন নাহি ভায়॥
মরিলে পোড়াইও বরাই যমুনার কুলে।
সে ঘাটে আসিবে রাধা জল আনিবারে॥
মরিবার বেলে রাধা সোঁওরাও রাধা।
জনমে জনমে যে মিলায় বিধাতা॥

নায়িকা শ্রীমতীরাধিকা এই প্রগাঢ় প্রেম ও তন্ময়তার কিরূপ প্রতিদান করিয়াছিলেন আমরা এখন তাহাই প্রদর্শন করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ কোটি চাঁদ জিনি ঘটা, ধনীর রূপের ছটা দেখিয়া পাগল হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী রাধা বলিতেছেন,

পহিলে শুনিলুঁ অপরূপ ধ্বনি
কদম্ব কানন হৈতে।
তারপর দিনে ভাটের বর্ণনে
শুনি চমকিত চিতে॥

তারপর দর্শন লাভ। সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো, তেমতি শ্যামের চিকনা দেহা। রাধা এই রূপ দেখিয়া বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি। শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের অভিলাষে পুনঃপুনঃ ঘরের বাহিরে যাইতেছেন, কিন্তু লজ্জা ও আশঙ্কায় তখনি আবার ফিরিয়া আসিতেছেন। মন চঞ্চল হইয়াছে, তিনি ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন এবং যে কদম্ব কাননে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন সুখ ঘটিয়াছে,—সেই কদম্ব কাননের দিকে দৃষ্টি করিতেছেন। শ্রীমতী রাধা এই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ বাহিরের পথ দিয়া যাইতেছেন

---

* পদকল্পতরু,(শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়)

ভাবিয়া পুনঃপুনঃ চমকিয়া উঠেন এবং প্রিয়তমের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে যাইতেছেন মনে করিয়া অলঙ্কার পরিতেছেন। শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় একাকিনী গহন কুঞ্জে গমন করিতেছেন এবং সেখানে তাহার দর্শন না পাইয়া ভূতলে লুটাইতেছেন; শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া তামালতরুকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতেছেন। নবানুরাগের প্রাবল্যে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের শ্যামরূপে তন্ময়তা জন্মিয়াছে। তাই তাঁহার নেত্রদ্বয়ে শ্যামরূপ, বাক্যে শ্যাম নাম, অঙ্গে শ্যাম বসন, কণ্ঠে নীলপুষ্পের কিংবা নীলরত্নের হার এবং হৃদয়ে শ্যামমণি বিরাজ করিতেছে এবং তিনি কোন শ্যামবর্ণা সখিকে আলিঙ্গন দান করিতেছেন। শ্রীরাধার বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ শ্যাম নাম স্মরিতে স্মরিতে অর্থাৎ শ্যামের ধ্যানে থাকিয়া শ্যাম হইয়াছে। ইহার পর মিলন; কিন্তু মিলনেও শ্রীরাধার সুখ নাই। * শ্রীকৃষ্ণ তাহার এত প্রিয় যে, সদাই হারাই হারাই মনে হইতেছে। রাধার ভয়, পাছে নিদ্রায় অচেতন হইলে শ্যামকে বিস্মৃত হন; তাই সারা নিশি জাগিয়া থাকেন। (১)

এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোড়ে দূর মানি ॥
সম্মুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা ॥

বৈষ্ণব কবি নায়ক নায়িকাকে এইরূপ প্রেম বিহ্বল, তন্ময় ও আত্মবিস্মৃত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সকল কবির তুলিই যে সমভাবে তাদৃশ সৃষ্টিনিপুণ, আমরা তাহা বলিতেছি না; আমরা কেবল একটা আদর্শ দেখাইতেছি।

বৈষ্ণব কবির সৃষ্টি ক্ষমতা কেবল নায়ক নায়িকার চিত্র অঙ্কনেই পর্য্যবসিত হয় নাই। তাহারা মাতার স্নেহ এবং সখার অনুরাগ ও অঙ্কিত করিয়াছেন সে সকল চিত্রও মনোরম। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে মধুর রসেরই প্রাধান্য; কারণ মধুর রসে অন্যান্য রসেরও অস্তিত্ব আছে এবং এই রসভূত আত্মবিসর্জ্জনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এজন্য বৈষ্ণব কবি মধুর রসের চিত্র অঙ্কনেই প্রায় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন এবং তাহাতে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বৈষ্ণব কবি নায়কনায়িকাকে প্রেমে বিহ্বল, তন্ময় ও আত্মবিস্মৃত করিয়াছেন কিন্তু তৎসত্বেও তাঁহারা সাহিত্যের বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনলাভ করিতে পারেন নাই। আমরা এই বিষয় বিস্তৃত করিয়া লিখিতেছি।

ধীশালী উমেশ চন্দ্র বটব্যাল মহোদয় নায়কনায়িকাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যে নায়কনায়িকা সমাজ ও নীতি উভয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেন, তাহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর নায়কনায়িকা তাহারা, যাহারা সমাজের বিধি উল্লঙ্ঘন করেন, কিন্তু নীতির মর্য্যাদা রক্ষণে যত্নশীল থাকেন। সমাজ ও নীতির মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী নায়কনায়িকা অধম। আমাদের দেশের সামাজিক প্রথা এই যে, স্ত্রীপুরুষ একবার বিবাহ বন্ধনে যুক্ত হইলে তাহা আর ছিন্ন করিবার উপায় নাই; স্ত্রী আমরণ বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে বাস করিবেন, স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত

---

* পদকল্পতরু (সতীশচন্দ্র রায়)

(১) চণ্ডীদাসের পদাবলী (নীলরত্ন মুখোপাধ্যায়)

হইলেও তাহার পক্ষে পত্যন্তর গ্রহণ করিবার পথ রুদ্ধ। তিনি যে কেবল পতির জীবদ্দশাতেই পত্যন্তর গ্রহণে অসমর্থা, তাহা নহে; পতির মৃত্যুর পরও তাহার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা এইরূপ সমাজের নায়কনায়িকা। রাধিকা অন্যের বিবাহিতা পত্নী, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রেমের প্রতিদান করিয়াছিলেন। এই মিলনে সমাজের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সকল ক্ষেত্রেই সমাজের আচার লঙ্ঘন দূষনীয় নহে। যদি কেহ বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করেন অথবা তাদৃশ প্রয়োজনবোধে কোন বিধবার পাণি গ্রহণে অগ্রসর হন, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহার কার্য্যের মূলে সামাজিক সাম্য বোধ এবং পরদুঃখে সমবেদনা রহিয়াছে। ফলতঃ ঐ কার্য্যে সমাজের দোষ সংশোধনের প্রয়াসরূপে পরিগণিত হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি জীবনে কোনদিন বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন নাই, তিনি যদি কোন বিধবার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিতে উদ্যোগী হন, তবে তাহা লালসা জনিত উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু ঐ কার্য্য কখনও নীতিবিরুদ্ধ নহে। বাস্তবিক কোন কার্য্যে সামাজিকতা বিরুদ্ধ হইয়াও নীতিবিরুদ্ধ না হইতে পারে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সম্বন্ধে এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায় যে, রাধা বাল্যকালে অন্যের ইচ্ছায় একজন ক্লীবের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে একরূপ বিধবা বলা যাইতে পারে। সুতরাং কৃষ্ণের সহিত তাঁহার মিলন নীতি বিরুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু যৌন সম্বন্ধ বৈধ করিতে হইলে বৈবাহিক বন্ধন আবশ্যক এবং এই বন্ধন সমাজের মেরুদণ্ড, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সহিত "সমাজের বিরোধ নাই, নীতির বিবাদ নাই কর্ত্তব্যপালনের শত্রুতা নাই। রাধিকার প্রেম ভক্তি কিছুরই বিরোধিনী নহে। রাধিকা ক্লীবে বিবাহিতা, শাস্ত্রমতে অনূঢ়া, পরকীয়া হইয়াও পরস্ত্রী নহেন, কুলটা হইয়াও স্বৈরিণী বা ব্যভিচারিণী নহেন"। *

কিন্তু এই মত বৈষ্ণবেতর সমাজে কতদূর স্বীকৃত, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। কিছুদিন পর্ব্বেও শাক্তমতাবলম্বীরা রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কথায় শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই; এখনও অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনুকূল নহেন।

এখন আমরা চাবিদ্বারা বৈষ্ণব কবিতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি। এই চাবি বৈষ্ণব ধর্ম্ম। ভগবান আনন্দ স্বরূপ। আনন্দের স্বভাব এই যে, উহা ব্যাকুলতা আনয়ন করে। সে ব্যাকুলতা মিলন জন্য। সাধারণ মানবের চরিত্র অনুধাবণ করিলেই এই তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়। মানুষ আনন্দ লাভ করিলে নিজ গৃহ কোণে বসিয়া থাকিতে অসমর্থ হয়; সে ছুটিয়া দশ জনের মধ্যে উপস্থিত হয়। অত এব যিনি আনন্দ স্বরূপ, তাঁহাতে নিত্য কালস্থায়ী এক অসীম ব্যাকুলতা রহিয়াছে। একারণ বৈষ্ণবের ভগবান জীবকে দয়া করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ লালায়িত। তিনি জীবের হৃদয় দ্বার সবলে ভাঙ্গিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন। ইহার নাম ভগবৎ কৃপা। তিনি জীবকে কৃপা করিবার জন্য সজলনেত্রে পথে পথে বেড়াইতেছেন। এই যে জীবের প্রতি তাহার অপার কৃপা বিতরণ, ইহার নাম লীলা। মন সংযত, হৃদয় নির্ম্মল, অহঙ্কার দূরীভূত হইলে জীব এই লীলা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। ভগবান লীলাময়। তিনি

* নবজীবন (প্রথম বৎসর)।

লীলা প্রকট জন্য দেহধারী হইয়াছেন। ভগবান সর্ব্ব প্রথম নৃসিংহ অবতারে ভক্তের নিকট ধরা পড়েন। লীলায় ভগবানের এই প্রথম প্রকাশ। নৃসিংহদেবের বিকট ভীষণ মূর্ত্তি ভক্ত প্রহ্লাদ সমীপস্থ হইবামাত্র মুহূর্ত্তে মধ্যে কুসুম কোমল হইল। তিনি কোমল হইতে কোমলতর হস্তে ভক্তের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ভগবানের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ লীলা শ্রীবৃন্দাবনে হইয়াছিল। লীলাময় ভগবান ব্রজের নরনারীকে কৃপা করিবার জন্য ব্রজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ব্রজের নরনারী প্রেমভক্তি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। এই যে ব্রজলীলা ইহার মধ্যে মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধার সহিত লীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উহার যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন॥
মোর গীত বংশীস্বরে আকর্ষে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত প্রাণহরে রাধাঅঙ্গ গন্ধ॥
যদ্যপি আমার রসে জগত সরস।
রাধার অধর রসে আমা করে বশ॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটিন্দু শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল॥
এইমত জগতের সুখ আমা হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু॥
এইমত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি দেখিয়ে যদি সব বিপরীত॥
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান॥
পরস্পর বেণু গীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন॥
কৃষ্ণ আলিঙ্গনে পাইনু জনম সফলে।
এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে॥
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হয় অন্ধ॥
তাম্বূল চর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দ সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে বলি তবু না পাই অন্ত॥

আমরা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম বিশ্বাস অতিসংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। রাধা কৃষ্ণের লীলা স্মরণ ও কীর্ত্তন এবং ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজন বৈষ্ণবের ধর্ম্ম সাধনা। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভজনপূজন প্রণালী সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে।

প্রভু কহে এ হোত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তা প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥

*　　　　*　　　　*

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥

অর্থাৎ শ্রীরাধিকা পরস্ত্রী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবকেও সেই প্রকার ভজন পূজন করিতে হইবে। বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত সমাজে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার কর্ত্তা ৺শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় এই তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি,

ভক্তিধর্ম্ম,—দুইরাজ্যে বিভক্ত, শ্রীগীতার রাজ্য ও শ্রীভাগবতের রাজ্য। জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি গীতার শেষ সীমা, জ্ঞান শূন্যাভক্তি শ্রীভাগবত রাজ্যের আরম্ভ। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য, শ্রীভগবানের এই দুই ভাব, তিনি সর্ব্ব শক্তিমান, এই গেল তাহার ঐশ্বর্য্য ভাব, তিনি রূপে ও গুণে আকর্ষণ করেন, এই গেল তাহার মাধুর্য্যভাব। গীতায় শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যভাবে ভজনের কথা লেখা, শ্রীভাগবতে মাধুর্য্য ভাবের ভজনা বিরচিত, গীতা রাজ্যের অন্তর্গত বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, মোসলমান ও প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম। শ্রীভাগবত গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবান নিজ জন; আর নিজরূপে তাঁহাকে যে ভজনা, তাহা দ্বারাই তাঁহাকে পাওয়া যায়। নিজ জন কাহাকে বলে? পিতা কি প্রভু; সখা কিভাই; সন্তান কি পতি, ইহারাই নিজ জন। অতএব এই সংসারে যে চারিটীবস্তু পিতা, সখা, পুত্র, পতি, ইহার মধ্যে শ্রীভগবানকে একজন কর। তাঁহাকে পিতা রূপে অথবা সখা রূপে অথবা পুত্ররূপে অথবা পতিরূপে ভজনা কর। এই যে তোমার বাৎসল্য প্রভৃতি চারিপ্রকার ভাব আছে, ইহা স্বাভাবিক। এত স্বাভাবিক যে, এইভাবের বস্তু না পাইলে তুমি অস্থির হইবে। যাহার পুত্র নাই সে পুত্র পুত্র করিয়া প্রাণ ছাড়িবে। অতএব এই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিভাব স্বাভাবিক।

যাহাদের দ্বারা এই সকল ভাবের পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে, তাহাদের জন্য আকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক; কিন্তু পার্থিব পুত্র পতি প্রভৃতি দ্বারা এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি সম্ভব নহে। কারণ তাহারা অপূর্ণ ও মলিন।

এই ভাবের তখনি পিপাসা শান্তি হইবে, যখন ইহার বস্তু পূর্ণ ও নির্ম্মল হইবে। এমন বস্তু শ্রীভগবান ভিন্ন আর নাই। অতএব এই ভাবগুলি দ্বারা যখন শ্রীভগবানকে ভজনা করা যায়, তখনি জীব প্রেমানন্দ তরঙ্গে পড়িয়া ভাসিতে থাকে।

পশ্চিম দেশের বল্লভচারীরা শ্রীকৃষ্ণকে বালগোপাল অর্থাৎ বাৎসল্য ভাবে ভজনা করে, ইহা দাস্যও সখ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহাতে দাস্যের নিষ্ঠা ও সেবা সখ্যের নিষ্ঠা, সেবা, অসঙ্কোচ এবং তদতিরিক্ত মমতাধিক্য আছে।

এইরূপ মধুর ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। যেহেতু এক মধুর ভাবে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, কান্ত এই চারি ভাবই জড়িত আছে। কান্ত মানে স্ত্রীলোকের স্বামী। স্ত্রী কখন স্বামীর দাসী হয়েন, কখন সখা হয়েন, কখন মাতার ন্যায় হয়েন, কখনও বা বক্ষ বিলাসিনী হয়েন। রামরায় বলিলেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ মাত্রায় প্রাপ্তি কেবল এই কান্ত ভাবেই হয়।

আবার কান্তভাব মধ্যে রাধার ভাব শ্রেষ্ঠ। তিনি মহাভাব স্বরূপিণী।

প্রেম দুইরূপ অহেতুক ও হেতুক, বা পরকীয় এবং স্বকীয়। যে প্রেমের হেতু আছে সে স্বকীয়, যাহার হেতু নাই সে পরকীয়।* মাতা পুত্রকে ভালবাসেন, কারণ সে পুত্র। অন্য

* অমিয় নিমাই চরিত, তৃতীয় খণ্ড।

শিশু যদি তাহার পুত্র হইতে তবে তাহাকেও তিনি ঐরূপই ভাল বাসিতেন। এইরূপ স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসেন, কারণ তিনি স্বামী, অন্যব্যক্তি যদি তাহার স্বামী হইতেন, তবে তাহাকেও ঐরূপই ভাল বাসিতেন। কিন্তু একজন নারী পর পুরুষকে ভাল বাসিলেন, তাহার কোন কারণ নাই; ঐপুরুষ ব্যতীত আর কোন পুরুষে, সে প্রেম অর্পণ সম্ভব নহে। এইরূপ স্বার্থ গন্ধশূন্য প্রেম দ্বারা ভগবানকে লাভ করিবার সাধনাই সর্ব্বোত্তম। ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবের উপাস্য; তাহাকে স্বামী ও নিজকে পরকীয়া মনে করিয়া সাধনা করিতে হইবে। বৈষ্ণবকে ভাবিতে হইবে যে,

বংশী গানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
সখি হে! শুন মোর হত বিধিবল।
মোর বপু চিত্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কানাকড়ি ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হইল অকারণে॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ গুণচরিত,
সুধা সার স্বাদবিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ
সেই নাশা ভস্ত্রার সমান॥

কৃষ্ণ কর পদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সেই হউক ছারখার,
সেই বপু লৌহময় জানি॥

ব্রজলীলা স্মরণ ও কীর্ত্তন এবং শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে মনন করিতে করিতে ভক্তের মনে এই প্রকার স্ফুরণ হয় যেন, নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ভাসিতেছে, কর্ণে তাঁহার বংশীধ্বনি পশিতেছে, নাসিকায় তাঁহার অঙ্গ গন্ধ লাগিতেছে, অধর তাঁহার অধরামৃত পান করিতেছে এবং হস্ত তাঁহার চরণতল স্পর্শ করিতেছে। মনের এই অবস্থা কেবল কল্পনার বিষয় নহে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন ইহার দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল।
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল॥
উদ্ধব দর্শনে যৈছে রাধার প্রলাপ।
ক্রমে ক্রমে হইল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেইভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান॥*

*　*　*　*　*

আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণ বেণু গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা প্রয়াণ॥ (১)

*　*　*　*　*

প্রতি বৃক্ষ বল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখে হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা॥
আগে পাইল কৃষ্ণ তারে পুনঃ হারাইয়া,
ভূমিতে পড়িল প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া॥
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ গন্ধে ভরিল উদ্যান।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈল অচেতন॥
নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল॥ (২)

অবিশ্বাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,

---

* শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ অন্ত্যলীলা।

(১) সপ্তদশ পরিচ্ছেদ অন্ত্য লীলা।

(২) ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ অন্ত্য লীলা।

দিব্যোন্মাদে ঐছে হয় কি ইহা বিস্ময়।
অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়॥ (৩)

যিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও তাহার সাধন প্রণালীতে বিশ্বাসী, তাহার নিকট রাধা কৃষ্ণের প্রেম সাধারণ নরনারীর প্রেম নহে। নায়ক স্বয়ং ভগবান, নায়িকা মহাভাব স্বরূপিনী, তাঁহাদের প্রেমের লীলা সাহিত্য শাস্ত্র দ্বারা বিচার করা সঙ্গত নহে। বিশ্বাসীর নিকট রাধা কৃষ্ণের এই প্রেম "নির্ম্মল ভাস্করের" ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি প্রার্থনা করেন,

সফল হইবে দশা, পুরিবে মনের আশা
সেবে দুঁহার যুগল চরণ॥
বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ,
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লঞা হাতে
দেখিব মনের অভিলাষে॥
দুঁহু চাঁদ মুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি,
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকট যাব
হেন দিন হইবে আমার॥

এইস্থানে আর একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। অসংখ্য কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহারি আদর্শে সে প্রেমলীলা আঁকিয়া গিয়াছেন, অথবা আপনাদের গৃহে যে ছবি দেখিয়াছিলেন, তাহাই রাধাকৃষ্ণ নামের রসায়ন দ্বারা উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়া ছিলেন? কবি রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান,
বিরহ তাপিত? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে?
বিজন বসন্ত রাতে মিলন শয়নে,
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি প্রেম ডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে,
রেখেছিল মগ্ন করি? এত প্রেম কথা,
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করে লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে?

(৩) চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ অন্ত্য লীলা।

এই প্রশ্নের উত্তর সহৃদয় পাঠকবর্গ নিজ নিজ রুচি অনুসারে করিয়া লইবেন। আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম পরকীয় ভাবের সাধকের শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চারিত করে; অনন্ত আনন্দের বিলাসে মনকে বিহ্বল করে। এই বিহ্বলতার চরম দৃষ্টান্ত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের যে সম্ভোগ লীলার বিবরণ বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই তাঁহার জীবনেও স্ফুরিত হয় নাই। অতএব বৈষ্ণব কবি সে আদর্শ কোথায় পাইলেন, তাহা দেখিতে হইবে। এই জন্যই বঙ্গীয় কবির কথার অনুমোদন করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে:—

এই প্রেম-গীতিহার
গাঁথা হয় নর-নারী মিলন বেলায়।

বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে শেষ কথা এই যে, বহির্ভাষা হইতে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলেও মানুষের মনমুগ্ধ হয়। কিন্তু তাহার সম্যক রসগ্রহণ করিতে হইলে চাবি লইয়া ভিতরে প্রবেশ করা আবশ্যক। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের চাবি নাই, তাহা সাম্প্রদায়িক মতামতের উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যের কার্য্য, প্রকাশ করা; সাহিত্য তাহার বক্ষে প্রকৃতি ও মানুষকে প্রকাশ করে। প্রকৃতির প্রকাশে তাহার সৌন্দর্য্যের বিকাশই লক্ষ্য। মানুষকে প্রকাশিত করিতে হইলে, তাহাকে তাহার সময়ের এবং সমাজের উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব। সুতরাং সে মানুষের মধ্যে সমাজের অবস্থা ও আদর্শ কতক পরিমাণে অবশ্যই ব্যক্ত হইবে। নানা সমাজ, নানা মত, নানা আদর্শ, কত বৈচিত্র্য। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও এরূপ সত্য ও নীতি আছে, যাহার ললাটে রাজটিকা এবং যাহা সকল সমাজে, সকল দেশেও সকল সময়ে স্থায়ী রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছে; মানুষে মানুষে যতই অনৈক্য থাকুক না কেন, তাহার অভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা নদীর মত সাধারণত্ব আছে। এই সাধারণত্বই মানুষের প্রাণ, ইহা লইয়াই মানুষ, মানুষ। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে মানুষের এই প্রাণ আর ঐ চিরন্তন সত্য ও নীতি অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। তাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মাত্রেই জাতি ধর্ম্ম সমাজ কাল নির্ব্বিশেষে পাঠককে আনন্দ দান করিতে পারে। বৈষ্ণব কবিতার প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়ধ্বনি কখনও লালসায় চঞ্চল, কখনও অনুরাগ বিহ্বল, কখনও মিলনে আনন্দপূর্ণ, কখনও বিরহে বেদনাময়, কিন্তু সর্ব্বত্রই প্রগাঢ় প্রেমরাগে রঞ্জিত। এই ধ্বনি সকল কালের সকল সমাজের মনুষ্যহৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে। এ জন্য বৈষ্ণবকবিতা পাঠে পাঠক মাত্রেই পুলকে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্তু বৈষ্ণবসাহিত্যের যাহা বিশেষত্ব, যাহা বৈষ্ণবের নিকট মধুর হইতে মধুরতর, তাহা অবৈষ্ণবের হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলিতে অসমর্থ; পরন্তু তাঁহারা উহাকে দোষযুক্ত বলিয়াই বিবেচনা করিবেন। তাদৃশ ত্রুটীসত্বেও শ্রীমতী রাধা শ্যামের বাঁশীকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই ভাষাতেই বৈষ্ণবকবিতার স্তুতি করিবেন।

কদম্বের বন হৈতে   কি না ধ্বনি
আসিয়া পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি   কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥

রাই কহে কেবা হেন, মুরলী বাজায় যেন,
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে জলে জনু কাঁপাইছে সব তনু
প্রতি তনু শীতল করিয়া॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপে নহে উষ্ণ অতি, পোড়ায় আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়া ওর॥

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

ব্রাহ্মণ সমস্যা।

যখন ব্রাহ্মণ ভারতে অদ্বিতীয়,- শাস্ত্রসাম্পদ তপোবনে যখন বিশুদ্ধ জ্ঞান ও উন্নত ধর্ম্মের মধ্যে সেই বিশিষ্ট বর্ণের চিত্ত অভ্রভেদী হইয়া বিরাজমান,—সমাজের উন্নততম আদর্শকে রক্ষা করিবার মহত্তার বরণে তাঁহারা বরণীয় পবিত্র,—আপনাকে যথাসম্ভব কর্ম্ম ও স্বার্থ হইতে মুক্ত রাখিয়া যখন তাঁহারা ভারতের কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে নিস্তব্ধ সুরটি অবিচলিত ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন,—কর্ম্মীদলকে ঠিক পথটী দেখাইয়া দিতেছিলেন,—তখন ব্রাহ্মণ ছিল ব্রাহ্মণ, ভারতও ছিল ভারত। হিন্দু তখন nation ছিল। Indian peoples কথাটা কোন জাতিরই অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। এ কথা তখন স্বপ্নেরও অতীত ছিল যে, ব্রাহ্মণ আবার বিশাল সমাজের মাঝখানে কোনও দিন সমস্যায় পরিগণিত হইবে। সেই-ই যে তখন সকল বিশালতার মধ্যে সামঞ্জস্যের একটী সুর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সকল সমস্যাকে দিনে দিনে সমাধান করিয়া দিতেছিল।

সুতরাং ব্রাহ্মণ ভূদেব দেবতা বিষ্ণুরও নমস্য জগতের শিরোভূষণ, মানব জাতির উপাস্য কোনও কথাটাই মিথ্যা নহে। সকল কথারই সুস্পষ্ট সম্ভব অর্থ আছে। সকল অর্থগুলিই মানবে গ্রহণ করিতে পারে মানিয়া জীবনের সহিত মিলাইয়া লইতে পারে। পারে বলিয়াই প্রাচীন ভারত পারিয়াছিল। ব্রাহ্মণের মধ্যে যে উন্নত ধর্ম্মের সমাবেশ বর্ণনা আমরা পাঠ করিয়া থাকি তাহা তখন আদর্শ মাত্র নহে—সত্যই আচরিত। ব্রাহ্মণেতর সাধারণের ব্রাহ্মণের প্রতি যে অচলাভক্তির উপদেশ পাঠ করিয়া থাকি তাহাও দাবী দাওয়া নহে—চলা এবং হওয়া। তখনকার দিনকালে ও সব শোনা কথা ছিল না। ও সব কল্পনা নহে,—বাস্তব।

যতদিন এই বিশিষ্ট বর্ণ সমাজের সকল সমস্যার উর্দ্ধে আপনাকে সমাসীন রাখিয়া সেগুলির মীমাংসার পথ দেখাইয়া আসিতে পারিয়াছেন ততদিনই অমনি গিয়াছে—ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা ব্রাহ্মণ এই শব্দটাকে এমন একটী সম্ভ্রমে মণ্ডিত রাখিয়া আসিয়াছেন যে,

সেই ধারাবাহিক মর্য্যাদার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া শব্দটী নিজেরই একটী স্বতন্ত্র সম্মোহিনী শক্তি জন্মিয়া গিয়াছে। ঐ শব্দটীকে আমরা মন্ত্রের পর্য্যায়েও দাঁড় করাইতে পারি। ব্রাহ্মণ এই শব্দ জপ করা চলে,—চলে কেন, সন্নিহিত অতীতে ভারতবর্ষ তাহা করিয়াছেও।

যেমন শক্তির পরিবর্ত্তে ঘটের প্রতিষ্ঠা যুদ্ধের পরিবর্ত্তে প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা তেমনি ঐ ব্রাহ্মণ শব্দটীর নামী যে দিন কালের আবর্ত্তে তলাইয়া গেল সে দিন নামেরই প্রতিষ্ঠা হইল। সেই জন্যই বলিতেছি সন্নিহিত অতীতে ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণ এই শব্দ জপ করিয়াই দিনাতিপাত করিয়াছে। শুধু তাহাই কেন ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে অমনি করিয়া পুতুলও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নামকে উঁচাইয়া দিয়া—নামের জোরে নামীকে পাওয়া যায়। বিশ্বাসে নামীর একটা মানুষের চেষ্টায় গড়া মূর্ত্তি সেদিন প্রতীক হিসাবে সমাজে খাড়া হইয়াছিল। সেই প্রতীক রূপে কল্পিত পুতুলই বর্ত্তমানের ঝড় ঝাপটায় ভূতলশায়ী হইয়া প্রহসন ও ব্যঙ্গচিত্রে প্রদর্শিত "বাভোান ছুজ্জন" মনিষ্যিতে দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্মণত্বকে সজীব রাখিতে সমাজ যাহা গড়িয়াছিল তাহারই ক্রমঃসঙ্কোচ পরিণতি আজিকালিকার বামুন। ঐ গলায় পৈতা উড়িয়া পাচক হিন্দুস্থানী বিদেশের চাকুরীয়া বাঙ্গালী মিথ্যাসাক্ষ্যপেষা চালকলার পুঁটুলি সকলি সেই মহৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ভাল জিনিষটীর পচানি।

এমনই হয়। সুদূর অতীতের সে ব্রাহ্মণ ভগবানের প্রতিষ্ঠা আর সন্নিহিত অতীতের ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিষ্ঠা। স্রষ্টাই সৃষ্টি করিতে পারে। বিধির বিধানেই বিশ্ব গড়িয়া উঠে। সৃষ্ট মানুষের সে অধিকার থাকিলে তাহার সৃষ্টি এমন করিয়া ব্যর্থ হইত না। মন্বাদির বিধান যতখানি বিধির বিধানের আবিষ্কার সঙ্কলন ততখানিই নিত্য। সামাজিক শ্রেষ্ঠগণের প্রক্ষিপ্ত অংশই কালে কালে ব্রণ সঞ্চার ও অস্ত্রোপচার প্রয়োগের ঘটা ঘটাইয়া তুলিতেছে।

নিশ্চয়ই আমি এই সমস্ত কথার মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিবাদ করি নাই। ব্রাহ্মণ বলিয়া একটী বর্ণ আছে তাহা নিত্য, তাহার কোনও দিন পরিবর্ত্তন নাই অনুকরণ করিয়াও সে বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হওয়া চলে না, সমস্তই আমারো জ্ঞানে সত্য। আমি যে একটু স্বতন্ত্র ভঙ্গীতে বলিতেছি তাহার একমাত্র কারণ এই যে, আমি অনুভব করিয়া এবং করাইয়া আমার সকল কথা বলিতে চাই। বলিবার ভঙ্গি যেমনই হউক ঐ যে চারিটী বর্ণের বিভাগ, আমি তাহা বিশ্বাসীদের অপেক্ষাও অকপটে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি। রসায়নে ধাতুর মৌলিকত্বের ন্যায় মানব প্রকৃতিতেও ধাতুর মৌলিকত্ব বেশী বিন্যস্ত। আমার অনুভূত সত্যে চাতুর্ব্বর্ণের শ্রেণী বিভাগ সেই হিসাবেই নিখুঁত। অন্য প্রকারে হয়ত বা শত প্রকারেই বর্ণ বিভাগের ব্যাখ্যা আছে। আমি যেভাবে বুঝিয়াছি সেই ভাবটাই আমার কাছে সত্যলব্ধ। আমার সত্যলব্ধ ব্যাখ্যাকে আমি সত্য বলিয়াই শিরোধার্য্য করি কারণ আমার কাছে তদপেক্ষা স্পষ্ট অনুভবগম্য আর কিছুই হইতে পারে না। বর্ণবিভাগের যাথার্থ্য স্পষ্টই অনুভব করিয়াছি। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র মানবের এই চারি বিভিন্নতা মূল মানব প্রকৃতির ধাতুগত চারিটি মৌলিকত্ব অবলম্বন। বর্ণ বলিতে কি বুঝা যাইতে পারে? বর্ণ এই কথাটির অর্থব্যাখ্যাচ্ছলে যিনি যত পণ্ডিত হয়ত তিনিই তত দুর্ভেদ্য হেঁয়ালীজাল বয়ন করিতে পারেন, সর্ব্বাপেক্ষা সরল ভাবেই মানব প্রকৃতির বর্ণনায় প্রযুক্তবর্ণের যাহা শব্দার্থ তাহাই আমি বুঝিতে পারি মাত্র। তাহাই আমার

সত্যের দ্বারা লব্ধবস্তু। ইংরাজিতে কথা আছে paint him in his true colour এই colour শব্দ যে শর্থের দ্যোতনা করে বর্ণ বলিতে আমিও তাহাই বুঝি। এই অর্থেই আমি বুঝিয়াছি ব্রাহ্মণ একটী বর্ণ অপর তিন শ্রেণীও তিনটি পৃথক্ পৃথক বর্ণ।

সকলের মূলে যিনি আছেন সৃষ্টি তাঁহা হইতেই বিবর্ত্তিত। সর্ব্বদর্শন ও বিজ্ঞানের মত একত্রিত করিলে এমনটাই দাঁড়ায়। অর্থাৎ অবশেষে এই কথাটাই হয় আসল কথা, বর্ণ সৃষ্ট পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত সুতরাং সৃষ্টির বাহিরেও নহে, সৃষ্টির যিনি মূল বর্ণ তাঁহা হইতে ও অভিন্ন নহে।

অবশ্য শাস্ত্রও তাহাই বলে। সে বলে বিভিন্ন বর্ণ বিরাট পুরুষের বিভিন্ন অবয়ব সঞ্জাত।

ব্রাহ্মণ ও বর্ণ, আমরা ব্রাহ্মণের কথাই কহিতেছি। দেখিয়াছি একদিন ব্রাহ্মণকে ; তিনি জীবনযাত্রাকে সরল ও বিশুদ্ধ করিয়া অভাবকে সংক্ষিপ্ত করিয়া এমন এক ভঙ্গীতে আমাদের অভ্যন্তরে সমাসীন ছিলেন যে, সেটা মঙ্গল ও কল্যাণের নিমিত্তই ব্রাহ্মণোচিত জীবন-যাপন, বৈশ্যোচিত দোকানদারী নহে। তাঁহার মধ্যে সত্যের অকুণ্ঠ স্বতঃস্ফূর্ত্তি দেখিয়া সমাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহার দ্বারে আসিয়া তাঁহাকে গুরুর সম্মান দিয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি সমাজের চালক ও ব্যবস্থাপক। তারপর দেখিয়াছি আর একদিন—সে কাহারা আপনাদের ব্রাহ্মণ নামীয় অধিকার সাব্যস্তোপযোগী রাশি প্রমাণ দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ করিয়া একটা প্রতিষ্ঠিত আদর্শে স্বচ্ছন্দ চালিত সমাজের মধ্যে আপনার দখল সত্ত্ব সাব্যস্ত করিতে নরকের জেলখানা স্বর্গের সিভিল সার্ভিস আর কোটী কোটী দেবতার সেনা শান্তিরক্ষক সাজাইতেই ব্যস্ত। সে দিনও নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া গিয়াছে—আবার আজ নূতন দিন আসিয়াছে—আজ দেখিতেছি আবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা—দেখিতেছি প্রয়োজনের তাড়নায় চালিত সমাজে ব্রাহ্মণ নামীয় একটা মৌখিক সম্মান একটা পুতুল খেলার ঘরে সাজা বরের স্বামীত্বের মত কল্পিত প্রাধান্য—সকলেরই সঙ্গে সমান বৃত্তি, সমান ধর্ম্ম, সমান জ্ঞান—সকলেরই মত জীবন সংগ্রামে গলদ্‌ঘর্ম্ম, কর্ম্ম ক্লান্ত একটা সম্প্রদায় কায়ক্লেশে বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। বজায় রাখা আর কিছুই নহে আপনার ও পরের কাছ হইতে একটা স্বীকৃতি মাত্র। মোটামুটি তিনটা স্তর দেখাইলাম মাত্র, পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে ক্রমঃসঙ্কোচের বিবর্ত্তন উল্লেখ করিতে বসি নাই, ব্রাহ্মণ ইতিহাস রচনা এখানে লক্ষ্য নহে। তবে এইটুকু করিতেছি বটে—একটা সন্ধান আরম্ভ করিয়াছি, ব্রাহ্মণ যদি এক হয় তবে সেই একত্ব কোথায় ? আর এই স্তর পরম্পরার মধ্যে সেই একেকে ধরিয়া কোনওরূপ সামঞ্জস্য সম্ভবপর কি না ?

একটা কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন এক একটা বর্ণ জাতি নহে, জাতির অভ্যন্তর বর্ত্তী বিভিন্ন থাক মাত্র। অবশ্য কোনও জাতির মধ্যেই বর্ণ সকলের পরস্পর পার্থক্য, বিভিন্নতাকে এত সুস্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশিত করিয়া—স্বার্থ ও আচার বিচার বৃত্তি প্রভৃতিকে আলাদা করিয়া দিয়া, এমন করিয়া কায়েমী পাট্টায় তাহাদিগকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। মূল বর্ণভেদ সকল দেশেই আছে সর্ব্বত্রই মানব প্রকৃতি ধাতুগত মৌলিকত্বে বৈচিত্র সম্পন্ন। দেখা যায়, ভারতেতর দেশে এই বৈচিত্রের অভ্যন্তরতত্ব কেহ অনুসন্ধান করে নাই।

পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়ামড়ি করিয়াই বিভিন্ন বর্ণগুলি উগ্র কর্ম্মকোলাহল মুখর একটা জীবন সংগ্রামের স্রোত রচনা করিয়াছে। সেখানে প্রকৃতি ভেদে বৃত্তি ভেদের ব্যবস্থা নাই। মনুষ্য জীবনে প্রয়োজনের ষ্টিম রোলারটা জীবন্ত মানুষগুলির উপর এমন নির্ম্মমভাবে গড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বিনা প্রয়োজনের যে অংশটা মানুষের মধ্যে থাকে সেটা অমনি অবস্থায় পতিতের চূর্ণবিচূর্ণ অস্থিপঞ্জরের মত রেণু রেণু হইয়া গিয়াছে। ভারত যেদিন বর্ণ বিভাগ করিয়াছিলেন, সেদিন বসুন্ধরার শ্রেষ্ঠ সম্পদশালিনী তাহার ভূমিতে আপন সন্তানগুলিকে প্রয়োজনের তাড়া হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখা তাহার সাধ্য ছিল। সে বিনা প্রয়োজনের যে একটা দিক আছে আপন সন্তানগুলিকে সেই দিকটাই দেখাইয়া দিয়াছিল। জীবনটাকে বজায় রাখিবার ব্যস্ততায় আপনাকে ভুলিয়া থাকার দরকার হয় নাই বলিয়া, তাহারা জীবনটাকে তন্নতন্ন করিয়া অধ্যয়ন করিতে, আপনাকে চিনিতে অবসর পাইয়াছিল। যে ভাব হিন্দুর বৈশিষ্ট্য ভারতের বানী তাহার জন্ম এইরূপেই সম্ভব হইয়াছে।

প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত ছিল না বলিয়াই, ভারতবর্ষ প্রাণটাকে কত সুস্বাদ সহকারে উপভোগ করা চলে, তাহারই সন্ধানে ব্যস্ত ছিল। প্রকৃতির দয়াতেই মানুষ এখানে সম্পন্ন, সুতরাং সম্পদ ব্যবহার কত মহান গৌরবে করা চলে তাহারই সে পরীক্ষা করিতেছিল। তাই সে প্রকৃতিকে লইয়া এত নাড়াচাড়া করিতে পাইয়াছিল—তাই-ই অন্তঃপ্রকৃতি বিশ্লেষণে তাহার এই বর্ণ বিভাগ আবিষ্কার। তাহার সমাজ আপনার সুশৃঙ্খলা বিধানার্থ তাহার আবিষ্কারকে আপনার কাজে লাগাইয়াছিল অর্থাৎ ভারতবর্ষ আপনার জীবন লব্ধ সত্যকে জীবনের সহিত মিলাইয়া লইতে ছাড়ে নাই।

সে প্রকৃতিভেদে বৃত্তিভেদ করিয়া এক এক মৌলিকত্ব সম্পন্ন প্রকৃতিকে সুস্পষ্ট ভাবে আপনাপন লক্ষণ অনুসারে উপযুক্ত সম্পূর্ণ উপযোগী কাজ বাছিয়া লইবার পথ খুলিয়া দিয়াছিল। ইহার সুফল এই যে, মানুষের বিভিন্ন বৈচিত্র অবাধে আপন পথে ছাড়া পাইয়া নির্ব্বিঘ্নে পরিণতি লাভ করিতে থাকিবে। এক একটা কাজ ঠিক ঠিক উপযুক্ত লোকের হাতে পড়িয়া culture হিসাবেই পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে।

এইরূপে পার্থক্যদ্বারা জীবন সংগ্রামের অনিবার্য্য সংঘাত যথাসম্ভব সংযত করিয়া পরস্পরের অভ্যন্তরস্থ মূল ভাবস্বরূপ সত্যকে এক বলিয়া অনুভব করতঃ বর্ণ ধর্ম্মের বিভিন্নতাকে জাতি ধর্ম্মের সামঞ্জস্যের অধীনে আনিয়া হিন্দু ছিল একটী nation.

এই nationএর চালক ও ব্যবস্থাপক ছিল ব্রাহ্মণ সুতরাং ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ। এই ব্রাহ্মণতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে তাঁহাদের রক্ষিত সমাজে তাঁহাদের স্থান ও কার্য্যপ্রণালী ঠিক ঠিক বুঝিতে পারিলে হিন্দুর constitution of Government চিনিলে আমরা বুঝিব রাষ্ট্র সমস্যার কত সুন্দর সমাধান এই অধঃপতিত দেশের জীর্ণ পুঁথির মধ্যে অনাদৃত পড়িয়া আছে। তাহার পুনরুদ্ধার করিতে পারিলে বর্ত্তমানের অন্বেষণ-আকুল জাতি সঙ্ঘকে Spiritual Democracyর সন্ধান দিয়া আমরা স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারিব এমনও ভরসা করিতে পারি।

ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে যদি তাহার সত্যস্বরূপে আবার পুনর্জ্জীবিত করিতে পারি তবে

আমরা যাহা পাইব তাহার স্থান Political Independence হইতে অনেক উচ্চে। কারণ সে জিনিষটাকে আপনার মধ্যে গড়িয়া তুলিতে পারিলে আমার দেশ সমগ্র জগতের উপর একটা ভাবের সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারিবে, যাহার প্রভুত্ব রাজনৈতিক প্রভুত্ব অপেক্ষা অনেক উচ্চ শ্রেণীর। অথচ লাভও অনেক, সেই ভাবের উপর সমাজটাকে পুনর্গঠিত করিতে পারিলে সমাজের ভিতরকার একটা কীটাণুকীটও হিংসার চাপে পীড়িত হইবে না। জীবন সংগ্রাম যতদুর সম্ভব সংযত হইবে, জীবন যাত্রা আদর্শ স্বরূপ হইবে বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না।

কিন্তু ব্রাহ্মণ রক্ষা না পাইলে বর্ণাশ্রম রক্ষা পায় না, ব্রাহ্মণ গড়িয়া না তুলিলে বর্ণাশ্রম গঠন চেষ্টা নিরর্থক। ব্রাহ্মণের উপযোগীতাই ব্রাহ্মণের সম্মান ও পূজার কারণ।

এই জন্যই ব্রাহ্মণত্ব লইয়া এত সংগ্রাম। এই পদ হইতে জাতির মর্ম্মের রসটুকুকে পাওয়া যায়,—এ জাতির রাজ সিংহাসনে বসিলেও যাহা মিলে না। ভারতে রাজার বেটার সিংহাসন কাড়িয়া লও, ক্ষতিটা তাহার মর্ম্মান্তিক হইবে না, সে একটা বৈষয়েক ক্ষতিমাত্র। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, তাহার বেটাকে সেই ব্রাহ্মণ পদচ্যুত করিতে প্রয়াস পাও দেখি? দেখিবে তাহা পারিয়াই উঠিবে না।

কথাটাকে স্থূল রূপকের মধ্যে আনিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। যেন ব্রাহ্মণত্ব একটা পদ। কেন না এই ভাবে ভাবটাকে গ্রহণ করিলে সুদুর অতীত হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ নামীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যত স্তর ভেদ অবলোকন করি তাহার রহস্যমধ্যে প্রবেশ সাধ্যগম্য হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান ভারতে ব্রাহ্মণের গুরুতর দায়ীত্ব স্মরণ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মণ সন্ধান কার্য্যে অনেককেই নিরাশ হইতে হইয়াছে—এ নিরাশ আজিকার নহে—আমার প্রপিতামহগণও ইহার অংশভাগী, অল্প বুদ্ধিব্যয়েই তাহা বুঝিতে পারি। সুতরাং শাস্ত্র সমুদ্রে অবগাহন ভিন্ন গত্যন্তর নাই দেখিয়া, আজকাল যাঁহারা ব্রাহ্মণ নামীয়, তাঁহাদেরি মুখে যাহা শাস্ত্র বলিয়া শুনিলাম তাহারই দুই একখানা পাঠ করিতে আরম্ভ করা গেল। প্রথমেই একটা কথা দৃঢ়ভাবে বারবার পুনরুক্ত হইতে দেখিয়া সেটা মগজে ঢুকিয়া গেল। কথাটা বেদ। সকল শাস্ত্রই দেখিলাম একমত যে, বেদের রক্ষক বলিয়া ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণত্ব। জিনিষটা বেশই স্পষ্ট হইল যে, যাহারা বিধাতৃ বিধিত পরম শ্রেষ্ঠ বেদে অনভিজ্ঞ তাহারা ব্রাহ্মণ নহে। ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ব্রাহ্মণ নহে, বেদ; বেদজ্ঞ বলিয়াই ব্রাহ্মণ। এমন কি একথাটুকুও কাজের কথা নহে যে ব্রাহ্মণ হইতে বেদের উৎপত্তি। শাস্ত্র দৃঢ়কণ্ঠেই বার বার বলিয়াছেন যে বেদ বিধাতৃবিধিত—বেদ অনাদি অনন্ত।

ব্রাহ্মণ কাহারা? ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উল্লেখ—সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম বিদ্যমান এইরূপ চিন্তাধারী প্রজাগণ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণু মৎস্য মার্কণ্ডেয় পুরাণেও ঠিক এইরূপ লিখিত আছে। সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম বিদ্যমান এই চিন্তাই বেদের মূল ভাব। সুতরাং বেদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্মণ নামে কিছুই খাড়া করিবার উপায় নাই। প্রথম বিধাতা, তারপর বেদ, তারপর ব্রাহ্মণ, তারপর জাতিধর্ম্ম রাষ্ট্র সমাজ প্রভৃতি। ভারতবর্ষে ইহাই ধারা।

বিধাতা এবং বেদের স্বরূপ মানবের অজ্ঞেয়। ব্রাহ্মণ পর্য্যন্তই আমাদের জ্ঞান পৌঁছিতে

পারে। এই ব্রাহ্মণ কোথা হইতে আসিল? শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, হরিবংশে বলে শুদ্ধ সত্ব গুণ হইতে—মহাভারতে এই বিরাট পুরুষকে শ্রীকৃষ্ণ বলাও হইয়াছে। আবার এমন কথাও আছে যে মনু হইতে ব্রাহ্মণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে উল্লেখ—বৈবস্বত মনু পুত্র কামনায় শতবৎসর যমুনা তীরে তপস্যা করিয়া পুত্র লাভের নিমিত্ত প্রভু হরির যজ্ঞ করায় আত্মসদৃশ দশ পুত্র লাভ করেন। সেই দশপুত্রের মধ্যে ইক্ষাকু জ্যেষ্ঠ।* * * মনুপুত্র করুষ হইতে কারুষ নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মবৎসল উত্তরাপথ রক্ষক ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয় এইরূপ ধৃষ্ট নামক মনুপুত্র হইতে ধার্ষ্ট নামে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়। তাঁহারা অবনীতলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। * * * ভগবান অগ্নি অগ্নিবেশ্য নামে স্বয়ং তাহার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ মহর্ষিই কানীন ও জতুকর্ণ নামে বিখ্যাত। তাঁহা হইতেই অগ্নিবেশ্যায়ন নামে ব্রাহ্মণ বংশ উৎপন্ন হইয়াছে।

পুত্র কামনায় তপস্যা এবং যজ্ঞের দ্বারা পুত্রোৎপত্তি—আবার একজনেরই বিভিন্ন পুত্র হইতে বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি, এ সকল কথার মধ্যে কি নিহিতার্থ এখন বুঝেই বা কে আর বর্ত্তমান যুগের মানুষকে বুঝাইতে পারেই বা কে?

আবার এই শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধেই যে ধারায় পাশ্চাত্যের ইতিহাস লিখিত হয় সেই ধারা বাহিয়া নৃপতিগণের একটা বংশ তালিকা দেওয়া আছে। তাহাতে কেহ ক্ষত্রিয় হইয়া রাজা হইতেছেন, কেহ ব্রাহ্মণ হইয়া সম্পদ প্রভুত্ব ত্যাগ করিতেছেন, কেহ বৈশ্যত্ব কেহ শূদ্রত্ব পাইতেছেন। রন্তিদেব ও অজমীঢ়াদির বংশাবলী ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। এই ভাবে দেখা যায় যে বর্ণ এবং বংশ এককথা নহে। জাতিশব্দও বর্ণের স্থলে সাধু প্রয়োগ নহে।

সমস্ত আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে মহাভারতেই বনপর্ব্বে সেই বিখ্যাত গল্পটী আছে যে গল্পের বহুদিন ব্রহ্মচর্য্য তপস্যা নিরত কৌশিক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ নারীর নিকট অপ্রতিভ হইয়া ব্যাধের সমীপে শিক্ষা লাভার্থ গমন করিয়াছিলেন। যে গল্পে আমরা জানিতে পারি, মাংস বিক্রেতা ব্যাধ সপ্রতিভ চিত্তে ব্রাহ্মণকে বলিতেছে—"হে ব্রহ্মণ অধিক কি কহিব যদি শূদ্রযোনি সম্ভূত ব্যক্তিও সদ্‌গুণ সম্পন্ন হয় তাহা হইলে সে বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারে এবং সেই আর্জ্জব সম্পন্ন ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।"

তারপর শান্তিপর্ব্বকে মহাভারতের জ্ঞানকাণ্ড বলা যাইতে পারে। এই পর্ব্বে শরশয্যাশায়ী আহত ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার স্বেচ্ছামৃত্যুত্বের জন্য দীর্ঘ জীবনলব্ধ জ্ঞানের কথা অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন, তিনি কৈলাস শিখরে সমাসীন মহাতেজীয়ান দীপ্যমান মহর্ষি ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করিয়া, ভরদ্বাজ যে কথা জানিয়াছিলেন সেই পুরাতন ইতিহাস অনুসারে বলিতেছেন দেখিতে পাই। ভৃগু বলিলেন, বর্ণ সকলের বিশেষ নাই, এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রথম সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে কর্ম্মানুসারে বিবিধ বর্ণ হইয়াছে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ কামভোগে অনুরক্ত, তীক্ষ্ণস্বভাব, ক্রোধন, সাহসিক, স্বধর্ম্মত্যাগী ও লোহিতাঙ্গ, তাহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা গো সমুদয় হইতে জীবিকানির্ব্বাহ করতঃ কৃষিজীবী হইয়াছে এবং স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, সেই পীতবর্ণের ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যত্ব লাভ করিয়াছে। আর যে সমুদয় দ্বিজগণ হিংসা মিথ্যারত, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী কৃষ্ণবর্ণ এবং শৌচ পরিভ্রষ্ঠ, তাহারাই শূদ্র হইয়াছে। এই সমস্ত কর্ম্মদ্বারা পৃথককৃত ব্রাহ্মণেরাই বর্ণান্তরে গমন করিয়াছে। তাহাদিগের যজ্ঞক্রিয়ারূপ ধর্ম্ম নিয়ত প্রতিষিদ্ধ নহে। ব্রাহ্মণেরা বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইলেও সকলেরই বেদে অধিকার ছিল, কেবল যাহারা লোভবশতঃ জ্ঞানহীন হইল, সেই শূদ্রদিগের বেদে অধিকার নাই, ইহা বিধাতাকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে।

অবশ্যই এই একাকার প্রাক্ পৌরাণিক এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা, তাহাকে সত্যযুগ বলিয়া অভিহিত করিব। এই একাকারের মানুষ ঐতিহাসিকগণের মেরু অথবা

কাস্পিয়ান তীরবর্ত্তী আর্য্য তাহাও অসম্ভব নহে। মোটের উপর আমি এ সকল দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি আমার যুক্তির সমর্থনের জন্য যে, বর্ণ মনুষ্যপ্রকৃতির বৈচিত্রের মৌলিকত্ব নির্ণয়। এই বর্ণের বিভাগের উপর আশ্রম এবং ধর্ম্ম রচনা করিয়া প্রাচীন ভারত আপনার সমাজ রাষ্ট্র প্রভৃতি character foundationএর উপর স্থাপন করিয়াছিল। Policy এখানে অনাদৃত।

সোজা কথায় ইহারই নাম আধ্যাত্মিকতা।

অর্থাৎ বিশ্বরহস্য তলাইয়া বোঝার জন্য জ্ঞান গভীর, সমস্তের স্বরূপ অবগত হওয়ায় সর্ব্বপ্রকার ক্রটি ও ভ্রম মুক্ত সত্য নিঃসংশয় হওয়ায়—বিশ্ব জীবনের নিশ্চিত পথটীর উপর অস্খলিত পদে দণ্ডায়মান এক সুমহান চরিত্র। এই চরিত্র সম্পদে সম্পদবান ব্রাহ্মণ আপনার সুমার্জ্জিত প্রকৃতি লইয়া অপরাপর সকল বর্ণের পুরোভাগে দাঁড়াইবেন সে আর বিচিত্র কি? তাহাই ত স্বাভাবিক। তাহাই দাঁড়াইয়াছিলেন। অপরাপর সকল বর্ণ বিশ্বজীবনের নিশ্চিত পথটী ধরিবার জন্য এই বর্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেন। ক্রটী ভ্রম হইতে যথাসম্ভব মুক্ত থাকিবার জন্য বেদস্বরূপ ইঁহাদিগের বাণীকে রাজবিধির উপরে স্থান দিতেন। ব্রাহ্মণ ছিল সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ বর্ণ। জগতের গুরু। এ প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটিয়া উঠিয়াছিল।

এই ব্রাহ্মণত্ব ব্যক্তিতেই ফুটিয়া উঠিত সন্দেহ নাই কিন্তু ব্যক্তিত্ব ব্রাহ্মণত্ব বলিয়া পরিগণিত হইত মনে করিলে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। ব্রাহ্মণের স্বভাব ব্যতীত ব্রাহ্মণ্য লাভ শাস্ত্রমতেই দুষ্প্রাপ্য। শুধু তাহাই নহে ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াও দুষ্কৃতকর্ম্ম বশতঃ শাস্ত্রের বিধানেই স্থানভ্রষ্ট হইতেন।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১৪৩ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে যে কথা লিখিত আছে তাহা পাঠ করিয়াই আমি একথা বলিতে সাহসী হইয়াছি।

শুধু তাহাই নহে মনুর শ্রাদ্ধের পাংক্তেয় ব্রাহ্মণে বাদ বিচারের ঘটা প্রথমাশ্রমের কঠোর বিধি ব্যবস্থা এমন কি রঘুনন্দনেরও স্থান বিশেষ নিরীক্ষণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ব্রাহ্মণত্ব একটা School of discipline—বংশগত বা জাতিগত অধিকার নহে। যাঁহারা জাতির বিশিষ্ট ব্যবহারে জাতিকে চালাইবার জন্য, জাতির মূল ভাবটা ধরিয়া রাখিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম তাঁহাদেরই বিধি পদ্ধতি। এই জন্যই স্মৃতিতে শাঙ্কর্য্যের সহিত ব্রাত্যেও পাতিত্যের বিধান। এই জন্যই সকল স্মৃতিকার ব্রাহ্মণ ব্রুব কথাটা এত ব্যবহার করিয়াছেন, মনু ব্রাহ্মণ ব্রুবকে অব্রাহ্মণ অপেক্ষাও হেয় করিয়াছেন। "সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণ ব্রুবে।" ৭।৮৫

হয়ত ব্রাহ্মণব্রুব কথাটা অনেকেই শুনেন নাই। সংজ্ঞা নির্দ্দেশক শাস্ত্রের সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিতে গেলে প্রবন্ধ পুস্তকাকারে পরিণত হয়। মাত্র একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

বিপ্রঃ সংস্কার যুক্তো ন নিত্যং সন্ধ্যাদি কর্ম্ম যঃ।
নৈমিত্তিকন্তু নো কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণ ব্রুব উচ্যতে॥

সরল সংস্কৃত, ইহার অনুবাদের প্রয়োজন নাই। "বামুনের ঘরের গরু" কথাটা যে গ্রাম্য কথায় চলিত আছে, তাহা এখন বুঝা যাইতেছে অশাস্ত্রীয় নহে।

শ্রীসত্যবালা দেবী।

দুই দিক্ (২)।

(নব্যভারতের কয়েকটী প্রবন্ধ স্মরণে লিখিত)।

১ম। লক্ষ্যহীন বিচারে মূল প্রশ্ন ভুলিয়া যাইতে হয়।

২য়। সহজ কথাবার্ত্তার মধ্যে বিচারের বাঁধাবাঁধি অত্যাচার সৃষ্টি মাত্র। তাছাড়া উত্তর অপেক্ষা বিচারের প্রণালীটাই অধিক প্রয়োজনীয়। 'দুই দিক্' দেখিতে না শিখিলে সে প্রণালী আয়ত্ত হয় না। আর চলনসই একটা উত্তর দেওয়া কঠিন ব্যাপারও নহে।

১ম। চলনসই নয়, চূড়ান্ত উত্তরই আবশ্যক।

২য়। সসীম বুদ্ধিতে সে অনন্তজ্ঞান অসম্ভব। নিউটন হইতে ডাল্‌টন পর্য্যন্ত সমস্ত পণ্ডিতই তাহার প্রমাণ।

১ম। চূড়ান্ত উত্তর কি তবে নাই?

২য়। যে অখণ্ড সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করিলে সকল সংশয় ছিন্ন হয়, সেই সত্যের মধ্যেই ইহা নিহিত আছে।

১ম। সে সত্য কোথায়?

২য়। যেমন ঋষিবাক্যের মধ্যে!

১ম। ঋষিবাক্যকে সনাতন সত্যের আধার মনে করিবার কারণ কি?

২য়। শাস্ত্র-পন্থীদিগের জীবন ও সাক্ষ্য অণুবীক্ষণাদি অপেক্ষা কম বিশ্বাস্য নহে।

১ম। ঋষিবাক্যের আর যতগুণই থাকুক তাহাতে স্বাধীনচিন্তাকে ব্যাহত করে।

২য়। স্বাধীনচিন্তা আগুনের মত, তাহা লইয়া খেলাকরা চলে না। জগতের অবিরোধে যিনি নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারই নিজের ব্যবস্থা নিজে করিবার যথার্থ অধিকার জন্মিয়াছে,—অন্যের পক্ষে স্বাধীনচিন্তা কথার কথা মাত্র। আর পূজনীয়ের অধীনতা 'পরাধীনতা'ও নহে।

১ম। নিজে ভুল না করিলে কেমন করিয়া ভ্রমসংশোধন ও শিক্ষালাভ হইবে?

২য়। যে উদ্ধত ও অধীর সে ই নিজে না ঠেকিলে শিখিতে পারে না। যাঁহারা বিনীত ও শ্রদ্ধাবান্ তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। যে ভাবে "আমিই ঠিক্ বুঝিতেছি, নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই আমি সব শিখিব, অন্যে যাহা শিখিয়াছে বা বলিয়াছে তাহা আমার নিকট মূল্যহীন,"—সে ব্যক্তি ইতিহাসকে বর্জ্জন করে। সে নিজেকেও গ্রহণ করিতে পারে না, কারণ নিজের ভিতরের কথা শুনিবার জন্যও রীতিমত ধৈর্য্য ও বিনয়ের আবশ্যক।

১ম। কিন্তু ঋষি-বাক্যের বিরুদ্ধে প্রবলতম সাক্ষী ভারতের দুর্দ্দশা।

২য়। তাহা ত ঋষিবাক্য লঙ্ঘনেরই ফল?

১ম। তাঁহারা যখন ত্রিকালদর্শী তখন প্রতিষেধ ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করেন নাই কেন?

২য়। শীতের পর গ্রীষ্ম ও দিনের পর রাত্রির ন্যায় সত্যসাধনায় অনুরাগ ও বিরাগ পর্য্যায়গামী,—এ পর্য্যায় কালধর্ম্ম বা প্রকৃতির নিয়ম। তাহাকে বাধা দিবার শক্তি কাহারও নাই। তবে সনাতনপন্থার যাহারা পথিক তাহারা পড়িয়া আবার উঠে, নতুবা একবারের পতনই মৃত্যুর কারণ হয়! শত শত বুদ্ধিমান্ জাতি মরিয়াছে,—হিন্দু মরিয়াও মরিতেছে না।

১ম। ঋষিবাক্যের গণ্ডী টানিয়া তাহার মধ্যে অচলভাবে বসিয়া থাকাই কি তবে পরম পুরুষার্থ?

২য়। ঋষিবাক্য 'সচল'—বেদ ও স্মৃতিগুলিই তাহার প্রমাণ,—তাহাতে গণ্ডী বা অচলতার সমর্থন করে না। Power Houseএর ভিতর চলাফেরা করিতে গেলে বিশেষজ্ঞের সতর্কতা

বাক্য উপেক্ষা করিলে চলে না। সংসার-পথও 'সঙ্কট এবং কণ্টকময়,'—সেখানে কি সতর্কতা-বাক্যের প্রয়োজন নাই ?

১ম। কিন্তু ভারতীয় জীবনের নিশ্চেষ্টতা অমার্জ্জনীয়।

২য়। পরের দেশকে অগ্নিসাৎ বা আত্মসাৎ করিবার জন্য একলাফে সাগরপার হইতে না পারিলে কি সচেষ্টতা সাব্যস্ত হয় না ? উচ্চস্তরে শঙ্করাদি যুগাবতারের আবির্ভাব, মধ্যস্তরে সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, কলা ও শিল্পশাস্ত্র, এবং নিম্নস্তরে পিতৃমাতৃসেবা, আতিথেয়তা আমোদ-আহ্লাদ ক্রীড়াকৌতুক, পরিশ্রম ও বলচর্চ্চা এখনও কি নিশ্চেষ্টতার লক্ষণ ?

১ম। ইউরোপের তুলনায় ভারত সত্যই নিশ্চেষ্ট।

২য়। ইউরোপের সহিত ভারতের মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সেখানে নির্দ্দয়া প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াই বাঁচিতে হয়, ভোগ্যবস্তু দুর্লভ এবং দেহরক্ষা দুষ্কর ;—কাজেই মানুষ ভোগলোলুপ ও দেহাত্মবুদ্ধি ; এবং কাজকর্ম্মের মধ্যে সমরসুলভ ছুটাছুটী, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অবিশ্বাস। এখানে ঠিক্ বিপরীত ;—সুজলা সুফলা হাস্যময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে খেলিতে খেলিতেই লোকে মানুষ হয়, ভোগ্যদ্রব্য প্রচুর এবং দেহ রক্ষা সহজ, কাজেই ভোগস্পৃহা সংযত ও দেহবুদ্ধি নিস্তেজ, এবং কাজকর্ম্মের মধ্যে শান্তি ও প্রাচুর্য্যসুলভ সন্তোষ প্রীতি ও বিশ্বাস। সাধ্য এবং সাধনা সম্বন্ধেও গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। সেখানে উদ্দেশ্য বাহ্য-প্রকৃতি জয়, অস্ত্র সমর ; এখানে উদ্দেশ্য অন্তঃপ্রকৃতি জয়, অস্ত্র আত্মসমর্পণ। উভয় পক্ষই অনন্তপথের পথিক, জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞান দুই-ই সীমাহীন। একজন বলিতেছেন, তিল তিল জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া বিশ্বজগৎকে নিঃশেষিত করিব, আর একজন বলিতেছেন, সোঽহংতত্ত্ব-নাশী ক্ষুদ্র অভিমানকে বিনষ্ট করিয়া বিশ্বরহস্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব। উভয়েই অক্লান্তকর্ম্মা। ইউরোপের চেষ্টা প্রধানতঃ বাহিরকে লইয়া—সুতরাং চোখে পড়ে, ভারতের চেষ্টা প্রধানতঃ ভিতরকে লইয়া—সুতরাং লোক-লোচনের অগোচরেই থাকিয়া যায়। উভয়েই জ্ঞানবলে বাহ্যপ্রকৃতির উপর খানিকটা কর্ত্তৃত্ব করিতে সমর্থ, ভোগপ্রবণ শক্তিকামী ইউরোপ তাহাদ্বারা রেলগাড়ী ও উড়ো জাহাজ নির্ম্মাণে ব্যস্ত, ত্যাগশীল মুক্তিকামী ভারত নালিকাস্ত্র এবং বারুদ ('বারুদ') এর সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও তৎসম্বন্ধে উদাসীন।

১ম। কিন্তু ভারত যে নিজের দাসত্ব-শৃঙ্খল ঘুচাইতে পারিতেছে না ?

২য়। কিছুদিন পরে তাহা সখ্য-শৃঙ্খলে পরিণত হইতেছে বলিয়া। সামরিকগুণে জয়লাভ করে, কিন্তু মানবিকগুণেই টিঁকিয়া থাকে, তাই জেতৃদলের সহিত ভারতের সখ্যসম্পর্ক গড়িয়া উঠে, তাই ভারতীয় মানব-ধর্ম্মের প্রচারক রবীন্দ্রনাথ রণক্লান্ত বিভ্রষ্ট ইউরোপের নিকট সেদিন ত্রাণকর্ত্তার সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন।

১ম। রবীন্দ্র নাথ অসাধারণ পুরুষ, কিন্তু ভারতীয় জন সাধারণ কি সম্মানের আসন অধিকার করিয়া আছে ?

২য়। জনসাধারণ মোটামুটি সকল দেশেই সমান। কোথাও মদ খায় ও ডাকাতি করে, আবার কোথাও ঘুমায় ও জুয়া খেলে। জন্ পাউণ্ড্স্ ও কবীর উভয়ত্রই আছেন। আর মধ্যস্তরে আছেন নিরীহ গৃহস্থগণ, যাহাদের প্রধান কাজ মানিয়া চলা এবং কোন মতে ভদ্রও শোভনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা। তবে একটু তফাৎ এই যে, এখানে মা বসুন্ধরার কৃপায় ও জলবায়ুর গুণে জীবন-ব্যাপারে ইউরোপের উগ্রতা নাই, আর উপযুক্ত ফল হয় না বলিয়া চেষ্টারও তাদৃশ প্রবলতা নাই। সেখানে দেশ ধনী, রাজা মুক্তহস্ত, এখানে দেশ দরিদ্র এবং সরকার সৈন্য ও পুলিশ পালনেই রিক্তহস্ত, সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই সাধারণের পক্ষে তুলসীতলার মাটীই একমাত্র ব্যবস্থা। ইউরোপের আস্তিক মহলেও এই নৈরাশ্যের 'শীর্ণি' যে বড় কম আছে তাহা নহে।

১ম। হাঁচি টিক্‌টিকির উপদ্রব বোধ হয় সেখানে কিছু কম ?

২য়। কম না হইলেও ক্ষতি ছিল না। স্বয়ং যীশু ডেভিলে বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে তাঁহার ত্রাণকর্ত্তৃত্বে ব্যাঘাত হয় নাই। ইংরাজ নাবিকেরা যারপরনাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাহা বলিয়া নৌযুদ্ধে তাহাদের কৃতিত্ব কম নহে। গুণে দোষ ঢাকিয়া দেয়, এমন কি নূতন দোষের সৃষ্টিও করে। একদিকের লাভ অপরদিকে ক্ষতির আকারে হাজির করিয়া দেওয়াই প্রকৃতির ধর্ম্ম। দোষশূন্য গুণ জগতে দুর্ল্লভ,—দোষবর্জ্জন করিতে গেলে গুণটীকেও সঙ্গে সঙ্গে বর্জ্জন করিতে হয়। ইউরোপ কেবল হাঁচি টিক্‌টিকি ছাড়ে নাই,—বাইবেলও ছাড়িয়াছে। তাই জ্ঞানিগণ কুসংস্কার বিনাশের দিকে অধিক লক্ষ্য না করিয়া সুসংস্কার প্রতিষ্ঠার দিকেই অধিক মনোযোগ দিয়া থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে যে সব নূতন দোষের সৃষ্টি হয় সেগুলিকে অপরিহার্য্য অমঙ্গল বোধে সহ্য করিয়া থাকেন। আগে লোকে হাঁচি টিক্‌টিকি মানিত, এখন ভোগসর্ব্বস্ব জীবনকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া মানে,—কে বলিবে কোন্‌টা অধিক কুসংস্কার? শেষ কথা ত্রুটীশূন্য জ্ঞান আবরণ-শূন্য সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য বোধ হয় বাহুল্য-বর্জ্জিত পরিচ্ছদের ন্যায় অশোভন।

১ম। ওকালতী দ্বারা 'হয়' কে 'নয়' করা যাইতে পারে, কিন্তু সত্য যা তা সত্য থাকেই। আমরা যে ঘরে বসিয়া উপবাস করিতেছি, আর অপরে যে আমাদের অন্নে ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতেছে ইহা কি অস্বীকার করা যায়?

২য়। কুসংস্কারের সহিত সে দুর্ভাগ্যের কোন সম্পর্ক নাই, বরং এই অপেক্ষাকৃত সুসংস্কারের যুগেই তাহার সৃষ্টি। রাজায় প্রজায় ন্যায্য সম্পর্ক স্থাপিত হইলেই উহার অবসান হইবে। কিন্তু ইংরাজ নিজের ভাগ্য-গৌরবকে আজিও বিজয়-গৌরব বলিয়া ভ্রম করিতেছেন, এবং প্রভুত্বমদে মত্ত হইয়া প্রজার সহিত ভ্রাতৃত্বচর্চ্চার অবসর পাইতেছেন না। খুব সম্ভব নিরুপদ্রব অসহযোগের ফলে উভয় পক্ষেরই কল্যাণ হইবে,—ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ইংরাজের চক্ষুরুন্মীলন হইবে।

১ম। কিন্তু ইংরাজের ভারতাধিকার যে বিধাতার বিধান?

২য়। চক্ষুরুন্মীলনও কি সেই বিধাতারই বিধান হইতে পারে না?

১ম। তাহার উপায় ত একটা বিরোধ-সৃষ্টি?

২য়। এ বিরোধ সৃষ্ট নহে, অপরিহার্য্য। দুই বিভিন্ন জাতির—দুই বিভিন্ন সভ্যতার—রাসায়নিক সংযোগ উপলক্ষে কিছু উত্তাপের উৎপত্তি হয়ই। মুসলমানের সহিতও হিন্দুর সংযোগ একদিনে এবং বিনাবিরোধে সম্পন্ন হয় নাই।

১ম। সে সংযোগ যতটুকু হইয়াছে তাহা ইংরাজ শাসনের কৃপায়, এবং তাহা সম্পূর্ণ হইতেও অনেক বাকী। ভারতীয় মুসলমান কি সত্যই খলিফাকে ছাড়িয়া কোন দিন ভারতীয় হিন্দুর সহায়তা করিবে?

২য়। ইংরাজ আমলের রাজনৈতিক সৌহৃদ্যকে মিলন বলে না। হিন্দু মুসলমানে প্রকৃত আত্মীয়তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বাহিরে পল্লীজীবনের বহু পুরাতন 'চাচা' 'ভাই' সম্পর্কের মধ্যে অনুসন্ধেয়। এ আত্মীয়তা কোন পক্ষই সহজে ভুলিতে পারিবে না। আর ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত দেশবুদ্ধির বিরোধও নাই। "সীজারকে সীজারের প্রাপ্য ও ভগবান্‌কে ভগবানের প্রাপ্য বুঝাইয়া দাও"—ইহা স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টের উক্তি। একের অধিকার আধ্যাত্মিক, অন্যের অধিকার ইহলৌকিক। তাই গত যুদ্ধে ভারতীয় মুসলমান ধর্ম্মগুরুকে মাথায় রাখিয়া তাঁহার ঐহিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল, তবে যদি বাস্তবিকই কোন দিন ভ্রান্তবুদ্ধিবশে তাহারা খলিফার স্বার্থে ভারতের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলেও হিন্দুর পক্ষে চিন্তার কারণ নাই। কুড়ি কোটী হিন্দু ভারতের ভিতরে বসিয়া যদি নিজের জোরে আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারে তাহা হইলে পরের নিকট কৃপাপ্রার্থী হইয়া কি সে স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে? যে দুর্ব্বল অপরে তাহাকে সাহায্য করিবার সুযোগ খুঁজিবে, অধীন করিবার জন্য,—ইহাই ইতিহাসের সাক্ষ্য। সুতরাং সে প্রশ্নের বিচার এখন অনাবশ্যক। উপস্থিত কর্ত্তব্য

কিন্তু সুস্পষ্ট। ধর্ম্মের নামে মুসলমান হিন্দুর দ্বারে উপস্থিত,—ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু কি তাহাকে বিমুখ করিবে? তা ছাড়া ভারতীয় হিসাবে মুসলমান হিন্দুর ছোট ভাই। 'হয়ত কোন সুদূর ভবিষ্যতে ছোট ভাই বিরুদ্ধাচরণ করিবে' এই শঙ্কায় কি বড় ভাই এখন হইতে তাহাকে বর্জ্জন করিতে পারে? রাজনীতির হিসাবেও ইহা নিন্দনীয়; মুসলমানকে যদি আপন করিতে বাকীও থাকে স্নেহ দ্বারাই সেটুকুর পূরণ হইবে,—সন্দেহ দ্বারা নহে।

১ম। তবে ইংরাজ সম্বন্ধে স্নেহ-বিমুখতা কেন?

২য়। ইংরাজ এখনও ভারতবাসী হন নাই, আর তা ছাড়া বিদ্বেষ যেটুকু দেখা যায় তাহা বাহিরে—অন্তরে নহে।

১ম। বাহিরেই বা কেন? আমরা যে ইংরাজের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ?

২য়। ঋণ শোধ হউক বা না হউক কৃতজ্ঞতার পবিত্র স্মৃতি চিরজীবন বহন করাই উচিত। কিন্তু ইংরাজ হিসাবী জাতি,—দাসত্বলোপ পর্য্যন্ত হিসাবী বুদ্ধিতে করিয়াছিল,—তাহারা যে পরিশোধ সম্ভাবনা না থাকিলেও ঋণ দিয়াছে একথা সহজে বিশ্বাস করিবার নয়। ভারতও কিছু কিছু শোধ দিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইংলণ্ডের কুবেরত্ব ভারতাধিকারের পর হইতে, তাহার সেদিনকার জগজ্জয় শিখগুর্খার রক্তে।

১ম। ইংরাজের রাজত্ব মুসলমানের তুলনায় রাম-রাজত্ব। মুসলমান অত্যাচারের সাক্ষী শিবাজী ও প্রতাপ; ইংরাজের বিরুদ্ধে সেরূপ সাক্ষী কোথাও নাই।

২য়। হৃতগৌরব মুসলমানের নিন্দা পুরুষোচিত নহে। তাহাদের 'অত্যাচার' নয়—উদারতা ও অসতর্কতার জন্যই শিবাজী ও প্রতাপের উদ্ভব হইয়াছিল। এখন পুলিসের কার্য্যদক্ষতায় রাজদ্রোহের সমস্ত বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ইহা স্থায়িত্বকামী রাজার শাসন যন্ত্রের কৃতিত্ব,—কিন্তু সুশাসনের অন্য প্রমাণ আবশ্যক। মুসলমানকে নির্ব্বোধ বলিতে পারা যায়,—প্রকৃত অপরাধীকে ধরিতে পারিত না, স্পষ্টবাদীকে ফাঁসি দিত এবং সমস্ত ভারতের ধনবল ও জনবলের অধীশ্বর হইয়াও দুএকটা নগণ্য লোকের মুখের কথায় বিচলিত হইয়া হঠকারিতার পরিচয় দিত ও অনর্থক দুর্নাম সংগ্রহ করিত। কিন্তু একটা কথা মুসলমান সম্বন্ধে মনে রাখা কর্ত্তব্য :—গোঁয়ার হইলেও তাহাদের শাসনে লোকে খাইতে পাইত এবং অপরকেও খাওয়াইতে পারিত, আর বল, স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম বুদ্ধি ও আয়ু আজকালকার তুলনায় অধিকই ছিল। নব্যন্যায়ের ও সৃষ্টি মুসলমান যুগে।

১ম। চিন্তা ও নারীজাতির মুক্তি, অস্পৃশ্যবাদ ও বর্ণাশ্রমের আংশিক উচ্ছেদ, এবং জাতীয়তা বুদ্ধির উন্মেষ ইংরাজ শাসনের সুমহৎ দান।

২য়। এসমস্ত 'দানের' দাতৃত্বে, মহত্বে, এমন কি অস্তিত্বে পর্য্যন্ত কোথাও কোথাও সন্দেহ আছে।

১ম। চিন্তার মুক্তি কাহার দান?

২য়। চিন্তার স্বাধীনতা ভারতে চিরদিনই অক্ষুণ্ণ ছিল,—তাই বেদনিন্দুক চার্ব্বাকের দর্শন আজিও জীবিত, এবং অসীমের পার্শ্বেই নিগমশাস্ত্রে দেবীমুখোক্ত বলিয়া পূজিত। নূতন মতবাদের জন্য কারা ও প্রাণদণ্ড ইউরোপ খণ্ডেরই সুমার্জ্জিত প্রথা। তবে যদি কেহ মনে করেন যে পিতৃপিতামহগণের ধরণে বিচার করার নাম চিন্তার দাসত্ব, আর অপরিচিত বিদেশীর নির্দ্দেশমত বিচার করার নাম চিন্তার স্বাধীনতা তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। আজকালকার অধিকাংশ 'স্বাধীন চিন্তাই' পাশ্চাত্য পণ্ডিতের যুক্তিতর্কের পুনরুদ্গীরণ মাত্র। এই চিন্তার যাঁহারা ধুরন্ধর তাঁহারা স্বদেশের দীর্ঘসঞ্চিত জ্ঞানকে অজ্ঞানতা বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন,—একবার নিকটে গিয়া তাহার স্বরূপ বিচার পর্য্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া বোধ করেন না। slave mentalityর এরূপ হীন দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। ইহা বিলাতী শিক্ষার সুমহৎ দান।

১ম। তাহা হইলে ত সংস্কৃত ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণই স্বাধীনচিন্তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, কিন্তু কই তাঁহাদিগকে ত কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিতর দেখিতে পাই না ?

২য়। কংগ্রেস ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির বাহন, সুতরাং বরণীয়। রাজনৈতিক জ্ঞান ও দেশবুদ্ধি যাঁহারা লাভ করিয়াছেন কংগ্রেস তাঁহাদেরই কর্ম্মক্ষেত্র। শাস্ত্রব্যবসায়ী উচ্চতর তত্ত্বের উপাসক,—তিনি সর্ব্ববিধ কল্যাণকর্ম্মীরই কল্যাণকামী। এরূপ লোকেরও জগতে প্রয়োজন আছে। ইংল্যাণ্ডের মত দেশেও পণ্ডিতের দল রাজনৈতিক আবর্ত্তের বাহিরে থাকিতেই ভাল বাসেন।

১ম। রাজনৈতিক জ্ঞান এবং দেশবুদ্ধিরও ত প্রয়োজন আছে ? সে জ্ঞান, সে বুদ্ধি কাহার দান ?

২য়। হিন্দুর দেশবুদ্ধি কমই ছিল, জাতীয়তার সংকীর্ণ গণ্ডী তাহাকে আটক্ রাখিতে পারে নাই। সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মময় চিন্তাকরা এবং নরনারী কাটপতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলকে প্রেমদৃষ্টিতে দর্শন করা ইহাই ছিল হিন্দুর তপস্যা,—তাহার সমাজ, তাহার দিনচর্য্যা সমস্তই তাহাকে এই বিরাট কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিত,—তাহার সাধনে সহায়তা করিত। এ অবস্থায় একটী ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের মধ্যে নিজের সমস্ত সহানুভূতিকে আবদ্ধ রাখা যে হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। আজিকার ঐ উপেক্ষিত শাস্ত্রব্যবসায়ী হিন্দুর সেই সুমহৎ আদর্শকে এখনও জাগাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাকে বাধা দিলে অন্যায় হইবে। তাঁহারই উদারতীর্থে অবগাহন করিয়া একদিন এই রাজনীতি-কলুষিত সংকীর্ণ-জীবনকে মুক্তিদান করিতে হইবে। বিশ্বাসপ্রবণ ভারত শাঠ্যময় জগতের কৌশলজালে পড়িয়া জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিল,—জাতীয়তা ভাবমুগ্ধ মুমূর্ষু ভারতের ইংরেজদত্ত বিষ চিকিৎসা,—ভারতের ইহাতে প্রয়োজন ছিল, সুতরাং চিকিৎসককে ধন্যবাদ। কিন্তু বিষ চিকিৎসান্তে বর্জ্জনীয়,—ইহা যে প্রাণান্তকারী হলাহল তাহা যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুল না হয়। যে দেশবুদ্ধির যূপকাষ্ঠে নরবলি নয়—নরজাতির বলি হইতেছে, তাহার মত ভয়ঙ্কর বস্তু আর কি আছে ?

১ম। স্ত্রীজাতির মুক্তির কথাটীও কি উড়াইয়া দিবার জিনিষ ?

২য়। পুরুষজাতির পূর্ব্বেই স্ত্রীজাতি মুক্তিলাভ করিবে ইহা কি বিশ্বাস্য ? মাতৃত্বই নারী-জাতির বৈশিষ্ট্য, —সঙ্গে সঙ্গে মৃদুতা, কোমলতা, রক্ষণশীলতা, মুগ্ধতা ইহাই তাঁহাদের ভাগ্যলিপি। ইহার অন্যথা ঘটাইলে নারীত্ব শূন্য নারীর সৃষ্টি হইবে, এবং তাহাই হইতেছে। পুরুষের অপেক্ষাও অনাবৃত দেহ এবং চপলস্বভাব নারীর সংখ্যা আজ কা'ল কম নহে। ইঁহারা পুরুষের সহধর্ম্মিণী নহেন, প্রতিযোগিনী। স্বর্গের দ্বার একটী নহে, পুরুষ বীর্য্য ও প্রতিষ্ঠা দ্বারা এবং নারী সেবা ও আত্মবিসর্জ্জন দ্বারা সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু আজকালকার মুক্তিবাদিনীগণ পুরুষের মতই কোমর বাঁধিয়া যশ ও প্রতিষ্ঠার দ্বার দিয়াই অগ্রসর হইতে চাহেন। মাতা ও বনিতার সুমহৎ কর্ত্তব্যে ইঁহাদের মন ফিরে না, স্বামী পুত্রকে দেশের কাজে উদ্বুদ্ধ করিয়া ও একনিষ্ঠ রাখিয়া ইঁহারা সন্তুষ্ট নহেন, সীতাসাবিত্রীর আসন ছাড়িয়া তাঁহারা সফ্রাজিষ্টের আসনের জন্য লালায়িত। ইহার নাম কি নারী জাতির মুক্তি ? স্ত্রীজাতির সকলে এই মুক্তির জন্য পাগল হইয়া উঠিলে সন্তানপালনরূপ গুরুতর দায়িত্ব চাকর চাকরাণীর উপর অর্পিত হইবে,—জাতটা এক পুরুষেই নষ্ট হইয়া যাইবে। স্বচ্ছন্দ বিচরণের যে মুক্তি তাহা ভারতে অল্পদিনই ব্যাহত হইয়াছে, আজিও বহু স্থানে অব্যাহতই আছে,—কিন্তু স্বচ্ছন্দ বিচরণ আর যথেচ্ছ বিচরণ এক কথা নহে, নিরস্ত্র পরাধীন জাতির পক্ষে একথা আরও সত্য। কিন্তু এসব বাহিরের কথা,—আদর্শ ভ্রংশই আসল কথা। মুক্তির নামে তাহাই আসিয়া পড়িতেছে। ইংলণ্ডেও স্বচ্ছন্দবিবরণের অতিরিক্ত আর বড় কিছু স্বাধীনতা ছিল না, সফ্রাগেট্ আন্দোলন সে দিনের কথা। দেখা যাউক ইংলণ্ডের জাতীয় অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়। তবে সাহিত্য ও আমোদ-প্রমোদ হইতে যতদূর বুঝা যায় ইংলণ্ডের অধোগতি আরম্ভ হইয়াছে।

১ম। ইংরাজের কল্যাণে অস্পৃশ্যবাদ উঠিয়া যাইতেছে। মাদ্রাজের পারিয়াগণ স্পর্শের ভীতিকর শাসন অপেক্ষা ডায়ারী শাসনকেও ভাল বলিয়া মনে করে।

২য়। লীলাময় যেদিন এক হইতে বহু হইয়াছেন, সেই দিনই বৈচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চনীচ-বোধের সৃষ্টি। সুতরাং স্পর্শবিচার উঠিবার নয়,—উঠেও নাই,—কেবল উপবীত ও নামাবলী হইতে সরিয়া গিয়া টুপী ও জুড়ীর মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। তাই রেলপথে ইউরোপীয়ের গাড়ী এবং সরকারী অফিসে বড়কর্ত্তাদের সিঁড়ি সগর্ব্বে বাজে লোকের বহিষ্কার ঘোষণা করিতেছে। ভারতের স্পর্শবিচার ছিল ধর্ম্মসংস্কার ও শৌচবুদ্ধিমূলক। অনাচার ও অনাচারীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দেহশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মশুদ্ধির পথ পরিষ্কার করাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। তাই একদিকে পশুপক্ষিগণ এবং অপরদিকে পরমাত্মীয়গণ পর্য্যন্ত ইহার শাসন হইতে অব্যাহতিলাভ করিতে পারেন নাই। চন্দ্রগুপ্তের গৌরব-যুগ হইতে আজি পর্য্যন্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর চক্ষে সর্ব্বভূক কুকুর অপেক্ষা বিশেষভূক বিড়াল, মাংসভোজী শকুনি অপেক্ষা শস্যভোজী শুক, এবং অজ্ঞাতকুলশীলের অন্ন অপেক্ষা মা, স্ত্রী ও সুব্রাহ্মণের অন্ন পবিত্র। অবশ্য আহার্য্য বস্তু মাত্রে যাহাদের প্রয়োজন, তাঁহাদের ঘাতকের অন্নেও বাধিবার কারণ নাই, কিন্তু হিন্দুর বিচার একটু স্বতন্ত্র রকমের। সে বিচারে অবশ্য চলাফেরার কিছু অসুবিধা ঘটায়, কিন্তু হৃদয়সম্পর্ককে মোটেই কলুষিত করে না। সুব্রাহ্মণ প্রাণ খুলিয়া চণ্ডাল প্রতিবেশীর সহিত আলাপ করিবেন, বিপদে তাহার সাহায্য করিবেন প্রয়োজন হইলে নিজেও লইবেন, উচ্চবর্ণের সহিত তাহার বৈষয়িক বিবাদের নিষ্পত্তিকালে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষেই বিচার করিবেন, এমন কি চণ্ডাল সাধুর সমাধিমন্দিরে ভক্তির অঞ্জলি দান করিবেন, কিন্তু কোন মতেই তাহার অন্নজল বা কন্যা গ্রহণ করিবেন না। আজকালকার স্পর্শ বিচার অন্যরূপ,—তাহাতে অন্নজল বা কন্যাগ্রহণে কোন আপত্তিই নাই, যত আপত্তি কেবল শ্রদ্ধাদানে। এ সর্ব্বনেশে অস্পৃশ্যবাদ আমাদের দেশে—অন্ততঃ বাংলায়—কখনও ছিল না। মান্দ্রাজ অঞ্চলে পারিয়ার প্রতি যে সামাজিক অবিচার তাহারও এ ধরণের নহে। সেখানেও পারিয়া সাধুর সমাধি স্থান ব্রাহ্মণের নমস্য,—স্বয়ং হনুমান হয় ত কোন বিস্মৃত যুগের পারিয়া বীর। পারিয়া নীতির কারণ বোধ হয় ঐতিহাসিক। মুষ্টিমেয় আর্য্যসন্তান প্রাধান্যলোপ শঙ্কায় পৌরুষক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে moral effect produce করিবার জন্য নানাবিধ কৃত্রিম উপায় ও সংকীর্ণ নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিবে,—আজ তাহারই ফলে মদ্রদেশ জর্জ্জরিত হইয়া শেষে ডায়ারী শাসনকেও শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছে। অবিলম্বে এই অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতীকার আবশ্যক, কিন্তু কালপ্রতীক্ষা নহিলেও চলিবে না। অসহযোগের আত্মশুদ্ধি সমর আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রত্যেককে চাই, অথচ যে বিনা চুক্তিতে আসিবে না তাহার এখানে স্থান নাই। সুতরাং আপাততঃ সমস্ত সংকীর্ণ স্বার্থের কথা ভুলিয়া বিনাযুক্তিতে এই সংগ্রামে যোগ দেওয়া আবশ্যক। ভগবৎ কৃপায় বিজয়শ্রী লাভ করিলে ঘরের সমস্ত গোলযোগ অনায়াসেই মিটিতে পারিবে। অবশ্য পারিয়ার শঙ্কার কারণ আছে,—যুদ্ধের সময় এক মূর্ত্তি এবং বিজয় লাভের পর আর এক মূর্ত্তি ইহা বিরল নহে। কিন্তু যুদ্ধটাই যখন আত্মশুদ্ধির, তখন এ সমস্ত শাঠ্যশঙ্কার অবকাশ নাই। আর, পারিয়া প্রাণের জ্বালায় যাহাই বলুন, একথা তাঁহাকে স্মরণ রাখিতেই হইবে যে, ঘরের বিবাদ ঘরে না মিটাইলে মিটিতেই পারে না, বিড়ালের বিবাদে বানর মধ্যস্থতার সুযোগ পাইলে বিবাদ মিটে—কিন্তু সর্ব্বনাশের পর। সর্ব্বনাশের মধ্যে আবার ভীষণতম সেই সর্ব্বনাশ, যাহা সুবিধার ছদ্মবেশে দেখা দেয়। পারিয়া তাহার দুঃখের সংসারে ইংরাজীর বেণোজল আনিয়া দুই একটা উচ্চপদ, এমন কি দুই একটা মেম বিবাহ ও করিতে পারিবে,—কিন্তু খোয়াইবে যে জিনিষ, তাহার নাম মনুষ্যত্ব। বাঙ্গালী এই উচ্চাসনের কারবারে দেউলিয়া হইয়া যে সাক্ষ্য দিতেছে, তাহা শিক্ষানবীশ পারিয়া ভায়ার নিকট উপেক্ষণীয় হওয়া উচিত নহে।

শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ।
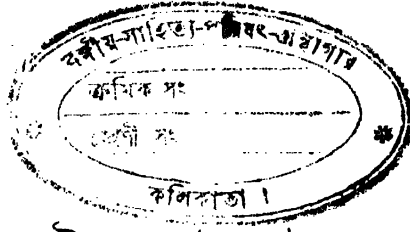
ইহ ও পরলোক।

স্বপ্ন দেখিলাম, আমরা কাশীধামে যাইলাম ব্রহ্মচারী বালকগণের উচ্চারিত বেদসঙ্গীত শুনিলাম। ভাগীরথীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিলাম। আজ বিশ্বনাথ, কাল দুর্গা-বাড়ী, এইরূপভাবে বেড়াইয়া বেড়াইলাম। দেহ ত শয্যায় শয়ান, কে বেড়াইল? চক্ষু ত মুদ্রিত, কে দেখিল? অথচ আমিই বেড়াইলাম, আমিই দেখিলাম। মনোপাধিক জীব মনের দ্বারা দেখাশুনার কার্য্য সমাধা করিল। জাগ্রতে স্থূলেন্দ্রিয়সাহায্যে সকলে দেখে শুনে। স্বপ্নে স্থূলেন্দ্রিয় নাই, কাজেই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা একা মনই দর্শন শ্রবণাদির কার্য্য সমাধা করে। স্বপ্নে স্থূলদেহেরই একটি সংস্কারমূলক ছায়া লইয়া মনোপাধিক জীব বিচরণ করে। বলা যাইতে পারে, মনই স্থূলদেহের ছায়া গ্রহণ করিয়া বিশ্বনাথ ক্ষেত্রে বেড়াইয়া আসিল। জাগরণ ও সুষুপ্তির মধ্যাবস্থাই স্বপ্ন। মন সম্পূর্ণ আত্মলীন ও স্বরূপপ্রতিষ্ঠ থাকিলে সুষুপ্তি। সুষুপ্তিতে স্বপ্ন দেখা সম্ভব হয়না। স্বপ্নে বাহ্যজগতই দৃষ্ট হয়। বাহ্যজগতের খেলাই সেখানে দেখা যায়। জাগ্রতাবস্থার আকাঙ্ক্ষাই মূর্ত্তিমতী, উপলব্ধি দর্শনসমানাকারা হইয়া ফুটিয়া উঠে। অনুভূতি হিসাবে স্বপ্নাবগতি সত্যই। স্বপ্নাবগাহিতিই সত্য (শাঙ্কর ভাষ্য)।

পরলোক স্বপ্নবৎ। মৃত্যুর পর মনোপাধিক জীব স্থূলদেহের যাবতীয় সংস্কার লইয়াই দেহত্যাগ করিয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহ। লিঙ্গদেহ, ছায়াদেহ ও লিঙ্গদেহ। সূক্ষ্মদেহের বিচরণ স্থানই সূক্ষ্মলোক বা পরলোক। পরলোক ইহলোকেরই প্রতিচ্ছবি। ইহলোকেরই বাসনা বা সংস্কার পরলোকে বিদ্যমান। ইহলোকের পাপপুণ্যাত্মিকা বাসনা পরলোকে অনুবর্ত্তমানা, স্থূলদেহে মর্ত্ত্যের অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের তথায় ফলভোগ, পরলোক কেবল মনেরই খেলা। ক্ষুধা তৃষ্ণা, তৃপ্তি অতৃপ্তি, সুখদুঃখ সমস্তই সেখানে মানসিক। সে লোকই মানসিক। সে লিঙ্গদেহ মনোধিষ্ঠিত মনোময়। মনোময়ানি তত্র শরীরাণি।

এই পরলোক যাহারা মানেন, তাঁহারাই আস্তিক। দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই, পরলোক নাই যাহারা বলেন, তাঁহারা নাস্তিক। পুষ্পে গন্ধের মত মৃত্যুতে যদি সব শেষ—তবে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রয়োজন নাই। পুণ্যের পুরস্কার, পাপের দণ্ড নাই। মৃত্যুর পর ভালমন্দ কার্য্যের কোন ফলাফল নাই। সাধনা, ভগবানে আত্মসমর্পন ব্যর্থ। অমৃতের সন্তান দেহাত্মবাদী পরলোকে অবিশ্বাসী হইয়া অসুররূপে দাঁড়াইবে। জন্মমৃত্যুর জাল রচনা করা ব্যতীত তাদের আর গতি নাই, থাকিবে না। কি দুঃখ, কি অনাশ্বাস। দেহাত্মবাদী যথেচ্ছাচারীই ত অসুর। "অসূন্ প্রাণান্ রাতি ক্লিশ্নাতি যঃ সোঽসুরঃ"। কঠোপনিষদে।যম নচিকেতা সংবাদে যমের উক্তি—"নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃপুনর্বশমাপদ্যতে মে"

মৃত্যুর পর স্থূলদেহের ছায়া লিঙ্গদেহ। স্বর্গ-নরক ভোগোপযোগী ভোগদেহও লিঙ্গদেহ। স্থাবরসংশ্লেষ প্রাপ্ত (জীবাণু-আকার) সূক্ষ্ম জীবদেহও লিঙ্গদেহ। স্থূলদেহের উপর আকর্ষণ

বা অতিরিক্ত ঝোঁকই স্থূলদেহের ছায়াগ্রহণের হেতু। ঐ আকর্ষণ, ঐ ঝোঁক যতই কমিতে আরম্ভ করে, সংস্কারমূলক ছায়াদেহও ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। ক্রমে স্মৃতি-উপস্থাপিত মূর্ত্তির মত সূক্ষ্মতম হইয়া মিলাইয়া যায়। সংস্কারমূলক ছায়াদেহ বিলীন হইলে পর মনোপাধিক জীব জীবানু-আকারে জলেস্থলে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। স্থাবরাদি পদার্থে সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে। এই স্থাবরসংশ্লেষ জন্মের দ্বার; জীবের অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। সংশ্লেষ অর্থে লাগিয়া থাকা। স্থাবরে শস্যাদিতে সংশ্লিষ্ট জীবের অবস্থা সংমূর্চ্ছিতবৎ, "সংমূর্চ্ছিতবদবতিষ্ঠন্তে" (শাঙ্কর ভাষ্য)। সে সময়ে অনুভূতি সুপ্ত, উপলব্ধি নাই। পানীয় ও খাদ্যের ভিতর দিয়া কত জীবানু আমাদের দেহে প্রবেশ করিতেছে, আবার জন্মিবার অনুকূল অদৃষ্ট না পাইয়া নির্গত হইয়া যাইতেছে। খাদ্যের কুন্তনপেষনাদিতে খাদ্যসংশ্লিষ্ট জীবের কোন যাতনা হয় না। আচার্য্য শঙ্কর স্বকৃত ছান্দোগ্যভাষ্যে স্পষ্টরূপেই ইহা বুঝাইয়া গিয়াছেন। জীবের স্থাবরসংশ্লেষকে * স্থাবরযোনি বা স্থাবরজন্ম বলিয়া কেহ বুঝিবেন না। পাপের ফলে জীবের স্থাবররূপ যোনিতে স্থাবরের কুন্তনপেষনাদিতে তৎস্থ জীবের কষ্টের উপলব্ধি হয়। বিষ্ণুপুরাণে সাবিত্রীসংবাদে জীব অঙ্গুষ্ঠাকাররূপে উক্ত হইয়াছে, কঠোপনিষদে "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের হৃদয়দেশ পুণ্ডরীক কলিকাকার বলিয়া তদধিষ্ঠিত আত্মা পুণ্ডরীক আকার বলিয়াই উক্ত আছে।

ছায়াদেহ কোথাও প্রেতদেহরূপে কথিত। প্রেতদেহ * ভৌতিকযোনি এক জিনিষ নহে। ভৌতিক যোনি জন্ম বিশেষ। যতদিন পরিত্যক্ত স্থূলদেহের উপর অতিরিক্ত আকর্ষন বা ঝোঁক, ততদিন ঐ ছায়া বা প্রেতদেহের অস্তিত্ব। স্থূলদেহ যখন আর দেখা যাইবে না, পুনঃ প্রাপ্তির আর আশা থাকিবে না; তখন ঐ আকর্ষণ ও ঝোঁক কমিতে আরম্ভ করিবে। সাধারণ মানবাদি জীবের ঐ আকর্ষণ বা ঝোঁক একবৎসর পর্য্যন্ত (কম বা বেশী) স্থায়ী হইয়া থাকে।

"সংবৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে" সংবৎসর মধ্যে বা পরে এই অর্থ করিলেই এক-বাক্যতা হয়। সাধারণ পাপপুণ্যকারী ব্যক্তিরাই একবৎসর মধ্যে বা পরেই স্থূলদেহ গ্রহণ করে।

স্থূলদেহের ছায়াই প্রেতদেহে বর্ত্তমান। এইজন্য প্রেতদেহের নামই ছায়াদেহ। মৃত্যুর পর ঐ ছায়াদেহ বা প্রেতদেহ গৃহীত হইয়া থাকে। ছায়া বা প্রেতদেহ কেবল মানবদের জন্যই, আতিবাহিক দেহ (যাহা স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত দশপিণ্ড দ্বারা নাশ্য) ছায়াদেহেরই অসংস্কৃত পূর্ব্বাবস্থা মাত্র। উহাও মানবেরই প্রাপ্য।

"কেবলং তন্মনুষ্যানাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ" যোগবাশিষ্ঠে পশুপক্ষীদের সম্বন্ধে ও আতিবাহিক দেহ গ্রহণের কথা আছে।

যোগীর যোগশক্তিলভ্য যোগদেহ, মহাত্মাদের অলৌকিক শক্তিজাত চিন্ময়দেহ, ছায়াদেহ বা প্রেতদেহ নহে। জীবদ্দশায় প্রগাঢ় চিন্তা মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিতে পারে। প্রিয়জনের বা আপনার চিন্তামূর্ত্তি কখন কখন দৃষ্ট হইয়াছে, এমন কথাও শুনা যায়। প্রগাঢ় ভাবনাপ্রকর্ষে

*বিস্তারিত পরে বুঝাইব)

* ভৌতিক যোনি সম্বন্ধে পরে বুঝাইব।

স্মৃতি প্রত্যক্ষের আকার ধারণ করে—ইহা আচার্য্য রামানুজের মত। ধ্যান বা নিদিধ্যাসন যে সাক্ষাৎকাররূপে পরিণত হইয়া থাকে—ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্ত।

ছায়াদেহ সাধারণতঃ সাধারণ পাপপুণ্যকারী মানবেরাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাপ্তি মাত্রেরই বিলয় আছে। ছায়াদেহের প্রাপ্তি ও বিলয় দুইই স্বভাবের কার্য্য। বাধা না পাইলে স্বভাবের কার্য্য আপনা আপনি সুশৃঙ্খলায় হইয়া থাকে। আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ প্রকৃতি বা স্বভাবের উপরেও সাধনার নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। মৃত আত্মার সদ্গতিকারণ কল্যাণময়ী প্রক্রিয়া আধ্যাত্মিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মৃতআত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। আমাদের শ্রাদ্ধতর্পণাদি উন্নত প্রণালীর আধ্যাত্মিক চিকিৎসা স্বাভাবিক নিয়মে রোগ আরোগ্য হয়, তথাপি চিকিৎসার প্রামাণ্য।

মুক্তব্যক্তি ও শিশুদের এই দেহলাভ ঘটে না (মুক্তদের সম্বন্ধে পরে বলিব)। যতই তীক্ষ্ণবুদ্ধি হউক, এক বৎসরের কি দুইবৎসরের কম কোন শিশুরই "আমার দেহ ইত্যাকার" এইরূপ সংস্কার থাকা সম্ভবই নহে; কাজেই স্থূলদেহের উপর তাহাদের কোন আকর্ষণই জন্মে না। শিশুরা মৃত্যুকালে স্থূলদেহের ছায়া লইয়া যাইতে পারে না বলিয়া একেবারেই জীবাণুআকার প্রাপ্ত হইয়া স্থাবরসংশ্লেষ লাভ করে। আর তদ্ভিন্ন বর্ত্তমানজন্মে কোনরূপ পাপপুণ্য করিয়া যায় না বলিয়া, স্বকর্ম্মার্জ্জিত কোন বিশিষ্ট গতির অধিকারী তাহারা হয় না। স্বানুরূপ দেহলাভের অপেক্ষা করা, কি আয়াস পাওয়া তাহাদের অদৃষ্টে নাই। মৃত্যুর পরই সংমূর্চ্ছিত জীবাণুআকার প্রাপ্তি। তজ্জন্যই শিশুদের পক্ষে দাহ বা শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা নাই। সংস্কারমূলক ছায়াদেহ গ্রহণের তাহাদের যোগ্যতা বা শক্তি থাকেনা; আতিবাহিক দেহ তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হয় না; পারলৌকিকার্থ পুণ্য বা অত্যুৎকট পাপ না থাকায়, স্বর্গ নরক ভোগ প্রাপক ভোগদেহ লাভও তাহারা করিতে বাধ্য হয় না; কাজেই দাহে এবং শ্রাদ্ধ তর্পণে, সেই শিশুদের কোন উপকারই নাই। জলোকার মত স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়াই অপর স্থূলদেহ প্রাপ্ত হয়—ইহা শিশুদের বেলায়ও খাটে না। কারণ শস্যাদিতে সংশ্লেষ, রসরক্তরূপে পরিণতি তার পর গর্ভবাস ইত্যাদিতে সময়ক্ষেপ হইবেই। আচার্য্য শঙ্কর জলোকাদৃষ্টান্তের অনুরূপ অর্থই করিয়া গিয়াছেন।

স্থূলদেহের উপর আকর্ষণই বড় আকর্ষণ। শবদেহ দাহান্তে আকর্ষণের বেগ মন্দীভূত হইয়া আইসে। সে দেহ পাইবার আশাও থাকে না। তবে অতীত বা বিনষ্ট বস্তুরও উপর ও ত আকর্ষণ লোপ পায় না। আত্মহত্যাকারীরা এমন অনৈসর্গিক উৎকটভাবে আচ্ছন্ন থাকে যে, তাহাদের স্বাভাবিক নিয়মে প্রেতদেহ বিমুক্তি ত ঘটেই না; উপরন্তু সন্তানাদির ইচ্ছা ও মন্ত্রশক্তি সহকৃত শ্রাদ্ধাদির কোন উপকার ও তাহারা পায় না। বহুকালে বহুকষ্ট ভোগের পর আত্মহত্যাকারী স্থূলদেহ প্রাপ্ত হয়। রঘুনন্দন আত্মহত্যাকারী সম্বন্ধে দাহশ্রাদ্ধাদির কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। তবে প্রাচীন সংহিতায় একটি প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ আছে। তাহা অতি কঠোর কিন্তু তদ্দ্বারা দেহীর উপকার হইতে পারে। সন্তানাদি তাহা না করিলে কোনরূপ প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন না। "নারায়ণ বলি," "বলিবধপ্রায়শ্চিত্ত" দুই স্থানে হইয়াছে বলিয়া সম্প্রতি শুনিয়াছি।

কোন মৃতব্যক্তির শবদেহ যদি স্ফটিকময় পাত্রে আবদ্ধ করিয়া উন্মুক্তস্থানে রক্ষা করা

যায়, তবে উক্ত দেহীর গতির ব্যাঘাত ও উদ্ধারের বিলম্ব ঘটে। ফটোও মৃত আত্মার বড় আকর্ষণের জিনিষ বলিয়া সাধারণ ব্যক্তির ফটো চিত্র প্রভৃতি রাখা সমীচীন নহে। খ্যাতনামা শিশিরকুমার ঘোষ মৃতপুত্রের ফটো তুলিবার জন্য আমেরিকায় প্রেততত্ত্ববিদের নিকট লিখিয়া পাঠান। বাল্যকালের ফটো থাকিলে মৃত আত্মাকে সহজে আনা যাইবে বলিয়া সেই প্রেততত্ত্ববিদ্ পুত্রটির শৈশব বয়সেরও কোন ফটো আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন।

শিশুদের কথাই হইতেছিল। যে শিশুরা বাল্যেই দেহত্যাগ করে—তাহারা দ্বিবিধ শ্রেণীর। এক, পুণ্যাত্মা দেবশিশু। আর, ক্ষুদ্রকর্ম্মা তৃতীয়জন্তু। মুক্ত মহাত্মারা কখন কখন শেষ একবার জন্মমৃত্যু ভোগ করিবার জন্যই সংসারে আসেন। বসুদের গঙ্গাগর্ভে জন্মমাত্র মৃত্যু, দেবকীর ছয়টি সন্তানেরই কংসহস্তে নাশ দেবশিশু স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। উহারা স্বাভাবিক দেবতা। ক্ষুদ্রকর্ম্মা মোহমুগ্ধ অজ্ঞ জীব জন্মমৃত্যু ভোগ করিবার জন্য শিশুরূপে জন্মিয়া দুই এক বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহারাই তৃতীয়জন্তুর উদাহরণ। শ্রুতি প্রমাণ—

অসকৃদবির্ত্তানি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং।”

কেবল যেবার উক্ত শিশু, শিশুঅবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না—বুঝিতে হইবে, তখন আর তাহার প্রারব্ধ (ফলোন্মুখ কর্ম্মফল) নাই। প্রারব্ধ না থাকায় সে জীব কেবল নূতন ক্রিয়মান কর্ম্মই করিয়া যাইবে। সামান্য অফলোন্মুখ সঞ্চিত কর্ম্মফল কিছু সঙ্গে আনিতে পারে, এইমাত্র। সঞ্চিত একেবারেই যাহারা না আনে, তাহারা আবার গোড়া হইতে ভবের খেলা আরম্ভ করে। পাপপুণ্যের খাতায় তাহাদের জমা খরচ কিছুই নাই। জৈবীবাসনা সংস্কার ও প্রকৃতির বশে জন্মের হাত তাহারা এড়াইতে পারে না। ক্রিয়মানকর্ম্মের উপর মানবের স্বাধীনতা আছে বলিয়া সেই নূতন ক্রিয়মান কর্ম্মই আবার নূতন করিয়া (অদৃষ্টও) প্রারব্ধ তৈয়ার করিবে। সেই প্রারব্ধ এ জন্মে ফলভোগ সম্ভব হইলে এই জন্মে ফল দিবে, নচেৎ জন্মান্তরে অনুবর্ত্তন করিবে। ইহজন্মের কর্ম্মফলের বল অধিক হইলে এইজন্মেই তাহার ফল ভোগ হইয়া থাকে।

“অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে”

আচার্য্য শঙ্করের মতে ক্রিয়মান কর্ম্মে মানবের স্বাধীনতা আছেই। অংশতঃ জন্মান্তরীন প্রকৃতির অধীন হইলে প্রধানতঃ উহা স্বাধীনই। বর্ত্তমান জন্মের প্রারব্ধ পূর্ব্বজন্মের ক্রিয়মান কর্ম্মেরই ফল। একজন্মে কৃত না হইলে প্রারব্ধ ত আর আকাশ হইতে নামিবে না। পূর্ব্বজন্মের প্রকৃতির বলেই মানব কর্ম্ম করে—ইহা মানিলে উন্নতি অবনতিতে মানবের কোনও অধিকার নাই, ইহা মানিতে হয়। একবার মানব যে ভাবের, যে জাতীয় পাপ বা পুণ্য করিয়া আসিবে, তাহা হইলে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সেই ভাবের, সেই জাতীয় পাপ ও পুণ্য অনুষ্ঠান করিয়াই তাহাকে যাইতে হইবে। একজন্মে কেবল স্বাধীনতা মানিয়া বাকী শত শত জন্মে স্বাধীনতা না মানা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। কস্মিন্‌কালে আর পরিবর্ত্তন নাই, আশ্চর্য্য! নরজন্ম শ্রেষ্ঠজন্ম—কারণ ঐ জন্মে মানবের কর্ম্মস্বাধীনতা আছে পশ্বাদি জন্ম নিকৃষ্ট—কারণ ঐসকল জন্মে কর্ম্মস্বাধীনতা নাই। শিক্ষা, সংসর্গ, সাধনা, ধর্ম্মকর্ম্ম ও ভগবানে ভক্তি সকলই বৃথা। এ মত মানিলে বিশ্বের খেলাই হয় না; লীলার বিচিত্রতা থাকে না, সৃষ্টির মাধুর্য্যই নষ্ট হয়।

প্রারব্ধে মানব পরাধীন। কারণ, যে ফলোন্মুখ কর্ম্মফল বর্ত্তমান জন্মের আরম্ভক—তাহা ভোগ করিতে হইবেই। অফলোন্মুখ সঞ্চিতাখ্য পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে মানব পরাধীন ও স্বাধীন। সাধনায় সঞ্চিত পাপ কর্ম্মফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অত্যাচারে উহা বৃদ্ধি লাভ করে। সঞ্চিতপুণ্য জন্মান্তরের আরম্ভক না হইলেও উহার ভোগ জন্মান্তরে হইয়া থাকে; পাপে নষ্ট হইতেও পারে, সঞ্চিত কর্ম্মফল অন্তঃকরণে সূক্ষ্মভাবে সংস্কাররূপে জড়াইয়া থাকে। বর্ত্তমান জন্মে যে নূতন কর্ম্ম কৃত হইবে—উহারই নাম ক্রিয়মান। ক্রিয়মান কর্ম্মে সামান্যমাত্রই অধীনতা আছে; জন্মান্তরীণ প্রকৃতির বশে একটি ভাল মন্দ করিবার ইচ্ছা স্বতঃই জাগে; আর সেই ইচ্ছার বশেও কখন কখন মানব যন্ত্রচালিত পুত্তলির মত কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে মানবের জোর সাধনা ফলবতী হইতে পারে; ওই ইচ্ছার প্রসার ও সঙ্কোচে মানবের হাত আছে; ইচ্ছা না থাকিলেও নূতন ইচ্ছার উদয়েও প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার দেওয়া আছে। কেবল মাত্র বর্ত্তমানজন্মের স্বাধীনভাবেও মানবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মে। অনেক কার্য্যই মানবে নূতন জন্মে করিয়াও যায়। মানব মনে করিলে দেবতা ও পিশাচ হইতে পারে। আমরা অগাধ অর্থ সত্ত্বেও দীনদুঃখীর দুঃখ মোচন করি না। আমরা মনে করিলে ভাল কার্য্য করিতে পারি, মন্দ কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারি, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বকই সে যত্ন লই না। আমাদের শত চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়—তখন না হয় বলিব জন্মান্তরীণ প্রকৃতি আমাদের চেষ্টার প্রতিকূলে ছিল।

শিশুদের প্রস্তাব চলিতেছিল। মনেকর, কোন শিশু জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়া তাহার প্রারব্ধ শেষ করিয়া আসিল, সঞ্চিতও রহিল না; তবে সে বক্তি মুক্ত হইবে না কেন? কারণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সে ত বাসনার উচ্ছেদ, সংস্কারের নাশ এবং ভগবৎ সাক্ষাৎকার করিয়া যাইতে পারে নাই—তাহারা মুক্ত হইবে কেন? কেহ কেহ পাপপুণ্যের কোন জমা খরচ না লইয়া গোড়া হইতে একেবারে ১ম পয়েণ্টে স্তরে থাকিয়াই নূতন কর্ম্ম আরম্ভ করে; করিবার পূর্ব্বে অবশিষ্ট কর্ম্মফল শেষ করিবার জন্য দুই একবার হয়ত শিশু জন্মে জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়া গিয়া থাকে। এ মৃত্যুতে পাপক্ষয়ই হয়, সঞ্চয় আর কিছুই হয় না।

শিশুগণের শৈশবে মৃত্যু সর্ব্বত্রই যে পাপসূচক তাহা নহে, তবে সেই শিশুর আর সে জন্মে কোন কর্ম্মফল সঞ্চয় হইল না। শিশুরা শিশু অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া অনেক সময়ে সেই গৃহে একই মাতার কোলে আসিয়া থাকে। অতি শৈশবে মৃত্যু হয় বলিয়া সে জন্মের কোন কর্ম্মফল না থাকায় তাহাদের ইচ্ছা ব্যাহত হয় না। মাতা পিতা প্রভৃতি প্রিয়জন শিশুসম্বন্ধে যে আকাঙ্ক্ষা করেন, সে আকাঙ্ক্ষার কোনরূপ বাধা শিশুর তরফ হইতে জন্মে না। বয়স্ক ব্যক্তির বেলায় এই নিয়ম খাটে না। কারণ পাপপুণ্য তাহাদিগকে যে মৃত্যুর পর কি অবস্থায় উপনীত করাইবে তাহার ঠিক নাই। পাপপুণ্যের বৈচিত্র্যই ইচ্ছামত কার্য্যের প্রতিবন্ধক হয়, প্রিয়জনের আকাঙ্ক্ষা সফল করে না। শিশু অবস্থায় যাহাদের মৃত্যু ঘটে, তাহারা প্রায়ই জন্মান্তরে মানব হইয়াই জন্ম লাভ করে।

এক গৃহে জন্মিলেও শিশুদের জন্মান্তরস্মৃতি ফুটে না। শিশুকাল হইতে একই ঘরবাড়ী একই আত্মীয়স্বজন দেখিয়া পূর্ব্বজন্মের বলিয়া সংশয়ই জন্মে না। বর্ত্তমান জন্মেরই ধারণা জন্মে। কোন বয়স্কব্যক্তি জ্ঞান সঞ্চারের পর পূর্ব্ব জন্মের পরিচিত স্থান এবং প্রিয়জনকে যদি

দেখিতে পায়—তাহা হইলেই ফুটিয়া উঠিবে। এইজন্যে আমি কোন স্থানে আসি নাই; অথচ দেখিয়াছি বলিয়া বেশ মনে পড়িতেছে—সেইরূপ ক্ষেত্রেই জন্মান্তরস্মৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। উদ্বোধের কারণ সামগ্রী উপস্থিত হইলে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট জন্মান্তরীণ স্মৃতি ফুটিয়া উঠে। জন্মান্তর-স্মৃতি যে স্পষ্ট অস্পষ্ট ফুটে না—তার একমাত্র কারণ উদ্বোধক সামগ্রীর অভাব; কালিদাসও এই তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা নূনং স্মরত্যবোধ পূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি॥

সাধারণ পাপপুণ্যকারী ব্যক্তি মৃত্যুর একবৎসর মধ্যে বা ঠিক পরেই সাধারণতঃ জন্ম গ্রহণ করে। প্রাণ দেহ হইতে বাহির হইলেই জীবের স্বস্তিবোধ হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে এক লহমার জন্যও মূর্চ্ছা আসিয়া অধিকার করে। আর সেই অবসরে মূর্চ্ছার অন্তরালে জীবের মৃত্যু ঘটে। কোন জীব আমি দেহ হইতে বাহির হইতেছি বা আমার প্রাণ বা আত্মা বাহির হইল এরূপ জানিতে পারে না। মৃত্যুর পর দেহী স্বস্তি বোধ করিয়া উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিয়া যায়, লঘুদেহ দেখিয়া "সে ভারী দেহ কোথায় গেল" ভাবিয়া কেহ কেহ মৃত্যুস্থানে ফিরিয়া আইসে। দেহ ভস্মীভূত, পুনঃপ্রাপ্তির কোন আশা নাই—কাজেই ঝোঁকও কমিয়া গেল। কেহ দুই একদিন সেই স্থানে আসা যাওয়া করিয়া, কোন ফল না পাইয়া দেহের উপর ত্যক্তরাগ হইল। প্রিয়জনের সহিত দেখা শুনায় কোন তৃপ্তি নাই, কোন লাভ নাই দেখিয়া তাহাও ছাড়িয়া দিল। কেহ বা দুই একদিন তৃপ্তি পাইয়াও শেষে বাধ্য হইয়াই অবশ্যম্ভাবী গতিলাভের জন্য সে স্থানের মায়া ত্যাগ করিল। আবার, সকলের শক্তি বা যোগ্যতাও থাকে না।

অধিকাংশ দেহীকেই নিজ নিজ পাপপুণ্যাত্মিকা প্রকৃতির বশে চলিতে হয়। স্থূলদেহের আশাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নূতন স্থূলদেহের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠে। নূতন স্থূলদেহের আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া সেই জীব উন্মত্তের মত এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। তখন প্রিয়জনের কথা মনে পড়ে না। নিজের ঝোঁকেই পাগল। স্থূলদেহ লাভের উপায় করিতে পারে না, অথচ সেই অনির্দ্দিষ্ট সন্ধানেই জীবকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। নূতন স্থূলদেহের আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন দেহের ছায়াও ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, শেষ সূক্ষ্মতম হইয়া মিলাইয়া যায়। অমনই জীব তখন স্থাবরসংশ্লেষ প্রাপ্ত হইয়া জন্মের অপেক্ষায় থাকে (উন্মুক্ত স্থানে খোলা জায়গায় বিশেষতঃ নদীতীরে মৃত্যুতে দেহীর কিছু কিছু উপকার হয়। আমাদের শাস্ত্রমতে গঙ্গাতীরে মৃত্যুতে উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইয়া থাকে)।

ছায়া দেহে অবস্থিতি কালে পাপপুণ্যের ফলভোগ হয় না। কেবল পাপপুণ্যাত্মিকা প্রকৃতির বলে মোটামুটী ক্ষুধাতৃষ্ণা, স্বস্তি ক্লান্তি, তৃপ্তি অতৃপ্তি আর তজ্জনিত সুখদুঃখের উপলব্ধি দেখা যায়। সে উপলব্ধিতে পাপপুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এ অবস্থা হাজতবাসের মত। জীবদ্দশার অভ্যস্ত সংস্কার জন্যই ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি ভাব জন্মে। "পাইলাম" এই সংস্কার জন্মিলেই তৃপ্তি ও সুখবোধ, আর পাইলাম এই সংস্কার না জন্মিলেই অতৃপ্তি ও দুঃখ-

বোধ। আপনা আপনিই এই সংস্কারের উদয়, আবার আপনা আপনিই বিলয় প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তবে আপনা আপনি বিলয় না হইলে তাহার উপায়বিধান করা যায় কি না দেখিতে হয়। আমরা "দিলাম" এই সংস্কার উৎপাদন করাইতে পারিলে মৃত জীবের তৃপ্তি ও সুখ-বিধান করিতে পারি। মৃত আত্মার সদ্গতি ও মঙ্গলের জন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা কেবল প্রার্থনা করিয়া থাকে। আমরা প্রার্থনা করি; উপরন্তু সম্মুখে অন্নজলাদি শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য রাখিয়া মন্ত্র ও ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে শুভসংস্কার উৎপাদনে যত্ন লই। মৃত জীব শ্রাদ্ধান্ন দৃষ্টি দ্বারা তৃপ্ত হন। পিতৃপুরুষের ভোজনই দৃষ্টিমূলক, দেবতাদের অমৃতভোজনের মত।"

"ন বৈ দেবা অমৃতমশ্নন্তি দৃষ্ট্বৈব অমৃতেন তৃপ্যন্তি।"

মাতার ঐকান্তিক ডাকে যখন সন্তানের রোগ সারে, সতীর হত্যা দেওয়ায় পতি মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচিয়া যায়, তখন সন্তানের প্রার্থনা ইচ্ছা ও মন্ত্রশক্তিসংস্কৃত প্রক্রিয়া দ্বারা মৃতজীবের উপকার হইতে না পারিবে কেন? এক বৎসর মধ্যে জন্ম না হইলে সপিণ্ডকরণ দ্বারা কোন বাধা যদি থাকে ত দূর হইয়া থাকে। শুভ সংস্কার উৎপাদন করা, বাধা দূর করা, সদ্গতির উপায় করা বা অন্যবিধ মঙ্গলবিধান করা শ্রাদ্ধাদির উদ্দেশ্য। শ্রাদ্ধাদি আধ্যাত্মিক চিকিৎসা।

"সংবৎসরে দেহমতো হতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে"

অত্যুৎকট পাপাচারী আর পারলৌকিকার্থ পুণ্যকারী ব্যক্তি সংবৎসর মধ্যে বা ঠিক পরেই জন্মগ্রহণ না করিয়া পাপপুণ্য ফলভোগার্থ স্বর্গে বা নরকে গমন করে।

"তত স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা"

স্বর্গ নরক ভোগোপযোগী দেহের নাম ভোগদেহ। ছায়াদেহে বা প্রেতদেহে সূক্ষ্ম জীবাণুশরীরে স্বর্গনরকভোগ বা পাপপুণ্য ফলভোগ হয় না। স্বর্গে পুণ্য ক্ষয়, নরকে পাপ ফল উপভুক্ত হইলে জীব স্থাবর সংশ্লেষ প্রাপ্ত হইয়া স্বকর্ম্মার্জ্জিত জন্ম লাভ করে, "যথাপ্রজ্ঞং হি সম্ভবঃ"

"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ" (কঠোপনিষৎ)

মানসিক সুখভোগের স্থানই স্বর্গ, মানস দুঃখভোগের ক্ষেত্র নরক। স্বপ্নের মত সে ভোগ কেবল সংস্কারমূলক। স্বপ্নের ভোগ যেমন স্বপ্নকালে সত্যরূপে প্রতীত, পারলৌকিক ভোগও পরলোকে বাস্তবরূপেই প্রতীত। "স্বপ্নাবগতিই সত্য" (শাঙ্করভাষ্য), স্বপ্ন কাল্পনিক হউক, স্বপ্নোপলব্ধি সত্যই! স্বাপ্নজ সুখদুঃখ এবং পারলৌকিক সুখদুঃখের সহিত বস্তুর সুখদুঃখের অনুভূতি হিসাবে কোন তারতম্য নাই। পরলোকের সুখদুঃখের অনুভূতি হিসাবে কোন তারতম্য নাই। পরলোকের সুখদুঃখের বিচার মর্ত্ত্যে বসিয়া করা চলে না। স্থূল-দেহের সুখদুঃখের বিচার যদি মুক্তি অবস্থায় লোকে বিচার করেন, তবে সে বিচার কি মানিয়া থাকি? মুখে মানা এক, মনেপ্রাণে মানা আর। আমরা মর্ত্ত্যের মধ্যে থাকিয়া যদি পারলৌকিক সুখদুঃখ মিথ্যা বলি, তাহা হইলে মুক্তিক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আমাদের পার্থিব সুখ-দুঃখভোগকে মিথ্যা বলিলে প্রতিবাদ করা চলে কি?

পরলোক ভোগপ্রাপক পুণ্য পারলৌকিকার্থ, ইহলোক-ভোগ্য পুণ্যের নাম ঐহিকার্থ। পুণ্যের বল অধিক হইলে ইহজন্মেই তার ভোগ হয়, নচেৎ জন্মান্তরে অনুবর্ত্তন করে। পরলোক

মান বা নাই মান, পরলোক কামনা করিয়া কিছু কর বা নাই কর—পারলৌকিকার্থ পুণ্য অনুষ্ঠিত হইলেই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। অত্যুৎকট পাপের ফল এই জন্মেই ভোগ হয়। এই জন্মে বা পর জন্মে যাহা ভোগ হইতে পারে না, তাহাই নরকে ভোগ হয়। (বিস্তৃত বিচার পরে করিব)।

কেহ যদি দুঃখশূন্য, পৃথিবীতলে অপূর্ব্ব, সুখ আকাঙ্ক্ষা করিয়া তদনুরূপ সাধনা করিয়া যায়, তবে সে সুখের ভোগ মর্ত্ত্যে স্থূলদেহে হইবে কিরূপে? মানসিক ভোগ ব্যতীত সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবে কোথায়? কেহ যদি আকাঙ্ক্ষা করে আমি পাখীর মত আকাশে আকাশে উড়িব, মৎস্যের মত জলে ভাসিয়া বেড়াইব, চিরজীবিত থাকিয়া চিরযৌবন পাইয়া জরারোগবিবর্জ্জিত হইয়া ইচ্ছামত সুখভোগ করিব, চিরযৌবনা আদর্শ সুন্দরী সঙ্গে অবসাদ-হীন ক্লান্তিশূন্য উপভোগ করিয়া যাইব। তবে তাহার সে আকাঙ্ক্ষা-পূরণ, এ ভাবে বাসনা পরিতৃপ্ত মর্ত্ত্যে স্থূলদেহে সম্ভবই নহে, মৃত্যুর পর মনোময় ভোগ ব্যতীত এ আদর্শ ভোগতৃষ্ণা কোথাও মিটিবার সম্ভাবনা নাই। জীবদ্দশার পুণ্যসাধনাই স্বর্গে ফলবতী হইয়া উঠে, মর্ত্ত্যের বাসনাই তথায় মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়। "স্বর্গলোকে মনোময়াণি শরীরাণি"।

স্বর্গলোক সংকল্পমূলক। সংকল্পমূলাস্তত্র লোকাঃ। এই কারণে দেখ, স্বর্গবর্ণনায় চিরযৌবনা অপ্সরা অবসাদহীন ভোগ, সংকল্পমাত্র ইচ্ছাপূরণ, জরারোগরাহিত্য চির বসন্ত, নিত্যজ্যোৎস্না প্রভৃতি বিদ্যমান। অবশ্য ইহা ভোগ স্বর্গ। ভোগস্বর্গ ব্যতীত অন্যবিধ স্বর্গও বিদ্যমান।

কেবল জ্ঞানরহিত কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক "কর্ম্মনা পিতৃলোকঃ" হইতে প্রত্যাগমন অনিবার্য্য। জ্ঞান সহিত কর্ম্মের দ্বারা দেবলোক "বিদ্যয়া দেবলোকঃ", দেবলোক হইতে কদাচিৎ ব্রহ্মলোক গমন হইয়া থাকে। বেদান্তমতে সগুণোপাসকেরা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া তথায় দহরাদি উপাসনাদিদ্বারা ক্রমমুক্তিলাভে অধিকারী হন।

ব্রহ্মনা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে,

পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদং"

মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে সেই কৃতাত্মা সগুণোপাসকেরা ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ করিবেন—ইহাই বেদান্তমতে ক্রমমুক্তি। আসল মুক্তি নির্ব্বাণ মুক্তি। নির্ব্বাণ মুক্তিতে "অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" "ন প্রাণাঃ উৎক্রমন্তি"। প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না; অর্থাৎ জীব (মনোপাধিক আত্মা) দেহ হইতে (উৎক্রান্ত) উদ্গত হয় না। বাসনার ক্ষয়ে মনের লয়। মনের লয়ে জীবের জীবত্বের প্রবিলয়। ফলে জীবাত্মার স্বরূপে ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি। "ব্রহ্মৈব ভবতি"।

যতদিন পুণ্যফল স্বর্গে বাস ও ততদিন। পুণ্যক্ষয়ে পতনের কাল উপস্থিত হইলে, স্বর্গের উপর জীবের মোহ ছুটিয়া যায়। মর্ত্ত্যে আসিবার নূতন ইচ্ছা জাগে। পুণ্যক্ষয় হইয়া আসিল অথচ মোহ কিছু মাত্র কমিল না—এ অবস্থা কত কষ্টের! অত কাল ধরিয়া স্বর্গে অপূর্ব্ব সুখাস্বাদন করিয়া আসিয়া আবার পৃথিবীর দুঃখশোকভূয়িষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করাই ত এক প্রকার নরক ভোগ বলিয়া বোধ হইবে। তবে লোকে স্বর্গ চাহিবে কেন,? স্বর্গ ভোগের পর পৃথিবীতে আসার চতুর্গুণ কষ্টের কথা ভাবিয়া কেহই স্বর্গকে স্পৃহণীয় বলিয়া ভাবিবে না। কিছুদিন রাজভোগের পর মুটিয়ার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসার মত, স্বর্গভ্রষ্ট জীবের

ফিরিয়া আসা মর্ম্মান্তিক কষ্টেরই কারণ হইবে। স্বর্গভোগোপযোগী পুণ্যের ক্ষয় হইবে, আর সেই সঙ্গে স্বর্গভোগের উপর একটি বিষম অতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণা জাগিয়া উঠিবে। বহুকাল দুঃখ নাই, দুঃখের স্মৃতি পর্য্যন্ত মনে নাই—কাজেই সে বাহ্যভোগ আর মধুর ও তৃপ্তিপ্রদ লাগিবে না। স্বর্গ তখন সুবর্ণপিঞ্জর, ভোগ তখন পণ্যক্রীত, অপ্সরা তখন হৃদয়হীনা ক্রীতদাসীরূপে দেখা দিবে। স্বর্গ আর তখন স্বর্গ বলিয়া মনে হইবে না। পৃথিবীই তখন নূতন এবং স্পৃহনীয় ঠেকিবে। স্বর্গের কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া পরাধীনভাবে সুমিষ্ট পুণ্যফল খাওয়ার চেয়ে মর্ত্ত্যে স্বাধীনভাবে সুখদুঃখময় পুণ্যপাপফল খাওয়াই ভাল লাগিবে। হৃদয়হীনা অপ্সরার পণ্যক্রীত সেবা অপেক্ষা প্রেমময়ী মর্ত্ত্যস্ত্রীর আদরের সঙ্গ স্পৃহনীয় মনে হইবে। স্বর্গভোগের আকর্ষণ যেমন ক্ষয় পাইবার অবস্থায় আসিবে, অমনই মনোভাবেরও পরিবর্ত্তন দেখা দিবে। ক্ষয়ও হইবে, ভোগদেহও বিলীন হইয়া যাইবে। পৃথিবীর শক্তি স্বর্গভ্রষ্টকে পৃথিবীর দিকে টানিয়া আনিবে। তার পর বায়ুমণ্ডলে ভাসিতে ভাসিতে মেঘের ভিতর দিয়া বৃষ্টিধারার সহিত সেই স্বর্গভ্রষ্ট জীব স্থাবরাদিতে সংশ্লেষ প্রাপ্ত হইয়া শুভ জন্মের অপেক্ষা করিবে। পর্ব্বত হইতে পতনের সময়ে যেমন জ্ঞান থাকে না, স্বর্গচ্যুতির পরও জীবের কোন উপলব্ধি থাকে না।

যাবৎ সংপাতমুষিত্বা (যাবত পুণ্যফলং স্বর্গে স্থিত্বা) অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে; যথেতমাকাশং আকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমোভূত্বা ভ্রাহভ্রং ভবতি। অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি; মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি, ত ইহ ব্রীহি যবা ওষধি বনস্পতয়স্তিলমাষা জায়ন্তে, অতোবৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং, যো রেত সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব তদাকার এব ভবতি (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)।

পারলৌকিকার্থ পুণ্যাচারী ধার্ম্মিকগণের ঐহিকার্থ পুণ্যের ফলে নূতন উৎকৃষ্ট কুলে শুভ জন্ম লাভই ঘটে। ইহলোকে যে পুণ্যের ফল ভোগ না হয়, তাহাই জন্মান্তরে ভোগ হইয়া থাকে। আবার যে পুণ্যফল ইহলোকে জন্মান্তরে স্থূলদেহে মর্ত্ত্যে ভোগ হইতে পারে না, তাহাই পরলোকে স্বর্গে মানসিক ভোগ করিতে হয়। আর পুণ্যক্ষয়ান্তে বহুকাল বাহ্যসুখ ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয় ও মন পরিশ্রান্ত হইয়া উঠে। স্বর্গভোগ এক ঘেয়ে, বৈচিত্র্যশূন্য হইয়া শেষে অতৃপ্তির কারণ থাকে। তখনই পৃথিবীতে আসার ইচ্ছা জাগে। ইহা ভগবানের করুণা।

কোন কোন মতে স্বর্গে পুণ্যের নিঃশেষে ক্ষয়ই হয় না; তৈলাবশেষের মত অবশেষ থাকিয়া যায়। সেই অবশিষ্ট পুণ্যের ফলেই স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তি উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ হয়। দ্রব তৈলাবশেষ পাত্রে লাগিয়া থাকা সম্ভব বলিয়া থাকে, পুণ্যের অবশেষ সেরূপ ভাবে থাকিবার হেতু নাই বলিয়া আচার্য্য শঙ্কর এ মত খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

মহাভারত মঞ্জরী।

সপ্তম অধ্যায়—প্রথমবার পাশাখেলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হইয়াছে। সকলেই গৃহে গিয়াছেন। কেবল রাজা দুর্য্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিয়া সভা দেখিয়া বেড়াইতেছেন। যতই দেখিতেছেন, ততই দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে, ঈর্ষ্যা হইতেছে। একদিন রাজা দুর্য্যোধন সভা দেখিতে দেখিতে স্ফটিকের কৃত্রিম জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহাতে জল আছে ভাবিয়া স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র উত্তোলন করিলেন। শেষে বুঝিলেন, তাহা জল নহে। তখন লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। আর এক দিন আর এক সরোবরে স্বচ্ছ জল দেখিয়া, তাহাও স্ফটিক ভাবিয়া যেমন নামিলেন, বস্ত্র ভিজিয়া গেল। তাহা দেখিয়া পাণ্ডবগণের ভৃত্যেরা হাসিয়া উঠিল। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল সহদেবও হাসিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ শুষ্ক বস্ত্র পাঠাইয়া দিলেন। অতি অভিমানী রাজা দুর্য্যোধন মরমে মরিয়া গেলেন। আবার সেই সভাগৃহের একস্থানে বৃহৎ দর্পণ দণ্ডায়মান ছিল। রাজা দুর্য্যোধন তাহা দ্বার ভাবিয়া যেমন গমন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি মস্তকে আঘাত পাইলেন। তিনি একে ত পাণ্ডবগণের রাজসূয় যজ্ঞ ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছেন, তাহার উপর এত লাঞ্ছনা, এত বিড়ম্বনায় ঘৃতাহুতি অনলের ন্যায় ঈর্ষ্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। *

শেষে রাজা দুর্য্যোধন মাতুল শকুনির সহিত হস্তিনায় চলিলেন। পথে মাতুলকে বলিলেন, "হতভাগা পাণ্ডবেরা একদিন আমার ভয়ে দীনহীন ভাবে, বনে বনে বিচরণ করিয়াছে, আর আজ তাহারা সমুদয় ভারতের সম্রাট হইল! ভাবিয়াছিলাম, এই রাজসূয় যজ্ঞেই যুদ্ধ বাধিবে, আর তাহাতেই আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। কিন্তু তাহারা অনায়াসে সম্পন্ন করিয়াছে। আমি তাহাদের সভা দেখিতে গিয়া যেরূপ লজ্জিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত হইয়াছি, তাহা ত জীবন থাকিতে ভুলিতে পারিব না। তাই ভাবিতেছি, ভীষ্মদেবাদির সাহায্যে তাহাদিগকে পরাজিত করিব। তাহা হইলেই তাহাদের সভা, ঐশ্বর্য্য, সাম্রাজ্য, সকলই অনায়াসে পাইব।"

শকুনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "কৃষ্ণ, পঞ্চ পাণ্ডব, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীকে যুদ্ধে পরাজিত করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহারা অজেয়। † তবে রাজা যুধিষ্ঠির পাশা খেলিতে ভাল বাসেন, অথচ খেলিতে জানেন না। তুমি তোমার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে পাশা খেলিতে আহ্বান কর। আমি তাঁহাকে কপটাচরণ দ্বারা পরাজিত করিব। তাঁহার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য—এমন কি দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত জিতিয়া লইয়া তোমাকে দিব।"

অমনি দুর্য্যোধনের প্রাণ নাচিয়া উঠিল। মামা ভাগিনায় পরামর্শ পথিমধ্যেই স্থির হইল। দুর্য্যোধন পিতাকে গিয়া বলিলেন, "রাজন্, পাণ্ডবেরা রাজসূয় যজ্ঞে এত ধন রত্ন, এত দ্রব্য সামগ্রী

---

* আদিপর্ব্ব ১—১৩

† সভাপর্ব্ব ৪৮—১৫।১৬।

পাইয়াছে যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হিমালয়ের কত পার্ব্বতীয় জাতি পিপীলিকা উত্তোলিত পিপীলিকা নামক স্বর্ণ রাশি রাশি উপহার দিয়াছে ‡। সিংহলের লোকেরা সমুদ্রের সারভূত বৈদূর্য্যমণি ও কত কত মুক্তা প্রদান করিয়াছে *। পাণ্ডবেরা এমন অমূল্য রত্ন সকল পাইয়াছে যে তাহা আপনার ভাণ্ডারেও নাই। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, 'শত্রুর অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া যে ব্যক্তি বিচলিত না হয়, সে অতি অধম পুরুষ'।"

অন্ধরাজ নীরব রহিলেন। ভাবিলেন, শত্রুগণের এত বৃদ্ধি দেখিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির স্থির থাকা উচিত নয়। তবে উপায়? তাহারা যে মহাবল। তখন শকুনি বলিলেন, "মহারাজ, কোন চিন্তা নাই। আপনি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলিতে আহ্বান করুন। আমি অনায়াসে সকল জিতিয়া লইব।"

বৃদ্ধরাজ প্রথমে অসম্মত হইলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন অত্যন্ত জেদী, ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন, "আপনি আমার কথা না শুনিলে, নিশ্চয়ই আমি প্রাণত্যাগ করিব। †" শেষে অন্ধরাজ সম্মত হইলেন।

বিদুর তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি তখনই ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ রাজার পায় মস্তক রাখিয়া, অতি বিনীত ভাবে, অতি করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "মহারাজ, আপনার পায় ধরি, আপনি কদাচ পাশা খেলায় সম্মত হইবেন না। তাহাতে জ্ঞাতি বিরোধ আরম্ভ হইবে, সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইবে। হায় হায়, এমন কার্য্য কদাচ করিবেন না।"

অন্ধরাজ শুনিলেন না। বলিলেন, "তুমি অদ্যই ইন্দ্রপ্রস্থে গমন কর, যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলিতে লইয়া আইস।"

মহাত্মা বিদুর তখন বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হায়, হায়, এ কুল আর রহিল না" শেষে তিনি ভীষ্মদেবের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। তখন তিনি রাজ আজ্ঞায় অতি বিষণ্ণ মনে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকে সকল কথা বলিলেন।

পরের দিন পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী বহু দাস দাসী সহ হস্তিনায় উপনীত হইলেন। দ্রৌপদীর শোভা, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূগণের প্রাণে ঈর্ষ্যানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহারা তাহা শীঘ্রই পতিপুত্রগণের হৃদয়ে ও সংক্রামিত করিলেন।

পরদিন পাণ্ডবেরা সভায় উপস্থিত হইলেন। অমনি অধীর শকুনি যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলিতে আহ্বান করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির পাশার অনেক নিন্দা করিলেন। তাহা শুনিয়া ধূর্ত্ত শকুনি

* সভাপর্ব্ব ৪৯—৫০।

‡ সভাপর্ব্ব ৫২—৪। পুরাকালেও ভারতের স্বর্ণের প্রবাদ বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। গ্রীক হেরোডোটাস খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিয়াছেন, "ভারতে প্রচুর স্বর্ণ আছে। কতক খনি হইতে উত্তোলিত হয়, কতক নদীর স্রোতের সহিত চলিয়া আইসে ও কতক মরুভূমি হইতে আনিত হয়। এই শেষোক্ত স্বর্ণ শৃগাল অপেক্ষা ও বৃহদাকার পিপীলিকাগণ বালুকার সহিত খুঁড়িয়া বাহির করিয়া উপরে আনিয়া রাখে। পরে তাহারা যখন আবার খনন করিতে ভূগর্ভে যায়, তখন ভারতবাসীরা উপরের পুঞ্জীকৃত মিশ্রিত বালুকা বোরায় ভরিয়া উষ্ট্রের উপর তুলিয়া অতি দ্রুতবেগে লইয়া আইসে। কারণ ঐ পিপীলিকাগণ জানিতে পারিলে উহাদিগকে মারিয়া ফেলে।" তৎপরে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মগধের রাজা চন্দ্রগুপ্তের সভাস্থিত গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসও এই পিপীলিকা উদ্ধৃত স্বর্ণের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্রকায় অসভ্যরা স্বর্ণ খুঁড়িয়া বাহির করিত এবং তাহাদিগকেই ভারতবাসী দূর হইতে দেখিয়া পিপীলিকা বলিয়া অনুমান করিত।

† সভাপর্ব্ব ৫২—৩৫।৩৬। তাহা হইলে তখনও সমুদ্র হইতে মুক্তা তোলা হইত।

বলিলেন "যদি ভীত হও, খেলিও না।" যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "আমাকে কেহ কোন কাযে আহ্বান করিলে, আমি কখনও পশ্চাদপদ হই না, এই আমার চিররীতি।"

তখন খেলা আরম্ভ হইল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ কৃপাচার্য্য, বিদুর, সঞ্জয় প্রভৃতি সকলেই তথায় বসিয়া আছেন। সভা গৃহ শত শত লোক পূর্ণ। শকুনি পাশা নিক্ষেপ করিয়াই বলেন, "এই আমার জিত" আর অমনি জিতিয়া লন। যুধিষ্ঠির ধন, রত্ন যতই পণ রাখিতে লাগিলেন, ততই হারিতে লাগিলেন। যতই হারিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ধৈর্য্য নষ্ট হইতে লাগিল। তিনি এইরূপে সুবিস্তৃত স্বরাজ্য, সমুদয় ধনৈশ্বর্য্য, অগণিত দাসদাসী যাহা কিছু তাঁহার ছিল, সকলই হারিলেন।

ধর্ম্মাত্মা বিদুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অন্ধরাজকে বলিলেন, "মহারাজ, মুমূর্ষু যেমন ঔষধ খায় না, আপনিও তেমনি আমার হিতকথা শুনিতেছেন না। আমি অনুপায়! আমি অনুপায়! তথাপি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, 'ক্ষান্ত হউন'। আমার দুর্য্যোধনের আজ হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। বৃষ যেমন মদভরে আপন শৃঙ্গ আপনিই ভাঙ্গিয়া ফেলে, দুর্য্যোধনও আজ তাহাই করিতেছে। যাহারা তাহার সহায়, তাহার মঙ্গলের উপায়, তাহাদিগকেই দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। ভ্রাতৃগণকে শত্রু করিয়া তুলিতেছে। হায়! হায়! সমুদয় কুরুকুল নষ্ট করিতে বসিয়াছে। কিন্তু মহারাজ, আপনি একটা কাকের জন্য এমন কুকর্ম্ম করিবেন না, শকুনির কপট ক্রীড়ায় জয়ী হইতেছেন বলিয়া আনন্দে অধীর হইতেছেন, কিন্তু এই পাশাই যে শেষে শর হইয়া সর্ব্বনাশ করিবে, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? এই পাশা খেলা হইতেই ভয়ঙ্কর শত্রুতা আরম্ভ হইবে; শেষে যুদ্ধ বাধিবে, তাহা কি আপনি দেখিতে পাইতেছেন না? হায়! হায়! কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুপ্ত সিংহকে জাগরিত করিতে চায়? শকুনি যে দেশ হইতে আসিয়াছে, সেই দেশেই প্রস্থান করুক, পার্ব্বতীয় মুষা পর্ব্বতেই গমন করুক, কুরুকুল রক্ষা হউক।"

দুর্য্যোধন তাহা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, গর্জ্জন করিয়া বিদুরকে বলিতে লাগিলেন, "আমরা শুধু সর্পকে পুষিতেছি! আপনি ধর্ম্মের ভান করেন, ধার্ম্মিক সাজেন; আর দিন রাত যাহাতে আমাদের ক্ষতি হয়, শত্রুগণের লাভ হয়, তাহাই পরামর্শ দেন। আমরা শত্রুকে পরাজিত করিয়া লাভবান হইয়াছি, ইহা আপনার সহ্য হইবে কেন? কিসে আমাদের হিত হয়, কিসে অহিত হয়, তাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না। আমাদের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, আমাদের ভাল মন্দ আমরা বেশ বুঝিতে পারি। আপনার ন্যায় নির্লজ্জের মুখ দেখিতে চাহিনা, যেখানে ইচ্ছা গমন করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের প্রতিবাদ করিলেন না। বিদুর মর্ম্মপীড়িত হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। একবার ভাবিলেন, এইস্থান হইতে প্রস্থান করি, আবার ভাবিলেন, থাকি, যদি কিছু উপকার করিতে পারি, আর ভীষ্মাদি সকলে সকল দেখিয়া শুনিয়া, অবাক হইয়া বিষণ্ণ মনে বসিয়া রহিলেন।

আবার পাশাখেলা আরম্ভ হইল। আজ যুধিষ্ঠিরের বিদ্যা বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। শত্রুগণ

---

* সভাপর্ব্ব ৪৯—৫৫।

তাঁহাকে যে ভাবে পরিচালন করিতেছে, তিনি সেই ভাবেই পরিচালিত হইতেছেন। দুষ্ট শকুনি বলিলেন, "এখন কি পণ রাখিবে? মহারাজ চক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের আর আছে কি"? অমনি যুধিষ্ঠির অধীর হইয়া একে একে ভ্রাতৃগণকে পণ রাখিলেন, আর হারিলেন! শেষে নিজ শরীর পণ রাখিলেন, আর হারিলেন। তখন শকুনি বলিলেন, "এখন দ্রৌপদীকে পণ রাখ, আর আছে কি, যে পণ রাখিবে?" অমনি যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন, আর অমনি হারিলেন, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার জিত হইয়াছে? কাহার জিত হইয়াছে?" শকুনি উত্তর করিলেন, "আপনার জিত হইয়াছে। দ্রৌপদীকেও জিতিয়া লইয়াছি।" অমনি অন্ধরাজ আনন্দে উন্মত্ত হইলেন, হো হো করিয়া উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন আনন্দে আটখানা হইয়া সেই সভামধ্যে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে মহানন্দের ঝটিকা কুরুকুলকে মহা আন্দোলিত করিতে লাগিল। তাহারা বুঝিল না যে তাহাতে তাহাদের মূলোৎপাটন হইতে লাগিল।

এখন দুর্য্যোধন এক ভৃত্যকে বলিলেন, "দ্রৌপদীকে এই সভায় লইয়া এস।" সে দ্রৌপদীর নিকট গমন করিয়া সকল কথা বলিল। তখন দ্রৌপদী উত্তর করিলেন, "আগে গিয়া সভায় জিজ্ঞাসা কর, রাজা যুধিষ্ঠির প্রথমে আপনাকে পণ রাখিয়া হারিয়াছিলেন কিনা। আর তাহা হইলে, তৎপরে তিনি আমাকে পণ রাখিতে পারেন কিনা।" সে আসিয়া সভায় তাহা জানাইল। তাহা শুনিয়া দুর্য্যোধন ক্রোধে অন্ধ হইলেন। দুঃশাসনকে বলিলেন, "তুমি যাও, দ্রৌপদীকে লইয়া আইস, পঞ্চ পাণ্ডব দেখিয়া ভীত হইও না।"

দুঃশাসন আজ্ঞা মাত্রেই আনন্দে প্রস্থান করিল। অন্তঃপুরে উপস্থিত হইল। দ্রৌপদী তাহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের মহিলাগণের আশ্রয় লইবার জন্য ছুটিলেন। পাপাত্মাও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, দীর্ঘ কেশ ধরিয়া ফেলিল। দ্রৌপদী সে সময় একবস্ত্রা ছিলেন, তাহা জানাইলেন, কত অনুনয় বিনয় করিলেন কিছুতেই ফল হইল না। দুঃশাসন তাঁহার কেশ ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল, আর বলিতে লাগিল, "তুমি একবস্ত্রাই হও, আর বিবস্ত্রাই হও, আমি তোমাকে সভায় লইয়া যাইব। তুমি এখন আমাদের দাসী।

দ্রৌপদীর চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন, সকলের নিকটেই আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছেন, তথাপি গান্ধারীদেবীর দয়া হইল না, ধৃতরাষ্ট্রের অন্য মহিলারাও বাধা দিলেন না। দুরাচার দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে সেই সভা মধ্যে লইয়া গেল। তথায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাবীরগণ বসিয়া আছেন, শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্র বসিয়া হাসিতেছেন তথাপি কেহই এই উপায়হীনা, সহায়হীনা, নিরপরাধিনী রাজ নন্দিনীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন না। তখন পাঞ্চালী কাঁদিতে কাঁদিতে দুঃশাসনকে বলিলেন, "এ সভায় আমার কত গুরুজন আছে, আমাকে বিবস্ত্রা করিও না। আমাকে পণ রাখিলেও স্বামীগণের নিন্দা করিতে পারিনা। কিন্তু এই মহাসভা কিরূপে এই অত্যাচারের প্রশ্রয় দিতেছেন, বুঝিতে পারিনা। তাহাতেই জানিতেছি, কৌরবগণ ধর্ম্মবিহীন হইয়াছেন, ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তব্যের পথ

হইতে স্খলিত হইয়াছেন।" দুঃশাসন তাহা শুনিয়া আরও বলের সহিত তাঁহার কেশ আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি সে যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন।

কর্ণ দুঃশাসনকে বলিলেন, "যে পঞ্চ স্বামী বরণ করিয়াছে, সে অসতী। তাহাকে সভামধ্যে উলঙ্গ করিলে দোষ হয় না। তুমি পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর বস্ত্র কাড়িয়া লও।" অমনি পাণ্ডবগণ, কেহ পাছে গাত্র স্পর্শ করে এই ভয়ে, সমুদয় গাত্র বস্ত্র খুলিয়া ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে গিয়া রাখিয়া আসিলেন।

এখন ভয়ঙ্কর দৃশ্য আরম্ভ হইল। কৃষ্ণার পরিধানে এক খানি মাত্র বস্ত্র। দুর্ব্বৃত্ত দুঃশাসন কর্ণের কথায় তাহাও আকর্ষণ করিতে লাগিল, সেই সভামধ্যে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। দ্রৌপদী অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, কত প্রকারে সকরুণ বিলাপ করিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির নিকট কাতর কণ্ঠে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন,তথাপি কেহই দুঃশাসনের কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন না। তখন দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের প্রতি সজল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাদের সাহায্য, তাহাদের করুণা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রাণের প্রিয়তম ভার্য্যাকে এইরূপ লোকাতীত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে দেখিয়া কি পাণ্ডবগণ স্থির থাকিতে পারিলেন ? যখনই যে পাণ্ডব অধীর হইতে লাগিলেন, তখনই যুধিষ্ঠির চক্ষুর ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে শাসন ও শান্ত করিতে লাগিলেন। কাজেই পাণ্ডবগণ মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিলেন, আর অসাধারণ ধৈর্য্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এখন দ্রৌপদীর দুঃখ ও দুর্দ্দশার চরম আরম্ভ হইল। দুরাচার দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র কাড়িয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার শরীরে যত বল ছিল, সমুদয় প্রয়োগ করিতে লাগিল। দ্রৌপদী এখন উপায়হীন হইয়া, মন প্রাণ দিয়া, যিনি দীন দুঃখীর অবলম্বন, বিপদভঞ্জন, তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। স্থির ও ধীরভাবে, শান্ত ও সমাহিতচিত্তে তাঁহার চিন্তা করিতে লাগিলেন, তিনি তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া, বাহ্য ব্যাপার ভুলিয়া, এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া দাড়াইয়া রহিলেন। দুঃশাসন তাঁহার শরীরের সমুদয় শক্তি দ্বারা তাঁহার বস্ত্র টানিতে লাগিল, তথাপি তাঁহাকে বিবস্ত্র করিতে সমর্থ হইল না। শেষে সেই পাপাত্মা পরিশ্রান্ত হইয়া আপনা হইতেই বিরত হইল। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বসিয়া পড়িল।

যখন পাপাত্মারা দেখিল, তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল না, তখন কর্ণ দুঃশাসনকে বলিলেন "এই দাসীকে গৃহে রাখিয়া এস।" তখন সে আবার দ্রৌপদীর চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল। তখন কৃষ্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।" এই বলিয়া তিনি সসম্ভ্রমে সভাস্থ সমুদয় গুরুজনকে প্রণাম করিলেন, আর বলিলেন, "আমাকে যেরূপ কেশাকর্ষণ করিয়া বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল, তাহাতে আমি প্রথমে প্রণাম করিতে অবসর পাইনাই। সে অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আপনারা বলুন, আমি অজিতা কি পরাজিতা ?"

ভীষ্ম বলিলেন ,"তাহা জানিনা, তবে এই জানি, নিশ্চয় এই বংশ ধ্বংস হইবে।" তথাপি কৃষ্ণা সেই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ তুলিতে লাগিলেন। তাহাতে ভীষ্ম বলিলেন, "যুধিষ্ঠির ধর্ম্মাত্মা, তিনিই উত্তর করুন।"

যুধিষ্ঠির কি উত্তর করিবেন ? শকুনি যে প্রবঞ্চনা দ্বারা পরাজিত করিয়াছে, তাহার ত প্রমাণ নাই। কাজেই তিনি অধোবদনে বসিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু বিদুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না তিনি বলিলেন, "যুধিষ্ঠির প্রথমে নিজকে পণ রাখিয়া বিজিত হওয়ায় প্রভুত্ব বিহীন হইয়াছেন। তৎপরে তাঁহার স্ত্রীকে পণ রাখিবার অধিকার তাঁহার ছিল না। বিশেষ দ্রৌপদী তাঁহার একার স্ত্রী নহেন।"

অমনি কর্ণ গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "দাসের যাহা কিছু থাকে, সকলই তাহার প্রভুর। পাণ্ডবগণ কৌরবগণের দাস হইয়াছে, তাহাদের স্ত্রীও কৌরবগণের দাসী হইয়াছে।" তৎপরে কর্ণ দ্রৌপদীর উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "তুমি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই বরণ করিতে পার। দাসীর তাহাতে দোষ হয় না।"

পাপাত্মা দুর্য্যোধন তাহা শুনিয়া প্রশ্রয় পাইল। স্বীয় বাম উরুদেশের বস্ত্র অপসারিত করিয়া তাহা দ্রৌপদীকে দেখাইল, আর কুটিল কটাক্ষ করিতে লাগিল। সেখানে কত গুরুজন বসিয়া আছেন, তাহাতে সে বিন্দু মাত্র ও লজ্জিত হইল না।

ভীম আর থাকিতে পারিলেন না। হুহুঙ্কার ছাড়িয়া সেই সভামধ্যে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "রে পাপাত্মা দুর্য্যোধন, যুদ্ধে গদার প্রহারে তোর ঐ বাম উরু ভঙ্গ করিয়া তোকে নিহত করিব। আর দুঃশাসন, যুদ্ধক্ষেত্রে তোর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্ত পান করিব, এই আমার ভীষণ প্রতিজ্ঞা। সভাস্থ সকল সাক্ষী থাকুন, সাক্ষী থাকুন।"

এমন সময় ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরে বহু শৃগাল ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, গর্দ্দভ সকল চীৎকার করিতে লাগিল, বিকটাকার পক্ষী সকল কর্কশ কলরবে প্রবৃত্ত হইল। ধৃতরাষ্ট্র তাহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ভীষ্মের বাক্য, বিদুরের সৎপরামর্শে যিনি ঠিকপথে আসেন নাই, কুকার্য্য হইতে বিরত হন নাই, তিনি এখন ভয়ে সৎপথে আসিলেন। তাঁহার মনে বংশ নাশ ভয় উদিত হইল। তিনি পলকের মধ্যেই পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। মৃদু মধুর ভাবে, মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন, "পাঞ্চালি, তুমি আমার পুত্রবধূগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সতী ও পরম ধার্ম্মিক। আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। যাহা চাহিবে, তাহাই দিব।" তিনি বৃক্ষের মূলোৎপাটন করিয়া, মস্তকে জল ঢালিতে লাগিলেন।

দ্রৌপদী উত্তর করিলেন, "রাজন্, যদি বর দিবেন, তবে এইবর দিন যে রাজা যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলেন।" অন্ধরাজ এমন চক্ষুস্মান হইয়াছেন। বলিলেন "সে বর ত দিলামই, অন্য বর লও। তুমি একটী বরের যোগ্য নহ।"

তখন পাঞ্চালী বলিলেন, "রাজন্, তবে এই বর দিন যে আমার অন্য চারি স্বামীও দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলেন।" ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "তাহাই হইল। এখন তৃতীয় বর। তোমার ন্যায় কন্যারত্নকে দুই বর দিয়াও মন পরিতৃপ্ত হইতেছেনা।"

কৃষ্ণা তখন উত্তর করিলেন, "মহাত্মন্, লোভ ধর্ম্ম নষ্ট করে। এজন্য তৃতীয় বর চাহিনা। আমার স্বামীগণ নিতান্ত নীচদশায় পতিত হইয়াছিলেন। এখন যে তাঁহারা দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলেন, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এখন তাঁহারা সৎকার্য্য করিয়া উন্নত হইতে পারিবেন।"

সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইলেন। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, দ্রৌপদী কি অবোধ মেয়ে! বিস্তৃত রাজ্য, বিপুল ঐশ্বর্য্য পুনরুদ্ধারের এমন সুযোগ পাইয়াও ছাড়িয়া দিলেন!

কর্ণ পাণ্ডবগণের এত দুর্দ্দশা করিয়াও, এত দুঃখ দিয়াও, পরিতৃপ্ত হন নাই। এখন তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া বলিলেন, "পত্নীই পাণ্ডবের গতি।"

রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে গমন করিলেন। করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "রাজন্, আপনি আমাদের সকলেরই প্রভু অধীশ্বর। চিরদিনই আমরা আপনার দাস। আমরা আপনার কোন্ কার্য্য করিব, আজ্ঞা করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র মধুর স্বরে বলিলেন, "বাবা যুধিষ্ঠির, তোমার মঙ্গল হউক। আমি আজ্ঞা করিয়াছি, তোমরা সস্ত্রীক স্বরাজ্যে গমন কর। সুখে রাজ্য শাসন কর। আমার বিপুল বংশে একমাত্র তুমিই জ্ঞানী, তুমিই ধার্ম্মিক। মনে রাখিবে, যেখানে জ্ঞান সেখানেই ক্ষমা। যিনি শত্রুতা পাইয়া মিত্রতা প্রদান করেন, তিনিই মহাত্মা।'

(ক্রমশঃ)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

কবি-কুঞ্জে।

যখন কবির কুঞ্জ কুটীরে
তখন সে ছিল ঘুমে,
প্রভাত স্বপন নয়নে তাহার
ছিল সে আনন্দধূমে;
অরুণ তখন তরুণ রাগেতে
হেসেছে গগনোপরে,
কোকিল পাপিয়া, অমিয় ঢালিয়া
গেয়েছে করুণ স্বরে!
বেলের কলিকা প্রথম প্রভাতে
ফুটিয়া হয়েছে ফুল,
বনে চাঁপা-রাণী তুলে মুখ খানি
নাই যে তাহার তুল!
রূপসী যূথিকা হাসিয়ে তখন
ঢেলেছে মধুর বাস!
মন্দ মলয় গন্ধ লুটিয়ে
ছেড়েছে মৃদুল শ্বাস,
ধীর তরঙ্গা স্নিগ্ধ তটিনী
ধরি কুলু কুলু তান,
দগ্ধ হৃদয়ে মুগ্ধ করিয়ে
গেয়েছে মধুর গান!

হৃদয়-কানন উঠেছিল হেসে
ফুটেছিল প্রাণে ফুল,
আনন্দ সাগর উছলি উঠেছে
পাইনি তখন কূল!

তখন—

প্রকৃতির ছবি হৃদয়ে জড়ায়ে
আসন গড়িনু তাতে,
আকুল অন্তর ডাকিল কবিবে
ধরিয়ে দুখানা হাতে!
তবুও তাহার ভাঙ্গিল না ঘুম
(সে যে) ভাবের স্বপন হেরে,
কাব্য-কানন কবিতার বন
পারেনা আসিতে ছেড়ে।
কহিল না কথা তবু কি উল্লাস
বহিছে প্রাণের মাঝে,
বীনার ললিত সুতান জিনিয়ে
আজো সে পুলক বাজে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

স্বরাজ।

(১৯)
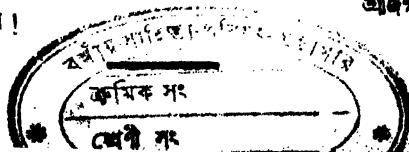
রুশদেশ আধুনিক অরাজক-সমাজ-বাদের জন্মভূমি। আজ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র রুশদেশেই রাষ্ট্র মার্ক্স-(Karl Marx)-প্রচারিত সমাজ-তন্ত্র-বাদ (State-socialism) প্রকাশ্যে বরণ করিয়া তদনুরূপ গণতন্ত্র (Democracy) সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। শক্তি-বিবর্জ্জিত, প্রেমে প্রতিষ্ঠিত নিরুপদ্রব অসহযোগদ্বারা রাষ্ট্রে বিপ্লব উপস্থিত করিবার আধুনিক পদ্ধতির ও প্রচার রুশদেশেই। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে রুশদেশে শতকরা অন্ততঃ ৬০ জন ছিল কৃষক। বিগত যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে রুশদেশে শতকরা অন্ততঃ ৮৫ জন গ্রামে বা ছোট সহরে বাস করিত। য়ুরোপের সকল দেশের মধ্যে রুশদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল সব চেয়ে বেশী। আর ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জার্ম্মান বন্ধু আমায় বলিতেন যে রুশদেশ আদৌ য়ুরোপে নয়, ওর সবটাই এশিয়াতে। আর টলষ্টয় বলিতেন যে রুশদেশীয় কৃষকদের ন্যায় ধর্ম্মভীরু ও ধর্ম্মপ্রাণ লোক দুর্ল্লভ। আমাদের দেশের অবস্থার সহিত বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে রুশদেশের অবস্থার এতটা সাদৃশ্য আছে বলিয়াই রাষ্ট্র ও শাসনের আলোচনায় রুশদেশের কথা তুলিয়াছি।

কিন্তু বল বা শক্তি (Force) ও শক্তিমূলক শাসনের প্রয়োজন শুধু পাশ্চাত্য যবন সমাজে ছিল, আছে ও থাকিবে, তাহা নয়। এই পবিত্র আর্য্যাবর্ত্তেও ইহার প্রয়োজন ছিল, আছে ও বহুশতাব্দী যাবৎ থাকিবে। আজ না কি ভারতে রাবণ রাজত্ব, সেকালে ভারতে রাবণ রাজত্ব ছিল না। কিন্তু রাবণ রাজাকে পরাস্ত করিয়া রাম-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পুণ্যাবতার রাম ও অতুল-সংযমী লক্ষ্মণকে কত না বিপুল বল বা শক্তি আহরণ ও প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং' এই মহামন্ত্র যে দেশে প্রচারিত হইয়াছিল, সে দেশের সাধারণ লোকের কথা ছাড়িয়া দিই, তথায় তপস্বী মুনিগণই বা সর্ব্বথা কোপ-বিমুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন কই ? যে পুণ্যভূমিতে সাধারণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের জন্য নিষ্কাম ধর্ম্মের দুঃসাধ্য মহান্ আদর্শের প্রথম প্রচার, সেই দেশেই ত আবার অবতীর্ণ ধর্ম্ম যুগে যুগে "পরিত্রাণায় সাধুনাম, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" বল বা শক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অহিংসা পরম ধর্ম্ম যে দেশে প্রচারিত হইয়াছে, সে দেশেই বা পুণ্যশ্লোক রাষ্ট্র পতি অশোক কয়দিন স্বীয় রাষ্ট্রে অহিংসা ধর্ম্ম পালন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন পদ্ধতি ও শাস্তি-বিধান আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তখনও এদেশে প্রবল শক্তি, শক্তি-মূলক কঠোর শাসন, ও প্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রয়োজন ছিল। পুণ্যভূমি আর্য্যবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ প্রযত্নের পরেও ম্লেচ্ছগণ নাকি "প্রতারো নভবন্তি।" কিন্তু শক্তি ও শক্তিমূলক শাসন সেখানেও মানব সমাজে চিরস্থির। সে শক্তি, সে শাসন শুধু ম্লেচ্ছের না-ও হইতে পারে, শুধু আর্য্যের না-ও হইতে পারে। যাহারই হউক্ তাহার প্রয়োজন আরও বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত থাকিবে। মানুষের পেটে যতদিন ক্ষুধা আছে, মানুষ, যত দিন কাম ক্রোধের অধীন, লোভ যতদিন মানুষকে কর্ম্মে নিয়োগ

করিবে, ঈর্ষ্যা দ্বেষ বা প্রতিহিংসা যতদিন মানব অন্তরে সময়ে সময়ে জ্বলিয়া উঠিবে, সমাজে যতদিন একজন, এক বা বহুজনের উপর—পুরুষ স্ত্রীর উপর, সুজাত হীন জাতির উপর, সবল দুর্ব্বলের উপর, ধনী দরিদ্রের উপর, পণ্ডিত মূর্খের উপর, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকের উপর—প্রতিপত্তি-লাভের বাসনা অন্তরে পোষণ করিবে, বিভীষিকা যতদিন মানবমনে চির-নির্ব্বাপিত না হয়, আর যতদিন মানবের বাহুতে বল, মস্তিষ্কে উদ্ভাবনী শক্তি ও মনে তেজ আছে, ততদিন সমাজে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবার জন্য মানবের পক্ষে শক্তি ও শক্তি-মূলক শাসনের প্রয়োজন থাকিবে। সে শক্তি ও শাসন নায়ক-পিতৃগণেরই হউক, দলপতির হউক বা রাষ্ট্রপতিরই হউক, তাহার প্রয়োজন এই পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তেও আছে ও বহু শতাব্দী থাকিবে।

শক্তি ও শাসনের প্রয়োজন আছে বলিয়াই যে রাষ্ট্র তথাকার সর্ব্বসাধারণকে শুধু শাসনভয়ে চালিত করিবে, ইহা কাজের কথা নয়। মানুষ ভয়ে কাজ করে সত্য, আবার সেই মানুষই প্রেমে প্রণোদিত হইয়া কাজ করে। ভয় যদি মানুষকে সংযত রাখে, প্রেম মানুষের কর্ম্মের উৎস। সমাজ বা ধর্ম্মসঙ্ঘের কথা বলিতেছি না, রাষ্ট্রের কথা বলিতেছি। রাষ্ট্র মানব মনের এই প্রেম বৃত্তিকে অবহেলা করিতে পারে না। রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য, মানবের স্বীয় স্বীয় জীবনে তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবে। মানবের প্রেম তখন স্বাধীনতার উন্মুক্ত আকাশে আপনা আপনি মানবকে কর্ম্মের পথে লইয়া যাইবে। যে রাষ্ট্র শুধু শাসনভয়ের কথাই বোঝে, কিন্তু মানব মনের প্রীতির পূর্ণবিকাশের পথে অন্তরায় বা তাহার প্রতি উদাসীন, সে রাষ্ট্র কখনও সুরাষ্ট্র নহে। মানব ভাঙ্গিতে জানে বটে। ভাঙ্গিবার ওস্তাদ মানুষের মত আর কে? কিন্তু গড়িতেও মানব স্বভাবতঃ চায়। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সভ্যসমাজে যাহা কিছু গড়া হইয়াছে তাহার কতটুকু রাষ্ট্রের নিজের সৃষ্টি? রাষ্ট্রের কথা ভুলিয়া গিয়া মানব স্বীয় অন্তরের প্রীতিতে বিভোর হইয়া আপন মনে আনন্দে গঠন করিয়া গিয়াছে।

প্রধানতঃ মানুষ লইয়াই রাষ্ট্র। সভ্য রাষ্ট্রমাত্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটি মূল কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পৃথক্ সম্পত্তি (Private property) যদি সমাজে রাখিতে হয়, তবে রাষ্ট্র বলিবে—চুরি করিবে না, দস্যুবৃত্তি করিবে না, প্রবঞ্চণা করিবে না, অপরের সম্পত্তির নাশ বা অপচয় করিবে না। পৃথক্ সম্পত্তি থাকুক বা নাই থাকুক, রাষ্ট্র বলিবে—জখম বা খুন করিবে না, অপরের শরীরে বলপ্রয়োগ করিবে না, অপরের গতিবিধির স্বাধীনতার হানি করিবে না, অপরের চিন্তার স্বাধীনতার হানি করিবে না। মানুষ লইয়াই যখন রাষ্ট্র, মানুষগুলিকে রক্ষা না করিলে রাষ্ট্ররক্ষাও হয় না। মানুষগুলি রক্ষা পাইলে, সুস্থ সতেজ হইলে, তবে তাহাদের সহকারিতায়, তাহাদের অর্থসাহায্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব। কিন্তু সবদেশেই সভ্যরাষ্ট্র এ সকল নিষেধাজ্ঞার উপর এক নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করে—রাষ্ট্রদ্রোহী হইবে না। ইহার যে কোনও নিষেধ-বিধি অমান্য করিলে রাষ্ট্র তাহার প্রহরীর সাহায্যে শাসন করে।

প্রত্যেক মানুষের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততদূর পর্য্যন্ত সে অপরের সম্পত্তি, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে পারে।

আততায়ীর হাত হইতে তাহার প্রাণরক্ষার জন্য রাষ্ট্রপ্রহরী রাখিয়াছে বটে, কিন্তু আত্ম-রক্ষার জন্য যদি সত্য সত্যই প্রয়োজন হয়, সে প্রহরীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে বাধ্য নহে। সে তখন অপরের বিনাশদ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে পারে। ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক মানুষের এই যেমন আত্মরক্ষার অধিকার, সমষ্টিভাবে রাষ্ট্রেরও এই অধিকার। রাষ্ট্রের এই আত্মরক্ষার অধিকার তাহার আপন প্রজার বিরুদ্ধে ও পররাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। কোন রাষ্ট্রের বাহিরের শত্রু যখন সেই রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিয়া তাহার রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করিতে চায়, সেই রাষ্ট্রের তখন অধিকার আছে যে, সে আপন রাষ্ট্রের লোকদিগকে বলিবে—"এসো, তোমরা আমাকে রক্ষা কর। তোমাদের অর্থে, তোমাদের সামর্থ্যে, প্রয়োজন হইলে, তোমাদের প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া, আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর। নতুবা তোমাদেরই সর্ব্বনাশ।" সমষ্টিভাবে রাষ্ট্র এই যে অধিকারের দাবী করে, ইহার সহিত মানুষের স্বীয় ব্যক্তিগত অধিকারের বিরোধ। এ বিরোধের মীমাংসা আজও হয় নাই। রাষ্ট্র এ দাবী করিয়াছে ও যথা সম্ভব দাবী আদায় করিয়াছে। আমাদের দেশে বিগত যুদ্ধে এদাবী খুব অল্পই আদায় হইয়াছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক, এ দাবী যথাসম্ভব কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়াছিল। যে এদাবী অগ্রাহ্য করিয়াছিল বা করিবার উপদেশ দিয়াছিল তাহাকেই শাসন করিয়াছে।

শাসনের কথা ত অনেক বলিয়াছি। পোষণ কি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়? ধর্ম্মের বেলায় বলিয়াছি যে সচরাচর লোকের চোখে পড়ে ধর্ম্মের নিবর্ত্তনা বিধি, প্রবর্ত্তনা তত নয়। রাষ্ট্রের বেলায় ও তাহাই। ইহা করিবে না, উহা করিবে না—এই নিবর্ত্তনা বিধি লইয়া মানুষ ও রাষ্ট্র এত ব্যস্ত হইয়া পড়ে যে, প্রবর্ত্তনা যে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য তাহা যেন লোকে বিস্মৃত হয়। আর এই বিস্মরণ যে শুধু আমাদের দেশেই—তাও নয়। তবে আমাদের দেশে রাষ্ট্র (state) ও শাসন (Government) এত অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে রাষ্ট্রের নামই হইয়াছে "গভর্ণমেণ্ট্" (Government)। তাই বলিয়া আমাদের দেশে ব্রিটিশ রাষ্ট্র প্রবর্ত্তনা বা পোষণ ব্যবস্থা আদৌ করে নাই একথা বলা চলে না।

করুক বা না করুক, রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য পোষণ কার্য্যের কয়েকটা মাত্র উল্লেখ করিতেছি। তাহা হইতেই দেখা যাইবে যে পোষণ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সুযোগ ও দায়িত্ব কতটা। রাষ্ট্রের সাধারণ লোকের স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থার জন্য রাষ্ট্র দায়ী। একাজে প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীর সহকারিতা প্রয়োজন। শিশু ভূমিষ্ট হইবার সময় হইতে তাহার শৈশবকাল পর্য্যন্ত তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রধানতঃ পিতামাতা দায়ী হইলেও, পিতামাতা যেন কর্ত্তব্য অবহেলা করে, তখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা। আর এ দায় উদ্ধার শুধু শাসনদ্বারা হয় না। বালকবালিকাদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার আধুনিক রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বলিয়া সবদেশেই স্বীকার করিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে সাধারণ লোকের মধ্যে নিম্নশিক্ষা বিস্তারই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। উচ্চ অঙ্গের জ্ঞানান্বেষণ ও তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণ রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য তালিকার বাহিরে। কিন্তু দুটী কথা মনে রাখিলে এ মতের সমর্থন করা যায় না। প্রথম, বিশ্ববিদ্যালয় ও মৌলিক তত্ত্বানুসন্ধান অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, রাষ্ট্রের অর্থ সাহায্য না হইলে তাহা

চলিতে পারেনা! পুরাকালেও রাজার অর্থসাহায্যে একাজ হইত। আর, এই জ্ঞানান্বেষণের সাহায্য না হইলে কৃষি বা শিল্পের উন্নতি অসম্ভব। জ্ঞানান্বেষণের জন্য না-ই হউক, কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্যও রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করা। দ্বিতীয়, সকল দেশেই কাজে দেখা গিয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নশিক্ষার প্রচার অতি দ্রুত হয়। তার পর শিশু বড় হইয়া নিম্নশিক্ষা লাভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য, ইহা দেখা যে কারখানায় বা অপর কার্য্যক্ষেত্রে অনুপযোগী কার্য্যে বা অতিরিক্ত পরিশ্রমে বালকবালিকাগণ ভগ্নস্বাস্থ্য না হয়। বড় হইয়া তাহারা যদি শিল্প বাণিজ্য বা কৃষি-কার্য্যে লাগিতে চায়, সমবায় পদ্ধতিতে (Co-operative Principle) মূলধনের যোগাড় ব্যাপার রাষ্ট্রের পরামর্শ ও সাহায্য বাঞ্ছনীয়। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির উন্নতিকল্পে ব্যবস্থা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। বাণিজ্য ও শিল্পবিস্তারের সহায়তা রাষ্ট্রের যেমনই কর্ত্তব্য তেমনিই প্রয়োজন ধনীদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যে শ্রমজীবিগণ শিল্প সামগ্রী নির্ম্মাণের কল নহে, তাহারা দেহ মন আত্মায় গঠিত মানুষ। তাহাদের বাসস্থান পারিশ্রমিক প্রভৃতি ব্যাপারে শ্রমজীবিদের স্বার্থরক্ষায় সহায়তা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। আর এই কলকারখানার যুগে যখন অত্যধিক মূলধন অল্পসংখ্যক ধনীর হাতে আসিয়া ধনীর অত্যন্ত ধনবৃদ্ধি ও দরিদ্রের অত্যন্ত দারিদ্র্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা উপস্থিত করিয়াছে তখন রাষ্ট্রের আর এক কর্ত্তব্য উপস্থিত ধন বিভাগে যাহাতে সমাজে যথা সম্ভব সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রের ব্যয়ভার ধনীর স্কন্ধে বেশী চাপাইতে হইবে।

এ তালিকায় অনেক কাজ আছে যাহা রাষ্ট্র নিজে না করিলেও রাষ্ট্র লোপ পায় না মনে কর মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও মাদক সেবনের মাত্রা স্থির করিবার ব্যাপারটা রাষ্ট্র আদৌ নিজ হাতে রাখিল না। এ ব্যাপারের পরিদর্শনের ভারও রাষ্ট্র নিজ হাতে রাখিল না। তাহাতে রাষ্ট্র লোপ পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। উপযুক্ত লোকে মাদক সেবন কমাইবার ব্যবস্থা করিলেই সমাজের কাজ চলিতে পারে। মনে কর রাষ্ট্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাতায়াতের পথ ও যান প্রস্তুতের ব্যবস্থা কিম্বা ডাক বা তারে চিঠি বা সংবাদ প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রে কিছুদিনের জন্য নিজ হাতে রাখিল না। তাহাও সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যদি রাষ্ট্র বজায় রাখিতে হয়, তবে যুদ্ধ বা বিপ্লবের সময় রেলগাড়ী, ডাক ও তার রাষ্ট্রকে নিজহাতে নিতে হইবে। আর পুলিস ও সৈন্য রাষ্ট্র নিজ হাতে রাখিতে বাধ্য। রাষ্ট্রের মধ্যে অপর কাহাকেও অধিকসংখ্যক পুলিস বা অধিকসংখ্যক সৈন্য রাখিবার অধিকার রাষ্ট্র দিতে পারে না। দিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা দুরূহ হইয়া পড়ে। ইহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—রাষ্ট্রের মূলভিত্তি বল বা শক্তি। আত্মরক্ষার মুখ্য উপায়, পুলিস ও সৈন্য, রাষ্ট্রের একচেটিয়া করিয়া নিজ হাতে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিতে হয় বলিয়াই যে আত্মরক্ষা শিক্ষাদান রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য পোষণ কার্য্যের তালিকার বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা নহে। রাষ্ট্রের মানুষগুলির দেহ, মন ও আত্মার স্বাস্থ্য রক্ষা ও পূর্ণবিকাশ যদি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য পোষণ কার্য্য বলিয়া মানিতে হয়, তবে ইহাও মানিতে হইবে যে ঐ মানুষগুলিকে সমষ্টিভাবে আত্মরক্ষা শিক্ষাদান রাষ্ট্রের অবশ্য কর্ত্তব্য।

(২০)

সর্ব্বম্ আত্মবশং সুখং। স্বাধীনতায়ই সুখ। সুখের চেয়েও বড় কথা—স্বাধীনতায়ই আত্মবিকাশ। মনে কর আমি একলা আছি, সমাজেও নয় রাষ্ট্রেও নয়। আমার স্বাধীনতার তখন সীমা নাই। যাই আমি সমাজে আসিলাম, তুমি ও আমি দুইজনে মিলিয়া মিশিয়া কাছা কাছি থাকিতে আসিলাম, অমনি আমার অধিকারের আমার স্বাধীন বাক্যের ও কার্য্যের একটা সীমা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার স্বাধীনতার যে সীমা রেখা টানা হইল তাহা যেন তোমার অধিকারের সীমা। সমাজের সকল লোকের অধিকারের একটা সামঞ্জস্য করিয়া সমাজ প্রত্যেকের স্বাধীনতার সীমা রেখা টানিয়া দেয়। কল্পিত অরাজক সমাজেও প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতার সীমারেখা থাকিবে। তবে এই স্বাধীনতা হ্রাসের একটা সার্থকতা আছে। সমাজে দশজনের সহিত থাকিলেই আত্মবিকাশের পূর্ণতা সম্ভব। তবুও সমাজ যদি স্বাধীনতার সীমা রেখা পাত এমন করিয়া করে যে তাহাতে তোমার আমার বিকাশ খর্ব্ব হয়, তবে সে সমাজ তোমার আমার পক্ষে কু-সমাজ। মাদ্রাজের "পঞ্চম" শ্রেণীর লোকেরা এখন নিজেদের "আদিদ্রাবিড়" নাম দিয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে হিন্দু সমাজ তাহাদের বিকাশ খর্ব্ব করিতেছে। তাহাদের পক্ষে উহা কু-সমাজ। সমাজের বেলায় যেমন, রাষ্ট্রের বেলায়ও তেমন। রাষ্ট্র আসিয়া আবার নূতন রেখাপাত করিয়া আমার স্বাধীনতার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। যাই সীমা অতিক্রম করিয়াছি, অমনই শাসন। শাসন অর্থ আমার অধিকার-হ্রাস। সুতরাং রাষ্ট্রের অধিকারে ও আমার অধিকারে বিরোধ। সে বিরোধে হার মানিতে হয় আমাকে। রাষ্ট্র ত হার মানিবে না। রাষ্ট্রের নির্দ্দেশ আজ্ঞা মানিতেই হইবে।

তার পরে ধর, আমাদের রাষ্ট্রে শ্যামবর্ণের বিভিন্ন জাতি (Race) আছে। তাহারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, এক জাতি অপর জাতির ভাষা বোঝে না। তাহাদের ধর্ম্মও বিভিন্ন, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও বিভিন্ন। সুতরাং আমাদের রাষ্ট্রে মানুষের স্বীয় ব্যক্তিগত জীবনে অধিকার আর একটু সঙ্কীর্ণ।

অধুনা আমাদের রাষ্ট্রে শাসক সম্প্রদায় গৌরবর্ণ ব্রিটিশ জাতীয়। শাসিত লোকগণ ভারতের শ্যাম ও গৌরবর্ণের বিভিন্ন জাতীয়। ভাষায়, ধর্ম্মে, আচার ব্যবহারে, রীতি নীতি ও শাসিত লোকগণ আবার শাসক সম্প্রদায় হইতে বিভিন্ন। ইহার ফলে শাসিত মানুষগুলির স্বীয় স্বীয় ব্যক্তিগত জীবনে অধিকার আরও একটু সঙ্কীর্ণ। এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, এই সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার দোষ যেমন আছে গুণ যে একেবারে নাই তাও নয়। ইহার ফলে মানুষগুলি কিছুটা নিরুদ্ধ বৃত্তি সহিষ্ণু হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভাষায়, ধর্ম্মে, আচার ব্যবহারে, রীতিনীতিতে, লোকগুলির সাদৃশ্য না থাকিলে "নেশান" বা জাতি (Nation) গড়ে না। আবার এসবে সাদৃশ্য থাকিলেই যে এক নেশান বা জাতি হয়, তাও নয়। "নেশান" ব্যাপারটা আমাদের দেশে ত খুবই নূতন আধুনিক য়ুরোপেও নূতন। আমাদের জাতি ছিল, গোত্র ছিল, বর্ণ ছিল, দল ছিল, রাষ্ট্র ছিল, "নেশান" ছিল না। সমগ্র ভারতবাসী ত দূরের কথা, আজও সব বাঙ্গালী ভাল করিয়া জমাট হইয়া এক নেশান হয় নাই। তবু যা হইয়াছে বাঙ্গালীই "নেশান" হইয়াছে।

আধুনিক য়ুরোপেও নেশান-বাদ ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব হইতে সুরু হইয়াছে, আজও তাহার জের চলিয়াছে। আমরা জাতীয়তাবাদ বা "নেশান"-বাদ (Nationalism) পাইয়াছি কিছুটা ইংলণ্ড হইতে; কিছুটা ইটালীর মাট্‌সিনির নিকট হইতে। "নেশান"-বাদের মূলকথা এই যে কোনও দেশে যখন সেই দেশবাসী অধিকাংশ লোক ভাষায়, ধর্ম্মে, সাহিত্যে, আচার ব্যবহারে, রীতি নীতিতে জমাট্ বাঁধিয়া এক "নেশান" হইয়াছে তখন সে "নেশান" বা জাতির অধিকার জন্মে যে সেই দেশে সেই "নেশান" বা জাতি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করিবে। উনবিংশ শতাব্দীতে অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া ইটালীয় ও হাঙ্গারীয় "নেশান" বা জাতি স্বাধীন রাষ্ট্রলাভের চেষ্টা করিয়াছে, তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গ্রীক্ ও সার্ব' প্রভৃতি "নেশান" বা জাতি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভের চেষ্টা করিয়াছে। ইংরাজ তখন এই সব "নেশানের" স্বাধীন রাষ্ট্রলাভের ইচ্ছার অনুমোদন করিয়াছে।

কিন্তু এই "নেশান"-বাদ (Nationalism) যেমন উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচারিত হইয়াছে, য়ুরোপের বড় বড় প্রবল রাষ্ট্রগুলি তেমনই আবার, সাম্রাজ্য-বাদ, (Imperialsm) প্রচার করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও প্রসারের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই সাম্রাজ্য বাদের ভিত্তি যদিও বল বা শক্তি (Force), সভ্য সমাজে প্রবল রাষ্ট্রগুলি সে কথা বলিতে লজ্জা বোধ করিয়াছে। তাহারা "জোর যার মুল্লুক তার" এ কথা না বলিয়া, বলিয়াছে যে গৌর বর্ণ "নেশানের" কর্ত্তব্য শ্যামবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ জাতির ভার বহন করা। যে সব জাতি আত্ম রক্ষা করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া সভ্যতার পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া গৌরবর্ণ "নেশান" গুলির কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডে এই সাম্রাজ্য বাদের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন ডিস্রায়েলি (Disraeli) ও ইহার প্রধান বন্দি কিপ্লিং (Kipling)। ইংরাজ জাতি "নেশান" বাদ ও সাম্রাজ্যবাদ, দুইই আনিয়াছে। ইংলিশ্, স্কচ্, ওয়েল্‌শ্, সব বাদ দিয়া নিজেদের নাম দিয়াছে "ব্রিটিশ নেশান"। আর নিজেদের সাম্রাজ্যের নাম, ব্রিটীশ সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য-বাদের প্রধান লীলাভূমি হইয়াছে আফ্রিকাতে; কারণ সেখানে বাহুবল, পাশব-শক্তি, জড়শক্তি প্রচুর থাকিলেও তাহাকে রাষ্ট্র শক্তিতে পরিণত করিবার মানুষ সেদেশে নাই ও আফ্রিকার মানুষগুলি সভ্যসমাজে তাহাদের মনের দুঃখ জোরের সহিত জাহির করিতে শেখে নাই।

এই "নেশান" বাদ বা জাতীয়তা বাদ (Nationalism) ও সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism) কথা স্মরণ রাখিলে বুঝা যাইবে আমাদের রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতা কি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইয়াছে। রাষ্ট্রের প্রবর্ত্তনা বিধি বা পোষণ কার্য্যের কথা পূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছি, আমাদের দেশে তাহা কতটা সুসম্পন্ন করা সম্ভব তাহার বিচারের সময়ও এই জাতীয়তাবাদ (Nationalism) ও সাম্রাজ্যবাদের (Imperialism) কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের শাসক-সম্প্রদায় আর এক "নেশানের", তাহাদের দেশ সাত সমুদ্র তের নদী পারে। শাসক-সম্প্রদায় যে "নেশানের," সেই ব্রিটিশ "নেশানের" পৃথক্ স্বার্থ আছে। আমাদের দেশের শ্যামবর্ণ শাসিতগণ "নেশান" হইয়া উঠিতেছে বটে, আর যতটা "নেশান" হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারও বেশী জাতীয়তার দাবী করিয়াছে। কিন্তু শাসকসম্প্রদায়ের যে বৃটিশ "নেশান" তাহার মত জমাট জাতীয়তা পৃথিবীর অন্যত্র

দুর্ল্লভ। ইংলণ্ডে দেখিয়াছি সাধারণ লোকের রাষ্ট্রপ্রীতিই হইয়াছে তাহাদের ধর্ম্ম। এমন স্বদেশপ্রীতিতে আত্মহারা জাতি পৃথিবীতে দুর্ল্লভ। সেই জাতি আবার সাম্রাজ্যবাদী।

আমাদের দেশে একই রাষ্ট্রের মধ্যে তবে নেশানে নেশানে সংঘর্ষ। আর এই বাষ্পশক্তি ও তড়িৎশক্তির যুগে, চীনদেশে মহামারী হইলে যখন বোম্বাই হইয়া মহামারী ভারতবর্ষে আসিয়া অধিষ্ঠান করে, ফ্রান্সে ছয়মাস যুদ্ধ চলিলে যখন কলিকাতায় শাকের দাম বাড়িয়া যায়, তখন শাসক সম্প্রদায়ের সুদূর দেশের "নেশানের" ও শাসিতগণের এ দেশের "নেশানের" স্বার্থের সংঘর্ষ কিছুই বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। রাষ্ট্রের আত্মরক্ষা যদি তাহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হয়, রাষ্ট্রের শাসকসম্প্রদায়ের স্বজাতিপ্রীতি যদি স্বাভাবিক, অনেক স্থলে এক "নেশানের" লাভ যদি অপর "নেশানের" লোকসান, তবে রাষ্ট্র কেমন করিয়া গঠনোন্মুখ "নেশানের" প্রতি তাহার প্রবর্ত্তনা বিধি বা পোষণ কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিবে? এ অবস্থায় শাসকসম্প্রদায় যদি রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে না পারে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। সত্যই বিস্ময়ের বিষয় হইবে যখন আমরা এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়া, এই রাষ্ট্র লইয়া, সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিব। সত্যই বিস্ময়ের বিষয় হইবে, যখন আমরা এই জাতীয়তাবাদী, সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গের স্কন্ধে সুখে সন্তুষ্টচিত্তে আরোহণ করিয়া শুধু আব্দার করিব, "হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ।"

(২১)

আমার মনে আছে, ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে একদিন সন্ধ্যাবেলা ভারত সভার (Indian Association) কমিটীর এক অধিবেশনের পরে বাড়ী ফিরিতেছি। আমার এক বন্ধু কথাটা তুলিলেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষ যাহাতে অষ্ট্রেলিয়া কানাডা প্রভৃতি উপনিবেশগুলির মত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হইতে পারে তাহার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলেই তিনি খুসী। আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম যে "বৃটিশ সাম্রাজ্যের মায়া আমার নাই। এই বৃটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিবার জন্য প্রাণভরা আকাঙ্ক্ষাও আমার নাই। এরূপ থাকিলে ভারতবর্ষ কিছুতেই পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না" বন্ধুটী বলিলেন, যে "তবে ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে এরূপ চেষ্টা করেন না কেন?" উত্তরে আমি জানিতে চাহিলাম, কিরূপ চেষ্টা, দুই চারিটী ইংরাজ বধ; না, কয়েকটা বক্তৃতা করিয়া দুই এক বৎসরে সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার চেষ্টা? আমি ত পাগল হই নাই।

তাহার কয়েক বৎসর পর যখন "হোমরুল" (Home Rule) আন্দোলন চলিতে লাগিল, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বক্তৃতায় অনেক সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যের দোহাই দিতেন। আমি ছিলাম এ বিষয়ে অবিশ্বাসী, নাস্তিক। তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে জানিতে পারিয়াছিলাম যে তাঁহারা সত্য সত্যই বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। এই বৃটিশ সাম্রাজ্য কালে নাকি বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবে বলিয়া তাঁহারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতেন। আমার মতে মানবের ভ্রাতৃত্ব সমুদয় পৃথিবীতে এই বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে

সাম্রাজ্যটীর কিছু সংস্কারের প্রয়োজন—নল্‌চে ও খোল দুইই বদ্‌লাইয়া সংস্কার করা দরকার। তাঁহারা এতটা অবিশ্বাসী ছিলেন না। ১৯১৮ সালের আগষ্টমাসে বোম্বাইয়ে দাশ মহাশয় বক্তৃতায় আবার বৃটিশ সাম্রাজ্যের দোহাই দিয়াছিলেন।

শ্রীমতী আনী বেসান্ত একবার এক ঘোষণাপত্রে বিভিন্ন প্রদেশের নায়কদের স্বাক্ষর চাহিয়াছিলেন। তাহাতে বাঙ্গালার কতিপয় নায়কের স্বাক্ষর দেওয়া হইয়াছিল। সেই পত্রে একটা কথা ছিল যে ব্রিটীশ সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেলে পৃথিবীর কি অশেষ দুর্গতি হইবে তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। স্বাক্ষরের পূর্ব্বে সেই পত্রের আলোচনার সময় আমি বলিয়াছিলাম যে সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেলেও ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড উভয়ই টিঁকিয়া থাকিবে। কয়েক শতাব্দী না হয় তেমন ঝিকিমিকি জ্বলিবে না। রোম সাম্রাজ্যের জীবিতকালেও লোকে ঠিক ঐরূপ মনে করিত। কিন্তু রোমের সাম্রাজ্য গিয়াছে বলিয়া ভগবানের রাজ্যে লোকের অভাব হয় নাই। গৌরব মণ্ডিত ইতিহাস লইয়া কত নূতন নূতন রাষ্ট্র ও কত নূতন নূতন জাতি পৃথিবীতে দেখা দিয়াছে। যে কোন সাম্রাজ্যের চেয়ে মানবজাতির আয়ু ও মূল্য বেশী।

কথাগুলি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সাম্রাজ্যই বল আর রাষ্ট্রই বল, উহা উপায় মাত্র। উদ্দেশ্য, সমষ্টিভাবে ইতিহাসে মানবের আত্মপ্রকাশ, ও ব্যষ্টিভাবে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে মানবের দেহ মন ও আত্মার বিকাশ। মানুষ যত বড়, রাষ্ট্র তত বড় নয়। যতদিন কোন সাম্রাজ্য দ্বারা, সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয়তঃ, মানবের বিকাশের সহায়তা হয়, ততদিন উহার আদর। তারপরে—সকল সাম্রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতার অলঙ্ঘ্য নিয়মে যে সাম্রাজ্য তাহার উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ, তাহার বিলয়; আবার তাহার স্থানে সেই ভাগ্যবিধাতারই নিয়মে নূতন রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য আসিয়া উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত হয়। সার্গোনের আকাডীয় সাম্রাজ্য হামুরাবীর বাবিলোনীয় সাম্রাজ্য, আসীরীয় সাম্রাজ্য, সেকেন্দারের মাসিডোনীয় সাম্রাজ্য, সীজারের রোমীয় সাম্রাজ্য, খোসরুর পারস্য সাম্রাজ্য, টাংদিগের চীন সাম্রাজ্য, জেঙ্গিস খাঁর মঙ্গোল সাম্রাজ্য, অটোমান্ তুরস্ক সাম্রাজ্য আর ভারতে অশোকের সাম্রাজ্য, আকবরের সাম্রাজ্য বা বৃটিশ সাম্রাজ্য—এসকলই সেই বিধাতার বিধানে উঠিয়াছে বা লয় পাইয়াছে বা পাইবে। যাহারা বিধাতার এই বিরাট প্রলয়লীলায় সহায়তা করে বা বিঘ্ন জন্মাইবার চেষ্টা করে তাহারা ক্ষুধা, ব্যাধি ও মৃত্যুর তাণ্ডব অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে। তোমার আমার ছোট খাটো সুখ দুঃখের কথা তাহাদের ভাবিবার অবসর নাই। ক্ষুধিত যখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে কি করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে, তাহাদের তখন উত্তর—যাও রাস্তা ঝাঁট দাও, নর্দ্দামা পরিষ্কার কর। শোকার্ত্ত মুমূর্ষু সান্ত্বনা চাহিলে তাহারা বলে—পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, এ খেলায়, শবের স্তূপ পর্ব্বত প্রমাণ হইবে, নরশোণিতের ধারা নদীর ন্যায় বহিবে। এ অভিনয় সুরু হইলে, তাল সাম্‌লাইতে পারে এমন লোক বিরল।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

উত্তর চরিতে তৃতীয় অঙ্ক।

মুরলা দাক্ষিণাত্যের ক্ষুদ্র নদী; গোদাবরী উদ্দেশ্যে বহিয়া চলিয়াছে। ও ত নদী নহে—ও যে অগস্ত্য পত্নী লোপামুদ্রার প্রেরিতা সখী, শিষ্যা, দাসী। দূতী হইয়া গোদাবরীর নিকট সংবাদ লইয়া যাইতেছে। নদীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী মূর্ত্তি ধরিয়া মানবী হইয়াছে। কবির ঐন্দ্রজালিক শক্তি জড়কে চৈতন্যময়ী করিয়াছে। অচেতনে প্রাণের প্রতিষ্ঠা আনিয়াছে। পথিমধ্যে অপর একটি নদী—"তমসা" আসিয়া মিলিল; সে নদী পাতাল গর্ভ ভেদ করিয়া গোদাবরীতে আসিয়া মিশিয়াছে। তমসা অপেক্ষাকৃত বড় নদী, প্রকৃতি বড় ধীর; মুরলার মত চপলা নহে। মুরলা বালিকা, তমসা প্রবীনা। তমসাও আজ শরীরিণী; ভাগীরথীর বরে অদৃশ্যা। তমসা সীতার অপেক্ষা বয়সে বড়, মান্যেও বড়, অভিন্ন হৃদয়া জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত। সীতার উপর তমসার বড়ই স্নেহ; তমসার উপর সীতার বড়ই শ্রদ্ধা। পাতালবাসিনী তমসা ভাগীরথীর আজ্ঞায় সীতার সখী বা সহচারিণী হইবার জন্য পঞ্চবটীতে চলিয়াছে।

দ্বাদশ বৎসরের পর রামচন্দ্র পঞ্চবটী দর্শনে আসিতেছেন। অগস্ত্যদেবের আশীর্ব্বাদ ও লোপামুদ্রার নির্ম্মাল্য মাথায় করিয়া অগস্ত্যাশ্রম হইতে ফিরিতেছেন। লোপামুদ্রা রামচন্দ্রে বড়ই স্নেহবতী আর স্নেহও স্নেহ পাত্রের সর্ব্বদা অনিষ্টাশঙ্কী। করুণাময়ী দেবীর ভয়—রামচন্দ্র পঞ্চবটীর "বধূসহবাস বিস্রম্ভ সাক্ষী" স্থানগুলি দেখিয়া পাছে মোহ যান; অতি গভীর শোকক্ষোভের সংবেগে পাছে তাঁর কোন প্রমাদ ঘটে—তাই গোদাবরীর উপর আদেশ হইল।

"গোদাবরি! তুমি ধীরে ধীরে পদ্মপরাগ সুরভি, "শীকরকণা-শীতল" তরঙ্গবাতাস দিয়া রামচন্দ্রের মূর্চ্ছিত জীবন তর্পিত করিও।"

রঘুকুলদেবতা গঙ্গাদেবীর ভয় আরও অধিক। তাই সরযূ-মুখে তিনি রামচন্দ্রের জনস্থান আগমনের কথা শুনিয়া গৃহাচারচ্ছলে সীতাকে লইয়া আসিয়াছেন। "শোকমাত্র দ্বিতীয়" রামচন্দ্রের পঞ্চবটী দর্শনে যদি কোন অনর্থ ঘটে; তবে সীতার দ্বারা সহজেই সে অনর্থের নিবারণ হইতে পারিবে। সীতাই যে রামচন্দ্রের মৌলিক সঞ্জীবনোপায়।

পাতালবাসিনী সীতা অবনীপৃষ্ঠচারিণী হইয়াও ভাগীরথীর বরে আজ মর্ত্ত্যলোকেরও অদৃশ্যা দ্বাদশবৎসরব্যাপী পতি বিরহে সীতার সেই রক্তিম কপোল পাণ্ডুর ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। সেই কুঞ্চিত কুন্তল বিলোল হইয়া মুখে ও চক্ষুতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেখিলে মনে হয়, যেন করুণ রসের মূর্ত্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে; বিরহব্যথা, শরীর ধরিয়া দেখা দিয়াছে। সীতার সেই সুকুমার দেহখানি আজ হৃদয়কুসুমশোষী দীর্ঘ শোকে বৃন্তচ্যুত কিশলয়ের অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সে ক্ষীণ পরিপাণ্ডু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মর্ম্মদগ্ধ কেতকী-গর্ভদলের নীলিমা লাভ করিয়াছে।

তৃতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক শেষ হইল। এইবার মূল তৃতীয়াঙ্কের যবনিকা উঠিল। এই অঙ্কে

মর্ত্ত্যমানবের অদৃশ্য থাকিয়া সীতা পঞ্চবটীতে সঞ্চরমান,—তাই ইহার আর একটী নাম ছায়া অঙ্ক। রামের হৃদয়স্থা প্রেমময়ী সীতার স্মৃতি যেন আজ প্রত্যক্ষ দর্শনাকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "ভাবনা প্রকর্ষাৎ স্মৃতে দর্শনরূপতা ইতি (রামানুজ ভাষ্য)। কবি কল্পনা চরম সার্থকতা্ লাভ করিয়াছে।

নেপথ্য হইতে—"প্রমাদ প্রমাদ" কি অনর্থ, কি অনর্থ—এইরূপ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। পুষ্পচয়নব্যগ্রা সীতা অমনই সকরুণোৎসুক্যে সেই শব্দ লক্ষ্যে কর্ণ পাতিল। সীতার স্বহস্তপোষিত করিশিশু আজ মদমত্ত গজরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত। সীতা সসম্ভ্রমে করপদ ছুটিয়া গেল। কি সুন্দর! অতীতের সেই শল্লকীপল্লব গ্রহণে ব্যাকুল করিশিশুকে মনে পড়িল; চকিতে বিদ্যুৎস্ফুরণবৎ বনবাসস্মৃতি জাগিয়া উঠিল—সীতা উদ্‌ভ্রান্তা হইয়া বলিয়া উঠিল "আর্য্যপুত্র, আমার পুত্রকে বাঁচাও"। বার বৎসরের ব্যবচ্ছেদ পূর্ণ হইয়া গেল! তন্ময়তায় অতীত বর্ত্তমানবৎ প্রতীত হইল।

"কোথায় আর্য্যপুত্র"! তন্ময়তা ছুটিয়া গেল। অতীত অতীত হইয়া গেল। বর্ত্তমান বর্ত্তমান হইয়াই দেখা দিল। সীতা তখন সেই চকিতদশীবিপর্য্যাসে মূর্চ্ছিতা। এমন সময়ে জলভরা মেঘের ধ্বনির মত এক গম্ভীর মাংসল নিনাদ সীতার কর্ণবিবর ভরিয়া উত্থিত হইল। সীতার মূর্চ্ছা অমনই ছুটিয়া গেল। বহুদিনের পর ভাবাবেশও দ্রুত, আর তাহার অন্তর্দ্ধানও দ্রুত। বড় আশ্বাসে বড় আহ্লাদে সীতা মেঘধ্বনি শ্রবণে ময়ূরীর মত চকিতা ও উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিল। সীতাবল্লভের অপরিস্ফুট (সীতার কাছে বড় পরিস্ফুট) দূরাগত ধ্বনি শুনিয়াই সীতা জানিতে পারিল—আর্য্যপুত্র পঞ্চবটীতে উপস্থিত।

তমসার মুখে তখন সীতা শুনিল—রাজকার্য্য পালনের জন্য রামচন্দ্র জনস্থানে সমাগত হইয়াছেন। সীতাবল্লভ রামচন্দ্রের এই কঠোর রাজকর্ত্তব্য পালন দেখিয়া—সীতার বড় আনন্দ হইল। "দিষ্ট্যা অপরিক্ষীণরাজধর্ম্মঃ খলুঃ রাজা" এইখানেই সীতা চরিত্রের একটী অনন্যসাধারণী বিশিষ্টতা। রামচন্দ্র যে রাজকর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিতেছেন—ইহাতেই সীতার আনন্দ! যে কঠোর কর্ত্তব্যপালনের জন্য রামের সীতা বিসর্জ্জন—সে কর্ত্তব্য পালিত না হইলে তবে যে এই কষ্ট ভোগই বৃথা হয়! রামের প্রণয়ে সীতার অগাধ বিশ্বাস। নহিলে রাম সীতাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছেন, তাই রাজকর্ত্তব্যের কঠোর দায়িত্ব বহন করিতে পারিতেছেন—এ বিশ্বাস সীতার নাই। এমত ধারণা জন্মিলে সীতার মুখে তৎক্ষণাৎ "দিষ্ট্যা" একথা শুনিতে পাইতাম না। নিষ্কলঙ্কা—তবু রাম তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন; লোকচক্ষুতে কলঙ্কিনী মত করিয়া বনে বিসর্জ্জন দিয়াছেন—এ কারণ যে অভিমান, তাহা অবশ্য সীতার বুক ভরিয়াই আছে। এ লজ্জাকর ব্যথা অবশ্য মর্ম্মস্থলে শেলের মত বিদ্ধ হইয়াই আছে। কিন্তু "অপরিক্ষীণরাজধর্ম্ম খলু রাজা"—এ কথাটীতে ঐ অভিমান ঐ ব্যথা নাই বা কোন প্রকার শ্লেষের ঈঙ্গিতটুকুও নাই। ইহা উদার হৃদয়ের স্বতঃনিসৃত বাণী। রাম শোকে মুহ্যমান্ হইয়া রাজকার্য্য হয়ত ঠিক পালন করিতে পারিবেন না, এমন আশঙ্কা সীতার ছিল। কর্ত্তব্যচ্যুতির শঙ্কা কাটিয়া গেল, সীতার বড় আনন্দের কথা। রাম অনুত্তেজিত মুহূর্ত্তে সীতার সম্মুখে যখন বলিতে পারিয়াছেন যে "লোকারাধনা নিমিত্ত আমি স্নেহ, দয়া, বন্ধুত্ব (প্রীতি)

এমন কি জানকীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি।" আর আজ রামের যোগ্যাপত্নী রামপ্রিয়া সীতাও তখন না বলিবেন কেন? (ভাগ্যবশতঃ) "দিষ্ট্যা অপরিক্ষীণ রাজধর্ম্মঃ খলু রাজা"।

পঞ্চবটীর সেই চিরপরিচিত তরুলতা, সেই স্বহস্তপালিত পশুপক্ষী, সেই করুণাদ্রাবিতা গোদাবরী, সেই "বহু নির্ঝর কন্দর" গিরিতট ;—রামের অন্তর্লীন দুঃখাগ্নি উদ্দামভাবে জ্বলিয়া উঠিল। রামও সংমূর্চ্ছিত; তাই দেখিয়া সীতা "ভগবতী তমসে, আমার আর্য্যপুত্রকে বাঁচাও" বলিয়া তমসার পায়ে পড়িল। তমসা আজ্ঞা করিল "তোমারই প্রিয় পাণিস্পর্শে জগৎপতি রাম বাঁচিবেন।" "যন্তবতু তদ্ভবতু যথা ভগবতী আজ্ঞাপয়তি—যাহা হউক তাহা হউক,—যাহা ভগবতী আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা করি। এস্থলে বিদ্যাসাগর মহাশয় অর্থ করিয়াছেন "আমার পাণিস্পর্শে আর্য্যপুত্র বাঁচিবেন কিনা জানি না, কিন্তু যখন ভগবতী (তমসা) আদেশ করিতেছেন, তখন তাঁহাকে আমি স্পর্শ করি।* বঙ্কিমবাবু এই অর্থের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর অতি তীব্র শ্লেষ করিয়াছেন "স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বুঝিতে পারিলেন না তখন যদু মধু কি বুঝিবেন!"

বঙ্কিম বাবু বলেন—"রামকে স্পর্শ করিবার আমার কি অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন—বিসর্জ্জন করিবার সময় একবার ডাকিয়াও বলেন নাই যে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম। আজি বারো বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাঁহার প্রিয় পত্নীর মত তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিব কোন্ সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতপ্রায়! যাহাহউক তাহাহউক আমি তাঁহাকে স্পর্শ করি।" ইহা ভাবিয়া সীতা স্পর্শ করিল, রামও চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমবাবুর অর্থের পরিপোষক প্রমাণ এই যে, তৎপরেই সীতা বলিলেন "ভগবতী তমসে, এস আমরা ফিরিয়া যাই। যদি ইনি (রাম) আমাকে দেখিতে পান, তবে এই অননুজ্ঞাত আগমনের জন্য (স্পর্শ ত দূরের কথা) আমার মহারাজ কুপিত হইবেন"।

অবশ্য বঙ্কিমবাবুর অর্থটি সূক্ষ্ম সমালোচনার হিসাবে ভালই প্রতীত হয়। কিন্তু আর একদিক দিয়া বিদ্যাসাগরের মতটিকে বেশ সমর্থন করা যায়। রাম মূর্চ্ছিত, এমত সঙ্গীন সময়ে অত মান অভিমান তর্ক উঠিতে পারে না। "বাঁচিবেনই" এমত নিশ্চিত বিশ্বাস সীতার থাকিতে পারে না। তবে ভগবতী আদেশ করিতেছেন তখন স্পর্শই করি। সীতাকে তখন তমসা যে আজ্ঞাই করিবে, সীতা না ভাবিয়া চিন্তিয়া তখনই তাহা করিতে প্রস্তুত। রামের জীবন যে সঙ্কটাপন্ন, সীতার মনে তখন ঐ অভিমানোত্থিত বিতর্ক না উঠিবারই কথা। পরে যখন রাম জীবন পাইলেন, তখনই অননুজ্ঞাত সন্নিধান জন্য শঙ্কা হইল। শঙ্কা চৈতন্যলাভের অগ্রে নহে। তারপর হরিচন্দন পল্লবের প্রলেপবৎ চিরপরিচিত স্পর্শ—রামের অঙ্গে নিষ্পীড়িত চন্দ্রকিরণরসের সেক দিয়া গেল। ইহা চিত্তের সঞ্জীবন অথচ মোহকর; মুহূর্ত্তের মধ্যেই সন্তাপজ মূর্চ্ছা নাশ করিয়া আনন্দের জড়তা আনিয়া ফেলিল। মূর্ত্তিমান প্রসাদের মত এই স্নেহার্দ্র শীতল স্পর্শ কি ভুলিবার? "কোথায় প্রিয়ে জানকি,

* অবশ্য তাঁহার স্বকৃত (উত্তর চরিতের) সংস্কৃত টীকায়।

কোথায় আমার সেই আনন্দদায়িনী দেবী প্রতিমা?" রাম চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, "কোথায় প্রিয়তমা! ছায়ামূর্ত্তি ভাগীরথীর বরে যে রামের অদৃশ্যা। রাম তখন ভাবিয়া লইলেন—"নিজেরই প্রগাঢ় চিন্তা আজ মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে প্রতারণা করিয়া গেল। ইহা তন্ময়তাজনিত একটা ভ্রান্তি মাত্র।

সীতার স্বকরপালিত সেই হস্তিশিশু মদমত্ত গজরাজকে পরাজিত করিল। সীতা আনন্দে সেই সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিল—দীর্ঘায়ু বৎস আমার, সৌম্যদর্শনা প্রিয়ার সহিত যেন অবিযুক্ত থাকে। বিরহেই সীতার যত ভয়। একে পতিবিরহ—তাহাতে আবার পুত্র বিরহ! রামায়ণের সীতাকে কেবল পতিবিরহই সহ্য করিতে হইয়াছিল। ভবভূতির সীতা দুই প্রকার বিরহই সমভাবে ভোগ করিতেছে। উত্তর চরিতে সীতা পাতালে মাতার নিকট অবস্থিতা; পুত্রদ্বয় স্তন্যত্যাগের পর হইতেই বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত। (রামায়ণে বাল্মীকি আশ্রমেই সীতা সপুত্রক অবস্থিতি করিত।

কদম্ব শাখায় উন্নতশিখ মণিময় মুকুটের মত প্রিয়া সমেত একটা ময়ূর বসিয়াছিল। সেই সময়ে কি জানি কেন, সে স্বভাবসিদ্ধ কেকারবে ডাকিয়া উঠিল। বাসন্তী দেখিল, সীতার সেই পালিতপুত্র ময়ূর শিশু। সীতা দেখিয়াই চিনিল। রামের চক্ষে অতীতের ছবিটা ভাসিয়া উঠিল;—সীতা ক্ষুদ্র করতলে করতালি দিতেছে, আর সেই ময়ূর শিশুটা সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে, আর সেই নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সীতার চক্ষুপল্লব ও কেমন সুন্দরভাবে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে। সীতার সযত্নরোপিত কদম্ববৃক্ষে দুই চারিটী ফুল ফুটিয়াছে। আর সীতার পালিত গিরিময়ূরটীও সেই বৃক্ষকেই আশ্রয় করিতেছে। রাম দেখিলেন—পক্ষীজাতি ও পরিচয় স্মরণ করে, স্নেহের মর্য্যাদা রাখে। আর তিনি শ্রেষ্ঠতম মানব হইয়াও কি করিলেন? রামের কান্না আসিল। তারপর বাসন্তী কদলীবন মধ্যবর্ত্তী একটি শিলাতল দেখাইয়া তাহাতে রামকে বসিতে বলিল। তথায় সীতার প্রিয় হরিণের দল আজিও তাহার চতুর্দ্দিকে চরিয়া বেড়াইতেছে। এইখানে বসিয়াই যে সীতা তাহাদের কত আদর করিয়া খাওয়াইত। রাম কাঁদিতে কাঁদিতে সেস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইয়া বসিলেন।

বাসন্তী ইচ্ছাপূর্ব্বক সীতার পূর্ব্বস্মৃতি উদ্রেক করিয়া রামকে কাঁদাইতেছে। মন্দভাগিনী সীতাও পাষাণীর মত তাহা সহ্য করিতেছে। সেই পঞ্চবটী, সেই প্রিয়সখী বাসন্তী, সেই "বিবিধ বিশ্রম্ভসাক্ষী গোদাবরী কাননোদ্দেশ," সেই পুত্রনির্ব্বিশেষ পশুপক্ষী, তরুলতা—এ সকল থাকিয়াও (সীতার কাছে) নাই। সীতা আর সীতা নহে। মর্ত্ত্যের পতি সোহাগিনী রাজ-রাণী আজ বিরহিণী, ভিখারিণী ও পাতালবাসিনী।

রাজরাজেশ্বরী আজ ছায়ামাত্র ধারিণী। আর সেই বিকলেন্দ্রিয় পাণ্ডুবর্ণ শোকদুর্ব্বল রামের অবস্থা দেখিয়া সীতার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। তবু সীতা সেই অশ্রুপতনোদগমের অন্তরালে সতৃষ্ণনয়নে রামকেই দেখিতেছিল। সীতার সেই স্নেহনিঃস্যন্দিনী নয়ন কখন সুখে কখন দুঃখে কখন শূন্যতায় অশ্রুবর্ষণ করিতেছে; দর্শন তৃষ্ণায় সে দৃষ্টি উত্তালদীর্ঘা, বিস্ফারিতা, দীর্ঘবৎ প্রতীতা। তমসা সস্নেহাস্রে দেখিল—সে দৃষ্টি দুগ্ধনদীর পয়োধারায় হৃদয়েশ্বরকে স্নান করাইয়া দিতেছে। বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ, যাহাকে আমার প্রাণ, আমার

দ্বিতীয় হৃদয়, নয়নের জ্যোৎস্না, অঙ্গের অমৃত" এই প্রকার শত শত বাক্যে ভুলাইতেন, সেই মুগ্ধা সীতাকে"—বলিতে বলিতে বাসন্তী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। এই বক্তব্যটী শেষ না করাই এখানে সৌন্দর্য্য! অলঙ্কার শাস্ত্রমতে স্থান বিশেষে ন্যূনপদতা একটি গুণ। বাসন্তী মূর্চ্ছাভঙ্গের পর উত্তর শুনিল—"লোকে যে সহ্য করিল না" অর্থাৎ আমি রাজা, প্রজার প্রতিনিধি; প্রজাদের যাহা সহ্য হইল না, কাজেই আমি ও সেই মতেই চলিলাম। রামের মনে একটি আত্মপ্রসাদ ছিল যে, তিনি প্রজার মতে চলিয়া প্রজানুরঞ্জন করিয়া যশোভাগী হইয়াছেন। বাসন্তী সেই আত্মপ্রসাদের উপর আঘাত দিল, জানাইল—

"অয়ি কঠোর! যশঃ কিল তে প্রিয়ং কিমযশো ননু ঘোর মতঃ পরং।"

অয়ি কঠোর, যশই এত আপনার প্রিয়; আর এই সীতা বিসর্জ্জনে কতদূর অযশ হইল তাহা কি জানেন? সীতা প্রাণের প্রাণ সে প্রিয় হইল না, প্রিয় হইল কি না যশ। ওহে যশলোলুপ, সীতা বিসর্জ্জনে কি আপনার যশ হইল, না অযশই হইল? বাসন্তীকে এত বড় আঘাত করিতে দেখিয়া সীতাও দারুণা ও কঠোরা বলিয়া বাসন্তীকে অনুযোগ না করিয়া পারিল না। "হরিণনয়না স্বভাবভীরু সীতার বনে কি অবস্থা হইল"—(বাসন্তীর) এই প্রশ্নেরই উত্তর রাম দিলেন। যে আত্মপ্রসাদ ক্ষুণ্ণ হইল—তাহার আর উত্থাপন হইল না। *

"সখি কি আর মনে করিব? সেই "ত্রস্তৈকহায়নকুরঙ্গবিলোলদৃষ্টি" সেই "পরিস্ফুরিত গর্ভভরালসা" জানকীর "মৃদুমুগ্ধ মৃণালকল্পা জ্যোৎস্নাময়ী অঙ্গলতিকা" নিশ্চয়ই রাক্ষসদিগের দ্বারা চিরদিনের মতই বিলুপ্ত হইয়াছে।" আত্মপ্রসাদ নষ্ট হইল। সীতা ত চিরতরে লুপ্তা। তবে কি রহিল? রাম তখন মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন। রামের হৃদয় দলিত হইয়া যাইতেছে, তবু দ্বিধা হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেছে না। অন্তর্দাহ সমস্ত অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে কিন্তু একেবারে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে না। কি কষ্টকর অবস্থা!

বাসন্তী রামকে কাতরতার পরাকাষ্ঠায় উপনীত দেখিয়া ধৈর্য্য ধরিতে কহিল। রামের শোকসাগরের অতি গভীর আবর্ত্ত বাসন্তী স্থির রাখিতে চাহিল। রাম শুনিয়া স্তম্ভিত! সীতাশূন্য দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সীতার নামটিও পৃথিবীতল হইতে লুপ্ত হইতে চলিল; তবু রাম আজও বাঁচিয়া আছে। এ অপেক্ষা স্থির থাকা আর কাহাকে বলে? ধৈর্য্য আর কাহার নাম?

সীতার সব দুঃখ গেল। অভাগীর পরে এত প্রেম, অভাগীর জন্য আর্য্যপুত্রের এত কষ্ট! এ বিসর্জ্জন সার্থক! রামের এই প্রেমগর্ভ প্রিয়বচনে সীতা মোহিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা দেখিল, সর্ব্বনাশ! এখন সীতাকে এ স্থান হইতে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়াই যে দুষ্কর হইবে। আর সীতাও কি ইহার পরে ধৈর্য্য ধরিতে পারিবে? রামের এত অধৈর্য্য; তবে সীতার কাছে সংযম আশাই করা যে বৃথা হইবে? তমসা সীতাকে রক্ষা করিতে যত্নবতী হইয়া, বলিল—

---

* বক্তব্য ছিল নির্ব্বাসন দিলেন।

ত্রস্ত + একহায়ন + ভীত—একবৎসর বয়স্ক। কুরঙ্গ—হরিণ।

বৎসে! "নৈতাঃ প্রিয়তমা বাচঃ স্নেহার্দ্রাঃ শোক-দারুণাঃ।
এতাস্তা মধুনোধারাশ্চ্যাতন্তি সবিষাস্ত্বয়ি"।

বৎসে, এ বড় মনোহারী বাক্য নয়! এ স্নেহে আর্দ্র কিন্তু শোকে দারুণ, ইহা তোমার কাছে এখন বিষমিশ্র মধুরধারা।

বাসন্তী দেখিল, রামের হৃদয় অতীব নিষ্কম্প অথচ স্তম্ভিত; আবেগে হৃদয় পরিপূর্ণ। সীতা বিষয়ক প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে রামের মনকে লইয়া যাইতে পারিলে এ কষ্ট দূর হইতে পারিবে—সেই আশায় তখন বাসন্তী রামকে জনস্থানের অন্যান্য ভাগগুলি দেখাইতে লাগিল। সকলভাগেই যে সীতার ছবি; সকলস্থানেই যে সীতার স্মৃতি। বাসন্তী দুঃখেরই উদ্দীপক স্থানগুলিকে বিনোদের উপায় বলিয়া মনে করিল। বাসন্তী ভুক্তভোগিনী নহে। নিজে ভুগিয়া যে অভিজ্ঞতা জন্মে, বাসন্তীর তাহা জন্মে নাই; তাই সে ভুল করিল। সীতা ঠেকে শিখিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে—তাহার কাছে কাজেই সে ভুল ধরা পড়িল। বাসন্তী যে ইচ্ছাপূর্ব্বক রামকে কষ্ট দিবার জন্য জনস্থানের অন্যান্য ভাগগুলি দেখাইতে লইয়া যায় নাই—তাহা তাহার স্বগতঃ উক্তিতে সুস্পষ্টই বুঝা যায়—যথা "কষ্টমত্যাপন্নোদেবঃ, তদাক্ষিপামি তাবৎ"

বাসন্তী একটী লতাগৃহের দ্বারে রামকে লইয়া আসিল সেই লতাগৃহ—

অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণা
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্ গোদাবরী সৈকতে
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুড্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ॥

সীতার সেই সুন্দর মূর্ত্তিটি—কাতরতা নিবন্ধন সেই মুগ্ধ প্রণামাঞ্জলি, রামের চক্ষুতে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। প্রতিপদে কেবল হৃদয় লইয়া ঘাত প্রতিঘাত; মনস্তত্ত্বেরই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ; আদি করুণের অপূর্ব্ব লহরীলীলা!

রাম গাঢ় তন্ময়তাবশে চারিদিকেই সীতার মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছিলেন; সীতার স্মৃতি আজ মূর্ত্তি ধরিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। রাম তাহাকে (আবছায়া রকমে) পাইয়াও পাইতেছিলেন না। প্রেমবিহ্বল ভাবপ্রবণ রাম, সীতার স্মৃতিচিহ্নের মধ্যেই তার ছবি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বলিলেনও তাই "চণ্ডি জানকি তুমি চারিদিকেই আমাকে দেখা দিতেছ; তবে অনুকম্পা করিতেছ না কেন?" সীতা যেন অভিমানবশে রামকে দেখা দিয়াও ধরা দিতেছিল না; প্রণয়কোপে কোপনা হইয়াছে বলিয়াই রাম সীতাকে "চণ্ডী" এই সম্বোধন করিলেন।

রাম চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন—সীতা নাই। তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। দেহের বন্ধন শ্লথ হইয়া আসিল; নিখিল চরাচর শূন্যবৎ প্রতীত হইল। তখন রামের বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল। দারুণ মোহ চারিদিক দিয়া তাঁহাকে ছাইয়া ফেলিল। রাম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

সীতাও মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা। তমসার মুখে তাঁহার পাণিস্পর্শই রামচন্দ্রের জীবনলাভের একমাত্র

উপায়—শুনিয়া সীতা সসম্ভ্রমে রামের হৃদয় ও ললাট স্পর্শ করিল। এবার দ্বিতীয়বার স্পর্শ; কাজেই মনে আর কোন সঙ্কোচ, ভয় বা ভাবনা কিছু নাই। রামেরও চেতনা ফিরিয়া আসিল। সেই স্পর্শের মাদকতায় বিভোর রামচন্দ্র আনন্দ নিমীলিত নয়নেই বাসন্তীকে কহিলেন—"সখি বাসন্তী! কি আনন্দ! জানকীকে পাইয়াছি।" অবশ্য গাঢ় তন্ময়তাজাত বিভ্রান্তিতেও কদাচিৎ এমত অবস্থা হইতে পারে। অবশ্য এখানে ছায়াসীতাই কারণ; বিভ্রম নহে। ভালবাসার সন্তাপহর সুখস্পর্শে সীতার বহুকালের সন্তাপ কোথায় চলিয়া গেল। স্বেদসিক্ত বাহু বজ্রলেপবদ্ধ—অবশ হইয়া কাঁপিতে লাগিল। তখন স্বেচ্ছাস্পর্শ, অমৃতশীতল কঙ্কণধর সীতার বাহুটী রাম অনায়াসেই ধরিয়া ফেলিলেন। সেই ললিতলবনীপল্লববৎ সুকুমার সে তুষারকরকাসদৃশ সুশীতল, চিরপরিচিত বাহুর স্পর্শে রামের ইন্দ্রিয় আবেশে শিথিল ও জড় হইয়া আসিতে লাগিল। যেমনই রাম "সখি বাসন্তী এই ধর" বলিয়া হাতখানি বাসন্তীকে ধরিতে বলিলেন অমনই সীতা সসম্ভ্রমে সে হাত সরাইয়া লইল। রাম অনুভব করিলেন, জড় হইতে যেন সহসা জড় খসিয়া গেল।

রামের স্পর্শ—বহুদিনের পর সেই আবেশময় স্পর্শ—সীতাও জ্ঞান হারাইল। সীতার চক্ষু আবেশে মুদিয়া আসিল, ইন্দ্রিয় শ্লথ হইয়া গেল। সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে রাম সীতার বাহু ধরিয়া ফেলিলেন। যখন দুই জনের স্পর্শে দুই জনেই বিভোর—সে সময়ে কাহারও চেতনা নাই। সে অবস্থায় রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; হস্ত দুইটী (দুজনের) অবশ হইয়াই ভাবাবেশে ঈষৎ কাঁপিতেছিল মাত্র। যখন সেই স্পর্শবিচ্যুতি ঘটিল, তখনই রাম অনুভব করিলেন "জড় হইতে জড় খসিয়া গেল।" স্পর্শকালে কিন্তু জড়ে জড় ছিল, কম্পবানে কম্পবান্ কিছু ছিল—এ উপলব্ধি ছিল না। সীতা সরিয়া গেল, আর রামের অপ্রকৃতিস্থ স্তিমিত চক্ষু চতুর্দ্দিকে সীতার অনুসন্ধানেই বৃথাই ঘূর্ণ্যমান হইতে লাগিল। এইখানেই তমসার বর্ণনার ভিতর দিয়া সীতার একটি সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তমসা একটু হাসির সহিত একটু কৌতুকের সহিত সীতার পানে স্নেহভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—

> সস্বেদ রোমাঞ্চিত কম্পিতাঙ্গী জাতা প্রিয়স্পর্শ সুখেন বৎসা।
> মরুন্নবাম্ভঃপ্রবিধূতসিক্তা কদম্বযষ্টিঃস্ফুট কোরকেব ॥

সীতা স্বেদজলসিক্তা কদম্বযষ্টিও নবজলসিক্তা। সীতা রোমাঞ্চিতা, কদম্বযষ্টিও স্ফুটকোরকা। সীতা কম্পমানা, কদম্বযষ্টিও বায়ুচালিতা। বৎসা সীতাই আজ কদম্বযষ্টির অবস্থায় উপনীতা। গুরুজনের মুখে কদম্বযষ্টির সহিত আপনার তুলনা শুনিয়া সীতা বড় লজ্জা প্রাপ্তা হইল। ভগবতী কি ভাবিবেন? যিনি আমাকে কলঙ্কিনীরূপে দশের কাছে দাঁড় করাইয়া নির্ব্বাসিতা করিলেন; তাঁহার উপর এখনও এত অনুরাগ, সীতা বড় কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল। তাহার নারীহৃদয়, তাহারই অজ্ঞাতে কিছু কুণ্ঠিত, আত্মসম্মান একটু আহত হইয়া পড়িল। তবে গাঢ় ভালবাসার কাছে ও সমস্ত তুচ্ছবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। ও সকল ফেনা বুদ্বুদের মত উপরে ভাসিয়া থাকে মাত্র।

রাম কিছু বুঝিতে পারিতেছিলেন না। সীতা যদি সত্যই আসিত, তবে বাসন্তী কেন

তাহাকে দেখিতে পাইল না? তবে কি সে আসে নাই? নিশ্চয় তাই। এ কি স্বপ্ন? কৈ, আমি ত নিদ্রিত নহি। তখন রাম নিশ্চয় করিলেন—

সর্ব্বথা স এব অনেকবার পরিকল্পনা নির্ম্মিতো বিপ্রলম্ভঃ পুনপুনরণুবধ্নাতি মাং (কষ্ট দিতেছে)

সীতার গাঢ় স্মৃতি সীতার ছায়া ধরিয়া রামকে মধ্যে মধ্যে ছলনা করিত। আর আজ সীতা সাক্ষাৎ ছায়ামূর্ত্তি, ইহাই বিশেষ)

বাসন্তী জটায়ু রাবণের যুদ্ধপ্রসঙ্গ তুলিয়া বীরের হৃদয়ে উত্তেজনা আনিবার চেষ্টা করিল। বীরত্বের উদ্দীপনা দুঃখশোক দূর করিয়া বলই আনিয়া দিবে। রামের চিত্তে একটু ফলও ফলিল। কিন্তু সীতার অবস্থা আরও সঙ্গীন হইল। তখন অতীতের দৃশ্য প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাসিত। স্মৃতি অনুভূতির আকারে বিবর্ত্তমানা। মুহূর্ত্তের জন্য বিভ্রম—সম্মোহের আবির্ভাব। ভাবাবেগে উন্মত্তা সীতা, "আর্য্যপুত্র আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া তখন চীৎকার করিয়া উঠিল। উন্মত্ততার পরই অবসাদ, প্রকৃতিরই নিয়ম। সীতা শুনিল, রাম বলিতেছেন "যে এ বিরহ নিরবধি, ইহার কোন প্রতিকারই নাই" যেটুকু আশা ছিল তাহাও নিঃশেষ হইল। আশা গেলেই সকল ফুরায়। সীতারও সবই ফুরাইল। অবসন্না সীতা "আমি জন্মের মত গেলাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রাম আর কাঁদিতে পারেন না, সীতার যে স্মৃতিচিহ্নগুলি আর দেখিতে পারেন না—তখন রাম সেই স্থান ত্যাগ করার জন্য বাসন্তীর নিকট অনুমতি চাহিলেন। রাম ছাড়িয়া যাইতে চাহেন কিন্তু সীতা উদ্বেগে ব্যাকুলা হইয়া "ভগবতি তমসে, আর্য্যপুত্র যে চলিয়া যাইতেছেন" বলিয়া তমসাকে জড়াইয়া রহিল। কি ঔৎসুক্য কি উদ্বেগ, কি কাতরতা কি বা মোহ! রাম স্বহস্তে সীতাকে বনে নিক্ষেপ করিয়াছেন—কাজেই তাঁহার পক্ষে সেই স্মৃতি চিহ্নগুলি দেখা বড়ই অনুতাপকর। সীতা ত আর নিজে ত্যাগ করে নাই তাহার দুঃখের মধ্যেও যে সান্ত্বনা আছে। আর সীতার অনুতাপের ত লেশমাত্রও কারণ নাই। নিজ হস্তে হৃৎপিণ্ডচ্ছেদের যে কি জ্বালা তাহা রামই জানেন, সীতা ত তাহা জানে না। আর তদ্ভিন্ন সীতা রামকে চক্ষুর উপর দেখিতে পাইতেছে, রাম ত পাইতেছেন না।

কাজেই সীতা চলিয়া যাইতে চাহিবে কেন? কত কালের পর যে প্রথম সীতা আজ প্রাণ ভরিয়া দুর্ল্ভদর্শন প্রিয়তম রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছে; সে আজ কেমন করিয়া সে স্থান ছাড়িয়া যাইবে? রাম সীতাকে ত দেখিতে পাইতেছেন না, দেখার বলবতী তৃষা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে মাত্র। রামও সীতাকেই দেখিতে চান! সীতা কোথায়? অগত্যা অশ্বমেধযজ্ঞার্থে প্রস্তুত হিরন্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি দেখিয়া রাম আপনার বাষ্পদিগ্ধ চক্ষু তৃপ্ত করিবেন, স্থির করিলেন।

কি, সীতার হিরন্ময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ! আর তাহা অযোধ্যায়! অশ্বমেধযজ্ঞে সহধর্ম্মচারিণীর নিমিত্ত? সীতা কৃতার্থা হইল। পরিত্যাগজনিত লজ্জাশল্য তাহার হৃদয় হইতে উন্মূলিত হইয়া গেল। শিথিলবৃন্ত কলটী ধৈর্য্যবন্ধনে বদ্ধ রহিল।

সেই হিরন্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি ধন্যা, যে আজ জীবলোকের আশাভরসা হইয়াছে। এ এক

আশ্চর্য্য প্রকারের ঈর্ষ্যা ও অসূয়া নিজে অধন্যা হতভাগিনী কিন্তু তাহারই প্রতিমূর্ত্তি আজ কি ধন্যা, কি সৌভাগ্যবতী। নিজের উপর এমন সুন্দর ঈর্ষ্যা অসূয়ার ভাবটী বড়ই উপভোগ্য।

বাসন্তী রামের অযোধ্যা প্রত্যাগমনের মত দিল। তমসাও সীতাকে বলিলেন "এখন চল বৎসে আমরাও যাই।" সীতা মুখে বলিল মাত্র "চলুন যাই" কিন্তু সে আজ কেমন করিয়া যাইবে? তাহার তৃষ্ণাদীর্ঘ চক্ষু যে প্রিয়তম রামচন্দ্রে আজ নিবাত হইয়া আছে।

রামচন্দ্র বিমানে আরোহণ করিয়া অযোধ্যায় চলিয়া যাইলেন। আর তমসার অঙ্গে ভর দিয়া সীতাও ধীরে ধীরে ছায়াখানির মত চলিয়া গেল। যেন অশরীরিনী সীতার ছায়াই রামের সম্মুখ হইতে নীরবে প্রস্থান করিল।

এই তৃতীয়াঙ্কে একই করুণরস (আলঙ্কারিকমতে অবশ্য করুণাবিপ্রলম্ভাখ্য আদি রস) নানা ব্যাভিচারী ভাবের মধ্য দিয়া পৃথক পৃথক রূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই করুণরস বর্ত্তমান। লজ্জা, নির্ব্বেদ, দৈন্য, জড়তা, উৎসুক ও ভয়, হর্ষ, বিষাদ, স্মৃতি ও মতি প্রভৃতি ব্যাভিচারী ভাবগুলি একই করুণরসকে বিবিধ আকার দিয়াছে। তাই এই একই করুণরস সারা তৃতীয়াঙ্ক ব্যাপিয়া প্রবাহমান থাকিয়া এক অপূর্ব্ব কবিত্বের বিকাশ করিয়াছে। বিশ্ব সাহিত্যে এ কবিত্বের তুলনা নাই। কোন সমালোচক বলিয়াছেন (বঙ্কিমবাবু) নাট্য হিসাবে তৃতীয়াঙ্কের মূল্য তেমন নাই। সে নাট্য কি ইংরেজি? সংস্কৃত নাট্য অবশ্যই নহে। কোথায় কোন ব্যাভিচারীভাব কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—তাহা টীকার সহিত তৃতীয়াঙ্কটি মিলাইয়া পড়িলে সকল পাঠকই বুঝিতে পারিবেন। আর জানিতে পারিবেন, একই করুণস্রোত কিভাবে কত দিক দিয়া বহিয়া গিয়াছে। কবির সহিত সকলেই এখন একবাক্যে বলিবেন—

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্ত ভেদা
দ্ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্
আবর্ত্তবুদ্বুদতরঙ্গময়ান্ বিকারা
নম্ভো যথা সলিলমেবতু তৎ সমগ্রং॥

কি সাহিত্য হিসাবে কিবা নাট্যহিসাবে তৃতীয়াঙ্কের তুলনা নাই।

"রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণ য়োরিব"

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

"ওয়া গুরুজী কা ফতে!"

কৃষ্ণপক্ষ নিশিথিনী, নিখিল ভুবন
সুখ-সুপ্ত, মাতৃ-অঙ্কে শিশুর মতন,
ঊর্দ্ধাকাশে তারাপুঞ্জ স্নেহ-দৃষ্টি প্রায়
জাগিছে ধরিত্রী-শিরে, বিজলী-লীলায়
তা'রি ছায়া বহে বুঝি বসুন্ধরা-বুকে
চঞ্চল খদ্যোতকুল!
নির্ভয়ে কৌতুকে
একাকী গোবিন্দসিংহ বনপথ ধরি'
অগ্রসিলা হেনকালে; দিতে ধৌত করি'
গুরুর চরণাম্বুজ পড়িতেছে ঝরি'
নবীন শিশির শষ্পে, শ্রম অপসরি'
বহিছে সমীর ধীরে, পত্রপুষ্পাঞ্জলি
অর্পিছে প্রকৃতিরাণী, বিহঙ্গ কাকলি
অতর্কিতে জাগি' কভু গাহিয়া বন্দনা
থামিছে অজ্ঞাতে পুনঃ!
পুরাতে কামনা
আসিলা মহাত্মা কোন্ গহন কাননে
শুনেছেন শিখগুরু, হেরিতে গোপনে
চেয়েছেন তিনি তাঁরে, তাই এ নিশীথে
চলেছেন গুরু একা!
ভ্রম হয় চিতে
দিব্যলোক হতে কোন্ পুরুষ প্রধান
আবির্ভূত বনভূমে! গাম্ভীর্য্য মহান্
শৌর্য্য ও সৌন্দর্য্য সাথে ওতপ্রোত হয়ে
পেতেছে আসন তাঁর প্রশান্ত হৃদয়ে
শ্রীঅঙ্গ মণ্ডিত করি'!
অদূরে সহসা
হেরিলা গোবিন্দসিংহ বিদূরি' তমসা
প্রজ্জ্বলিত ধূনি পাশে সৌম্য দরশন
সুকুমার সাধু এক ধ্যানে নিমগন
আত্মানন্দে ডুবি' যেন! করুণ-কোমল
তেজোদৃপ্ত মুখ পানে বিস্ময়-বিহ্বল
নিরখি' ক্ষণেক গুরু সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায়
নমিলেন যুক্ত করে!
ফুল্ল কলি প্রায়
মেলিয়া পঙ্কজআঁখি সাধু ক'ন ধীরে
সম্ভাষি' গোবিন্দসিংহে (সারা চিত্ত ঘিরে
বাজিল মধুরে বীণ!)—"এস নরোত্তম!
বস এই কৃষ্ণাজিনে! নিত্য নিরুপম
কি তীব্র সাধনা-সাধ অন্তরে তোমার
সিন্ধুর তরঙ্গ হেন অদম্য অপার
জাগিছে জানিগো আমি! একদা তাহার
প্রবল প্লাবনে যত কলঙ্ক-আঁধার
ঘুচিবে ভারত হতে! সোণার ভারত
হাসিবে গৌরবে পুনঃ উল্লাসি' জগত
ধর্ম্মে কর্ম্মে মুক্ততায়! তুমি শক্তিধর
নব যুগপ্রবর্ত্তক! বিশ্বাস নির্ভর
কর এই বাক্যে মম, দিব্য দৃষ্টি বলে
হেরিতেছি ভবিষ্যৎ!"

গুরু কুতূহলে
কহিলেন মুগ্ধচিত্তে "তুমি অন্তর্য্যামী
বুঝিলাম প্রভু, আজ! বড় ভাগ্যে আমি
পেয়েছি দর্শন তব! চিরনিশিদিন
নিভৃত হৃদয়-কক্ষে হইয়া বিলীন
যে ধ্যানে রয়েছি ডুবি, সাফল্যের তার
শুনাইলে বার্ত্তা তুমি! এত অত্যাচার
জন্মভূমি বক্ষে মম নীরবে সহিতে
পারি না পারি না আর! মরম-শোণিতে
সঞ্চারিত হলাহল, ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে
জ্ঞান-শক্তি হারাইয়ে দুস্তর-পতনে
মূর্চ্ছাতুর দেশবাসী; জরাচ্ছন্ন প্রাণ
নাহি করে অন্ধকারে আলোক সন্ধান
দারুণ মরণে বরি'! হয় আশা মনে
শুনি শুধু মহাত্মন্! বিশাল ভুবনে
আছ জ্ঞাত প্রতিকার উপায় ইহার
শাশ্বত সহজসাধ্য; তা'ই কৃপা করে
আজিকে আমারে কহ!"

সাধুর অধরে
ফুটিল মধুর হাসি, কন মৃদুভাষে
"সে উপায় কহিবারে তোমারে যে পাশে
এনেছি গোপনে ডাকি'! তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
এখনি কহিব আসি'!"
বন-অন্তরাল
পলকে পশিল সাধু, মাধুরী-বিজলী
চকিতে খেলিয়া গেল! গুরু কুতূহলি
রহিলা একাকী বসি'! ধূনির অনল
নিরখিতে ভবিষ্যৎ হইল চঞ্চল
বিস্তারি' সহস্রশিখা!
ম্লান করি তায়
বিশ্ব-চিত্ত-উন্মাদক রূপের প্রভায়
তিলোত্তমা সমা এক অপূর্ব্ব সুন্দরী
সহসা পশিল সেথা; সারা অঙ্গ ভরি'
ঝলকিছে বহুমূল্য হীরকখচিত
সুবিচিত্র অলঙ্কার, যেন উলসিত
চাঁদে চুম্বি' তারাদল!
বিস্মিত গুরুর
পদতলে বসি' বামা কহিল মধুর
আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে-"ক্ষম হে সুন্দর!
রূপমুগ্ধা রমণীর তৃষিত অন্তর
উৎসৃষ্ট চরণে তব! ছদ্ম-সাধুবেশে
আহ্বানিয়া এ বিজন অরণ্য প্রদেশে
তোমারে এনেছি দেব! ফুলের মতন
বিকশিত উচ্ছ্বসিত প্রফুল্ল যৌবন
অতুল ঐশ্বর্য্য আর, সব সমর্পন
করিতেছি তব করে! হে প্রাণ-অঞ্জন!
লহ তুমি কৃপা করে! রাতুল চরণে
দাও স্থান এ দাসীরে!"
সুরেন্দ্র-ভবনে
বীরেন্দ্র পার্থের পাশে মুগ্ধা উর্ব্বসীর
প্রেম-নিবেদন এ কি! কাল-ভুজঙ্গীর
একি তপ্ত বিষশ্বাস! শিখগুরু ত্বরা
ঈষৎ পশ্চাতে সরি' দীপ্ত বহ্নিভরা
কহিলেন বজ্রকণ্ঠে "কে তুই ডাকিনী
ছলিতে আসিলি মোরে?"
হাসিয়া কামিনী
সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানি' অন্তর-অন্তরে
লালসার বহ্নি ঢাকি' সোহাগের স্বরে
উত্তরিল "হে প্রশান্ত! শান্ত হও তুমি,—
আমি তো পিশাচী নহি! সারা আর্য্যভূমি
একটু করুণা তরে আজিকে যাহার
রয়েছে উন্মুখ হয়ে 'অনুপ কোঁয়ার'
আমি সেই, প্রাণেশ্বর! শৌর্য্য বীর্য্য তব
মোর বুদ্ধি অর্থ সনে মিলি' অভিনব
অদম্য শক্তির ধারা করিয়া সৃজন
জন্মভূমি বক্ষ হতে সকল বেদন
কলঙ্ক-কালিমা সব দিবে প্রক্ষালিয়া
জাহ্নবী-প্রবাহ সম! গর্ব্বে উপেক্ষিয়া
যেও না হৃদয় মোর! পূজার থালায়
লহ তুলি' তব নাথ! ধন্য হায়,
জীবন যৌবন মম, হইবে সফল
উদগ্র সাধনা তব!"
মুহূর্ত্তে অনল
স্পর্শিল স্ফুলিঙ্গ স্তূপে! দৃপ্ত ক্রোধভরে
কহিলেন শিখগুরু (নিশীথ অম্বরে
গর্জ্জিল অশনি যেন!) "অনুপ কোঁয়ার!
জানি তোরে দুশ্চারিণি! ধিক শতবার
যৌবনে সম্পদে তোর! তুই যদি আজ
না হ'তি অবধ্যা নারী, হানিতাম বাজ
তোর শিরে পদাঘাতে, সকল স্পর্দ্ধায়
নিমেষে বিচূর্ণ করি'! অধর্ম্ম-ছায়ায়
ধর্ম্মগুরু ভারতের উদ্ধার সাধন
চাহে না গোবিন্দসিংহ! লইয়া জীবন
দূর হয়ে যা রে তুই! প্রগল্‌ভা তোর
ক্ষমিলাম সব আমি!"

নিশি হ'ল ভোর
অকস্মাৎ অতর্কিতে! মুখরি' কানন
স্বভাব ঋত্বিকবৃন্দ বিহঙ্গমগণ
"জয় গুরুজীর জয়!" উঠিল গাহিয়া
মধুর ললিত-কণ্ঠে, সে তানে মাতিয়া
বননির্ঝরিণীকুল গাহিল পুলকে
"জয় গুরুজীর জয়!" দ্যুলোকে ভূলোকে
দ্বারে দ্বারে প্রভঞ্জন ধাইল গাহিয়া
"জয় গুরুজীর জয়!" নয়ন মেলিয়া
সে তানে মিলায়ে তান পবিত্র স্পন্দন
জাগাইয়ে মহাব্যোমে গাহিল ভুবন
"জয় গুরুজীর জয়!"

কত বর্ষ পরে
বঙ্গের চারণ কবি নিভৃত অন্তরে
সে মহান্ জয়ধ্বনি করিছে শ্রবণ
আত্মহারা হয়ে আজ! পুণ্য-নিকেতন
হে প্রিয় স্বদেশ মোর! গোপন আত্মায়
বরি' লহ হেন দৃঢ় চরিত্র নিষ্ঠায়
অপূর্ব্ব এ স্বার্থত্যাগে! গাহ আরবার
নেহারি' গোবিন্দসিংহে সম্মুখে তোমার
পরম আনন্দভরে নোয়াইয়ে শির
"জয় গুরুজীর জয়! জয় গুরুজীর!"

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

জাতীয়তা।

জাতির প্রতি আত্মবৎ মমত্ব বুদ্ধির নামই জাতীয়তা। ব্যক্তির আত্মপ্রেম তাহাকে সর্ব্বদাই হৃষ্টপুষ্ট রাখিতে, আনন্দময় দেখিতে চায়। অধীনতায় সঙ্কুচিত ও মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া স্বাতন্ত্র্যলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। দশজন মানুষের মধ্যে আপন চরণের উপর দাঁড়াইয়া উন্নতমস্তকে অসঙ্কোচে যেন একজন মানুষের মত ব্যবহার করিতে পায়—দলিত পেষিত ঘৃণ্য জীবনের দুর্ব্বলতা হইতে দূরে থাকিয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ ফলে সম্পূজিত হয়; ব্যক্তির আত্ম-প্রেম তাহাই আকাঙ্ক্ষা করে। প্রতিকূলতায় সে বাসনা প্রত্যেক ব্যক্তিরই পূর্ণ না হইলেও আত্ম-প্রেমের অস্তিত্ব লোপ হয় না। উহা ক্ষণ কালের জন্যও ব্যক্তিকে ত্যাগ করে না আজীবন সাথে সাথে থাকিয়া পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের শিক্ষা দেয়—মুক্তির পথে টানিয়া লইয়া যায়। সুধাময়ী মুক্তির আসনে উপবিষ্ট দেখিতে চায়; তাই ব্যক্তিমাত্রেই স্বাতন্ত্র্যকামী। আত্ম-প্রেমের অভাব হইলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি বৃদ্ধির চিন্তা মনে উদ্রিক্তই হইত না, ব্যক্তি জীবনহীন প্রস্তরবৎ হইয়া যাইত। আত্ম-প্রেমই তাহাকে অনুভূতি সম্পন্ন করিয়াছে; তাই সে ব্যক্তি নামে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তাই তাহার সর্ব্বস্ব।

মানব হৃদয়ে যখন আত্ম-প্রেমের ন্যায় জাতীয় মমতা স্থান লাভ করে; তখন জাতীয় সুখ দুঃখের চিন্তা, লাভালাভের গণনা, মানাপমানের ভাবনা, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণা তাহার মস্তিষ্ক অধিকার করে। জাতীয় আনন্দে আনন্দিত, জাতীয় উৎপীড়নে আপনাকে উৎপীড়িত, জাতীয় সমুন্নতিতে আপনাকে গৌরবমণ্ডিত মনে করে। জাতির সহিত নিজের অস্তিত্ব মিশাইয়া দেয়। জাতিকে যতদিন উন্নত জাতির সমকক্ষ করিয়া তুলিতে

না পারে; ততদিন তাঁহার কর্ম্মের শেষ হয় না। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, জাতীয় বিপুল স্বার্থই তাঁহার জীবনে একমাত্র বরণীয় হইয়া থাকে। জাতীয়তার উন্মাদনায়, ত্যাগের উজ্জ্বলতায় দেশ আলোকিত ও পবিত্র করে। প্রত্যেক জাতিতেই কোন মহনীয় চরিত্র মহাপুরুষের হৃদয়ে জাতীয়তা জন্মলাভ করে। জগজ্জীবন তপন যেমন উষার অন্ধকারে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় রশ্মিমালায় অন্ধকার নষ্ট করতঃ ধরণীতল আলোকিত করিয়া মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড কিরণ বিকীরণ করেন; জাগতিক প্রত্যেক বস্তু তাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করে; তেমনই জাতীয়তামত্ত মহাত্মার হৃদয় হইতে ক্রমে ক্রমে সমগ্র জাতিতে জাতীয় মমত্ব বোধ সম্প্রসারিত হইয়া জাতিকে জাতীয়তা সম্পন্ন করিয়া তোলে। তাহার ফলে জাতির প্রতি নরনারীর হৃদয়ে আত্মমর্য্যাদা বোধ জাগ্রত হয়—জাতির অঙ্গবিশেষ কোনরূপ বেদনা পাইলে সেই বেদনা প্রত্যেকের হৃদয়ে অনুভূত হইয়া চঞ্চলতা প্রদান করে। জাতি বা জাতির অঙ্গবিশেষের প্রতি অধিকার, অত্যাচার, লাঞ্ছনা জনিত ব্যথা প্রত্যেকের মর্ম্ম পীড়াদায়ক হইয়া থাকে। ব্যক্তিত্বের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ন্যায় জাতির স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কামনা স্বাভাবিকরূপে হৃদয়ে হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। জাতীয়তার অকৃত্রিমতার গুণে ক্ষুদ্র জাতি ও বৃহৎ জাতির ভয়ের হেতু ও সম্মানের ভাজন হয়—'বড়'র পিরিতি তাহাকে বন্ধুত্বের আসনে বসাইয়া তৃপ্তিবোধ করে।

জাতীয়তাবর্জ্জিত ছিন্নভিন্ন জন বহুল বিরাট জাতিও হৃদয়ের দোষহীন কর্ম্মবশে একতা বিহীন মৃতবৎ জাতীয় জীবনটাকে শক্তিশালী জাতির হস্তে তুলিয়া দিয়াই আরাম বোধ করে, পদতলে পড়িয়া থাকিয়া পদ লেহন করিতেই ভালবাসে! আঘাতে সাড়া দিবার শক্তিটাও হারাইয়া ফেলে। যখন অসহ্য হয় শুধু অশ্রুপাত করে। হস্ত পদ সঞ্চালনের শক্তিটুকু পর্য্যন্ত থাকেনা—মানুষের মত দাঁড়াইবার সাহস ত দূরের কথা। জাতির অন্তর্গত কোন ব্যক্তি সাড়া দিবার প্রয়াস করিলে সকলে মিলিয়া তাহাকে টানিয়া ভূতলে ফেলিয়া চাপিয়া ধরিয়া থাকে। যেম্নি আছি তেম্নি থাকি, এই ভাবটাই তাহাদের প্রবল। সুতরাং জাতীয়তা-বিহীন জাতিমাত্রকেই সর্ব্বদা অত্যাচার অবিচারের তিক্ত আস্বাদ ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়—ইহাই তাহার সুনিশ্চিত কর্ম্মফল!

সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, আমরা ভারতবাসী জাতীয়তা বর্জ্জিত জাতি। 'জাতীয়তা' শব্দটী অধুনা প্রায় সকলের মুখে উচ্চারিত হইলেও জাতীয়তার অনুভূতি আমাদের অনেকেরই নাই। জাতীয় মমত্ব বুদ্ধি কতিপয় মহাপুরুষের হৃদয়মন্দিরে স্থান লাভ করিয়া থাকিলেও অবশিষ্ট নরনারী জাতীয় মমতা পরিশূন্য ইহা বলিতে আমরা কুণ্ঠিত নহে।

জাতির জন্য ত্যাগস্বীকারই জাতীয়তার প্রধান লক্ষণ। আত্মবৎ সমগ্র জাতিকে যতদিন অনুভব না করা যায় ততদিন জাতির সুখদুঃখে মানাপমানে হর্ষ বিষাদ আসেনা। জাতীয় স্বার্থের জন্য ব্যক্তিত্বের সুবিধা বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের মধ্যে কয়জনের সেরূপ স্বভাবের বিকাশ দেখা যায়? আমরা সামান্য সামান্য স্বার্থ লইয়া মারামারি করি, নামযশের ভাগ লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া মরি—ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইলে সরিয়া পড়ি?

দেশাত্মবোধ সম্পন্ন কোন মহাত্মা ত্যাগের মহিমায় দেশ উদ্ভাসিত করিয়া দেশবাসীকে ত্যাগের পথে টানিয়া লইতে সক্ষম হইলে, আমরা দ্বেষবুদ্ধির অধীনতাপাশ ছিন্ন করিতে পারিনা বলিয়া, তাঁহার কার্য্যে বাধা উৎপাদনের চেষ্টা করি—তাঁহার ক্রটী বিচ্যুতি বড় করিয়া দেখাইয়া দেশবাসীকে তাঁহার প্রদর্শিত পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে চাই। তাঁহার সবল সতেজ হৃদয়ের প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ গৃহকোণে বসিয়া থাকি, কেহ কেহ বা দূর হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করি। ইহাতে আর কিছু হউক না হউক ত্রেতার বিভীষণের স্মৃতি বর্ত্তমানে মানবমনে উদিত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই।

দেশের জন্য জাতির জন্য যাঁহারা ত্যাগী ও নির্ভীক কর্ম্মী, তাঁহাদের কর্ম্মফলে দেশের কল্যাণ, জাতীয়তাহীন দেশবাসীর প্রতিকূলতায় যত সামান্য পরিমাণেই সংসাধিত হউক, তাঁহারা তজ্জন্য শ্রদ্ধাভাজন ও ধন্যবাদার্হ। তাঁহারাই দেশবাসীর আদর্শ। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের কর্ম্মই ভারতবাসীকে মনুষ্যোচিত অধিকার প্রদান করিবে।

ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন জাতিই সমুন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ত্যাগ স্বীকার ভিন্ন কোন জাতিরই মুক্তির পথের সন্ধান মিলে নাই। ত্যাগ মন্ত্রের উপাসনা না করিয়া কোন জাতিই ধনৈশ্বর্য্যে প্রভাব প্রতিপত্তিতে অলঙ্কৃত হইতে পারে নাই। ত্যাগই জাতির মুক্তির সেতু।

ত্যাগের মহিমা জাতীয়তার অর্থ কিছু অনুভব করিতে পারিয়াছ কি? যদি না পারিয়া থাক অন্য দেশে অন্য জাতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ বিস্ময়ে হৃদয় অভিভূত হইবে হৃদয়ের অযথা বিদ্যাবুদ্ধি ও বাগ্মিতার গর্ব্ব নষ্ট হইবে; জাতি কেমন করিয়া অধিপতি হয় সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

জনসংখ্যাও দেশের আয়তনে ক্ষুদ্র জাপানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখা যায়? আজ যে জাপান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি নিচয়ের সমকক্ষ? ইহা কি শুধু খাঁটী জাতীয়তার ফল নহে? জাতীয়তার প্রভাবমত্ত দেশের জমিদারবর্গ যদি তাঁহাদের স্ব স্ব সম্পত্তি জাপানরাজের পদতলে স্বেচ্ছায় ঢালিয়া না দিতেন তাঁহাদের ত্যাগের মহিমায় দেশবাসী যদি হৃদয়ে হৃদয়ে জাতীয়তার আসন প্রস্তুত না করিতেন; আজ জগৎ পূজ্য জাপান ক্ষুদ্র ও নগণ্যই থাকিয়া যাইতেন। জাতীয়তার গুণে ক্ষুদ্র বৃহৎ হয়—ক্ষীণশক্তি মহাশক্তিধর হইয়া যায়।

জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তিনিচয়ের অন্যতম জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য একদা বহু খণ্ডে বিভক্ত ছিল; একতাবর্জ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজশক্তির দ্বারা শাসিত হইত। প্রতিবেশী প্রবলরাজ্য কর্ত্তৃক যখন তখন উৎপীড়িত ও অপমানিত হইয়া মর্ম্মপীড়া লাভ করিত। ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি কখনও কল্পনাও করিতে পারে নাই, যে প্রবলের অত্যাচার ও লাঞ্ছনা হইতে তাহারা মুক্তিলাভ করিবে? মহাপ্রাণ বিসমার্কের হৃদয়ে জাতীয়তার প্রদীপ্ত অনল জ্বলিয়া উঠিয়া যখন ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে সেই অনলে গ্রাস করিতে সক্ষম হইলেন তখন তাহাদের দুর্ব্বলতা ভস্মীভূত হইয়া আত্ম-চৈতন্য জাগ্রত হইল। ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের নৃপতিগণ স্ব স্ব রাজত্ব প্রুশিয়া রাজের চরণতলে অঞ্জলী দিয়া প্রভুত্বের সঙ্কোচ সাধন করিয়া জর্ম্মাণ সাম্রাজ্য গঠন করিলেন; সেই দিন হইতেই জর্ম্মাণদেশ বিশ্বরাজ্যে গণ্য হইয়া পড়িল৭ প্রবলের

অত্যাচার হস্তপ্রসারণ বন্ধ করিল। জাতীয়তার অভাবে জর্ম্মাণদেশ হতমান ছিলেন; জাতীয়তার প্রভাবে জগন্মান্য হইলেন।

ফরাসীর জাতীয়তা সুবিখ্যাত। ফরাসী জাতি অকপট জাতীয়তার গুণেই সাধারণ তন্ত্র লাভে সমর্থ হইয়াছিল। আজও তাহাদের মধ্যে সে জাতীয়তার কণামাত্র ক্ষীণতা উৎপন্ন হয় নাই। ফ্রান্সের প্রতি নরনারীর মধ্যে সে অকৃত্রিম জাতীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। একটা সামান্য দৃষ্টান্তের দ্বারাই ইহা প্রতিপন্ন হইবে;—কতিপয় বৎসর গত হয়, ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মাণ কাইসারের নিকট ফ্রান্সের এক গায়িকা গান গায়িতে অস্বীকৃত হয়। তাহাকে কাইসারের সম্মুখে উপস্থিত করিলে সে কাইসার কর্ত্তৃক কেন গান করিবে না জিজ্ঞাসিত হইয়া নির্ভয়ে উত্তর করে যে, "আলসাস লোরেণের বেদনা এখনও ভুলিতে পারি নাই।" জাতীয়তা সঞ্জাত বেদনা ও আত্মমর্য্যাদা বোধ কেমন প্রবল! এরূপ না হইলে কি কোন জাতি সমুন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে?

আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ইংরাজের জাতীয়তার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। জাতীয়তার বলেই ইংরাজ ক্ষুদ্র হইয়াও বৃহতের শাসকপদে অধিষ্ঠিত। জাতীয়তার বৈশিষ্টই তাঁহাকে বিশ্বরাজ্যে অতুলন প্রভুত্বের আসন দিয়াছে। জাতির জন্য ইংরাজের মত ত্যাগী সন্ন্যাসী কে? ইংরাজ ডাক্তার বৌটন দিল্লীর সম্রাট নন্দিনীর রোগমুক্তির পুরস্কার স্বরূপ চাহিলেন—"দেশবাসীর জন্য বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার।" আপনার জন্য কিছুই চাহিলেন না—আপনাকে ভুলিয়া জাতিকে ধনী করিবার উপায় করিয়া দিলেন। ইহাই প্রকৃত জাতীয়তা। এই জাতীয়তার অভাবে জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় পরে—এই জাতীয়তার প্রেরণায় পরাধীন জাতি ও স্বাধীনতা লাভে কৃতার্থ হয়।

এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশমন্বিত বিশ্বের যেখানেই স্বাধীনতার ধ্বজাধারী স্বাধীন রাজ্য দেখিতে পাইবে; ধরিয়া লইও সেইখানেই জাতীয়তার প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে বিরাজমান। পরাধীন শ্রীহীন অপদার্থ জাতির দাসবৎ ঘৃণ্য জীবনের কারণানুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবে "জাতীয়তার অভাব।

ভারতে যে কখনও জাতীয়তা বোধ ছিল না, এমন নহে। তবে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। রাজপুত জাতির জাতীয়তা গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস রচিয়া রাখিয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়ের 'জাতীয়তা' প্রবল মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যেও হিন্দুরাজ্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল। শিখগুরু গোবিন্দসিংহের মহাপ্রাণ-নির্গত 'জাতীয়তা' শিখজাতির হৃদয়ে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া প্রবল পরাক্রান্ত শিখজাতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। পরন্তু সমগ্র ভারতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বিরাট জাতীয়তা বোধ কখনও হয় নাই বলিয়াই জাতীয়তাবর্জ্জিত বিরাট আজ জাতীয়তা-মণ্ডিত ক্ষুদ্রের চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে!

আজ চাই ভারতের বিরাট জাতীয় জীবনে জাতীয়তার সৃষ্টি ও পুষ্টি। ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত চাই বেদনার অনুভূতি। আমাদের জাতীয়তা-বোধ তেমন প্রবল নয় বলিয়াই আমরা এক অঙ্গের আঘাতে অন্য অঙ্গ মর্ম্ম-পীড়া অনুভব করিতে পারি না।

পঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যা-কাণ্ড ও নরনারীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার অনাচার কাহিনী বাস্তব পক্ষেই কি আমাদিগকে তেমন ব্যথিত করিয়াছে? আমরা কি সত্য সত্যই ঐ ঘটনায় অপমানিত বোধ করিয়াছি? আমাদের ভগ্নী জননী আত্মীয় স্বজন নিহত ও অপমানিত হইলে আমরা যেরূপ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতাম, জালিয়ানওয়ালাবাগের ভীষণ ঘটনা কি তদনুরূপচিত্ত বৈকল্য আনয়ন করিয়াছে? কোন কোন মহাপুরুষের চিত্তে জাতীয়তার জাগরণের ফলে তদ্রূপ অবস্থা আসিয়া থাকিলেও অধিকাংশের যে অনুভূতি আসে নাই, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যায়।

যদি পঞ্জাবীর মর্ম্মবেদনায় বাঙ্গালী, মারাঠী গুজরাটী বা মাদ্রাজীর প্রাণে সমবেদনার অনুভূতি সম্ভব হইত, তাহা হইলে আজ জাতীয়তার অনুরোধে একজন ভারতবাসীকেও অত্যাচারী গর্ব্বিত সরকারের সংশ্রবে যাইতে দেখা যাইত না। আত্মসম্মানের অনুপ্রেরণায় ও মর্ম্মবেদনার আতিশয্যে কেহই সরকারের ছায়া স্পর্শ করিত না—করিতে প্রাণ চাহিত না। কাহারও পিতাকে যদি তাহার অন্নদাতা প্রভু পদাঘাত করে; তবে সেই ব্যক্তি কি পিতার অপমানকারী প্রভুর চরণতলে পড়িয়া থাকিবার লোভ ত্যাগ করে না? পেটের দায় থাকিলেও করে—এমন অপমানটা হজম করিয়া সে চাকরী করিতে পারে না। যদি পারে, তবে সে মনুষ্যাধম—অপদার্থ!

যাহারা জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পরেও সরকারের প্রদত্ত সম্মান বা অর্থের লোভে সংশ্রব ত্যাগ করিতে পারে না, তাহাদের জাতীয়তা-বোধ যে জাগ্রত হয় নাই; মনুষ্যত্ব যে তাহাদের দ্বারা রক্ষিত হয় নাই, ইহা বলিলে কি মিথ্যা বলা হয়?

তোমরা 'হামপদ্ম রায়ের গোষ্ঠী' শিক্ষার অভিমান করিতে পারে, বিজ্ঞতার বড়াই করিতে পার, জাতীয়তার ধ্বজা উড়াইতে পার; কিন্তু মানুষের মনের উপর কপটতার পোষাক পরিয়া কর্ম্মহীন জীবনের ম্লানছবি দেখাইয়া ভোগের স্বর্ণ শৃঙ্খল গলায় দোলাইয়া কখনই আসন লাভ করিতে পারিবে না।

দেশ জাগিতেছে—ইহা সত্য কথা। তোমরা শিক্ষিতবর্গ যদি জাতীয়তা সম্পন্ন হইতে তাহা হইলে তাড়াতাড়ি দেশ জাগিয়া যাইত। তোমাদের দোষের মাত্রাধিক্যই তাহা হইতে দিতেছে না।

তোমরা ওকালতী ত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছ—কার্য্যকালে ২।১ জনে ছাড়িতেছে বটে, তোমরা অধিকাংশেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া জাতীয় জীবনের হীনতা জ্ঞাপন করিতেছ। তোমরা দলে দলে স্কুল কলেজ ছাড়িতেছ—দুদিন যাইতে না যাইতেই আবার দলে দলে পরিত্যক্ত স্থানে প্রবিষ্ট হইতেছ।

সহযোগিতাবর্জ্জন নীতির সম্মান সকল ক্ষেত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে দলিত হইতেছে। ইহার ফল এই হয়, সাধারণ জনগণ সংশয়াত্মা হইয়া পড়ে! যত বেগে অগ্রসর হয়, তত বেগ আর থাকে না।

প্রকৃত জাতীয়তা বর্ত্তমানে যত কাজ না করিতেছে; হুজুগ তদপেক্ষা দ্রুত ও অধিক কাজ করাইতেছে। হুজুগের কর্ম্মফল স্থায়ী নহে—জাতীয়তা-সম্ভূত কর্ম্মফল চিরস্থায়ীও অটল।

বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনটি ব্যর্থ হইতে দিলে ভারতের কল্যাণ অনেকদূরে পিছাইয়া পড়িবে। এ সঙ্কটসময়ে প্রত্যেক ভারতবাসীরই ভারতের জন্য চিন্তা করা কর্ত্তব্য। মত পার্থক্য দূরে রাখিয়া জাতীয়তার অনুরোধে সকলে মিলিয়া মিশিয়া আন্দোলনটাকে সফল করিবার নিমিত্ত আত্ম-নিয়োগ করিতে না পারিলে পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

তুমি নেতা হইতে পারিলে না বলিয়া অভিমানে সরিয়া দাঁড়াইলে চলিবে না। যেই নেতা হউক না কেন তাঁহার সাহায্য করিয়া সফলতা লাভ কর; ফলভাগী শুধু নেতা হইবে না; তুমিও হইবে। জাতীয়তাবোধের অল্পতার জন্যই এইরূপ অভিমানের সৃষ্টি হয়। দেখ নাই বিগত ইউরোপের যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড এস্কুইথ পদত্যাগ করিয়া স্থলাভিষিক্ত লর্ড লয়েডজর্জ্জের কেমনভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন? তোমরা হইলে কি করিতে? মন্ত্রী পরিষদের ছায়াও স্পর্শ করিতে না। তোমাদের কার্য্য দেখিয়া মনে হয়, "দেশ উদ্ধার হয় ত তোমাদের দ্বারাই হউক, নচেৎ দেশোদ্ধারের কাজ নাই!" জাতীয়তার অভাবই এরূপ অবস্থার হেতু।

এখনও সময় আছে এখনও ফিরিয়া এস। প্রাথমিক স্বায়ত্তশাসন কি জিনিষ তাহাও একরূপ বুঝিতে পারিয়াছ। সকলে মিলিয়া সহযোগিতা বর্জ্জন করিয়া জাতীয়তার পরিচয় প্রদান কর—স্বরাজ লাভ করিয়া মানুষ নামে অভিহিত হও।

স্বরাজ পাইতে চাহিলে সংঘবদ্ধ হওয়া চাই—সংঘবদ্ধ হইতে জাতীয়তার প্রয়োজন। জাতীয়তার উন্মাদনা ব্যতীত কোন আন্দোলনই সফলতা লাভ করিবে না। জাতীয়তা প্রত্যেক ভারতীয় নর নারীর হৃদয়ে জাগাইয়া তোল; দেখিবে, এমন কোন বাধা নাই, যাহা ভারতের স্বরাজ লাভের অন্তরায় হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

গান।

সিন্ধু-বারোয়াঁ—দাদ্‌রা।

জীবন-তরীর হালখানি এই
ছাড়িনু আজ তোমার হাতে!
যেথায় চলে চলুক্ তরী
দুঃখ-ঝঞ্ঝা বইব মাথে!
যদিই আসে ঝড়ের রাতি
ধ্রুবতারার জ্বাল্‌ব বাতি
মৃত্যু-তরণ শঙ্কাহরণ
কাণ্ডারী গো রইবে সাথে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়।

যিনি একপ্রকার সহায়বলবিহীন অবস্থা হইতে আত্মপ্রতিভায় বিপুল প্রতিষ্ঠা ও অসাধারণ ধন অর্জ্জন করিয়াছিলেন, যিনি রাজদ্বারে আর্ত্তের বন্ধু ও ভরসাস্থল ছিলেন, যিনি অসংখ্য লোকের প্রাণদণ্ড হইতে পরিত্রাণ করিয়া জনসমাজে "জীবন রায়" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন, যাঁহার অলোকসামান্য পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা, মুক্তহস্ত দান, সৌভ্রাত্র্য বাৎসল ও প্রীতি, যাঁহার অসীম ধৈর্য্য, অক্লান্ত শ্রম, অজেয় প্রতিজ্ঞা, অদম্য উৎসাহ এবং সর্ব্বোপরি লোকোত্তর ঔদার্য্য ও ক্ষমা সকলের আদর্শ স্বরূপ ছিল, আজ তাঁহার অমর আত্মা পৃথিবীর ধূলা মাটীর মায়া কাটাইয়া ও সকল জ্বালা যন্ত্রণা ও কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া অমর লোকে, জগজ্জননীর অমৃতময়, শান্তিময় কোলে স্থানলাভ করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ জীবনের মহত্ব আলোচনা ও তাঁহার অশেষ গুণরাজি অনুধ্যান করিয়া আজ তাঁহার সারবত্তা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি।

শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথের ৬ বৎসর বয়সের সময় আমাদিগের জননী স্বর্গারোহণ করেন। তখন আমাদিগের স্বর্গীয় পিতৃদেব পিতৃ ও মাতৃ স্থানীয় হইয়া তাঁহার প্রিয় সন্তানগণকে রক্ষা করিতে থাকেন। এই সময়ে আমি কলেজে প্রবেশ করিয়াছি তাই আমাকে কলিকাতায় থাকিতে হইত। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীগণ সতত পিতৃসঙ্গে বাস করিতেন। শ্রীমানজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিশুগণের জীবন তৎকারণে স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্নেহরসে কিরূপ সিঞ্চিত হইত তাহা বর্ণনীয় নহে, অনুমেয়। দশ এগার বৎসর বয়স হইতে শ্রীমানের আশ্চর্য্য প্রতিভা বিকশিত হইয়া সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতে লাগিল ১৪।১৫ বৎসর বয়সের কবিতা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত ও সময় সময় পত্র হইতে পত্রান্তরে উদ্ধৃত হইতে লাগিল। ১৬ বৎসর বয়সের একখানি কবিতা পুস্তক মুদ্রিত করা হইয়াছিল। প্রাতঃসূর্য্যের প্রথম কিরণ স্পর্শে একটী গোলাপ কলিকা বিকশিত হইতেছে এই ঘটনাবলম্বনে ১৪শ সর্গ অপূর্ব্ব গীতিকবিতা তিনি ১৭ বৎসর বয়সে রচনা করেন। এইরূপে তাঁহার জীবন বসন্তের আরম্ভ তাঁহার মধুর কাকলীতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেব শ্রীমানের প্রতিভা দর্শনে এবং তাঁহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার জন্য বিলাত প্রেরণের কল্পনা করিতে থাকেন এবং তজ্জন্য তাঁহার অশ্বারোহণ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু হায়! অতর্কিত ভাবে কাল সন্ন্যাস রোগ আসিয়া এই সময় আমাদিগের পিতৃদেবকে ছয়দিনের মধ্যেই ইহধাম হইতে লইয়া গেল। তখন মনে হইল শ্রীমানের বিলাত যাইবার কল্পনা ত্যাগই করিতে হইবে। কিন্তু পিতৃ বিয়োগের কঠিন আঘাতের ক্লেশ আংশিক অপনোদন হওয়ায় পরেই শ্রীমান তাঁহার স্বাভাবিক আত্মনির্ভরশীলতা গুণে সাহসের সহিত, একাকী স্বয়ং তৎকালের শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার, খ্যাতনামা স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিলাত যাওয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উপদেশপ্রার্থী হয়েন। মাননীয় ব্যারিষ্টার মহোদয় তাঁহার

প্রতিভা সন্দর্শনে প্রীত হইয়া একখানি অনুরোধ পত্র সহ শ্রীমানকে ময়মনসিংহের মহাপ্রাণ মহারাজা স্বর্গীয় সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের নিকট পাঠাইয়া দেন।

মহারাজা বাহাদুরও শ্রীমানের সহিত আলাপে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিলাতের শিক্ষার ব্যয় ভারের কতক বহন করিতে সম্মত হন ও শ্রীমানকে তখনই কতক টাকা দিয়া বিদায় করেন। শ্রীমান তখনই নিজ বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাড়ী হইতে আর কিছু টাকা লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। তখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। কিঞ্চিদধিক সতর বৎসর বয়স্ক পিতৃ মাতৃহীন যুবক বা বালকের পক্ষে এই ব্যাপার কতদূর ক্ষমতার পরিচায়ক তখন তাহা বুঝি নাই—এখন চিন্তা করিয়া অবাক হইতেছি। এই আত্মনির্ভরশীলতাই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। বাল্যের খেলা ধূলা ক্রিয়া কৌতুকের মধ্যে এই গুণের নিদর্শন—যাহা অনেক সময়েও দোষ বলিয়া ভ্রম হইত—তাহা লক্ষ্য করিতেছি।

বিলাতে তিনি নয় বৎসর কাল ছিলেন। যদিও তাঁহার স্বর্গীয় খুল্লতাত এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ যথা শক্তি সাহায্য করিতেন এবং নিজ নিজ সম্পত্তি বন্ধক দিয়াও তাঁহার জন্য টাকা পাঠাইয়াছেন তথাপি তদ্দারা এই সুদীর্ঘ বিলাত প্রবাসের ব্যয়ের অত্যাল্প অংশই নির্ব্বাহ হইতে পারিত। তিনি নিজের চেষ্টাতেই অন্যান্য মহাত্মাগণের সাহায্য লাভ করিয়া কোনরূপে ব্যয় চালাইতেন। অর্থাভাব নিবন্ধন কোন ২ দিন তিনি এক পেয়ালা চা মাত্র খাইয়া বা এক টুক্‌রা মাংস খাইয়া দিন কাটাইয়াছেন। যদিও তাঁহার শিক্ষকগণ সময় সময় আমার নিকট তাঁহার শিক্ষার উন্নতি বিষয়ক পত্র লিখিয়াছেন—তথাপি অনাটন, অর্থাভাব নিবন্ধন তাঁহার নিয়মিত অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটিত। এই ভাবে তিনি সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিয়া অল্পের জন্য অকৃতকার্য্য হয়েন। পরে তিনি কিছুদিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিঃছাত্র রূপে অধ্যয়ন করেন ও পরিশেষে গ্রেজইন নামক আইন শিক্ষালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৯৮ সনে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। এই নয় বৎসর কাল তাঁহাকে যে কঠোর ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। তৎকালে বিলাত প্রবাসী কোন বাঙ্গালী পরিবার হইতে তাহার নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত হয় যে, আপনি আমাদিগের একটী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে, আপনার বিলাতের সমস্ত ব্যয়ভার আমরা বহন করিব। কিন্তু অর্থলোভে বিবাহ, তিনি কখনই অনুমোদন করিতেন না। এজন্য বিশেষ ক্লেশ অভাব সত্ত্বেও, এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। এই ঘটনা হইতে তাহার মতের উচ্চতা নির্ম্মলতা ও দৃঢ়তা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও কলিকাতা হাইকোর্টে কার্য্য আরম্ভ করেন। কলিকাতা ব্যারিষ্টার শ্রেণীতে ভুক্ত হওয়ার জন্য যে সামান্য টাকার প্রয়োজন, তাহাও তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হয়। কিন্তু তিনি নিজের শক্তি অবগত ছিলেন, এবং তাহারই ভরসায় কোন রূপে আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া ও একখানি বাটী ভাড়া করিয়া শনৈঃ শনৈঃ ব্যবসাতে উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি বিদ্যাভিলাষী, বিদ্যাবিলাসী ছিলেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বহু সংখ্যক গ্রন্থ তাঁহার সঙ্গে আনিয়াছিলেন। বিলাতের এত ক্লেশের মধ্যেও তিনি উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী সংগ্রহে বিরত হন নাই। ঐ সকল গ্রন্থকারগণ তাঁহার চির সহায় ছিল, তাঁহারাই তাঁহার কষ্টে প্রবোধ

দাতা ও উৎসবের সঙ্গী ছিল। ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াও তাঁহাকে অবসর সময়ে নিশীথ কাল পর্য্যন্ত পড়িতে দেখা যাইত। তিনি যেমন বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ ছিলেন তেমনি বিচক্ষণ ও বিদ্বান ছিলেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি মাত্র একবিংশতি বর্ষ কাল কার্য্য করিয়াছেন। এই অনতি দীর্ঘকাল তিনি কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সম্পূর্ণ রূপে নিজ পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নিজের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ও তাহার মহোন্নতি সাধন, পরিজন প্রতিপালন ও আত্মীয় স্বজনগণের সাহায্য করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। রাজদ্বারে নিগৃহীত কত বিপন্নকে তিনি সামান্য অর্থ লইয়া বা অর্থ না লইয়া উদ্ধার করিয়াছেন, রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত কত যুবক তাঁহার চেষ্টায় অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা আজ কে করিবে? লোকলোচনের বাহিরে, তিনি কত দান করিতেন, তাহার ইয়ত্বা নাই। পরিজনের প্রতি তাঁহার কি অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল, তাহা অন্তরঙ্গ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। তাঁহার স্বর্গীয় খুল্লতাত মহাশয়ের নিকট তাঁহার অনেক গুলি টাকা পাওনা ছিল। তাহা তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, গ্রহণ করেন নাই। আমি তাঁহার অগ্রজ, বৃহৎ পরিবার লইয়া যখনই অর্থাভাবে পড়িয়াছি, তখনই তিনি অকাতরে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভাবিতে তিনি বিরত হন নাই। আমার কনিষ্ঠ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ, শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ যখন বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন, তখন শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথের অবস্থা অসচ্ছল না হইলেও শ্রীমানজ্ঞান স্বয়ং ডাক্তার রজার্স, ডাক্তার ব্রাউন প্রভৃতি ডাক্তারগণকে আনিয়া বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। তৎকালে তাঁহার যে সৌভ্রাত্র যে মহাপ্রাণতা দৃষ্ট হইয়াছিল তাহা দেবদুর্লভ, মানুষের কথা কোন্ ছার। এইরূপে তিনি এই বিশ বৎসর কাল, সমস্ত ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয় স্বজনের কত প্রকার সহায়তা করিয়াছেন—অকাতরে অম্লান বদনে তাহাদের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার, কত অর্থ ব্যয়, কত অভাব মোচন করিয়াছেন, তাহা আর কত উল্লেখ করিব। তাহা স্বজনগণের প্রত্যেকের হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে ও থাকিবে। স্বার্থপরতার যুগে এই ভাবে আত্মীয় স্বজনের জন্য অর্থ ব্যয় ও ত্যাগ স্বীকার বেশী দেখা যায় না। এরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও মঙ্গলেচ্ছা রামায়ণাদি কাব্যে পাঠ করিয়াছিলাম, বাস্তব জীবনে তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীমানের ভালবাসা সাহায্য এবং সেবা যে নিজ পরিবারেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল তাহা নহে। তিনি তাঁহার নূতন সমব্যবসায়ীগণকে নিজ সহোদর ভ্রাতার ন্যায় সাহায্য করিতেন। তিনি পাশ্চাত্য সমাজের উচ্চ যে সকল উন্নত ভাব আমাদিগের কল্যাণকর—তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাহ্যিক য়ুরোপীয় তিনি ভাবাপন্ন বলিয়া অনুষ্ঠিত হইতেন—কিন্তু তাঁহার অন্তর সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ভাবাপন্ন ছিল তিনি সুকুমার কলা ও কাব্যামোদী ছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু পুরুষোচিত ধীরোদাত্ত, বীরত্বময় ভাব তাঁহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিত। আজকাল অস্মদ্দেশে পুত্র কন্যাগণের কত সুন্দর মনোমুগ্ধকর নাম রাখা হয়—কিন্তু তাঁহার আদর্শানুযায়ী তাহার একমাত্র পুত্রের নাম বড় সাধ করিয়া "অর্জ্জুন" রাখিয়া গিয়াছেন ক্ষুদ্র হইলেও ইহা তাহার অন্তরের নিগূঢ় দেশপ্রীতি-সূচক সন্দেহ নাই।

শ্রীমান অতি ক্ষমতাশালী ব্যারিষ্টার ছিলেন, এবং সর্ব্বদা ন্যায় পথে বিচরণ করিয়া সকলের নিকট সুনাম ও সম্মান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত নিউবোল্ড সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

"I had a great admiration for Mr. Roy's abilities. Mr. Roy was one of the best Cross-examining Counsel that I had before me and found Mr. Roy absolutely fair in his conduct as an advocate."

শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথের জীবনের উদ্দেশ্যই ছিল মাতৃভূমির সেবা করা। নিজ পরিবারবর্গের জন্য উপযুক্তরূপে ব্যবস্থা করিয়াই, অবিলম্বে স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, বাগ্মিতা প্রভৃতি সমস্ত শক্তি মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত করিবেন, এইরূপ সংকল্প ছিল। তিনি পাঠদ্দশায় বিলাতে অবস্থানকালে ভারত হিতৈষী মহা স্থবির মহামান্য স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজীর ভারত হিতানুষ্ঠানে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তৎকালে তিনি নির্ভীক চিত্তে উচ্চ কণ্ঠে "ভারত ভারতবাসীর জন্য" এই সুমহান্ রাজনৈতিক সূত্র যাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার সার্থকতা আজ দেখা যাইতেছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই কার্য্য কতদূর সাহসের ও অনাবিল রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ দৃষ্টির পরিচায়ক তাহা এ কালে ধারণা করা সহজসাধ্য নহে।

স্বদেশের জন্য সততই তাঁহার প্রাণ কাঁদিত, এ জন্যই তিনি নিজ ব্যবসায়ে ক্ষতি করিয়াও বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হওয়ার জন্য গত বৎসর বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু একদিন রেল হইতে অবতরণ সময়ে, পদে আঘাত প্রাপ্ত হন এবং তজ্জন্য তাহাকে শয্যাগত থাকিতে হয়, তাই তাহার ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তৎসময়ে, তিনি বঙ্গের রায়তগণের অভাব অভিযোগের প্রতিকার কল্পে, রায়ত সমিতি স্থাপন প্রভৃতি প্রজা হিতকর কার্য্যে বিশেষ যত্ন এবং সময় ও অর্থ ব্যয় করেন। রায়তগণ তাহাতে কতদূর কৃতজ্ঞ হইয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন। তাঁহার রোগের সময়ে, তাঁহার রোগমুক্তির জন্য, অনেক স্থলে মন্দিরে ও মস্‌জিদে দেবকার্য্য হইয়াছে এরূপ শ্রুত হইয়াছি। একজন রায়ত তাহার ক্ষেত্রের একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইক্ষুদণ্ড তাঁহারই জন্য রাখিয়া দিয়াছিল, সম্প্রতি তাহা এখানে পৌছিয়াছে। একজন শিক্ষিত রায়ত প্রতিনিধি তাঁহার বিষয় যাহা আমার নিকট লিখিয়াছে তাহার কতক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—"তাঁহার অকাল বিয়োগে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা দেশবাসীমাত্রেই বুঝিতেছে। আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে, তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালার রায়ত যে সর্ব্বতোভাবে উপকৃত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবানের কাজ ভগবানই করিলেন; বাঙ্গালার দরিদ্র রায়ত আজ অদৃষ্টদোষে নিরাশ্রয় ও বন্ধু হীন হইল। দেশ জননীর উজ্জ্বল কণ্ঠমণি স্খলিত হইল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীমান তাঁহার প্রিয় কনিষ্ঠকে ডাকিয়া, কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, "ভাই, এই যে সুন্দর বাড়ী, টাকাকড়ি, জিনিষপত্র, সুন্দরী স্ত্রী, পুত্র দেখিতেছ, যে মুহূর্ত্তে প্রয়োজন বুঝিব, এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া মাতৃভূমির সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে তিলার্দ্ধ ও ইতস্ততঃ করিব না।

রাজনীতি ক্ষেত্রে দেশরঞ্জন চিত্তরঞ্জনের সহিত তাহার মতের অনৈক্য ছিল এবং তাঁহারা বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরভুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু যে দিন শ্রীমানজ্ঞান চিত্তরঞ্জনের মহাবর্জ্জনের সংবাদ শুনিলেন, তাহার পর অবিলম্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আন্তরিক ও ঐকান্তিক ভক্তির সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বলিতে কি হইবে, যে বাঁচিয়া থাকিলে এই মহাপ্রাণ দেশ সেবায় নিজের সমগ্র শক্তি অঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইতেন না? কিন্তু ভগবানের আদেশ অন্যরূপ হইল, তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ হইল না।!

তিনি জীবনে, মরণে একই প্রকার ধৈর্য্য, বিচক্ষণতা এবং নির্ভীকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান অক্ষুণ্ণ ছিল, শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিজ চিকিৎসার বিষয়ে বিজ্ঞতার সহিত উপদেশ দিয়াছেন। রোগের সে দুর্ব্বিসহ যাতনা যে ভাবে তিনি সহিয়াছেন, তাহাতে কি চিকিৎসক, কি শুশ্রূষাকারক, কি আত্মীয় স্বজন সকলেই মুগ্ধ ও অবাক হইয়াছেন।

আর অধিক কি লিখিব! কি বলিব! চূড়াহীন মন্দিরের ন্যায়, মস্তকহীন দেহের ন্যায়, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় আজ এই পরিবার! কিন্তু ভাবনা কিসের? জগৎপাতা জগদীশ্বর তাঁহার সন্তানগণকে রক্ষা করিতেছেন এবং করিবেন। যে অমর-আত্মা এ পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষা লইয়া এই লোকে এতদিন বাস করিয়া গেলেন, তিনি অমর লোক হইতেও তাহার শিশুপুত্র এবং শোকাকুলা সহধর্ম্মিণী ও প্রিয় পরিজনগণের কল্যাণ সাধন করিবেন। আমরা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে অবিচলিত থাকিতে পারিলেই, তাঁহার আত্মীয় নামের যোগ্য হইতে পারিব এবং তাঁহার প্রতি প্রকৃত প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইবে। তাহার পর মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই। তাঁহার জীবলীলা সমাপ্তির কিছু পূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিলেন "দাদা আমি চলিলাম।" ইহাই প্রকৃত কথা, আত্মা বিনষ্ট হয় না—লোকান্তরে চলিয়া যায়। আমরাও সত্বরই সেই পথের পথিক হইয়া, পুণ্যবল থাকিলে, পুনরায় তাঁহার সঙ্গ লাভ করিব, এই আশায় আশ্বস্ত হই। জীবমাত্রেই মরণশীল, অগ্র পশ্চাৎ সকলকেই একই স্থানে যাইতে হইবে। মৃত্যু সাময়িক বিচ্ছেদমাত্র। তাহাতে মুহ্যমান না হইয়া যাহাতে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তাঁহার সঙ্গ লাভ করিতে পারি তাহারই চেষ্টা করা উচিত। ইহা ব্যতীত সান্ত্বনার আর কিছুই নাই।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়।

বৈশাখী পূর্ণিমা

কবি বলিয়া গিয়াছেন, "পুণ্যদা পূর্ণিমা তিথি বৈশাখের মাসে।" বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি পুণ্যদা কেন? সাধারণের উত্তর কি তা এখানে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। একটা বিশেষ অর্থও আছে। ভারত আধ্যাত্মিকতার জন্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসের এক অতি শ্রেষ্ঠ অংশ এই পূর্ণিমার সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। এই তিথিতেই শাক্যমুনি জন্মগ্রহণ করেন, এই তিথিতেই তাঁহার বুদ্ধত্ব লাভ হয়,

এবং এই তিথিতেই বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। আবার গৌতমবুদ্ধ যে নিশান ফেলিয়া গেলেন, সেই নিশান ধরিয়া তুলিয়া তিনি এ দেশে আধ্যাত্মিকতার মহাস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন সেই আচার্য্যশঙ্করেরও তিরোধানের তিথি এই বৈশাখী পূর্ণিমা। সুতরাং এ পূর্ণিমা যে পুণ্যদা তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। ইহার সঙ্গে বুদ্ধও শঙ্কর এই দুই যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি গ্রথিত। বুদ্ধদেব মানবাত্মাকে বাহ্য আচার নিয়মের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া সেই নৈতিক জীবনের স্বাধীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যাহা না পাইলে ধর্ম্মজীবন, অধ্যাত্ম জীবন আরম্ভই হয় না। সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণই ধর্ম্ম, (religion) আর সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন আত্মপ্রতিষ্ঠাই নীতি। (morality) নীতিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ধর্ম্ম আসে না। যার আত্মপ্রতিষ্ঠা নাই, তার আত্মসমর্পণ কবন্ধের শিরঃপীড়ার ন্যায় অলীক। বুদ্ধের মধ্য দিয়া না গেলে শঙ্করে পৌছান যায় না। কিন্তু উভয়ের সম্মিলন কোথায়? নীতি—স্বাধীন আত্মপ্রতিষ্ঠা (Free Self-determination)—ইহাই বুদ্ধভাব ; ধর্ম্ম—ব্রহ্মে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ (Absolute Self abnegation in God)—ইহাই শঙ্করভাব। সুতরাং বুদ্ধ যতক্ষণ আছেন শঙ্কর আসিতে পারেন না। আবার শঙ্কর যখন আসিলেন বুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপেই তিরোহিত হইতে হইবে। তবে উভয়কে কি আমরা একসঙ্গে অভ্যর্থনা করিতে পারিব না? ইহার অর্থ কি এই, যে, মানবের নীতি ও ধর্ম্ম, Morality ও Religion একসঙ্গে অবস্থিতি করিতে পারে না? এমন তত্ত্ব (Philosophy) কি নাই যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে বুদ্ধ ও শঙ্কর স্বতন্ত্রভাবে কেবল ইতিহাসের আলোচ্য না থাকিয়া একসঙ্গে আমাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য গ্রহণ করিতে পারেন? সাধারণ চিন্তাবিহীন মানুষ ধর্ম্ম ও নীতিতে কোন অসামঞ্জস্য দেখে না। কেন না, নীতি তাহার কাছে কতকগুলি বাহ্যিক নিয়ম পালন, বুদ্ধদেব যাহা দুর্নীতি বলিয়া পরিহার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মও সাধারণ মানুষের কাছে কতকগুলি নিয়ম পালন। সুতরাং দুই দফা নিয়মপালনের মধ্যে একটা গুরুতর অসামঞ্জস্য কোন সময়েই তার চক্ষে পড়ে না। কিন্তু নীতি—যদি হয় আত্মপ্রতিষ্ঠা (Self determination) এবং ধর্ম্ম যদি হয় আত্মসম্বরণ (Self surrender) তবে এক অন্যের বিধ্বংসী হইয়া দাঁড়ায়। উভয়ের সমন্বয় কোথায়? সে মহাতত্ত্ব কি যাহার সুশীতল ছায়ায় বুদ্ধ ও শঙ্কর উভয়েই সঞ্জীবিত হইয়া উঠেন, কেহ কাহাকে বাধা দেন না? এই পুণ্যদা পূর্ণিমা তিথিতে উভয়ের পুণ্যস্মৃতি আমাদের অন্তরে জাগ্রত হইয়াছে, আমরা আজ সেই তত্ত্বের অনুধ্যান করি যাহার সঞ্জীবন স্পর্শে বুদ্ধ শঙ্কর একসঙ্গে আমাদের অন্তরে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠেন। বুদ্ধদেব যে আত্মাকে স্ব-প্রতিষ্ঠ করিয়াছেন, নিয়মের জাল হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন এবং শঙ্কর যে আত্মার অনুসরণ করিতে যাইয়া আর যা কিছু সব মায়াসাগরে ডুবাইয়া দিয়াছেন,—এই দুই এরই সত্তা স্বীকার করিয়া উভয়ের মৌলিক একত্বের (Fundamental unityর) সুস্পষ্ট ধারণাই সেই তত্ত্ব। আমরা আজ এই তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করি, যাহারই মধ্যে কেবল মানবাত্মার স্বাধীনতা (Free self determination) ও তাহার ঈশ্বরাধীনতার (Self surrender to God) সামঞ্জস্য। এই তত্ত্বই কেবল আমাদের বৈশাখী পূর্ণিমার উৎসবকে পূর্ণতা দান করিতে পারে। নতুবা

বাহিরের উৎসব বাহিরে পড়িয়া থাকিবে, আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিবে না। উহা শঙ্কর ও বুদ্ধ উভয়েরই অবজ্ঞার বস্তু। এই তত্ত্বেই বুদ্ধ ও শঙ্করের মিলন ও মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের সফলতা।

ভারতের আধ্যাত্মিকতার বিবর্ত্তনে যিনি একাধারে বুদ্ধ ও শঙ্করের সাধন সম্পদের সমাবেশ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিও আজ স্বতঃই আমাদের স্মৃতিপথের পথিক না হইয়া পারিতেছেন না। তিনি বুদ্ধ ও শঙ্করের সম্মিলন ভূমি। রামমোহন বুদ্ধনীতির সার কথা মানবাত্মার স্বাধীনতার ধ্বজা লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে স্বাধীনতার সম্মুখে বাহ্য আচার ব্যবহারের জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি স্বীয় জীবনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে এমন মহিমাময় গৌরবমুকুটে বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন, যাহার নিকটে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপুরুষও মাথা না নোয়াইয়া নিস্কৃতি পান নাই। (ইহাই আধ্যাত্মিকতার বিবর্ত্তনে একদিককার স্থাপন Thesis) এই রামমোহনই কিন্তু—"কর অহঙ্কার খর্ব্ব, ত্যজ মন দ্বৈতগর্ব্ব, একাত্মা জানিবে সর্ব্ব অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়" বলিয়া পরমাত্মসাগরে সব বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। (ইহাই খণ্ডণ antithesis) রামমোহনই আবার "যে তোমার আত্মারূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত চরাচরে" এই সূত্রে বুদ্ধাত্মা ও শঙ্করাত্মার মৌলিক একত্ব (সমীকরণ Synthesis) হৃদয়ে ধারণ করিয়া মানবের অধ্যাত্মজীবনের পূর্ণ সফলতার আদর্শ দেখাইবার জন্য নবযুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যে তিথিতে বুদ্ধ ও শঙ্করের তিরোভাব সেই তিথির উৎসবে আমাদের মধ্যে রামমোহন উপস্থিতির জল্পনায় ভাবগত (লজিক্যাল্) পৌর্ব্বপর্য্যায় ক্রমভঙ্গদোষে দোষী হইব না। বরং ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহাদ্বারা সে ক্রমের অভীষ্ট নিরবচ্ছিন্নতাই রক্ষিত হইল। তাই আজ রামমোহনকেও স্মরণ না করিয়া পারিতেছি না। * কিন্তু অদ্ভুত, অতি অদ্ভুত বাস্তব ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরার সন্নিপাত (Chronological coincidence) আমি যতদূর গণণা করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাতে বৈশাখী পূর্ণিমা শ্রীরামমোহনের জন্মতিথি বলিয়া আমারও দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে। রাজার জন্মদিন সৌর জ্যৈষ্ঠমাসে। প্রতি তৃতীয় বর্ষে মলমাসের বৎসরে বৈশাখী পূর্ণিমা জ্যৈষ্ঠের প্রথমে যাইয়া পড়ে। † পুরাতন পঞ্জিকার সাহায্যে গণনা করিয়া দেখিয়াছি রামমোহনের জন্ম বৎসরে বৈশাখী পূর্ণিমা জ্যৈষ্ঠ মাসেই ঘটিয়াছিল। যে তিথিতে ভারতের ধর্ম্ম-বিবর্ত্তনের ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান ত্রিযুগাবতারের স্মৃতি এমন করিয়া একত্র সমাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহা যে পুণ্যদা সে কথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং যাঁহারা রামমোহনের স্মৃতি রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছেন; যদি তাঁহারা রাধানগরে রামমোহন সরোবরের তীরে বৈশাখী পূর্ণিমায় রামমোহন মেলা বসাইতে পারেন তবে রাজার স্মৃতিরক্ষার সঙ্গে বৈশাখী পূর্ণিমার সৌন্দর্য্যের দিক্ (Picturesque side)ও বজায় থাকে।

এখন এই সৌন্দর্য্যের দিকের কথাই বলিব। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না তাঁহাদের কাছে কি এই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না বিধৌত নীলাকাশের কোন

* ১৩২৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার কোন বিশেষ উপাসনার ভাব লইয়া যখন এই প্রবন্ধ রচিত হয় তখন কেবল আধ্যাত্মিকযোগের কথাই মনে হইয়াছিল। জ্যোতিষিক কৌতূহল পরে হইয়াছিল, যদিও অব্যবহিত পরে।

† ১৩২৮ সালের পঞ্জিকা দেখিলেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।

সমাচার নাই? আজ লৌকিক ধর্ম্ম নিয়মে শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোলোৎসব। পুষ্প বাহ্যসৌন্দর্য্যের নিদর্শন। আজ বাহ্যসৌন্দর্য্যে গা ঢালিয়া দিবার দিন—বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে কোলাকুলির দিন। মানবাত্মার উপর এই পূর্ণচন্দ্রের কি এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণীশক্তি আছে যাহার হস্ত হইতে সাধুমহাত্মাগণও অব্যাহতি পান নাই। এরূপ কথিত আছে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকাইয়াই সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিয়াছিলেন। বাহ্যপ্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যকে আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের আরম্ভ এই বাহ্যপ্রকৃতিকে লইয়া। ইহাকে মায়ার বন্ধন, সয়তানের খেলা বলিয়া দূরে পরিহার করিবার উপায় নাই। এই বাহ্যপ্রকৃতিকেও আপনার করিয়া লইতে হইবে। যাহাতে আনন্দ পাই, তাহাকে আপনার করা কত সহজ। ঐ সুন্দর ফুলটিকে কত সহজে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনার করিয়া লই। এই বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়াই সর্ব্বপ্রথম আমাদের সুন্দরের সঙ্গে যোগ হয়। সুতরাং এই প্রকৃতিও আমাদের অনুধ্যানের বিষয়। জাতীয় জীবনধারার অভিব্যক্তিতে (প্রাচীন ঋষিগণের উত্তরাধিকার সূত্রে) শঙ্কর 'সত্যং'এর, বুদ্ধ 'শিবং'এর আর কৃষ্ণ 'সুন্দরং'এর বিকাশ। রামমোহনে তিনেরই সমাবেশ। সুন্দরের উপাসনায় রাজা কাহারও পশ্চাতে নহেন। যাহা হউক, কৃষ্ণ নামের (Conceptএর) মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই অভিপ্রেত ছিল—বিশেষভাবে এই লৌকিক ধর্ম্মের। কিন্তু লৌকিক ধর্ম্ম আপনার সে উদ্দেশ্য (mission) সুসম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সৌন্দর্য্যের জায়গায় তার উল্টাটাই বা সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন! এই অনাসৃষ্টির জন্য, জাতীয় জীবনের সৌন্দর্য্যবোধের ধারা যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে দায়ী, তাহা না স্বীকার করিলে অবিচার করা হইবে। বাহ্যপ্রকৃতিকে ধরিতে যাইয়া আমরা প্রতিপদেই তাহার অতীত হইয়া পড়ি। হয় মায়া বলিয়া উড়াইয়া দি, না হয় ব্রহ্মে লীন করি, না হয় তো এক অর্থ বাহির করিয়া সেটাকে পশ্চাতে ফেলিয়া দি। ঠিক সেটাকে সেইটা বলিয়া কখনও ধরি না। এক কুৎসিৎ চেহারা গড়িয়া তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় বসিয়া যাই; মানুষের ধরের উপর এক হাতীর মাথা বসাইয়া দিয়া যুগযুগান্ত ধরিয়া ফিলসফাইজ্ করিয়া আসিতেছি। ভুলিয়া গিয়াছি, সৌন্দর্য্যবোধ ফিলসফি নয়, আর্ট। সৌন্দর্য্যরসবেত্তা দার্শনিক নহেন, কলাবিৎ। চিরদিনই 'সুন্দরং'কে 'সত্যং' ও 'শিবং'এর চাপা দিয়া অগ্রসর হইয়াছি, তাই যত অনাসৃষ্টি জমা হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা কেহ অস্বীকার করিবে না, সান্ত অনন্তেরই পাদপীঠ, অনন্তের প্রকাশরূপে সান্তকে না দেখিলে ভুল দেখা হইল। কিন্তু এ কথাও কি সত্য নয়, অনন্ত যে একটা বিশেষ আকারে নিজেকে প্রকট করিয়া ইহাকে মহিমান্বিত করিয়াছেন, তাহার সেই বিশেষত্বটিকে অন্য নিরপেক্ষভাবে উপলব্ধি না করিলে সেটাকে ভুল দেখা হইল। বিশেষের মধ্যে নির্ব্বিশেষকে দেখা হিন্দু-দৃষ্টি। বিশেষকে বিশেষরূপে দেখিয়া তাহার বিশেষত্ব-টিকেই পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা গ্রীক্‌ভাব। এই গ্রীক্ ভাবের ভাবুক না হইলে যথার্থ সৌন্দর্য্যবোধ বিকশিত হয় না। যেখানেই সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে তাহা এই ভাবের দ্বারাই ফুটিয়াছে। আমরা প্রধানতঃ এই ভাবের অনুসরণ করি নাই। আমরা আমাদের দার্শনিকের দৃষ্টি লইয়াই অগ্রসর হইয়াছি। সে দৃষ্টি ছাড়িয়া জগতের উপর দৃষ্টিপাত করিতে পারি নাই।

কাকের পা দুখানিকে লম্বা করিয়া ও তদনুপাতে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গড়িয়া এক মানুষের ছবি আঁকিয়া বলিলাম ইনি বুদ্ধদেব! শরীরের অপচয়ে আত্মার উপচয় অর্থাৎ সৌন্দর্য্য সূচিত হইতেছে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যবোধের জন্য সভাষ্য ফিলসফিচাই, এক মল্লিনাথ অবশ্যই প্রয়োজন। এই শ্রেণীর সৌন্দর্য্যবোধকে আমি বলিয়াছি সত্য ও মঙ্গলের দ্বারা সুন্দরকে আচ্ছাদন করা। সত্য ও মঙ্গলের ন্যায় যে সুন্দরেরও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্ত্বা আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। সুন্দরকে সত্য ও মঙ্গলের পাদপীঠরূপে স্বীকার করিলেই চলিবে না। ঐ ব্যাখ্যার দ্বারাই যদি বুদ্ধদেবের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হয়, তবে তো একখানা কেতাব লিখিলেই হইত, ছবি আঁকিবার বা মূর্ত্তি গড়িবার কি প্রয়োজন ছিল! দার্শনিক কলাবিদ্‌কে স্থানচ্যুত করিয়া কলার প্রাণ হরণ করিয়াছে। আমরা দার্শনিকের চক্ষে জগৎ দেখি বলিয়া আমাদের কাব্যগুলিতেও এত দর্শন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে যে অন্য দেশের দর্শনেও এত দর্শন আছে কি না সন্দেহ। (অবশ্য, প্লেটোর Dialogues গুলি প্রধানতঃ কাব্য কি দর্শন সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ মতদ্বৈধ প্রকাশ করিয়াছেন। Inge তাঁর Gifford Lectures 1917—1918, প্লেটোর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "No system can be had in his writings. He was a poet and prophet." সুতরাং আমাদিগকে কলাবিদের দৃষ্টিতেই বাহ্য জগতের উপর দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। নতুবা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিব না। আবার এই সুসভ্য কলাবিদের দৃষ্টিই বাহ্য জগৎকে গ্রহণ করিবার একমাত্র পন্থা নহে। সেই জন্য, একটু পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থাকিলেও, আমরা কত ভাবে বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি, তাহারই একটু আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মসাধন। প্রকৃতি সর্ব্বদা একরূপে অবস্থান করেন না। হ্রাসবৃদ্ধি রহিয়াছে। আদিম মানব আদিতেও করিয়াছিল এবং এখনও এই বৃদ্ধি ও অভ্যুদয়ের সময়ে (The Season of Exuberance in nature) আনন্দে আত্মহারা হইয়া প্রকৃতির মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া প্রকৃতিরই অঙ্গীভূত হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করে প্রকৃতিরই মধ্যে সে আত্মলাভ করে, প্রকৃতির এই উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়াই আপনাকে বিকশিত করে। সে আপনাকে প্রকৃতির সঙ্গে এক বলিয়া ধরিতে পারিয়াছিল তাই তাহার মধ্যে বিশ্বপ্রীতি ফুটিয়াছিল। বুদ্ধদেব আমাদিগকে সর্ব্বজীবে মৈত্রী শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের বিশ্বমৈত্রীক ভাব আমরা আমাদের এই আর্য্যপূর্ব্ব আদি পিতৃপুরুষের নিকট পাইয়াছি। মানুষ যতই সভ্যতামার্গে অগ্রসর হইয়াছে ততই সে প্রকৃতির ক্রোড় ভ্রষ্ট হইয়া এই সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। আবার স্রোত ফিরিয়া, সহরবাসী সুসভ্য মানব, প্রকৃতির অনুকরণে সৌন্দর্য্যচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু আদিম মানবের দানের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এই যে আমাদের দোল হিন্দোল রাস পুষ্পদোল শারদীয় উৎসব সকলই তো এই প্রকৃতির অভ্যুদয়কালীন আনন্দোচ্ছ্বাস। কিন্তু আমরা এখন হইয়াছি ফিলজফার, তাই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় লাগিয়া গিয়াছি। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ শকুন্তলায় আশ্রম ত্যাগকালীন পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদির সঙ্গে যে সপ্রেম সম্ভাষণ তাহা দেখিয়া ইটপাটকেল ও

কতকগুলি অভ্যস্তকর্ম্ম পিঞ্জরাবদ্ধ আমাদের সহরবাসী সুসভ্য আত্মাকে কি তাঁহার কাছে নিতান্তই খাট বলিয়া মনে হয় না?

দ্বিতীয়তঃ, মানুষ নিজেই নিজের বিশেষ অবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গ লাভ করিবার জন্য লালায়িত হয়। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে এখনও প্রথা আছে যে দীক্ষা গ্রহণের পর বনে প্রস্থান করে ও প্রকৃতির সঙ্গসাধনে লিপ্ত হইয়া থাকে। উপনয়নের পর আমাদেরও ব্রাহ্মণ কিছু দিন প্রকৃতি চর্চ্চায় নিযুক্ত হয়; ইহা নিশ্চয়ই সেই আদিম পিতৃ-পুরুষগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

তৃতীয়তঃ, গ্রীক্‌ভাবে প্রকৃতি সাধন। ইহার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। বিশেষকে বিশেষরূপে দেখিয়াই তাহার সঙ্গে একত্বসাধন তাহার প্রাণ ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রবেশ ও তাহার উপলব্ধি। একটি ফুল লইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ ও উহারই মত সুন্দর, উহারই মত কোমল হইয়া উঠিবার চেষ্টা। হিন্দুভাবের ন্যায় উহাকে সমগ্রের মধ্যে ডুবাইয়া দিবার প্রয়াস নহে। এমন যে প্লেটো যিনি পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবাদের (Idealism) জনক তাঁহারও আইডিয়া (Concept) গুলি যেন কাঁটাছাটা একএকটি বিশেষ (particular) বিষয় জগতের (Objective world) এক একটি অঙ্গ। বিশেষত্বনিষ্ঠ গ্রীক্‌প্রকৃতির আওতায় (Envirnment) মধ্যে আর কিছুর আশা আমরা করিতেই পারি না। প্লেটো হিন্দু হইলে তাঁর দর্শন ঐ আকার কথনও ধরিত না।

চতুর্থতঃ, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও তাহাদের সম্বন্ধকে আমাদের অধ্যাত্মজীবনের অভিব্যক্তির নিদর্শনরূপে দেখিতে পারি। যেমন সূর্য্যোদয়কে আত্মার উদ্বোধন স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। এখানেও প্রকৃতির বস্তুগতসত্তাকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিতে হইবে, গ্রহণ করিতে হইবে, উপভোগ করিতে হইবে। আমরা জানি সূর্য্য উঠে, কিন্তু কয়দিন সূর্য্যোদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তাহার সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া আত্মাকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি? পাহাড়ের পশ্চাদ্দেশ হইতে সূর্য্যোদয়ের মহামহিমা, সমুদ্রে সূর্য্যাস্তের বিষাদপূর্ণ গাম্ভীর্য্যের মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক অভ্যুদয় ব্যসনের উপলব্ধি সহস্রগুণ বৰ্দ্ধিত হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আগে এই ঘটনা নিচয়ের সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিবার শক্তি সঞ্চয় চাই। অন্যদিকে অধ্যাত্ম দৃষ্টিরও উদ্বোধন চাই। কুজ্ঝটিকাবসানে কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য দর্শনে সপ্ততিপর বৃদ্ধকেও হাততালি দিয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু সন্দেহ-কুয়াসা-মুক্ত আত্মা জ্ঞানের আলোক দেখিয়া, যে এমনি আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিবে এই উপমার কয়জন উক্ত পরিচিত স্বভাবের শোভার মধ্যে ডুবিয়া তাহা উপভোগ করিয়া থাকেন!

পঞ্চমতঃ, সমগ্র বাহ্য প্রকৃতিকে মহাপ্রাণের এক অখণ্ড লীলা বলিয়া দর্শন। মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়া নহে, রজ্জুতে সর্পভ্রম বলিয়া নহে, জগৎকে ব্রহ্মে লীন করিয়া দিয়া নহে, কিন্তু ইহাকে এক জীবন্ত জাগ্রত মহাপ্রাণের বাস্তব খেলা, তাঁহার প্রাণের অভিব্যক্তি, প্রাণের তরঙ্গ বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রতিস্পর্শে তাহারই স্পর্শ, প্রতি দর্শনে তাঁহারই দৃষ্টি, প্রতিকর্ণে তাঁহারই শ্রুতি। তিনি ইহারই মধ্যে পূর্ণরূপে আপনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। •

ইহা তাঁহারই প্রাণের খেলা। পদ্মগন্ধে তাঁরই গাত্রগন্ধানুভূতি, দাবানল দর্শনে ভগবানের বহ্নুৎসব বলিয়া হাত তালি দিয়া নৃত্যের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য তা কি অনির্ব্বচনীয় নহে? এইরূপে বাহ্য জগৎকে বাস্তব সত্তা রূপে গ্রহণ করিয়া বিশেষকে উড়াইয়া না দিয়া কিন্তু তাহার বিশেষত্বকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া যদি আমরা অনন্তের অন্বেষণে ছুটি তবেই আমাদের তপস্যা আমাদিগকে পূর্ণ ব্রহ্মের চরণতলে উপনীত করিবে। অন্য কোন পথে যদি যাই জাতীয় জীবন যাহার সাক্ষ্য একাধিকবার দিয়াছে—আমরা পৌঁছিব গিয়া মহা শূণ্যতায়। তাই মনে রাখিতে হইবে, জগৎটা মায়ার খেলা নয়, প্রেমের লীলা।

প্রেমের গতি সৌন্দর্য্যের দিকে। তাই, প্রকৃতির গায়ে, তার মুখচোখ দিয়া সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সেই পরম সুন্দর যে স্বহস্তে আপনার চিত্র আপনি আঁকিয়া তুলিতেছেন। তাই জগৎ সুন্দর। প্রশ্ন এই, এই বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদে ও ফুলে কি কেহ সেই সুন্দরকে দেখিলেন না? কবি উত্তরে গাহিয়া উঠিলেন—

তুমি সুন্দর, তাই তোমার বিশ্ব সুন্দর শোভাময়।
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল দৃশ্য নন্দন-প্রভাময়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বর্ষা গেছে

যাচ্ছে উড়ে শাদা শাদা ভাঙ্গা চোরা মেঘের গাদা
জ্বালার ঝলক্ বুকের তলায় সরে গেছে;
গর্জ্জে গর্জ্জে বর্ষা ধারা ঝরে গেছে।

লক্ষ্যহারা শূন্যপথে যাচ্চে দূরে হাওয়ার রথে;
গাছের পাতার বিলাপ-গাথা ভুলে গেছে;
ক্ষিতির সাথের স্থিতির বাঁধন খুলে গেছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বেদে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের স্থান।

আমরা সর্ব্বদাই শুনিতেছি স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই। "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা"। আবার ইহাও শুনিতেছি যে, "শ্রুতিস্মৃত্যোর্বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরিয়সী", অথবা "ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ"॥ আমরা বিনা বিচারে বিনা অনুসন্ধানে মানিয়া লই যে, শ্রীমদ্‌ভাগবত যখন বলিতেছে, "স্ত্রীলোকের বেদশ্রবণে অধিকার নাই" অথবা মনু যখন বলিতেছেন "নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথক্ যজ্ঞো" (৫—১৫৫), অবশ্য বেদেও ঐ কথাই আছে। কিন্তু বেদ খুলিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা প্রতারিত হইয়াছি।

লোপামুদ্রা (১—১৭৯), বিশ্ববারা (৫—২৮), শাশ্বতী (৮—১—৩৪), অপালা (৮—৯১—৭), ঘোষা (১০—৪০), রাত্রি (১০—১২৭), জুহূ (১০—১০৯), সূর্য্যা (১০—৮৫), যমী (১০—১৫৪), এবং শচী (১০—১৫৯), এই সকল নারী-ব্রহ্মবাদিনী বেদের ঋষি বা দ্রষ্টা,—অর্থাৎ বেদমন্ত্রের রচয়িতা বা "মন্ত্রকৃতঃ"। শ্রীমদ্ভাগবত "পাষণ্ডি" নাম দিয়া বৌদ্ধদিগের উপরে কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেনঃ—"জলৌঘৈর্নিরভিদ্যন্ত সেতবোবর্ষতীশ্বরে। পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈর্বেদমার্গঃ কলৌ যথা"॥ ১০—২০—২৩॥ "ঈশ্বর যখন বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন জলের বেগে আহত সেতু সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, যেমন কলিযুগে পাষণ্ডিদিগের নাস্তিকভাবাপন্ন শাস্ত্রের প্রভাবে বেদমার্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।" আমরা আশা করি, পাঠক "পরের মুখে ঝাল না খাইয়া" নিজে বেদের নিক্তিতে ওজন করিয়া স্থির করিবেন, কে ন্যায়তঃ বেদমার্গ উৎসাদনের অপরাধে অধিক অপরাধী, বৌদ্ধেরাই অধিক অপরাধী, না যাঁহারা বলিতেছেন, "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" আমরা দৃষ্টান্তরূপে প্রথমে নারী ঋষি বিশ্ববারাদৃষ্ট সূক্তটি, এবং পরে কিতব বা শূদ্র-ঋষি কবষ-দৃষ্ট সূক্ত-পঞ্চক সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। বিশ্ববারা বলিতেছেনঃ—"সমিদ্ধো অগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেৎ প্রত্যঙুষসমুর্বিয়া বিভাতি। এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমোভির্দেবা ইলানা হবিষা ঘৃতাচী"॥ ৫—২৮—১॥ "অগ্নি সম্যকরূপে প্রজ্বলিত; তাহার তেজ আকাশের দিকে বিস্তৃত হইতেছে; উষার অভিমুখে সেই তেজ বিশেষরূপে দীপ্তি পাইতেছে। বিশ্ববারাও স্তোত্রদ্বারা দেবগণের স্তব করিতে করিতে হবির্যুক্ত 'স্রুক্' (ঘৃতপ্রক্ষেপার্থ হাতা বা চামচ) লইয়া পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইতেছে।" "অগ্নেশর্ধ * মহতে সৌভগায় তব দ্যুম্ননি উত্তমানি সন্তু। সং জ্যাম্পত্যং সুযমমা কৃণুষ"॥ ৫—২৮—৩॥ "হে অগ্নে, শত্রু দমন কর, যেন মহা সৌভাগ্য লাভ হয়, তোমার উৎকৃষ্টতম তেজ প্রকাশিত হউক। আর, হে অগ্নে, দাম্পত্য-সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।" এস্থলে আমরা দেখিতেছি, বিশ্ববারা নারী, অথচ মন্ত্ররচয়িতা বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি স্বয়ং অগ্নিকে যজ্ঞে আহ্বান করিতেছেন, অতএব তিনি হোতা। তিনি স্বয়ং "নমঃ" বা স্তব উচ্চারণ করিতেছেন, অতএব তিনি উদ্গাতা। "হবিষা ঘৃতাচী",—তিনি ঘৃত-প্রক্ষেপক স্রুকে করিয়া হবিঃ বা হোমদ্রব্য লইয়া অগ্নিতে হোম করিতে যাইতেছেন, অতএব তিনি অধ্বর্য্যু। আবার বিশ্ববারার উপরে যজ্ঞের তত্ত্বাবধায়ক-রূপে এস্থলে অন্য কেহ নাই, অতএব বিশ্ববারা স্বয়ংই তাঁহার কৃত এই যজ্ঞের ব্রহ্মা। পাঠক এস্থলে স্পষ্ট দেখিতেছেন, বৈদিক যজ্ঞাদি কার্য্যের সমস্ত অধিকার নারীতে বর্ত্তমান। "ত্রয়ী" অর্থাৎ—"বেদে স্ত্রীলোকের অনধিকার" বলাতে কি 'শ্রীমদ্ভাগবত', "নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথক্ যজ্ঞঃ" বলাতে কি 'মনু-সংহিতা', বেদমার্গ উৎসাদনের অপরাধের অপরাধী হইতেছেন না?

আর একটী মহামূল্য তত্ত্বরত্ন আমরা কবষ-দৃষ্ট সূক্ত হইতে লাভ করিতেছি সেটি কি? মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে ভৃগু বলিতেছেন "ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং," অসৃজৎ ব্রাহ্মনানেব পূর্ব্বং ব্রহ্মা

* "শৃধ প্রসহনে" পা।

প্রজাপতীন্‌," "হিংসানৃত প্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ। কৃষ্ণাঃ শৌচ-পরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ" (১৮৮—১০, ১, ৩)। মহাভারতের মতে ভীষ্মের সাক্ষ্য মতে শূদ্রেরাও দ্বিজ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, পুণ্ড্র শবর-মুতিবা ইত্যাদি অন্ত্যজেরা ও বিশ্বামিত্রের সন্তান—"বৈশ্বামিত্রজ দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠাঃ" (৭—৩—১৮)। বেদের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকাতে, আমরা এতকাল বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মন "মুখবাহুরূপদতঃ। ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রং চ নিরবর্ত্তয়ৎ "(মনু, ১—৩১)। আমরা শান্তিপর্ব্বে প্রকাশিত তত্বরত্নের সমাদর করি নাই। কবষ-দৃষ্ট সূক্তে আমরা সাক্ষাৎভাবে দেখিতেছি যে, বেদে সর্ব্বে বর্ণাদ্বিজাতয়ঃ," নিত্য "দ্বিজায়েঃ,"—শুধু—তন্ত্রোক্ত ভৈরবী চক্রে নয়। হায়, বেদ মার্গের নামে দেশ এতকাল কত শয়তান সেবাই না করিয়াছে! ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ স্বয়ং সাক্ষ্য দিতেছেন যে, ইলুষের পুত্র কবষ একজন বেদ মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি, এবং সেই কবষ "দাস্যাঃপুত্রঃ কিতবোঽ ব্রাহ্মণঃ।" কবষ দৃষ্ট সূক্তে আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, দাসী পুত্র অব্রাহ্মণ কিতব কবষ একজন ঋগ্বেদীয় ঋষি, ঋগ্বেদের পাঁচটি সূক্তের রচয়িতা বা দ্রষ্টা। সুধু তাহা নয়, বেদে দেখা যায়, এই দাসীপুত্র, অব্রাহ্মণ, কিতব (জুয়ারি), রাজা কুরুশ্রবণের যজ্ঞের 'ঋষি' বা মন্ত্রদ্রষ্টা। তিনি রাজা মিত্রাতিথিরও 'বন্দিতা' বা স্তোত্র-রচয়িতা। (১০—৩৩—৪, ৭)। কবষ বলিতেছেন, "কুরুশ্রবণমাবৃণি রাজানং ত্রাসদস্যবং। মংহিষ্ঠং বাঘতাং ঋষিঃ বা মন্ত্রদ্রষ্টারূপে ত্রসদস্যুর পুত্র মহাদাতা "আমি ঋষি কুরুশ্রবণের নিকটে স্তোত্র-গায়ক ঋত্বিক্‌দিগের জন্য ধন প্রার্থনা করিতেছি।" তিনি রাজা মিত্রাতিথির পুত্রকে, পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া, বলিতেছেন, "অধি পুত্রো পমশ্রবো নপাম্মিত্রাতিথেরিহি। পিতুষ্টে অস্মি বন্দিতা"—"হে আমার পুত্রস্থানীয় মিত্রাতিথির পুত্র উপমশ্রব, আমার নিকটে এস। আমি তোমার পিতার স্তোত্র-রচয়িতা।" সুধু তাহাও নয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ স্বয়ংই সাক্ষ্য দিতেছেন যে, এই অব্রাহ্মণ দাসীপুত্র কবষের দৃষ্ট "প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেতু অপো অচ্ছা", "(গাতু) গমনশীল সোম (ব্রহ্মণে) স্তোত্রের সহিত (দেবত্রা) দ্যোতমান জলের নিকটে (প্র এতু) ভালরূপে গমন করুক' ইত্যাদি সূক্ত (১০—৩০) ব্যবহার করিয়া, সরস্বতী নদীতীরে যজ্ঞকারী অভিজাত্যাভিমানী (ব্রাহ্মণ) ঋষিগণ—"অপাং প্রিয়ং ধামোপাগচ্ছন্‌" (ঐত ২—৩—১৯) 'জল দেবতার প্রিয় স্থান লাভ করিয়াছিলেন।' হায়, শঙ্করাচার্য্যের মত শুদ্ধাদ্বৈতবাদী মহাপুরুষও কি না নিতান্ত বেদ-বিরুদ্ধ কথা বলিলেন :—"যচ্চেদং শূদ্রো যজ্ঞেঽনভিক্লিপ্তঃ ইতি তন্ন্যায়পূর্ব্বকত্বাৎ বিদ্যায়ামপি অনবক্লিপ্তত্বং দ্যোতয়তি, ন্যায়স্য সাধারণত্বাৎ"—(ব্র-সূ, ১—৩—৩৪) "শূদ্রের যজ্ঞে অনধিকার যখন ন্যায় সঙ্গত, তাহাতেই শূদ্রের বিদ্যাতে অনধিকারও প্রতিপন্ন হইতেছে, কারণ ন্যায় সর্ব্বত্র সাধারণ।" লোক সকল পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ, আমাদের কৃত ব্যাখ্যাতে বিশ্বাস করিবে না" (২—১—১) এই ভয়ে কি শঙ্করও এমন বেদ-বিরুদ্ধ কথা বলিলেন? অথবা বৌদ্ধ সময়ে মূল বেদ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এজন্য মূল বেদ বা ত্রয়ী সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যেরও কোনরূপ সাক্ষাৎ জ্ঞান ছিল না। "ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ" (মনু, ২—১৩), "বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনং" মনু, (১২—৯৪), শঙ্করাচার্য্য স্বয়ংও বলিতেছেন, "বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে।" ২—১—১॥ এমন কি জৈমিনি পর্য্যন্ত তাঁহার মীমাংসাসূত্রে সূত্র করিতেছেন, "বিরোধে ত্বনপেক্ষ্যং স্যাৎ"

(১—৩—৩) "শ্রুতি বিরুদ্ধা স্মৃতিরপ্রমাণং" (শবর-ভাষ্য)। "বেদবিরুদ্ধ কথা আদরের অযোগ্য—শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতিপ্রমাণ নয়"। বেদ আমাদিগের সর্ব্বশাস্ত্রের শিরোমণিস্বরূপ, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। তবুও কি সেই সাক্ষাৎদৃষ্ট বেদমার্গ অদ্যাপি কণ্টকাকীর্ণ থাকিবে? কবষ-দৃষ্ট এই সূক্তপঞ্চক ভারতমাতার নয়নমণিস্বরূপ। বেদের প্রচার হইলে কবষের দৃষ্টান্ত নিশ্চয় ভারতবাসীদিগকে নূতন চক্ষু দান করিবে, এই বিনাশোন্মুখ হিন্দু জাতিকে—Dying Raceকে"—প্রকৃত বেদমার্গ প্রদর্শন করিয়া পৃথিবীর অপরাপর জীবিত জাতি সকলের ন্যায়, প্রকৃত জীবন্ত জাতীয়তার সোপানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিবে।*

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

সাঙ্খ্য বেদান্ত ও শাক্তাগম।

সাঙ্খ্য, বেদান্ত এবং আগম শাস্ত্রের উদ্দেশ্য একভাবে দেখিতে গেলে একই। সাঙ্খ্যের পুরুষ কেবল সাক্ষীচেতা; বেদান্তের ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দম্ এবং আগম শাস্ত্রের শিবশক্তি ও সচ্চিদানন্দ পদ বাচ্য। যিনি তত্ত্বানুন্বেষী, তাঁরই মনে একটা ধোঁকা হয় যে, জীবমাত্রেই সর্ব্বদা দ্বৈতের রাজত্বে বাস করে অথচ দ্বৈতাতীত হবার কোন উপায় আছে কি না এবং উপায় থাকিলেও দ্বৈতাতীত অবস্থা সত্য কি না? এই সংশয়ের বা ধোঁকার সামঞ্জস্য অতি কঠিন। অনেক সময়ে যে ব্যক্তি যে ভাবে এবং যে উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, সে সেই ভাবে উপলব্ধি করে। কিন্তু আমার মনে হয়, যে, বিশেষভাবে বিবেচনা করিলে মূলতঃ কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। যদিও সাঙ্খ্য বলেন যে, পুরুষ কেবল সাক্ষীচেতা সে পরিণামী নয়। তাহার কোন পরিণাম হয় না অর্থাৎ ইংরাজী কথায় He is pure consciousness। কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে অহম্ এবং ইদম্ ইংরাজি কথায় I and this ত সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি। তবে অহম এবং ইদম এই দুই বাক্যের সামঞ্জস্য কি প্রকারে হইবে? সাঙ্খ্য বলেন যে, প্রকৃতি অথবা প্রধান জড়, পরিণামী এবং পুরুষের ভোগের জন্য সে পরিণাম পুরুষের সংস্পর্শে পরিণামী।

ভাবিয়া দেখুন যে পুরুষ যদি না থাকে তাহা হইলে সে পরিণামের দর্শক কে? যদি কলে নাট্যাভিনয় হয় (Theatrical performance by a mechanical process) এবং সেই অভিনয় দেখ্‌বার কোন দ্রষ্টা বা শ্রোতা না থাকে, তাহা হইলে সে অভিনয়ের সার্থকতা কি? সাঙ্খ্য বলেন জড় প্রকৃতি পরিণামশীলা, নৃত্যময়ী, নর্ত্তকী আর দর্শক পুরুষ; এই দুয়ের সামঞ্জস্য কি প্রকারে হয়! যে জড়, সে ত জড় আছে ও থাকিবে। যে দর্শক এবং শ্রোতা, সে ত দর্শক এবং শ্রোতা আছে ও থাকিবে। এই দুয়ের সামঞ্জস্য কি প্রকারে সম্ভব। সাঙ্খ্যদর্শন এই অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য, এই প্রকারে একটা উদাহরণ দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যথা রক্তজবা কুসুম ও স্ফটিকমণি। জবাকুসুম স্বভাবতঃ রক্তিম, স্ফটিক স্বভাবতঃ শুভ্র। দুয়ের যখন সান্নিধ্য হয় স্ফটিক ও রক্তিম দেখায়। সেই প্রকার জড় প্রকৃতির সান্নিধ্যে, পুরুষ দর্শক এবং শ্রোতা হইয়া প্রকৃতির পরিণাম কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হন। কিন্তু যদি পুরুষ বিস্ময় হয় এবং প্রকৃতি জড় হয় তাহা হইলে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি করিয়া হইতে

* লেখকের খ্বগ্বেদ নামক গ্রন্থ হইতে।

পারে? অতএব আমার বক্তব্য এই যে সাঙ্খ্য দ্বৈতবাদী হইলেও সেই দ্বৈতবাদকে রক্ষা করিতে গিয়া একটা বিষম বিভ্রাটে উপনীত হইয়াছে কিন্তু সাঙ্খ্যের প্রাধান্য এই যে সাঙ্খ্য পুরুষ কেবল চেতাসাক্ষী স্বীকার করায় চিৎ (pure consciousness) স্বীকার করিয়াছেন। এই স্বীকার করিয়া জগতের অহম্ ও ইদম্ এই দ্বৈতের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলের গ্রহণীয় হয় নাই। কিন্তু যখন প্রকৃতি এবং পুরুষের পরস্পর সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন, তখন দেখিতে হইবে যে, অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু জীবের দ্বৈতভাব কিসে হইল, তৎসম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন সেটা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ mysterious. এখন দেখা যাক বেদান্ত শাস্ত্র কি বলে এখানে আমি শঙ্করাচার্য্যের যাহা অভিমত তাহাই গ্রহণ করিয়া দু চার কথা বলি। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে শ্রুতির মহাবাক্য "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" রক্ষা করিতে গেলে "একমেবাদ্বিতীয়ম" তো স্বীকার করিতেই হইবে। তবে জগতে যে অহম এবং ইদম I and this এই যে দ্বৈতভাব কোথা হইতে আইসে। বেদান্ত শাস্ত্র বলেন যে, এটা "মায়াবীজ্রীম্ভন" এটা মিথ্যা। ইহার কোন পারমার্থিক সত্বা নাই। কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করা হইল মায়া কি? তিনি বলিলেন মায়া সৎ (সত্য) নয় (not real) অথচ মায়া অসৎ (অসত্য) নয় (not unreal) এবং মায়া সদসৎ নয় not partly real and not partly unreal) তবে মায়া কি? তিনি ব্রহ্ম সাপেক্ষ তিনি মিথ্যাভূতা সনাতনী Eternal falsity জগতে যে দুই দেখি অর্থাৎ অহম এবং ইদমের যে পার্থক্য করি সেটা ভ্রান্তি (Ignorance) ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়। পাঠকগণ দেখিবেন যে বেদান্ত শাস্ত্র এক চিন্ময় বস্তু অথবা সম্বিৎ (pure conciousness) ছাড়া গ্রহণ না করিলেও একবস্তু দুইভাবে প্রকটিত কেন হয় তাহার বিচার এই যেমন সাঙ্খ্য গোঁজামিল দিয়াছেন, বেদান্ত ও সেই গোঁজামিল দিতেছেন এবং বলিতেছেন ইহা অনির্ব্বচনীয় (not explainable in our terms of logical duality) এখন দেখা যাক আগম শাস্ত্র কি বলেন। আগম শাস্ত্র বলেন শিব নিষ্কল, নির্গুণ, এক পরম সত্বা, তিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি চিৎ (pure consciousness) কিন্তু তিনি শক্তিমান। তিনি এবং তাঁর মহাশক্তি এক। তিনি বিভু এবং শক্তিমান অতএব তিনি তাঁহার শক্তিবলে পূর্ণও থাকিতে পারেন অথচ পূর্ণ থাকিয়াও লীলার জন্য শক্তি আচ্ছাদন করিয়া আবরণ করিয়া তাঁহার পূর্ণত্বে হ্রাস করিয়া এক হইলেও, দুই হইয়া, বহু হইয়া নিজের অসীম শক্তি সীমাবদ্ধ করিয়া জগতে বহুত্ব স্থাপন করেন অথচ তাহাতে তাঁহার পূর্ণত্বের একত্বের, কোন হ্রাস হয় না। আগমশাস্ত্র বলেন যে ইহা সত্য, কিন্তু সে সত্যের উপলব্ধি করিতে হইলে সাধনার দরকার। ইহাতেও দাঁড়াইল এই যে, একই বস্তু দুই হইয়া, বহু হইয়া, কেন প্রতীয়মান হয় তাহা অনির্ব্বচনীয়। তাহাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে, সাধনার দ্বারা সেই বস্তু যাহা একই অথচ দুই, বহু, কেন হয় তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের বাক্যের দ্বারা সে গূঢ়তত্ত্ব (mystery) গ্রহণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। অদ্য আমার শেষ বক্তব্য এই, যে, শাস্ত্র আলোচনার আবশ্যক, সে আলোচনা জ্ঞানলাভের এক প্রধান উপায়। কিন্তু যথার্থ জ্ঞান, সাধনা ব্যতীত হইতে পারে না। আর

প্রত্যেক জীবকে করিতে হইবে। যিনি সে সাধনা করিতে প্রস্তুত নন, তিনিই এক সংবস্তু দ্বিধা হইয়া, বহুধা হইয়া কেন প্রতীয়মান হয় তাহা জানিবার অধিকারী নহেন।

শ্রীব্যোমকেশ শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী।

আরোগ্যের রহস্য।

আট বছরের একটি পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় শিশু, অসুখে পড়িয়া তাহার বন্ধুকে জানাইলে, বন্ধু নিজের পিতাকে, পিতা প্রতিবেশী এক বৈদ্যকে, ও বৈদ্য এক সুবিজ্ঞ চিকিৎসককে আনাইয়া শিশুটিকে রক্ষা করিলেন।

এখানে শিশুটির রোগমুক্তির মূলে ছিল কি? তাহার আরোগ্য লাভের আন্তরিক ইচ্ছা। মানুষ সহজে পরাধীনতা চাহেনা, হয়ত সে নিজের বন্ধুকে জানাইবার পূর্ব্বে আপন বুদ্ধিমত কিছু চেষ্টাও করিয়া থাকিবে। তাহার বৈফল্যেই, বোধ হয় তাহার বন্ধুকে সংবাদ দেওয়া। মানুষ সহজে নিজের বাহাদুরী ছাড়ে না, বন্ধুও হয়ত নিজের বুদ্ধি মত কিছু একটা পরামর্শ তাহাকে দিয়া থাকিবে,—সে হয়ত সেই পরামর্শ মত চলিয়া ফল পায় নাই। বন্ধু তখন নরম হইয়া, সম্ভবতঃ কিছু বিপন্ন বোধ করিয়া, পিতাকে জানাইয়াছিল। তিনিও যে নিজের বিদ্যা চালাইয়া, দীনহীন শিশুটিকে বিনা খরচায় বাঁচাইয়া দিবার চেষ্টা করেন নাই,—এমন বোধ হয় না। বিফল হইয়াই হয়ত শেষে বৈদ্যকে ডাকাইয়াছিলেন। প্রথমে অবশ্য অল্পে কাজ সারার চেষ্টা,—তাহারই বৈফল্যে শেষে বড় চিকিৎসকের আগমন ও রোগীর আরোগ্য লাভ।

বাহ্যতঃ ব্যাপারটি এইরূপই বটে;—কিন্তু ভিতরে আরও কিছু আছে। সেই সহিষ্ণু শিশুটি নিজ বন্ধু হইতে বৈদ্যপর্য্যন্ত সকলেরই চিকিৎসার অত্যাচার কেবল যে নীরবে সহ্য করিয়াছিল তাহা নহে,—তাহাকেই নিজের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন জানিয়া একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছিল, এবং পথ্যাদি সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সংযম রক্ষা করিয়াছিল। প্রথমটি না থাকিলে তাহার উপর কাহারই সহানুভূতি হইত না, সংযম না থাকিলে ঐ সহানুভূতি-জাত সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইত। ফলতঃ রোগমুক্তির মূলকথা শ্রদ্ধা ও সংযম। যাহা ঠিক বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহা সে আপনা হইতেই করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ভিষক-ভেদে ও অসুখটির অবস্থা ভেদে যে নানারূপ ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল,—তাহাকে সে উপদ্রব মাত্র বোধ না করিয়া ধীরভাবে পথ্যাপথ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

ঐ রোগমুক্তির ন্যায় সকল মুক্তিরই সাধনপথ একরূপ। যাহা মঙ্গল বলিয়া বোধ হইবে, নিষ্ঠার সহিত তাহার অনুসরণ করিলে সত্যের পথ উন্মুক্ত হয়,—সাধক স্তর হইতে স্তরান্তরে নীত হইয়া অবশেষে বুদ্ধপদ লাভ করেন। ভগবান তাঁহার জীবকে নিরাশ্রয় রাখেন নাই, তাহার মধ্যে যে সত্য বুদ্ধিটুকু ক্ষীণ ধারায় অবিরতই প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই মর্য্যাদা যদি সে যথারীতি রক্ষা করিতে পারে; তাহাই অবশেষে তাহাকে মোক্ষপদবীতে উত্তীর্ণ

করিবে,—স্বল্পমপ্যস্যধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। Mission (ব্রত) ব্যক্তিভেদে স্বতন্ত্র, সত্যপন্থার অনুসরণ করিলে—অর্থাৎ সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ জ্ঞানেই যে নিম্নস্তরের তত্ত্বকে শ্রেষ্ঠ সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে তাহারই অনুসরণ করিলে—ক্রমশঃ সত্যের মহত্তর মূর্ত্তি সাধকের সম্মুখে প্রকাশিত হয়, হয়ত শেষে তিনি সেই Missionএর সন্ধানও লাভ করেন। সেখানে তিনি শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন,—কারণ তাঁহার যাহা Mission তাহা ভাগবত কর্ম্ম ত বটেই, তাহার উপর সেই বিশেষ mission.—সেই বিশেষ ভাগবত কার্য্যের নায়ক তিনি স্বয়ং;—সেখানে শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী সকলেরই আসন তাঁহার নীচে, তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এই missionএর সন্ধান যে সকল সময় পাওয়াই যায় তাহা নহে,—যে দীর্ঘ সাধনায় সে সিদ্ধি লাভ করা যায় মানবের আয়ুষ্কাল হয়তো তাহার তুলনায় অতি সঙ্কীর্ণ, সুতরাং mission হয়ত ঠিক বুঝাই যায় না,—কিন্তু একথা ঠিক, যদি কখন বুঝা যায়, তাহা এই সত্যসাধন দ্বারাই বুঝা যায়,—অন্যথা নহে। পরকাল তত্ত্ব জানিনা, কিন্তু জীবনান্ত কালের পূর্ব্বে এই mission এর সন্ধান পাইলেও সাধকের কার্য্য সিদ্ধি হয়। সেই ব্রত নিজের জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে আর হয়ত তাঁহার সময় থাকে না,—কিন্তু তিনি অপরের হৃদয় ক্ষেত্রে উহার বীজ রোপণ করিয়া যাইতে পারেন। হয়ত বহু সাধনের ফলে তিনি যে সত্য লাভ করিলেন তাহা কোন শৈশবের Copybookএ লিখিত ছিল, কিন্তু এভাবে কুড়াইয়া পাওয়া ও সাধনায় পাওয়া একবস্তু নহে,—সে জিনিষে প্রাণ নাই, ইহাতে আছে। নাম প্রচার অনেকেই করেন,—কিন্তু গৌরাঙ্গের মত 'দন্তে তৃণ করিয়া' ও 'আমায় কিনিয়া রাখ' বলিয়া প্রচার খুব কম লোকেই পারে। 'নাম' যে তাঁহার বহু সাধনার সিদ্ধি 'নাম' যে তাঁহার সর্ব্বস্ব। তাহার প্রচার কেবল মুখের ভাষায় নহে,—চোখে মুখে ভাবে ভঙ্গীতে তাঁহার সমগ্র চৈতন্য যেন তাঁহার প্রচারের ভাষাকে সবল ও অপরাজেয় করিয়া তুলে। যে সাধক সমস্ত জীবনের চেষ্টার পর জরাজীর্ণ অবস্থায় নিজব্রতের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তাঁহার ও পক্ষে পর কালের দোহাই দিবার প্রয়োজন হয় না,—পরকালে এই ব্রত তাঁহারই দ্বারা আবার প্রচারিত হইবে বলিয়া আত্ম প্রবোধ দানের প্রয়োজন তাঁহার হয় না, কারণ এই জীবনেই যে কয়টা দিন বাকি থাকে তাহারই মধ্যে তিনি বহু ব্যক্তিকে অভাবে জনকতককেও সেই ব্রত দান করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারাই প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সানন্দে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া দিবেন। দ্বাদশটি মত্র শিষ্যের উপর ভার দিয়া খৃষ্ট ইহধাম ত্যাগ করেন, আজ খৃষ্টধর্ম্ম (ইউরোপ বলিতেছিনা) জগজ্জয়ী। কাহার, ব্রত কে সাঙ্গ করে কে বলিবে? মানুষ ত যন্ত্র মাত্র, Linotype এর অক্ষর গুলির চিন্তাশক্তি থাকিলে নামিবার সময় মানুষের মতই তাহারা অবসর বোধ করিত ও হতাশ হইয়া পড়িত, কিন্তু যন্ত্রী তাহাদের প্রত্যেকটিরই জন্য—এক এক স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন,—তাহারা বিক্ষিপ্ত হইতে পায় না, সকলেই শৃঙ্খলার মধ্যে আসিয়া একটি অর্থপূর্ণ নূতন বস্তু গড়িয়া তুলে। মানুষও সেই অক্ষর,—কেবল সচেতন এমন কি কেহ কেহ যন্ত্রীর কল কৌশলের পর্য্যন্ত সমাচার রাখে,—তাহারা সহস্র পতনের মধ্যেও নিজে লীলাময়ের কোলে আছে জানিয়া ভয়শূন্য, ও তাহাদের একমাত্র কার্য্য এই অভয়বার্ত্তা ঘোষণা করা—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

এত গেল উদ্‌যাপনের কথা। কিন্তু ব্রত যাহাদের সাঙ্গ হয় নাই, এমন কি সাঙ্গ হইবার কোন লক্ষণ পর্য্যন্ত নাই,—যাহারা ব্রতের সন্ধান পর্য্যন্ত পায় নাই বা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ করিয়াছে,—তাহাদের জীবন কি নিষ্ফল? তাহাদের সাধনা কি নিরর্থক? মোটেই নয়। সাধনাই সিদ্ধি, সাধনাই সিদ্ধির স্বরূপ। যদি কেহ একান্তভাবে সাধনা করিয়া থাকেন, তাহাতেই তাঁহার মুক্তি। সৃষ্টি হইতে লয় পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ যাত্রার মধ্যে কোন্ জীব যে কোন্ জায়গায় পড়িয়া আছে তাহা কেহই জানে না। যে স্তরকে আজ সর্ব্বোচ্চ বলিয়া বোধ হইতেছে, সেখানে যাঁহারা আছেন তাঁহারা আবার উচ্চতর স্তরের সংবাদ দিবেন। কর্দ্দমাক্ত বৃষ আজ সৌখীন অশ্বত্বের জন্য লালায়িত। স্তরের যখন শেষ নাই,—উর্দ্ধগতির যখন একটি চরম সীমা নাই, অন্ততঃ সে সীমা যখন দৃশ্যমান নাই,—তখন বিশ্রাম কোথায়, শান্তি কোথায়? ক্রমোন্নতি কথার কথা, মৃগতৃষ্ণিকা মাত্র। শেষ নাই,—ভবিষ্যৎ নাই, বর্ত্তমানই সব,—বর্ত্তমানের চেষ্টাই যেমন একমাত্র নির্ভরযোগ্য সামগ্রী, তেমনি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারই আমাদের মুক্তি;—যিনি সমস্ত জীবন ধরিয়া প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন তিনি আজন্ম মুক্ত।

এত সবলের কথা। কিন্তু যাহারা দুর্ব্বল? যাহারা প্রকৃতই দুর্ব্বল তাহাদের বড় বিপদ, কারণ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। দুর্ব্বলতা ক্ষুদ্রতার সেবা মাত্র;—যেখানে দেখিবে মানুষ অতি অল্প পাইয়াই স্ফীত হইয়া উঠিল সেইখানেই সে দুর্ব্বল; যেখানে দেখিবে অল্প ত্রুটি কেহ মার্জ্জনা করিতে পারিতেছে না—সেইখানেই জানিবে সে নিজে অল্পপ্রাণ। এ সকলের মূলে আছে ক্ষুদ্র সন্তোষ, ভূমার উপেক্ষা, অহঙ্কারের প্রাবল্য। অহং বুদ্ধির অধিকার কমাইতে হইবে। যে কেবল শরীরে দুর্ব্বল, তাহার জন্য চিন্তা নাই। সে ত অপরকর্ম্মীকে ভালবাসিতে ও আশীর্ব্বাদ করিতে পারে। তাহাদের কার্য্যই তাহার কার্য্য, অন্ততঃ তাহাতেই তাহার সুখী হইবার অধিকার আছে। দুঃখী সেই যে নিজেও পারে না এবং অপর যে পারে তাহাকেও আপন বলিয়া বোধ করে না।

শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ।

কঃ পন্থা?

কোথা যাব, কোথায় যাইতে চাই, তার ঠিকানা না করিয়াই পথের কথা তোলা উদ্ভট, স্বীকার করি। কিন্তু, বর্ত্তমানে আমাদের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনাতে উপায়টা উদ্দেশ্য অপেক্ষা বড় হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসের নূতন আইন কহিতেছেন যে, বৈধভাবে এবং নিরুপদ্রবে স্বরাজ-লাভ করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। স্বরাজটী চরম লক্ষ্য নহে। যদি তথাকথিত বৈধ উপায়ে ও নিরুপদ্রবে এই স্বরাজ মিলে, তবেই তাহাকে বরণ করিয়া লইব। অন্যথা, এই উপায় ব্যতীত স্বরাজলাভ যদি অসম্ভব হয়, তাহা হইলে স্বরাজকে বর্জ্জনই করিয়া যাইব। মানুষ যাহাকে চরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাকে কোনও দিন এরূপ ভাবে উপায় বিশেষের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে যায় না। নাগপুরে যখন এ বিষয়ের আলোচনা হয়,

তখন কেহ কেহ এ আপত্তি তুলিয়াছিলেন। তাঁহারা কহিয়াছিলেন, আমরা স্বরাজ চাই, ইহা আমাদের চরমলক্ষ্য; যখন যে উপায় এই লক্ষ্যলাভের জন্য সমীচীন মনে হইবে, তখন সেই উপায়ই অবলম্বন করিব। আগে হইতে কোনও উপায় বিশেষকে চিরদিনের জন্য আশ্রয় করিয়া চলিব কিরূপে? কিন্তু এ কথা কর্ত্তারা কাণে তুলিলেন না। এমন কি স্বরাজ বলিতে কি বুঝিব, তাহা পর্য্যন্ত আজিও ভাল করিয়া খুলিয়া বলা হয় নাই।

(২)

স্বরাজ কথাটী আমাদের রাষ্ট্রীয় সাহিত্যে পোনর বৎসর পূর্ব্বে, স্বর্গীয় দাদাভাই নাওরোজী সর্ব্বপ্রথমে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সে সময়ে দেশের লোকে স্বরাজের একটী মোটামুটী অর্থ করিয়া লইয়াছিল। সে অর্থটা এখন ঘোলাইয়া গিয়াছে। গান্ধী মহাত্মা স্বরাজ অর্থ কথনও রাম-রাজ কহেন; কখনও ধর্ম্ম-রাজ কহেন; কখনও "বৈরাজ" বোঝেন;—অর্থাৎ সমাজের এমন একটী অবস্থা বোঝেন, যে অবস্থাতে কোনও প্রকারের বাহিরের শাসন প্রয়োজন হইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নির্ম্মল ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কাহারও উপরে কোনও রূপ উপদ্রব না করিয়া, স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। সমাজের এই অবস্থায় রাজাও থাকিবে না, রাজ-দণ্ডও থাকিবে না। সিপাহী-সান্ত্রী, পুলিশ-পাহারা, আইন-আদালত—মানুষকে বাঁধিবার ও শাসাইবার জন্য কোনও কিছুর প্রয়োজন হইবে না, কোনও কিছু থাকিবে না। ইহারই নাম না কি "বৈরাজ"। গান্ধী মহাত্মা এই "বৈরাজ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কি না জানি না। কিন্তু তাঁহার ইণ্ডিয়ান হোম-রুল (Indian Home Rule) নামক পুস্তকে স্বরাজের এইরূপ আভাষই পাওয়া গিয়াছে। আবার কখনও কখনও স্বরাজ-অর্থে ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে যেরূপ শাসন-প্রণালী প্রচলিত, তাহাও বুঝাইয়াছেন। কখনও বা পার্লেমেণ্টের বা প্রজা-প্রতিনিধি-সভার দ্বারা পরিচালিত শাসনকেও স্বরাজ কহিয়াছেন। কিন্তু এ সকল কথা তাঁহার পুঁথি-পত্র ঘাঁটিয়া বাহির করিতে হয়। সচরাচর তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশে স্বরাজ কথার কোনও বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আর নানা স্থানে, নানা প্রসঙ্গে তিনি স্বরাজের যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা হইতেও একটী পরিষ্কার আদর্শের ধারণা জন্মে না। কারণ, রামরাজ বা ধর্ম্মরাজ, আর প্রজা-প্রতিনিধি-সভার উপরে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র বা ডিমোক্রাসী (democracy), এক বস্তু নহে। এ সকল নানাকথার উপরে আবার সম্প্রতি তিনি খিলাফত ও স্বরাজকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীহট্টে বক্তৃতা করিতে যাইয়া কহিয়াছেন—"খিলাফতই স্বরাজ, স্বরাজই খিলাফত"। এ কথার অর্থ যে কি, প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা তাহা বুঝা অসাধ্য। মুসলমানের পক্ষে এক অর্থে খিলাফত ও স্বরাজ এক হইতে পারে। কিন্তু যাহারা মুসলমান নহে, তাহাদের স্বরাজের সঙ্গে খিলাফতের কি যে সম্পর্ক থাকিতে পারে ইহা কল্পনা করাও অসাধ্য। এ ত গেল মহাত্মার নিজের কথা। তাঁহার আসন্ন-শিষ্যেরা মাঝে মাঝে স্বরাজের যেমন ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে বিষয়টা আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে। স্বরাজ যে একটা রাষ্ট্রীয় বস্তু বা আদর্শ, রাষ্ট্রীয় শাসনের একটা বিশেষ ব্যবস্থা, কেহ কেহ ইহা পর্য্যন্ত অস্বীকার করেন। ইহাঁদের কথায় স্বরাজ বাহিরের বস্তু নহে, ভিতরের বস্তু; অন্তরে ইহা লাভ করিতে হয়। এই সকল

নানাকারণে কোথায় যে আমরা যাইতে চাই, আমাদের গন্তব্য কি, এই মূল প্রশ্নের বিচার ও আলোচনা অবান্তর হইয়া উঠিয়াছে। কর্ম্মের কোলাহলের ভিতর দিয়া ফলাফলের ভাবনা মাথা তুলিবার অবসর পাইতেছে না। চারিদিকে কেবলই শুনিতেছি—এটা কর, ওটা কর, ইহা দাও, উহা ছাড়, তাহা হইলেই এতদিনের মধ্যে স্বরাজ মিলিবে। আর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা এই যে বিজ্ঞলোকেও কোথায় যাইতেছি, ইহা বিচার না করিয়াই এ সকল আদেশ প্রতিপালনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন।

(৩)

এই ব্যস্ততার অর্থ কি? দেশের লোকে বর্ত্তমান অবস্থাতে অত্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, ইহা দ্বারা এই কথাটাই অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয়। রোগের যন্ত্রণা যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখন লোকে যেমন দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া যে যাহা কহে, তাহাই করিতে যায়, আমাদেরও প্রায় সেইরূপ দশাই উপস্থিত হইয়াছে। সাধারণ লোকে অন্নবস্ত্রের কষ্ট আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। যাহারা স্বল্প-বিস্তর লেখাপড়া শিখিয়াছে, এবং সাময়িক পত্রাদি পড়িয়া যাহাদের মধ্যে একটা দেশাত্মবোধ জন্মিয়াছে, তাহারা অন্যদেশের লোকের তুলনায় নিজেদের অবস্থার হীনতা উপলব্ধি বা অনুমান করিয়া, এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণ ও শিক্ষিত লোক সকলেই বর্ত্তমান বিদেশী শাসন-ব্যবস্থাকে নিজেদের দুরবস্থার জন্য দায়ী বলিয়া ভাবিতেছে। সুতরাং এই বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ হইলেই, তাহাদের বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্গতির অবসান হইবে, এইরূপ কল্পনা করিয়া এই গভর্ণমেণ্টকে নষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। এ কথাটা গোপন করিয়া কোনও ফল নাই। এই গোড়ার কথাটা না বুঝিলে রাজা ও প্রজা কেহই এই আসন্ন বিপ্লবতরঙ্গে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। স্বরাজ বলিতে দেশের লোকে কিছুই এখনও ভাল করিয়া বোঝে না। অনিচ্ছা বা অক্ষমতানিবন্ধন, যে কারণেই হউক না কেন, তাহাদের নেতৃবর্গও জনসাধারণকে স্বরাজের সত্য অর্থ ভাল করিয়া বুঝান নাই বা বুঝাইতেছেন না। স্বরাজ-লাভে আর কি হইবে বা না হইবে, দেশের লোকে ইহা জানে না, বুঝে না, ভাবে না। তাহারা এইমাত্র জানে, বুঝে ও ভাবে যে এই স্বরাজ আসিলে বর্ত্তমান ইংরেজ রাজ আর থাকিবে না। আর ইহাই আপাততঃ কি বিজ্ঞ কি অজ্ঞ বহুতর লোকে যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেছে। অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ইহার প্রতীকার কি?

(৪)

দেশের লোকের মনের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহারা পথ-বিপথ বিচার করিবে কি না সন্দেহের কথা। গভর্ণমেণ্ট যদি কঠোর নীতি অবলম্বন করিতেন, তবে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাঁহারাও অনেকটা উদাসীনতা ও উপেক্ষার ভাব দেখাইতেছেন। পোনর বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা যেরূপ চোখ রাঙাইয়াছিলেন, এবারে এখনও সেরূপ কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।* এমন কি আড়াই বৎসর পূর্ব্বে অতি সামান্য কারণে পঞ্জাবে যে নৃশংস অভিনয় হইয়াছিল, তদপেক্ষা শতগুণ অধিক গুরুতর কারণ

* এই প্রবন্ধ লেখার পর গভর্ণমেণ্টের ভাব অনেকটা বদ্‌লাইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

সত্ত্বেও মালাবারে তাঁহারা সেরূপ কঠোর নীতি অবলম্বন করিতেছেন না। কথায় কথায় হরতাল হইতেছে; ধর্ম্মঘট হইতেছে; চারিদিকে সরকারের প্রতাপ চক্ষের উপরে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু রাজ-পুরুষেরা অসাধারণ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া এ সকল সহিয়া যাইতেছেন। ইহার পশ্চাতে কোন্ গূঢ় নীতি লুকাইয়া আছে, অনুমান করা নিতান্ত অসাধ্য না হইলেও, স্পষ্ট করিয়া বলা একান্ত সহজ নহে। কঠোর নীতি অবলম্বনে কোনও ফল হইবে না। বরং বিপরীত ফল হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। ইহা তাঁহারাও বোঝেন, আমরাও জানি। ও খেলা উভয়পক্ষেরই অভ্যস্ত। সুতরাং কোনও পক্ষই সহজে আবার সে খেলা খেলিতে ব্যগ্র নহেন। নতুবা ইতিমধ্যেই বর্ত্তমান অসহযোগ-নাটকের অভিনয়ের একাধিক পট-পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যেরূপ বিচক্ষণতার সহিত নিজেদের চাল চালিতেছেন, আমরা কি সেরূপ বিচক্ষণতার সহিত চলিতেছি? এই প্রশ্নটা ধীরভাবে, একাগ্রচিত্তে বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। এইজন্যই বারম্বার ঘুরিয়া ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমরা কি চাই?

(৫)

আমরা চাই, স্বরাজ, অর্থাৎ বর্ত্তমান ইংরাজ-শাসনের আমূল পরিবর্ত্তন। ইহা দেশের প্রায় সকল লোকেরই প্রাণের ভিতরকার কথা। কিন্তু বর্ত্তমান ইংরাজ-শাসন নষ্ট হইলেই কি আমরা যাহা চাই, তাহা পাইব? অথবা যে কারণে এই ইংরাজশাসন এতটা অপ্রীতিকর হইয়া পড়িয়াছে, সেই সকল কারণ নিঃশেষে দূর হইবে? ইংরাজ-শাসনের প্রধান দোষ এই যে ইহা দেশের লোকমতের বা বহুমতের অনুগত নহে। অর্থাৎ দেশের লোকের অভিমত অনুযায়ী আইন-কানুন রচিত হয় না। বিদেশেই শাসনকর্ত্তারা নিজেদের খেয়ালমত বা স্বার্থসাধনের জন্য দেশের আইন-কানুন রচনা ও শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। সর্ব্বদাই যে ইহাতে প্রজার স্বার্থ-হানি হয়, এমন বলা যায় না। যেখানে শাসকসম্প্রদায়ের স্বার্থের সঙ্গে শাসিত সাধারণের স্বার্থের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানেই আমাদের স্বার্থ-হানি করিয়া তাঁহারা নিজেদের স্বার্থসাধন করিতে চাহেন। ইহার ফলে আমাদের জাতির সমষ্টিগত ধনের, মানের এবং স্বাধীনতার যথাযোগ্য বৃদ্ধি ও সম্ভোগের ব্যাঘাত জন্মে। নিক্তির ওজনে বিচার করিলে বর্ত্তমান ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ইহাই। রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে যাইয়া দেশের শিক্ষিত নেতৃগণের যে বুদ্ধি-বিকাশ হয়, শাসনকুশলতাসম্পাদনের জন্য শাসক-দিগকে যে সংযম ও দূরদর্শিতা সাধন করিতে হয়, দেশরক্ষার ভারবহনে যে ক্ষাত্রবীর্য্য ও মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, বর্ত্তমান পরাধীন অবস্থাতে আমরা এ সকল হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। জগতের অপরাপর জাতিসকল যেরূপে সমষ্টিভাবে আপনাদের জাতীয় জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবার অবকাশ পাইয়াছে, আমাদের সে অবকাশ নাই। এ দেশের ইংরাজ-শাসনের প্রধান দোষ ইহাই। যেখানেই একটা ভিন্ন দেশের ও ভিন্নজাতির লোকে কোনও দেশের রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র অধিকার করিয়া বসে ও আর একটা দেশের শাসন-সংরক্ষণের ভার-গ্রহণ করে, সেখানেই এরূপ অবিচার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ভারতের ইংরাজশাসনের এই মারাত্মক অপকারিতা অস্বীকার করা যায় না।

(৬)

কিন্তু জাতিগতভাবে, সমষ্টিরূপে এই শাসনের অধীনে আমরা যেরূপ পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছি, ব্যক্তিগতভাবে ঠিক ততটা পরিমাণে পঙ্গু হইয়াছি কি? একথাটাও একবার ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। জাতির সঙ্গে ব্যক্তির, সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী, ইংরেজিতে যাহাকে অর্গেনিক (organic) সম্বন্ধ কহে। এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে অঙ্গীর অনিষ্টপাতে বা পূর্ণ ও প্রমুক্ত আত্মবিকাশের ব্যাঘাতে তাহার অঙ্গ সকলের দুর্ব্বলতা ও আত্মবিকাশের হানি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। শরীর দুর্ব্বল ও অচল হইলে, ক্রমে শরীরের ইন্দ্রিয় এবং অঙ্গসকলও অপটু ও অক্ষম হইতে আরম্ভ করে। সেইরূপ যে জাতি স্বাধীনভাবে আপনার জাতীয়জীবনের সকল অঙ্গের বিকাশ ও সার্থকতা সাধনে ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়, সে জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিরাও, তাহার ফলে, জীবনের নানাদিকে আত্মবিকাশ, আত্মপ্রকাশ ও আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। একথাটা সর্ব্বদাই দৃঢ় করিয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। যতক্ষণ না ভারতবর্ষ স্বাধীনভাবে, অর্থাৎ অন্য কোনও জাতির শক্তির বা কৌশলের প্রভাবে নিজের মনুষ্যত্ব ও জাতীয়জীবনের আদর্শ ও সাধনার সম্যক সম্প্রসারণের পথে কোনও প্রকারের বাধা না পাইয়া, নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সম্পূর্ণ অবসর পাইয়াছে, ততক্ষণ ভারতের ব্যক্তিসাধারণে বা জনসাধারণে ব্যষ্টিভাবেও নিজেদের সম্পূর্ণ বিকাশলাভ করিতে পারিবে না। একথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে ও সর্ব্বদা মনে করিয়া রাখিতেই হইবে। এই ধারণা এবং ভাবনাই স্বরাজ-সাধনের মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্রকে ভুলিলে চলিবে না। ইংরেজ নিজের শাসনকে যতই উদার বা মোলায়েম করুক না কেন, তাহাতে আমাদের ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের যথাযোগ্য বিকাশ ও সার্থকতালাভ যে কখনই সম্ভব হইবে না, ইহা যে ভুলিবে, তাহার বন্ধন কখনও ঘুচিবে না। কিন্তু এই কথাটা আগুণ দিয়া মনের ভিতরে অক্ষরে অক্ষরে দাগাইয়া রাখিয়াই, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাও সর্ব্বদাই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে ইংরেজ শাসনের এই সাংঘাতিক অপকারিতা সত্ত্বেও, কোনও কোনও দিকে, এই শাসনাধীনে আমরা ব্যক্তিগতভাবে যতটা স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছি, এতটা পরিমাণে ইতিপূর্ব্বে আমরা এরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকার ও অবসর পাই নাই।

(৭)

আর এখন যাঁহারা ধীরভাবে বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতে চাহেন, তাঁহাদের সমক্ষে সর্ব্বপ্রধান প্রশ্নই এই :—একটা অনির্দ্দিষ্ট-রূপ, অব্যাখ্যাত-অর্থ, অজ্ঞাত-লক্ষ্য "স্বরাজের" লোভে আমরা আমাদের এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত হারাইতে চাহি কি না? এই প্রশ্নটা উঠে এইজন্য যে এই স্বরাজের নামে, এই স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় যে সকল কাজ হইতেছে, তাহাতে ত দেখিতে পাই যে, "শয়তানী" ইংরাজ-রাজের শাসনাধীনেও আমাদের যেটুকু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, এই স্বরাজপন্থীদের শাসনে তাহাও থাকে না। ইংরেজ যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছে। চারিদিকে নানাভাবে আমাদিগকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিয়াছে। এ সকলই সত্য। কিন্তু এপর্য্যন্ত ত ইংরাজশাসনে এমন কোথাও ঘটে নাই যে বাজারে আমি দাম দিয়া, স্বাধীনভাবে আমার আহার্য্য বা ব্যবহার্য্য বস্তু কিনিতে পাই না। পাইতে হইলে

জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিকরা ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়। ইংরাজ আমাকে যখন বিদ্রোহী বলিয়া জেলে দেয়, তখনও সে নিজে আমার অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করে। আর আমি যতবারই জেল খাটিয়া থাকি না কেন, বাহিরে আসিলে, আর দশজনের মতন, বাজারদরে আমি বাজারে ইচ্ছামত পণ্যাদি কিনিতে পারিব না, এরূপ ত কখনও করে না। অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে যখন চাঁদপুরে ও গোয়ালন্দে "হরতাল" হইয়াছিল, তখন যাঁহারা সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া গান্ধি-মহাত্মার পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন নাই, বিশেষতঃ যাঁরা যে কারণেই হউক ইংরাজের চাকুরী করেন, তাঁহারা কন্‌গ্রেস কমিটির সহিকরা ছাড়পত্র ছাড়া বাজারে প্রতিদিনের খাদ্য দ্রব্য কিনিতে পান নাই। দোকানদারদিগের উপরে এমনই শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে তাঁহারা এই ছাড়পত্র না পাইয়া কাহাকেও কোন বস্তু বেচিতে সাহস পায় নাই। এক যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ব্যতীত, আর কখনও সভ্যজগতে কোথাও মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে এরূপ আক্রমণ হয় না। "শয়তানী" ইংরাজরাজের অধীনেও কোথাও এরূপ অত্যাচার দেখা যায় নাই। এইজন্যই ভাবিতে হয়, ইহাই যদি "স্বরাজের" অর্থ হয়, অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অযথারূপে কেবল নেতৃবর্গের প্রতাপ প্রতিষ্ঠার জন্য নষ্ট করিয়া যদি এই "স্বরাজ" পাইতে হয়, তবে এই "স্বরাজের" কোনও সত্য সার্থকতা থাকিবে কি না ?

(৮)

স্বরাজ চাই, ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য, বিনাশের জন্য নহে। সমষ্টিকে আশ্রয় করিয়া সমষ্টির শক্তি ও স্বাধিকারের ভাগীদার হইয়া, ব্যষ্টির পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মচরিতার্থতা সাধনের জন্যই স্বরাজ চাই। এইজন্যই স্বরাজ এরূপ বহুমূল্য বস্তু। এইব্যক্তিগত স্বাধীনতাই মানুষের দেবত্ব-লাভের প্রধান সাধন। প্রাচীন সন্ধ্যাবন্দনার মন্ত্রে আছে—

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মাস্মি ন চ শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

আমি দেবতা, অপর কেহ নই; আমি ব্রহ্ম, শোকভাক্ নই; আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমি নিত্যমুক্তস্বভাবসম্পন্ন। অর্থাৎ আমার প্রকৃতিতে, আমার অন্তরের ও আত্মার গঠনে, আমি জীব হইয়াও প্রকৃতপক্ষে শিবস্বরূপ। ঈশ্বর অংশে আমার উৎপত্তি। ঈশ্বরত্বলাভই আমার এই জীববিকাশধারার চরম লক্ষ্য। ব্যক্তিগত-স্বাধীনতা এই লক্ষ্যলাভের সোপান। এই স্বাধীনতা যদি রক্ষিত এবং বর্দ্ধিত না হয়, তবে "স্বরাজ" দিয়া আমি কি করিব ? তাহা হইলে, স্বরাজের কোনওরূপ পারমার্থিক সার্থকতা ত থাকে না।

আমরা স্বরাজ চাই, "স্বরাট্" হইবার জন্য। এই স্বারাজ্য আত্মার স্বারাজ্য। আত্মা ব্যষ্টিরূপেই আমাতে প্রকাশিত। এই আত্মা আমার অহং বস্তু। ইহা আমার আমিত্ব। এই অহং বস্তুকে, এই আমিত্বকে, এই ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করিয়া যে স্বারাজ্য পাওয়া যায়, তাহাতে আমি কেবল একের দাসত্ব হইতে আর একজনের দাসত্বেই যাইব। আমার নিজের আমিত্বে, স্বামিত্বে, বা স্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিব না, করিতেও পারিব না।

এই জন্যই জিজ্ঞাসা করি—কঃ পন্থাঃ ?

এই কি স্বাধীনতার পথ ?

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

সামান্য ভাবেই হউক আর বিশেষ ভাবেই হউক জন্মতিথি ও মৃত্যুতিথিকে স্মরণ করিবার পদ্ধতি আমাদেরও দেশে নূতন নহে; কোনো না কোনো প্রকারে বহুকাল হইতে ইহা প্রচলিত আছে। যাঁহারা নিজ নিজ গুণ ও কার্য্যের দ্বারা অসাধারণ, যাঁহারা মহান্, যাঁহাদিগকে আমরা মহাপুরুষ বলিয়া উল্লেখ করি, তাঁহাদের ঐ স্মরণীয় তিথি সমূহ সাধারণ নহে। মহাপুরুষেরা পরলোক গমনের সময় যাহা লইয়া যান জীবলোকের পক্ষে তাহা অতি সামান্য, কিন্তু যাহা তাঁহারা রাখিয়া যান, জীব লোককে প্রদান করিয়া যান, তাহার তুলনা হয় না; যাহা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ, মানুষেরা তাহারই অধিকারী হয়। সে দুর্ভাগ্য, যে এই শ্রেষ্ঠ দানকে গ্রহণ করিতে পারে না। সংসারের কর্ম্ম প্রবাহে মানবের চিত্ত প্রায়ই ভাসিয়া যায়, স্থির থাকিতে পারে না। যাহা তাহার ধরিবার, ধরিতে পারে না, তাই লক্ষ্যেও পৌছিতে পারে না। কিন্তু তাহাকে সেখানে পৌছিতেই হইবে, আশ্রয়তরুর শাখা তাহাকে ধরিতেই হইবে, এবং এজন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহা তাহার চাই-ই-চাই। মহাপুরুষগণের জীবন-কথা এ বিষয়ে তাহাকে প্রভূত সাহায্য করে। শাস্ত্রে যাহা পড়া যায়, আচরণে তাহা দেখিলে, হৃদয়ে তাহা গভীরতর ভাবে প্রবেশ করে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই যখনি কোনো মহাপুরুষের জন্মতিথি বা মৃত্যুতিথি উপলক্ষ্যে তাঁহাকে স্মরণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়, বস্তুতঃই তখন আমার হৃদয়ে প্রভূত আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে।

সম্প্রদায় বিশেষের আবর্ত্তে ঘূর্ণিপাক খাইয়া মানুষের দৃষ্টি এত চঞ্চল হইয়া পড়ে, তাহার চিত্ত এতই দূষিত হইয়া উঠে যে, যাহা দেখিবার, যাহা শুনিবার, যাহা সত্য সে তাহা দেখিতে শুনিতে বুঝিতে পারে না। ইহাতে সেই সত্যের কোন ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় সেই মানুষেরই। জগতে এই জাতীয় মানুষেরই সংখ্যা অনেক, তাহাদের নিকট সম্প্রদায়টাই বড়, তাই সেই সম্প্রদায়ের বাহিরের কোনো কিছুকে তাহারা সহ্য করিতে পারে না, তাহা যতই না কেন সত্য ও সুন্দর হউক। বস্তুত যাঁহারা মহান্ তাঁহারা কোন সম্প্রদায়েরই নহেন, তাঁহারা বিশ্ব-মানবের। সম্প্রদায় তাঁহারা নিজে রচনা করেন না, ইহা কালের ধর্ম্মে বা মানুষের ধর্ম্মে আপনা-আপনিই হইয়া পড়ে। যাঁহারা সত্য-সত্যই মহাপুরুষ তাঁহাদিগকে সম্প্রদায়মুক্ত করিয়াই দেখিতে হয়। আর দেখিবার সময় চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া অপক্ষপাতে দেখিতে হয়; অক্ষরের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়; এবং দেহের দিকে না তাকাইয়া প্রাণ বা আত্মার দিকে তাকাইতে হয়; তাহা হইতেই যাহা দেখিবার তাহা ঠিক দেখিতে পাওয়া যায়।

আজ সমগ্র ভারতবর্ষে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত-পর্য্যন্ত যে মহাতপস্বীর তপস্যার প্রভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে, যে মহাত্মা আজ সত্যাগ্রহের পরম বাণী প্রচার করিয়া আত্মার পরম শুদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছেন, গুর্জ্জর জননীই তাঁহাকে জঠরে ধারণ করিয়াছিলেন। আর প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে (১৮২৪ খৃষ্টাব্দে) কাঠিয়াবাড়ে সৌভাগ্যবতী সেই গুর্জ্জর জননীই

আর একটি তপোনিষ্ঠ পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলেন। ইনিও সত্যের উপাসক হইয়া সত্য অর্থের প্রকাশ করিয়া মানবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ইঁহারাই নাম স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। ইঁহার পরলোক গমনের এখনো চল্লিশ বৎসর হয়নি, ইঁহার জন্ম হয় ইংরাজী ১৮২৪ সালে, আর মৃত্যু হয় ১৮৮৩ সালে। তিনি জীবিত ছিলেন ৫৯ বৎসর মাত্র। স্থূলত ইঁহার জীবনকে প্রায় সমান-সমান তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। যথা (১) গৃহবাস ২১ বৎসর (১৮২৪-১৮৪৫), বিশেষ অধ্যয়ন ও ভ্রমণ ১৮ বৎসর (১৮৪৫-১৮৬৩), এবং সাধারণ লোককার্য্য ২০ বৎসর (১৮৬৩-১৮৮৩)। ইঁহার পূর্ব্বনাম ছিল মূ ল শ ঙ্ক র।

ইঁহার পিতা একজন ধনশালী ও পরম শৈব ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু পিতার ধন ও ধর্ম্ম উভয়ই পুত্রকে ধরিয়া রাখিতে পারে নি। মূলশঙ্করের গৃহ জীবনের কথা আলোচনা করিলে বুঝা যায়, বাল্য হইতে তিনি অত্যন্ত যুক্তিপ্রিয় ছিলেন। ইহা হইয়া আসিতেছে, এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। 'কেন'র উত্তর দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। এই যুক্তিপ্রবণতাই ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহাকে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী করিয়াছিল। মূলশঙ্করের বাল্য জীবনের দুইটি কথা বা ঘটনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই তাঁহাকে সত্যানুসন্ধানে প্রথম প্রবল প্রেরণা দিয়াছিল। বলিয়াছি, তাঁহার পিতা অতি শিবভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুত্র এক শিব রাত্রির দিন পিতার আদেশে, তাঁহার সহিত পূজা করিবার জন্য, এক শিব মন্দিরে গমন করেন। গভীর রাত্রিতে, পূজকেরা এমন কি তাঁহার পিতাও নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, তিনি দেখিলেন, একটা ইঁদুর শিবলিঙ্গ প্রতিমার উপর উঠিয়া তাহা দূষিত করিতেছে। মূলশঙ্করের হৃদয়ে বাজিয়া উঠিল 'এই কি দেবতা ?' তিনি তখনি পিতাকে জাগাইলেন, প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু পিতা উত্তর দিয়া পুত্রকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না, পুত্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে তাঁহার হৃদয়ের ভাব এইরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। যদিও পরিবারের অন্যান্য লোকেরা ইহার বিশেষ কোনো সন্ধান পাইল না। এই সময়ে মূলশঙ্করের বয়স চৌদ্দ বৎসর মাত্র।

দ্বিতীয় ঘটনা, ইহার দুই বৎসর পরে তাঁহার হৃদয়ে যথার্থ বৈরাগ্যের উদয়। একদিন মূলশঙ্কর যখন অন্যান্য ব্যক্তির সহিত একটি সঙ্গীতোৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল তাঁহার ছোট ভগিনীর কলেরা হইয়াছে। চিকিৎসা হইল, ফল হইল না, বালিকার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। শোকবিকল আত্মীয় স্বজনের মধ্যে দেখা গেল মূলশঙ্কর ধীর-স্থির-অচল হইয়াছিলেন, যেন তাঁহার কোনো শোকই হয় নি। জীবনে ইহাই তাঁহার প্রথম শোক। তাঁহার হৃদয়ে ইহা গভীর রেখা পাত করে। কপিলবাস্তুর শাক্য কুল রাজপুত্রের ন্যায় ইঁহারো হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল 'মৃত্যুকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, আমারো একদিন এই অবস্থা হইবে। মানবের এই দুঃখকে কিরূপে এড়াইতে পারা যায়? কোথায় গেলে মুক্তি পাওয়া যাইবে ?' তিনি তখনই প্রতিজ্ঞা করিলেন 'যেরূপে হউক আমাকে ইহার অনুসন্ধান করিতেই হইবে ?' তাঁহার মনের ভাব অন্যে জানিল না, ভিতরে ভিতরে তাহার কার্য্য চলিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার এক প্রিয় বিদ্বান্ পিতৃব্যের মৃত্যু হইল। মূলশঙ্করের হৃদয়ের পূর্ব্ব ভাব আরো দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন

সংসারে সমস্ত অনিত্য, জীবনের উপভোগ্য কিছু নাই। সংসার সুখ ভোগ তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি "পুত্রৈষণা" ও "বিত্তৈষণা" কে চিরদিনের জন্য হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন করিলেন। এবং এইরূপে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

পুত্রের হৃদয়ের ভাব পিতা-মাতার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকে নাই, বিবাহ বন্ধনে বন্ধন করিবার জন্য তাঁহারা কোনো চেষ্টারই ক্রটি করেন নি, কিন্তু মূলশঙ্কর সেই চেষ্টাকে সফল হইতে দেন নি। রাত্রিতে নির্জ্জনে তিনি জন্মের মত গৃহত্যাগ করেন। পিতা অনুসন্ধানের জন্য অশ্বারোহী ভৃত্য-গণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি ধরাও পড়িয়াছিলেন, কিন্তু মন যখন যাহার মুক্ত তখন তাহাকে কে বন্ধন করিবে? তিনি তাহাদের হাত এড়াইয়া চলিয়া গেলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২১ বৎসর

ব্রাহ্মণের প্রাচীন রীতি অনুসারে ৮ম বর্ষেই তাঁহার উপনয়ন হয়। ১৪ বৎসরের পূর্ব্বেই তিনি সমগ্র যজুর্বেদসংহিতা (শুক্ল) ও অন্যান্য বেদের কিছু কিছু অংশ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। উপনয়নের পর গায়ত্রী, সন্ধ্যা ও যজুর্বেদের রুদ্রাধ্যায় হইতেই তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। ২১ বৎসরের মধ্যে তিনি নিঘণ্টু, নিরুক্ত, কল্প ও পূর্ব্বমীমাংসাদি অধ্যয়ন করেন। শৈশবে যে বেদবিদ্যায় তাঁহার শিক্ষার আরম্ভ পরবর্ত্তী জীবনে সেই বেদবিদ্যারই উপর তাঁহার সমস্ত কার্য্য প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা গিয়াছে। বেদবিদ্যারই মধ্যে তিনি সত্যের প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

গৃহত্যাগ করিয়া মূলশঙ্কর লক্ষ্যের অনুসন্ধানে দুর্গম পথের দ্বারা দূর দূরতর স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি লালা ভগত রায়ের * নিকট নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শুদ্ধচৈতন্য নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইহার পরে নানা ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয়। কাশী প্রভৃতি নানাস্থান ভ্রমণ করেন, এবং নর্ম্মদাতীরে উপস্থিত হন। এই স্থানে তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল তখন দয়ানন্দ সরস্বতী। এই সময়ে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর মাত্র। ইহার পর নানা স্থানে ঘুরিয়া যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন ও যোগাভ্যাস করেন। হিমালয় প্রভৃতি যে সমস্ত তীর্থ স্থলে তপস্বী ও জ্ঞানী সাধুগণের থাকিবার সম্ভাবনা দুর্গম হইলেও তিনি সেই সমস্ত স্থানে পর্য্যটন করিতে বিরত হন নি। কিন্তু বহু স্থানেই নিজের অভীষ্ট লাভ করিতে তিনি পারেন নি। তথাপি তিনি তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হন নাই। উপনিষৎ খুলিলেই দেখা যায় বিনা তপস্যায় কিছু হইবার উপায় নাই, যিনি যেখানে কোনো সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বিনা তপস্যায় তিনি তাহা পান নাই। শিষ্য উপস্থিত হইলে গুরু সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। তার পর উপযুক্ত দেখিয়া তিনি উপদেশ দিয়াছেন, আর শিষ্যও তাহা গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। উপনিষদের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়, এবং প্রাচীন শাস্ত্রে ইহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। দয়ানন্দ যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহার মূলে পূর্ব্বোক্ত তীব্র যুক্তিপ্রবণতা ও বৈরাগ্য এবং এই তপস্যা দেখিতে পাওয়া যায়।

---

* কেহ কেহ বলেন, লালা ভগত রায়ের।

জীবনের ৩৬ বৎসর তাঁহার এইরূপে যায়। তখনো তিনি কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নি, তখনো তাঁহার সময় উপযুক্ত হয় নি, ভবিষ্যতে যে গুরুভার তাঁহাকে বহন করিতে হইবে তখনো তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন নি।

দেশের ধার্ম্মিক, সামাজিক ও অন্যান্য বিবিধ অবস্থা তাঁহার চক্ষু ও চিত্তকে এড়াইয়া থাকিতে পারে নাই। তিনি ইহা তীব্র ভাবে অনুভব করিয়াই নিবৃত্ত থাকিতেন না। কিরূপে সেই দুরবস্থা বিনষ্ট হইয়া দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হইতে পারে তিনি তাহা ভাবিতেন। তিনি দেখিয়াছিলেন দেহের এক অঙ্গের উন্নতিতে কিছুই হয় না, সমস্ত অঙ্গ পুষ্ট হইলেই দেহীর যথার্থ পুষ্টি হয়। তাই আমরা তাঁহার পরজীবনে দেখিতে পাই তাঁহার সংশোধক বা সংস্কারের দৃষ্টি কোনো এক বিশেষ দিকে আবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্বত্রই প্রসারিত হইয়াছে। তিনি বর্ত্তমান যুগে রাজ ধর্ম্মের ও কথা না বলিয়া ছাড়েন নি।

ধর্ম্মকেই তিনি নিজের সমস্ত কার্য্যের ভিত্তি করিয়াছিলেন, এবং বলা বাহুল্য তাহা ঠিকই করিয়াছিলেন। যাহা ধর্ম্ম তাহা মঙ্গল, অতএব যে শাস্ত্র ধর্ম্মকে প্রকাশ করে, তাহা মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল উপদেশ দিতে পারে না। ধর্ম্মের মধ্যে যদি কিছু অমঙ্গল দেখা যায়, তিনি ভাবিতেন, তবে তাহা শাস্ত্রের উক্তি নয়; যে শাস্ত্র অমঙ্গলের কথা বলে তাহা শাস্ত্র নহে। তাই ধর্ম্মের সংস্কার, শাস্ত্রের যুক্তিযুক্ত যথাযথ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। তাই তাঁহার চিত্তে উদিত হইয়াছিল শাস্ত্রের যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রথম হইতেই বেদে ও বৈদিক ধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তখন তিনি চঞ্চল হইলেন, বেদ উপনিষদের রহস্য তাঁহাকে জানিতে হইবে।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে স্বামী দয়ানন্দ মথুরার সুপ্রসিদ্ধ দণ্ডী বিরজানন্দ স্বামীর নিকটে আগমন করেন। ইনি অতিশয় তেজস্বী ও বিদ্বান ছিলেন। ইনি অন্ধ ছিলেন, কিন্তু ইঁহার সমুজ্জল প্রজ্ঞা চক্ষু ছিল। দয়ানন্দ ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। দেখা গিয়াছিল গুরু শিষ্যেরও প্রজ্ঞা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছিলেন। বিরজানন্দ স্বামীর আর্য গ্রন্থেই একমাত্র অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল, অনার্য গ্রন্থকে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি স্বামীজীকে বলিয়াছিলে আগে যে অনার্য গ্রন্থ পড়িয়াছ তাহা ভুলিয়া যাও, তাহা না হইলে আর্য গ্রন্থের মহিমা তোমার নিকট প্রতিভাত হইবে না।" এরূপ কথা কেহ কখনো তাঁহাকে বলেন নি। শিষ্যের ইহা মনের অনুকূলই হইয়াছিল। এই সময়ে দয়ানন্দের বয়স ৩৫।৩৬ বয়স হইবে। আড়াই বৎসরের পরে অধ্যয়ন সমাপনান্তে গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে গুরু বলিয়াছিলেন 'বৎস, আমি গুরু দক্ষিণা চাই। শিষ্য বলিলেন গুরুদেব, আমার এখন কি আছে যাহা আপনাকে অর্পণ করিতে পারি?' গুরু বলিলেন দক্ষিণা না পাইলে তো আমি তোমাকে যাইবার অনুমতি দিব না। আর এমন কিছু চাহিব না যাহা তোমার আয়ত্ত নহে।' শিষ্য বলিলেন 'তবে আদেশ করুন।' গুরু বলিলেন 'বৎস, তুমি যাও, দেশে যে অজ্ঞানতা চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে তুমি তাহা দূর করিয়া নিজের অধ্যয়নকে সার্থক কর!' শিষ্য গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে নবীন দৃশ্য প্রতিভাত হইল। এখন হইতে তাঁহার জীবনের শেষ অঙ্কের

অভিনয় আরম্ভ হইল। এই শেষ কুড়ি বৎসরের কার্য্যেই দয়ানন্দ স্বামী দ য়া ন ন্দ স্বা মী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

মথুরা হইতে নির্গত হইয়া স্বামীজী রাজপুতানা ও অন্যান্য বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। পৌরাণিক ধর্ম্মকে খণ্ডন করাই ইহার প্রধান বিষয় ছিল। বৈদিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও তদন্য ধর্ম্মের নিকৃষ্টতা প্রতিপাদনের জন্য তিনি তিনটি উপায় অবলম্বন করা স্থির করিয়াছিলেনঃ—১ম, প্রচার করা, বক্তৃতা করা, ও শাস্ত্রার্থ বা তর্ককরা; ২য়, বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া। এবং ৩য়, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া, গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, বৈদিক মন্ত্রের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রকাশ করা, যাহাতে সাধারণে বৈদিক ধর্ম্মকে বুঝিতে পারে।

তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারে চারিদিকে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। হরিদ্বার, কানপুর, কাশী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ স্থানে বড়-বড় সভায় বহু বহু লোকের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত গণের সহিত তাঁহার ভীষণ তর্ক হইয়াছিল। তিনি হিন্দু ধর্ম্মের ও সমাজের মধ্যে যাহা কিছু অবৈদিক বা কুৎসিত বা অনুচিত বা অপ্রামাণিক দেখিয়াছিলেন, নির্দ্দয় ভাবে কঠোর যুক্তিতে তৎসমুদয় খণ্ডন করিতেন। ইহার মধ্যে প্রতিমা পূজা একটি প্রধান বিষয় ছিল। তিনি তর্ক করিয়া যুক্তি দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা অবৈদিক, ইহাতে সুবিধার পরিবর্ত্তে বরং নানা অসুবিধাই হয়, এবং সেই জন্যই ইহা ত্যাজ্য। তিনি হিন্দু সমাজে প্রচলিত নানারূপ পূজা, গয়াশ্রাদ্ধ, জগন্নাথাদি দেবতা, গঙ্গাস্নান, গুরুমাহাত্ম্য তন্ত্র, পুরাণ, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়কে (সত্যার্থ প্রকাশ ১১শ সমুল্লাস) কঠোর ভাবে এক দিক্ হইতে খণ্ডন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি জাতি ভেদের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানিতেন বটে, কিন্তু তাহা গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে, জন্ম অনুসারে নহে। তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই এই সব সম্বন্ধে ঘোর তর্ক বিতর্ক উঠিত। স্বামীজীর সহিত তর্কে আঁটিয়া উঠা বড় সহজ ছিল না। লোকে ক্রমশঃ তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রচলিত হিন্দু সমাজ, বলা বাহুল্য, তাঁহাকে শত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ভাবিল তিনি যেন সকলকে খ্রীষ্টান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কাশী হইতে তিনি কলিকাতায় আসেন (১৮৭৩ ডিসেম্বর)। এখানেও তিনি বহু বক্তৃতা করেন, ও পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার বহু বিচার হয়। ব্রাহ্মসমাজের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার বহুবার সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হয়। এখানে সেই সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে তাঁহার ক্ষেত্রটা অনেকটা পরিস্কৃত হইয়াছিল, তিনি তাঁহার বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের বহু সুবিধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদিগকে তিনি অগ্নিহোত্র যজ্ঞোপবীত ধারণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে পারেন নি।

স্বামীজী এতদিন কেবল সংস্কৃতেই বক্তৃতা ও আলোচনা করিতেন, কিন্তু পরে কেশব চন্দ্র সেনের পরামর্শে তিনি তাহা প্রধানতঃ হিন্দীতেই করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতায় "ব্রাহ্ম সমাজ" স্থাপনের আবশ্যকতা আছে, ইহাও অনুভব করেন।

কলিকাতা হইতে তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ ও প্রচার করিয়া বোম্বাই গমন করেন। নবেম্বর (১৮৭৪) সেখানেও তাঁহার বিচার-প্রচার সমস্তই পূর্ব্বের মত হইয়াছিল। এই সময়ে সেখানে নব্যশিক্ষিতেরা "প্রার্থনা সমাজের প্রভাবে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন। তিনি কলিকাতায় "ব্রাহ্মসমাজ" ও বোম্বাইতে "প্রার্থনাসমাজ" দেখিয়া "আর্য্যসমাজ" স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৮৭৫ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাই সহরে সাধারণ সভা করিয়া প্রথম "আর্য্যসমাজ" প্রতিষ্ঠিত হইল।

আর্য্য সমাজের কয়েকটি নিয়ম এই :—

(১) সত্য জ্ঞান ও সত্যজ্ঞানের বিষয়ীভূত সমস্ত পদার্থের মূল ঈশ্বর।

(২) বেদই সত্য শাস্ত্র, প্রত্যেক আর্য্যেরই ইহার অধ্যয়ন, অধ্যাপন, শ্রবণ, ও প্রচার কর্ত্তব্য।

(৩) সত্যকে গ্রহণ ও অসত্যকে বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক কার্য্য সম্পূর্ণরূপে ন্যায় অন্যায় অনুসন্ধান করিয়া, ধর্ম্ম অনুসারে করিতে হইবে।

(৫) আর্য্যসমাজের মূল উদ্দেশ্য জগতের কল্যাণ করা—যাহাতে সকলের শারীরিক আধ্যাত্মিক ও সমাজিক মঙ্গল হয়।

বোম্বাই সহরে আর্য্যসমাজ স্থাপন করিয়া তিনি পুনায় গমন করেন। সেখানেও তিনি কতকগুলি বক্তৃতা করিয়া প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত তর্ক-বিতর্কও বিষম হইয়াছিল।

কেবল হিন্দুসমাজের সঙ্গে নহে, মুসলমান ও খ্রীষ্টানসমাজের সঙ্গে বহু তর্ক-বিতর্ক করিতে হইয়াছিল। মৌলবী ও পাদরী গণের সঙ্গে তাঁহার বহু বিচার হইয়াছিল। এক ধর্ম্ম-মেলায় (চন্দাপুর, শাজাহানপুর, ১৮৭৭ সাল) মৌলবী ও পাদরীগণের সহিত তাঁহার বিচার্য্য বিষয় সমূহের মধ্যে একটি ছিল এই যে—"বেদ, কোরান, ও বাইবেল এই তিনের মধ্যে কোন্ খানিকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া স্বীকার করিবার প্রমাণ আছে; সকলেই নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া বিচার করিয়াছিলেন, ও মনে করিয়াছিলেন জয় হইয়াছে তাঁহারই। বস্তুতঃ এ সব বিচারের ফল এইরূপই হইয়া থাকে।

স্বামীজী রাজপুতানা, উত্তর পশ্চিম, বড়োদা, বোম্বাই ও গুজরাট প্রভৃতি স্থানে নিজের বৈদিক ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফল তেমন কিছুই হয় নাই—যদিও সর্ব্বত্র তাহার আন্দোলনের একটা প্রভাব অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি পঞ্চনদে প্রথম প্রবেশ করিলেন (১৮৭৭) তখন দেখা গেল, বেদবিদ্যার ও বৈদিক ধর্ম্মের সেই পরিচিত প্রাচীন ভূমিতে দেখিতে দেখিতেই, তাহারা উভয়েই স্বামীজীকে উপলক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। আজ যদিও দূর হইতে দূরতর স্থানে দেশ হইতে দেশান্তরে স্বামীজীর প্রচারিত আর্য্যধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তথাপি পঞ্জাবেই ইহা সুপরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৭৭ সালের ২৬শে জুন তারিখে পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে নূতন আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এবং বোম্বাই-এ আর্য্যসমাজ স্থাপনের সময় বিহিত নিয়মগুলিকে এই সময় পুনর্ব্বার সংশোধন করিয়া লওয়া হইল। লাহোর আর্য্যসমাজের সভাসদেরা যখন তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহাকে সমাজের গুরুর পদবী গ্রহণ করিতে হইবে, তখন তিনি কহিলেন, গুরু হইতেছেন পরমপিতা পরমেশ্বর, গুরুবাদ

ভগ্ন করাই আমার উদ্দেশ্য, তাহার প্রচার করা নহে; সভাসদেরা তাহার কথা শুনিয়া আবার যখন বলিলেন আচ্ছা তবে আপনি আমাদের পরম সহায়কের পদ গ্রহণ করুন!' স্বামীজী তখন বলিলেন 'তোমরা যদি আমাকেই পরম সহায়ক বল, তবে ঈশ্বরকে কি বলিবে? তোমরা আমাকে সহায়ক মাত্র জানিও।"

লাহোরে আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৮৭৮ হইতে ১৮৮০ পর্য্যন্ত তিনি পঞ্জাব ও যুক্ত প্রান্তে পর্যটন ও প্রচার করেন। এইসময় থিয়োসফিকাল সমাজের নেতাদের সহিত ইহার আলাপ পরিচয় আলোচনা হইয়াছিল। কর্ণেল অল্কট ও মাদাম ব্লাবাৎস্কি ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। কিছুদিন থিয়োসফিকাল সোসাইটীর সহিত আর্য্যসমাজের একটা যোগ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বেশী দিন টিকে নাই।

স্বামীজী ইহার পর (১৮৮১ সাল ১০ই মার্চ্চ) রাজপুতানায় দীর্ঘ পর্য্যটনের জন্য নির্গত হন। সেই সময়ে উদয়পুরের মহারাণা সজ্জনসিংহ তাঁহাকে আহ্বান করেন। মহামতি মহাদেব গোবিন্দ রানাডে মহাশয় এই সময় মহারাণার রাজসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। স্বামীজী এখানে দীর্ঘ দিন থাকিয়া মহারাণাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি এখানে "পরোপকারিণী" নামে এক সভা স্থাপন করিয়া নিজের যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি পুস্তক ও ছাপাখানা ইত্যাদি ছিল সমস্তই এই সভার হস্তে প্রদান করেন। সভা অনতিবিলম্বেই ২১ হাজার টাকা তুলিয়া নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন।

উদয়পুর হইতে তিনি শাহাপুর গিয়া যোধপুরে আগমন করেন।

স্বামীজী সেখানে সাধারণ বক্তৃতা ও প্রচারের কার্য্য ছাড়া যোধপুরাধীশ মহারাজা বলবন্ত সিংহজীকে বিশেষ উপদেশ প্রদান করিতেন।

এখানে ১৮৮৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধার পর স্বামীজী নিজের পাচকের হাত হইতে দুগ্ধ লইয়া পান করেন। একটু পরেই তাঁহার পেটে অত্যন্ত বেদনা আরম্ভ হইল, তিনি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। শুনা যায় পাচক অন্যের প্রেরণায় ধনলোভে অতি সূক্ষ্ম কাচচূর্ণকে চিনির সহিত দুধের মধ্যে মিশাইয়া দিয়াছিল। স্বামীজী পাচকের এই অপকার্য্যের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পাচক ইহা তাঁহার নিকট স্বয়ং স্বীকার করে। কতটাকার জন্য সে এই অপকার্য্য করিয়াছে তাহা তিনি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে সেই টাকা দিলেন, এবং বলিলেন, তুমি এই টাকা লইয়া এখনি এই দেশীয় ও ইংরেজ রাজ্য ছাড়িয়া নেপালের দক্ষিণে পলায়ন কর। মহারাজ বলবন্ত সিংহ তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না। পাচক প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। এদিকে স্বামীজীর পীড়া ক্রমশঃ গুরুতর হওয়ায় সুচিকিৎসার জন্য তাঁহাকে প্রথমে আবুতে ও পরে আজমীঢ়ে আনয়ন করা হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইল। ৩০শে অক্টোবর (১৮৮৩) অপরাহ্ণে তাঁহার অবিলম্বে মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া পরমাত্মার ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইহার পর শুইয়া পড়িয়া সন্নিহিত সকলকেই সম্মুখ হইতে পশ্চাতের দিকে যাইতে বলিলেন, উদ্দেশ্য তাঁহার সম্মুখে আসিলে তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ হইবে। সকলে সরিয়া গেলে

ভগবানের গুণপ্রকাশক একটি হিন্দিগান করিয়া গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সন্ধ্যা ৬টার সময় স্বামীজী দেহত্যাগ করিলেন! সে দিন দীপান্বিতা অমাবস্যা; তাঁহার অভাবেই সঙ্গে সঙ্গে যেন চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার বিশ্বকে আচ্ছন্ন করিল! কিন্তু পর ক্ষণেই চতুর্দ্দিকে দীপাবলীর দীপলেখা জ্বলিয়া উঠিল, অন্ধকার তিরোহিত হইল। মনে হইল স্বামী দয়ানন্দের সত্য দীপই সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত হইয়া থাকিল। যেন তিনি শোকমুগ্ধ শিষ্যগণকে আশ্বাস দিয়া গেলেন—'বৎসগণ, আমি চলিলাম, কিন্তু ঐ দেখ আমার সত্য দীপ চারিদিকে জ্বলিয়া থাকিল; তাহাই তোমাদিগকে চালিত করিবে।

স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি তিনি বস্তুতই সত্যের উপাসক ছিলেন। যদি তিনি বুঝিতেন ইহা সত্য তবে তিনি তাহা অনুসরণ ও প্রচার করিতেন তাহা যতই না কেন দুষ্কর হউক। এ জন্য তিনি নিন্দা-স্তুতি কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি সত্যার্থ প্রকাশের ভূমিকায় বলিতেছেন—"সত্য অর্থের প্রকাশ করাই আমার এই গ্রন্থের মুখ্য প্রয়োজন। 'সত্য অর্থের প্রকাশ' বলিতে আমি ইহাই বুঝি যে, যাহা সত্য তাহাকে সত্য এবং যাহা মিথ্যা তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করা। সত বলিতে ইহাই বুঝিতে হয় যে, যাহা যেরূপ তাহাকে সেইরূপই বলা, লেখা ও মান্য করা।...কাহারো মনে কষ্ট দেওয়া বা কাহারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থে কিছুই লিখিত হয় নাই। যাহাতে মানব জাতির উন্নতি ও উপকার হয়, মানবেরা যাহাতে সত্য-মিথ্যা জানিয়া সত্যকে গ্রহণ ও মিথ্যাকে বর্জ্জন করিতে পারে তাহাই করা ইহার তাৎপর্য্য। সত্যের উপদেশ ছাড়া মানবজাতির উন্নতির অন্য কোনো উপায় নেই।"

স্বামীজী স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রেম কেবল স্বদেশেই আবদ্ধ হইয়াছিল না তিনি কেবল ভারতবাসীরই কল্যাণ চিন্তা করেন নাই, তিনি মানবজাতিরই কল্যাণ চাহিয়াছিলেন। তিনি যখন বেদকেই ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন তখন বেদান্ত ধর্ম্ম যে সমগ্র মানবজাতির মঙ্গললাভের জন্য তাহা তাঁহার বুঝিতে একটুও বিলম্ব হয় নি। তাই তাঁহার বৈদিকধর্ম্মের গ্রহণে কোনো দেশের কোনো জাতির কোনো লোকের বাধা তিনি দেখিতে পান নি। জাতিবাদের কোনো বন্ধন ইহার মধ্যে নাই। বিশেষ কোনো জাতিতে বা বিশেষ কোনো বংশে জন্মিলে যোগ্যব্যক্তিরও বেদোক্ত ধর্ম্মে অধিকার থাকিবে না ইহা তিনি ভাবিতে পারেন নি, আর তাঁহার মত লোক ইহা ভাবিতে পারেনও না। তাই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে মুসলমান পর্য্যন্তও স্থান পাইয়াছে। তথাকথিত অস্পৃশ্য অপাঙ্‌ক্তেয় জাতিরাও আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় স্বামীজী মানবজাতির সমগ্র অঙ্গেরই পুষ্টিকে যথার্থ কল্যাণ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অঙ্গবিশেষের পুষ্টি তাঁহার মতে পুষ্টিই নহে। এইজন্যই স্বামীজীর প্রচারিত ধর্ম্ম খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রচারকে অনেকটা বাধা প্রদান করিতে পারিয়াছিল।

স্বামীজীর দৃষ্টি কেবল ধর্ম্মসংস্কারেই আবদ্ধ ছিল না, তিনি সমাজের বিভিন্ন বিষয় সমূহের সংস্কার করিয়াছিলেন। দেশের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক এই ত্রিবিধ উন্নতিরই দিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। এই সমস্ত সংস্কার করিতে [illegible] তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহার

ন্যায় যুক্তিপ্রবণ ব্যক্তির পক্ষে ইহা বুঝা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, যুক্তি তর্ক দ্বারা যথাযথরূপে সমস্ত বুঝাইয়া না দিলে কেবল অনুশাসনের দ্বারা লোকে বুঝিতে পারিবে না। তাই তিনি যেদিকেই যাহা কিছু করিতে গিয়াছিলেন সেই সমস্তকেই নানারূপ যুক্তি তর্ক দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কারের কার্য্য এইরূপেই চলিয়াছিল।

শিক্ষাসংস্কার তাঁহার অন্যতম প্রধান কার্য্য। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন শিক্ষাকে ব্রহ্মচর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না করিলে শারীরিক ও মানসিক কোনো শিক্ষাই উপযুক্ত হইতে পারে না। তিনি প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া শিক্ষণীয় বিষয় সমূহকে প্রাচীনেরই মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নি, নবীনকেও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ও নবীনের যথাযথযোগেই তাঁহার শিক্ষাবিধি সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

তিনি কেবল বালকগণেরই শিক্ষা ব্যবস্থা করিয়া নিবৃত্ত ছিলেন না, স্ত্রীশিক্ষাতেও তাঁহার সমান উৎসাহ ও উদ্যোগ ছিল। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া কন্যাগণকেও উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, ইহা কেবল যুক্তিতে নহে, বৈদিক প্রমাণেও তিনি ব্যবস্থাপিত করেন। ইহারই পরিণামে আজ আর্য্যসমাজে বহু কন্যাপাঠশালার সৃষ্টি হইয়াছে। কন্যাপাঠশালার ছাত্রীগণের সংস্কৃত ভাষার পটুতার কথা অনেকেই জানেন। স্বামীজী পুত্র-কন্যা উভয়েরই শিক্ষাকে অবশ্য বিধেয় (compulsory) করিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

বাল্যে বা অকালে বিবাহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া স্বামীজী সমাজের আর এক দিকে বহুকল্যাণ সাধন করেন। পতিপুত্রহীনা বিধবাগণের সন্তান লাভের জন্য তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের নিয়োগবিধির অনুমোদন করেন। বর্ত্তমানযুগে নিয়োগ সম্বন্ধে লোকমত অতিবিরুদ্ধ থাকিলেও স্বামীজী যে, অনুমোদন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার নারীজাতির প্রতি সকরুণ দৃষ্টিই প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষ বিশেষ স্থলে তিনি বিধবা বিবাহের বিধান করিয়াছিলেন।

স্বামীজী গোরক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এসম্বন্ধে বড় বড় রাজকর্ম্মচারীরও সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে ছাড়েন নি, আন্দোলনও অনেক করিয়াছিলেন। গোরক্ষা হইলে ভারতের কত দিকে কত উন্নতি হইতে পারে ইহা তিনি তলাইয়া বুঝিয়াছিলেন। স্বামীজীর মাতৃভাষা ছিল গুজরাতী, কিন্তু প্রচারের জন্য তিনি হিন্দী অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইঁহার দ্বারা হিন্দীর প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। তিনি ইংরাজী জানিতেন না, কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রচারের তখন বাধা হয় নাই। ইংরাজী না হইলে আজকাল ভারতেও প্রচার করা শক্ত, কিন্তু আশা হয়, কিছু দিন পরে আবার হিন্দীতেই ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার কার্য্য চলিবে।

বৈদিক ধর্ম্মের সহিত স্বামীজী বৈদিক সাহিত্যেরও বহু প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার অবলম্বিত বেদব্যাখ্যা-প্রণালীর সহিত অনেকে একমত না হইতে পারেন, কিন্তু বৈদিক সাহিত্য আলোচনার দিকে তিনি যে দেশের লোকের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

তাঁহার স্থাপিত আর্য্যসমাজের প্রভাব ও কার্য্য আজ কেবল ভারতেরই মধ্যে নহে; ইহার বাহিরেও অনুভূত হইতেছে। আর্য্যসমাজের কার্য্য উৎসাহ ও নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। তাহার লোকহিতকর কার্য্য নিজেই পুরস্কৃত হইতেছে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

স্বরাজ সাধনায় নারী।

শাস্ত্রে ত্রিবিধ দুঃখের কথা আছে। পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখকেই হয়ত ঐ তিনটির পর্য্যায়েই ফেলা যায়, কিন্তু আমার আলোচনা আজ সে নয়। বর্ত্তমান কালে যে তিনপ্রকার ভয়ানক দুঃখের মাঝখান দিয়ে জন্মভূমি আমাদের গড়িয়ে চলেচে, সেও তিন প্রকার সত্য, কিন্তু সে হচ্চে, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক। রাজনীতি আমরা সবাই বুঝিনে, কিন্তু, এ কথা বোধ করি অনায়াসেই বুঝ্‌তে পারি, এই তিনটিই একেবারে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। একটা কথা উঠেছে, একা রাজনীতির মধ্যেই আমাদের সকল কষ্টের, সকল দুঃখের অবসান। হয়ত একথা সত্য, হয়ত নয়, হয়ত বা সত্যে মিথ্যায় জড়ানো, কিন্তু এ কথাও কিছুতেই মিথ্যা নয় যে, মানুষের কোনো দিক দিয়েই দুঃখ দূর করার সত্যকার প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। যাঁরা রাজনীতি নিয়ে আছেন তাঁরা সর্ব্বথা, সর্ব্বকালেই আমাদের নমস্য। কিন্তু আমরা, সকলেই যদি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার সুস্পষ্ট চিহ্ন খুঁজে না ও পাই, যে দাগ গুলো কেবল স্থূল দৃষ্টিতেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—আমাদের আর্থিক এবং সামাজিক স্পষ্ট দুঃখ গুলো—কেবল এই গুলিই যদি প্রতিকারের চেষ্টা করি, বোধ হয় মহাপ্রাণ রাজনৈতিক নেতাদের স্কন্ধ থেকে একটা মস্ত গুরুভারই সরিয়ে দিতে পারি।

তোমাদের দীর্ঘ অবকাশের প্রাক্কালে, তোমাদের অধ্যাপক এবং আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত মৈত্র মহাশয়, এই শেষের দিকের অসহ্য বেদনার গোটা কয়েক কথা, তোমাদের মনে করে দিবার জন্যে আমাকে আহ্বান করেছেন এবং আমিও সানন্দে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেচি। এই সুযোগ এবং সম্মানের জন্য তোমাদের এবং তোমাদের গুরুস্থানীয়দের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিই।*

এই সভায় আমার ডাক পড়েছে দুটো কারণে। একেত মৈত্রমশাই আমার বয়সের সম্মান করেছেন, দ্বিতীয়তঃ একটা জনরব আছে, দেশের পল্লীতে পল্লীতে গ্রামে গ্রামে আমি অনেক দিন ধরে অনেক ঘুরেচি। ছোটবড়, উঁচুনীচু, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ বহু লোকের সঙ্গে মিশে মিশে, অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করে রেখেচি। জনরব কে রটিয়েছে খুঁজে পাওয়া শক্ত, এবং এর মধ্যে যত অত্যুক্তি আছে, তার জন্য আমাকেও দায়ী করা; চলে না। তবে. হয়ত, কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। দেশের নব্বুই জন যেখানে বাস করে আছেন সেই পল্লীগ্রামেই আমার ঘর। মনের অনেক আগ্রহ অনেক কৌতূহল দমন করতে না পেরে অনেক দিনই ছুটে গিয়ে তাঁদের মধ্যে পড়েচি, এবং তাঁদের বহু দুঃখ, বহু দৈন্যের আজও আমি সাক্ষী হয়ে আছি। তাঁদের সেই সব অসহ্য, অব্যক্ত, অচিন্তনীয় দুঃখ দৈন্য ঘোচাবার ভার নিতে আজ আমার দেশের সমস্ত নরনারীকে আহ্বান করতে সাধ যায়, কিন্তু, কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে আসে, যখনই মনে হয়, মাতৃভূমির এই মহাযজ্ঞে নারীকে আহ্বান করা আমার কতটুকু অধিকার আছে! যাকে দিই নি, তার কাছে

* পুজাবকাশের পূর্ব্বে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের নিকট পঠিত।

প্রয়োজনে দাবী করি কোন্ মুখে? কিছুকাল পূর্ব্বে নারীর মূল্য বলে আমি একটা প্রবন্ধ লিখি, সেই সময় মনে হয় আচ্ছা, আমার দেশের অবস্থা ত আমি জানি, কিন্তু, আরও ত ঢের দেশ আছে, তারা নারীর দাম সেখানে কি দিয়েছে? বিস্তর পুঁথি পত্র ঘেঁটে যে সত্য বেরিয়ে এল, তা দেখে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। পুরুষের মনের ভাব, তার অন্যায়, এবং অবিচার সর্ব্বত্রই সমান। নারীর ন্যায্য অধিকার থেকে কমবেশী প্রায় সমস্ত দেশের পুরুষ তাঁদের বঞ্চিত করে রেখেচেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাই আজ দেশ জুড়ে আরম্ভ হয়ে গেছে! স্বার্থ এবং লোভে, পৃথিবী জোড়া যুদ্ধে, পুরুষে যখন মারামারি কাটাকাটি বাধিয়ে দিলে তখনই তাদের প্রথম চৈতন্য হল, এই রক্তারক্তিই শেষ নয়, এর উপরে আরও কিছু আছে। পুরুষের স্বার্থের যেমন সীমা নেই, তার নির্লজ্জতারও তেম্‌নি অবধি নেই। এই দারুণ দুর্দ্দিনে নারীর কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াতে তার বাধ্‌লনা। আমি ভাবি, এই বঞ্চিতার দান না পেলে এ সংসার-ব্যাপী নরযজ্ঞের প্রায়শ্চিত্তের পরিমাণ আজ কি হত? অথচ, এ কথা ভুলে যেতেও আজ মানুষের বাধে নি।

আজ আমাদের ইংরাজ Government এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ক্ষোভের অন্ত নেই। গালিগালাজও কম করিনে। তাদের অন্যায়ের শাস্তি তারা পাবে, তিনি কেবলমাত্র তাদেরই ত্রুটির উপর ভর দিয়ে আমরা যদি পরম নিশ্চিন্তে আত্মপ্রসাদ লাভ করি তার শাস্তি কে নেবে? এই প্রসঙ্গে আমার কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ-খুড়া জ্যোঠাদের ক্রোধাক্ত মুখ গুলি ভারি মনে পড়ে। এবং সেই সকল মুখ থেকে যে সব বাণী নির্গত হয় তাও মনোরম নয়। তাঁরা আমাকে এই বলে অনুযোগ করেন, আমি আমার বইয়ের মধ্যে কন্যাপণের বিরুদ্ধে মহা হৈ চৈ করে তাঁদের কন্যাদায়ের সুবিধে করে দিইনে কেন?

আমি বলি মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

তাঁরা চোখ কপাল তুলে বলেন, সে কি মশায় কন্যা দায় যে!

আমি বলি, তাহলে কন্যা যখন দায় তখন তার প্রতিকার আপনিই করুন, আমার মাথা গরম করার সময়ও নেই, বরের বাপকে নিরর্থক গালমন্দ করবার ও প্রবৃত্তি নেই। আসল কথা এই যে, বাঘের সুমুখে দাঁড়িয়ে, হাত জোড় করে তাকে বোষ্টম হতে অনুরোধ করায় ফল হয় বলেও যেন আমার ভরসা হয় না, যে বরের বাপ কন্যাদায়ীর কান মুচ্‌ড়ে টাকা আদায়ের আশা রাখে তাকেও দাতা কর্ণ হতে বলায় লাভ হবে বিশ্বাস করিনে। তার পায়ে ধরেও না, তাঁকে দাঁত খিঁচিয়েও না। আসল প্রতিকার মেয়ের বাপের হাতে, যে টাকা দেবে তার হাতে। অধিকাংশ কন্যাদায়ীই আমার কথা বোঝেন না, কিন্তু কেউ কেউ বোঝেন। তাঁরা মুখখানি মলিন করে বলেন, 'সে কি করে হবে মশাই, সমাজ রয়েছে যে! সমস্ত মেয়ের বাপ যদি এ কথা বলেন ত আমিও বল্‌তে পারি, কিন্তু একা ত পারিনে!' কথাটা তাঁর বিচক্ষণের মত শুনতে হয় বটে, কিন্তু আসল গলদও এইখানে। কারণ, পৃথিবীতে কোন সংস্কারই কখনো দল বেঁধে হয় না! একাকীই দাঁড়াতে হয়। এর দুঃখ আছে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত একাকীত্বের দুঃখ, একদিন সংঘবদ্ধ হয়ে বহুর কল্যাণকর হয়। মেয়েকে যে মানুষ বলে নেয়, কেবল মেয়ে বলে, দায় বলে, ভার বলে নেয় না, সে—ই

কেবল এর দুঃখ বইতে পারে, অপরে পারে না। আর কেবল নেওয়াই নয়, মেয়ে মানুষকে মানুষ করার ভার ও তারই উপরে এবং এইখানেই পিতৃত্বের সত্যকার গৌরব।

এ সব কথা আমি শুধু বল্‌তে হয় বলেই বল্‌চিনে; সভায় দাঁড়িয়ে মনুষ্যত্বের আদর্শের অভিমান নিয়েও প্রকাশ করচিনে, আজ আমি নিতান্ত দায়ে ঠেকেই একথা বল্‌চি। আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছেন—আমিও তাদের একজন। কিন্তু আমার অন্তর্য্যামী কিছুতেই আমাকে ভরসা দিচ্চেন না। কোথায় কোন অলক্ষ্যে থেকে যেন তিনি প্রতিমুহূর্ত্তেই আভাস দিচ্চেন এ হবার নয়। যে চেষ্টায়, যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্য্যন্ত যাদের দিইনি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে শুদ্ধমাত্র চরকা কাটিতে বাধ্য করেই এত বড় বস্তু লাভ করা যাবে না। গেলেও সে থাক্‌বে না। মেয়েমানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে করেই রেখেচি মানুষ হতে দিই নি স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যে দেশ, যেদিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় করে দেখেচে, তার মনুষ্যত্বের কোন খেয়াল করেনি, তার দেনা আগে তাকে শেষ করতেই হবে!

এইখানে একটা আপত্তি উঠ্‌তে পারে যে, নারীর পক্ষে সতীত্ব জিনিসটা তুচ্ছও নয়, এবং দেশের লোক তাদের মা-বোন-মেয়েকে সাধ করে যে ছোট করে রাখ্‌তে চেয়েচে তাও ত সম্ভব নয়। সতীত্বকে আমিও তুচ্ছ বলিনে কিন্তু একেই তার নারী জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি। কারণ, মানুষের মানুষ হবার যে স্বাভাবিক এবং সত্যকার দাবী একে ফাঁকি দিয়ে যে কেউ যে-কোন-একটা-কিছুকে বড় করে খাড়া করতে গেছে, সে তাকেও ঠকিয়েছে নিজেও ঠকেছে। তাকেও মানুষ হতে দেয়নি, নিজের মনুষ্যত্বকেও তেম্‌নি অজ্ঞাতসারে ছোট করে ফেলেচে। একথা তার মন্দ চেষ্টায় করলেও সত্য, তার ভাল চেষ্টায় করলেও সত্য! Frederic the Great মস্ত বড় রাজা ছিলেন, নিজের দেশের এবং বংশের তিনি অনেক মঙ্গল করে গেছেন, কিন্তু তাদের মানুষ হতে দেননি। তাই তাঁকেও মৃত্যুকালে বলতে হয়েছে 'all my life I have been but a slave driver!' এই উক্তির মধ্যে ব্যর্থতার কত বড় যে গ্লানি অঙ্গীকার করে গেছেন সে কেবল জগদীশ্বরই জেনেছিলেন।

আমার জীবনের অনেকদিন আমি Sociologyর (সমাজতত্ব) ছাত্র ছিলাম। দেশের প্রায় সকল জাতিগুলিকেই আমার ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছে,—আমার মনে হয় মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব্ব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তারা, কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি নৈতিক সকল দিক দিয়েই ছোট হয়ে গেছে। এর উল্টো দিকটাও আবার ঠিক এমনি সত্য। অর্থাৎ, যে জাতি যে পরিমাণে তার সংশয় ও অবিশ্বাস বর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছে, নারীর মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা যারা যে পরিমাণে মুক্ত করে দিয়েছে,—নিজেদের অধীনতার শৃঙ্খল ও তাদের তেম্‌নি ঝরে গেছে। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ পাওয়া যাবে না যারা মেয়েদের মানুষ হবার স্বাধীনতা হরণ করেনি, অথচ

তাদের মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা অপর কোন প্রবল জাত কেড়ে নিয়ে জোর করে রাখতে পেরেচে। কোথাও পারেনি,—পারতে পারেও না, ভগবানের বোধ হয় তা আইনই নয়। আমাদের আপনাদের স্বাধীনতার প্রযত্নে আজ ঠিক্ এই আশঙ্কাই আমার বুকের ওপর জাঁতার মত বসে আছে। মনে হয় এই শক্ত কাজটা সকল কাজের আগে আমাদের বাকি রয়ে গেছে, ইংরাজের সঙ্গে যার কোন প্রতিদ্বন্দিতা নেই। কেউ যদি বলেন, কিন্তু এই এসিয়ায় এমন দেশ ও ত আজ ও আছে মেয়েদের স্বাধীনতা যারা একতিল দেয়নি; অথচ তাদের স্বাধীনতা ও ত কেউ অপহরণ করেনি। অপহরণ করবেই এমন কথা আমি ও বলিনি। তবুও অমি এ কথা বলি, স্বাধীনতা যে আজ ও আছে সে কেবল নিতান্তই দৈবাতের বলে। এই দৈব বলের অভাবে যদি কখনও ও বস্তু যায়, ত আমাদেরই মত কেবল মাত্র দেশের পুরুষের দল কাঁধ দিয়ে এ মহাভার সূচ্যগ্র ও নড়াতে পারবেনা। শুধু আপাতঃ দৃষ্টিতে এই সত্যের ব্যত্যয় দেখি ব্রহ্ম দেশে। আজ সে দেশ পরাধীন। একদিন সে দেশে নারীর স্বাধীনতার অবধি ছিলনা। কিন্তু যে দিন থেকে পুরুষে এই স্বাধীনতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করে ছিল, সেই দিন থেকে, একদিকে যেমন নিজেরাও অকর্ম্মণ্য বিলাসী এবং হীন হতে সুরু করে-ছিল, অন্যদিকে তেম্‌নি নারীর মধ্যেও স্বেচ্ছাচারিতার প্রবাহ আরম্ভ হয়েছিল। আর সেই দিন থেকেই দেশের অধঃপতনের সূচনা। আমি এদের অনেক শহর, অনেক গ্রাম, অনেক পল্লী অনেকদিন ধরে ঘুরে বেড়িয়েচি, আমি দেখ্‌তে পেয়েছি তাদের অনেক গেছে কিন্তু একটা বড় জিনিস তারা আজও হারায়নি। কেবল মাত্র নারীর সতীত্বটাকেই একটা ফেটি্‌স করে তুলে তাদের স্বাধীনতা তাদের ভাল হবার পথটাকে কণ্টকাকীর্ণ কোরে তোলেনি। তাই আজও দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, আজ ও দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আজও দেশের আচার ব্যবহার মেয়েদের হাতে। আজও তাদের মেয়েরা একশতের মধ্যে নব্বুই জন লিখ্‌তে পড়তে জানে, এবং তাই আজও তাদের দেশ থেকে আমাদের এই হতভাগ্য দেশের মত, আনন্দ জিনিসটা একেবারে নির্ব্বাসিত হয়ে যায় নি। আজ তাদের সমস্ত দেশ অজ্ঞতা, জড়তা ও মোহের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সত্য, কিন্তু একদিন যেদিন তাদের ঘুম ভাঙ্‌বে এই সমবেত নরনারী একদিন যেদিন চোখ মেলে জেগে উঠ্‌বে, সেদিন এদের অধীনতার শৃঙ্খল, তা সে যত মোটা এবং যত ভারিই হোক্, খসে পড়তে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হবে না তাতে বাধা দেয় পৃথিবীতে এমন শক্তিমান কেউ নেই।

আজ আমাদের অনেকেরই ঘুম ভেঙেচে। আমার বিশ্বাস এখন দেশে এমন একজন ও ভারতবাসী নেই যে এই প্রাচীন পবিত্র মাতৃভূমির নষ্ট গৌরব, বিলুপ্ত সম্মান পুনরুজ্জীবিত না দেখ্‌তে চায়। কিন্তু কেবল চাইলেই ত মেলেনা, পাবার উপায় করতে হয়। এই উপায়ের পথেই যত বাধা, যত বিঘ্ন, যত মতভেদ। এবং এই খানেই একটা বস্তুকে আমি তোমাদের চির জীবনের পরম সত্য বলে অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। যার যা দাবী তাকে তা' পেতে দাও। তা' সে যেখানে এবং যারই হোক। এ আমার বই পড়া বড় কথা নয়, এ আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তির মুখে শোনা তত্ত্বকথা নয়,—এ আমার এই দরিদ্র জীবনের বার বার ঠেকে শেখা সত্য। আমি কেবল এই টুকু দিয়েই অত্যন্ত

জটিল সমস্যার এক মুহূর্ত্তে মীমাংসা করে ফেলি। অমি বলি মেয়ে মানুষ যদি মানুষ হয়, এবং স্বাধীনতায়, ধর্ম্মে, জ্ঞানে যদি মানুষের দাবী আছে স্বীকার করি, ত এ দাবী আমাকে মঞ্জুর করতেই হবে, তা সে ফল তার যাই হোক। হাড়ি-ডোমকেও যদি মানুষ বল্‌তে বাধ্য হই, এবং মানুষের উন্নতি করবার অধিকার আছে এ যদি মানি তাকে পথ ছেড়ে আমাকে দিতেই হবে, তা সে যেখানেই গিয়ে পৌঁছাক। আমি বাজে ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে কিছুতেই তাদের হিত করতে যাইনে। আমি বলিনে, বাছা তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এ করতে নেই, ও বল্‌তে নেই ওখানে যেতে নেই,—তুমি তোমার ভাল বোঝনা—এস আমি তোমার হিতের জন্য তোমার মুখে পরদা এবং পায়ে দড়ি বেঁধে রাখি। ডোমকে ও ডেকে বলিনে, বাপ্‌, তুমি যখন ডোম তখন এর বেশি চলা-ফেরা তোমার মঙ্গলকর নয়, অতএব এই ডিঙোলেই তোমার পা ভেঙে দেব। দীর্ঘ দিন বর্ম্মা দেশে থেকে এটা আমার বেশ কোরে শেখা, যে মানুষের অধিকার নিয়ে গায়ে পড়ে খেলাই তার হিত করবার আবশ্যক নেই।

আমি বলি যার যা দাবী সে ষোল আনা নিক। আর ভুল করা যদি মানুষের কাজেরই একটা অংশ হয়, ত সে যদি ভুল করে ত বিস্ময়েরই বা কি আছে, রাগ করবারই বা কি আছে! ছুটো সুপরামর্শ দিতে পারি,—কিন্তু মেরে ধরে হাত পা খোঁড়া করে ভাল তার করতেই হবে, এত বড় দায়িত্ব আমার নেই। অতখানি অধ্যবসায় ও নিজের মধ্যে খুঁজে পাইনে। বরঞ্চ মনে হয়, বাস্তবিক, আমার মত কুঁড়ে লোকের মত মানুষে মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষাটা যদি জগতে একটু কম করে কোরত ত তারাও আরামে থাকৃত এদের ও সত্যকার কল্যাণ হয়ত একটু আধটু হবার ও যায়গা পেত। দেশের কাজ, দেশের মঙ্গল করতে গিয়ে, এই কথাটা আমার, তোমরা ভুলোনা।

আজ তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কথা বল্‌বার ছিল। সকল দিক দিয়ে কি কোরে সমস্ত বাঙ্‌লা জীর্ণ হয়ে আস্‌চে,—দেশের যারা মেরু-মজ্জা সেই ভদ্র গৃহস্থ পরিবার কি কোরে কোথায় ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে আস্‌ছে, সে আনন্দ নেই, সে প্রাণ নেই, সে ধর্ম্ম নেই, সে খাওয়া-পরা নেই ; সমৃদ্ধ প্রাচীন গ্রাম গুলা প্রায় জন শূন্য,—বিরাট প্রাসাদ তুল্য আবাসে শিয়াল কুকুর বাস করে ; পীড়িত, নিরুপায় মৃতকল্প লোক গুলো যারা আজ ও সেখানে পড়ে আছে, খাদ্যাভাবে, জলাভাবে কি তাদের অবস্থা,—এই সব সহস্র দুঃখের কাহিনী তোমাদের তরুণ প্রাণের সামনে হাজির করবার আমার সাধ ছিল, কিন্তু এবার আমার সময় হলোনা। তোমরা ফিরে এস, তোমাদের অধ্যাপক যদি আমাকে ভুলে না যান ত আর একদিন তোমাদের শোনাব। আজ আমাকে তোমরা ক্ষমা কর।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষার্থী স্বেচ্ছাসেবক মণ্ডলীর প্রথম অধিবেশনে উপদেশ।

শুনেছি মুদীরা জমাখরচের হিসাবে আধপয়সার গরমিল মেলাবার জন্য চার পয়সার তেল পোড়ায়। আমরা এই রকম অনেক সময় ছেলেদের জমা খরচ মেলাবার চেষ্টা করি। শতকরা কত ছেলে কলেজ ছেড়ে দিয়েছে, তারই দরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় কত কমে গিয়েছে, অধ্যাপকের সংখ্যা ও বেতন কত কমাতে হবে, এই হিসাব মেলাতে সকলে ব্যস্ত, কিন্তু এ দিকে বহুমূল্য জীবন-তেল যে পুড়ে যাচ্ছে, তার হিসাব নিকাশ করবার অবকাশ আমাদের নাই। এই বাঙ্গালা দেশে জন্মের চেয়ে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় একলক্ষ অধিক। বিলাতের মতন স্বাধীন দেশে মৃত্যুর চেয়ে জন্ম হাজারে ১১ বেশি; অর্থাৎ, আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের মতন যদি বছরে তাদের দেশে আঠার লাখ মরে, জন্মায় আঠার লাখ কুড়ি হাজার। জাতীয় জীবনের জমা খরচের খাতায় তাদের দেশে জমার ঘরে থাকে হাজার করা ১১ বেশি; আমাদের দেশে খরচের খাতায় হাজার করা প্রায় ১·১ বেশি। এই হিসাবে বাংলা দেশটা শীঘ্রই দেউলে হ'য়ে যাবে। এই খরচের হিসাব খতিয়ে খরচের দফাগুলি বেশ ক'রে দেখা উচিত। প্রথম দফা বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী। আমরা শিখেছি "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।" ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে মা বাপ আশা ক'রে থাকেন, ছেলে গাড়ী ঘোড়া চ'ড়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাক্‌বে। মাথা ধরা, মাথাঘোরা, অম্বল, পেটের অসুখ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, চসমা-প্রাবল্য প্রভৃতি নানা ফাঁড়া কাটিয়ে কোন প্রকারে ছেলেটী বিশ্ববিদ্যালয়-সরস্বতীর পূজা সমাপ্ত ক'রে উকীল পদবী প্রাপ্ত হয়েছে। উকীলের জমার ঘর শূন্য, কিন্তু ইতিমধ্যে লোক সংখ্যার খাতায় জমার ঘর পূর্ণ হ'তে চলেছে। মুন্সেফীর রেজিষ্টারি পুস্তকে নাম লিখিয়ে অনেক কষ্টে একটা মুন্সেফী চাকুরীর জোগাড় হল। জমার চেয়ে খরচ বেশী; কিন্তু উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে, অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনার প্রভাবে, শিক্ষালগুড়াহত দেহে জমার চেয়ে খরচের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে। ("মুন্সেফ-রোগ" বা) ডায়েবিটিস্-জীর্ণ দেহ-তরণীটাকে ঠেলে মুন্সেফীর ক্ষুদ্রনালা থেকে সদরওয়ালার ভরা গঙ্গায় যখন এনে ফেলা হয়েছে, গঙ্গার তরঙ্গাঘাত ঐ জীর্ণ তরণী বেশী দিন সইতে পারলে না। এ ত গেল গরীব ধনীদের কথা। মাসে দুইশত টাকা যার আয় সেও এখন গরীব। কিন্তু দশটা পাঁচটায় কি সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত খেটেও যাদের ভাত কাপড় জোটে না, তারা রোগের আক্রমণ সইতে না পেরে লাখে লাখে মরে। এই সমুদয় রোগের আক্রমণ নিবারণ করা যায়, তাই এদের বলে নিবার্য্য রোগ। বাংলায় বছর বছর দশলক্ষ লোক এই নিবার্য্য রোগে মারা যায়, এদের অর্দ্ধেকের বয়স দশ বছরের কম। চেষ্টার অভাবে প্রতিদিন গড়ে সাড়ে তেরশোয়ের বেশি শিশু মারা যায়।

নিবার্য্য রোগে মারা যায়—

প্রতিবৎসর	...	...	১০,০০,০০০ (মোট)
„	...	...	৫,০০,০০০ ছোট ছেলে
প্রতিদিন	...	...	১৩৭০টী ছোট ছেলে

জন্মের একবছরের ভিতর ৩,২৫,০০০টী শিশু মারা যায়। একথা শুনে তোমরা চমকে উঠ্‌ছ? কিন্তু পেটের ভিতর কত ছেলে মারা যায় জান? প্রায় চার লক্ষ। যে তের চৌদ্দ লাখ ছেলে বেঁচে থাকে, তাদের কজনই বা বড় হয়ে কাজে—প্রকৃত কাজে লাগে.? প্রকৃত কাজ দশটা পাঁচটায় কলম পিষে মুনিবের ধমক খেয়ে বাড়ীতে গিয়ে নিরীহ স্ত্রীলোকদের উপর ঝাল মিটন নয়, কিম্বা তাস পাশার আড্ডায় গিয়ে দুঃখ ভুলে যাওয়া নয়, কিম্বা গাধার খাটুনী খেটে বাড়ী গিয়ে নেতিয়ে পড়া নয়, কিন্তু নিজের ও দেশের কাজে সতেজে অবিশ্রান্ত খাটা। এই অবিশ্রান্ত খাটার শক্তি কজনের? গত যুদ্ধের সময় যে সব বাঙ্গালী যুবক রংরুট হ'তে এসেছিল, তাদের শতকরা ৭৫ জনকে অনুপযুক্ত বলে ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল। কারণ কি?

ইউরোপ-মহাসমরে বিলাতে রংরুটের সময় দশ লক্ষ লোক অকর্ম্মণ্য গণ্য হয়েছিল। অকর্ম্মণ্যতার কারণ ডাক্তারদের মতে শিশুপালন জ্ঞানের অভাব। গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় এবং প্রসবের পর স্ত্রীলোকদের প্রকৃত শুশ্রূষা হয় না; অসুস্থ স্ত্রীলোকদের সন্তান রোগে বা স্তন্যদুগ্ধাভাবে মারা যায়; যারা বাঁচে, দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হ'য়ে থাকে। তাই বিলাতের লোকেরা গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে, প্রসবান্তে স্ত্রীলোকদের ঘরে ঘরে ধাত্রী ও ডাক্তার পাঠিয়ে চিকিৎসা, শুশ্রূষা ও শিশুপালনের ব্যবস্থা করেছেন। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞলোকদের শিক্ষা ও রোগনিবারণের ব্যবস্থার জন্য সভা সমিতি সংস্থাপিত হয়েছে। আমাদের জনসাধারণ এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট; আর সরকারী ব্যবস্থায় লাভের গুড় পিঁপড়েতেই খায়। সৈন্যবিভাগ প্রভৃতি মানুষমারা কল রক্ষার জন্য টাকা ঢেলে, পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট ও মন্ত্রীদের রুই কাতলার ব্যবস্থা ক'রে, যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাই থেকে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় ক'রে সরকার দেশের স্বাস্থ্যরক্ষা করেন। এই উপায়ে দেশে স্বাস্থ্য ফিরে আসতে পারে না। ফিরে আসতে পারে, যদি আমরা দশে মিলে তার ব্যবস্থা করি। অবশ্য পূর্ণ স্বরাজ না এলে পূর্ণ স্বাস্থ্য আসবেনা। কিন্তু স্বরাজ সরঞ্জাম তাড়িৎব্যজনের নিম্নে আরাম কেদারায় সুপ্ত নিদ্রালস স্বদেশানভিজ্ঞ কলিকাতা-বাবু নয়, কিন্তু দেশের প্রকৃত জীবন—গ্রামের শোভা, কৃষক ও শ্রমজীবী। স্বরাজের আশা সুদূর পরাহত ততক্ষণ যতক্ষণ না তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া বসন্ত ওলাওঠা হ'তে রক্ষা করা যায়, তাদের অন্নবস্ত্রাভাব ঘুচিয়ে রোগ আক্রমণ এড়াবার শক্তি দেওয়া যায়। রোগে শোকে সাহায্য ক'রে তাদের আপনার করে নিয়ে বুঝাতে হবে দেশে স্বাস্থ্যতত্ত্ব জ্ঞান, গোচারণ মাঠ, দুগ্ধবতী গাভী এবং দুগ্ধের অভাবে কত লাখ লাখ শিশু মারা যাচ্চে, যারা বড় হয়ে পরিবারের ও দেশের কাজ করতে পারত। তাদের স্ত্রীলোকদের বুঝাতে হবে কেমন ক'রে মা পূতনারাক্ষসী হ'য়ে বিষাক্ত স্তন্যদুগ্ধ বা বিকৃত গোদুগ্ধ খাইয়ে নিজের শিশুকে গলা টিপে মেরে ফেল্‌চে। পূতনারাক্ষসী বিষ মাখান স্তন্যপান করিয়ে শিশু কৃষ্ণকে মারতে গিয়েছিল, কিন্তু শক্তিশালী শিশু স্তন ধ'রে এমন বজ্রটান দিলে যে টানের সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসীর প্রাণ বেরিয়ে গেল। এই আখ্যায়িকার মর্ম্ম বুঝতে হ'লে আয়ুর্ব্বেদ আলোচনার প্রয়োজন। আয়ুর্ব্বেদীয় ভাষায় পূতনা এক প্রকার শিশুরোগের নাম। ইহার লক্ষণের সঙ্গে ধনুষ্টঙ্কার বা পেঁচোয় পাওয়ার লক্ষণের অনেক

সাদৃশ্য। শিশুকৃষ্ণ এই রোগকে নাশ করেছিলেন কেমন ক'রে? এ কথাটা বুঝতে হ'লে Power of Resistance কথাটা বুঝ্‌তে হয়। এ কথার অর্থ রোগ আক্রমণ ব্যর্থ করবার শক্তি। এই শক্তি যার আছে তাকে কোন রোগ আক্রমণ করতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত দিই। ওলাওঠা-বিষ-কলুষিত জল অনেকে খায় কিন্তু যাদের ঐ শক্তি আছে তাদের ওলাওঠা হয় না। ম্যালেরিয়ার দেশে থেকেও কারো কারো ম্যালেরিয়া হয় না। কি রকম জান? যেমন গোলামখানা-খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েও দেশ হিতৈষীদের গোলামী ভাবটা যায় না। এই রোগ তাড়াবার শক্তি শৈশব থেকে তাদেরই জাগে যারা যথেষ্ট পরিমাণে মাতৃদুগ্ধ পায়। স্তনে দুগ্ধ তাদেরই যথেষ্ট হয় যাদের আছে হরিততৃণাচ্ছাদিত গোচারণ মাঠ এবং হৃষ্টপুষ্ট দুগ্ধবতী গাভী। মা যশোদার তা ছিল, তাই শিশু কৃষ্ণ পূতনা-আক্রমণ ব্যর্থ করেছিলেন। গ্রামে গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের বুঝাতে হবে খোলা মাঠের প্রয়োজনীয়তা, কলকারখানা প্রতিষ্ঠাতা সাহেবদের নিকট অর্থলোভে জমি বিলি করার অনিষ্টকারিতা, গোজাতির উন্নতি বিধান এবং বায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষার অত্যাবশ্যকতা। তোমাদের চেষ্টায় যখন গ্রামবাসীর লুপ্তস্বাস্থ্য ফিরে আসবে, নানাবিধ রোগের আক্রমণ ব্যর্থ করতে যখন তারা সমর্থ হবে, নানাবিধ রোগে তাদের শুশ্রূষা ক'রে যখন তাদের মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে আনবে, তখনই বুঝবে তোমরা তাহাদের প্রকৃত বন্ধু। তখন যা বল্‌বে তাই তারা শুন্‌বে। স্বরাজ আসবে প্রাণময় সরল বিশ্বাসী মুক্ত-প্রান্তর-বিহারী গ্রামবাসীর ডাকে, প্রাণহীন জমাখরচ-চিন্তা-ভারগ্রস্ত মোটরারোহী সহরবাসী বাবুবৃন্দের বিজ্ঞতাসূচক বাক্য বিন্যাসে নহে। গ্রামে গিয়ে তাদের আত্ম নির্ভর ও চিন্তাশক্তি জাগিয়ে তুলবে। 'আমাদের যা ছিল ও যা আছে তাই ভাল' এই কাল্পনিক সন্তোষ-মায়া-জালটা ছিঁড়ে দিতে হবে। অনেকগুলি মেয়েলি ব্যবস্থা মুনি ঋষির ব্যবস্থার মতন অলঙ্ঘ্য হ'য়ে পড়েছে; সেই গুলি যে প্রকৃত শাস্ত্র নয় তা বুঝিয়ে দিতে হবে। বুঝাতে হবে ওলাউঠা একটা দানব দৈত্য নয়, যে মন্ত্র-পূত কাগজ বা পতাকা দেখে তারা পালিয়ে যাবে, কিম্বা ভয়ে আমাদের দেশ ছেড়ে পালাতে হবে, কিন্তু এর কারণ কতকগুলি বীজাণু মাত্র। ভয় কি? এদের মৃত্যুবাণ ত প্রত্যেকের হাতেই আছে।* কেবল দশে মিলে ব্যবস্থা করলেই হয়। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে পড়ে কেবল অদৃষ্ট বেচারীকে গালিমন্দ দিবার প্রয়োজন নাই। চেষ্টায় ম্যালেরিয়াও দূরীভূত হয়। ফরাশীশ অধিকারে এল্‌জিরিয়া নামক একটা দেশ আছে। তার মধ্যে মিটিজ্জা উপত্যকার নাম ছিল "ফরাশীশ কবর" (Frenchman's grave)। সেখানে গেলেই ফরাশীশ মাত্রেরই ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু অবধারিত ছিল। দশের চেষ্টায় সে স্থানের পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন সেখানটাকে বলে মরকত মিটিজ্জা। (Emerald Mitidja)। জমির আবাদ ক'রে, কমলা নেবু আঙ্গুর প্রভৃতির চাস করে সে স্থান এখন নন্দন কাননে পরিণত হয়েছে।

অশ্বত্থামা উত্তরার গর্ভস্থ শিশু নষ্ট করবার জন্য যখন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন, ভীতা উত্তরা করযোড়ে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলেছিলেন :—

---

* মুসলমানদের গোর দেওয়া এবং গোরস্থানে সদলে লইয়া যাওয়া ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ। কিন্তু সেদিন ময়মনসিংহে এক গ্রামে ওলাউঠার ভয়ে সকলে পলাইয়া গেল এবং একজন মুসলমান মৃত স্ত্রী পুত্রকে গোর দিবার লোক না পাইয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া নিজে ও সকলে পুড়িয়া মরিল। শ্রীঘ।

পাহি পাহি মহাযোগিন্! দেব দেব জগৎপতে।
অভিদ্রবতি মামীশ! শরস্তপ্তায়সো বিভো।
কামং দহতু মাং নাথ! মামে গর্ভো নিপাত্যতাং॥

আজ লক্ষ লক্ষ শিশুর মাতা করযোড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে বলচেন :—

"রক্ষা কর রক্ষা কর। আমাদিগকে রোগ মৃত্যু আক্রমণ করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাদের সন্তান যেন মারা না যায়।"

ভগবান তাদের কাতর প্রার্থনা শুনেছেন। তাই তিনি গোপালরূপে তোমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে শিশু ও শিশুর জনক জননীকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। তোমরা আপনার মধ্যে তাঁহাকে দর্শন কর এবং শিশুর মধ্যে জাতীয় জীবনের মূল বীজ নিহিত জেনে শিশু ও তাহার পিতা মাতার স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানের জন্য বদ্ধপরিকর হও।

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস।

শান্তি।

গর্জ্জে ঝঞ্ঝা এলো চুলে,
দৃষ্টি উজল বিদ্যুতে;
অট্ট হাস্যে ওষ্ঠ মূলে
দীপ্তি দোয়ায় মৃত্যুতে।
মুষ্টিবদ্ধ ক্ষিপ্ত খড়্গ
রক্ত ধারে চর্চ্চিত;
বিকট নাদে ফাটে স্বর্গ
বিশ্বে প্রলয় তর্জ্জিত।
দৃপ্ত হিংসা, সুরার ঝাঁঝে
নগ্ন অঙ্গ মর্দ্দিছে;
রুধির তৃষায় পিশাচ নাচে
বিশ্বে প্রলয় বর্দ্ধিছে।
কর্ম্মে অটল বিশ্ব-শান্তি
তুচ্ছ করে স্পর্দ্ধিতে;
সদা-শিবের শুভ্র কান্তি
পার্‌বে কেবা মর্দ্দিতে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

স্বরাজ।

(২২)

এখন মনে করা যাউক যে এই গৌরবর্ণ সাম্রাজ্যবাদী জাতি বা নেশনের অন্তর্ভুক্ত শাসক-সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্নভাষী, বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, গৌর, শ্যাম, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ লোকগুলির প্রতি রাষ্ট্রের যে সকল কর্ত্তব্য তাহা সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম। মনে করা যাউক যে তাহাদের সর্ব্বদেশে প্রসারিত বাণিজ্যের স্বার্থ, তাহাদের পরিপুষ্ট ও পুষ্টিপ্রার্থী শ্রমশিল্পের স্বার্থ, তাহাদের অর্দ্ধশিক্ষিত অভিজাতদিগের স্বার্থ, তাহাদের সুশিক্ষিত শাসনক্ষমতাভিমানী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের স্বার্থ, তাহাদের তেজীয়ান্ শ্রমজীবিদের স্বার্থ, তাহাদের জাতীয়তাভিমান দুষ্ট মহিলা ধর্ম্মযাজক বা সুপণ্ডিতদিগের স্বার্থ, তাহাদের গর্ব্বিত জল-স্থল-শূন্য-বিহারী সেনাদিগের স্বার্থ—এককথায় তাহাদের সমগ্র জাতি বা নেশানের স্বার্থ ভারতবর্ষের ভূমি বা খনি, শ্রম বা অর্থদ্বারা পরিপুষ্ট করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা এই শাসকসম্প্রদায় সংযত করিল। মনে করা যাউক যে সুদূর বৃটেনে তাহাদের যে রাষ্ট্র, তাহার আত্মরক্ষা ও পোষণের ব্যাপারে এই শাসক-সম্প্রদায় ভারতবর্ষের স্বার্থের হানি হইতে দিবে না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে ও সেই প্রতিজ্ঞা কার্য্যতঃ পালন করিতে তাহারা ও তাহাদের ভারতীয় প্রতিভূগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। এসব যদি সত্য হয়, তাহা হইলেই কি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গঠনোন্মুখ জাতিগুলি দেশের লোকের সকল রাষ্ট্রীয় কার্য্যের পরিচালনার ভার সেই শাসক-সম্প্রদায়ের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে প্রস্তুত?

প্রশ্নটির উত্তর দিবার সময় কয়েকটি কথা মনে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। পানীয়, অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ, ঔষধ প্রভৃতি মানুষের দেহরক্ষার জন্য যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন তাহার উৎপাদন দেশমধ্যে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা তাহার প্রাপ্তির সুবিধা—এই দুই ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের কি আন্দাজ প্রভাব তাহার কিছুটা আভাস পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। এগুলি না হইলে দেহরক্ষা হয় না, অতি বড় ধার্ম্মিকেরও নয়। মানুষের দৈনিক জীবনের প্রথম ও প্রধান অধ্যায় এইগুলি লইয়া, সুতরাং এইগুলির সম্পর্কে রাষ্ট্রের যে প্রভাব তাহা উপেক্ষা করা চলে না। এগুলির কার কতটা প্রয়োজন তাহা অনেকটা মানুষের নিজের মনের উপর নির্ভর করে। একটা মাত্রা আছে যাহার নীচে আর অভাব কমান যায় না। কিন্তু মাত্রাটা অনেক পরিমাণে নিজের আয়ত্তাধীন। যে নিজের অভাব ও প্রয়োজন যথাসাধ্য স্বল্প করিয়াছে, নিজের মনের বাসনা সংযত করিয়াছে, তাহার জীবনে রাষ্ট্রের শুভ বা অশুভ প্রভাবে তেমন কিছু আসিয়া যায় না। তার পরে যদি সে রামকৃষ্ণপরমহংস দেবের ন্যায় সতত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে আত্মায় পরমাত্মায় যোগসাধনে নিযুক্ত থাকে, তাহার বেলায় রাষ্ট্র নাই বলিলেও হয়। তাহার কাছে সুরাষ্ট্র বা কুরাষ্ট্র নাই, স্বরাজ বা পর-রাজ নাই। আমাদের দেশে তেত্রিশকোটি রামকৃষ্ণপরমহংস বাস করিলে স্বরাজের আলোচনারই প্রয়োজন থাকিত না। আমাদের দেশে তেত্রিশকোটী লোক আমার ন্যায় সাধারণ মানুষ। রামকৃষ্ণপরমহংস দেবের ন্যায় তাহারা এত সংযমী, আত্মস্থ ও যোগ-যুক্ত নহে। তাহাদের ধর্ম্ম বলিতে সচরাচর ধর্ম্মের বাহিরের অনুষ্ঠান বুঝায়। তাহাদের সংযমের

মাত্রা, প্রথমতঃ তাহাদের স্বাভাবিক সুখস্পৃহা ও দ্বিতীয়তঃ তাহাদের পরিবারের অপর লোকের অভাব প্রধানতঃ এই দুইটী দ্বারা নিয়মিত হয়। তাহারা কামিনী কাঞ্চন সর্ব্বথা ত্যাগ করিতে চাহে না। সুতরাং অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতির আয়োজন হইলে, তাহাদের দৈনিক জীবন পিতা পুত্রের সম্বন্ধ, পতি পত্নীর সম্বন্ধ, আত্মীয় স্বজনের সম্বন্ধ, প্রতিবেশী বন্ধুর সম্বন্ধ প্রভৃতি লইয়া ব্যাপৃত থাকে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে জাতকর্ম্ম, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান ও অপর ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়া তাহারা ব্যস্ত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহারা তাহাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন লইয়া বার মাস ত্রিশ দিন ব্যস্ত। আমাদের দেশে বৃটিশরাষ্ট্র মানুষের এই দৈনিক জীবনের উপর প্রত্যক্ষভাবে আধিপত্য করিতে চায় নাই। এই সব পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যে টুকু আধিপত্য করিয়াছে তাহা প্রায়ই দেশের লোকের আদর্শ ও স্বাধীন ইচ্ছার অনুযায়ী। কোনও কোনও স্থলে প্রথমতঃ কিছুটা দেশের লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও, পরে তাহা দেশের লোক অনুমোদন করিয়াছে, যথা—সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, চড়কে পিঠ বিঁধাইয়া ঘোরা ইত্যাদি প্রথা নিবারণ। আরও কতকগুলি ব্যাপার—যথা—দত্তকগ্রহণ, দায়াধিকার, প্রজা-ভূম্যধিকারী সম্বন্ধ, বিবাহবিধি—বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল পরেও তাহাই রাখিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে হাত দেয় না বলিয়াই কি আমরা রাষ্ট্রীয় কার্য্যের পরিচালনার ভার ঐ শাসক-সম্প্রদায়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ?

প্রত্যক্ষভাবে দেশের লোকের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের উপর রাষ্ট্র আধিপত্য না করিলেও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের প্রভাব তাহার উপর আসিয়া পড়িবেই পড়িবে। সে প্রভাব পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে সুস্থ, সবল, সতেজ উদার আনন্দপূর্ণ ও পূর্ণতাপ্রয়াসী করিতে পারে। আবার সে প্রভাবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন দুর্ব্বল, সঙ্কীর্ণ, স্বল্পে তুষ্ট, একঘেয়ে স্ফূর্ত্তিহীন ও ম্লানও হইতে পারে। আমাদের বর্ত্তমান পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে রাষ্ট্র সুস্থ সতেজ, উদার, আনন্দপূর্ণ ও পূর্ণতাপ্রয়াসী করে নাই, ইহা নিশ্চিত। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মাধুর্য্য আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি গুণে তাহা মধুর। তাহাতে ধর্ম্মভাব, আত্মবিসর্জ্জন, পরসেবা প্রভৃতি বৃত্তির চরিতার্থতা সম্ভব। কিন্তু তাহার প্রসার অতি সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ। উদারতা ও বিশালতা তাহার লক্ষণ নহে, বিকাশ ও পূর্ণতার দিকে তাহার দৃষ্টিই নাই। আর এই যে মধুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কথা বলিলাম, তাহা সঙ্কীর্ণই হউক আর বিশালতা ও পূর্ণতাপ্রয়াসী না-ই হউক, সেই সঙ্কীর্ণ অথচ মধুর, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনই বা দেশের কতজন লোকের মধ্যে সম্ভব। শুধু জীবন রক্ষার জন্য জন্য যতটা অর্থের প্রয়োজন, তার উপর একটু কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ হাতে না থাকিলে এই মাধুর্য্যের বিকাশ সম্ভব হয় না। আমাদের দেশের সমগ্র জনসংখ্যার কয়জন লোকের সেই সামান্য উদ্বৃত্ত অর্থ আছে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। আর যাহাদের বা সেই সামান্য উদ্বৃত্ত অর্থ আছে তাহারাও অনেকেই অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। সত্যই "আমরা অন্ন হইয়া থাকি"। নিজ নিজ জীবন

আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে ভারতের বাহিরের সভ্যসমাজের তুলনায় আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা বা ইতিহাসাদি আলোচনার রস আসিয়া তাহাকে নূতন পূর্ণতর মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে যাও, যদিবা কিছু এই নূতন রস পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রবেশ করিতেছে। বাঙ্গালার বাহিরের লোকেরা তাহাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এ রসে বঞ্চিত বলিলেও চলে। তাহার প্রধান কারণ, বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রের বাহিরে জাতীয় আধুনিক সাহিত্য ও শিল্প তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রের বাহিরে সামান্য জনকয়েক লোক বিদেশী সাহিত্য ও বিদেশী শিল্পকলার সাহায্যে মধুর অভাব গুড় দিয়া মোচন করিতেছেন। বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রের কথা বলিবার সময়ও আবার বলি, সমগ্র জনসংখ্যার কতটুকু অংশ এই নূতন রসাস্বাদন করিয়া স্বীয় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আনন্দ উপভোগ করিতেছে? কিন্তু এই সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশের সহায়তা পুরাকালে রাজার ও রাজসভার কর্ত্তব্য ছিল। এখনও রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা ছাড়া সে বিকাশ সহজ হয় না। পরোক্ষভাবে দেশের লোকের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যদি রাষ্ট্রদ্বারা প্রভাবিত হয় ও সে প্রভাব যদি তাহাকে দুর্ব্বল সঙ্কীর্ণ ও ম্লান করিতে পারে, তবুও কি আমরা রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার ঐ বিদেশীয় জাতির শাসকসম্প্রদায়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত?

বিদেশীয় বিজাতীয় শাসকসম্প্রদায়ের পক্ষে তাহাদের আপন দেশের ও জাতির স্বার্থ ভারতের অর্থে পরিপুষ্ট করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা ও সে প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য সরল মনে চেষ্টা করা বরং সহজ। সে প্রতিজ্ঞা পালিত হইলে ভারতের লোকের পানীয়, অন্নবস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতি দেহ রক্ষার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া বরং সহজ হইতে পারে। কিন্তু এই যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিশালতা ও পূর্ণতার কথা বলিলাম, এ ব্যাপারে যদি রাষ্ট্র আসিয়া দেশের লোকের সাহায্য করিতে চায় তবে সে রাষ্ট্রের কর্ণধার বিদেশীয় বিজাতীয় কোনও সম্প্রদায় হইলে চলিতে পারে না। এ ব্যাপারে স্বরাজ না হইলে রাষ্ট্র সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে উদারতা ও পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে না।

কোনও দেশের অধিকাংশ লোকে যদি সদৃশ ভাষা সাহিত্য, ধর্ম্ম, রীতিনীতি ও চালচলনে এক হইয়া জমাট বাঁধিয়া উঠে, তখন ন্যায়তঃ সে জাতি বা "নেশান" সে দেশে স্বীয় হস্তে স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার ভার চাহিতে পারে—ইহাই জাতীয়তাবাদের (Nationalism) মূল কথা। এ কথাটী মনে রাখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পূর্ণতা সাধনের দিকে নজর পড়িলেই, অমনি জাতিগঠন বা রাষ্ট্রগঠন ব্যাপার সহজ হইয়া পড়ে, এমন নয়। রাষ্ট্রীয় জীবনের পূর্ণতা সাধন ও সামাজিক জীবনের পূর্ণতা সাধন এক কথা, এরূপ বলা যায় না। ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন ইহার প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন অথচ পরস্পর সুসংবদ্ধ। একটীর সহিত অপরটীর অতি নিকট সম্পর্ক। এত নিকট সম্পর্ক যে একটীর বিকাশে বাধা পাইলে অপরের স্বাভাবিক ও পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন—এ সকলের উপর

ধর্ম্মসমাজের (church) ও রাষ্ট্রের (state) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব প্রবল। কিন্তু এ সকল প্রকার জীবনের ভিত্তি দেহরক্ষা। মানবদেহ মূলভিত্তি, তাহার উপর মানব মন ও মানব আত্মার ভিন্ন ভিন্ন বিকাশোন্মুখ বৃত্তির নূতন নূতন মালমসলার সাহায্যে পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্ম্মসঙ্ঘ-সংক্রান্ত জীবন গাঁথিয়া তুলিতে হয়। জীবন গঠনের এই ক্রমোন্নতি ও পূর্ণতা প্রয়াসী মালমসলাগুলির শত বৈচিত্র্যের মূলে মানবদেহ। আর পরিবার, সমাজ, ধর্ম্মসঙ্ঘ বা রাষ্ট্র—এ সকল ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টির মধ্যে রাষ্ট্রই হইতেছে সেই বিপুল শক্তিশালী সমষ্টি, যাহার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ঐ মানব দেহ রক্ষা। তাহা যদি হয়, তবে কি আমাদের দেশে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার—এই পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মূলভিত্তি যে মানবদেহ রক্ষা, তাহার শুভাশুভের ভার ঐ বিদেশীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসক-সম্প্রদায়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে আমরা প্রস্তুত?

অপরে আমাকে লালন পালন করিবে আর আমি নিরুদ্বেগে জীবন ধারণ করিব ইহাতে এক রকম শান্তি থাকিতে পারে। কিন্তু বয়োপ্রাপ্তি হইলে, নিজের বৃত্তিগুলির সম্যক্ বিকাশের আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিলে, ইহাতে সুখ বা শান্তি পাওয়া যায় না। আজ প্রায় ১৩ বৎসর হইল লণ্ডনে মিড্‌ল্ টেম্পল্ (Middle Temple Hall) ভোজনশালায় একদিন সন্ধ্যাবেলা প্রায় আড়াই শত লোক একত্র আহারে বসিয়াছিলাম। আমাদের মেজে আমরা চারিজন ছিলাম। তাহার একজন লণ্ডন প্রবাসী স্কচ জাতীয় প্রৌঢ় ব্যারিষ্টার, আর একজনও ব্যারিষ্টার, আইরিশ জাতীয়। তাঁহারা দুইজনে বন্ধু। কেহই ভারতবর্ষ দেখেন নাই। স্কচ ভদ্রলোকটী ভারতবর্ষের নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের প্রাণনাশের জন্য যে চেষ্টা হইয়াছিল তাহার কারণ কি? লোকটা কি এমনই অত্যাচারী যে বাঙ্গালাদের কাছে এতটা অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। দুই দুইবার তাহাকে মারিবার চেষ্টা হইল। ফ্রেজার সাহেবের প্রাণনাশের চেষ্টার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে অপর ব্যারিষ্টারটী, যাহার দেশ আয়র্ল্যাণ্ডে, তিনি হাসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ফ্রেজার সাহেবের বাড়ী কোন্ দেশে। আমি বলিলাম, স্কটল্যাণ্ডে। তিনি হাসি চাপিয়া, রাগের ভাব দেখাইয়া উত্তর দিলেন—"ঐ ত যথেষ্ট কারণ!" (Reason enough!) হাসির রোল পড়িয়া গেল। তাহার পরে আবার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এবার ঐ স্কচ ভদ্রলোকটী আফ্রিকার ও অপরাপর বৃটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীর প্রতি অবমাননার কথা তুলিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এরূপ ব্যবহার যে অন্যায় তাহা কি আবার বলিবার প্রয়োজন আছে? কিন্তু এ ব্যাপারেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশেষত্ব দেখা যাইতেছে। তোমরা ভারতবাসীগণ নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া ইহার প্রতীকারের চেষ্টা কর। দেখিবে, বৃটিশ সাম্রাজ্য তাহাতে বাধা ত দিবেই না, পারিলেই সাহায্য করিবে। এত বড় অন্যায় এই ক্ষুদ্র উপনিবেশগুলি যে করিতে পারে, তাহাতেই প্রমাণ যে সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলির সাম্রাজ্যের ভিতরে কতটা স্বাধীনতা। আমার স্বাধীনতার অর্থই এই যে ভাল বা মন্দ দুইই আমি করিতে পারি, নতুবা স্বাধীনতার অর্থ থাকে না। তোমরা ভারতবাসীরাও সেই স্বাধীনতার অধিকারী। তোমরাও এই অন্যায়ের প্রতিকার-চেষ্টা কর। নিজের

সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য, রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের উন্নতি কর। দেখিবে যে এই বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে যত স্বাধীনতা, এত স্বাধীনতা কোনও রাষ্ট্রে নাই। সাম্রাজ্যের বাহিরে গিয়া ভারতে স্বাধীন রাষ্ট্র সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইলেও দেখিবে যে সে রাষ্ট্রেও নিজ নিজ জীবনে এত স্বাধীনতা পাইবে না। অথচ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিলে, বাহিরের শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইতেছ। মিছামিছি তোমরা 'সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলায়' বলিতেছ। সাম্রাজ্যের বাহিরে গেলে, শুধু তোমাদের কেন, সাম্রাজ্যের যে কোনও অংশের অবস্থা কেমন হইবে জান? যেন তীরে ভূতের উৎপাত এড়াইতে গিয়া অগাধ সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া (Between the devil and the deep sea)।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তা হতে পারে। কিন্তু আমার দেশবাসীর মনের ভাব কি জান? ভূতের সঙ্গে ত ঘর করিয়া দেখা গেল, কি উৎপাত। এখন অগাধ সমুদ্রটা কি রকম, একবার দেখা যাক্। বয়োপ্রাপ্তির এই লক্ষণ।"

(২৩)

বস্তুতঃ কথাও এই। নিজের দেশে নিজের রাষ্ট্র নিজেরা চালাইব, ইহা স্বাভাবিক ইচ্ছা। বয়স হইলে যখন কোনও জাতির বৃত্তিগুলি ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তখন এ ইচ্ছা আপনা আপনি জাগে। মানব সভ্যতার আলোচনা করিতে গিয়া জ্ঞানী এরিষ্টট্‌ল্ এই জন্যই বলিয়াছেন যে মানুষ রাষ্ট্রীয় জীব (Political animal)। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ক্যাম্বেল্ ব্যানার্ম্যান্ (Sir Henry Campbell-Bannerman) বলিয়াছিলেন যে সুরাজ দিয়া স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করা অসম্ভব (Good governmeent can never be a substitute for self-government)। আর যখন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির অগাধ জলে সাঁতার খেলিতে খেলিতে ভারত সচিব মর্লী বা ভারত সচিব মণ্টেগু মাঝে মাঝে বলিয়াছেন যে এ দেশের রাষ্ট্রশাসন যন্ত্র যদি শুধু ভারতবাসীরই হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, ইংরাজকে যদি তাহার চালক না রাখা হয়, তবে সে যন্ত্রের কার্য্যকারিতা (Efficiency) হ্রাস পাইবে ও তাহার ফলে নিকৃষ্ট শাসনে ভারতের জনগণের সমূহ ক্ষতি হইবে,—তখন এই সত্যেরই উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিয়াছি যে, মানিয়া নিলাম যে বহু শতাব্দীর পরাধীনতার ফলে ভারতবাসী শাসনযন্ত্র চালাইতে এখন আর তেমন কর্ম্মকুশল নহে, মানিয়া নিলাম যে, ইংরাজ নিজের দেশে তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিলেও, আমাদের দেশের শাসন যন্ত্র চালাইতে সুনিপুণ, তবুও আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক যখন সুশাসন পাইতে যত ব্যগ্র, তার চেয়ে বেশী ব্যগ্র স্বয়ং শাসন চালাইতে, তখন তাহাদের স্বরাজের সাধ কিছুতেই সুরাজে মিটিতে পারে না। ইংরাজের কর্ম্মকুশলতা যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, ধার করা কর্ম্মকুশলতায় আমাদের দেশের লোকের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকশিত হইতেছে না। তাহারা নিজের কর্ম্মকুশলতা (Efficiency) চায়, পরের ধার করা কর্ম্মকুশলতায় তৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। সে তৃপ্তির জন্য যদি এদেশের শাসন কার্য্য কতকাংশে নিকৃষ্ট হয়, হউক। সুশাসন না-ই হইল। একেবারে দুঃশাসন ত হইবে না। এ কথারও মূলে সেই এক সত্য। ভারতবাসীও মানুষ, ভারতবাসীও

রাষ্ট্রীয় জীব। ইচ্ছা যখন জাগিয়াছে, তখন তাহার রাষ্ট্রীয় বৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশের জন্য স্বাধীনতার নির্ম্মল আলোক, বিশুদ্ধ বাতাস ও উন্মুক্ত আকাশ চাই।

এতদিন আমাদের দেশের লোকের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের কোনই সুযোগ ছিল না, এ কথাও সত্য নহে। আর আজ প্রায় এক বৎসর হইল রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের পূর্ণ সুযোগ মিলিয়াছে বা মিলিবার প্রশস্ত সুগম পথে আমরা আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এ কথাও সত্য নহে। কথাটার সম্যক্ আলোচনা এখানে হইতে পারে না। মোটামুটি কয়েকটী কথা বলা আমার উদ্দেশ্য। কথাগুলি প্রসঙ্গক্রমে আমরা ভারতসচিব মণ্টেগুমহাশয়কে বলিয়াছিলাম। যুদ্ধের সময়ই হউক বা শান্তির সময়ই হউক, শান্তি বিভাগের (civil) কর্ম্মই হউক বা সমর বিভাগের (military) কর্ম্মই হউক, রাষ্ট্রীয় সকল কর্ম্মগুলিকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী, শাসন-নীতি নির্দ্দেশ (Determination of Policy), আর সর্ব্ব নিম্নশ্রেণী, নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কাজ করা (Execution of the Policy)। আর এ দুইয়ের মাঝামাঝি এক শ্রেণী, নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কাজ হইতেছে কি না, তাহার পরিদর্শন (Supervision of Execution)। প্রথম শ্রেণীর বিষয়টা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। দ্বিতীয় শ্রেণী, পরিদর্শন ও তৃতীয় শ্রেণী, নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কাজ —এই দুইটী বুঝিতে, তাহা হইলে আর বেগ পাইতে হইবে না। শাসন বা পোষণ কার্য্য কোন্ নীতি অনুসারে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করা রাষ্ট্রের একটা বড় কাজ। আর এই নীতি নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রধানতঃ তিনটী বিষয় স্থির করা দরকার:—(১) অধিকার (Rights) ও দায়িত্ব (Duties) স্থির করিতে হইবে; (২) অধিকার (Rights) যদি রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রের বাহিরের লোকেরা না মানে, স্বীয় দায়িত্ব বহন করিতে যদি তাহারা আপত্তি করে বা বাধা জন্মায়, তবে প্রয়োজন মত শাস্তি নির্দ্দেশ করিতে হইবে ও (৩) কোন্ কার্য্য বিধি (Procedure) অনুসরণ করিয়া অধিকার মনোনীত হইবে, বা দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করাইতে হইবে বা প্রয়োজন হইলে শাস্তি দিতে হইবে সেই কার্য্যবিধিও Procedure) নির্দ্দেশ করিতে হইবে যেন অযথা অত্যাচার বা উৎপীড়ন না হয়। আর এই যে অধিকার (Rights) বা দায়িত্ব (Duties) নির্দ্দেশের কথা বলিলাম, তাহা যে কি বিশাল ও জটিল ব্যাপার তাহা দুই চারি কথায় এখানে বলা সম্ভব নয়। পূর্ব্বেও তাহার আভাস দিয়াছি, আরও কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলেই হইবে—যথা, এক রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার অধিকার ও তাহার জনগণের প্রত্যেকের প্রাণ সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার ও সেই সম্পর্কে এই সকল অধিকারের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অপর দেশের ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রত্যেকের আত্মরক্ষার অধিকার ও এই সকল পররাষ্ট্রের জনগণের প্রাণ সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার (Foreign Policy); আমাদের রাষ্ট্রের জনগণের প্রত্যেকের প্রাণরক্ষার ও দৈহিক স্বাধীনতার অধিকার ও তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমাদের রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার অধিকার; আমাদের রাষ্ট্রের ব্যয় চালাইবার জন্য তাহার জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর সামর্থ্যানুযায়ী অর্থ সাহায্য করিবার দায়িত্ব; অসহায় শিশু সন্তানের প্রাণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার সেই সম্পর্কে রাষ্ট্রের ও পিতামাতার দায়িত্ব; আমাদের রাষ্ট্রের বালক বালিকাগণের প্রত্যেকের দেহ, মনোবৃত্তি ও

চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য যথাযোগ্য শিক্ষা পাইবার অধিকার ও সেই সম্পর্কে রাষ্ট্রেরও পিতামাতার দায়িত্ব; সংক্রামক রোগ বিস্তার নিবারণ করিতে রাষ্ট্রের ও জনগণের দায়িত্ব; দরিদ্র প্রতিপত্তিহীন শ্রমজীবিগণের শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিপত্তিশালী ও ধনী শ্রম-নিয়োক্তাগণের ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব; শ্রমজীবিগণের সমবেত ও দলবদ্ধ হইয়া একযোগে স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্য নিরুপদ্রব প্রয়াসের অধিকার; ধনী শ্রমনিয়োক্তাগণের কারখনা ও তথাকার যন্ত্রাদি বিনাশ নিবারণ করিবার অধিকার; সচ্চরিত্র শিক্ষিত কর্ম্মক্ষম পুরুষ ও স্ত্রীর সদুপায়ে শ্রমদ্বারা জীবনরক্ষার উপযোগী কর্ম্ম পাইবার অধিকার ও সেই সম্পর্কে রাষ্ট্রের ও জনসাধারণের দায়িত্ব; সমাজ যাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিতেছে তাহাদের মানবোচিত সম্মানের ও সাম্যের অধিকার; শান্তিরক্ষক পুলিস ও সৈন্যের অধিকার; জনসাধারণের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন বাক্যের অধিকার; স্বদেশী বা বিদেশী জাহাজে আনীত পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক আদায় করিবার অধিকার; প্রজা ও ভূম্যধিকারীর অধিকার; ক্রেতা ও বিক্রেতার অধিকার; উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের অধিকার; ইত্যাদি। কেহ যেন মনে না করেন যে, এই ছোট তালিকাটী শুধু কল্পনার সৃষ্টি। কেহ হয় ত বলিবেন, অধমর্ণের আবার অধিকার কি? টাকা যে ধারে তাহারও যে অধিকার থাকিতে পার, তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। আমাদের এই আর্য্যাবর্ত্তে এমন সময় ছিল, যখন ঋণী ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে বিচারপতির আদেশে ঋণদাতার সেবক ভৃত্য হইয়া বৎসরের পর বৎসর নফরি (Serfdom) করিতে বাধ্য হইত। আজ তাহা আইন-বিরুদ্ধ। আজ ঋণদাতা ছয় মাসের বেশী কাল ঋণীকে কারাবদ্ধ করিতে পারে না, আর এই ছয় মাসের মধ্যেও ঋণী ইচ্ছা করিলে দেউলিয়া আইনের বিধান মত অসমর্থ ঋণীর অধিকারের বলে কারাবাস ও ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব হইবে মুক্তিলাভ করিয়া সংসারে পুনরায় স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের চেষ্টা করিতে পারে। ইতিহাসে এমনও দেখা গিয়াছে যে ঋণগ্রস্থ লোকদিগের এই অধিকার ছিল না বলিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্ভাবনা হইয়াছিল।

রাষ্ট্রের এই যে তিন শ্রেণীর কাজের কথা বলিলাম—শাসন নীতি নির্দ্দেশ, নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কাজ, ও সেই কার্য্য পরিদর্শন—এই তিন শ্রেণীর কাজ করিয়া মানুষের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকশিত করিতে হয়। কোনও মনোবৃত্তি সম্পর্কিত জ্ঞানও চিন্তার স্বাধীনতা মাত্র থাকিলে সেই বৃত্তি বিকাশের সুযোগ হয় না। সেই চিন্তা অনুযায়ী কাজ করিবার উৎসাহ ও উদ্যমের সুযোগও চাই। তবে সে বৃত্তি বিকাশের অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হয়। এখন কেহ কি বলিতে চান যে আমাদের দেশে এই তিন শ্রেণীর কাজ করিয়া মানুষের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের কোনও সুযোগই কাহারও এত দিন ছিল না? সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর কাজ অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট শাসন নীতি কার্য্যে পরিণত করা—ইহা প্রায় ষোল আনা আমাদের স্বদেশীয় লোকেরাই করিয়াছে। সকল দেশেই এই শ্রেণীর কাজের পারিশ্রমিক দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজের পারিশ্রমিক অপেক্ষা কম। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজে যত লোক দরকার হয়, এই শ্রেণীর কাজে তদপেক্ষা অনেক বেশী লোক দরকার হয়। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট শাসন-নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সব লোক যদি সুদূর বিদেশ হইতে আনিতে হইত, তবে এ দরিদ্রদেশ-শাসন জন্য অসম্ভব ব্যয় হইত শুধু শাসনযন্ত্রের

ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াই রাষ্ট্র দেউলিয়া হইয়া পড়িত। এই কারণেও বিদেশ হইতে অল্প ব্যয়ে এত লোক আনা সম্ভব হয় নাই বলিয়া ও নির্দ্দিষ্ট শাসন নীতি কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী প্রচুর লোক অল্প পারিশ্রমিকে এদেশেই পাওয়া গিয়াছে বলিয়া এই সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর কাজ প্রায় ষোল আনা আমাদের স্বদেশীয়দের হাতে রহিয়াছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ, পরিদর্শন, ক্রমে ক্রমে আমাদের স্বদেশীয়দের হাতে আসিতেছে। ইতিমধ্যেই অনেকস্থলেই পরিদর্শন কাজ আমাদের স্বদেশীয়দের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। আমাদের স্বদেশীয় লোকের এবিষয়ে কৃতিত্ব সকলেই স্বীকার করিতেছে। আর এই প্রথম শ্রেণীর কাজ সম্বন্ধে যাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, শাসন-নীতি যাহারা কিছুই বোঝে না, তাহাদের পক্ষে শাসন-নীতি অনুযায়ী কাজের পরিদর্শনে কৃতিত্ব দেখান অসম্ভব। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজের মধ্যে ব্যবধান যদিও কম, তবুও প্রথম শ্রেণীর কাজ, শাসন-নীতি নির্দ্দেশ, এত কাল আমাদের স্বদেশীয় লোকের হাতে ছিল না। বলিতে গেলে, সর্ব্ব প্রথম লর্ড মর্লী জন কয়েক ভারতবাসীকে এই কাজ করিবার কিছুটা সুযোগ দিয়াছেন। মন্ত্রীসভায় (Executive Council) ভারতবাসী স্থান পাইবার পূর্ব্বেও ব্যবস্থাপক সভায় (Legislative Council) ভারতবাসী স্থান পাইয়াছিল ও শাসন-নীতি নির্দ্দেশ ব্যাপারে আমাদের স্বদেশীয় ব্যবস্থাপকগণ কতকগুলি বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেন। কিন্তু শাসন-কর্ত্তা (Governor) ও তাঁহার মন্ত্রীসভা (Executive Council) সে মতামত মানিতে বাধ্য ছিলেন না। তখন শাসন-নীতি ভারতবাসী ব্যবস্থাপকগণের মতানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হওয়া বা না হওয়া শাসন-কর্ত্তা ও তাঁহার মন্ত্রীসভার উপর নির্ভর করিত। ব্যবস্থাপকগণের মত অবশ্যপালনীয় ছিল না। শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার মন্ত্রীসভার উপর ব্যবস্থাপকগণ স্বীয় মতামত প্রকাশ দ্বারা প্রভাব বিস্তার করিতে প্রয়াস পাইতেন মাত্র। শাসননীতি নির্দ্দেশ ব্যাপারটী প্রকৃতপক্ষে ব্যবস্থাপক সভার হাতে ছিল না। তাহা ছিল, বস্তুতঃ শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার মন্ত্রীসভার হাতে। ব্যবস্থাপকসভা শাসন-নীতি নির্দ্দেশের পূর্ব্বে বা পরে তাহার সমালোচনা করিতেও এই সমালোচনা দ্বারা যতটা সম্ভব শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার মন্ত্রীসভাকে প্রভাবিত করিতে পারিতেন মাত্র। আমাদের স্বদেশীয়গণ ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Council) সভ্য হইয়া শাসননীতি নির্দ্দেশ করিতেন না। যে দুই চারি জন স্বদেশীয় লোক ভারতীয় মন্ত্রীসভার বা প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সভ্য হইতেন, শুধু তাঁহারা অপর মন্ত্রী ও শাসনকর্ত্তার সহিত একযোগে ও ব্যবস্থাপকগণের সমালোচনার সাহায্যে, শাসন-নীতি নির্দ্দেশ করিতেন। লর্ড মর্লী প্রবর্ত্তিত শাসন পদ্ধতিতে আমাদের দেশের লোকের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের তেমন সুযোগ হইয়াছিল এরূপ বলা যায় না। এই জন্য আজ প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় গোলদিঘির পাড়ে এক প্রকাশ্য সভায় প্রসঙ্গক্রমে আমি বলিয়াছিলাম যে, সেই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে বা অপর কোনও যোগ্য ভারতবাসীকে ভারতের প্রধান শাসনকর্ত্তা (Governor General). নিযুক্ত করা হইলে ও আমাকে ও আমার পরিচিত স্বদেশীয় বিভিন্ন প্রদেশের বন্ধু বান্ধবকে শাসনকর্ত্তা ও মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইলেই ভারতে স্বয়ং-শাসন (Self-Govern-) ment) প্রতিষ্ঠিত করা হইল এরূপ মনে করিব না। তাহাতে ভারতের জনগণের

বৃত্তি বিকাশের উপযোগী আলোক বাতাস ও আকাশ পাওয়া হইবে না। শুধু যে আমার মত জন কয়েক লোকের মনে রাষ্ট্রীয় বৃত্তি আছে, অপর কোটী কোটী স্বদেশবাসীগণের মনে তাহা জাগে নাই বা জাগিবে না, ইহা যদি বিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে স্বদেশবাসী শাসনকর্ত্তা হইতেছে, স্বদেশবাসী মন্ত্রী হইতেছে, স্বদেশবাসী ইংলণ্ডে ভারত সচিবের মন্ত্রীসভার সদস্য হইতেছে, কালে স্বদেশবাসী প্রধান শাসনকর্ত্তা হইবে বা ভারতসচিব হইবে ইহা মনে রাখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারিতাম। যেমন ভারতের প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার কথা বলিবার সময় বলিয়াছি যে, সে অতুল সাহিত্য ও শিল্প সম্পদের সে বিশ্ব-পূজ্য সভ্যতার রচনায় বা ভোগে আর্য্য ও অনার্য্য জনসাধারণের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল, যেমন ভারতের মুসলমান সভ্যতার কথা বলিবার সময় বলিয়াছি যে সে সভ্যতা সকল সমবিশ্বাসী মুসলমানের সমান অধিকার প্রচার করিলেও, সম্ভোগের সময় নিম্নশ্রেণীর অসংখ্য মুসলমান ও প্রায় সকল শ্রেণীর অসংখ্য হিন্দু জনসাধারণ বঞ্চিত হইয়াছিল, তেমনই কি সুদূর ভবিষ্যতে যখন আধুনিক ভারতের ইতিহাস লেখা হইবে তখন ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা স্বার্থান্ধ হইয়া ভারত-জননীর ললাটের সেই প্রাচীন কলঙ্করেখা চিরমুদ্রিত রাখিবার জন্যই সারাজীবন প্রয়াস করিয়াছি? নিজেদের জনকয়েকের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের আয়োজনে সন্তুষ্ট হইয়া, কোটী কোটী স্বদেশীয়দিগের মানবোচিত অধিকারের কথা বিস্মৃত হইয়া, সুখে ধন যশ ও সম্মান ভোগ করিয়া দিন কাটাইয়াছি?

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

পোলাও—নবম উচ্ছ্বাস।

এই বুঝি শেষ হাঁড়ি, এই বুঝি শেষ,
বার্দ্ধক্য আময় জরা দেহ শক্তিহীন;
গৃহে অগ্নি জ্বলিয়াছে রুগ্না গৃহিণীর
মরণের আবাহন হা হুতাশ ধ্বনি
ছিনায়ে লয়েছে মোর কবিতার স্পৃহা।
অনুজেরা নহে কেহ লক্ষণ অনুজ,
পিতৃ তিরোধান সহ, গুরুভক্তি টুকু
জাহ্নবীরে এসেছেন করি উহা দান।
কি কাঠিন্য হেরি এবে মুখে তাহাদের,
দূরে থাকি তবু শুনি ভীম আস্ফালন,
বৃদ্ধ আমি, গৃহ ত্যাগী, সৈকত নিবাসী,
পিতৃধন ক্রান্তি মাত্র করিনি গ্রহণ;
তবু রোষকষায়িত অব্যক্ত রাগেতে
শুনি সদা ঘূর্ণ্যমান নয়ন তাদের।

আজি বিশ্ব চাহিতেছে সম বেদনায়
সুমার্জ্জিত টলষ্টয়—উদাত্ত গান্ধীজী;
আত্মজয়ী, বলিছেন, দেব ধ্বনি করি
দ্বেষ হিংসা পুড়াইয়ে, ফেলিয়ে অনলে,
মানুষ মানুষ সাজি হও রে ভারতে
কি লিখিব? লিখিতেছি আপনার কথা,
পুরোভাগে লিখিবার শত উপাদান
এ সকল পরিহরি স্বার্থ নিয়ে বসে?
আজ ভারতের মাঝে উঠেছে উচ্ছ্বাস
এনেছেন নবরাজ মহা জাগরণ
বৈদেশিক হস্তে ন্যস্ত অপূপের ভার
ক্ষুধাতো মেটেনা তাহে, ক্ষুধার জ্বালায়
বুভুক্ষু তস্কর নামে আজি নির্য্যাতিত।
দুনিয়ার চোর করে সাধুরে তস্কর,

সাধু যদি সাধু থাকে রাজার বিধান
অসাধু করিয়ে তারে দাগা দিয়ে দেয়।
পদে ভর দিয়া, দাঁড়াইতে চাও যদি
(দেখিবে রাজ্যের চক্ষু হইয়াছে রাঙা
Gypsy কি ভাল নয় তোমাদের চেয়ে ?
আরবের মরুচারী, দস্যু বেদুইন
তারও মুখে বার হয় পুলকের হাসি।
আমরা কে ? বনীয়াদী গোলাম দুর্জ্জন
ভগীরথ এনেছিল নির্ম্মল জাহ্নবী
পরশিয়া যার নীর নর নারী যত
মনের কলুষ রাশি করিতেন দূর।
এনেছে শিক্ষিত রাজ বিশ্বের আদর্শ
ক্ষমতায় অদ্বিতীয় কৌটাল্যে দুর্জ্জেয়
শত শত মস্ত-লিথি * ভারত মাঝারে
পান করি পাশ্চাত্যের এই সোমরস
সহস্র সহস্র নর বিনা সাধনায়
পশুত্বের নিম্নস্তরে করিছে গমন
ভারতের রাজা কেবা ? এ রাজ্য কাহার
এ রাজ্য এ দেব রাজ্য কাহার জানিনা
এই মাত্র বুঝি ইহা ইংরাজের করে
প্রবঞ্চক একদিন বিশ্বাস গরিমা
নষ্ট করি দিয়াছিল প্রলুব্ধ হইয়া।
ওই সেই মিরজাফর কলঙ্কী দুষ্মন
বদবখৎ দুরাচার নরকের কীট
আবার এসেছে বুঝি সেই মিরজাফর
ম্যাজিক মানেনা এ যে Lagic এতে দড়
স্বগত সুন্দরী কহে দাঁড়া'য়ে কাননে
Ingratitude thou marble hearted fiend
বাঙ্গালার চিত্ত; চিত্ত ফেলিয়া নিশ্বাস
বলে শুনি আকাশের মুখ পানে চেয়ে
Blow blow thou winter wind
Thou art not so unkind

* Lethe নরকের নদী।

As man's ingratitude
বৈপিনীক বীণা ওহো স্বদেশীর দিনে
শুনে ভেবেছিনু মনে ব্যাধের এ বীণা
ও কাকলী ঢালে নাই প্রেমের লহরী
ও কাকলী টানে নাই চিত্ত রাধিকার
সে দিনের Euripides দামিনী উল্লাস
নিখিল ভারত গর্ব্ব রবি উদ্দীপনে
জেগেছিল বঙ্গভূমি; তোমরা দোয়ার
চর্ব্বিত চর্ব্বণ করি লুঠিতে সুখ্যাতি—
াক আছে তোমাতে বল সারাল শাঁসাল
কত লেখা লিখে ছিলে এখনো লিখিছ
পেচো ধরা ভ্রূণ যথা আতুর কুটিরে
জনমিয়া মরে যায়, জননীর বুকে,
তোমার Logic সিক্ত হিজি বিজি গাথা
বাহির হইবা মাত্র মরণেরে ভজে।
ভাষার মূর্চ্ছনা শুধু কানের ভিতর
ক্ষণিক অমিয় ধারা করে বরিষণ
ভাব হীন বলে ভাষা প্রাণের ভিতর
আবেগ বিমর্দ্দজাত প্রবল উচ্ছ্বাস
কখনোতো পারিল না তুলিতে পুলক
তুহিন ধরন ভাব পশ্চিম দেশের
বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে পরশে তোমার
ছান্দোগ্য সঞ্জাতভাব কোন্ দেবতার
হৃদয়-গোমুখী হ'তে হয়ে নিষ্কোষিত
নিখিল ভারতবর্ষ করিছে নবীন
কি বৈশদ্যে—পরিপূর্ণ ভাবের লহরী
নাহি কোন রূপসীর রূপের বিস্তার
নাহি কোন সুন্দরীর চোকের ঠমক
নাহি পদ্মিনীর কোন গন্ধ প্রলোভন
আছে করুণার হোথা লাবণ্য মাধুরী
সহানুভূতির আছে ছন্দ ঝরা গতি
আছে চিন্ময়ের তরে প্রাণের আবেগ।
আর আছে স্বাস্থ্যক্ষুণ্ণা অবসন্না ক্ষীণা
দেশমাতৃকার তরে আগ্রহ প্রকাশ।

কি কঠোর অক্রমন্ন পশ্চিমের নীতি
শাসনের blister রসনা উপর
ঢেলে দিয়ে মূক করি রাখিবে তোমায়।
বাসের অযোগ্য ভূমি হতেছে জগত
তুস্মনে ন্যায়ের বক্ষে করুক আঘাত
পিশুন ন্যায়ের চক্ষে দিক ধূলা ঢালি
ন্যায়ের আসন ইথে টলিবেনা কভু।
christ এর মন্ত্রশিষ্য সমগ্র পশ্চিম
ন্যায়ের কি বিকলাঙ্গ করিছেনা শুনি?
A fool at forty is a fool indeed
হোক তবু তোমা যদি পাইতাম সখা
ছাত্র ভাবে নাহি হোক মিত্র ভাবে ধর
Violence [illegible]হিত ferule হাতে
শিখাতেম, নির্ব্বাচিত পন্থা তব সখা
মহাজন পরিত্যক্ত বিনাশ আশ্রয়।
দাসত্বের চাপে আজি কণ্ঠাগত প্রাণ
প্রতিপদে অপমান, প্রতি অপমানে
আত্ম-মর্য্যাদার বুকে উঠিতেছে কাটি
মানুষের মানবোধ ছিল না কি সখা—
Logic খচিত তব হৃদয়ের মাঝে?
জান না কি হে কোবিদ সম্মান-লোলুপ
সে মর্য্যাদা চিত্ত হোতে পলায়েছে দূরে
কি হয়েছে বল দেখি হয়েছি মিথ্যুক,
হয়েছি বিলাস প্রিয় হইয়াছি ভীরু
শিখিয়াছি আত্মগান করিতে কীর্ত্তন
শিখিয়াছি পরমুখে করিতে শ্রবণ
আপনার যশোগাথা পুরস্কার দিয়া।
ক্ষমতার মঞ্চে যদি অপকর্ম্মী বসে
শিখিয়াছি তারও পদ করিতে পূজন
দুর্ব্বল যে প্রাণে তার জাগে অহনিশ
মরণের ঘূর্ণ্যমান লোহিত লোচন
জীবনের মধ্যস্থলে বসায়ে মরণে
প্রাণের ব্যর্থতা দিয়ে করে তারে প্রীত।
যে দিন জীবন লয়ে আসে আগন্তুক
হর্ষে দীপ্ত চারুকান্তি বিশ্বের মাঝারে
মরণ প্রহরী রূপে দাঁড়ায় শিয়রে।
মরণ আছিল পূর্ব্বে জীবন সোদর
জীবন আছিল পূর্ব্বে মরণের সখা
মরণের তপস্যায় জীবন—জীবন।
জীবনে জীবন নাই আছে মৃত্যুভয়
আছে মাত্র অত্যাচার সহন ক্ষমতা
প্রতি বিধানের বল কে লয়েছে হরে
কে শিখাল ভিক্ষা বৃত্তি করিতে গ্রহণ
যে শিক্ষায় চরিত্রের হয় প্রতিষ্ঠান
সে শিক্ষা কি আর আছে জগত মাঝারে?
দুর্ব্বল যে চিত্তে তার ক্ষমার উদ্ভব
কখনও কি হইয়াছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে?
পাশ্চাত্য শিক্ষায় সবে হতেছি দুর্ব্বল
ধর্ম্ম হতে কর্ম্ম হতে আসিতেছি সরে—
চিত্ত হতে ফেলিয়াছি উৎপাটন করি
সুপবিত্র প্রাচ্যভাব আর্য্য ধর্ম্ম-নীতি।
ভুলিয়াছি বেদস্তুতি বেদের সঙ্গীত
শিখিয়াছি রাজা হতে ক্ষীণ ভেদনীতি
অব্যয়ে করিতে ব্যয় অবিশ্বাস দিয়া।
নররূপে নারী মূর্ত্তি ক্লৈব্যের বিকাশ।
কোন্ বিশেষণে তোমা করিব ভূষিত
ওই যে Englishman ভারত অরাতি
Logic মণ্ডিত তব ফেনিল লেখায়
বুঝিবা thunderer নাম করিবে ধারণ।
বর্ত্তমানে তুমি বুঝি Edsterling হবে
লুফে তাই লইয়াছ Hare কেশরী
গরজন কর সাধু কাঁপায়ে ভারত
তব গরিমায় আজি গর্ব্বিত আমরা।
ধর্ম্মপুষ্ট ন্যায় এই নিখিল সংসারে
আপনার দিব্য প্রভা করিবে বিস্তার
ওই দেখ চেয়ে দেখ বেথেলহাম আজ
পাইয়াছে ক্রুশবদ্ধ মেষ পালকেরে—
আজ মক্কা কার ধ্বনি করিয়া শ্রবণ

পুলকেতে ধরিয়াছে বিনয়ের হার—
শুচিমেধ্য প্রাণ হতে গোমুখী তরঙ্গ
তীব্রতা বুকেতে করি ছুটিছে ভারতে
পবিত্রতা নির্ঝরিণী পুলকে মাতিয়া
বিগলিত বৃন্দাবন হর্ষ বুকে ধরি—
চিত্তে চিত্তে ছুটিতেছে উল্লাস বহিয়া
সদাকুণ্ঠ ছিল প্রাণ জড়তা প্রভাব
আজ তারে বিকাশের পথে লয়ে যেতে
কে যেন বেণুয়া রবে করিছে সঙ্কেত
মাথা লয়ে মাথা খেলা নহেক স্বরাজ
দম্ভভরে প্রভুত্বের দাবানল জ্বালি
প্রাণের বৈচিত্র হরা নহেক স্বরাজ
মানুষের অধিকার মানুষকে দান
ন্যায়ের পবিত্র হর্ষ উপভোগ করি
যে পুলক পায় নর তাহাই স্বরাজ
ক্ষমতার তাজ পরা কুক্কুট হৃদয়—
আইনের প্রহরণ করিয়া ধারণ
দুর্ব্বলের নির্য্যাতন পেষণ যন্ত্রণা
দিয়ে যারা বড় হয় তারা বড় নয়
তারা বড় নয়—এই কথা বলিবার
অবাধ শকতি, এই শকতির নাম
নৈসর্গিক আধ্যাত্মিক নির্ম্মল স্বরাজ।

বুরোক্রেসি হৃদয়েতে নাহিক স্বরাজ
পশ্চিমের রাজনীতি অভিষিক্ত নহে
স্বরাজের প্রাণভরা শান্তির সলিলে।
ভীষ্মের ত্যাগের মাঝে আছিল স্বরাজ
ধর্ম্মপুত্র ধৈর্য্য মাঝে আছিল স্বরাজ
মরন্দ কপোল Plato হৃদয় ভরিয়া
স্বরাজের চলস্রোত হ'তো প্রবাহিত।
জড়বাদী পশ্চিমের স্বরাজের সুধা
পান করাবার তরে রবীন্দ্র বাউর।
চিদানন্দ প্রেমস্রোতে ভাসাতে পশ্চিমে
বিশ্বভারতীর গৃহ হতেছে নির্ম্মিত।

আমার জনম ভূমি প্রিয় শান্তিপুর
যারে বঙ্গ নরনারী মানে তীর্থ বলি
যেথায় অদ্বৈত মম ঊর্দ্ধতন পিতা
জনমিয়া ভক্তিরসে চিরদিন তরে
দিব্য স্থানে পরিণত গিয়াছেন করি
সেই শান্তিপুর মম গৌরবের খনি
শ্রীঅদ্বৈত বক্ষভেদি ভক্তি তরঙ্গিনী
এনেছিল স্বর্ণপদ্ম উজানে বহিয়া
সেই পদ্ম বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্য প্রভু।
যার প্রেমে ভেসেছিল নহে শুধু সাধু
অসাধুও সাধু হয়ে অকৈতব সুখ
উপভোগি বৈকুণ্ঠেতে গিয়াছেন চলি
কোটি কোটি প্রাণমাঝে [illegible]দ্বৈত প্রভাব
প্রবেশিয়া, ব্যথা করিয়া সঞ্চিত
আনিয়াছে অভিশপ্ত ভারত মাঝারে
শুদ্ধ প্রাণ মহামতি দেবতা গান্ধীরে।
প্রকাম্যের প্রতিকৃতি গান্ধী মহারাজ
ভালবাসা দিয়া বিশ্ব করিবেন স্নাত।
চেয়ে দেখ চেয়ে দেখ আকাশের পানে
অধ্যাত্ম শকতি আজ পশু বিক্রমেরে
করিতেছে পরিম্লান মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে।
প্রতিহিংসা দানবের অব্যর্থ আয়ুধ
ভালবাসা দেবতার অমৃত নিছনি—
জেতার হৃদয় হ'তে তীব্র দাবানল
ভালবাসা ঢেলে দিয়ে গুর্জ্জর নির্জ্জর
করিবেন শান্তিরাজ্য জগতে স্থাপিত।
জড়বাদী জড়তার ভাঙ্গি কারাগার
চিন্ময়ের প্রেমে প্রাণ করিবে শীতল।
অঞ্জন তোমার চোখে জ্ঞানাঞ্জন আজ
প্রদান করেছে ভাই চাহ আঁখি মেলি
ইচ্ছা করে একবার বিপিন! তোমার
প্রহ্লাদ জ্ঞানের ভাই বুকে টেনে লই
তুমি যে জ্ঞানের পিতা প্রহ্লাদ জনক।
জ্ঞানাঞ্জনে চেয়ে দেখ Gregory বিকাশ

Basil বালকচিত্ত চিতচোরা হাসি
জ্ঞানাঞ্জন কি সরল সখাগত প্রাণ
সখিত্বের মাধুরীতে স্নাত তার চিত
উৎপীড়িত বন্ধুতরে বন্ধুর পরাণ
কেঁদেছিল তাই বাপ'কষ্টের সাগরে
ঝম্প দিয়ে নরকুলে ধন্য হ'য়ে গেল
মানুষতা পাশবতা দুইটী সুন্দরী
বিজন হৃদয় মধ্যে দোঁহে করে বাস
পাশবতা শক্তিময়ী কৌশলে সখীরে
কুরস করায়ে পান করে সংজ্ঞাহীন
পশুত্বের সে কৌশল আজিত্রিয়মান
বিধাতার দান ওই মধুর প্রেরণ
পশুতায় নির্ব্বাসিত করেছেন ধীরে।
ওই দেখ মতিলাল নির্ম্মল শশাঙ্ক
জ্ঞানের ধবল জ্যোতি বিকশিত প্রাণ।

ওই দেখ মোজাহেদ তেজস্বী আজাদ
আত্মোৎসর্গ করেছেন ধর্ম্মের লাগিয়া।
ওই লিলীরাণী ওই বান্ধব Stokes
বরিশাল ধন্য করা শরৎকুমার
আমার গৌরব বহ্নি সরল নৃপেন
ওই ভগ্নী সরোজিনী কল্যাণী সরলা
মনস্বিনী তেজস্বিনী—সাবিত্রী সাবিত্রী
জ্ঞান রসাপ্লুত ওই প্রতিষ্ঠ জিতেন
ন্যায়ের চরণে যিনি সঁপেছেন প্রাণ
যার চক্ষুদীপ্তি স্পর্শে অযুক্তি পলায়
তার ছবি আজি সখা কর বিলোকন
শিশিরের প্রতিচ্ছবি বঙ্গমতিলাল
গলিত মৌক্তিক ধারা যার লেখা হ'তে
পশু শক্তি বুকে অগ্নি করে উৎপাদন
শান্তশীল সে লেখায় আস্বাদে অমৃত
গোলাপ সুবাস ওই মধুর সুভাস
স্মরণে যাহার কথা নেচে উঠে প্রাণ
শতদল শ্যামল যার পরিমলে
সমগ্র ভারত-ভূমি আজ বিমোহিত
ওই দেখ চেয়ে দেখ বাসন্তী হোথায়
বিলাসের ভস্ম রাশি মাখিয়া শরীরে
জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি ধরি দ্বারে দ্বারে দেবী
নবীন আশ্বাস বাণী করেছেন দান।
দম্ভ আজি দূরে ফেলে প্রমাতা সুন্দর
চারিদিকে চেয়ে দেখ দেবতার ছবি
রাষ্ট্র শক্তি যত কেন হউক বিকট
অদম্য অপরাজেয় দুর্দ্ধর্ষ ভয়াল
সে শক্তি ও হয় লীন তাঁহারি ইক্ষণে
যাঁহার বৈদগ্ধ্যে বিশ্ব এত মনোরম।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

শিক্ষায় প্রতারণা।

পাঠশালায় যখন পড়িতাম, তখন গুরুমহাশয়কে ভয় এবং ভক্তি দুইই করিতাম, অত্যন্ত গুরুতররূপে। একমাত্র গুরুভক্তির প্রভাবে, কত অসাধ্য সাধনই না হইতে পারে, শিশুকালেই অনেক গল্পে, পাঠশালায় প্রবেশ করিবার অনেক পূর্ব্বেই তাহা জানিয়া ফেলিয়াছিলাম। সুতরাং প্রথম হইতেই অতিরিক্ত মাত্রায় গুরুভক্তি করিতে লাগিলাম। এ যে ঘোর কলিযুগ, তাহা কিন্তু তখনও বুঝিতে পারি নাই। সত্যযুগের মত এ যুগেও গুরুভক্তের নিকট অসাধ্য কিছুই নাই, এই ছিল তখন দৃঢ় বিশ্বাস। আর অতি শৈশবেই শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম "গুরোর্দোষাবরণং ছত্রম্" অর্থাৎ যে গুরুর দোষকে আবরণ বা লুকাইয়া রাখিতে পারে, সেই প্রকৃত ছাত্র। কাজে কাজেই প্রকৃত ছাত্র হইবার লোভে, বিনা বিচারে বাবাকে মাকে লুকাইয়া ও গুরুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তামাক, গাছের শসাটা, কাঁচ কলাটা ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা পাইলেই, গুরুমহাশয়ের শ্রীচরণে আনিয়া উপস্থিত করিতাম। পাঠকপাঠিকাগণের নিকট ইহা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহার প্রত্যেকটি কথা সত্য। মাঝে মাঝে বাবামায়ের সতর্কদৃষ্টি এড়াইতে না পারিয়া ধরা পড়িয়াও যাইতাম; কিন্তু প্রাণান্তেও গুরুমহাশয়ের দোষটাকে সযত্নে আবরণ করিতে পরাঙ্মুখ হইতাম না। গুরুর একনিষ্ঠভক্ত আমরা চোর, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি বলিয়া গণিত হইলেও গুরুভক্তি হইতে কখনও একচুল বিচ্যুত হইতাম না।

গুরুভক্তির গুরুত্ব যতই বাড়িতে লাগিল, ততই প্রথমে বাবার পকেটের পয়সা, পরে মা'র আঁচলের চাবী এবং ক্রমশঃ পাড়া-পশীর গাছের আম, মাচার কুমড়া বা শসা এবং ক্ষেতের আলু পটলগুলি একটার পর আর একটা করিয়া কি যাদুমন্ত্র বলে যেন কোথায় অদৃশ্য হইতে লাগিল। আমাদের সময় সময় মনে হইত, হয়ত বা আমাদের এই গুরুতর তপস্যার প্রভাবে ইহারা সশরীরে সজ্ঞানে স্বর্গেই বা গমন করিয়া থাকিবে। যাক্, পাঠশালায় গুরুমহাশয় বিদ্যাদান অপেক্ষা বেত্রদানই করিতেন বেশী এবং আমরাও বেতন অপেক্ষা ভক্তি প্রদর্শন করিতাম আরও অনেক বেশী। উভয়ত্রই বেশ প্রাঞ্জল প্রতারণা।

তারপর ইংরাজী বিদ্যালয়ে ঢুকিলাম। গুরুভক্তির প্রবল স্রোতে একটুকু মন্দা পড়িল বটে, আর পাড়াপর্শীর ক্ষেত্রের বা মাচার জিনিষগুলি ভাসিয়া যাইত না বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে বাবার পকেটের পয়সা যেন কেমন করিয়া কোথায় চলিয়া যাইত। আমরা চাঁদা করিয়া ছুটির পূর্ব্বে কোনও শিক্ষক মহাশয়কে ছাতা, কেহকে বা জুতা আবার অপর কেহকে বা দোয়াতদান বা fountainpen অর্ঘ্যস্বরূপ দিতাম। তবে একথা ধ্রুব সত্য, যে পাঠশালায় গুরুমহাশয়কে যেমন অবিচারে পরমভক্তির সহিতই দিতাম, এক্ষেত্রে ঠিক ততটা হইয়া উঠিত না। শাস্তির ভয়ে, পরীক্ষায় বেশী নম্বর পাইবার লোভে, বা প্রথম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবার আশায় মাঝে মাঝে কোন কোন শিক্ষক মহাশয়গণকে এইরূপে পূজা না করিলে তাঁহারা প্রসন্ন থাকিতেন না। আমার কথাগুলি যে নিখুঁত সত্য,

তার প্রমাণ স্বরূপ সম্প্রতি কলিকাতা সহরের সর্ব্বপ্রধান বিদ্যালয়দ্বয়ে যে, অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গ্রামের বিদ্যালয়ে যখন পড়িতাম, তখন মনে করিতাম, শুধু পাড়া-গেঁয়ে অনুদারমনা শিক্ষকগণই এরূপ করিয়া থাকেন। তারপর, ওহরি! ক্রমে অবস্থার বিপর্য্যয়ে দুই তিনটি সহরের বিদ্যালয়ে, এমন কি নগরের দুই একটা বিদ্যালয়েও পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু, হায়, সর্ব্বত্রই, কখনও বেশী নম্বর পাইবার আকাঙ্ক্ষায়, কখনও বা প্রথম দ্বিতীয় হইবার আশায় কিম্বা শুধু প্রভু (master) দের সন্তুষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে তাঁহাদিগকে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হইত। প্রতিদান স্বরূপ তাঁহারা ক্লাসে আমাদিগের একটুকু আব্দার সহ্য করিতেন; যে অপরাধে অপরের বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইত, সেই অপরাধেই আবার আমরা তাঁহাদের ন্যায্য বিচারে বেকসুর খালাস পাইতাম। কতদিন দেখিয়াছি, আমার অপরাধে নির্দ্দোষ রামা ভুতো মার খাইয়া মরিয়াছে। অবশ্য মাঝে মাঝে যে দুই একজন উন্নতমনা, উদারপ্রাণ, স্নেহপরায়ণ শিক্ষকও লাভ করি নাই, এমনও নয়। মনে হয়, এদের পুণ্যেই আজও শিক্ষক নামটা একেবারে জঘন্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

এবার শিক্ষক মহাশয়দের আর একটা মহৎ গুণের কথা বলিব। তাঁহারা অনেকেই একমুখে তিন চার রকমের কথা বলিতে পারেন। আমাকে হয়ত বলিলেন—'তোর কোন জন্মেও কিছু হইবে না', আবার আমার অভিভাবক মহাশয়কে বলিলেন, "না আপনার ছেলে আজ কাল একটু একটু ক'রে পড়াশুনা করছে, ছেলেত বোকা নয়, একটুকু খেলার দিকে বেশী ঝোঁক্, এই যা দোষ; তা দুদিন পরে শুধরে যাবে।" আবার প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে বলিলেন—"এ ছেলেটার জ্বালায় ক্লাস পড়ান যায় না, অবিশ্রান্ত সকলকে জ্বালায়।" অথবা, "কি করে আর লেখাপড়া হবে, বলুন; আজ আপনাদের ম্যাচ্, কাল আপনাদের সভাসমিতি, আবার পরশু আপনাদের বক্তৃতা, ছেলেরা পড়াশুনা করবে কখন?" যে শিক্ষক মহাশয় আমাকে দিনে দশবার বলেন যে আমার কিছু লেখাপড়া হবে না, তাঁকেই যদি আমার গৃহশিক্ষক রাখিবার জন্য প্রস্তাব করি, অমনি তিনিই আবার বলিতে আরম্ভ করেন, "তুই ভয় পাচ্ছিস্ কেন রে? তুই ত আর নেহাৎ বোকা নস্; দুমাস আমি পড়ালে দেখ্‌বি তুইও একজন ভাল ছেলে হয়ে পড়্‌বি।"

আবার কেহ কেহ ক্লাসে আসেন বেশ একটু দেরী করিয়া। তারপর আসিয়াও "লিখ্ লিখ্ পড়্ পড়্" এমনি একটা কিছু করিয়া কোনওরূপে নির্দ্দিষ্ট সময়টুকু কাটাইয়া দেন। কেউ বা ক্লাসে বসিয়া নিদ্রাদেবীর সেবা করেন, কেউ নভেল বা উপন্যাসের রস আস্বাদন, কেউ বা নিজেদের চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি আরো কত কি কাজ করেন। কোনও কোনও শিক্ষক মহাশয় আবার সময় সময় ছাত্রদের শুনাইয়া কর্ত্তৃপক্ষদের বলিয়া থাকেন, "পঁচিশ টকায় আর কতই বা পড়াইব। পেটে খেলে পিঠে সয়।" এখানেও সেই প্রতারণা!

তারপর স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের কথাটাও একটুকু বলা দরকার। শুধু শিক্ষক আর ছাত্র লইয়াই ত স্কুলটা নয়? ইহার যে আবার উপরওয়ালা আছেন। প্রায়ই দেখা

যায়, মাঝে মাঝে দুই একটি এমন অপূর্ব্ব ছাত্রের আগমন হয়, যে তাদের জ্বালায় সমস্ত স্কুলটি অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। শিক্ষক মহাশয়গণ, এমনকি কর্ত্তৃপক্ষগণ পর্য্যন্ত, অনেক সময় তাহাদিগকে বাগে আনিতে পারেন না; তাহারা স্কুলের অনেক ছাত্রের মস্তক ভক্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ সব জানিয়া শুনিয়াও শুধু ৩টি বা ৪টি টাকার লোভে কিছুতেই তাহাদিগকে তাড়াইতে বা সরাইতে পারেন না, এবং আরও আশ্চর্য্যের কথা, প্রতিবৎসরেই তাহারা প্রমোশন পায়! কেন না, নচেৎ যে স্কুলের আয় কমিয়া যায়! এখানেও সেই প্রতারণা!!

স্কুলকেই বা শুধু বলি কেন! আজ কাল বিশ্ববিদ্যালয়েরও যে আবহাওয়া বদলে গিয়েছে। যে সব ছাত্র হেড্ মাষ্টার মহাশয়দের হাতে একশতের মধ্যে ১৫।২০ পায়, তারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের অপার কৃপায়, হয়ত বা প্রথম বিভাগেই উত্তীর্ণ হইয়া যায়। এমনও শোনা যায়, যে কেহ ২৫ নম্বর মাত্র উত্তর করিয়া ৩০।৩২ নম্বরও পাইয়াছে। না পাইলেই বা বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চলিবে কেমন করিয়া? ভাল, আমরা কিন্তু গোড়াতেই একটা বিষম ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয় কথাটার বুৎপত্তিলব্ধ অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই বলিয়াই এতগুলি অপ্রিয় কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। এ যে বিশ্বের সকল বিদ্যারই আলয়, তা ভুলিলে চলিবে কেন? আর প্রতারণাটাও কি একটা বিদ্যা নয়?

যাক্ কোনও রূপে স্কুলের পড়া শেষ করা গেল, এবার কলেজে ঢুকিবার পালা। ওমা, সেখানে ঢুকিতে গেলে কোথাও শুনি সিট্ (স্থান) নাই, কোথায়ও শুনি কোন বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে'? ইত্যাদি। কিন্তু, প্রায় অনেক স্থানেই কেরাণী সাহেবের পকেটে যদি আমার দক্ষিণ হস্তটি একবার প্রবেশ করাইবার সুযোগ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আর ভর্ত্তি হইতে কোনও গোলমাল প্রায় হয় না। এখানে গোড়ায়ই প্রতারণা। বড়র সবই বড় কিনা! তার পর ক্লাসে রামের পরিবর্ত্তে শ্যাম হাজিরা দেয়, কতজন বিদেশে থাকিয়াও proxy দেবার কৃপায় প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত থাকে। আবার ক্লাসের exercise বা পরীক্ষাদির সময় কেহ নোটবুক দেখিয়া লিখিতে থাকে, কেহ অপরের প্রশ্নোত্তর পত্র দেখিয়া অবিকল তাহা নকল করিয়া দেয় ইত্যাদি, ইত্যাদি! প্রফেসর মহাশয়গণ ইহা দেখিয়াও দেখেন না, এসব তুচ্ছ ব্যাপারে তাঁহাদের মস্তিষ্কের অপব্যয় করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। অথবা, "ক্ষমাই মহত্তের লক্ষণ" এই নীতির সম্মানের জন্য "বোবার শত্রু নাই', সাজিয়া তাঁহারা চুপ করিয়া থাকেন। কত স্কুলের ছাত্র, কত কলেজের ছাত্রকে বলিতে শুনিয়াছি, "কি করিব বলুন ত, আমরা এত কষ্ট ক'রে খেটে খুটে পড়ে যাই, আর ওরা সব কিছু না পড়ে শুধু টুকে আমাদের থেকে কত বেশী নম্বর পায়! তারপর পরীক্ষায় বেশী নম্বর না পাইলে, কোনও অভিভাবক মারপিট্ করেন, কেউ বা গালিগালাজ করেন, আবার কেহ কেহ বা গৃহশিক্ষকের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করেন; এক্ষণে এসবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে না টুকে উপায় কি?" ক্রমে ক্রমে তাহারাও একটু একটু করিয়া এই সব অসদুপায় শিক্ষা করিতে থাকে। ইহার নাম যদি বিদ্যালয় বা শিক্ষালয় হয়, তবে যমালয় বা পাপালয় কোথায়?

এদিকে আবার দুই বৎসরে কোনও বিষয়ের ৪ খানা কেতাবের মধ্যে মাত্র দুইখানি পড়ান হইল; কোনও বিষয়ের মাত্র একখানি, আবার কোনও বিষয়ের নাম মাত্র পড়ান হইল। তোমরা ছাত্রগণ যেমন করিয়া পার, বাকী কেতাবগুলি তৈয়ারী করিয়া লও। আমাদের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক, তোমরা পূর্ণ দুটি বৎসরের বেতন দিবে, common room না থাকিলেও, তার জন্য চাঁদা দিবে, লাইব্রেরী না থাকিলেও পুস্তকের ব্যবহারের জন্য টাকা জমা দিতে হইবে, ইত্যাদি; আমরা ইহার বিনিময়ে তোমাদিগকে percentage দিব, allow করিব; বস্, আর অধিক কি চাও? পড়্তে শুন্তে হয়, বাড়ীতে শিক্ষক রাখ অথবা নিজে যেমন করিয়া হউক ৭ খানা ইংরাজীর ৫ খানা পড়িয়া ফেল, ২ খানার বেশী পড়াইবার ব্যবস্থা আমরা করিতে পারিব না।" এ যদি প্রতারণা বা দোকানদারী না হয়, ত প্রতারণা বা দোকানদারী কি?

যাক্ কলেজের জীবনও একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসাগর ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলাম। এখানে আবার আর এক কাণ্ড। অমুক পরীক্ষকের শ্যালক অঙ্কে ৭ নম্বর কম পাইয়াও উত্তীর্ণ হইল, আর রমেশ চক্রবর্ত্তী ১ নম্বর কম পাইয়াছে বলিয়া উত্তীর্ণ হইল না। অমুক চন্দ্র ঘোষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মচারী বিশেষের আত্মীয় বা পুত্র, সুতরাং সে যাহাই লিখুক না কেন, তাকে প্রথম করিতেই হইবে। কেহ মামার কৃপায়, কেহ মেসোর দয়ায়, কেহ ভগ্নীপতির অনুকম্পায়, কেহ বা বাবার নামের ঠেলায়, আবার কেহ কেহ বা সুপারিসের বা তদ্বিরের প্রভাবে অনুত্তীর্ণ হইয়াও উত্তীর্ণ হইয়া যায়, আর যাদের মামা মেসো পিসে বাবা কেহ নাই, তারা অধিকতর উপযুক্ত হইলেও অনুত্তীর্ণই থাকিয়া যায়। আর প্রতারণা কি গাছে ধরে!

এবারে শেষের পালা। পরীক্ষাসাগর যতই দুর্লঙ্ঘ্য হউক না কেন, আমরা বাঙ্গালী, মহাবীরের বংশ কিনা জানি না, তবে সে দেশে জন্ম বলিয়া, অন্ততঃ তাহার হাওয়ায়, আমরা অনায়াসে সে সাগর পার হইয়া যাই। সুতরাং আমিও পরীক্ষাসাগর সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হইলাম। মনে আশা এতকালের পরিশ্রম, এতকালের প্রচেষ্টা, এতকালের গুরুভক্তি বা গুরুপূজার অর্ঘ্যোপহার, এবারে সফল। এবারে সরস্বতীর কৃপায়, লক্ষ্মী ঠাকুরুণ ঘরের মেজে এসে ঠেসে বস্‌লেন আর কি। হোলও ঠিক তা-ই। লক্ষ্মীঠাকরুণ নোলক ঝুলিয়ে, ইহুদী মাকড়ী দুলিয়ে, মলবাজায়ে, প্রাণ মজায়ে, ঘর সাজায়ে এসে দাঁড়ালেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাণ্ডারের চাবিটি আন্‌তে ভুলে গেলেন! এত পড়েশুনে শেষে শুধু হা অর্থ! হা অন্ন! ওঃ, আগাগোড়াই কি ভীষণ প্রতারণা!!!

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিগত * প্রস্তাবে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠকবর্গ দেখিতে পাইয়াছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা প্রাচীন পদ্ধতি হইতে কতদূর ব্যাপক এবং উপকারী হইয়াছে। আমরা গত প্রস্তাবে কেবলমাত্র সংস্কৃত-বিভাগের সম্বন্ধে যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, কেবল তাহাই দেখাইয়াছি। বঙ্গদেশের অভিভাবকবর্গ এখন পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কিরূপ প্রণালীতে শিক্ষাদান করা হইতেছে এবং তাহাতে কিরূপ 'যুগান্তর' আনয়ন করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই। ইহার কারণ এই যে, এই শিক্ষা পদ্ধতির যে বিবরণ সময়ে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হয়, তাহা ইংরেজী ভাষায় নিবদ্ধ। বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত ইহার বিবরণ বাহির হয় নাই। এই নিমিত্তই এই শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার লোকদিগের মধ্যে ভাল করিয়া প্রচারিত হইবার সুবিধা পায় নাই। যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, কেবল তাহাদের মুখে শুনিয়া, অভিভাবকেরা এতৎ সম্পর্কে যাহা কিছু জানিতে পারিতেছেন। কিন্তু ছাত্রবর্গের মুখে প্রচারিত বিবরণও নিতান্ত অসম্পূর্ণ। তাহার কারণ এই যে, এই শিক্ষাপদ্ধতিতে যতপ্রকারের বিভাগ আছে, সকল বিভাগের সকল ছাত্রের মুখে একসঙ্গে সকল কথা শুনিবার সম্ভাবনা কোন অভিভাবকেরই নাই। কেন না, সকল ছাত্র ত সকল বিভাগে অধ্যয়ন করে না। প্রধানতঃ এই কারণেই, আজ পর্য্যন্ত এই শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধে অধিকাংশ অভিভাবক এবং দেশের লোক অনভিজ্ঞ রহিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি দেশের লোক সকল বিষয়ের বিশেষ সংবাদ ভাল করিয়া জানিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, এ প্রকার ব্যবস্থা অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এবং এই ব্যবস্থানুসারে ছাত্রবর্গ যে মহতী শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইতেছে, সে সুযোগ অন্য কোথায়ও পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই শিক্ষাকে একপ্রকার সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা বলিয়া আখ্যা প্রদান করিলে, বোধ হয় কোন অতিরঞ্জিত কথা বলা হইবে না। এই প্রস্তাবে আমরা বঙ্গীয় অভিভাবক বর্গের এবং দেশের লোকের জানিবার সুবিধার নিমিত্ত প্রধান প্রধান শিক্ষিতব্য বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইহা দ্বারা পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, এই ব্যবস্থা সর্ব্বতোমুখী ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য কি না।

আমরা গত প্রস্তাবে কেবল মাত্র সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে কি প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং সেই ব্যবস্থা পূর্ব্বের ব্যবস্থা হইতে কতদূর বিভিন্ন, তাহা দেখাইয়াছিলাম। তাহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সকল ছাত্রের পক্ষেই আটখানি প্রশ্ন পত্রের উত্তর লিখিতে

---

* "নব্যভারত, গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।"

হয়। এই আটখানি প্রশ্ন পত্রের মধ্যে, প্রথম চারিখানি প্রশ্ন পত্র তত্তৎ বিষয়ের পরীক্ষার্থী সকল ছাত্রের পক্ষেই গ্রহণীয় প্রশ্ন পত্র। কিন্তু অপর চারিখানি প্রশ্ন পত্র কেবল তাহাদেরই নিমিত্ত, যাহারা সেই বিষয়ের বিশেষ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের অভিলাষী। প্রথম চারিখানি প্রশ্ন পত্র সাধারণ জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য করে এবং শেষ চারিখানি প্রশ্ন পত্র বিশেষ-জ্ঞানের পরীক্ষার জন্য নির্ম্মিত করা হয়। ইহাতে এই সুবিধা হইয়া উঠিয়াছে যে, যে ছাত্র যে বিষয়টীই গ্রহণ করুক্ না কেন; সেই ছাত্রের সেই বিষয়টীর সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান এবং বিশেষ জ্ঞান—উভয় প্রকার জ্ঞান লাভের সম্বন্ধেই সহায়তা করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ছাত্রটীকে সেই সেই বিষয়ে কি প্রকার নিপুণ ও পটু করিয়া তোলা হইল, তাহা পাঠকবর্গ অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে কি প্রকার বিস্তৃত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিষয়নির্ব্বাচন হইতেই, পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

আমরা সংস্কৃতের কথা প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি। তদ্দ্বারা দেখিয়াছেন যে, সংস্কৃতের সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, বেদ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই ইহাতে গৃহীত হইয়াছে, এবং সকল বিষয়ের জন্যই নির্দ্দিষ্ট বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগেই, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে, যাহাতে ছাত্রদিগের সাধারণ ও বিশেষ উভয় প্রকার জ্ঞানই উপার্জ্জিত হইতে পারে, তজ্জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সংস্কৃত ব্যতীত, পালি-শিক্ষা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, সে পদ্ধতিটী পালি-বিদ্যার সম্পূর্ণ সর্ব্বদিক্‌ব্যাপিনী শিক্ষালাভের পথকে সুগম করিয়া তুলিয়াছে। ভারতে যে দিগন্তপ্লাবী বৌদ্ধধর্ম্মের আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই আন্দোলনের ফলে, বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধ ইতিহাস, বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ কলাশিল্প—প্রভৃতি অমূল্য বিদ্যাগুলি একদিন ভারতবর্ষকে মহতী সমৃদ্ধিতে ভূষিত করিয়া তুলিয়াছিল। কত প্রদেশের কত মহা মহা বিদ্বদ্বর্গ, কতকাল একান্ত পরিশ্রম করিয়া—এই সকল বিদ্যার যে পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। কিন্তু বৌদ্ধদিগের এই সকল রত্ন অধিকাংশই পালি-ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং বৌদ্ধ-যুগের সেই সকল মূল্যবান্ শাস্ত্র ও বিবিধ বিষয়িনী বিদ্যার জ্ঞান লাভ করিতে হইলেই পালিভাষা শিক্ষার প্রয়োজন। পালিভাষা শিখিয়া, সেই ভাষায় রচিত সাহিত্য-দর্শনাদি বিবিধ বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন। একটা কথা এই সম্বন্ধে বলিলেই এই শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি হইতে পারিবে। হিন্দুর বিশ্ব-বিখ্যাত বেদান্ত দর্শনে আমরা যে মায়াবাদ দেখিতে পাই, যে মায়াবাদের উপরে বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠিত, সেই মায়াবাদটী কিছু একদিনেই, আকাশ হইতে বৃষ্টি-ধারার সহিত পতিত হইয়া, বেদান্ত দর্শনের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। এই মায়া-তত্ত্বটী এই আকারে পরিণতি পাইবার পূর্ব্বে, বহুদিন হইতে বৌদ্ধপণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শূন্য-বাদ, বিজ্ঞান-বাদ, স্যাদ্বাদ প্রভৃতি মতগুলি ক্রমে ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। এই সকল মত বৌদ্ধপণ্ডিতমণ্ডলীর বিবিধ শাখায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে, পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বহুদিন হইতে আলোচিত হইয়া হইয়া, ক্রমে পরিপুষ্ট হইতেছিল। বেদান্তে যে আজ মায়াবাদ ও নির্গুণব্রহ্মতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা বুঝিতে

হইলে, ইহার ইতিহাসটী বুঝিতে হয়। এই ইতিহাসে, ইহার ক্রম-পরিণতি ও পুষ্টির ইতিহাস গ্রথিত রহিয়াছে। কিন্তু এই ক্রম-পরিণতি ও পুষ্টি বুঝিতে হইলেই, বৌদ্ধগণের দর্শন-শাস্ত্র জানিতেই হইবে। নতুবা এই মায়াবাদ ও নির্গুণব্রহ্মবাদ, কোথা হইতে আসিল এবং কোন্ কোন্ চিন্তা-প্রণালীর, কি প্রকার পরিণতি দ্বারা ইহা পরিপুষ্ট হইয়াছিল এবং অবশেষে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে ইহা কিরূপে বেদান্তে প্রবিষ্ট হইয়াছিল,—এ সকল কথা না বুঝিতে পারিলে বেদান্তের মূল ভিত্তিস্থানীয় নির্গুণব্রহ্মবাদের কথা ও মায়ার তত্ত্বটী আদৌ বুঝিতে পারা যাইবে না। কিন্তু ইহার আদিম চিন্তাপ্রণালী ও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মত-বাদগুলির তত্ত্ব—যাহার পরিণামে মায়াবাদ ও ব্রহ্মবাদ উৎপন্ন হইল—তাহা বুঝিতে হইলেই পালি-গ্রন্থাবলীর শরণ লইতে হইবে; পালিতে রচিত বিবিধ মতবাদের ঐতিহাসিক আলোচনা করিতেই হইবে। তাই বলিতেছিলাম যে, হিন্দুদর্শনশাস্ত্র ভাল করিয়া বুঝিতে হইলেই, বৌদ্ধবিদ্যার আলোচনা করিতেই হইবে। বৌদ্ধশাস্ত্র বুঝিতে হইলেই পালি বুঝিতে হইবে ও পালি-রচিত গ্রন্থনিচয় অধ্যয়ন করিতে হইবে। নতুবা হিন্দুদর্শন ঐতিহাসিক প্রণালীতে বুঝিতে পারা কঠিন হইয়া উঠিবে। এই দুই বিদ্যাই প্রাচীনকালে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় সেই পালিশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পালির বিবিধ বিভাগের প্রত্যেক বিভাগকে এক একটী মুখ্য বিভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া, প্রত্যেক বিভাগের জন্যই আটখানি করিয়া প্রশ্ন পত্রের উত্তর দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগে এইরূপে সাধারণ জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞান—এই দুই-এরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যেই আবার প্রাচীন "লেখা-মালা" শিক্ষার ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পালির ইতিহাস, পালির দর্শন, পালির সাহিত্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি লইয়া এক একটা পৃথক্ বিভাগ রচিত হইয়া, শিক্ষাকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

অবিকল এই প্রণালীতে আরবী এবং প্রাকৃত শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে এবং তদনুসারে ছাত্রবর্গ অধ্যয়ন করিতেছে।

এই সকল ভারতীয় বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের "প্রাচীন ঐতিহাসিক শিক্ষা" বিভাগের উল্লেখ করাও নিতান্ত আবশ্যক। এই বিভাগটী Ancient Indian History and Culture অর্থাৎ—"ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও বিশেষবিদ্যা"—নামে পরিচিত। যে সকল ছাত্র এই বিভাগে অধ্যয়ন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ভারতের প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত প্রায় তাবৎ বিদ্যার সহিতই পরিচয় হইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছে। এই বিভাগে—প্রথম চারিখানি সাধারণ জ্ঞানলাভের উপযোগী প্রশ্নপত্রের উপাদান স্বরূপ,

(১) বৈদিক সাহিত্য ও রামায়ণ-মহাভারতীয় যুগের ইতিহাস

(২) মহাভারতীয় যুগের পরবর্ত্তীকালের সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতিতত্ত্ব (পালরাজগণ ও সেনরাজগণ সম্পর্কিত বিবরণ সহ)।

(৩) ও (৪) প্রাচীন ভারতের ভূগোলতত্ত্ব, হিউন্‌সাঙ্ লিখিত বিবরণ সহ। ভুবন-কোষ সম্বন্ধীয় বিদ্যা প্রভৃতি নিবদ্ধ আছে

এতদ্ব্যতীত, বিশেষজ্ঞানলাভের উপযোগী বিষয়গুলিকে প্রধানতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম বিভাগে অশোক, শুঙ্গ ও সাতবাহন রাজগণের লিপিসমূহ এবং ক্ষত্রপ ও গুপ্তরাজগণের লিপিমালা। দ্বিতীয় বিভাগের জন্য কলাশিল্প ও প্রস্তরশিল্প এবং তৃতীয় বিভাগে বিভিন্ন নৃপতিবর্গের সাময়িক নানাপ্রদেশস্থ মুদ্রার বিবরণ এবং চতুর্থ বিভাগে অতি প্রাচীন স্থপত্য বিদ্যার বিশেষ বিবরণ—এই সকল শিক্ষণীয় বস্তু আছে। এই চারিটি বিভাগ লইয়া একটা শ্রেণী কল্পিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতেও চারিটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ রহিয়াছে। এই শ্রেণীতে সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি, স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি প্রভৃতি-সূচক এবং লোক গণনা সম্পর্কিত তত্ত্ব—এইগুলি লইয়া চারিটী বিভাগ আছে। তৃতীয় শ্রেণীটী ভারতের ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস বিষয়ক। ইহাতে বৈদিকযুগের ধর্ম্মতত্ত্ব, পৌরাণিক-যুগের ধর্ম্ম বিবরণ, বৌদ্ধ-সময়ের ধর্ম্মেতিহাস, জৈনধর্ম্মের ইতিবৃত্ত—প্রভৃতি বিভাগের গঠন করা হইয়াছে। চতুর্থ শ্রেণীটী ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে বিরচিত। এই শ্রেণীতে ভারতের গণিতবিদ্যা, পরিমিতি শাস্ত্র, বীজগণিত, লীলাবতী, শুল্‌ভশাস্ত্র, ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ ও তাহার ইতিহাস, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, আর্য্যভট্টীয় গ্রন্থাদি সমস্তই অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। পঞ্চম শ্রেণীটী নৃতত্ত্ব, বিষয় লইয়া গঠিত। জাতি বিভাগ, শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কিত যাবতীয় বিবরণ রহিয়াছে। পাঠক দেখিতে পাইবেন, এই শ্রেণীগুলির মধ্যে যে ছাত্র যে শ্রেণীটী গ্রহণ করিবে, সেই শ্রেণীতেই তাহাকে অপর চারিটী প্রশ্নপত্র লইতে হইবে। এই প্রকারে সাধারণ জ্ঞানলাভের জন্য ও বিশেষজ্ঞানলাভের জন্য ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। এতদ্‌ দ্বারা ছাত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল কিনা, পাঠকগণই ভাবিয়া দেখিবেন।

এতদ্‌ব্যতীত, ইংরেজী সাহিত্য বিভাগ, ইংরাজী ইতিহাস বিভাগ, ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র ও গণিত বিভাগ রহিয়াছে। এই সকল বিভাগেও পূর্ব্বের ন্যায় আটখানা করিয়া প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি প্রকার বৃহৎব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আমরা উপরে যে কয়েকটী বিভাগের উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতেই সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারিবে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতা শক্তি আরো বহুমুখে প্রসৃত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাহা করিয়াছেন, ভারতের অপর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহা নাই। প্রাচীন তিব্বতীয় ভাষায় ভারতের কত অমূল্য রত্ন ভাষান্তরিত রহিয়াছে। সে গুলির সংখ্যা কম নহে। সেগুলির উদ্ধার সাধন করিতে হইলে, তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষার একান্ত উপযোগিতা রহিয়াছে। নতুবা সেই সকল মূল্যবান্ রত্নের আর পুনরুদ্ধারের কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না। এই ভাষার শিক্ষার সম্যক্ ব্যবস্থার নিমিত্ত, সার্ আশুতোষ কত পরিশ্রমে, কত অর্থব্যয়ে এবং গবর্ণমেণ্টের তিব্বতস্থ কর্ম্মচারিগণের সাহায্যে সুপণ্ডিত কয়েকজন "লামা"কে লইয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইঁহাদিগের যোগে তিব্বতীয় অভিধান প্রস্তুতের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। মুসলমানযুগের প্রাক্‌কালে ভারতের অসংখ্য "বিহার" হইতে কত কত সুপণ্ডিত,—শিষ্যবর্গ লইয়া বহুযত্নে

অধীত ও লিখিত গ্রন্থসমূহ লইয়া, এই তিব্বতে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহার সংখ্যার অন্ত নাই। তারপর বৌদ্ধযুগে,—এমন কি পালরাজগণের শাসনকাল পর্য্যন্তও, ভারত ও তিব্বতের মধ্যে পরস্পর যাতায়াত ছিল; পরস্পর গ্রন্থাদির বিনিময় হইত; কত গ্রন্থ এই প্রকারে তিব্বতে চলিয়া গিয়াছে। তথায় কতক বা মূলের আকারে, কতক বা তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সেই দেশেই পড়িয়া রহিয়াছে। সার আশুতোষের এই যত্নের ফলে, এই সকল গ্রন্থরত্নের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা জন্মিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত, ছাত্রবর্গ যাহাতে বাঙ্গালাভাষা, হিন্দীভাষা, আসামীভাষা এবং ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা উপযুক্তরূপে শিখিতে পারে, তজ্জন্য যে প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে সম্যক্ বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালাভাষা ত বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক প্রণালীতে সুসংস্কৃত হইয়া, এম্ এ পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই যে সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইহার ফলে, বৎসরের পর বৎসর, ছাত্রবর্গ সুশিক্ষিত হইয়া বাহির হইতেছে;—এজন্য সমগ্র বঙ্গদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ঋণী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালাদেশেরই সম্পত্তি। বাঙ্গালী জাতির বিশেষ উপকারের জন্যই ইহা আত্মনিয়োগ করিয়াছে। বাঙ্গালার নর-নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে আপন সন্তান-সন্ততির সুশিক্ষার জন্য যে মহান্ ভার অর্পণ করিয়াছিলেন;—সেই গুরুতর ভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আশার অতিরিক্তরূপে উদ্‌যাপিত করিতে পারিতেছেন কিনা, পাঠকবর্গ সেইটি বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। সার্ আশুতোষ ইহার প্রধান কাণ্ডারী। সেনেটের সভ্যবর্গ তাঁহার সাহায্যকারী। ইঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও যত্নে শিক্ষার প্রণালী যাহা অবলম্বিত হইয়াছে, ইহার প্রশংসা একমুখে করিতে পারা যায় না।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

স্বর্গত পিতাপুত্র।

স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের নাম "নব্যভারত" প্রকাশের সময়েই (১২৯০ সালে) সর্ব্বপ্রথম শ্রবণ করি। তখন স্কুলের ছাত্র ছিলাম, তবে পত্রিকাদি পড়িবার বাতিক খুবই ছিল, "নব্যভারত" খানি শ্রদ্ধাসহ পাঠ করিতাম।

দেবীপ্রসন্নবাবু তখন উপন্যাস লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। "শরচ্চন্দ্র" "বিরাজমোহন" প্রভৃতি অনেক গুলি উপন্যাস তিনি লিখিয়াছিলেন। সেই গুলির কয়েক খানি "নব্যভারতে" ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিজের ছাড়া অপরের উপন্যাসও "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছিল যথা ৺রমেশচন্দ্র দত্তের সংসার ও সমাজ। পরিশেষে যখন তিনি দেখিলেন যে গল্প ও উপন্যাস ভূয়িষ্ঠ ভাবে মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা গুলি অধিকার করিয়া সৎসাহিত্যের ক্ষতি জন্মাইতেছে তখন তাঁহার "নব্যভারতে" গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ করা রহিত করিয়া দিলেন।

ইহাতে "নব্যভারতে" গ্রাহক সংখ্যার নিশ্চয়ই আশানুরূপ বৃদ্ধি হইতে পারে নাই কিন্তু দেবীপ্রসন্ন বাবু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ ও করেন নাই। অপিচ চিত্র দ্বারা পত্রিকা সুশোভিত করিয়া ইহার আকর্ষণী শক্তি পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য ও দেবীপ্রসন্ন বাবু কদাপি যত্ন করেন নাই। তিনি ইহাতে বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়াই বোধহয় মনে করিতেন। ঐ হেতু তিনি গন্ধ তৈলের বিজ্ঞাপন, তথা চক্‌চকে "প্রচ্ছদ পট" ইত্যাদিরও পক্ষপাতি ছিলেন না তাঁহার পত্রিকায় এসকল দেখা যায় নাই। ইহা হইতেই তাঁহার চরিত্র কিরূপ ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে।*

দেবীপ্রসন্ন বাবুর লেখায় একটা বিশিষ্টতা ছিল ইহাতে তাঁহার আন্তরিকতা (আর্ণেষ্টনেস্) প্রতিভাত হইত। এই গুলি পাঠ করিলে তাঁহার গভীর দেশবাৎসল্য, সমুদার নীতিজ্ঞতা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যাইত। আজকালকার উপন্যাস গুলিকে অনেকটা "কামানলের ইন্ধন" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দেবীপ্রসন্ন বাবুর উপন্যাসগুলি তাদৃশ ছিলনা ঐগুলি পাঠ করিলে সদ্‌গ্রন্থ পাঠের ফললাভই হইত। পরন্তু আজকাল, সে সব পড়িবার লোক বিরল। রুচি বদলিয়া গিয়াছে তাই বোধহয় তিনি ও পথে আর যান নাই। ফলতঃ লোকসাধারণের রুচির অনুবর্ত্তনে যা' তা' লিখিয়া অথবা যা' তা' করিয়া পয়সা কুড়ান দেবীপ্রসন্ন বাবুর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। এই জন্য তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

তাঁহার আর একটি গুণ ছিল নির্ভীক নিরপেক্ষতা। তাঁহার "নব্যভারত" দলবিশেষের কাগজ ছিলনা। তিনি নিজে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন তথাপি সম্প্রদায়ের গলদ ঘাঁটিতে কুণ্ঠিত হন নাই। "যৌবনবিবাহ ও ব্রহ্মোসমাজ" প্রবন্ধ পড়িয়া তাঁহার প্রতি অপক্ষপাতী ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রদ্ধার ভাব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। "সত্যের" অনুরোধে এবং বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই স্বধর্ম্ম ও স্বকীয় সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কেহ কেহ পত্রিকা সম্পাদক ভাবে পৈতৃক সমাজের দোষোদ্‌ঘাটনে পঞ্চমুখ, পরন্তু নিজের সমাজের গলদ দেখিতে 'পরাঙ্মুখ' হইয়া থাকেন। প্রকৃত সত্যান্বেষী বিবেকবান্ ব্যক্তি তাহা করেন না দেবীপ্রসন্ন বাবু সেইরূপ একজন ছিলেন। যে গলদ ঘাটিবে, তাহার উপর অনেকেই রুষ্ট হইবে, ইহা স্বাভাবিক; সেই রোষের ভয় করিয়া প্রকৃত সমাজ হিতৈষী ন্যায়বান্ ব্যক্তি পশ্চাৎপদ হন না; দেবীপ্রসন্ন বাবু তাদৃশ নির্ভীক ছিলেন।

এই সকল কারণে, আমি দেবীপ্রসন্ন বাবুর পক্ষপাতী ছিলাম, এবং "নব্যভারতে" মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ দিতাম।*

সর্ব্বপ্রথম বোধহয় ১৩১৪ সালে "নব্যভারতে" প্রথম প্রবন্ধ (পরমহংস শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দপুরী) প্রেরণ করি। প্রবন্ধলেখক রূপে "নব্যভারত" পত্রের অন্ততঃ ঐ সংখ্যা বিনামূল্যে পাইতে প্রত্যাশা করিয়াছিলাম কিন্তু দেবীপ্রসন্ন বাবু বোধ হয় যে সে লেখককে বিনামূল্যে পত্রিকা দিতেন না। তাই মূল্য দিয়া ঐ সংখ্যার "নব্যভারত" (২৫শ খণ্ড ৯।১০ম সংখ্যা) ক্রয় করিতে হইয়াছিল। এখন বলিতে পারি, যে ইহাতে আমি তখন একটু অসন্তুষ্ট হইয়া

* এরূপ কৈফিয়ৎ দিবার একটু কারণও আছে। সাহিত্য-সমাজপতি স্বর্গীয় সুহৃৎ সুরেশচন্দ্রের পত্র বিশেষ হইতে নিম্নোদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলেই কারণ প্রতীত হইবে।
"আশা করি আপনি ভাল আছেন, এবং গোঁড়ামীতে গোঁড়া লেবু অপেক্ষাও টক্ হইয়া ব্রাহ্মলুমের পাহাড়ে প্রবন্ধ নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।"

ছিলাম; কিন্তু পশ্চাৎ ঐভাব দূরীভূত হয়, এ যাবৎ বৎসরে এক দুইটা প্রবন্ধ "নব্যভারতে" দিয়া আসিতেছি এবং ইদানীং "নব্যভারত" নিয়মিত রূপেই প্রাপ্ত হইতেছি।

বোধহয় ১৩১৫ সালে যেবার রাজসাহীতে সাহিত্য সম্মিলন হয় দেবীপ্রসন্ন বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম। তাঁহার অমায়িক ও প্রীতিপ্রদ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলাম এবং সাহিত্যসম্মিলন সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রবন্ধ "নব্যভারতে"ই দিব, এরূপ একটা সংকল্প ধার্য্য করিয়াছিলাম। দেবী-প্রসন্ন বাবুর আমোলে এই সংকল্প হইতে কদাপি বিচ্যুত হই নাই এবং তাঁহার স্বর্গতির পরে এ যাবৎ সাহিত্য সম্মিলনও আর হয় নাই।

এই উপলক্ষ্যে দেবীপ্রসন্ন বাবুর উদ্দেশে আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশই আবশ্যক মনে করিতেছি। ময়মনসিংহ সাহিত্যসম্মিলন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে এমন দুএকটি কথা ছিল যাহা প্রকাশ করাতে দেবীপ্রসন্নবাবুর সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের নিকটে তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি কোনও কিছু বাদ দিয়া প্রবন্ধের অঙ্গহানি তথা প্রবন্ধ লেখকের মনোব্যথা ঘটান নাই। বাঁকিপুর সাহিত্যসম্মিলন বিষয়ক প্রবন্ধে মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের স্তাবকবর্গের উক্তির প্রতিবাদে এবং পশ্চাৎ আরো দুএকটি প্রবন্ধে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছিল, তাহা দেবীপ্রসন্ন বাবু অকুতোভয়ে যথাযথ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্য দুএক জন পত্রিকা সম্পাদকের হাতে এতাদৃশ প্রবন্ধের কি গতি হইত, তাহা একটি উদাহরণ দ্বারা সূচিত করিতেছি। "বাঁকীপুর সাহিত্যসম্মিলন" প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ প্রবাসী পত্রিকায় "বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তক কে!" এই শিরোনামে "কষ্টি পাথর শীর্ষক পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছিল। জনৈক পণ্ডিত ইহার প্রতিবাদ করিয়া "কষ্টি পাথরে বাজে দাগ" নামক প্রবন্ধ লিখেন, ইহাতে ব্যঙ্গবিদ্রূপ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ইত্যাদি যথেষ্ট ছিল। প্রতিবাদী এই প্রবন্ধ 'প্রবাসীতে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই 'ব' 'ভ' ও 'ম' এই তিন পত্রিকায় ও পাঠান। 'ব' ও 'ম' সম্পাদক সমগ্র প্রবন্ধ ছাপাইয়াছিলেন এবং "ভ" সম্পাদক ইহার সারসংক্ষেপ সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশিত করেন। প্রতিবাদের উত্তরে প্রবাসীতে যে প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম' "প্রবাসী" অবশ্যই তাহা ছাপাইয়া ছিলেন। কিন্তু 'ব' ও 'ম' এর নিকট ঐ উত্তরের প্রতিলিপি প্রেরিত হইলেও 'ব' সম্পাদক কৃপা করিয়া অর্দ্ধাংশ মাত্র প্রকাশ করেন, "ম" সম্পাদক ইহা প্রকাশের উপযুক্তই মনে করেন নাই। "ভ" সম্পাদকের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরের চুম্বক প্রেরিত হইলেও, তিনি তাহা না ছাপাইয়া কতকগুলি বাজে কথা বলিয়া তর্কবিতর্কের উপসংহার করেন। দেবীপ্রসন্ন বাবু কদাপি লাভ লোকশানের আশায় সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হন নাই।

একদিন ভিন্ন দেবীপ্রসন্ন বাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পর আলাপাদি হয় নাই। কিন্তু পত্রালাপ যথেষ্ট হইত—দুঃখের বিষয় ঐ সকল পত্র (দৈবাৎ *একখানি ব্যতীত) সংরক্ষিত হয় নাই। আত্মীয় ভাবেই তিনি আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন ১৩২০ সালে কোনও লেখার * জন্য একটা ডিফেমেসন মামলা এখানে (গৌহাটিতে) দায়ের হয়, তখন এই

---

* ইতোঽধিক অপর কোনও পত্রিকায় পাঠাইয়া ছিলেন কিনা জানি না ঐ তিন খানিই আমার দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল।

"ত্রিশ বৎসর অন্তে" শীর্ষক প্রবন্ধে ৺ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর ৺ কামাখ্যা তীর্থ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য উপলক্ষে ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে ইহাতে দু একটা অপ্রীতিকর কথা ছিল।

সহরে তাঁহার স্বজেলার পরিচিত অনেকে থাকিলেও আমাকেই সাহায্যার্থ লিখেন—সুখের বিষয় মাম্‌লাটা আপোষে মিটাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যে চিঠিখানি আছ তাহা ঐ মাম্‌লা সম্পর্কিত—এবং গোপনীয় বলিয়া পরিচিহ্নিত – তাই এই স্থলে প্রকাশ করা গেল না।

তাঁহার পুত্র অচির স্বর্গত প্রভাতকুসুম বাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ঘটে নাই—তবে পত্রালাপ আরম্ভমাত্র হইয়াছিল। প্রভাতকুসুম সাধু মাতাপিতার * সন্তান – সাধুই ছিলেন—নানা সৎকর্ম্মে তাঁহার উৎসাহের কথাও শুনিয়াছিলাম। বাল্যে বিলাত গিয়া তিনি পিতাকে যে সকল চিঠি পত্র দিতেন—বোধ হয় তাহাই "খোকার বিলাতের পত্র" এই শিরোনামে "নব্যভারতের" অঙ্গীভূত হইয়া প্রভাতকুসুমের সাহিত্য সাধনায় হাতে খড়ি হইয়াছিল। পরন্তু পিতা জীবিত থাকিতে কৃতবিদ্য পুত্র প্রভাতকুসুম 'নব্যভারতের' কোনও রূপ সেবা করেন নাই—এবং দেবীপ্রসন্ন বাবু কোনও এক পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন যে পুত্রের এ দিকে তেমন মতিগতি নাই। পিতার মৃত্যুর পরে যখন প্রভাতকুসুমকে 'নব্যভারতে'র পরিচর্য্যায় বৃত হইতে দেখিলাম—পত্রিকাখানির সৌষ্ঠবার্থে সচেষ্ট দেখিলাম—তখন প্রকৃতই আনন্দিত হইয়াছিলাম। ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভায় পঠিত একটি প্রবন্ধ † 'নব্যভারতে' পাঠাইয়া প্রভাতকুসুম বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—প্রবন্ধটি তাঁহার মনঃপূত হইয়াছে কি না—কেন না, তাহাতে এমন দুএকটি কথা ছিল যাহা তদীয় সাম্প্রদায়িক অভিরুচির বিরোধী বিবেচিত হইতে পারে। তদুত্তরে লিখিত তাঁহার এই শেষ পত্রখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহা হইতে দেখা যাইবে, তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্রই ছিলেন।

"আপনার স্নেহ পত্র ও ৺ ভূদেব স্মৃতি শীর্ষক প্রবন্ধটি পাইয়া যারপর নাই উপকৃত হইলাম। আপনি এই প্রকার মধ্যে মধ্যে 'নব্যভারতের' প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিলে কৃতার্থ হইব। আপনার সন্দর্ভের সহিত যদি সকলের মতের মিল নাও হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? আপনি নির্ভীক ভাবে যেমন আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে ত্রুটি করিবার কোন নূতন কারণ উপস্থিত হইয়াছে না ভাবিলেই সুখী হইব।

'নব্যভারতে' যে চিরপ্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য ছিল, সেই সার্ব্বভৌম নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে আমি যতদিন ইহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছি, প্রাণপণ চেষ্টার ত্রুটি করিব না। প্রতিবাদও ছাপিব। এই বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আশঙ্কাও দেখি নাই।"

পত্রখানি পাইয়া আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে যে উত্তর লিখি, তাহা বোধ হয় প্রভাতকুসুম রোগশয্যায় পাইয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরেই হঠাৎ শুনা গেল তিনি অকালে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

---

* পিতা দেবীপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে যথোচিত বলিয়াছি—মাতার সম্বন্ধেও আমার বাল্যাবধি একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল। জনৈক ব্রাহ্ম বাল্যবন্ধু শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতায় গিয়া দেবীপ্রসন্ন বাবুর আশ্রয়ে অবস্থান করেন—তিনি একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "Devi Babu's wife is an incarnation of piety" ঐ কথাটা তদবধি স্মৃতিপটে মুদ্রিত থাকিয়া আমাকে দেবীপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীর প্রতিও শ্রদ্ধালু করিয়াছিল।

† নব্যভারত ১৩২৮ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের ৺ ভূদেব স্মৃতিসভায় পঠিত প্রবন্ধ "উপাসনা" পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রেরিত হইয়াছিল দুঃখের বিষয় তাহাতো প্রকাশিত হয়ই নাই প্রবন্ধটা ফেরত চাহিয়াও পাওয়া যায় নাই। তবে এডুকেশন গেজেটে ঐ প্রবন্ধের সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক।

মহাভারত মঞ্জরী।

অষ্টম অধ্যায়।

দ্বিতীয়বার পাশাখেলা।

পাণ্ডবেরা স্বরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাতে দুর্য্যোধনাদির দুঃখের অবধি নাই। তাঁহারা আবার পরামর্শ করিয়া মন্ত্রণা স্থির করিলেন। পরে দুর্য্যোধন পিতার নিকট গিয়া বলিলেন, "রাজন, পাণ্ডবেরা কি এই অপমান জীবন থাকিতে ভুলিতে পারিবে? দ্রৌপদীর এত লাঞ্ছনা, এত দুঃখ কি আমাদের রক্ত বিনা নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হইবে? আপনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাহা কি সম্ভবপর! আপনি শীঘ্রই শুনিবেন, তাহারা বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, ভীষণ রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। তখন কি করিবেন! কিরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন! এই জন্য বলিতেছি, তাহাদিগকে পুনরায় পাশা খেলিতে আহবান করুন। এবার যিনি পরাজিত হইবেন, তিনি চর্ম্ম পরিধান করিয়া দ্বাদশ বর্ষের জন্য বনে গমন করিবেন। চিনিতে পারিলে আবার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও আর এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে। এইরূপ পণে পরাজিত করিয়া, বুদ্ধিবলেই কণ্টকোদ্ধার করিব। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে আমরাও বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিব। হে ধীমান, আমার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া আমাদিগকে বিপদ সাগরে ভাসাইবেন না।"

অন্ধরাজ সম্মত হইলেন। তাহা শুনিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, বিদুর, সঞ্জয়, বাহ্লীক, ভূরিশ্রবা, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদ্বয় বিকর্ণ ও যুযুৎসু প্রভৃতি সভাস্থিত অনেকেই প্রতিবাদ করিলেন। শেষে গান্ধারী দেবী আসিয়া বলিলেন, "রাজন্ যখন, দুর্য্যোধন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তখনই বিদুর বলিয়াছিল, 'এই পুত্র বংশ-নাশ করিবে।' তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? ধর্ম্মাত্মা বিদুরের কথা কখনও মিথ্যা হইবার নহে। অতএব দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া এই বৃহৎ বংশ রক্ষা কর। হায়! কে পাণ্ডবগণকে উত্তেজিত করিতে সাহস করে! কে নির্ব্বাপিত অনল পুনঃ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দগ্ধ হইতে চায়! অন্যায় উপায় দ্বারা ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিলেও তাহা কদাচ স্থায়ী হয় না।"

অন্ধরাজ উত্তর করিলেন, "দেবী, যদি বংশ নাশ অবশ্য ঘটিবার হয়, তবে কে তাহা নিবারণ করিবে? দুর্য্যোধনেরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে, আমি কি করিব?"

পাণ্ডবেরা রথে চড়িয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছেন, এমন সময় দূত গিয়া উপস্থিত হইল, "বৃদ্ধ রাজা পুনরায় পাশা খেলিতে আহবান করিয়াছেন।"

যুধিষ্ঠির বলিলেন, "কি করিব, জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ। আমার সর্ব্বনাশ হইলেও তাঁহার আজ্ঞা অবহেলা করিতে পারিব না।"

সকলে শকুনির প্রবঞ্চনা জানিয়া শুনিয়া আবার হস্তিনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আবার সেই সভায় প্রবেশ করিলেন। ধূর্ত্ত শকুনি আবার পাশা খেলিতে যুধিষ্ঠিরকে আহবান

করিল। পণের নিয়ম জানাইল। অবিলম্বে খেলা আরম্ভ হইল। ধৃতরাষ্ট্রাদি সকলেই বসিয়া রহিলেন। শকুনি পাশা নিক্ষেপ করিল আর বলিল, "এই আমার জিত", আর অমনি জয়ী হইল। অমনি তাহারা পাঁণ্ডবগণকে সত্য পালন করিতে বলিল। অমনি অজিন আনীত হইল। পাণ্ডবেরা রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া তাহা পরিধান করিলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, "তুমি এই দীন হীন পাণ্ডবগণের সহিত বনে গিয়া কি সুখ পাইবে! কৌরবগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বরণ কর।" সে ভীমকে "গরু গরু" বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল, আর আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, ভীমের গতির অনুকরণ ছলে ত্রিভঙ্গ হইয়া গমন করিতে লাগিল, আর বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ভীম তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমার প্রতিজ্ঞা এই, ত্রয়োদশ বর্ষ পরে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিব, তাহার মস্তকে পদাঘাত করিব। দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্ত পান করিব।"

বিদুর যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "তোমার জননী বৃদ্ধ হইয়াছেন, বনবাস ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে আমার গৃহে রাখিয়া যাও," তিনি সম্মত হইলেন। কিন্তু কুন্তী দেবী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, পুত্রগণের সহিত বনে যাইতে জেদ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

বিদুর সেই সভায় পাণ্ডবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পুত্রগণ, কেহ অন্যায় রূপে পরাজিত হইলে দুঃখিত হয় না। তোমরা কোন অবস্থাতেই নিরানন্দ, নিরুৎসাহ হইও না। কোন অবস্থাতেই কর্ত্তব্য করিতে ভুলিও না। মনে রাখিবে, যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়।"

রাজা যুধিষ্ঠির তখন সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমরা আজ পিতামহ, আচার্য্য, জ্যেষ্ঠতাত, পিতৃব্য, দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ সকলের নিকটেই বিদায় লইতেছি। আবার দেখা হইবে।"

তখন পাণ্ডবেরা বনবাসে বহির্গত হইলেন। আর দ্রৌপদী? অশেষ দুঃখ দুর্গতির মধ্যেও যদি স্বামীগণকে সুস্থ ও সুখী করিতে পারেন, এই আশায়' তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। নগরবাসীরা তাঁহাদের জন্য অশ্রুপাত ও ধৃতরাষ্ট্রাদির বহু নিন্দা করিতে করিতে বহুদূর অনুগমন করিল। পরে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে ফিরিয়া আসিল।

পাণ্ডবেরা প্রস্থান করিলে সঞ্জয় ধৃতরষ্ট্রকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি পাণ্ডবগণকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছেন, সমুদয় ভারতবর্ষের একাধিপত্য লাভ করিয়াছেন, এখন পুত্র পৌত্রগণের সহিত আনন্দ করুন।" কিছুকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "হায়, আপনি আজ পাপ পুত্রের কথায় যে কীর্ত্তি করিলেন, তাহার পরিণামে সমুদয় ভারতবর্ষ উৎসন্ন হইবে।"

বিদুর বলিলেন, "হায়! দুর্য্যোধন আজ যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিল, তাহার ফল চতুর্দ্দশ বর্ষে ভোগ করিবে।" কিছুকাল নীরব থাকিয়া পরে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "রাজন্, সকলেরই চক্ষু আছে, তবে লোকে কাহাকেও দূরদর্শী, কাহাকেও অদূরদর্শী বলে কেন?

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পাখীর কথা—শ্রীসত্যচরণ লাহা, এম, এ, বি এল প্রণীত হৃষীকেশ সিরিজ, নং ২। খুব ভাল কাগজে ছাপা। ২৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; ভাল কাপড়ের মলাটে বাঁধা, ও সোণার জলে নাম ছাপা। বইখানিতে কয়েকখানা ভাল ছবি আছে। মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা।

বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর বই এই নূতন, এই নূতনত্বের জন্যও বটে, আর গ্রন্থের গুণের জন্যও বটে, এখানির বিশেষ সমালোচনা প্রয়োজন। গ্রন্থের সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে গ্রন্থকার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। কলিকাতার লাহা মহাশয়েরা ধনী বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ; ইঁহাদের মধ্যে বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছি। সে কালের বড়মানুষেরা শুধু আপনাদের খেয়ালে পাখী পুষিতেন আর বুলবুলের লড়াই-এর জন্য অনেক ব্যয় করিতেন। কৃতবিদ্য গ্রন্থকার পাখী পুষিয়া তাহার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় নিবিষ্ট। এই বংশের আর একজন কৃতী যুবক, অর্থশাস্ত্র, পুরাতত্ত্ব, প্রভৃতির আলোচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। শুভদিন আসিয়াছে।

গ্রন্থখানির দোষের অংশ চাঁদের কিরণে কলঙ্কের মত ডুবিয়া গিয়াছে; তবে এ শ্রেণীর বই নূতন বলিয়া, আর ভবিষ্যতে সুযোগ্য লেখক দোষটুকুর দিকে তাকাইবেন মনে করিয়া, প্রথম ক্ষুদ্র দোষের কথাই বলিতেছি। এ শ্রেণীর বইয়ের ভাষা, সরস হওয়া উচিত; খাঁটি বিজ্ঞানে হউক আর বৈজ্ঞানিক বর্ণনাতেই হউক, সরল ভাষায় বই রচনা করাই ইউরোপের পদ্ধতি। সৌন্দর্য্যের বর্ণনাতেও সংস্কৃত শব্দের অতিরিক্ত প্রয়োগে বর্ণনা মনোরম হয় না; পদ-যোজনাটা কোন রচনাতেই জটিল করা চলে না। গ্রন্থকার একস্থানে লিখিতেছেন;—"এইবার পথিমধ্যে গৃহবলভিতে সুপ্ত পারাবত ও অম্ভোবিন্দুগ্রহণ-চতুর চাতকের উপর কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক আলোকরশ্মি নিপাতিত করিয়া সঞ্চরমান মেঘদূতকে অলকার পথে বিদায় দিয়া, আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।" এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়; আশা করি, গ্রন্থকার তাহার রচনারীতিকে আদর্শ করিবেন।

গ্রন্থকার নিজে নানা জাতীয় পাখী পুষিয়াছেন, পাখীর বাগান করিয়াছেন, আর বৈজ্ঞানিকের চোখে পাখীদের গতিবিধি দেখিয়া, পাখীতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। পাখী সম্বন্ধে এমন বই নাই যাহা তিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া পড়েন নাই, আর নিজের পরীক্ষায় বিদেশীদের পরীক্ষাকে পদে পদে যাচাই করিয়া লইয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কোথায় কোন পাখীর কেমন বর্ণনা আছে, তাহা বিজ্ঞানের বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া প্রাচীন পাখীদের নামের চমৎকার পরিচয় দিয়াছেন। একটা বিষয় লইয়া এমন করিয়া না মজিলে, কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। ভবিষ্যতেও গ্রন্থকারের কাছে আমরা অনেক আশা করি।

চকা-চকীর বিরহ সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহা লইয়া গ্রন্থকার অনেক কথা লিখিয়াছেন। আমি নিজে যাহা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা বলিতেছি। শীতকালে ওড়িষ্যার মহানদীর পাহাড়ে অংশে অনেক ছোট ছোট বালির চড়া পড়ে, আর চড়ায় চড়ায় নানা পক্ষী রাত্রে বাস করে; একজোড়া চকা-চকী একটা চড়ায় ও আর একজোড়া আর একটি কাছের

চড়ায় বসিয়াছে, তাহা সন্ধ্যার সময়ই লক্ষ্য করিয়াছি ; রাত্রে যখন, দুটি চড়া থেকেই চকাদের ডাক শুনিয়াছি, তখন মনে হইয়াছে, যে এক চড়ায় পুরুষ চকা ডাকিয়া উঠিলেই, অন্য চড়ার চকাটি সাড়া দিয়া ডাকে। এপারে ওপারের এই রকম ডাক শুনিয়াই হয়ত কবি কল্পনার সৃষ্টি। দীর্ঘরবে ডাকে চকারা, আর চকীরা সঙ্গে সঙ্গে ঐ ডাকের তাল রাখিয়া যে "কোঁ-কোঁ" করে তাহা হয়ত বৈজ্ঞানিকেরা সহজে বুঝিবেন, কারণ, পাখীদের মধ্যে পুরুষগুলিই কণ্ঠস্বরের খেলা বেশী দেখায়। গ্রন্থকার আমার কথাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

আমরা আনন্দে ও আগ্রহে অনুরোধ করিতেছি, যে পাঠকেরা এই গ্রন্থখানি পড়িবেন। *

ঝড়ের দোলা—৮৮ বি হাজরা রোড হইতে ফোর আর্টস ক্লাব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৮০ বার আনা। ছাপা ও কাগজ ভাল। ক্রাউন অষ্টাংশিত ৯৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

এই বইখানিতে চারিটি গল্প আছে। (১) 'পাগল' শ্রীসুনীতি দেবী কর্ত্তৃক লিখিত ; (২) 'মাধুরী'– শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক রচিত ; (৩) 'শ্রীপতি'—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসুর রচনা ; 'জয়মালা'র রচয়িতা শ্রীদীনেশরঞ্জন দাস।

ছোট ছোট গল্পের এই বইখানি, একদিকে গল্পগুলির মধুরতায়, আর অন্যদিকে রচনার সুকৌশলে, মনোহর হইয়াছে। রচনা-কৌশলের একটু নূতনত্ব এই, যে সাজাইয়া গুজাইয়া গোড়া বাঁধিয়া, গল্পের আখ্যান আরম্ভ করা হয় নাই, তবুও প্রথম ছত্র পড়িবা মাত্রেই গল্পের রস অনুভব করা যায়। ছোট গল্পের পক্ষে এই কৌশল বড় প্রশস্ত। লেখাগুলিতে কোথাও বাজে কথার বোঝা নাই, অথবা একটা বর্ণনার নামে কথা ফুলান নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দুই চারিটি কথা।

সরকার পক্ষ হইতে বলা হয় যে অসহযোগীদের ভীতিপ্রদর্শনের ফলেই ১৭ই নবেম্বর হরতাল হইয়াছিল। এবং সেই ভীতি জনসাধারণের মন হইতে আপনোদনের জন্য, সরকার সভাসমিতি ও স্বেচ্ছাসেবকদলকে বে-আইনি ঘোষণা করিয়া শান্তিপ্রিয় ও ভদ্র সার্জ্জেণ্ট ও গোরাদিগকে রাস্তায় রাস্তায় দাঁড় করাইয়া দিলেন। মনে রাখা উচিত যে স্বেচ্ছাসেবকেরাই নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া চাঁদপুরে বিসূচিকাগ্রস্ত কুলীদিগের মধ্যে কাজ করিয়াছিল! এই সকল বীরহৃদয় পরদুঃখকাতর যুবকদের সৎকর্ম্মগুলি একেবারে উড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে গুণ্ডার সামিল করিয়া দেওয়া হইল। ফলে তাহারা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রকাশ্য ভাবে আপনাদিগকে স্বেচ্ছাসেবক বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে জন্য অত্যন্ত নম্রতা ও ভদ্রতার সহিত পুলিশ তাহাদিগকে সরকারী-গৃহে স্থান দিতে লাগিল। এই নম্রতার চরম হইল হেরম্ব বাবুর সহিত গোরাপল্টনের ব্যবহারে! সে কথা যাউক, কিন্তু ১৭ই তারিখের হরতালের সহিত ২৪ শে ডিসেম্বরের তুলনা কোথায়? পূর্ব্ব তারিখে গাড়ী বন্ধ, দোকান হাট বন্ধ, রাস্তায় আলোর অভাব। ২৪শে তারিখেও তাহাই, অথচ ১৭ই তারিখে স্বেচ্ছাসেবকগণ বাহির হইয়াছিল, ২৪শে তারিখে স্বেচ্ছাসেবক বাহির হয় নাই। এই পার্থক্যটি মনে রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ১৭ই তারিখে যুবরাজ কলিকাতায় আসেন নাই, ২৪শে তারিখে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন। পূর্ব্বে যুবরাজের পিতা যখন আসিয়াছিলেন, তখন পুলিশের রুলের গুঁতা ও গোরার চাবুক খাইয়াও লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে ব্যগ্র হইত। এবার কয় সহস্র

লোক গিয়াছিল? হরতাল শুধু কলিকাতায় হয় নাই, সমগ্র বঙ্গদেশময় হইয়াছে। স্বীকার করিতেই হইবে যে, অসহযোগীগণ দলে কমই হউন বা বেশীই হউন সাধারণ লোকে তাঁহাদের কথা শুনিয়া চলিতে ইচ্ছুক—তাঁহারা ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন। বুঝা যাইতেছে যে সরকারের প্রতি সাধারণের আর শ্রদ্ধা নাই। গত এক বৎসরের মধ্যে চাঁদপুরের ঘটনা, দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ও ১০৮ প্রভৃতি ধারায় গবর্ণমেণ্ট ন্যায় বিচারের নামে যে অবিচার করিয়াছেন তাহার ফলেই লোকের মন এরূপ বিমুখ হইয়া উঠে নাই কি? বিশিষ্ট, পরোপকারী, শিক্ষিত ও দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ নানা অজুহাতে অত্যাচারিত ও জেলে প্রেরিত হইয়াছেন। তাহার ফলে লোকের মনে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন না। সরকার যেন ভুলিয়া না যান যে যদিও দেশের সকলেই এখনও অসহযোগী নহে, তাহাদের মন অসহযোগের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ও এইরূপ দমননীতি চালাইতে থাকিলে সকলেরই অসহযোগী হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

সিটিকলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় সমগ্র বাঙ্গালার প্রতিনিধি হইয়া গোরার আক্রমণের প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিলেন। গোরা তাঁহাকে অপমান করিয়া শুধু তাঁহাকেই নহে সমগ্র বাঙ্গালা দেশকে অপমানিত করিয়াছে। হেরম্ব বাবুকে লাট সাহেব বলিয়াছেন, "আর এরূপ ঘটিবেনা।" আর কি ঘটিবে না? হেরম্ব বাবুর প্রতি অপমান, না সমগ্র দেশবাসীর প্রতি অপমান? এবিষয়ে হেরম্ব বাবু নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছেন কি? পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহে এই আশ্বাসের মূল্য রহিয়াছে কি?

তাহার পর সার হেনরী হুইলার যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা কাটা ঘায়ে নূনের ছিটা। অসহযোগীগণ প্রহারের বদলে প্রহার দিবে না জানিয়াই গোরাপল্টন বীরত্ব প্রকাশ করিতে সাহসী হয়। ইংরাজী মুখপত্র "ইংলিশম্যান" বলেন The military were chasing peaceful citizens" এবং ইহার বিরুদ্ধেই মৈত্র মহাশয় প্রতিবাদ করেন। হুইলার সাহেব নাকি আভাস দিয়াছেন যে বিলাতে ঐরূপ করিলে মৈত্র মহাশয়কে গ্রেপ্তার করা হইতে পারিত; জিজ্ঞাসা করি, বিলাতে মিলিটারী ঐরূপ করিতে সাহস পাইত কি? আর যদি করিত এবং যদি মৈত্র মহাশয়ের মত পদস্থব্যক্তি ঐরূপে অপমানিত হইতেন তাহা হইলে বিলাতের "mob" কি করিত? কি করিত তাহা আমরাও জানি, সার হেনরীও জানেন।

এবার কংগ্রেসের বিবরণ পড়িলে দেখা যায় যে অন্যান্য বৎসর হইতে এবার কংগ্রেসে কথার ধূম কম। বক্তৃতা অপেক্ষা কার্য্যের প্রতি সভ্যগণ বেশী মনোযোগী হইয়াছেন। কংগ্রেস হজরত মহানীর প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া, কংগ্রেসের স্বরাজের ক্রীড্ (creed) অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভালই করিয়াছেন। দেশের লোককে যে কাজের জন্য আহ্বান করা হইবে, সে কাজের জন্য সমগ্র জনসঙ্ঘ প্রস্তুত না হইলে, কেবল বিপদ ডাকিয়া আনা হয়, উদ্দেশ্য সফল হয় না। কংগ্রেস হইতে এবার দেশের সর্ব্বসাধারণকে, সকল রকম মতাবলম্বীকেই দেশের কাজে আহ্বান করা হইয়াছে। লক্ষ্য যখন এক, তখন কার্য্য পদ্ধতির সামান্য পার্থক্য ভুলিয়া একত্র কাজ করিবার সুযোগ সকলকে দান করিয়া কংগ্রেস বিশেষ উপকার করিয়াছেন। জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে সরকারের বিফল চেষ্টায় ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, বিভিন্ন পন্থীদের মতের পার্থক্যগুলি ক্রমশঃ দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া সকলে একযোগে কাজ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার আভাস আমরা নরমপন্থীদের এলাহাবাদে বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির বক্তৃতায় পাইতেছি।

বেতাল।

স্বরাজ।

(২৪)

কোনও রাষ্ট্রের সকল অধিবাসী,—কি ধনী, কি দরিদ্র, কি পুরুষ, কি স্ত্রী,—সকলে তথায় তাহাদের রাষ্ট্রীয় বৃত্তির সম্যক বিকাশের সুযোগ পাইবে ইহা সুনিশ্চিত হইলে, তবে বলা চলে যে সে রাষ্ট্রের লোক স্বয়ং-শাসনের (Self-government) অভিমুখে যাইবার জন্য প্রশস্ত সুগম পথে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। অরাজক সমাজের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি যে যাঁহারা সাম্যবাদী অথচ শাসন-মূলক রাষ্ট্র (State) চাহেন না, যাঁহারা শক্তিমূলক শাসন (Government) চাহেন না, যাঁহারা বলেন যে কোনও দেশে মানব সমাজে তথাকার জনসমষ্টির মতের প্রাধান্য থাকিবে না কিন্তু প্রত্যেকের জীবনে স্বীয় স্বীয় বিবেকের আধিপত্য থাকিবে, তাঁহাদের মতে সমাজ গঠিত হইলে সে সমাজে পৃথক্ সম্পত্তি (Private Property) থাকিবে না, মূলধন বা সুদ থাকিবে না, উত্তরাধিকার (Inheritance) থাকিবে না, বিচারালয় থাকিবে না, কারাগার থাকিবে না, পুলিস বা সৈন্য থাকিবে না। সে সমাজে অধিকার বা দায়িত্ব নির্দ্দেশ ব্যাপার খুব সহজ হইয়া পড়িবে। অধিকার বা দায়িত্ব মানাইবার জন্য শাসনযন্ত্রের প্রয়োজন থাকিবে না। তাঁহাদের মতে, স্বরাজ বলিতে অধিকাংশের মতানুযায়ী শাসন বুঝাইবে না, স্বরাজের অর্থ সর্ব্ববাদীসম্মত শাসন বা সমাজে শাসনের অভাব। মানব সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় কোনও দেশে এরূপ স্বরাজ সম্ভব নহে বলিয়া, রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র চালাইতে হইবে ইহা মানিয়া লইয়া, আমাদের রাষ্ট্রে সকল লোকের রাষ্ট্রীয় বৃত্তির সম্যক্ বিকাশের আয়োজন কতদূর করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা করিব।

শাসন নীতি নির্দ্দেশের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা শুনিয়াছি যে মূলতঃ শাসন নীতি নির্দ্দেশ ব্যাপারটী অধিকার ও দায়িত্ব নির্দ্দেশ। এক রাষ্ট্রের ভিতরে রামের অধিকার ও শ্যামের দায়িত্ব স্থির করিতে হয়। এক শ্রেণীর অধিকার নির্দ্দিষ্ট করিতে গিয়া অপর শ্রেণীর দায়িত্ব স্থির করিয়া দিতে হয়, যেমন প্রজা ভূম্যধিকারীর বা উত্তমর্ণ অধমর্ণের অধিকার বা দায়িত্ব। আবার ইহাও দেখিয়াছি যে, যে শ্রেণীর দায়িত্ব আছে তাহারই আবার অবস্থা বিশেষে অধিকার আছে, নতুবা রাষ্ট্র টেঁকেনা। এখানেও কিস্তির পর কিস্তি; আবার পাল্টা কিস্তির ব্যবস্থা (Check and balance system)। এই যেমন বলিলাম একই রাষ্ট্রের ভিতরে বিভিন্ন শ্রেণীর অধিকার ও দায়িত্ব নির্দ্দেশের কথা; তেমনই আবার এক রাষ্ট্র ও অপর রাষ্ট্র, এ দুইয়ের ভিতরেও অধিকার ও দায়িত্ব নির্দ্দেশের জটিল ব্যাপার রহিয়াছে। এক রাষ্ট্রের যাহা অধিকার (Rights) তাহা অপর রাষ্ট্রের দায়িত্ব (Dutes)। আবার দায়ী রাষ্ট্রেরও অধিকার আছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র সকলের পরস্পরের অধিকার ও দায়িত্ব নির্দ্দিষ্ট করিবার সময় আপোষে আলোচনা করিয়া তাহা স্থির করিতে হয়। অধিকার স্থির করিবার সময় আপোষে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিলে, কর্ম্মীর রণম্। অনেক সময় ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পরস্পরের

মধ্যে অধিকার ও দায়িত্ব স্থির নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তবুও সে নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে এক রাষ্ট্র নারাজ ও সেই জন্য দুই রাষ্ট্রে রণ বাধিয়াছে। রণে নিযুক্ত রাষ্ট্র সমূহের রণসম্পর্কে পরস্পরের অধিকার ও দায়িত্ব স্থির করিতে হয়। আবার রাষ্ট্রগুলি যখন পরস্পর বন্ধুভাবে শান্তিতে বাস করে তখনও উপনিবেশ বা সীমান্ত প্রদেশের লোক বা জমি, আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধায়োজন, বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে রাষ্ট্র সমূহের অধিকার ও দায়িত্ব স্থির করিতে হয়। এই যে সব অধিকার বা দায়িত্ব নির্দ্দেশের কথা বলিলাম, ইহা লইয়াই ব্যবহার বা আইন।

প্রাচীন কালে একসময়ে যাহা ছিল প্রথা (custom) পরে তাহা হইল ব্যবহার বা আইন (Law)। ব্যবহার বা আইন মানাইবার জন্য রাষ্ট্রের শাসন। প্রথা মানাইবার জন্যও সমাজের শাসন ছিল। কোনও প্রথা আমাদের দেশে কে প্রথমে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে তাহা বলা কঠিন। প্রথার সৃষ্টি কর্ত্তা বা প্রবর্ত্তক ও যাহারা প্রথা মানিয়া চলে বা না মানিবার দরুণ সমাজে শাস্তি পায়, ইহারা সমসাময়িক নহে। প্রথা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আর্য্যগণ প্রধানতঃ নিজেদের সমাজের প্রাচীন প্রচলিত প্রথা মানিয়া চলিতেন। সেই প্রথানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট অধিকার ও দায়িত্ব তাঁহারা মানিতেন। আবার অনার্য্য ভারতবাসীদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা আর্য্য প্রথা হইতে ভিন্ন হইলেও, এমন কি অনার্য্য প্রথাগুলিকে হেয় জ্ঞান করিলেও, কালক্রমে আর্য্যগণ অনেক অনার্য্য প্রথা আর্য্যসমাজে প্রচলিত করিয়া নিয়াছিলেন। আর বিজিত অনার্য্যগণ কালক্রমে বিজেতা গর্ব্বিত আর্য্যদিগের প্রথা নিজ সমাজে মানিয়া নিয়া আর্য্যসমাজের নিম্নতম শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইত। কিন্তু আর্য্যপ্রথাই বল, অনার্য্যপ্রথাই বল, যে জনসাধারণ এই সব প্রথা মানিয়া চলিত, বা না মানিবার দরুণ সমাজে শাস্তি পাইত, তাহাদের শতকরা নিরানব্বই জনের এই সব প্রথা সৃষ্টি বা প্রবর্ত্তন ব্যাপারে কোনও হাত ছিল না। তাহাদের অধিকার (rights) ও দায়িত্ব (duties) ঐ সকল প্রথানুসারে নির্দ্দিষ্ট হইত বটে; কিন্তু সে অধিকার ও দায়িত্ব নির্দ্দেশ ব্যাপারে তাহাদের মত বা অমতে বড় একটা আসিয়া যাইত না।

প্রাচীন প্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তন হইত না, এমন কথা বলিতেছি না। কি পরিবর্ত্তন হইবে, পুরাতন প্রথা কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া সমাজে নূতন আকারে প্রচলিত হইবে তাহা সে কালে কে স্থির করিয়া দিত? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোনও কোনও দেশে পুরোহিত দলপতি বা পুরোহিত-রাষ্ট্রপতি তাহা স্থির করিয়া দিতেন। কোনও কোনও দেশে বা দলপতি বা রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে নায়ক-পিতৃগণ সকলে মিলিত হইয়া আলোচনা ও বিচারের পর তাহা স্থির করিয়া দিতেন। অপরাপর প্রাচীন দেশে যেমন, আমাদের দেশেও ধর্ম্ম বলিতে তখন মানুষের সমগ্র জীবনের প্রায় প্রত্যেক ব্যাপার বুঝাইত। আমাদের দেশে প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য প্রথা বা সদাচার তখন ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত ও অধীন ছিল। কালক্রমে নির্দ্দিষ্ট প্রথাগুলি আমাদের দেশে ধর্ম্মসূত্র ও পরে ধর্ম্মশাস্ত্র আকারে, শাস্ত্রালোচনার অধিকারী ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন ও আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাহার বিচার করিবার অধিকার সকলের ছিল না। তখনকার আর্য্যসমাজের বাহিরের বিজিত অনার্য্যগণের কথা ছাড়িয়া দিই; আর্য্যসমাজভুক্ত সর্ব্ব সাধারণের অতি ক্ষুদ্রাংশের সে অধিকার ছিল।

যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন বা আলোচনা করিবার অধিকারী ছিল না, তাহারা প্রথা পরিবর্ত্তনের কথাও বড় একটা তুলিতে পারিত না। ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় যাহাদের অধিকার ছিল না তাহারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রথার ব্যতিক্রম প্রচার করিলে, সেই প্রচারিত পরিবর্ত্তন সমাজে সদাচার বলিয়া গণ্য হইত না; প্রথমতঃ তাহা ব্যভিচার বলিয়া নিন্দিত হইত। পরে হয়ত কোনও কোনও স্থলে সেই নবপ্রচারিত পরিবর্ত্তনের সমর্থক পরিব্রাজক জ্ঞানীগণ বিভিন্নদেশ পর্য্যটনকালে সেই সকলদেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সেই নূতন মত প্রচারিত করিতেন ও পরে তাঁহাদের মতানুসরণ করিয়া অপর তীর্থপর্য্যটকগণ সেই নবপ্রচারিত পরিবর্ত্তন দেশবিদেশে ছড়াইয়া দিত। এইরূপ প্রচারের ফলে হয়ত বা কোনও কোনও দেশে বা সম্প্রদায়ে সেই পরিবর্ত্তিত প্রথা প্রচলিত হইত, কোথাও বা হইত না। কিন্তু সাধারণতঃ এই প্রথা পরিবর্ত্তনের অধিকার কয়জনের ছিল? বিজিত, সমাজ বহির্ভূত অনার্য্যগণের ত ছিলই না; সমাজভুক্ত অনার্য্য বা আর্য্যদের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যক লোকই ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন বা আলোচনা করিবার অধিকারী ছিল। আবার শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকারী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সকলে কিছু গুরুগৃহে ধর্ম্মসূত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত না। যাঁহারা সুপণ্ডিত গুরুর নিকট ধর্ম্মসূত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন তাঁহাদের মধ্যে কোনও কোনও মেধাবী তেজস্বী তীক্ষ্ণধী শাস্ত্রবিৎ স্বীয় স্বতন্ত্র মত ঘোষণা করিতেন ও পরে তাঁহাদের অনুগামী পরিব্রাজক ও পর্য্যটকদিগের সাহায্যে তদীয় স্বতন্ত্র মত সাধারণ জনসমাজে প্রচারিত হইত। দলপতি বা রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে তখন প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া সমাজে প্রচলিত হইত। আবার প্রশ্ন করিতেছি, সেকালে প্রথা পরিবর্ত্তন ব্যাপারে, পরিবর্ত্তিত প্রথানুযায়ী বিভিন্নশ্রেণীর অধিকার ও দায়িত্ব নির্দ্দেশ ব্যাপারে, দেশের সমগ্র অধিবাসীর কয়জনের হাত থাকিত? প্রথাই বল, আর ব্যবহারই বল, চাণক্যোক্ত ধর্ম্ম-ব্যবহার-চরিত্রই বল, আর মানবশাস্ত্রোক্ত শ্রুতি-স্মৃতি-সদাচারই বল—সেকালে দায়িত্ব ও অধিকার নির্দ্দেশ ব্যাপারে দেশের সমগ্র অধিবাসীর মত বা অমত তেমন প্রণিধানযোগ্য বিষয় ছিল না। বিভিন্ন জনপদের যে জন কয়েকের মত হইলে সমগ্র অধিবাসী কালক্রমে নূতন প্রথা বা ব্যবহার বা আইন মানিয়া নিত সেই জন কয়েকের মত বা অমত ছিল, সেকালে প্রণিধানযোগ্য বিষয়। সত্য বটে, সেই জন কয়েকের নূতন মত গড়িয়া তুলিয়া সর্ব্ব সাধারণের নিকট তাহা আদৃত করাইতে সময় লাগিত। সুধী সমাজে নূতনপ্রথা প্রবর্ত্তন ও জনসাধারণের মধ্যে তাহা প্রচলন—এ দুইই সময় সাপেক্ষ ছিল। কিন্তু দায়িত্ব ও অধিকারের নূতন নির্দ্দেশ জনসাধারণের হাতে ছিল না। তাহা ছিল মাত্র জনকয়েকের হাতে। সত্য বটে, সেই দায়িত্ব ও অধিকার নির্দ্দেশ ব্যাপার, "ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক" উপাধিভূষিত প্রবল প্রতাপান্বিত, উদ্যত দণ্ড রাজার মতামতের উপরও তেমন নির্ভর করিত না। কিন্তু জনগণ বা তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দায়িত্ব ও অধিকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিত না, ইহাও নিশ্চিত। অনেকস্থলেই দায়িত্ব ও অধিকার নির্দ্দেশ ব্যাপার তৎকালীন আদর্শের অনুরূপ ও জনগণের হিতার্থ সুসম্পন্ন হইত। কিন্তু জনগণদ্বারা কিম্বা তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদ্বারা দায়িত্ব ও অধিকার নির্দ্দেশ ব্যাপার সম্পন্ন হইত না। শাসননীতি

নির্দ্দেশ জনগণের বা তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ছিল না। রাষ্ট্রের সকল লোকের রাষ্ট্রীয় বৃত্তির সম্যক্ বিকাশের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে, ইহা প্রাচীনকালের আদর্শ নহে।

(২৫)

আধুনিক আদর্শ কি তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জনগণেরই হিতার্থ জনগণদ্বারা জনগণের শাসন। শাসন ও পোষণ দুইই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য ইহাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সমগ্র জনগণদ্বারা শাসন ও পোষণ কর্ত্তব্য কিরূপে হইতে পারে? সমগ্র জনগণ সহযোগিতা দ্বারা শাসন ও পোষণ কার্য্য সুসম্পন্ন করাইতে পারে বটে। কিন্তু রাষ্ট্রের শাসন ও পোষণোপযোগী যন্ত্রটীত সমগ্র জনগণের হাতে চালাইবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া চলে না। বিশেষতঃ যতদিন রাষ্ট্রের বাহিরে শত্রু আছে ও সেই শত্রু সুযোগ পাইলে রাষ্ট্রের বিনাশ সাধনে প্রস্তুত, যতদিন রাষ্ট্রের ভিতরে ও রাষ্ট্রের বাহিরে মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত শিকার প্রবৃত্তিটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে অক্ষম, ততদিন শাসন যন্ত্রটী এমন হওয়া চাই যে প্রয়োজন হইলেই অল্প কয়েকজনের সম্মতিতে যন্ত্রটী পূর্ণবেগে চালান যাইতে পারে। আত্মরক্ষার জন্য যতটা বল বা শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক, ততটা বল বা শক্তি চালকের ইচ্ছামত ও অবিলম্বে যাহাতে ঐ যন্ত্র হইতে পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা চাই-ই চাই। এক কথায় রাষ্ট্রশক্তি সমবেত, সুসংবদ্ধ, একলক্ষ্য ও এক কেন্দ্র হইতে চালিত হওয়া চাই (centralised organisation)। নতুবা রাষ্ট্র ও শাসনের অস্তিত্বের সার্থকতা থাকে না। প্রাচীনকালে য়ুরোপে ও এশিয়াতে সময়ে সময়ে কতকগুলি ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্র দেখা দিয়াছিল। সে সকল রাষ্ট্রের জনগণ অল্প পরিসর স্থানে বাস করিত। প্রয়োজন হইলে সে সকল রাষ্ট্রের জনগণ দুই চারি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে একত্র হইয়া তাহাদিগের সমিতির নির্দ্ধারণ স্থির করিতে ও তদনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিতে পারিত। য়ুরোপে এথেন্স্, স্পার্টা ও রোম একসময়ে এইরূপ নগর-রাষ্ট্র (city-state) ছিল। চীনদেশে ও আমাদের দেশেও এইরূপ নগর-রাষ্ট্র ছিল। এইসব ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রে সমগ্র জনগণ দ্বারা শাসননীতি নির্দ্দেশ ও নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য সম্ভবপর ছিল। সম্ভবপর ছিল বলিয়া তথায় বস্তুতঃ সমগ্র জনগণের হাতে শাসনযন্ত্র ন্যস্ত ছিল, এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, ঐ সকল রাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে হেলট্, প্লীবীয়ান্, দাস, অনার্য্য প্রভৃতির সংখ্যা বড় কম ছিল না। কিন্তু যে সকল রাষ্ট্র আয়তনে বড়, তাহাদের শাসনযন্ত্র সমগ্র জনগণের হাতে রাখা একেবারেই চলে না। পৃথিবী হইতে যুদ্ধ সম্ভাবনা যতদিন দূর না হইবে, ততদিন সমগ্র জনগণ দ্বারা বড় রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র চালাইবার প্রস্তাব আকাশ কুসুমের ন্যায় কল্পনার বিষয় মাত্র থাকিবে। বৃহদায়তন রাষ্ট্রের জনগণের রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের উপায়, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা (Representative) শাসন নীতি নির্দ্দেশ ও তদনুযায়ী কার্য্যের পরিদর্শন। জনগণদ্বারা শাসন সে স্থলে অসম্ভব। জনগণ-প্রতিনিধি দ্বারা শাসন (Representative Government) সম্ভব। শাসননীতি নির্দ্দেশ ও শাসনকার্য্য পরিদর্শন সেস্থলে

থাকে প্রতিনিধির হাতে। জনগণের হাতে থাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার (Vote)। সংবেত, সুসংবদ্ধ, একলক্ষ্য রাষ্ট্রশক্তিকে এক কেন্দ্র হইতে পরিচালিত করিবার ভার কোটী লোকের হাতে না দিয়া কয়েকশত প্রতিনিধির হাতে দেওয়া হয়। আর সেই কয়েকশত পরিচালক প্রতিনিধিকে নির্ব্বাচিত করিবার অধিকার (Vote) দেওয়া হয় কোটী লোকের হাতে। আর প্রতিনিধিগণ যাহাতে নির্ব্বাচকদিগের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে তাহার জন্য নির্ব্বাচকদিগের নিকট প্রতিনিধিগণকে দায়ী রাখা হয় (Responsible)। প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচকদিগের মতানুযায়ী কার্য্য না চালাইলে, উপযুক্ত সময়ে নির্ব্বাচকগণ তাহাদের প্রতিনিধিদিগকে পদচ্যুত করিতে পারে। পুরাতন প্রতিনিধিকে তাড়াইয়া নূতন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে পারে। এইরূপ শাসন ব্যবস্থা ঠিক জনগণ দ্বারা শাসন নহে, ইহা প্রতিনিধি দ্বারা শাসন (Representative Government)। আর প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচকদিগের নিকট জবাবদিহি থাকে বলিয়া, শাসক সম্প্রদায় জনগণের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকে বলিয়া এই শাসন-পদ্ধতিকে বলে (Responsible Government) দায়িত্বপূর্ণ শাসন। শাসনের জন্য পরিণামে কৈফিয়ৎ দিবার দায়িত্ব জনগণের নিকট।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জনসমাজে সাম্য সংস্থাপনের চেষ্টায় বল বা শক্তির (Force) স্থানে ব্যবহার বা আইনের (Law) প্রাধান্য সমাজের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ; কিন্তু আইন এ সম্পর্কে সভ্যতার শেষ বা সর্ব্বোচ্চ সোপান নহে। এ স্থলে বলিতেছি যে রাজার (King) ও রাজসভার (Court) শাসন অপেক্ষা নির্ব্বাচিত দায়ী প্রতিনিধি দ্বারা শাসন (Responsible and Representative goverment) মানবমনের অধিকতর তৃপ্তি সাধন করে বটে; কিন্তু ইহাও রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশ চেষ্টার শেষ কথা নহে। এখানেও "মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" ব্যবস্থা।

কয়েকটি কথা বলিলেই বিষয়টি সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমতঃ তোমার ও আমার প্রতিনিধি শাসন-যন্ত্র চালাইলেই যে তুমি ও আমি শাসন যন্ত্র চালাইলাম তাহা নয়। শাসন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিলে প্রতিনিধির রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের ব্যবস্থা হইল বটে, কিন্তু তোমার ও আমার রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের তেমন সুবন্দোবস্ত হইল, এরূপ বলা চলে না। সব সময়ে প্রতিনিধি যে তোমার ও আমার মতানুযায়ী শাসন কার্য্য করিবে, তাহারও স্থিরতা নাই। অনেক সময়ে তুমি ও আমি হয় ত খোঁজও রাখিব না, প্রতিনিধি কি করিল বা কি করিল না। আর কাজ হইয়া যাইবার পরে খবর পাইলেও, তোমার ও আমার ঐ কাজে অমত ছিল একথা জানাইলেই যে কাজটির সকল কুফল তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয় এরূপও নহে। এককথায় বলিতে গেলে, প্রতিনিধি দ্বারা শাসন ও স্বয়ং শাসন ঠিক এক নয়। দ্বিতীয়তঃ প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থাটীকে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোনও দেশে দোষ ত্রুটীর সম্ভাবনা হইতে বিমুক্ত করা যায় নাই। আমার মতে হয়ত গোপালবাবু শিক্ষা-বিভাগের বিশেষ কিছুই বোঝেন না, কিন্তু বিচার-বিভাগের এমন সুনিপুণ কর্ণধার তাঁর মত আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সকল নির্ব্বাচকদিগের নির্ব্বাচন কার্য্যের ফলে দেখা গেল যে গোপাল বাবু শিক্ষা-বিভাগ বা বিচার-বিভাগ কোনটীতেই কর্ণধার নিযুক্ত হইলেন না, তাঁহার ভাগ্যে জুটিল সাধারণ-স্বাস্থ্য বিভাগ। অথচ কার্য্যতঃ তিনি

তোমারও প্রতিনিধি, আমারও প্রতিনিধি, আর সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগে শনির অসাধারণ প্রভাব। অনেক স্থলেই তুমি ও আমি নির্ব্বাচিত করিয়া দিই প্রতিনিধিদিগকে, আবার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচন করিয়া দেয় অপর একজনকে এবং সে গিয়া তোমার ও আমার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দেয়। বস্তুতঃ হয় ত সে তোমার বা আমার মনোমত প্রতিনিধি নয়। সাত নকলে আসল খাস্তা। তৃতীয়তঃ, নির্ব্বাচন ব্যাপারটীকে নিখুঁত খাঁটি রাখিবার চেষ্টা প্রায়ই বিফল হয়। প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে গেলেই অর্থ ব্যয়। কিছুটা অর্থ ব্যয় করিতে যে প্রস্তুত নহে সে নির্ব্বাচিত হইবার আশা করিতে পারে না। আমি উৎকোচ দিবার কথা বলিতেছি না। দশ বিশ হাজার নির্ব্বাচকদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে, তাহাদিগকে নির্ব্বাচন প্রার্থীর মত ও চরিত্রের কথা জানাইতে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার কথা বলিতেছি। নির্ব্বাচন ব্যাপারটীকে ধনশালীর প্রতিপত্তি হইতে মুক্ত রাখা প্রায় অসম্ভব। সচ্চরিত্র, সদ্বিবেচক, জ্ঞানী, স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি যদি নির্ধন হন, তাঁহার প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইবার আশা খুবই কম। চতুর্থতঃ, নির্ব্বাচকগণ শুধু রাষ্ট্রের ও দেশের মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া ভোট (Vote) দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতেছে, এরূপ অনেক সময়েই ঘটিয়া উঠে না। হয়ত বা জমিদারের খাতিরে, নয়ত বা উত্তমর্ণের খাতিরে ভোট অনেকে দিয়া থাকে। কেহ বা শুধু আত্মীয়তার খাতিরে অনুপযুক্ত লোককে ভোট দেয়। এইরূপ আরও অনেক কথা বলা যায়। এই জন্য বলিতেছিলাম যে স্বয়ং শাসনের নামে প্রতিনিধিদ্বারা দায়িত্বপূর্ণ শাসনের ব্যবস্থা, "মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" ব্যবস্থা।

প্রতিনিধিদ্বারা শাসন ব্যবস্থার মূলে আর একটি কথা আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহা কোনও রাষ্ট্রের সমগ্র জনগণের মতানুযায়ী শাসন নহে, প্রত্যেকের সম্মতি লইয়া শাসন নহে। অধিকাংশের মতানুযায়ী শাসন হইবে, ইহাই তাহার ভিত্তি। প্রতিনিধিদ্বারা শাসন ব্যবস্থায় অনেক স্থলে কিন্তু অধিকাংশের মতানুযায়ী শাসনও হয় না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্রেও অনেক সময়ে প্রতিনিধিদ্বারা শাসনকার্য্যও অধিকাংশের মতানুযায়ী শাসন নহে। অল্পাংশ অধিকাংশের সহিত একই রাষ্ট্রে বাস করে। তাই বলিয়া অল্পাংশের অধিকার যে একেবারে নগণ্য, তুচ্ছ, এরূপ মনে করিবার কোনও সুযুক্তি নাই। অধিকাংশ যাহা বলিবে অল্পাংশকে সর্ব্বদা সকল ব্যাপারে তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে, এরূপ বিধান হইলে, অল্পাংশের লোকের স্বাধীনতা একেবারে লোপ পায়। রাষ্ট্রের অধিকারের সহিত যেমন প্রজার ব্যক্তিগত অধিকারের সামঞ্জস্য হওয়া প্রয়োজন, তেমনই অধিকাংশের রাষ্ট্রীয় অধিকারের সহিত অল্পাংশের রাষ্ট্র সম্পর্কিত অধিকারের সামঞ্জস্য সাধন চাই। নতুবা রাষ্ট্রপতির অত্যাচারের ন্যায় অধিকাংশের অত্যাচার স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিবে।

আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত শাসন ব্যবস্থা দেখা দিয়াছে তাহার মধ্যে জনগণদ্বারা শাসন বৃহদায়তন রাষ্ট্রে বেশীদিন চলে নাই। আজ যদি ভারতবর্ষ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করে ও বৃটিশ্ সাম্রাজ্যের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হয়, কাল আমরা এই প্রতিনিধি দ্বারা শাসন ব্যবস্থা এদেশে চালাইবার প্রয়াস পাইব। আমরা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই প্রতিনিধি দ্বারা শাসন ব্যবস্থারই শরণাপন্ন হইব। পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি তথাকার জনগণের

রাষ্ট্রীয় বৃত্তি বিকাশের ইহাপেক্ষা প্রকৃষ্টতর উপায় আজ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই। কোনও কালে পাইবে না, একথা আমি বলিতেছি না। শতাব্দীর পর শতাব্দী সংগ্রাম করিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জার্ম্মানী বা অপর কোনও রাষ্ট্র আজও নূতন পথ বাহির করিতে পারে নাই। রুশদেশ নূতন পথে চলিবার দুরন্ত প্রয়াস করিয়াছে। সেও আজ বৈরাজ্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া রাষ্ট্র ও প্রতিনিধিদ্বারা রাষ্ট্রশাসনের ব্যবস্থার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, পথে নর-শোণিতের নদীতে আজও হাবুডুবু খাইতেছে। স্বাধীনতা আজ সেখানে মুমূর্ষু অবস্থায় উন্মুক্ত আকাশও বিশুদ্ধ বাতাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আমরা স্বরাজ সাধনার পথে সবে পা দিয়াছি। সে পথে দেহকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া শুধু মন ও আত্মা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে চলিবে না। আমাদের স্বরাজসাধনার পথে কখনও অসহযোগ, কখনও বিরুদ্ধাচরণ। কিন্তু সহযোগিতা সে পথে নিত্য সাধনার বিষয়। পুঞ্জীকৃত জঞ্জাল দূর করিবার জন্য বিনাশ চেষ্টাও সে পথে চাই; কিন্তু গঠনচেষ্টা তথায় নিত্য কর্ত্তব্য। আত্মনির্ভর সে পথে পরম সম্বল, কারণ আত্মশক্তিবোধ না হইলে সে পথে এক পা অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু হঠকারিতা সে পথে বিষম অন্তরায়। যেমন চাই নিজের শক্তিও পুরুষকারে পূর্ণ আস্থা, তেমনই চাই প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি ও পুরুষকারের পরিমাণ নিরূপণ। জাতীয়তাগঠন তথায় আপাততঃ অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু বিশ্বমানবে প্রেম সে সাধনা হইতে নিরাকৃত হইলে তাহারও শাস্তিভোগ আমাদিগকেই করিতে হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাদ দিয়া বিশ্বমানব নয়। প্রতিদ্বন্দ্বীও বিশ্বমানবের অন্তর্ভুক্ত ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। গঠনের পথ বা বিনাশের পথ, সহযোগের পথ বা অসহযোগের পথ, যে পথেই সাধনা কর সর্ব্বত্র চরিত্রবল চাই। আর চরিত্রবল শুধু সংযম, স্বার্থনাশ, সহিষ্ণুতা, অহিংসা, ধৈর্য্য নহে। স্বাবলম্বন, অধ্যবসায়, শ্রমাভ্যাস, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বিঘ্নসিদ্ধিতে নিপুণতা, দশের সহিত সমবেত উদ্যোগে উৎসাহ, দৈনিক জীবনের প্রতি ক্ষুদ্র ব্যাপারে সততা ও সুশৃঙ্খলা ও সর্ব্বোপরি স্বদেশপ্রেম—এ সকলই চরিত্রবলের উপাদান। শুধু অভাবাত্মক গুণগুলিতে সিদ্ধ হইলে হইবে না। ভাবাত্মক গুণের সাধনা চাই। আর স্বদেশপ্রেম ত শুধু স্বদেশের আকাশ ও বাতাস, ধূলি ও জল, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের প্রতি টান নয়; স্বদেশের মানুষের প্রতি প্রেম। স্বদেশের মানুষের অধিকার প্রতিদিন সম্মান করিতে হইবে। শুধু ধনীর অধিকার নয়, নির্ধনের অধিকারও মানিয়া চলিতে হইবে। শুধু মানীর প্রতি সম্মান নয়, অমানীর প্রতিও সম্মান দেখাইতে হইবে। শুধু পুণ্যবান্‌কে নয়, পাপীকে ভাল বাসিতে হইবে। আমার স্বরাজের আদর্শ যে পদদলিত করিতেছে তাহাকেও প্রেম করিতে হইবে। শুধু অভাবাত্মক "অহিংসা" (Non-violence) সাধনে স্বদেশপ্রেম সাধনা হইবে না। চাই ভাবাত্মক প্রেম (Love) সাধনা। এ বিশাল, মহান্ আদর্শের যোগ্য সাধক কয়জন? আমি ত নই। তবুও "স্বরাজ" "স্বরাজ" বলিতেছি। নিজের নগণ্য ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ না করিয়া পারিতেছিনা। তোমরা দশজন তোমাদের শক্তি নিয়োগ করিলে আমার ন্যায় দুর্ব্বল সেবকও হৃদয়ে বল পাইবে। "নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" ॥

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

উত্তর চরিতের চতুর্থাঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্কে বিষ্কম্ভকে সৌধাতকি ও ভাণ্ডায়ন নামে বাল্মিকীর দুইজন শিষ্য দেখা দিল। সৌধাতকি পাঠে অমনোযোগী, ক্রীড়ায় ব্যসনী, ব্যবহারে দুর্ব্বিনীত আর সর্ব্বত্রই অসংযতবাক্। ভাণ্ডায়ন তাহার বিপরীতই ছিল। বাল্মিকীর উপযুক্ত ছাত্র; কি বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, কি ভদ্রোচিত ব্যবহার, কি সংযত বাক্, কিবা সংযতমধুর বাণী। ভাণ্ডায়নের কথায় জানিতে পারা গেল যে, রাজর্ষি জনক সীতার দুর্ব্বিপাকজনিত দুঃখে বানপ্রস্থাশ্রমে চন্দ্রদ্বীপতপোবনে এতদিন তপস্যায় রত ছিলেন। আর আজ সেই তপোবন হইতে বাল্মিকী আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজর্ষি জনক আজ সীতাশোকে দহ্যমান বনস্পতির অবস্থায় উপনীত। সীতার সে নির্ব্বাসন দুঃখে ব্রহ্মবাদী রাজর্ষির মর্ম্মস্থল ছিন্নবিচ্ছিন্ন। সে শোক সে দুঃখের বিরাম নাই। বশিষ্ঠ ও বাল্মিকীর সহিত সাক্ষাৎ শেষ করিয়া ক্লান্ত রাজর্ষি বাল্মিকীআশ্রমে বহির্বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট। অবসাদে ক্লান্তিতে তাঁহার চক্ষু দুটি অর্দ্ধ মুদ্রিত। সেই মুদ্রিত চক্ষুর উপর সীতার সেই কাঁদ কাঁদ মুখখানি অস্পষ্ট ভাসমান। একে বার্দ্ধক্য তায় দারুণ ব্যথা—তার উপর পরাক শান্তবান প্রভৃতি কঠোর ব্রতপালনের কষ্ট, তথাপি ত দগ্ধদেহের বিনাশ নাই। আত্মঘাতীর গতি অন্ধতামিস্র লোকে,—কাজেই ব্রহ্মবাদী ঋষি স্বেচ্ছায় দেহপাত করিতে পারেন না। অথচ সেই দেহভার আর বহন করাও তাঁহার পক্ষে এখন অসম্ভব।

মনে পড়ে যখন সীতার সেই নির্ব্বাসন দণ্ড, তখন জনকের ধৈর্য্য আর থাকে না। বসুন্ধরাকে পর্য্যন্ত কঠোরা বলিয়া অনুযোগ করিয়া থাকেন। বসুন্ধরে, অগ্নি যাহার পবিত্রতার সাক্ষী, সেই স্বতঃপবিত্রা তনয়ার এই কুৎসিত নির্ব্বাসন মা হইয়া কেমন করিয়া সহ্য করিলে?"

ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ আজ শেষ হইয়াছে। বশিষ্ঠদেব, অরুন্ধতী ও কৌশল্যা-সহ ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রম হইতে যাত্রা করিয়াছেন। সেই পুণ্যশ্রীললামভূতা সীতা নাই। সে রাজলক্ষ্মী অধ্যাসিত রাজ্য নাই। রাজধানী এখন শ্রীহীনা; তথায় আর সুখ নাই; কৌশল্যাদির মনেও শান্তি নাই। বশিষ্ঠদেবের অভিপ্রায় অনুসারে ফিরিবার পথে সকলে বাল্মিকী আশ্রমে উপনীত। আসিয়া দেখেন, রাজর্ষি জনক তথায় উপস্থিত। হায়, কৌশল্যা কেমন করিয়া রাজর্ষি জনকের নিকট মুখ দেখাইবেন! সীতা পরিত্যাগ করিয়া রাম যে কেবল রাজর্ষির মাথায় বেদনা ভার চাপাইয়াছে তাহা নহে, দারুণ অপমানের বোঝাও চাপাইয়াছেন। নিজের পুত্রের এই আচরণে কৌশল্যা বড় লজ্জিতা, বড় দুঃখিতা। রাজর্ষির সাক্ষাতে বাহির হইতে কৌশল্যা চাহেন না। এদিকে বশিষ্ট-দেবের আদেশ, নিজে যাইয়া রাজর্ষি জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তখন অগত্যা কৌশল্যা রাজর্ষির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। কৌশল্যাকে দেখিলে কে বলিবে যে, সেই কৌশল্যা।" দশরথের গৃহের সেই লক্ষ্মী আজ দীনা ভিখারিণীর মত উপস্থিত। সেই মণিমাণিক্য ভূষিতা রাজরাণী বিধবার ভিখারিণীর সাজে সজ্জিতা; অবস্থার কি পরিবর্ত্তন! জনকের

নিকট যে কৌশল্যা একদিন মূর্ত্তিমান্ মহোৎসবের মত ছিল, আর আজ সেই কৌশল্যার দর্শন, ক্ষতে লবণক্ষেপের মত কষ্টকর দাঁড়াইয়াছে। দশরথের মত স্বামীর সেই দুঃখকর মৃত্যু, তার উপর স্বতঃশুদ্ধা সীতার সেই অপমানজনক নির্ব্বাসন কৌশল্যার শরীর মন একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছে। ফলপুষ্পময় রাজোদ্যান আজ শ্রীহীন, আগাছায় পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কৌশল্যার চরণ আর বহে না। কুলগুরুর আদেশ—কৌশল্যা কোনমতে আপনাকে ধরিয়া রাখিয়া যন্ত্রের মত অগ্রসর হইতেছে। হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া দুরু দুরু কাঁপিতেছে। ভিতরের কথঞ্চিৎ রুদ্ধ ব্যথা আজ দ্বিগুণ হইয়া দেখা দিয়াছে। প্রিয়জন দর্শনে ব্যথা প্রবল হইয়া উঠে, ইহাই মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম, কৌশল্যারও তাহাই হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন,

দৃষ্টে জনে প্রেয়সি দুঃসহানি
স্রোতঃ সহস্রৈরিব সংপ্লবন্তে॥

প্রিয়জন সমাগমে দুঃসহ দুঃখ সহস্র স্রোতোধারায় মানবকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কুমার সম্ভবে কালিদাসও বলিয়াছেন—

"স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে"

বহুদিনের বিস্মৃতিতে শোকের উপর যে আবরণ পড়ে, প্রিয়জনের সাক্ষাতে সেই আবরণ দূর হইয়া যায়। আবরণই এখানে দ্বার।

কঠোর কর্ত্তব্যের নিকট নিজের শোক দুঃখ তুচ্ছ করিয়া কৌশল্যা জনকের সাক্ষাতে উপস্থিতা। স্বামীর প্রাণোপম বন্ধু, বৎসা সীতার স্নেহময় পিতা, নিজের পরমাত্মীয় সুহৃৎ, সেই রাজর্ষি জনক কি এই? এই "অনুপস্থিত মহোৎসব" দিনে আমি কিরূপে সম্ভাষিতা হইব—কৌশল্যা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।

রাজর্ষি জনক ভগবতী অরুন্ধতীর নিকট যাইয়া ভূতলনমিত শিরে জগদ্বন্দ্যা উষাদেবীর মত তাহাকে বন্দনা করিলেন। সে বন্দনাটি বড় মধুর। আর তাহাতে অতীত ভারতে উপযুক্ত রমণীর মর্য্যাদা কিরূপ ছিল, তাহার একটি চিত্র পাওয়া গেল।

যথা পূতম্মন্যো নিধিরপি পবিত্রস্য মহসঃ
পতিস্তে পূর্ব্বেষামপি খলু গুরূণাং গুরুতমঃ।
ত্রিলোকী মঙ্গল্যামবনিতল লোলেন শিরসা
জগদ্বন্দ্যাং দেবীমুষসমিব বন্দে ভগবতীঃ॥

লোকে আশীর্ব্বাদ করে ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক। অরুন্ধতী আশীর্ব্বাদ করিলেন "পরংজ্যোতি স্তে প্রকাশতাম্"—সেই পরাজ্যোতি তোমাতে প্রকাশিত হউক।

কঞ্চুকি রাজান্তঃপুরের রক্ষক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাত্র। সেই পুরাকালেও ব্রাহ্মণের দাসত্ব। বাস্তবিক এ অধঃপতন কালিদাস ও ভবভূতির আমলেরই। রাজর্ষি কঞ্চুকিকে আর্য্য সম্বোধন করিয়া তাহার সম্মান, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও মহানুভবতা প্রদর্শন করিলেন, "আর্য্য, প্রজাপাল মাতার কুশল তো?" প্রজাপালনের অনুরোধে যে নিজের স্ত্রীকে, স্বতঃপবিত্রা সীতার মত প্রিয়তমা পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারে, সেই প্রজাপালক রাজার মাতার কুশল তো?

কি মর্ম্মান্তিক উপেক্ষা, কি স্তিমিত? ঔদাসীন্য। ধিকৃত হৃদয় হইতে প্রচণ্ড আত্মার একটি

গৈরিক নিঃস্রাব ফুটিয়া উঠিল। কঞ্চুকির মনে হইল, কৌশল্যার প্রতি ইহা একটি নিষ্ঠুর তিরস্কার দেওয়ার উদ্দেশ্যেই জনকের যে এ উক্তি, তাহা নহে। নিষ্ঠুর পরিহাস বা মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গ করাই তাঁহার যে অভিপ্রায় তাহাও নহে। কঞ্চুকির সেই মামুলী কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টায় জনকের হৃদয়ের জ্বালা আরও বাড়িয়া গেল, আত্মমর্য্যাদা দ্বিগুণ ভাবে ক্ষুন্ন হইল। একদিন সীতাপতি রামচন্দ্রও লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—"উৎপত্তিপরিপূতা" সীতার আবার শুদ্ধি কি"? আর আজ সীতাপিতা জনকও গর্জ্জিয়া উঠিলেন ----

"আঃ কোহয়মগ্নির্ণাম অস্মৎ প্রসূতি পরিশোধনে" সীতাই ত আমার মূর্ত্তিমতি শুদ্ধি, তার আবার শুদ্ধি কি! রাম ত একদিন অপমান করিয়াছে, আবার আজও অপমানিত হ'লেম।

অরুন্ধতী জনকের বিশ্বাসেরই অভিব্যক্তি করিলেন। তারপর সীতার উদ্দেশ্যে একটি করুণ দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার নাসাপুট হইতে উত্থিত হইল। সপ্তর্ষি বরনীয়া জগদ্বন্দ্যা অরুন্ধতী সীতাকে কি ক্ষোভে দেখিতেন, স্নেহের সঙ্গে কি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন, তাহা প্রকাশ পাইল।

বৎসে,

শিশুর্ব্বা শিষ্যা বা যদসি মম তত্তিষ্ঠতু তথা।
বিশুদ্ধেরুৎকর্ষস্ত্বয়ি তু মম ভক্তিং জনয়তি,
শিশুত্বং স্ত্রৈণং বা ভবতু ননু বন্দ্যাসি জগতাং
গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।।

বৎসে (সীতে) শিশুই হও, আর আমার শিষ্যাই হও তুমি আমার যা, তুমি তাই থাক। কিন্তু তোমার পবিত্রতার উৎকর্ষ তোমার প্রতি আমার ভক্তি জন্মাইয়া দিতেছে। শিশুত্বই থাক, আর স্ত্রীত্বই থাক, তবু তুমি জগতের বন্দনীয়া। গুণই পূজার প্রকৃত প্রবর্ত্তক, লিঙ্গও (স্ত্রী পুরুষই লিঙ্গ) নহে, বয়সও নহে।

একদিকে জনকের অন্তঃস্তম্ভিত শোক, স্বতঃউৎসৃত জ্বালার অভিব্যক্তি, আর অন্যদিকে অরুন্ধতীর শান্ত নিরুপদ্রুত স্নেহ, স্নিগ্ধ কোমল শ্রদ্ধার প্রকাশ। একদিকে গৈরিক নদ প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। অপরদিকে বননদী স্নিগ্ধ কোমল ছায়াখানি বুকে করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

কৌশল্যার হৃদয়ে ঘাতপ্রতিঘাত আরম্ভ হইল— তখন কৌশল্যার মনে পড়িল সেই প্রাণ প্রিয়পতি দশরথের কথা। সেই রাজর্ষির সহিত অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধুতা। স্মৃতি পথে জাগিয়া উঠিল সেই শিশুদের কোমল মুখকয়খানি, সেই অতীতের মধুময়ী ছবি। তখন রাজরাণীর সেই কুসুম সুকুমার হৃদয়ে বহুদিনের রুদ্ধ বেদনা উথলিত হইয়া উঠিল। দারুণ দশা বিপর্য্যয় সহ্য করিতে না পারিয়া কৌশল্যা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

রাজর্ষির উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য কোথায় ভাসিয়া গেল। হৃদয়ের যে উষ্ণ জ্বালা অকস্মাৎ যেন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। তখন রাজর্ষির চিন্তাস্রোত অন্যখাদে বহিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ দশরথ কি ছিলেন? দ্বিতীয় হৃদয়, মূর্ত্তিমান আনন্দ, প্রাণ ধারণের ফল, না আর কিছু ছিলেন শরীর, জীবন—না—তাহা হইতেও প্রিয় কিছু ছিলেন। সেই দশরথের প্রাণ প্রিয়তমা, আমার সেই প্রিয় সখী যে এই। যাহাদের ভালবাসার আমি সঙ্গী ছিলেম, আনন্দের অংশভাগী

ছিলেম, আর প্রণয় কোপেও যাহাদের মৃদুভর্ৎসনার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেম,—সেই প্রিয় সখী কৌশল্যার প্রতি কি নৃশংস ব্যবহারই না করিলাম।

কৌশল্যা ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিতে লাগিলেন—তাঁহার অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষুদুটি তখন সীতার মুখ পুণ্ডরীক দর্শনাশে ব্যাকুল, বাহুদুটী সেই জ্যোৎস্নাসুন্দর অঙ্গলতিকার আলিঙ্গন আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র। মহারাজ দশরথ বলিতেন "সীতা রঘুবংশের বধূ কিন্তু জনকসম্বন্ধে সীতা আমাদের দুহিতা"।

সম্বন্ধের বীজ সীতা আর নাই; তবু দগ্ধ জীবন ত যায় না; বজ্রলেপ দিয়া কে যেন প্রাণকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাই আর প্রাণ নড়িতে চড়িতে চায় না। রোদনের স্রোত বাড়িয়াই চলিয়াছে দেখিয়া অরুন্ধতী কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং "পরিণাম ফল ভালই হইবে" কুলগুরুর এই আদেশটিও স্মরণপথে আনয়ন করিলেন। স্নেহ সর্ব্বদাই বৈফল্যই আশঙ্কা করে। তাই কৌশল্যা বলিলেন—

"ভগবতি, সীতাকে আবার পাইব—সে মনোরথ চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া গিয়াছে"—এই কথায় অরুন্ধতীর আত্মমর্য্যাদা একটু ক্ষুণ্ণ হইল। "শুভফল হইবে" বশিষ্ঠদেবের ইহাই আদেশ তাহাতে অবিশ্বাস! পতিব্রতা নারী বশিষ্ঠ দেবের মত পতিদেবতার উপর রাজ্ঞীর এই অবিশ্বাসের ভাব লক্ষ্য করিয়া যেন একটু উত্তেজিতা মত হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যিনি স্নেহের কোমলা মূর্ত্তি ছিলেন, এক্ষণে তিনি আবার ব্রাহ্মণ্য জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়ী, সতীত্বের তেজে তেজস্বিনী অরুন্ধতী কৌশল্যাকে কহিলেন,

"তবে কি রাজপুত্রী, বশিষ্ঠ দেবের বাক্য মিথ্যা হইবে মনে করিতেছ? সুক্ষত্রিয়ে, মনে অন্য প্রকার ভাবনা আনিয়ো না, তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অবশ্যই ঘটিবে। "সেই আবির্ভূত ব্রহ্মজ্যোতি" ব্রাহ্মণের বাক্য কখন নিষ্ফল যায় না, তাঁহাদের বাক্যের উপর নিয়তই সিদ্ধি বাস করে। সে ব্রাহ্মণেরা কখনও বিফল বাক্য উচ্চারণ করেন না। রামচন্দ্র একদিন অষ্টাবক্র ঋষির "বীরপ্রসবা হও" (সীতার প্রতি) এই আশীর্ব্বাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন—

"ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি" (১মাঙ্ক)

নেপথ্যে কল কল রব উত্থিত হইল। বশিষ্ঠ জনকাদির আগমন জন্য বালকগণের আজ 'শিষ্টানধ্যায়' *; কাজেই মনের আনন্দে বালকগণ আজ খেলাধূলায় মত্ত। কৌশল্যা শোকের মূর্ত্তি। বালকগণের আনন্দ কোলাহল তাঁহারও চিত্তে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ফুটাইয়া দিল। তাই তিনি বলিয়া উঠিলেন "সুলহং সোক্খং দাব বালঅত্তং হোদি" বাল্যকালে চিন্তার উদ্বেগ নাই, শোক দুঃখের কোনও কারণ নাই, কাজেই শিশুদের সর্ব্বদাই আনন্দভাব।

সেই বালকগণের মধ্যে একটি বালকের মুখশ্রী সকলকার লোচনপটে ফুটিয়া উঠিল। সেই বালকই লব। তার সেই কুবলয়দল স্নিগ্ধ ঘন শ্যামবর্ণ সেই মনোরম কাকপক্ষ চূড়া, সেই সৌষ্ঠবপূর্ণ মুগ্ধ ললিত অঙ্গের মধ্যে কৌশল্যা রামভদ্রেরই শ্রী প্রত্যক্ষ করিলেন। জনকের মনে হইল, রঘুনন্দনই যেন আজ শিশুরূপে দণ্ডায়মান। এ কে রে? নয়নের অমৃতাঞ্জন স্বরূপ এ বালকটী কে রে? সপ্তর্ষিবন্দিতা অরুন্ধতী ভাগীরথীর মুখে অগ্রেই সমস্ত রহস্য

* শিষ্ট+অনধ্যায়=শিষ্টজন আগমন হেতু অনধ্যায়, অর্থাৎ ছুটী।

অবগত ছিলেন। বৎসা সীতার যে দুইটী যমজ পুত্র, আর তাহারা যে বাল্মিকী আশ্রমে নীত অরুন্ধতী অগ্রেই তাহা শুনিয়াছিলেন। এই পুত্রটী যে সেই যমজ পুত্রেরই অন্যতম ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন।

আশ্চর্য্য এ বালক এ ত ব্রাহ্মণ বালক নহে—এ যে ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী—নহিলে বাণপূর্ণ তুনীরদ্বয় পৃষ্ঠে থাকিবে কেন? এদিকে ভস্মলিপ্তবক্ষ, পরিধেয় মৃগচর্ম্ম, আবার বাহুতে কার্ম্মুক শোভমান। জপমালা ও অশ্বত্থদণ্ডের সঙ্গে "উৎকট কোটিক" শরাসনের মিলন বস্তুতই আশ্চর্য্যকর।

লবের 'বিনয়মসৃণ তেজ' মধুরনম্র ব্যবহার, সুন্দর অভিবাদন প্রণালী দেখিয়া সকলেই প্রীতিলাভ করিলেন। অরুন্ধতী লবকে ত একেবারেই কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। শুধু যে তাঁহার কোলই ভরিয়া গেল তাহা নহে। বহুদিনের মনোরথ ও সম্পূর্ণ হইল। অরুন্ধতী যে লবকেই সীতার পুত্র জানিয়া কোলে লইয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার ত আনন্দ জন্মিবারই কথা। কিন্তু কৌশল্যা ত লবকে সীতার পুত্র বলিয়া জানেন না। তবু তিনি যখন লবের নীলোৎপলশ্যাম অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, কলহংস নিনাদবৎ মধুরগম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলেন, তখন তাহারও মনে হইল, যেন শিশু "রামভদ্র" আসিয়া কোলে বসিয়া আছে। ভাল করিয়া লবের মুখখানির প্রতি দৃষ্টি করিয়া রামের মাতা দেখিতে পাইলেন যে, লবের মুখশ্রীতে যেন বধূ সীতারও মুখশ্রীর ছায়া ফুটিয়া রহিয়াছে। লব পিতার দেহ গঠন, কণ্ঠস্বর, ধীরোদাত্ত গতি ও অনুভবগাম্ভীর্য্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার মুখশ্রী হইয়াছে মাতারই মুখের মত। শাস্ত্রেও বলে, মাতৃমুখী সন্তানই সৌভাগ্যবান্।

স্ত্রীলোকের প্রকৃতিই এই। বালকদিগকে মাতাপিতার কথাই অগ্রে জিজ্ঞাসা করে। কৌশল্যার হৃদয়ে আশার যে ক্ষীণরশ্মিটুকু জাগিবার উপক্রম করিয়াছে—প্রশ্নও তদনুরূপ হইবারই কথা, হইলও তাই। কৌশল্যা জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার মা আছেন বাপকে মনে পড়ে?" হৃদয়ের অস্ফুট আশা আজ বাণীরূপে প্রকাশিত হইতেছে, নহিলে মার বেলায় 'আছেন'? আর বাপের বেলায় "মনে পড়ে"? এরূপ প্রশ্ন উঠে কেন? সীতার পুত্র, সীতা কাছেই আছে, রাম ত নিকটে থাকিবেন না। অবশ্য কৌশল্যা যে এই ভাবিয়াই ইচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা না হইতে পারে।

লব কিছু জানে না—স্তন্য ত্যাগের পরই তাহারা মাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাল্মিকী আশ্রমে প্রতিপালিত। সীতা তাহাদের মাতা, রামচন্দ্র তাহাদের পিতা—ইহা তাহারা জানে না। তাহারা জানে, তাহারা বাল্মিকীর, উত্তরও দিল তাই। কৌশল্যা সে উত্তর শুনিতে চাহেন না। তাঁহার মন চাহে না। তাই তিনি বলিলেন—"যাহা প্রকৃত বলিবার তাহাই বল।" বাল্মীকি ত আর বিবাহিত নহেন যে, তাঁহার পুত্র জন্মিবে।

রামচন্দ্র অযোধ্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী। সহধর্ম্মচারিণী ব্যতীত অশ্বমেধ যজ্ঞ হয় না; তাই হিরন্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি পার্শ্বে রাখিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিবেন স্থির করিয়াছেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞ-অশ্ব লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হওয়াই বিধি। লক্ষণের পুত্র চন্দ্রকেতু দিগ্বিজয়ে অশ্ব লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। ঘটনাক্রমে বাল্মিকী আশ্রমে অশ্ব উপস্থিত। চন্দ্রকেতুও অশ্বের

পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রমে উপনীত। জনকের সহিত কথোপকথনে লব মহর্ষি বাল্মীকির রচিত রামায়ণের কথা পাড়িল এবং জানাইল—"প্রাপ্তপ্রসববেদনা সীতার বনবাস পর্য্যন্তই প্রকাশিত হইয়াছে। বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণে পাঁচ মাস গর্ভাবস্থায় বাল্মীকি আশ্রমের সম্মুখেই লক্ষ্মণ কর্তৃক সীতা বিসর্জ্জিত হন। কিন্তু ভবভূতি সীতাকে পূর্ণগর্ভাবস্থায় পূর্ণ অরণ্যে ভাগীরথী তীরে বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। (এ সম্বন্ধে তুলনামূলক সমালোচনা প্রথমাঙ্ক সমালোচনায় অগ্রেই করিয়াছি)। এবং রামায়ণের কিয়দংশ লইয়া একখানি নাটকও প্রণীত হইয়াছে; এবং সেই নাটকখানি অভিনয়ার্থ নাট্যগুরু ভরতঋষির আশ্রমে প্রেরণও করা হইয়াছে। নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুশ সেই নাটকখানি পৌঁছিয়া দিবার ভার লইয়া সশস্ত্রে যাত্রা করিয়াছে।"

ভ্রাতার কথা শুনিয়া কৌশল্যা যেন একটু হতাশ একটু মুহ্যমান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার ভাইও আছে!" "ভ্রাতা আছে"—তবে ত সীতার পুত্র হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তারপর তখন যমজ ভ্রাতার কথা শুনিলেন, তখন যেন আবার আশ্বস্ত হইয়া উঠিলেন।

মিথ্যা জনরবে উদ্বিগ্ন হইয়া রামচন্দ্র পূর্ণগর্ভা সীতাকে অরণ্যে বিসর্জ্জন করিয়াছেন—লবের মুখে এই কথা শুনিয়া কৌশল্যা কাঁদিয়া উঠিলেন। পিতা জনক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—"উঃ—সেই নিদারুণ পরিত্যাগের অপমান, তার উপর প্রসবের ব্যথা; আর চারিদিকে হিংস্র বন্যজন্তুর কোলাহল। বৎসে সীতা! ভয়ে ভীত হইয়া কতই বার আমাকে "রক্ষা কর" বলিয়া স্মরণ করিয়াছিলে? হা বৎসে,

নূনং ত্বয়া পরিভবঞ্চ নবঞ্চ ঘোরং তাঞ্চ ব্যথাং প্রসবকালকৃতামবাপ্য

ক্রব্যাদগণেষু পরিত পরিবারয়ৎসু সন্ত্রস্তয়া শরণমিত্যসকৃৎস্মৃতোহস্মি।

জনকের স্নেহময় চক্ষুর উপর সীতার সেই অশরণ অবস্থার ছবি ফুটিয়া উঠিল। অরুন্ধতী ও কৌশল্যা বিশেষতঃ বালক লবের সম্মুখে রাজর্ষির আত্মমর্য্যাদা মাথা খাড়া দিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে পৌরজনের কুমর্য্যাদা আর রামের অবিমৃষ্যকারিতা মনে পড়িল। উঃ—এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে সীতার এই নিন্দিত নির্ব্বাসন, এই নিদারুণ দশা বিপর্য্যয়!—চিন্তা করিতে করিতে জনকের মস্তিক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। রুদ্ধ কোপানল অবসর পাইয়া আজ অস্ত্রমুখে বাহির হইতে চাহে। "অন্তর্গূঢ় ঘনব্যথা" অভিশাপের আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে। কৌশল্যা দেখিলেন, সর্ব্বনাশ; এখনই বুঝি অযোধ্যা দগ্ধ হইয়া যায়, রাজপরিবারবর্গ অভিশপ্ত হইয়া উৎসন্ন প্রাপ্ত হয়; রঘুকুল ছারেখারে যায়। রাজমাতা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। "ভগবতি ক্রুদ্ধ রাজর্ষিকে প্রসন্ন করুন।"

অরুন্ধতী দেখিলেন—শম প্রধান তপোবনে আজ দাহাত্মক, গূঢ় তেজ জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। তপস্যাবর্দ্ধিত ক্ষাত্রীয়তেজ আজ ভয়ানকরূপে দেখা দিয়াছে। তখন অরুন্ধতী বৎস রামভদ্রের করুণদুর্ব্বল ছবিখানি ক্রুদ্ধ রাজর্ষির সম্মুখে ধরিলেন; প্রতিপাল্য হতভাগ্য পৌরজনবর্গের প্রকৃত অবস্থা মনে করাইয়া দিলেন। তখন জনকের সেই দারুণ কোপানল শান্ত হইয়া আসিল। পুত্রস্থানীয় রামভদ্রের উপর একটি করুণ সমবেদনা জাগিয়া উঠিল। "ভূয়িষ্ঠদ্বিজ-বালবৃদ্ধবিকল স্ত্রৈণশ্চ পৌরো জনঃ।" বলিয়া রোষপ্রকাশ নিষ্ফলবোধে রাজর্ষি শান্ত হইলেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব আসিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণবালকগণ নূতন জীবটিকে দেখাইবার জন্য লবকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণকরিয়া লইয়া গেল। লব শাস্ত্রজ্ঞানে বুঝিল অশ্বমেধ যজ্ঞেরই অশ্ব।

"বিশ্ববিজয়িণাং উর্জ্জস্বল: সর্ব্বক্ষত্রিয় পরিভাবী মহান্ উৎকর্ষনিষ্কর্ষ:" লবের ব্রহ্মচর্য্য-শান্ত ক্ষত্রিয় তেজঃ ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তারপর যখন শুনিল

অয়মশ্বঃ পতাকেয়মথবা বীর ঘোষণা।
সপ্তলোকৈকবীরস্য দশকণ্ঠকুলদ্বিষঃ॥

এই ক্রোধোদ্দীপক অক্ষর, এই রাজসিক বাণী লবের ক্ষাত্রীয় তেজে প্রচণ্ড আঘাত করিল। "কি, পৃথিবী কি নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছে"—বলিয়া লব অন্তরের মধ্যে একটি ব্যথা অনুভব করিলেন—

"ন তেজস্তেজস্বী প্রসৃতমপরেষাং প্রসহতে"

"মহারাজ রামচন্দ্রের নিকট আবার ক্ষত্রিয় কে?" রাজপুরুষের এই দর্পিত বাণী শুনিয়া লব তখন রামচন্দ্রের জয়বৈজয়ন্তী, সেই উৎকর্ষ নিষ্কর্ষস্বরূপ অশ্বটি গ্রহণ করিলেন। তখন লবের কথামত ব্রাহ্মণবালকেরা অশ্বকে তপোবনের মধ্যে তাড়াইয়া লইয়া গেল। "সক্রোধদর্প রাজপুরুষবর্গের দীপ্যমান অস্ত্রশ্রেণী ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। লবেরও উৎকট কোটি কোদণ্ড হইতে ঘন ঘর্ঘর ঘোষ উত্থিত হইল।

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।

ও কে ডাকে!

সন্ধ্যাবেলায় ভোরের পাখীর সুরে ও কে ডাকে গো?
পেয়ে জাগরণের সাড়া, শ্রান্ত পাখায় দিচ্চি নাড়া,
জীর্ণ শিরায় বাসি নেশা টাট্‌কা ব্যথায় জাগে গো!
শীর্ণ ধারা দিবি ঢেলে, পিছন পানে উজান ঠেলে,
রে অজানা! একি খেয়াল চালাস জোরের ঝাঁকে গো?
খেয়াল, খেলোয়াড়ের প্রাণে জিত্‌বে কানা কড়ির দানে।
তাই কি গো সে আমায় টানে নিগূঢ় স্নেহের গানে গো?
সাঁজের আঁধার ঘরের ধাপে; ভোরের সুরে গীতি কাঁপে;
আকুল আশা ব্যথায় জাগে; তাকের উপর ডাকে গো।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।
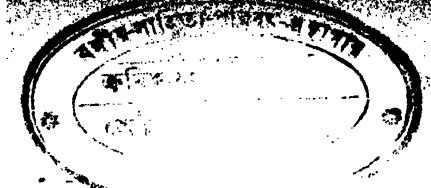
মানব-জীবন ও জাতীয় উন্নতি।

মানুষকে আমরা যতই স্বাধীন মনে করি না কেন, তাহার বার আনা রকম কার্য্য-কলাপ প্রকৃতির বশে। মানুষের কতকগুলি প্রকৃতি দত্তপ্রবৃত্তি আছে এবং সেগুলিকে আমরা স্বতঃপ্রবৃত্তি বলিয়া থাকি। এই স্বতঃপ্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ চলিয়া থাকে। এই হিসাবে দেখিলে, মানুষ কলের পুতুলের মত কেবল প্রবৃত্তির অনুশাসনেই চালিত হয়।

মানুষের যৌথপ্রবৃত্তি (১) আছে তাই অনেক লোক একসঙ্গে বাস করে এবং ইহাকে আমরা কুল সংঘ, সমাজ, উপজাতি, জাতি ইত্যাদি বলিয়া থাকি। মানুষের স্নেহ আছে, প্রেম আছে, এই জন্য মানুষের পারিবারিক জীবন। মানুষের অর্জ্জন লিপ্সা (২) বা ধন লিপ্সা আছে সেই জন্য ব্যবসায় বাণিজ্য, সেই জন্য ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়। বালকের পকেট অনুসন্ধান করিলে উহার ভিতর কত কি দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা বালকের অর্জ্জন প্রবৃত্তি। ইতর জীব হইতে ছেলে বুড়ো সকলেই খেলা প্রিয় এবং ইহাও একটা প্রবৃত্তি। এইরূপ চৌদ্দ পনরটা প্রবৃত্তি মানুষের আছে এবং উহা বিজ্ঞান সম্মত। লয়ড মরগ্যান, রোমেনস্, ম্যাকডুগাল, থরনডাইক্ প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিৎ ও মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহার বিষয় অনেক লিখিয়াছেন। আর একটা প্রবৃত্তি আছে ইহাকে আমরা কৌতূহল প্রবৃত্তি (৩) বা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য বলিতে পারি এবং ইহার ফলে মানুষ নূতন তত্ত্ব ও তথ্য বাহির করিয়াছে ও করিবে। কৌতূহলকে কেহ কেহ রস বলিয়া থাকেন। এই রস (বা ইমোসন্) মানবজীবনে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। আবার মিশ্র রসও আছে, তাহাকে আমরা ভাব বলিব এবং ইংরাজীতে উহা সেন্‌টিমেন্ট বলে। দেশ-প্রেম একটা ভাব যেহেতু উহাতে প্রেম, মমতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি রস সম্মিলিত আছে। এই জন্য ধর্ম্ম, নীতি ও সৌন্দর্য্য বুদ্ধিও ভাব; উহা রস নহে। কারণ উহারাও বহু রস আশ্রিত। ভাবই মানব জীবনের বিশেষত্ব, উহাই সভ্যতার মূল। তবে ভাবের সহিত বুদ্ধির ও যুক্তির সংযোগ না থাকিলে সে ভাব কুসংস্কারের নিদর্শন হইয়া পড়ে।

কেবল যে মানুষেরই যৌথ প্রবৃত্তি আছে তাহা নহে অপর জীবও বন্যাবস্থায় এই প্রবৃত্তির বশীভূত, এই সকল বন্য-জীবকে কোন উপায়ে ধরিয়া রাখিলে বড়ই অস্থির হয় এবং ছাড়িয়া দিলে একবারে দলের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়। যৌথ বৃত্তি মেরুদণ্ডবিহীন জীবের মধ্যেও দেখা যায়। পিঁপড়ে ও মৌমাছির একত্র বাস প্রবৃত্তি সকলেরই সুপরিচিত। মৌমাছির সমাজ ও উহাদের স্বতঃ বুদ্ধি প্রাণীতত্ত্ববিদের একটি বিশেষ আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিকই মৌমাছির চাক যেন একটি গ্রাম, উহাতে শ্রম বিভাগ আছে এবং পরস্পর সাহচর্য্য আছে। উহারা চাকখানি এমন পরিষ্কৃত করিয়া রাখে যে মানুষে তাহার গ্রামকে সেরূপ ভাবে পরিষ্কৃত রাখিতে পারেনা। পরিষ্কার রাখার কাজটা কতকগুলি

(১) Gregarious.
(২) Acquisitiveness.
(৩) Curiosity.

মৌমাছির নির্দ্দিষ্ট আছে ইহা ছাড়া চাক নির্ম্মাণ কাজ, মধু সংগ্রহ, অণ্ড সংরক্ষণ, এবং বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য ঐরূপ ভাবের ব্যবস্থা আছে। যদিও উহারা মৌমাছি। তবুও ইহাদের কর্ম্মকুশলতা মানুষের অনুকরণ যোগ্য।

মৌমাছির জীবন ও সংঘ যুগেযুগে এক ভাবেই চলিয়াছে হয়ত উহাদের আকার, গঠন বর্ণ প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিম্বা উহাদের স্বতঃ বুদ্ধিও দুই একটা বাড়িয়া থাকিতে পারে কিন্তু উহাতে আর কিছু বিশেষত্ব দেখা যায় না। মৌমাছিজীবনযাত্রার বোধ হয় ঐ ভাবেই শেষ। কিন্তু মানুষের বেলায় তাহা হয় নাই। অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, প্রশান্ত দ্বীপপুঞ্জ, আমেরিকা ও আণ্ডামান প্রভৃতি স্থলে এমন মানুষ আছে যাহারা আমাদের দৃষ্টিতে এখনও বন্যজীব। তাহাদের আচার, ব্যবহার, বিশ্বাস, চিন্তাপ্রণালী কিছুই সভ্যমানবের মত নহে। মানুষ ছাড়া অপর জীবের মধ্যে উৎকর্ষতার তারতম্য এত অধিক কোথাও নাই।

এরূপ তারতম্য কেন হয়? আগে একটা মস্তিষ্ক থিওরি ছিল অর্থাৎ মস্তিষ্ক পদার্থের তারতম্য অনুসারে মানুষের তারতম্য বা জীবের তারতম্য ঘটে। এ থিওরি আর চলেনা কারণ উহা এখন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। আর একটা থিওরি এই যে মানবের আদিম অবস্থায় অর্থাৎ উহাদের আমরা যে অবস্থায় এখন অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাই, আপন জাতি, (১) কুল (২) বা গোত্রের (৩) মধ্যে পরস্পর সাহচর্য্যে থাকিত কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে তাহারা ক্রমশঃ অপর জাতি, কুল বা গোত্রে পরিণত হইত। এই অবস্থায় নিকটবর্ত্তী স্থানে যখন ফল মূল অথবা জীবজন্তু প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী হ্রাস হইয়া পড়িত তখন এক জাতির সহিত অপর জাতির যুদ্ধ বাধিত এবং যে জাতি অধিক বুদ্ধিমান ও বলশালী তাহারা অপর পক্ষকে পরাজিত করিয়া তাহাদের দ্রব্য সামগ্রী কাড়িয়া লইত, তাহাদের স্ত্রীলোকদের অধিকার করিয়া লইত ও পুরুষগুলাকে দাস করিত। যুদ্ধে যাহারা নির্জ্জীব তাহারা মরিয়া যাইত এবং নেতাদের মধ্যে যাহারা গণ্য তাহারা স্ত্রীলোকগুলিকে বাছিয়া লইয়া নিজের করিয়া লইত। ইহার ফলে উপযোগীতার সংরক্ষণ বা "সরভাইভ্যাল অব দি ফিটেষ্ট" হইত। এই উপযোগী পুরুষরমণী সংযোগে যে নূতন প্রজা সৃষ্টি হইল তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা উন্নত। কিসে উন্নত—বুদ্ধিতে ও শরীরে। প্রবাদটি এখনও চলিয়া আসিতেছে কিন্তু এরূপ ভাবে ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে কোনও জাতির উৎকর্ষতার ইতিহাস পাওয়া যায় না। অসভ্যেরা সেই ভাবেই এখনও যুদ্ধ চালাইতেছে, একদল জিতিতেছে, তাহারা অপর দলের পূর্ব্বোক্ত ভাবেই সমস্ত লইতেছে কিন্তু নূতন উৎকৃষ্ট জাতির সৃষ্টি কই?

যাহা হউক যখন সভ্য মানুষ প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না তখন ধরিয়া লইতে হইবে যে একটা কোন কারণে উন্নত জাতির অভ্যুদয় হয়। উন্নত মানবের সম্বন্ধে আর একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে এবং উহা তত আদৃত নয় বলিয়া উহার কথা সংক্ষেপে বলিব।

---

(১) Horde.

(২) Tribe.

(৩) Totem.

প্রবাদটি কোমৎ ও তাঁহার বিখ্যাত অনুচর বকলের। ইঁহাদের মতে ভৌগোলিক সংস্থান অর্থাৎ কোনও দেশ পার্ব্বত্য, সমুদ্র সন্নিকট, মরুভূমি তলস্থ, নদীমাতৃক প্রভৃতি বিশেষত্ব অনুসারে জাতীয় উৎকর্ষতা সাধিত হয়। ইহা ছাড়া খাদ্য প্রাচুর্য্য ও অপ্রাচুর্য্যও উন্নতি বা অনুন্নতির কারণ। যেমন আরব ও মিসরীয় জাতি উন্নত নহে, তাহার কারণ সেখানে খেজুর যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, কাজেই সেখানকার লোক আহার সংগ্রহের জন্য অধিক বুদ্ধি ব্যয় করে না এবং বুদ্ধি ব্যয় করেনা বলিয়া তাহারা নির্ব্বোধই থাকে, কাজেই উন্নত হইতে পারে না।

সমাজ সমস্যা অতি জটিল এবং বুদ্ধিজীবী সমাজতত্ত্ববিৎ বলিয়া থাকেন যে সামাজিক ক্রিয়া বহু কারণ সমন্বিত, ইহাতে একদিকে জড়ের প্রভাব ও অপর দিকে চিত্তের প্রভাব রহিয়াছে এবং তাহা বড় বৃক্ষের শিকড়ের মত পরস্পর এতই মিলিত যে উহা বাছিয়া লইয়া মূল ঠিককরা বড়ই কঠিন।

মানবজীবন প্রবৃত্তিমূলক তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রবৃত্তিটা কি তাহা বলা হয় নাই। স্নেহ, প্রেম, যৌথবৃত্তি বলিলে আমরা নিজের মানসিক অবস্থাটা বুঝিতে পারি কিন্তু উহাদের স্বরূপ অবস্থাটা বুঝিতে পারিনা। ইহাদের মূল সম্পূর্ণ ভাবে প্রকৃতির আড়ালে। কোন কোন মনস্তত্ত্ববিৎ স্বতঃবৃত্তিগুলাকে মাধ্যাকর্ষণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এক জড়-কণার মধ্যে এমন কি গুণ আছে যাহা অপর জড়কণাকে টানে তাহা আমরা যেমন কিছুই জানি না সেইরূপ স্নেহ প্রভৃতি এক একটা জীবের গুণ আমরা বুঝিতে পারি উহা দ্বারা একটা প্রেরণা (ইম্‌পল্‌স) হয় তাহাও বুঝি আর কিছু বুঝিবার সামর্থ্য মানুষের নাই। সম্ভবতঃ স্বতঃ-প্রবৃত্তি একটা অন্ধ শক্তি, এবং জীব ও মানব সমাজে আমরা যে সকল দৃশ্য ও ব্যাপার দেখিতে পাই উহা তাহার কারণ। মানবের জ্ঞান বিজ্ঞান মানবের কৌতূহল হইতে আর এই কৌতূহল আছে বলিয়া আমরা জগৎরহস্য বুঝিতে চেষ্টা করি। প্রকৃতির এটা অনুগ্রহই বলিতে হইবে যে উহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিলে সে নিজের দুয়ার খুলিয়া দেয়। যদি সে নিয়ম না থাকিত তাহা হইলে হাজার চেষ্টা করিলেও আমরা উহার শৃঙ্খলা বুঝিতে পারিতাম না। প্রকৃতি মনকে নিজের অন্তরের কথা বুঝিবার জন্য বোধ হয় ঐরূপ ভাবে সাজাইয়া দিয়াছে।

তবে প্রকৃতি সকলের সমান নহে, ইহার তারতম্য আছে। বুদ্ধি যেমন সকলের সমান নহে তেমনি প্রবৃত্তি সমূহেরও ইতর বিশেষ আছে। কাহারও ধনলিপ্সা কৌতূহল অধিক কাহারও বা কম। আবার প্রবৃত্তিবিরোধও আছে। কেহ ঘোর সংসারী অর্থাৎ তাহায় স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি প্রবৃত্তি খুব প্রবল, আবার কেহ সংসার বিরাগী অর্থাৎ তাহারা স্নেহ, প্রেম, কাটাইয়া অপর কোনও ভাব লইয়া ব্যস্ত থাকে। ভাবরাজ্যে দেখা যায় কেহ স্বদেশপ্রেমিক আবার কেহ স্বদেশদ্রোহী। যাহারা স্বদেশদ্রোহী তাহাদের অধিকাংশ স্থলে ধনলিপ্সা অথবা প্রতিহিংসা বৃত্তিটা প্রবল হয়।

ভাবরাজ্যের আদর্শ অনেক বিরোধের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বুদ্ধ ও খৃষ্ট সংসার ত্যাগ করিয়া পরকালের চিন্তায় মানুষকে থাকিতে বলিয়াছেন। আবার এদিকে আমাদের দেশে চার্ব্বাক সম্প্রদায়, রোম প্রদেশে লুক্রিসস্, গ্রীক এপিকিউরিয়েনস্ ও পারস্যবাসী ওমারখাইয়াম্ ইঁহারা ইহ জগতকে বড় করিয়া পরকালকে ছোট করিয়াছেন। আর আজকাল ইউরোপেও এই

ভাবটাই প্রবল। চার্ব্বাকদের "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ", লুক্রিসস্ ও এপিকিউরিয়েনস্দের বার মাস সমান ভাবে সুখ অন্বেষণ" এবং ওমারখাইয়ামের "মস্‌জিদে সময় নষ্ট করা অপেক্ষা সরাবখানায় আমোদ করা ভাল" প্রভৃতি উক্তি ইউরোপে বেশ প্রতিফলিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইউরোপে তপ ও সন্ন্যাসের আদর ছিল কিন্তু নব অভ্যুদয় হইতে ইউরোপে সে প্রবৃত্তিটা আর নাই। আমাদের দেশেও বৃহন্নারদীয় পুরাণে যদিও "কমণ্ডলু বিধারণ" অর্থাৎ সন্ন্যাস নিষেধ আছে কিন্তু জন সংঘ তাহা গ্রহণ করে নাই।

সাধারণ লোক প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াই চলে এবং প্রচলিত সামাজিক ভাবগুলাই তাহারা গ্রহণ করে। এই হিসাবে তাহারা অনুন্নত জাতি অপেক্ষা বিশেষ উন্নত নহে। তবে সভ্যতার আগমন সমাজে কি করিয়া হয়? সকলেই সাধারণ প্রবৃত্তির বশে চলিলে সমাজে এক ভাবই থাকিয়া যায় উহার উৎকর্ষ সাধন হয় না উহা একবারে মৌমাছির সমাজের মত হইয়া পড়ে।

মানুষ প্রবৃত্তি অতিক্রম করিতে পারে না, তাহা হইলে সভ্যতারও প্রবৃত্তির সহিত একটা সম্বন্ধ আছে। গারো, খাসিয়া, নাগা প্রভৃতি আদিম জাতিকে আমরা সভ্য বলি না কেন অথবা কেন তাহারা বর্ব্বর অবস্থায় আছে। তাহাদেরও কৌতূহল, অনুকরণ, স্নেহ, প্রেম, ধনলিপ্সা প্রভৃতি আছে, তবে তাহারা এরূপ হীন অবস্থায় কেন রহিয়াছে? সভ্যতার কারণ অনুসন্ধান করিলে বিশেষ কোন নূতন নিয়ম পাওয়া যায় না তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তবে সভ্যতার কতকগুলি আনুষঙ্গিক ব্যাপার আছে। মনুষ্য প্রবৃত্তির সমধিক বিকাশ যে জাতির মধ্যে হয় তাহাকেই আমরা সভ্য বলি। নব্য পাশ্চাত্য জাতিকে আমরা সভ্য বলি তাহার কারণ তাহাদের মানববৃত্তিগুলির বেশ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। বিজ্ঞান রাজ্যে তাহাদের বহু অধিকার ত আছেই, তাহা ছাড়া ভাবরাজ্যেও শিল্প, কলা, স্থপতি, সাহিত্য প্রভৃতি সুকোমল রসেরও তাহারা নূতন নূতন সৃষ্টি করিতেছে। তাহাদের জনসংঘ বোধ হয় পূর্ব্বের মত এক ভাবেই চলিতেছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে উন্নত শ্রেণীর লোকদের কৌতূহল বা নব অনুসন্ধান প্রবৃত্তি খুব অধিক ও সেই সঙ্গে শ্রম, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় গুণগুলি থাকায় তাহারা নূতন নূতন তত্ত্ব বাহির করিতে পারিতেছে। তাহাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থবল আছে, কাজেই অন্নচিন্তা তত নাই। মানুষের শক্তি যদি অন্ন বস্ত্রের জন্য অধিক ব্যয় করা হয় তাহা হইলে তাহাদের অপর দিকে বড় একটা টান থাকে না। আহারের ব্যবস্থা মানুষের আগে চাই এবং তাহাতে যাহাদের শক্তি ক্ষয় অধিক না করিতে হয়, স্বভাবের নিয়মানুসারে তাহারা অপরাপর প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে পারে। যে সকল বর্ব্বর জাতি ফল মূল অথবা বন্য জীব জন্তু ধরিয়া খায় তাহারা আহারের চেষ্টাতেই প্রায় সমস্ত দিনই থাকে এবং এই জন্য তাহারা অধিক আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিলে আর সহজে খাটিতে চায় না, তখন বিশ্রাম খোঁজে।

তবে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানবসমাজে প্রতিভাশালী ব্যক্তি সভ্যতার প্রধান উপকরণ। নূতন দিক, নূতন তত্ত্ব, নব পন্থা প্রভৃতি সাধারণ লোকে দেখাইতে পারে না, ইহাতে প্রতিভার আবশ্যক। যখন সমাজে যাবতীয় লোক সাধারণ বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি লইয়া চলে তখন সমাজ অবসন্ন ও অচল হয়। প্রাচীন সংস্কার, আচার ব্যবহার ভাব লইয়া সমাজ ঐ

অবস্থায় চলিয়া থাকে। ভাবপ্রবণ না হইলে সমাজ অগ্রসর হইতে পারে না। ধর্ম্মভাব, রাষ্ট্রীয় ভাব, নৈতিকভাব, এক ধারায় চলিলে সে সমাজ পশ্চাৎপদ সমাজ। জনসংঘ, জীববিশেষের প্রবাহবৎ চলে তাহাদের ভিতর ভাবের আবেশ করিয়া দিতে হয়। প্রতিভাশালী, সম্বুদ্ধ, জ্ঞানী ব্যক্তির সমাজে কেন আবির্ভাব হয় তাহা সমাজতত্ত্ব হইতে জানা যায় না। তবে এরূপ কোন ব্যক্তির আগমন হইলে বুঝিতে হইবে যে, সমাজের কোনও একটা গলিত স্থানের সংস্কার হইবে অথবা কোন একটা নূতন প্রকৃতি রহস্য প্রকাশিত হইবে। মহাজনের আবির্ভাব অনৈমিত্তিক কিনা বলা যায় না; হয়ত ইহার কোনও নিয়ম শৃঙ্খলা থাকিতে পারে। যাহা হউক আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে "সম্ভবামি যুগে যুগে" এই প্রাচীন কথাটি সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারা যায়।

প্রত্যেক সভ্য জাতির এক একটা সময় এমন আসে যখন তাহাদের সমাজ মুক্ত হইয়া যেন ফুটিয়া উঠে। প্রাচীন মিসরে আমেনহোটেপের সময় মিসর জাতিটা বেশ জাগিয়া উঠিয়াছিল। গ্রীসে সোলন ও আলেক্‌সান্দারের শাসনকালে গ্রীক প্রবৃত্তি পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অগস্টস যুগ রোম্যান জাতির গৌরবের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। যে জাতি উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে তাহাদের গৌরবের একটা কাল আছে। সেই সময়টা তাহাদের যেন মানবীয় ভাবগুলা বিকশিত হয়। নবীন পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে সার্লমেন, ফ্রেডারিক, পিতর, লুই প্রভৃতির সময় সুপ্রসিদ্ধ। আবার এদিকে ইংলণ্ডে এলিজাবেথের সময় ব্রিটিশ জাতির কিশোর অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিদর্শন ঐ সময়ের সুকুমার সাহিত্যে। উদ্যমশীলতায় ও ভিক্‌টোরিয়ার যুগ ত পৃথিবীর ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। আসিরিয়া ব্যাবিলন, প্রাচীন পারস্য, চীন ও আরব জাতিরও বেশ অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং তাহাদেরও সৌভাগ্যের যুগ আছে। প্রাচীন ভারতেরও একটা উন্নত সভ্যতা হইয়াছিল। যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, বশিষ্ঠ প্রভৃতি অনেক নূতন ধারা দেখাইয়াছেন। উপনিষৎ হইতেই বোধ হয় দর্শন ও ঈশতত্ত্বের সৃষ্টি তাহার পর বেদের ছয়টা অঙ্গ ত আছেই। দুঃখের মধ্যে ঐ সময়কার শিল্প ও কলাবিদ্যার সংবাদ ইতিহাস এখনও আমাদের দিতে পারে নাই। বৌদ্ধযুগে অশোকের সময় জ্ঞান, বিজ্ঞান, সৌন্দর্য্য বুদ্ধি, (সাহিত্য, স্থপতি, কলা) প্রভৃতি অন্তরের প্রবৃত্তি গুলি বাহিরে সমপ্রভাবে স্ফুরিত হইয়াছিল।

আর একটা বিষয় দেখিবার আছে; মানব সমাজ মৌমাছিসমাজের মত একভাবী নহে। এক এক জাতির অভ্যুদয়ে জগত এক একটা নূতন সামগ্রী পাইয়াছে। শিল্প, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি ত সভ্যতার অঙ্গ, ইহার বহিস্ফূরণ প্রত্যেক উন্নত সমাজেই পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটা নূতন দিক বা নূতন ভাব প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যেই আছে। যেমন প্রবালকঙ্কাল স্তরে স্তরে পড়িয়া গভীর সমুদ্র গর্ত্ত হইতে ধীরে ধীরে উঠে ও নূতন দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া জীব ও উদ্ভিদের বাসভূমি হয় সেইরূপ জগতের প্রত্যেক সভ্যসমাজ এক স্তরের উপর দাঁড়াইয়া নিজেরা অপর এক স্তর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। মিসরীয় জাতির সভ্যতার প্রধান নিদর্শন বিরাট স্থপতি ও বাক্যবাচক চিত্রাক্ষর। আসিরীয় ও ব্যাবিলনের সভ্যতার স্তরে আমরা অক্ষরলিপি ও সম্ভবতঃ জ্যোতিষের রাশি গণনা প্রভৃতি পাইয়াছি। ইতিহাসের বাণী অনুসারে আরবরা

চীন জাতির নিকট হইতে মুদ্রাযন্ত্র, বারুদ ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য পাইয়াছি। মুসলমানদের (আরব ও পারস্য মধ্যযুগ) নিকটও মানব সমাজ অনেক বিষয়ে ঋণী। যখন ইউরোপ ও এসিয়া প্রদেশে জন সমাজ প্রাচীন মত, চিন্তা ও সংস্কার লইয়া চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতেছিল সেই সময় মুসলমানেরাই এসিয়া ও ইউরোপের সেতুস্বরূপ হইয়া উভয় স্থানের জ্ঞান আহরণ ও চর্চ্চা করিতেছিলেন। ঐ সময়ের ইতিহাসও মুসলমানেরাই নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আলবিরুনী গ্রীক ও হিন্দু জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া দুইই যথাসাধ্য স্বজাতির মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। আল্‌কেমী বা মূল রসায়ণ কতকটা মুসলমানেরই প্রতিভার ফল।

যাহা হউক প্রাচীন সমাজের মধ্যে হিন্দু ও গ্রীকেরাই বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। হিন্দু সভ্যতা যেমন এসিয়ায় আলোক বিস্তার করিয়া চীন, জাপান পারস্য প্রভৃতি দেশে নূতন ভাব দিয়াছে সেইরূপ গ্রীকজাতির জ্ঞানে নব্য ইউরোপীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। গ্রীকজাতির যদিও ধর্ম্মের দিকটা বড়ই ক্ষুদ্র ছিল কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে গ্রীক সভ্যতা বেশ সমুন্নত। গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানরূপে বোধ হয় গ্রীকেরাই জগতকে দিয়াছে। আরকিমিদিস্‌ ও পাইথাগোরাস্‌ হিন্দুজাতির কণাদ ও নাগার্জ্জুনের মত বিজ্ঞানের স্রষ্টা। হিন্দুরা প্রকৃতির নিয়ম অনুসন্ধানটা বড় ভালবাসিতেন না, প্রকৃতির মূল রহস্যটার দিকেই হিন্দুজাতির টান কিছু বেশী। গ্রীকদের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসাটাই ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আর হিন্দুদের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা এসিয়ার মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুরা কণাদ-মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিলেন না, জড়-রহস্য ফেলিয়া দিয়া জড়ের পিছনের রহস্যে আকৃষ্ট হইলেন।

গ্রীকজাতি স্থপতি ও ভাস্কর্য্যে পৃথিবীতে একটা নূতন ধরণ দেখাইয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের দর্শনও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। গ্রীক-সভ্যতা এতই সমুজ্জ্বল যে রোমক সভ্যতা তাহার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রাকপ্রতিভা যাহা প্রসব করিয়াছিল রোমকজাতি তাহারই পরিচর্য্যা করিয়াছে। তবে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি হওয়ায় রোম রাষ্ট্রনীতিতে বেশ নিপুণ হইয়াছিল। রোমের ব্যবস্থা-তন্ত্র (আইন) সভ্য জগতে একটা আদরের জিনিস। গ্রীক ও রোম স্বীয় কঙ্কাল দ্বারা যে জ্ঞান-স্তর নির্ম্মাণ করিয়াছেন নব্য ইউরোপ তাহার উপর দাঁড়াইয়া আধুনিক সভ্যতা রচনা করিয়াছে।

হিন্দু জাতির মানসিক প্রবৃত্তিটা প্রকৃতির পশ্চাতে। তাঁহাদের ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ বৈদিক তত্ত্ব অনুষ্ঠানের জন্য। সঙ্গীত ও নৃত্য দেবতা তুষ্টির জন্য এবং ভাস্কর্য্য ও স্থপতি দেবতা ও দেবালয় রচনার অনুরোধে। এমন কি তাঁহাদের দর্শনও মোক্ষ ও অপবর্গ লাভের জন্য। বোধ হয় এই কারণই আমাদের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের মধ্যে আরিস্ততল বা টলেমির ভাগ কম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও শঙ্কর ভূত বিশ্লেষণে ব্যস্ত ছিলেন না, "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" উঁহারই ধ্যানে ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

অতএব প্রত্যেক সভ্যতায় এক একটা বিশেষ ধরণ আছে। প্রত্যেক সভ্য জাতিই অপর কোন সভ্য জাতির নিকট ঋণী। এক জাতির দ্বারা মানুষের যাবতীয় জ্ঞান সঞ্চিত হইতে পারে না। অক্ষর ও সংখ্যা রচনাতেই মানুষের বহুযুগ গিয়াছে। যদি কেহ মনে করেন যে ইউরোপীয় সভ্যতাই মানব সভ্যতার চরম তাহা হইলে বলিতে হইবে তাঁহার মত

অযৌক্তিক। যদি পৃথিবীতে মানুষ পঞ্চাশ হাজার বা একলক্ষ বৎসর আসিয়া থাকে তাহা হইলে মানুষের প্রবৃত্তি-চালিত জ্ঞান এতদিন ধরিয়া নূতন নূতন পথ দেখাইয়া আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আনিয়াছে। পৃথিবী সৌরমণ্ডলে কতদিন থাকিবে তাহা কে জানে? এখনও যে কতলক্ষ বৎসর কত যুগ ও যুগান্তর অতিবাহিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। এতকাল ধরিয়া মানব-প্রবৃত্তি কি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে। আরও কত সভ্যতা ও কত জ্ঞান আসিবে তাহার সীমা নাই। অতীতের ঘটনার কতকটা আভাস পাওয়া যায় কিন্তু ভবিষ্যতের গূঢ় প্রহেলিকাময়।

নব্য ইউরোপীয় সভ্যতা প্রকৃতি-রহস্য ঘাঁটিয়া অনেক প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারের অসারতা দেখাইয়া দিয়াছে। প্রাচীন সৃষ্টিবাদে আর কেহ বিশ্বাস করে না। সূর্য্যকে শত শত জাতি দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়াছে, কিন্তু উহা এখন গলিত উদজান পিণ্ড। বজ্র এখন কোনও দেবতার অস্ত্র নহে উহা জড়ের ক্রিয়া মাত্র। আবার এদিকে কতকগুলি পরিত্যক্ত বিশ্বাসও আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ইউরোপ এখন প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করে। বশীকরণ (হিপ্‌নটিসম্) ব্যাপার এখন ত সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে; এখন অনেকে দিব্যজ্ঞানে (১) বিশ্বাস করেন। ইউরোপীয় সভ্যতা যে স্তর রচনা করিতেছে তাহা খুব উচ্চ। হিন্দুরা মোক্ষকেই মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন, মোক্ষই মানবজীবনের চরম উন্নতি। খ্যাতনামা দার্শনিক লাইবনিজ বলেন, আমাদের বংশপরম্পরায় অগ্রসর হইতে হইবে, উন্নতির (প্রোগ্রেস্) দিকে চলিতে হইবে ইহাই মানবের লক্ষ্যের বিষয়, ইহাই মানব জীবন। উভয় মতেরই মূল্য আছে, উভয়ই দার্শনিক রহস্য, মানুষ যখন নিজেকে চিনিয়াছে তখন তাহার একটা কর্ত্তব্য আছে, তাহার স্থান বুঝিয়া লইতে হইবে। নবীন পণ্ডিত বার্গসোঁ ও অয়কেন মানুষকে "কর্ত্তব্য" লইয়া চলিতে বলিতেছেন। কিন্তু সে কর্ত্তব্যটা কি, কে জানে! প্রোগ্রেস্ আপনি হয়, না মানুষে করে এইটিইত সমস্যা।

নব্য সভ্যতার একটা বিশেষ লক্ষণ আছে, জনসংঘ (মাস্) চিরকালই দেব, ঋত্বিক, রাজা ও ধনসম্পদের সেবা করিয়া আসিতেছে! এখন কিন্তু সে ভাবটা আর বড় নাই। রবার্ট আউয়েন হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ল মারকস্ ও লেনিন অবধি সকলেই জনসংঘের পুরোহিত হইয়া তাহাদের কল্যাণ কামনা করিতেছেন ও অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। আর একটা বিশেষত্ব এই, যে কয়েকটি কারণে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া আজকাল ভাবের আদান প্রদান চলিতেছে এবং তাহার ফলে মানব মনের সংকীর্ণতা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়া যেন এক বিশ্বমানবের সৃষ্টি হইতেছে। ভবিষ্যতে ইহা হইতে মানুষের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা ব্যাপ্য ব্যাপক প্রণালীর দ্বারা বুঝা যায় না। মানুষের ভাবের (সেনটিমেণ্ট) পরিবর্ত্তন হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে যজ্ঞে নানাবিধ পশুবধ ও সুরা প্রচলিত ছিল, মৃত্যুর পর সমাধি প্রচলিত ছিল, অসবর্ণ বিবাহের বিধান ছিল, আদিম জাতির মধ্যে যত প্রকারের বিবাহ প্রচলিত আছে প্রাচীন সমাজে তাহার অনুমোদন ছিল। কিন্তু ভাব পরিবর্ত্তনের সহিত উহা আর চলে না। ভাবের কোনও জানা নিয়ম নাই, উহা কখন আসে এবং কখন যায় তাহা

(১) Clair Voyance.

ধরিবার উপায় নাই। আর একটা কথা আদিম সমাজে একটা ভাবের অভাব দেখা যায় কিন্তু উহা সভ্য সমাজে বেশ শিকড় গাড়িয়াছে। সেই ভাবটা লজ্জা বা ইংরাজী ভাষায় মডেস্‌টি। আদিম মনুষ্য সমাজে ইহা নাই বলিলেই হয়, সেই জন্য তাহাদের কাপড়ের এত সরঞ্জাম নাই, সভ্য সমাজে লজ্জা আছে, তাই আচ্ছাদনের উপর আচ্ছাদন। এ সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে মানুষ যতদিন পরের সুখে কাতর হইবে, পরস্ব, নিজস্ব করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিবে, অপরকে ঠকাইয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধির বিষয় ভাবিবে ততদিন পৃথিবী এই ভাবেই চলিবে। "মা হিংস্যেৎ" "যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ম্ মম" এই দুই ভাবে মানব সমাজ যতদিন অনুপ্রাণিত না হইবে ততদিন পৃথিবীতে এক জাতিই থাকুক বা বহু জাতিই থাকুক সামাজিক ব্যাপার এই ভাবেই চলিবে। কাজেই বলিতে হয় জগতে মানুষের কৃতিত্ব কিছুই নাই অপরাপর জীব যেমন জগৎ শৃঙ্খলে একটা বেষ্টনী; মানুষও অনেকটা তাহাই। ভাবের পরিবর্ত্তন লইয়াই মানুষ, এবং সেই জন্যই জগৎকর্ত্তাকে আমরা ভাবময় বলিয়া থাকি।

শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য।

কালের দাবী।

প্রতীচ্য-গৌরব-সূর্য্য, অতীতের হে পূজ্য-ব্রাহ্মণ,
ছিলে তুমি একদিন ধরণীর নরোত্তম
অনুপম
ত্যাগী তপোধন।
ঊষার উদয়সম আদিম প্রভাতে অদ্বিতীয় প্রতিভা তোমার
বিদূরিয়া দিয়াছিল নবীন কিরণে মানবের মোহ-অন্ধকার।
দর্শনে বিজ্ঞানে জ্ঞানে গভীর মনীষা—জ্যোতিষ্মান্! দিয়াছিল জ্বালি,
আসমুদ্র-হিমাচল-নিখিল ভারতে দীপ্তিশালী অপূর্ব্ব দীপালী।
ব্রহ্মজ্ঞানে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, তব মন
দুর্ল্লভ তপস্যাতেজে উজ্জ্বল করিয়াছিল অরণ্য-আশ্রম তপোবন।
আলোড়িয়া পঞ্চভূত প্রকৃতির সৃষ্টি-মায়া-জাল
মথিয়া ত্রিকাল
জন্ম মৃত্যু জীবনের ঘুচায়ে প্রমাদ
অমৃতের বিচিত্র সংবাদ
সত্য শিব সুন্দরের সৎ-চিৎ-আনন্দ-ঘন বাণী
দিয়াছিলে আনি।

অসীমেরও পৌঁছিয়া সীমায়
মহামহিমায়
লভেছিলে তুমি একদিন
প্রতিদ্বন্দ্বীহীন
ভারতের সর্ব্বোচ্চ আসন !
তোমার শাসন
সেদিন মানিয়াছিল সেতুবন্ধ কুমারীকা হ'তে
গান্ধারে তিব্বতে
আদিযুগ পিতামহগণ !
ক্ষমতার সেই প্রলোভন
অন্তরের দুর্ব্বলতা করিয়া আশ্রয়
চেয়েছিলে অনন্ত বিজয়
অসবর্ণ জাতির উপরে চিরদিন !
নিয়তির নিয়ম কঠিন
সেই তব কলুষিত মনে
সঙ্গো-পনে
আনিল সেদিন
হীন পরাজয় !
বিষময়
তাহারই কুফলে
রসাতলে
ফেলিয়াছে টানি
সুমেরু শিখর হ'তে স্বর্গারূঢ় তোমাদের স্বর্ণচূড় সিংহাসন খানি।

হায় শাস্ত্রপাণি !
স্বার্থের চরণ তলে
পলে, পলে
মহত্বেরে দলি
এসেছিলে চলি !
আজি সেই শূন্য-গর্ভ
বর্ণ-গর্ব্ব
জীর্ণ ছদ্মবেশ
চিনিয়াছে দেশ !

সহস্র বর্ষের তব অনুষ্ঠিত অন্যায়ের ক্লেদ
জাতির জীবন যজ্ঞে যুগ যুগ ধরি
আত্মশক্তি হরি
করিল যে নিষ্ঠুর নির্ম্মম নর-মেধ
স্বদেশে সমাজে ধর্ম্মে রাষ্ট্রনীতি পটে
সর্ব্বঘটে
আজি তাহা করিছে প্রকাশ
মহা সর্ব্বনাশ !
অগণিত নানা শাস্ত্রে অসত্যের রচি মায়া-ফাঁস,
সৃজিয়াছ যেই নাগপাশ—
আজি তার অস্বাস্থ্য বাতাস
নির্জ্জীব করিয়া দেছে এজাতির জীবনের শ্বাস !
হীনতম গোপন কৌশলে
প্রক্ষিপ্ত শাস্ত্রীয় শ্লোক, মিথ্যা মন্ত্র বলে
পুরাইতে আপনার কলুষ বাসনা
বিস্তারিলে পুরাণের অষ্টাদশ বিষধর ফনা !
আজি তার গরল দংশনে—
জর্জ্জরিত আর্য্যজাতি সমাজে ও মনে !
'স্রষ্টার বদন হতে সৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, দ্বিজ—'
হেন কত রূপকথা বিরচিয়া প্রচারিলে দুর্ব্বিনীত অহঙ্কার নিজ!
শুনাইলে নারায়ণ বক্ষে ধরে পদ-চিহ্ন তব—
স্পর্দ্ধার চূড়ান্ত নব নব !
শূদ্রকের হত্যাকাণ্ড, অসহায় রামের সহায়ে
তোমার হিংস্রমূর্ত্তি বীভৎস কঙ্কাল বহুকাল দিয়াছে দেখায়ে;
নিষ্ঠুর পরশুরাম,
মাতৃঘাতী পাতকীর নাম
স্বর্ণাক্ষরে রেখেছ লিখিয়া
সবার নয়নে যেন ছলনার মোহাঞ্জন দিয়া !
'—সমস্ত ক্ষত্রিয়গণে একাকী সে করেছে সংহার
একবিংশবার—'
হেন কত মিথ্যা ইতিহাস
করায়ে বিশ্বাস
জাগাইয়া জাতিগত ত্রাস
চেয়েছিলে ক্ষমতার ভয়াবহ বিভীষিকা করিতে প্রকাশ।

শস্ত্রচারী ক্ষত্রিয়ের গর্কোদ্ধত পরাক্রম না পারি সহিতে অবশেষে
দারুণ বিদ্বেষে
তাদের হেরিতে হীনবল
বিস্তারিয়া ষড়যন্ত্র চক্রান্তের কুটিল কৌশল
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ ঘটায়েছো সুদূর দ্বাপরে
তারপরে
গর্ভাধান পুংসবন হ'তে শ্রাদ্ধ শান্তি সপিণ্ডকরণ
সকলের সবকাজে অন্ন, বস্ত্র, অর্থ, আভরণ,
হয় যাহা বিনাশ্রমে আয়,
করিয়াছ আজীবন তারই শুধু সহজ উপায়!
বিস্তারি সমুদ্র পথে নিষেধের কঠিন বাঁধন
সাধিয়াছ নির্ব্বিচারে অনাগত উন্নতির অসময়ে অন্ত্যেষ্টি সাধন।
অবনত অন্তরের সেই তব শীর্ণ সঙ্কীর্ণতা
সেদিন অযথা
বাণিজ্য বৈভব বিদ্যা বিজ্ঞানের আদান প্রদান
রুদ্ধ করি চিরতরে, অবিশুদ্ধ ঘোর অকল্যাণ
আনিয়াছে ডেকে ;
সেই দিন থেকে
আপনার প্রতিপত্তি অব্যাহত রাখিতে নিয়ত
রচিয়াছ কত
অবৈধ শাস্ত্রীয় বিধি বিধানের বিবিধ প্রাচীর
সবারে করেছে যাহা পরাধীন আজ, হীন-বীর্য্য, দীন নত-শির!
শাস্ত্র শিক্ষা, ব্রহ্ম-বিদ্যা বেদ
স্ববর্ণ ব্যতীত তুমি সবারেই করিয়া নিষেধ
চেয়েছিলে জ্ঞানরাজ্যে একছত্র নিজ অধিকার
তোমার সে প্রতারণা বিবেকের বিরুদ্ধ বিকার
ঘোর ধাপ্পা-বাজী
নিষ্ঠুর ধ্বংসের মাঝে আজি
পড়িয়াছে ধরা!
অকালে এনেছে ডেকে জরা
তোমাদের অত্যাচার অসত্যের ভণ্ড আচরণ,
হত্যা করি দেশের যৌবন!
মূঢ় অন্ধ বিশ্বাসের লভিয়া সুযোগ
অনায়াসে ভোগ

করিয়াছ কয়ান্ত, ভেবেছিলে মনে।
সেই মহা অশুভ কুক্ষণে
ক্ষমতার উচ্চ শৈলে বসিয়া সেদিন, ভাবোনাই একবার
তোমাদের নির্দ্ধারিত পাপপুণ্য হিসাবের ধার
ধারেনা যে আছে হেন জন
তোমাদের প্রবর্ত্তিত স্বর্গ মর্ত্ত্য নরকের বহু উচ্চে তাহার আসন!
সেদিন হেরিয়া অন্তর্যামী
তোমাদের প্রবঞ্চনা আচারের জঘন্য গোঁড়ামী
হেসেছিল মনে মনে একা!
হায়, যদি কোনও মতে সেদিন পাইতে তুমি দেখা
তোমাদের শোচনীয় এই বর্ত্তমান;
আতঙ্কে উঠিত কাঁপি প্রাণ!
বিনাশ নিশ্চিত জানি হয়ত হইতে সাবধান!
জ্ঞান বুদ্ধি বিবেকের করিতে না এতকাল প্রতিপদে এত অপমান
মানুষ হইয়া তুমি মানুষের প্রতি করিয়াছ যেই অবিচার
অনিবার্য্য পরিণাম তার
দুর্গন্ধ পঙ্কের মাঝে তোমারেও আনিয়াছে টানি!
জানি, ওগো, জানি—
ক্ষমতার করি ব্যভিচার,
আজি তুমি ভূপতিত, উপবীত সার—
বিবর্জ্জিত ব্রহ্মবিদ্যা, বেদ-বিধি ব্রাহ্মণত্বলেশ
সুকৃতির ভগ্নস্তূপ; দগ্ধ-স্মৃতি মহিমার, সাধনার ধ্বংস অবশেষ!
তপোভ্রষ্ট হে তাপস!
খুলে ফেল আজি তব জর্জ্জরিত নির্ব্বীর্য্য খোলস,
স্বার্থশূন্য আত্মত্যাগী উদার প্রেমিক চিত্ত ল'য়ে
দাঁড়াও আজিকে এসে সবার মাঝারে এক হ'য়ে!
আপনার অযোগ্যতা করিয়া স্বীকার মুছে ফেল মিথ্যা অভিমান
অতীত গৌরব রত্ন ঋষি মনিষীর করিও না আর অপমান!
স্বদেশের মুখ চেয়ে—'সামুরাই' বীরবৃন্দ সম—
অনুপম
হৃদয়ের বলে
এস দলে দলে
বল, মোরা চাহিনা সে পূর্ব্ব-অধিকার—
ঐশ্বর্য্যের কণামাত্র যার

নাহি আর তোমাদের নিঃশেষিত দরিদ্র-ভাণ্ডারে।
সকলের দ্বারে
নামিয়া দাঁড়াও নির্ব্বিচারে,
বল দর্পভরে—
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কি চণ্ডাল সমান সকলে পরস্পরে!
অস্পৃশ্য, অধম, নীচ, জাতি, বর্ণ, ভেদ নাহি আর,
সকলের সব কাজে সবার সমান অধিকার,
অখণ্ড এ রাষ্ট্র পরিবার—
সবাই আত্মীয় আজ সব আপনার!
একই জননীর পুত্র একদেশ একজাতি সাহোদর সবে
পতিত এ ভারতের উন্নতি আবার সম্ভব হইতে পারে তবে।

শ্রীনরেন্দ্র দেব।
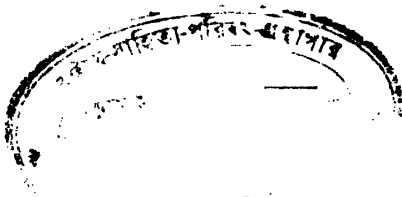
বৈদিক বিষ্ণু ও কৃষ্ণ।

বেদ পাঠ না করিলে পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বোঝা যায় না, কারণ অনেক পৌরাণিক কাহিনীরই মূল বেদে। যেমন ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমশঃ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মে, তেমনি বৈদিক ঋষিদের এক একটি কল্পনা হইতে, এক একটী কবিত্বপূর্ণ কথা হইতে, বড় বড় পৌরাণিক গল্প রচিত হইয়াছে। সেই যুগের এক এক জন ঋষি বা যোদ্ধা—যিনি কল্পিত কি ঐতিহাসিক তাহা নির্ণয় করা এখন আর সম্ভব নহে—তাঁহার সম্বন্ধে বেদে যাহা অতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ এত বিস্তৃত ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে, সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ স্থান সমূহের সঙ্গে তাহা এত জড়িত হইয়া গিয়াছে, যে তাহা এখন ঐতিহাসিক বলিয়া মনে হয়। এই প্রবন্ধে এবং ইহার পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে এই সকল কথার কিছু প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিব।

বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এখন এদেশে ঈশ্বররূপে পূজিত। কিন্তু এই সম্মানের পদ পাইতে তাঁহাদের অনেক শতাব্দী, অনেক যুগ, লাগিয়াছে। বিষ্ণু বেদে, বিশেষতঃ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেবতা। ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ। বিষ্ণু "ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা" (ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ২২শ সূক্ত)—ইন্দ্রের যুক্ত বা উপযুক্ত সখা। তাহা তো হবেনই। বৈদিক বিষ্ণু আর কেহই নহেন, তিনি সূর্য্য। আর ইন্দ্র মেঘ ও বিদ্যুতের দেবতা সূর্য্য বাষ্পাকারে জল আকর্ষণপূর্ব্বক মেঘ সৃষ্টি করিয়া ইন্দ্রের সহায়তা করেন। যাহা হউক,

এই যে সূর্য্যরূপী বিষ্ণু, যিনি খর্ব্বাকার বামন সদৃশ, তিনিই "ত্রিবিক্রম"। পুরাণে এই ত্রি-বিক্রম বা তিনটি পাদক্ষেপের এবং তদ্দ্বারা বলির ছলনার কতই না বর্ণনা! কিন্তু ঋগ্বেদে দেখা যায় এই ত্রি-বিক্রম আর কিছু নহে, আকাশে সূর্য্যের তিনটি সংস্থান মাত্র। প্রত্যুষে সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে চক্রবাল রেখার উপরে, মধ্যাহ্নে আকাশের মধ্যস্থলে, এবং অস্তগমনকালে পশ্চিম চক্রবাল রেখার উপরে থাকে। এই হইল বিষ্ণুর ত্রি-বিক্রম। বামনাবতারের বৈদিক গল্প শুক্লযজুর্ব্বেদের শতপথ-ব্রাহ্মণে আছে। সে বিষয় পরে বলিব। ঋগ্বেদের "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"—বিষ্ণুর সেই পরমপদ – যার অর্থ উপনিষদে দাঁড়াইয়াছে—ব্রহ্মের বিশ্বাতীত নির্গুণ স্বরূপ—তাহা আর কিছু নহে—মধ্যাকাশে সূর্য্যের অবস্থান মাত্র। যাহা হউক, ৭ম মণ্ডলের ৯৯তম ও ১০০তম সূক্তে আমরা আবার বিষ্ণুর দেখা পাই। এই সূক্তকারেরা তাঁহাকে অনেক বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তি হইতে বোঝা যায় কিরূপে তিনি ক্রমশঃ পরম দেবতার আসনে উন্নীত হইয়াছিলেন। গায়ত্রীতেও (১।১৬৪।৪৬) তাঁহার স্থান খুব উচ্চ, যদিও গায়ত্রীর বৈদান্তিক অর্থ তখনও কল্পিত হয় নাই। হংসবতী ঋক্ (৪।৪০।৫) সূর্য্য-বিষয়িণী কিনা সন্দেহ, কিন্তু যদি তাহাই হয় তবে বোঝা যায় যে কোন কোন মন্ত্র-রচয়িতা বিষ্ণুকে পূজ্যতম দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভারত ও বৈষ্ণব পুরাণসমূহে তাঁহার যে স্থান, তাহা প্রাপ্ত হইতে কেবল অনেক সময় নহে, অনেক সংগ্রামও লাগিয়াছিল। সেই সংগ্রামের কথা বেদ পুরাণে উভয়েই আছে। ফলতঃ অবতারবাদ কল্পিত হইবার পূর্ব্বে এবং বিষ্ণুর প্রধান অবতার কৃষ্ণ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সেস্থান প্রাপ্ত হন নাই। অবতারবাদ বৈদিক সময়ের অনেক পরে কল্পিত হয়, কিন্তু বিষ্ণু যেমন বৈদিক, যিনি পুরাণে বিষ্ণুর প্রধান অবতাররূপে অভিষিক্ত হইলেন সেই কৃষ্ণও বৈদিক। আমরা এখন বৈদিক কৃষ্ণের কথা বলি।

মহাভারত ও পুরাণের কৃষ্ণ ধর্ম্মাচার্য্য ও যোদ্ধা দুইই। বেদে দুই কৃষ্ণ, এক জন মন্ত্র-রচয়িতা ঋষি, আর এক জন যোদ্ধা। মহাভারত ও পুরাণে এই দুই বৈদিক কৃষ্ণ মিলিত হইয়াছেন। মহাভারতের কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়, কিন্তু অনার্য্য গোপকুলে প্রতিপালিত। বেদের ঋষি-কৃষ্ণ আঙ্গিরস অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ অঙ্গিরা ঋষির বংশোদ্ভব, কিন্তু যোদ্ধা কৃষ্ণ অনার্য্য। পৌরাণিক কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের সদ্ভাব নাই, নানা স্থানে উভয়ে কলহ ও যুদ্ধ। বৈদিক অনার্য্য কৃষ্ণ ইন্দ্রের ঘোর শত্রু। কিন্তু বেদে ইন্দ্রের নিকট কৃষ্ণ পরাস্ত, পুরাণে সেই পরাজয়ের যথেষ্ট প্রতিশোধ,—প্রতিপদেই ইন্দ্র কৃষ্ণের নিকট পরাজিত ও অপমানিত। যাহা হউক, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬শ সূক্তের ২৩শ মন্ত্রে এবং ঐ মণ্ডলেরই ১১৭শ সূক্তের ৭ম মন্ত্রে আমরা আঙ্গিরস কৃষ্ণের প্রথম দেখা পাই। এই মন্ত্রদ্বয়ের ঋষি কক্ষিবান্ বলেন, কৃষ্ণ এবং তৎপুত্র বিশ্বকায় বৈদিক দেবতা অশ্বিদ্বয়ের উপাসক ছিলেন। বিশ্বকায়ের পুত্র বিষ্ণাপুর মৃত্যু হইলে অশ্বিদ্বয় তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। কৃষ্ণ পুরাণে ঐশী শক্তি সহ পুনরাবির্ভূত হইয়া নিজ গুরু সান্দিপনি সম্বন্ধে এই দৈব কার্য্যের অনুকরণ করিয়াছিলেন। সান্দিপনির পুত্র প্রভাসের নিকট সমুদ্রে পঞ্চজন নামক অসুরকর্তৃক হৃত হয়, কৃষ্ণ সেই অসুরের হাত হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনেন। যাহা হউক, ৮ম মণ্ডলের ৮৫তম সূক্তে পুনর্ব্বার আমরা

আঙ্গিরস কৃষ্ণের দেখা পাই। এই সূক্ত কৃষ্ণের নিজেরই রচিত এবং ইহার দেবতা সেই অশ্বিনৃদ্বয়ই। পরের সূক্ত কৃষ্ণপুত্র বিশ্বকের রচিত। বিশ্বক এবং বিশ্বকায় যে একই ব্যক্তি, তাহা এই দেখিয়া বোঝা যায় যে বিশ্বক এই মন্ত্রে নিজ পুত্র বিশ্বাপুর উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য অশ্বিনৃদ্বয়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। যাহা হউক এই আঙ্গিরস কৃষ্ণকে আরো কয়েকটি সূক্তে এবং মন্ত্রযুগের অবসানে সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা পুনরায় দেখিতে পাই। ছান্দোগ্যে তিনি "দেবকী-পুত্র" এবং আঙ্গিরসবংশীয় ঘোরনামক ঋষির শিষ্য। সে বিষয়ে আমরা পরে বলিব। এখন অনার্য্য যোদ্ধা দ্বিতীয় কৃষ্ণের কথা বলি।

ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডল, ৯৬তম সূক্তে তাঁহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সূক্তের ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ মন্ত্রে একটি যুদ্ধ বর্ণিত আছে। তার এক পক্ষে ইন্দ্র, অপর পক্ষে কৃষ্ণ। স্থান অংশুমতী নদীতীর। "অংশুমতী" বোধ হয় কাবুল নদীর প্রাচীন নাম। কৃষ্ণ দশ সহস্র সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আসেন। এই সেনা যে অনার্য্য ছিল তার প্রমাণ এই যে ইহাকে ঋগ্বেদে "অদেবীঃ" অর্থাৎ দেবপূজা-বর্জ্জিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র বৃহস্পতির সাহায্যে এই সেনাকে বিনষ্ট করেন। এই বেদোক্ত ইন্দ্র-কৃষ্ণের যুদ্ধই পুরাণোক্ত ইন্দ্র ও কৃষ্ণের সমুদায় বিবাদের মূল। পৌরাণিকেরা বৈদিক দেবপূজার স্থলে কৃষ্ণপূজা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পান। কাজেই কৃষ্ণকে অন্ততঃ কতক পরিমাণে বৈদিক প্রধান দেবতা ইন্দ্রের বিরোধী না করিলে হয় না। দুটীমাত্র বিরোধের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করি। প্রথমটী বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন-পূজা উপলক্ষে। গোপেরা ইন্দ্রপূজা করিতে চায়। কৃষ্ণ বলিলেন ইন্দ্র কৃষিজীবী আর্য্যদের দেবতা। আমরা কৃষিজীবী নই, আমরা পশুজীবী গোপ। সুতরাং ইন্দ্রের পূজা না করিয়া আমাদের সেই গিরির পূজা করা উচিত যিনি আমাদের গো-বর্দ্ধন, গো'র আহারদাতা। তার পর কি হইল তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। পৌরাণিক কৃষ্ণের মধ্যে যে অনার্য্য উপকরণ আছে তাহা এই গল্প হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়। কোনও খাঁটি আর্য্য নেতা দেবরাজ ইন্দ্রের পূজার বিরোধী হইতে পারেন না। গোপেরা যে পশুজীবী অনার্য্য ছিল তাহাও এই গল্প হইতে বোঝা যায়। ইহার আরো অনেক প্রমাণ আছে। যাহা হউক্ দ্বিতীয় বিবাদ পারিজাত-হরণ উপলক্ষে। এই বিবাদে এক পক্ষে ইন্দ্র ও অন্যান্য বৈদিক দেবতা, অপর পক্ষে কৃষ্ণ ও তাঁহার সেনা। জয় অবশ্য কৃষ্ণপক্ষেই হইল। ইন্দ্র-কৃষ্ণ-বিবাদের আদি ও অন্ত আমরা কতক বলিলাম। ইহার এক মধ্য আছে—যে সময়ে বিষ্ণু অন্য বৈদিক দেবতা হইতে বড় হইবার চেষ্টা করেন। তখন ইন্দ্রের ইঙ্গিতে বিষ্ণুর শিরশ্ছেদ হয়। সেই গল্প আছে শতপথ-ব্রাহ্মণে। সময়মত তাহা বলিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

গয়ার ইতিহাস।

গয়ালী—
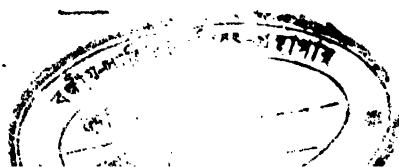
গয়ার ইতিহাস লিখিতে হইলে গয়ালী বা স্থানীয় হিন্দু পাণ্ডাগণের একটা সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত না লিখিলে ইহা সম্পূর্ণ অঙ্গহীন থাকিয়া যায়। গয়ার প্রাচীন ইতিহাসে ইহারা খুব জলন্ত যুদ্ধ বিগ্রহের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। প্যালেষ্টাইন যেমন পাশ্চাত্য দেশের খৃষ্টান ধর্ম্ম উপাসকগণের ক্রুসেডের পরিচয় দিয়া মধ্য যুগের ইতিহাস পৃষ্ঠাকে জলন্ত স্বর্ণ অক্ষরে জাগরুক রাখিয়াছে, সেইরূপ গয়াক্ষেত্র হিন্দুগণের জলন্ত ক্রুসেডক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার বিবরণ পরে লিখিব। এই ইতিহাসের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে হইলে গয়ার গয়ালীগণের বিষয় কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

যেমন মথুরার চৌবেগণ তীর্থপুরোহিত হইতেছেন সেইরূপ "গয়ালীগণ গয়ার তীর্থব্রাহ্মণ হইতেছেন। এখন গয়ালী ঘর সকল প্রায়ই নির্ব্বংশ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের বংশবৃদ্ধির পক্ষে প্রধান অন্তরায় যে প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ইহাদের কুলপ্রথানুযায়ী আর দার পরিগ্রহ করার বিধি নাই এবং কন্যা পাওয়াও দুর্ঘট। কয়েকটি গয়ালী ঘর বেশ সম্ভ্রান্ত, বর্দ্ধিষ্ণু ও ধনী। গয়ালীদিগের মধ্যে অধিকাংশই অলস এবং অসচ্চরিত্র বিশিষ্ট। এইখানকার মধ্যে ৺ ছোটে লাল সিজোয়ার, নারায়ণলাল মাহতা, ৺ রামহরি ঢেঁড়ী, ৺ বিহারিলাল বারীক রায় বাহাদুর, রায় বলদেবলাল নাকফোফা বাহাদুর, ৺ বলদেবলাল খড়খোকা, ৺ নানকুলাল মৌয়ার, ৺ মোতীলাল সেন, ৺ বলদেবলাল টাটক (নেপাল-রাজের তীর্থগুরু), ৺ বলদেবলাল চারিয়ারি, কমলা প্রসাদ আহীর, দুখীলাল মৌয়ার, কৃষ্ণলাল ধোকড়ী, বুল্লকলাল ভীখম ভাইয়া, প্রভৃতি গয়ালীগণের গৃহ বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং প্রখ্যাত। এই গয়ালীগণের নাম ধাম মিলাইয়া গয়ার যাত্রীগণ তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ কল্পিত গয়ার পাণ্ডার গৃহে উপনীত হইতে পারেন এবং সুলভে গয়াকার্য্য সমাধা করিতে পারেন। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটির জীবনী পরবর্ত্তী স্থানে লিখিত হইবে। গয়াশ্রাদ্ধ পূর্ণ অঙ্গ সমাপ্ত করিতে হইলে মোট ৪৫ স্থানে পিণ্ডদান করিতে হয়। কেহ ২১৯ বেদীতে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন কিন্তু তীর্থমালায় ১৬৪টি তীর্থ বেদীর নিদর্শন পাওয়া যায়। পিণ্ডদান ক্রিয়া সমাপনের পর তীর্থগুরু গয়ালীর পাদপূজা করিয়া "সুফল" লইতে হয়। সুফল না লইলে "গয়াকাজ" অছিদ্র ও সম্পূর্ণ হয় না। এই কারণে গয়ালীদের যাত্রীগণের উপর পীড়ন ও অর্থের নিমিত্ত অত্যাচারের অবসর ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে গয়ালীগণ যাত্রীদের উপর অর্থের জন্য অত্যন্ত পীড়ন ও অত্যাচার করিত, কিন্তু এখন তাহা ক্রমশঃ দমিত হইলেও স্থানে স্থানে পীড়নের মাত্রা বড় কম নাই। গয়ালীগণ নিজেদের বাটীতে অথবা "অক্ষয়বট" তীর্থে দক্ষিণাদি লইয়া গয়া কার্য্যান্তে যাত্রীদের "সুফল" দিয়া থাকেন। অক্ষয়বট তীর্থে পিণ্ডদান ও পূজন করিলে পিতৃগণের অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। পঞ্চক্রোশের মধ্যে প্রথম শ্বেতবরাহ কল্পের প্রথম ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্র গয়াশ্রাদ্ধ করিতে অত্রস্থানে

আইসেন বলিয়া রামায়ণ ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। ব্রহ্মা যখন গয়াতীর্থ প্রথম কল্পিত করেন তখন গয়ালীগণকে ৫৫ গ্রাম এবং প্রভূত স্বর্ণ রৌপ্যাদির পর্ব্বত দিয়াছিলেন। কালক্রমে গয়ালীদের লোভও দুর্ভাগ্যবশতঃ সবই নষ্ট হইয়াছে; এমন কি তাঁহাদিগকে প্রদত্ত ভূমিও পরহস্তগত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পরভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে তাহার ফলভোক্তা ভূস্বামীর পিতৃগণ হইয়া থাকেন; সেইজন্য গয়ার যাবতীয় বেদীতে গয়ালীগণ যাত্রীদের নিকট হইতে ৴৫ একপয়সা করিয়া ভূস্বামীর কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। গয়ার মধ্যে সকল বেদীই "চৌদ্দসাহী পঞ্চের অধিকারভুক্ত হইতেছে। নিম্নে বেদীদের তালিকা এবং করগ্রহণের হার লিখিত হইল :—

বেদী	অধিকারী	করের হার
উত্তর মানস	চৌদ্দসাহী	এক পয়সা
উদিচীকনখল	"	"
দক্ষিণ মানস	"	"
ধর্ম্মারণ্য	"	"
মাতঙ্গী	"	"
ব্রহ্মসরোবর	"	"
গদালোল	"	"
ভীমজানু	"	"
কাগবলী	"	"
গয়াশীর	"	"
গয়াগজ	"	"
সীতাকুণ্ড	"	"
তারক ব্রহ্ম	"	"
বড় অক্ষয় বট *	"	৵১০
ছোট অক্ষয় বট	"	৴৫
বিষ্ণুপদ	"	"
আম্রসেচন	"	"

গয়াকূপ এবং মঙ্গলা গৌরীর নিম্নস্থ গোপ্রচার তীর্থদ্বয় গয়ালীগণের ভোগপত্নী সন্তানদের বা সুরতওয়ালাদের হাতে ন্যস্ত আছে। ইহার আয় তাহারাই ভোগ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি বেদী আছে তাহা কোন কোন গোয়ালীর স্বতন্ত্র অধিকারভুক্ত। যেমন—

জিহ্বালোল	হিরালাল চৌধুরী	৴৫

* ইহাই ব্রহ্মাকল্পিত আদি এবং প্রাচীন তীর্থ। ক্ষুদ্র অক্ষয় বট পর কল্পিত এবং ইহা গয়ালীগণের পয়সা রোজগার করিবার অন্যতম উপায় মাত্র। হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থে তথা গয়া মাহাত্ম্যে বা গরুড় ও বায়ুপুরাণে ছোট অক্ষয় বটের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ধৌতপদ *	শ্যামলাল গুপ্ত ও নারায়ণ লাল গুপ্ত	৫
আদি গদাধর	বাপুলাল বারিক	৫
আদি গয়া—	কানাইলাল মউয়ারের পুত্র (রামজী ও শ্যামজী)	৫
গায়ত্রী ঘাট	নরসিংহ লাল মাহতো	"
মুণ্ডপৃষ্ঠা	রামলাল ধোকড়ী	৫
ব্রহ্মগয়া	বাপুজী ভৈয়া	"

গয়ালীগণ ফল্গু, বিষ্ণুপদ এবং অক্ষয় বট ছাড়িয়া অপর সকল তীর্থে ৫ করিয়া ভূস্বামীর কর নিজ ২ যাত্রীদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন। স্বতন্ত্র বেদীর কর বেদীপতি একাই গ্রহণ করিয়া থাকেন কিন্তু যেগুলি সাধারণ বেদী, তাহার নিয়ম এই যে, যে কয়জন গয়ালী আদায়ের সময় উপস্থিত থাকেন তাঁহারাই তাহা সমঅংশে বিভাগ করিয়া লন এবং এক অংশ বেদীর হয়, অর্থাৎ এই সামান্য "বৃত্তি" হইতে বেদীর সংস্কার পূজাদি সমাহিত হইয়া থাকে। বেদীর দান বা কর গয়ালী ভিন্ন অপর কাহারও লইবার অধিকার নাই। যে যে বেদীতে যে যে গয়ালী উপস্থিত থাকিবেন তিনিই এই করের অংশ পাইবেন, ঘরে বসিয়া এই করের অংশ ভাগী কোন গয়ালী হইতে পারেন না। সকল বেদীরই বিভক্ত কর হইতে এক অংশ পূজা সংস্কারাদির জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপদে সকল গয়ালীর ভিক্ষা করিবার অধিকার আছে। পাদপদ্মে যে "চড়াই" হয় তাহা উপস্থিত গয়ালীগণ ভাগ করিয়া লন, পিণ্ড দত্তকের গয়ালী বা তাঁহার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন তাহা হইলে তিনিই সমুদয় দান বা প্রদত্ত বৃত্তি পাইয়া থাকেন। এই থানে প্রত্যেক বঙ্গবাসীর নিকট হইতে /১০, দক্ষিণাত্য বাসীগণের নিকট হইতে ৴১৫ তিন পয়সা এবং অন্যান্য যাত্রীদের নিকট হইতে ৴১০ অর্দ্ধ আনা কর বা প্রবেশ-শুল্ক গয়ালীগণ আদায় করিয়া থাকেন। কুণ্ডের মধ্যে "চড়" পয়সা যজমানের গয়ালী তথায় উপস্থিত থাকিলে তিনি সমুদয়ই পাইয়া থাকেন, নচেৎ মন্দিরে উপস্থিত অপর যাবতীয় গয়ালী তাহা সমাংশে ভাগ করিয়া লইতে পারেন। সন্ধ্যার পরের "চড়াই" গৌতম গোত্রীয় ভৈয়া গয়াপাল ছাড়া অপর কোন গয়ালী তাহা লইতে পারেন না; ইহার মুখ্য কারণ এই যে রাত্রি কালের দক্ষিণা, পূজা, ঠাকুর প্রণামী, চড়াই, চরণ পূজাদি যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা কেবল মাত্র গৌতমগোত্রীয় ভৈয়া গয়াপালগণ পাইয়া থাকেন, যে হেতু যখন রিশাল ভৈয়া গয়াপাল চক্রান্ত করিয়া পূর্ণা চৌধুরাণী গয়াপালনীকে হত্যা করেন, তখন তিনি নর হত্যা পাপে লিপ্ত হওয়া প্রযুক্ত গয়াপালগণ একমত হইয়া তাঁহাকে এই রাত্রির "বিষ্ণুপদ" পূজার বৃত্তি দান করিয়া দিলেন। বিষ্ণুপদ, অক্ষয় বটাদি তীর্থে যাত্রীগণ ভূর্জ্জোৎসর্গও করিয়া থাকেন; তাহার প্রাপ্য গয়াপালগণ পাইয়া থাকেন কেবল মাত্র তীর্থের প্রবেশ বৃত্তি যাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহা "চৌদ্দসাহী" সাধারণ সমিতি গ্রহণ করিয়া সংস্কার পূজাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। চৌদ্দসাহী সমিতির কার্য্যকারক কর্ম্মচারীগণ পালানুসারে গয়াপাল সম্প্রদায় হইতেই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এক কর্ত্তা থাকেন; তিনি কর্ম্মত্যাগের সময় অপর নির্ব্বাচিত সভ্যকে নিকাশ দিয়া

* এই বেদী লইয়া কিশুন লাল মেহরওয়ারের সহিত গুপ্ত এবং ভরদার পাটনা হাইকোর্টে মোকর্দ্দমা হইয়া ভরদা ও গুপ্ত জয়লাভ করিয়াছেন।

থাকেন। গয়ালীগণের কর্ম্মগত বৃত্তি হইতেছে। যে গয়ালী কোন যাত্রীর প্রদত্ত সনন্দ বা পূর্ব্বপুরুষের নাম ধামের নিদর্শন স্বীয় পুস্তকে দেখাইতে পারেন তিনিই তাঁহার গয়ালীরূপে কল্পিত হইয়া থাকেন। ইংরাজ রাজের এদেশে অভ্যুদয়ের প্রারম্ভ কাল হইতে অদ্যাবধি আদালতে বহু মামলা মকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে তাহা সবিশেষ পাঠ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গয়ানগরের চতুর্দ্দিকে চারিটি ফটক বা তোরণ অতি প্রাচীন কাল হইতে বিরাজমান ছিল। এই চতুঃসীমার মধ্যে কোন মুসলমান বাস করিতে পারে না এবং মুসলমানগণ "আজান" দিতে পারেন না। গয়ার জমী "মদৎমাস" ভুক্ত হইতেছে; ইহার জন্য কাহাকেও কর বা খাজনা দিতে হয় না। চৌধুরীখানার জমী বিক্রয় হয় না। সম্বৎ ১৭৬৯ সালের একখানি প্রাচীন পূর্ণ চৌধুরাণীর দত্ত বিশাল ভাইয়া গয়ালীর নামীয় কবলা পত্র দৃষ্ট হয়; পরবর্ত্তী প্রায় ১০০ শত বৎসরের মধ্যে চৌধুরীখানার জমীর কবলাদিসূত্রে হস্তান্তরের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইংরাজি ১৪৫৯ হইতে ১৩৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যোধপুররাজ যোধসিংহ যাত্রিদের উপরকার ৪০৲ টাকা সিক্কা কর দিল্লীর সম্রাট দেশে রহিত করান; এবং ১৮০৯ সালে বাদসাহ দ্বিতীয় সাহ আলমের ফার্ম্মান অনুসারে গয়াগত যাবতীয় যাত্রীর উপর বাৎসরিক ১৮৯১৪৲ টাকা সিক্কা যে নির্দ্ধারিত ছিল, তাহা রহিত করা হয়। ইংরাজ অধিকারের প্রথম অবস্থায় ও এরূপ সামান্য কর যাত্রীদের নিকট হইতে আদায় হইত। মিঃ ফ্রান্সিস্ গিলান্‌ডার্স এই যাত্রীকর আদায়ের কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার প্রদত্ত একটি ঘণ্টা গয়ার বিষ্ণুমন্দিরের নাটমন্দিরে ঝুলিতেছে; তাহা প্রত্যেক পথিক দেখিতে পাইয়া থাকেন। ভারতে লজিং হাউস টেক্সরূপে এখন পিলগ্রীম একট্ মতে প্রতি যাত্রীর নিকট হইতে ১৲ করিয়া কর গয়ার মিউনিসিপালিটী আদায় করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বকালে প্রাচীন রাজাগণ কর্ত্তৃক দুইবার বিষ্ণুমন্দির সংস্কৃত ও নির্ম্মিত হইয়াছিল; ৺নৃসিংহ-দেব ও ৺পুণ্ডরীকাক্ষদেবের মন্দিরের গাত্রে দুইটি প্রস্তরফলক গ্রথিত আছে তাহা পরে বিবৃত করিব। প্রাতঃস্মরণীয়া ইন্দোররাজরাণী অহল্যাবাই এই মন্দির ১৭৯৫ সালে বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত করেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ৺বিষ্ণুপদের মন্দিরের পূর্ব্বাবস্থার স্থাপত্যে দেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। গয়ার প্রখ্যাত গয়াপাল বাবু বালগোবিন্দ সেন মহারাজ ১৩০০ সালে বিষ্ণুপদ মন্দিরের শিখরদেশে স্বর্ণনির্ম্মিত ধ্বজা সংস্থাপন এবং ১৩১৪ সালে বিষ্ণুর পাদচিহ্নের চতুর্দ্দিকে রজতময় বেষ্টনী বা "হৌজ" নির্ম্মাণ করাইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই সেনজি মহারাজ প্রাচীন গয়ানগরের উত্তর তোরণের সন্নিকট বাবু রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীর সম্মুখে বহু অর্থ ব্যয়ে এক দেবালয়, সদাব্রত ব্যবস্থা ভিক্ষাদান প্রতিষ্ঠা করিয়া পাঠশালাদি দিয়াছেন। বিষ্ণুপদ মন্দিরের দক্ষিণ যে সুন্দর ৺জগন্নাথদেবের মন্দির দৃষ্ট হয় তাহা গয়া-পালাগ্রগণ্য মদ্‌পিতৃবন্ধু ৺বিহারীলাল মেহরওয়ার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ৺গদাধর ঘাটের অব্যবহিত উত্তর যে সুন্দর নূতন প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট দৃষ্ট হয় এবং যাহার উপর শতসহস্র যাত্রী প্রবাস বাস কষ্ট বিস্মৃত হইয়া সহাস্য বদনে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে "ফল্গুতীর্থ" বেদীতে পিণ্ডদান করিয়া কৃত-কৃতার্থ মনে করেন তাহা গয়ার গয়ালীকুলমুকুট ও শিরোমণি ৺ছোটে লাল সিজুয়ার মহোদয়ের দ্বারা বহু অর্থ ব্যয়ে ১৮৯৫।১৮৯৬ সালে নির্ম্মিত হয়। গদাধরঘাট ৺রাণী অহল্যা

বাইর ভৃত্যের দ্বারা এবং মুন্সীঘাট তদীয় মীর মুন্সী ৺লছ্‌মন মুন্সীর দ্বারা ১৮১৫।১৮১৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সূর্য্যকুণ্ডের ঘাট এবং চৌদিককার প্রাচীর ১৮৫০ সালে টিকারী রাজ মহারাজা মিত্রজীৎসিংহ বাহাদুর গয়া শ্রাদ্ধান্তে প্রাচীন গয়ানগর গয়াপালগণকে দান করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। গয়ানগরের মুর্চ্চা মহল্যার অন্তর্গত প্রাচীন ৺কেশব দেবের প্রাচীন মন্দির গয়াপাল কুলগৌরবা শ্রীমতি আইনাবাই পাহাড়ীন্ বহু অর্থব্যয়ে পুনঃ সংস্কার করাইয়া ১৩১২ ফশলী সালে সদাব্রত, দান, পাঠশালা, ও পুজাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মুড়লী পাহাড়ের উপর যে মন্দির বহু ক্রোশ দূর হইতে গয়া নগরে আগন্তুক পথিকের নয়ন ও মন মুগ্ধ করে, তাহা শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ ৺গোপাল মিশ্র ভিক্ষালব্ধ অর্থে ১৮৮৪ সালে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এই মুড়লী পর্ব্বতের উত্তর দিকে নিম্নস্থানে ভৈরব মন্দির এবং এই পর্ব্বত মধ্যে আকাশগঙ্গা পাতালগঙ্গা এবং উর্দ্ধে অগস্ত্যকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থ অবস্থিত আছে, তাহা পরে বিবৃত করিবার ইচ্ছা আছে। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

বিপিন বাবুর কঃ পন্থা ?

সর্ব্বজন পরিচিত অসাধারণ বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় অগ্রহায়ণ সংখ্যা নব্যভারতে "কঃ পন্থা ?" নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহা পাঠ করিয়া আমরা ক্ষুব্ধ না হইয়া পারি নাই।

যখন কোন লোক স্বজনগণের উপর কোন কারণে বিরক্ত হইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়—আত্মীয়তা ভুলিয়া পরজনের ন্যায় আচরণ করিতে থাকে; তখন তাহার রিপু বিশেষের দ্বারা আবৃত বুদ্ধির সমীপে সুবিচারের আশা করা যায় না। সে বুদ্ধি শুধু ঘরের ত্রুটির কথাই খুঁজিয়া বাহির করে, স্বজনগণের দোষ আবিষ্কার করিতেই ব্যস্ত হয়।

বিপিনবাবু বরিশাল হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিত্ব সম্পন্ন করিয়া আসিয়াই জাতীয় মহাসমিতির সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন; ইহা অনেকেই জানেন। বরিশালে বিপিনবাবুর প্রতি অশিষ্টাচার প্রদর্শিত হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। ইহাতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। মতভেদ হইলেই শিষ্টাচার বর্জ্জন করিতে হইবে, মান্য ব্যক্তির অপমান করিতে হইবে, ইহা আর্য্যপ্রথা নহে। রক্ত মাংসের শরীরে ইহাতে ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে, মর্ম্মবেদনা দুঃসহ হইতে পারে, কিন্তু আত্মঘাতী প্রবৃত্তি বিচক্ষণ ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও স্থান লাভ করিতে পারে না। বিপিন বাবু কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করায় সাধারণকে তাঁহার দেশবাৎসল্যের প্রতি সন্দিহান হওয়ার সুযোগ তিনি দিয়াছেন বলিয়া আমাদের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে।

তিনি কোথায় দেশের পথ প্রদর্শক হইবেন, না এখন পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কঃ পন্থা ?' পাল মহাশয় বলেন, "কংগ্রেসের নূতন আইন করিতেছেন

যে, বৈধ ভাবে এবং নিরুপদ্রবে স্বরাজ লাভ করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। স্বরাজটী চরম লক্ষ্য নহে। যদি তথাকথিত বৈধ উপায়ে ও নিরুপদ্রবে এই স্বরাজ মিলে, তবেই তাহাকে বরণ করিয়া লইব। অন্যথা এই উপায় ব্যতীত যদি স্বরাজ লাভ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে স্বরাজকে বর্জ্জনই করিয়া যাইব।”

সত্যই কি কংগ্রেসের নূতন আইন এইরূপ বলেন? স্বরাজ লাভ কংগ্রেসের চরম লক্ষ্য নয়—স্বরাজ লাভের উপায় বিশেষই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, এইরূপ ব্যাখ্যা দার্শনিকের মস্তিষ্ক প্রসূত হইতে পারে। পরন্তু কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই উহা বুঝিবেন না, আর ইহাও বিশ্বাস করিবেন না যে, কোন একটী উপায়ের সাহায্যে স্বরাজ লাভ না হইলে স্বরাজকে বর্জ্জন করিয়াই যাইবেন। নাগপুর কংগ্রেসে স্বরাজ লাভের জন্য যখন যেরূপ উপায়াবলম্বন সমীচীন বোধ হইবে, তাহাই অবলম্বন করার প্রস্তাব কর্ত্তারা গ্রহণ করেন নাই, এরূপ উক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম হইল না। এ স্থলে বোধ হয় কর্ত্তা শব্দে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি কংগ্রেসে কি ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছায়ই প্রস্তাব গৃহীত হইয়া থাকে? লোকমতের আধিক্যের অপেক্ষা রাখে না? যদি লোকমতের দ্বারা প্রস্তাব গৃহীত হইবার নিয়ম থাকে, তবে কর্ত্তাদের স্কন্ধে দোষ দেওয়া চলে কি? যাহার প্রস্তাব লোকমতের সহানুভূতি লাভের যোগ্য হয় তাহাই গৃহীত হইতে পারে। আনার প্রস্তাব মূল্যবান মনে হইলেও লোকমত সমর্থন না করিলে ইহাই বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমানে প্রস্তাবটি গ্রহণের যোগ্য নয়। কংগ্রেস চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় বৈধ ও নিরুপদ্রব আন্দোলন ভিন্ন পাশবিক বলের আশ্রয় লইয়া স্বরাজ লাভ সম্ভব নহে। “ঢাল নাই তরোয়াল হীন নিধিরাম সর্দ্দারদের” পক্ষে নৈতিক বলের শরণ লইয়াই স্বরাজ লাভ করিতে হইবে। তাই এই পথকেই সুনিশ্চিত পথরূপে অবধারিত করা হইয়াছে। এই পথে চলিয়া যদি সাফল্য না ঘটে, তবে অন্য উপায় অবলম্বনের কথা আসিতে পারিবে। শুধু নানাবিধ ঔষধের ব্যবস্থা করিলে রোগ সারিবে না—যে ঔষধের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হইবে, তাহা সেবন করিতে হইবে—রোগ, মুক্তির পথে না আসিলে অবশ্যই অন্য ঔষধ সেবনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইতে পারে। সেবন না করিয়াই এই ঔষধে কোন ফল হইবে না এ কথা বলাও যেমন জ্ঞানীর অযোগ্য এই ঔষধে ফল না হইলে আর কোন ঔষধ ব্যবহার করিব না, ইহাও তেমনই অজ্ঞানের গোঁড়ামী মাত্র। জাতীয় কার্য্যে শুধু নয়, সবকাযেই গোঁড়ামী পরিত্যাজ্য।

জাতীয় মহাসমিতি ভারতের জ্ঞানী গুনী বিদ্বান ও চিন্তাশীলগণের সম্মিলন ক্ষেত্র। উহাতে গৃহীত প্রস্তাব সকলেরই শিরোধার্য্য করা কর্ত্তব্য। উহা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রতিকূলে হস্ত প্রসারণ করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। পথের কথা না তুলিয়া কংগ্রেস নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া স্বরাজ লাভের আনুকূল্য করিবার জন্য শক্তিধর বিপিন চন্দ্রকে এখনও আমরা শতবার অনুরোধ করি। আমাদের সাগ্রহ অনুরোধ কি সফল হইবে না?

“স্বরাজ বলিতে কি বুঝিব, তাহা আজিও ভাল করিয়া খুলিয়া বলা হয় নাই।” বিপিনবাবুর এ অভিযোগটী সত্য। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার অনুগামীবৃন্দ স্বরাজ শব্দের নানা ব্যাখ্যা

দিয়াছেন। যিনিই যে অর্থ করুন, স্বরাজ শব্দের সহিতই তাহার প্রকৃত অর্থ জড়িত আছে। স্বরাজ যে রাষ্ট্রীয় বস্তু বা আদর্শ ইহা অস্বীকার করিবার কাহারও সাধ্য নাই। যিনি যেরূপ ব্যাখ্যাই করুন, স্বরাজ যে আত্ম-নিয়ন্ত্রিত রাজ্যকেই বলে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আত্ম-নিয়ন্ত্রিত রাজ্য বা স্বরাজ লাভ করাই ভারতবাসীর চরম লক্ষ্য। এই স্বরাজ সাধারণ তন্ত্র বা রাজতন্ত্র উভয়ই হইতে পারে। দেশের অবস্থা বুঝিয়া স্বরাজের পদ্ধতি নির্দ্দেশিত হইতে পারিবে তখনই, যখন পরহস্তচালিত শাসনযন্ত্র ভারতবাসীর স্বাধিকারে আসিবে। ইহা নূতন কথা নহে। স্বরাজ কিরূপ হইবে, তাহা খুলিয়া না বলিলেও পর হস্ত হইতে শাসনযন্ত্র নিজ হস্তে আনিবার জন্য প্রযত্ন অবৈধ নহে। অষ্ট্রীয়ার হস্ত হইতে মহাত্মা গ্যারিবল্‌ডী যখন ইটালীর উদ্ধার সাধন করেন, তখন স্বরাজ কিরূপ হইবে তাহা দেশবাসীদের সঙ্গে পূর্ব্বেই সুস্থির করিয়া লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন নাই। অষ্ট্রীয়ার শাসনের উচ্ছেদের নিমিত্তই প্রাণপণ লড়িয়াছিলেন। যখন কৃতকার্য্যতা লাভ করিলেন, স্বরাজ লব্ধ হইল, তখন দেশীয় রাজকুমারকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া স্বরাজকে রাজতন্ত্রে পরিণত করিলেন। আমাদেরও স্বরাজ ব্যাখ্যায় সময়ক্ষেপ না করিয়া পর-শাসনের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য সর্ব্বাগ্রে শক্তি প্রয়োগ করা সমীচীন। স্বরাজ লাভ হইলে তাহার প্রকার ভেদ আপনি হইয়া যাইবে। সেজন্য উদ্বিগ্ন না হওয়াই কর্ত্তব্য।

নানা কারণে দেশের লোক যে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বিপিনবাবুও স্বীকার করিয়াছেন। "স্বরাজের অর্থ না বুঝিলেও সাধারণ লোকে এইটুকু বুঝিয়াছে যে স্বরাজ হইলে আর ইংরাজরাজ থাকিবে না।" আমরা বলি আরও একটু বুঝিয়াছে ও আশা করিতেছে যে, তাহাদের নিজের রাজ্য হইবে। স্বরাজ লাভের জন্য সাধারণের এই জ্ঞানই যথেষ্ট। এই জ্ঞানের সহায়তায়ই তাহারা দেশের স্বরাজ লাভের জন্য সর্ব্ববিধ ত্যাগ স্বীকার করিতে সমর্থ হইবে।

বিপিন বাবুর ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরই অনুপায়। তাঁহারা স্বরাজ মূর্ত্তি সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ না করিয়া কখনও কার্য্য ক্ষেত্রে নামিতে পারিবেন না। যতক্ষণ তাঁহাদের মনের মত স্বরাজ ব্যাখ্যা তাঁহারা না পাইবেন, কিছুতেই স্বরাজ কর্ম্মীদের কর্ম্মের বৈধতা ও আন্তরিকতা স্বীকার করিবেন না, বা তাহাদের কর্ম্মের সহায়তা করিবেন না। তাহার প্রমাণ আলোচ্য প্রবন্ধেই আছে। পাল মহাশয়ের দুঃখ, স্বরাজ পন্থীরা কথায় কথায় হরতাল ও ধর্ম্মঘট করিতেছে, চারিদিকে সরকারের প্রতাপ চক্ষের উপর নষ্ট হইয়া যাইতেছে দেখিয়াও সরকার অসাধারণ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া আছেন। কঠোরতা অবলম্বন করিবার ইঙ্গিত ইহাতে যেন বেশ আছে মনে হয়। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের রুদ্রমূর্ত্তির কার্য্য দর্শনে আশা করি, তিনিও সুখানুভব করিতে পারিবেন না।*

ইংরাজ শাসন হইতে যে আমাদের স্বরাজ উৎকৃষ্ট হইবে না, তাহার প্রমাণ তিনি চাঁদপুরের ধর্ম্মঘটের বিবরণের মধ্য হইতে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। চাঁদপুরে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার

* দেখিয়া সুখী হইলাম এই প্রবন্ধ লিখিত হইবার পরে বিপিনবাবু গবর্ণমেণ্টের রুদ্রনীতি দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রতিবাদ স্বরূপ ম্যানিফেষ্টোতে দস্তখত করিয়াছেন।

হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল। "কংগ্রেস কমিটির সহি করা ছাড় পত্র ভিন্ন সরকারী কর্ম্মচারীগণ কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে নাই।" সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইবে। "সয়তানী ইংরাজ রাজের শাসনাধীনেও ভারতবাসীর যেরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, এই স্বরাজ পন্থীদের শাসনে তাহাও থাকে না।" ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়া এই স্বরাজ লাভ করিতে তিনি চাহেন না। ইংরাজ রাজত্বে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে, ইহা যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্যষ্টির সমষ্টি যে জাতি তাহারও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন আছে? জাতি যেখানে স্বাতন্ত্র্য বর্জ্জিত সেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতার অর্থ কি? ইহা তার্কিকের তর্কজাল মাত্র। আমি ২টী হরিণ শিশু কিনিয়া একটীকে যদি শিকলে আবদ্ধ না করিয়া আমার বাগানের প্রাচীরের মধ্যে চরিয়া খাইতে ছাড়িয়া দিই, তবে সেই হরিণটী যদি বুক ফুলাইয়া বলে আমি ব্যক্তিগত পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি, তাহা হইলে হাস্যকর হইবে কি না? ইংরাজ রাজের শাসনাধীনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কতটুকু আছে তাহা ভুক্তভোগীগণ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন। ইংরাজরাজের যশ গান করিতে যাইয়া অযথা উক্তি দ্বারা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা নিতান্ত নিন্দনীয়। চাঁদপুরের ঘটনায় আমরা এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, স্বেচ্ছায় দেশবাসী নেতার আদেশ পালনে অভ্যস্ত হইয়াছে—দুঃখ যন্ত্রণা শির পাতিয়া লইতে শিখিয়াছে। সকল দেশেই জাতীয় স্বার্থ রক্ষার অনুরোধে নেতার আদেশ পালন করিতে যাইয়া লোকে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেয়। চাঁদপুরেও তাহাই হইয়াছে। তজ্জন্য নিখিল ভারতের স্বরাজ মূর্ত্তি কলঙ্ক-মণ্ডিত করিতে যাওয়া শক্তির অপব্যবহার মাত্র। স্বরাজ লাভ হইলে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পুষ্টি লাভ করিবে, কখনও ক্ষুণ্ণ হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। তবে এ সত্য গোপন করা যায় না যে, সমাজবদ্ধ জীবের সমাজের কল্যাণের জন্য, শান্তি শৃঙ্খলার অনুরোধে, ব্যক্তিত্বকে অনেক সময় সঙ্কুচিত করিতে হয়—না করিয়া উপায় নাই। স্বরাজ হইলে, যাহা স্বেচ্ছায় লোকে করে, পর রাজের অধীনে তাহা অনিচ্ছায় করে, ইহাই প্রভেদ। পররাজ প্রায় সর্ব্বদাই ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের বাধা জন্মায়—স্বরাজ ব্যক্তিত্বের বিকাশ পথ প্রসারিত করিয়া দেয়। স্বরাজ পররাজের পার্থক্য এই খানে।

বিপিনবাবু ঘর ছাড়িয়া পরের ঘরে আশ্রয় লইয়াছেন; বর্ত্তমান স্বরাজ আন্দোলনের বিপক্ষে তাঁহার শক্তিশালী লেখনী ধারণ করিয়াছেন ইহা আমাদের দুঃসহ বেদনাদায়ক। যাঁহাকে বঙ্গের তিলক মনে করিয়াছিলাম তিনি আজ কোথায়? ইহা ভাবিতেও আমাদের কষ্ট হয়। ইচ্ছা হয় তাঁহাকে বলি, "এস হে, ফিরে এস, ঘরের ছেলে ঘরে। আর থেক না পরের ঘরে অভিমান করে।" তিনি আমাদের কথা শুনিবেন কি? এতদিনের অর্জ্জিত, মান প্রতিপত্তি যশোরাশি যে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহা কি তাঁহার চিন্তার বিষয় হইবে না? ভগবান তাঁহার সুমতি প্রদান করুন। তাঁহার মতন শক্তিমান নেতা প্রকৃতপথের সন্ধান লাভ করিয়া দেশমাতৃকার সেবায় আত্ম সমর্পণ করিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করুন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

দুইদিক্ (৩)

(প্রধানতঃ নব্যভারতের কয়েকটী প্রবন্ধ স্মরণে লিখিত)

১ম। সর্ব্বতোভাবে দোষশূন্য বা গুণশূন্য জিনিষ জগতে নাই। ভারতীয় স্পর্শ বিচারেরও পক্ষ সমর্থন করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে দোষের ভাগ অত্যধিক। বর্ত্তমান আন্দোলনই তাহার প্রমাণ।

২য়। মানুষ মুগ্ধভাবে কোন কিছুর অনুবর্ত্তন করিলেই তাহাতে বাড়াবাড়ি আনিয়া ফেলে। অন্নে বস্ত্রে এমন কি বিদ্যায় পর্য্যন্ত বাড়াবাড়ি আছে। স্পর্শবিচারও ধর্ম্মবুদ্ধির বাড়াবাড়ি,—সুতরাং বিকৃতি। বিরাট গৃহে বৃকোদরের পাচকত্বে যে বহু ব্রাহ্মণও সংকৃত হইতেন না এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। সুবর্ণবণিক্ উদ্ধরণ দত্তের অন্ন পরিবেশনে ব্রাহ্মণগণও আসন ত্যাগ করেন নাই। আজিও ৺ জগন্নাথক্ষেত্রে অন্নবিচার নিষিদ্ধ। এদিকেও শিক্ষা রেল, ষ্টীমার ও অফিসের শাসনে স্পর্শবিচার আপনা হইতেই সংকুচিত হইতেছে। কিন্তু মূলতঃ জিনিষটী খারাপ নহে। অন্নে, বস্ত্রে স্বাতন্ত্র্যরক্ষা চিকিৎসাশাস্ত্রের বিধান। রুচিভেদের কথাও স্মরণীয়। জীবহিংসাশূন্য দেবগৃহে যে যুবক পালিত, মাংসবিক্রেতার অন্ন কিছুতেই সে গ্রহণ করিতে চাহিবে না। ধর্ম্মজীবনেও স্পর্শের প্রভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে—যীশুখ্রীষ্ট অপবিত্র স্পর্শ বুঝিতে পারিতেন, ধর্ম্মজীবনের যাঁহারা প্রথম সাধক তাঁহারাও অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অন্ন-বিচার মানিয়া চলেন। স্পর্শ সম্বন্ধে এই বিচারটুকু সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কোন আন্দোলনেই ইহা নিরাকৃত হইবে না। আর না হইলেও ক্ষতি নাই, প্রীতিই যাঁহাদের তপস্যা তাঁহারা ব্যক্তিগত কারণে বাহিরের দূরত্ব রক্ষা করিলেও সহৃদয়তায় সকলকেই আপন করিতে পারিবেন। ঘৃণাবুদ্ধির নিরসনই গান্ধীজীরও উদ্দেশ্য, বিচারবুদ্ধির নহে। তাঁহার ন্যায় ধীর ও সুবিবেচক ব্যক্তির পক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া অসম্ভব।

১ম। অহিংস অসহযোগের দুরূহ মার্গে দেশশুদ্ধ লোককে আহ্বান করিয়া তিনি যে নিজেই বাড়াবাড়ি করিতেছেন, এবং ফলে বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলের উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

২য়। সত্য সকলের জন্য, কোথায় রত্নাকরের মধ্যে বাল্মীকি লুকাইয়া আছেন কে বলিতে পারে? গুরুর আসনে যিনি উপবিষ্ট তিনিই অধিকার বিচার করিবেন, কিন্তু বিনয়ী ব্যক্তি যিনি সকলের নিকটই শিক্ষা করিতে প্রস্তুত তিনি সে উচ্চাসন গ্রহণ করিবেন কেন? গান্ধীজি কোন দিন তাহা করেন নাই,—তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যে পন্থাকে ফলপ্রদ বলিয়া জানিয়াছেন তাহাই বিশ্বাসের জলন্ত ভাষায় লোকসমক্ষে প্রচার করিয়াছেন। জনসাধারণ তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া সেই পন্থার সমর্থন এবং বহু ক্ষেত্রে অনুবর্ত্তনও করিয়াছে। আর যদি কোথাও না করিয়া থাকে তাহাতেই বিস্ময়ের কথা কি আছে? অহিংসার মত কঠিন আর কিছুই নাই। প্রহার লাভের পর চুপ করিয়া থাকা অস্বাভাবিক। মনুষ্যের যাত্রা পশুত্ব হইতে দেবত্বের দিকে,—সেই গন্তব্য স্থানে যে মানুষ

পৌঁছে নাই তাহার পক্ষে প্রতিশোধপ্রবৃত্তি নিতান্তই সহজ ও স্বাভাবিক। এই প্রকৃতি ধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে হইলে দীর্ঘসাধনার প্রয়োজন হয়। কেবল দুদিন গান্ধী মহারাজের জয়োচ্চারণ করিলে সে সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। তাছাড়া এখানে গুরু শিষ্যে দেখা নাই, সাধনার শিক্ষানবিশীর চেষ্টামাত্রও নাই। সুশিক্ষিত পুলিশ ও সৈন্য যখন সুপরিচিত নায়কের অধীনেও সকল সময় আত্মসংযম করিতে পারে না, তখন অশিক্ষিত জনসাধারণ নায়কহীন অবস্থায় যদি তাহা না পারিয়া থাকে তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? এখানে গান্ধীজির দায়িত্ব মাত্রও নাই। এই যে সেদিন খ্রীষ্টান নামধারী কোটি কোটি লোক ধরাতল নর-শোণিতে প্লাবিত করিয়া দিল, তাহার জন্য কি যীশুখ্রীষ্ট দায়ী? তথাপি যে গান্ধীজি সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে লইয়া প্রায়োপবেশনের অনুষ্ঠান করেন তাহাতেই বুঝা যায় তাঁহার হৃদয়ের বিস্তার কতদূর। Distance lends enchantment to the View দূরত্বে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। যীশুর অবতারত্বের কত অংশ দূরত্ব জন্য তাহা কে নির্ণয় করিবে? গান্ধীজী জীবদ্দশাতেই অবতার, তাঁহার সম্বন্ধে বল্গাশূন্য জিহ্বায় কথা বলিতে নাই।

১ম। কিন্তু অবতারের যে বাক্য রক্ষাই হইলনা? ৩১শে ডিসেম্বর চলিয়া গেল, কোথায় বা স্বরাজ, কোথায় বা বন্দীদিগের কারামুক্তি!

২য়। স্বরাজ গ্রহণীয় নহে অর্জ্জনীয় বস্তু,—কর্ম্মিগণের তপস্যায় ও আমলাতন্ত্রের চণ্ডনীতির প্রসাদে আমাদের সেই অর্জ্জনশক্তি যদি আসিয়া থাকে তাহা হইলে ৩১এ ডিসেম্বর ব্যর্থ হয় নাই। যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন বিনাসাধনায় স্বরাজ পাইবেন এবং ৩১এ উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই নেতৃবর্গের প্রতি কটূক্তি করিতে বসিবেন তাঁহাদিগকে কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু সত্যই যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন কথা বড়, না কল্যাণ বড়? বলবানের নিকট প্রেষ্টিজই বড়, স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও সত্যের প্রেষ্টিজ বজায় রাখিবার জন্য কল্যাণের অসত্যকে সত্যের সাজে সাজাইতে গিয়াছিলেন। গান্ধীজী বলবান্ নহেন ভক্ত, তাই সে অপরাধ করেন নাই। আহম্মদাবাদ কংগ্রেসে অনেকেই স্বরাজ ঘোষণার জন্য ব্যগ্র ছিলেন,—কিন্তু ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি নিজেই তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন। যাহারা চরকা প্রভৃতি গোটাকতক সহজ কর্ত্তব্যেই বিমুখ হইল, তাহারা স্বরাজের উপদ্রব সহ্য করিবে কিরূপে? বাস্তবিক এবারকার আত্মসংযমে তিনি লাজমানভয়ের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় মহাপ্রাণের নিকট প্রাণ অতি তুচ্ছ বস্তু, বাক্যই বড়, তিনি সেই বাক্যকেই ভারতকল্যাণের দ্বারে উৎসর্গ করিয়াছেন। এ আত্মাহুতির মহিমা স্মরণ করিলে সত্যবিশ্বাসীর হৃদয় আশায় উদ্বেলিত হয়। এ সংবাদে কি কারাগারের শৃঙ্খলভার লঘু করিয়া দেয় নাই? আর সেদিনকার কাজ স্বরাজ ঘোষণা বন্ধ করিয়াই শেষ হয় নাই। কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম লিখাইয়া আইনভঙ্গেও দেশশুদ্ধ লোককে আহ্বান করিয়াছিল। বার্দ্দুলি এবং আনন্দ পল্লীদ্বয়ে নিরুপদ্রব আইনভঙ্গের কাজ পূর্ণভাবে আরম্ভ হইবারও কথা। সমস্ত ব্যাপারেই ধীরত্ব, সুবিবেচনা ও আত্মত্যাগ। ভগবান্ কি এ আরম্ভকে শুভময় করিবেন না? নেতৃবৃন্দকে সরাইয়া দিয়া তিনি স্বয়ং যেন নিজে তাহাদের নেতৃত্বগ্রহণে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার জন্য পাদপীঠ প্রস্তুত করিতে হইবে। ছোট বড়,

গৃহী সন্ন্যাসী, ধর্ম্মাচার্য্য, শিক্ষক, চিকিৎসক, বণিক্‌, কৃষক, শিল্পী—এমন কি মুচি মেথর কসাইকে পর্য্যন্ত সেই মহা অতিথির জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সর্ব্বস্ব-ত্যাগ সকলে পারিবে না, তাহার প্রয়োজনও নাই,—কিন্তু প্রত্যেককেই নিজের কর্ত্তব্যে অবহিত ও পরের দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে—দিন কতকের জন্য ও ক্ষুদ্রতা ও লোভ বর্জ্জন করিতে হইবে। এখন কি জাতীয় জীবনতরণীর একমাত্র কর্ণধারকে পরিত্যাগ করিবার সময়? আর কোন শক্তি না থাকুক ভগবানকেও ত একটু জানাইতে পারা যায়?

১ম। কিন্তু অনাখ্যাতমূর্ত্তি কোন আদর্শের অনুধাবন কি বুদ্ধিমানের কার্য্য?

২য়। গান্ধীজী সত্যের সাধক এবং তাঁহার সমস্ত জীবন একথার সাক্ষী। তিনি স্বরাজ সাধনায় যে ছায়ার অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস্য। শিশুর নিকট মাতৃস্তন্য যেমন সত্য স্বরাজও তাঁহার নিকট তেমনি সত্য ছিল। বিশ্বাস দ্বন্দ্বনিবৃত্তির ফল, তাই ভক্ত যুক্তিতর্ক না তুলিয়াই ভগবানকে ভোগ করিতে থাকেন ও তাঁহার নামপ্রচারে জগৎকে মাতাইয়া তুলেন। কিন্তু যুক্তিতর্ক পণ্ডিতের জীবন, তাঁহারা সোজাপথেও দিগ্‌দর্শন হস্তে বেড়াইতে পাইলেই সুখী হন, এবং স্বাস্থ্যকে বায়ুপিত্তকফের সামঞ্জস্য রূপে নির্দ্দেশ করিয়া তৃপ্তি বোধ করেন, কিন্তু ইহাতে স্বাস্থ্যশালীকে বিপন্ন করিয়াই তুলে। কাজের লোক জানে যে কড়াক্রান্তি বিচার করিয়া চলিতে গেলে পথ চলাই হয় না, তাই তাহারা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার জন্য কালক্ষয়ও করে না,—গান্ধীজিও করেন নাই,—বাহিরের পীড়াপীড়িতে যাহা করিয়াছেন তাহাতে সকলের মন উঠে নাই। যে বস্তু অখণ্ড মঙ্গল তাহাকে খণ্ডবস্তুর ন্যায় সংজ্ঞার আয়ত্ত করাও যায় না। তা ছাড়া স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার,—মাছের পক্ষে জলের মত আমাদের পক্ষেও স্বরাজ-বোধের প্রভাবমুক্ত থাকা ও তাহার সংজ্ঞানির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তাই এসবস্থলে সংজ্ঞার বদলে বর্ণনাই দিতে হয়,—স্বরাজ কখনও ধর্ম্মরাজ্য, কখনও অক্ষুণ্ণ স্বাতন্ত্র্য এবং কখনও বা খিলাফৎ হইয়া পড়ে। সকলগুলিই স্বরাজের সহিত যুক্ত, কোনটাই তাহার পূর্ণ পরিচায়ক নহে। কিন্তু সংজ্ঞা অপেক্ষা অনুভূতি বড়, তাহা নিজের প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র নিজেই প্রস্তুত করিয়া লয়। আমরাও সকলে অতি তীব্র ভাবেই স্বরাজের অভাব অনুভব করিতেছিলাম। এমন সময় ভগবান্ কোথা হইতে এক ধীর নির্ভীক শুদ্ধচেতা সফলকর্ম্মীকে আমাদের মধ্যে প্রেরণ করিলেন—তাঁহার নেতৃত্বে সমগ্রভারত এখন স্বরাজের সাধনায় প্রবৃত্ত। সে সাধনা যখন সজীব ও তাহার পথ যখন প্রস্তুত তখন আর সংজ্ঞা লইয়া মারামারি কেন?

১ম। কিন্তু উপায় ত উদ্দেশ্যের নিয়ামক হওয়া উচিত নহে; স্বরাজবাদীর দল যেন বলিতেছেন বৈধ ও নিরুপদ্রব উপায়ে যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই স্বরাজ।

২য়। যাহা বৃহৎ ও সমগ্র—অংশমাত্র নহে, তাহাকে বল বা কৌশলপূর্ব্বক ছিনাইয়া আনিতে হয়ও না, আর যায়ও না। নিজেকেই তাহার সঙ্গে মিলাইয়া দিতে হয়। এইজন্যই সাধনাও সিদ্ধি, উপায় ও উদ্দেশ্য এক হইয়া যায়, গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজা সারিতে হয়। স্বরাজ্য জীবনের মত,—জীবন যেমন শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত অভিন্ন স্বরাজ্যও সেইরূপ ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন। জীবননাশই জোর করিয়া করিতে হয়, জীবন রক্ষা সহজ উপায়েই হইয়া

থাকে, সেইজন্য ভ্রমাদিও স্বভাবদত্ত সংস্কার। এসবস্থলে পন্থানির্ণয়ে কোন শিক্ষানবিশীর প্রয়োজন নাই,—সত্যের যাহা সহজ ও সরল পথ তাহাই অনুসরণীয় এবং তাহা নিজেও সত্য ছাড়া আর কিছুই নহে"। সুতরাং উপায় ও উদ্দেশ্য অভিন্ন।

১ম। কিন্তু সত্য সাধনার এত সহজ পথ উন্মুক্ত থাকিতে অহিংসা ও অসহযোগের উপর নির্ভর কেন? অহিংসা দুর্ব্বলতার আবরণ মাত্র, অসহযোগ মূঢ়তা।

২য়। শক্তিমানের সাহায্য সুগম পন্থা বটে, কিন্তু শ্রেয়ঃ পন্থা না হইতে পারে। বলহীন স্বরাজ্য লাভের অধিকারী নহে। সেই বল কি সে বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে পারে? ষ্টীমারের বলে চলৎশক্তি লাভ করা গাধাবোটের পক্ষে সৌভাগ্য নহে—দুর্ব্বিপাক, তাহাতে তাহাকে অন্ধ ও প্রতারিত করে, নিজের স্বরূপ ভুলাইয়া দিয়া চন্দ্রসূর্য্যের সহিত জ্ঞাতিত্বকামী কুষ্মাণ্ডের অবস্থায় আনিয়া ফেলে। পরের কাঁধে চড়িয়া বামনের প্রাংশুত্বলাভ ঘটে না,—বিশেষ কাঁধ হইতে ফেলিয়া দিবার অধিকারও যদি সেই পরের হাতেই থাকে। আজ পার্লেমেণ্ট দয়া করিয়া অক্ষমভারতকে যাহা দিবেন কাল আবার তাহা কাড়িয়া লইতেই বা তাঁহাদের কতক্ষণ? আমরা যোগ্যতার পরিচয় দিলে তাঁহারা কাড়িবেন না,—কিন্তু যোগ্যতার বিচার ত তাঁহারাই করিবেন? তাঁহাদের সহিত আমাদের বিচার প্রণালীর মিল হয় কি? তাঁহারা যে ভারতগত প্রাণ তাহাও মনে করিবার কোন কারণ হইয়াছে কি? সুতরাং শক্তির উৎসটী নিজেদের ভিতরই থাকা চাই। অথচ আমরা যে নিতান্তই দুর্ব্বল ও পরাশ্রয়ী হইয়া পড়িয়াছি, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু শক্তি মনের, দেহের নহে,—সুতরাং শুদ্ধতাসাপেক্ষ ও সকল অবস্থাতেই অর্জ্জনীয়। It is never too late অসহযোগিতা এই শুদ্ধির সাধন পথ। ইহার প্রসাদে মনের দৃঢ়তা লাভ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে শক্তি আসিয়া জুটিবে। শুদ্ধি সেই যীশু কথিত mustard seed—কামান বন্দুকে তাহার বংশলোপ হয় না। আর হইলেই বা কি? পবিত্রতার বিনিময়ে প্রাণরক্ষা করা অপেক্ষা মৃত্যুই কি শ্রেয়স্কর নহে? এই শুদ্ধিলাভের একমাত্র উপায় অহিংসা। নিরীহকে হিংসা করা যায়, কিন্তু অহিংসককে হিংসা করা যায় না। যীশু খৃষ্টের ক্রুশোপাখ্যান বহু পণ্ডিতের মতে অমূলক, ডেসডিমোনার হত্যা অস্বাভাবিক বলিয়াই ঘাতককে কবি স্বজাতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন নাই। যে ব্যক্তি আহত হইয়াও বলে "ভাই! আমি তোমার শত্রু নহি, না জানিয়াই তুমি আমায় আঘাত করিয়াছ, ভগবান্ তোমার ভ্রান্তি দূর করুন,—" এরূপ লোককে হত্যা করা কি সহজ কথা? যুদ্ধ ত উভয় পক্ষের বল পরীক্ষা? বাতাসের সঙ্গে কি যুদ্ধ চলে? এক হাতে কি তালি বাজে? আর কামান থাকিলেই কি তাহার ব্যবহার করা যায়? যে ব্যবহার করিবে সেও ত মানুষ? তবে কিছুক্ষণ তাহার ভ্রম হইতে পারে, অহিংসাকে সে প্রথম প্রথম একটা ভীরুত্বের ছদ্মবেশ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু বহুদিন এভাবে চলে না, সত্য চাপা থাকে না। রাজনীতি ভক্ত পশুবলদৃপ্ত ইংরাজ আজ আমাদের অহিংসাবাদে বিশ্বাস করিতেছেন না, করিলে নিশ্চয়ই শান্ত হইতেন। তাঁহাকে বিশ্বাস করাইবার প্রয়োজন নাই, চেষ্টাও হয় ত

বিফল হইবে,—কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে অহিংসার অনুশীলন করিলে তাঁহারা আপনারাই বুঝিবেন। সূর্য্য উঠিলে আর তাঁহাকে প্রদীপ জ্বালিয়া দেখাইয়া দিতে হয় না। কেবল জিনিষটা খাঁটি হওয়া চাই,—নহিলে চোখে মুখেও হিংসার প্রকাশ থাকিবে।' তাই অহিংসামন্ত্রের যিনি ঋষি, তিনি বলিতেছেন—"কায়মনোবাক্যে হিংসাশূন্য হও, জয় অনিবার্য্য।" পদাঘাত সহ্য করিয়াও চুপ করিয়া থাকা মানুষের কাজ না হইতে পারে, কিন্তু উত্তরে পদাঘাত করাও মানুষের কাজ নহে। বিবাদ পশুচিত, তাহাতে জয় পরাজয়ের মীমাংসা হইতে পারে, আন্তরিক বিরোধের অবসান হয় না,—পরাজিত আবার সময় পাইলেই আক্রমণ করে। অক্রোধের দ্বারাই ক্রোধের প্রকৃত শান্তি হয়। তাই গান্ধীমহাশয় বলেন "অহিংসা ভীরুর ছদ্মবেশ নহে, দুর্ব্বলেরও বল নহে, ইহা পৌরুষাভিমানী মানবের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র।" বলিতে পারা চাই—মনের মিল হউক বা না হউক কেহই আমার শত্রু নহেন, আমি সকলের সেবক।

১ম। কিন্তু জনসাধারণ 'সকলের' সেবা না করিয়া কেবল গান্ধী মহাশয়েরই পূজা করিতেছে এবং আপনাপন ব্যক্তিত্ব হারাইয়া স্বাধীনতা লাভের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে।

২য়। ক্ষেত্রভেদে কোথাও জ্ঞান হইতে ভক্তির কোথাও বা ভক্তি হইতে জ্ঞানের উন্মেষ হয়। প্রকৃত ভক্তি কোথাও 'অন্ধ' থাকে না। সুতরাং ভক্তিকে আমার ভয় নাই, বিশেষতঃ ভক্তিবাদী বাংলাদেশে। গান্ধীজীর যাহারা প্রকৃত ভক্ত তাহারা তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে, সুতরাং 'সকলকে' ভালবাসিবে। নকল ভক্তিকেই ভয় করিতে হয়। আজ কার ত্যাগের অগ্নি পরীক্ষায় সকলের চিত্তবৃত্তি যেরূপ শুদ্ধতা লাভ করিতেছে তাহাতে সাধারণের ভিতরও প্রচুর ভাবে জন-প্রীতির সঞ্চার হইতেছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহারা কর্ত্তব্যানুরোধে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে শিখে তাহারা স্বাধীনতা লাভের অযোগ্য হয় না।

১ম। কিন্তু 'স্বাধীন' ভারতে কি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এখন অপেক্ষা ক্ষুণ্ণ হইবে না? কোন্ কালে আমরা সে অধিকার এত অধিক পরিমাণে ভোগ করিয়াছি?

২য়। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। মুসলমান সম্বন্ধে যাহা জানি তাহাও ইংরেজেরই লেখা। ভারতে যে রাজ-ভক্তিবাদ প্রচুর পরিমাণে ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাজগণ প্রায়ই সংস্কারবশে Self-less (আত্ম-পরায়ণতা-শূন্য) হইয়া থাকেন, তখনও হইতেন; পার্শ্বে মন্ত্রিসভার এবং উপরে ব্রাহ্মণশ্রেণীরও যথেষ্ট প্রভাব তাঁহাদের উপর ছিল, রাজধানীর বাহিরে পল্লীবাসীগণ আত্মমনোনীত গ্রাম্যমাওলিকের দ্বারা শাসিত হইত—সিবিলিয়ান Rhys Davids সাহেবের পুস্তকেও তাহার উল্লেখ আছে। সুতরাং পীড়ন অধিক ছিল, মনে করিবার কোন কারণই নাই। পীড়ন অধিক থাকিলে—এত বিভিন্ন ধর্ম্মমতের এবং নিম্নস্তরে এত স্বাস্থ্য সভ্যতা ও আনন্দের স্ফূর্ত্তি হইত না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিমাপ সম্বন্ধে এই কয়েকটী কথা স্মরণীয়ঃ—

(১) কথা বলিবার স্বাধীনতা ও কাজ করিবার স্বাধীনতা এক নহে।

(২) কাগজে কলমে স্বাধীনতা ও প্রকৃত স্বাধীনতা এক নহে।

(৩) পদে পদে গোলাগুলি ও গুপ্তচরের ভয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হন্তারক।

(৪) মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন ও বিচার বৈষম্য লোকমতস্ফূর্ত্তির ব্যাঘাতক।

(৫) শাসনশক্তি কেন্দ্রীভূত হইলে ব্যক্তিত্বকে কিছু না কিছু খর্ব্ব না করিয়াই পারে না।

(৬) অত্যন্ত অন্নকষ্টের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্যক্ উন্মেষ হয় না।

এই সকল কথা স্মরণ করিয়া মনে হয় ইংরেজের রাজত্বে শাসন অপেক্ষা সাহচর্য্যেই আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হিসাবে অধিকতর লাভবান হইয়াছি। ইংরাজ নিজে খুব স্বাধীনতা প্রিয়, কথায় কথায় ধর্ম্মঘট করে, উপবাসের ভয় করে না।

১ম। কিন্তু আমাদের মত হরতাল করে না, তাহা ধর্ম্মঘট অপেক্ষাও ভয়ানক। শান্তির সময় পয়সা দিলে জিনিষ মিলিবে না, ইহা চিন্তা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

২য়। হরতাল স্থায়ী হইলে বিপদ বটে,—কিন্তু ইহা একদিনের ব্যাপার। ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য সার্থসিদ্ধি ইহার উদ্দেশ্য অভিমান প্রকাশ। গরীব যথেষ্ট সহিয়াছে,—একদিন তাহাকে রাগ করিতে দাও। বহুদিন সে তোমাদের দাসত্ব করিয়াছে,—একদিন তাহার সেই বোঝা তোমরা নিজে বহন করিয়া দেখ, তাহার সেবার মূল্য ও দুঃখের পরিমাণ কত। রোমেও প্লীবিয়ান্ দল এইরূপ করিত, কিন্তু স্বাধীন দেশে তাহাদের মর্য্যাদা ছিল,—পেট্রিশিয়ান্ দল তাহাদিগকে অনুনয় করিতে লজ্জাবোধ করিত না। কিন্তু এখানে একদিকে বিদেশীর হৃদয়হীন কলকারখানা, অপরদিকে সমাজ নিরপেক্ষ দেশবাসীর ততোধিক হৃদয়হীন উপেক্ষা, উভয় দিকেই চিরানুগত ভৃত্যবর্গের ধৃষ্টতায় রোষ। কিন্তু হরতাল ক্ষণেকের বিদ্রোহ, ভয় নাই, শীঘ্রই ক্ষুধার তাড়নে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। ব্যক্তিত্ব লোপের ভয় থাকে ত সাবধান সেই বিরামহীন কেন্দ্রীভূত রাজশক্তিকে যাহা "বাত্যার মত প্রচণ্ড, ও নিয়তির মত দুর্ব্বার।" তাহার সহিত অসহযোগই ব্যক্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায়।

১ম। তবে কি অসহযোগিতার কোন কালেই অবসান হইবে না?

২য়। ইহা policy নহে, creed—ব্যক্তিগত শুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে হইলে পশু-বলদৃপ্ত প্রচণ্ড শক্তির সহিত সংস্পর্শ রাখিলে চলিবে না,—তা স্বাধীন অবস্থাতেই কি আর পরাধীন অবস্থাতেই কি। ক্ষুদ্র ও বৃহতের সম্মিলনে আঘাত ক্ষুদ্রকেই সহিতে হয়, লাভ বৃহত্তের ভাগেই পড়ে—ইহাই মানবজাতির সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা। অতএব বৃহৎকে একটু দূরে রাখা ক্ষুদ্রের পক্ষে কর্ত্তব্য; অন্যথা বন্ধুত্ব আনুগত্য শেষে স্তাবকত্বে ও পরিণত হইবে। পশুবল যেখানে প্রধান বল, সেখানে আনুগত্য করিতে হইলে পশুত্ব চর্চ্চাই করিতে হইবে,—আত্ম-শুদ্ধি আসিবে না। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার প্রধান অন্তরায় অন্নবস্ত্রে পরমুখাপেক্ষিতা, তাই এই দুই বিষয়ে যতদূর সম্ভব স্বাধীন হওয়া আবশ্যক। এইখানেই চরকার মাহাত্ম্য,—কলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তি তাহার আছে কি না এ বিচারদ্বারা তাহার মূল্য পরিমাপ হয় না। কেবল দেখিতে হয় চরকায় বস্ত্র স্বাতন্ত্র্য দিতে পারে কি না। ঠিক্ একই কারণে অন্ন সম্বন্ধেও স্বাধীন হইবার চেষ্টা করা উচিত। অনেকে বলিবেন ইহাতে প্রত্যেক পরিবারকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া অসভ্যতার যুগ পুনরানয়ন করিবে। মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের জন্য আমাদের অধিক সময় যায় না,—বাকী সময়ে আমরা নিজ নিজ শক্তিমত কেহ বা

বিদ্যা দান, কেহ বা স্বাস্থ্য ও দেশ রক্ষার উপায় বিধান, কেহ ধন বৃদ্ধি, কেহ বা সাধারণ ভাবে সমাজ সেবা করিয়া সভ্যতার চর্চ্চা করিতে পারি। অন্য জাতির সঙ্গেও সম্বন্ধ স্থাপনে আপত্তি নাই,—ঐ দুটীমাত্র বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া নিজ সমাজের সহিত সমস্ত বিষয়ে ও অন্যজাতির সহিত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিলে সভ্যতার সমস্তই বজায় থাকে। নিজত্ব-প্রতিষ্ঠা দ্বারা দৃঢ়, সমাজ-সম্পর্কদ্বারা উন্নত ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ দ্বারা উদার হইলে তবে সত্য, শিব, ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা হয়। গোড়ার কথা সত্য—তাহা দৃঢ়তা ও বলবত্তা ব্যতীত অর্জ্জিত হয় না। যাহার নিজত্বই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহার আত্মপ্রসারণ কবন্ধের শিরঃপীড়ার মত অসম্ভব। শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ।

তিনটি কথা।

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

গুরুদেব এবারে মৃত্যু মুখ হইতে টানিয়া রাখিলেন, কতদিনের জন্য ও তাঁর কি কাজে তিনিই জানেন; তাঁর ইচ্ছা পরিপূর্ণ হউক। এই এক মাসে রোগশয্যায় শুইয়া বারম্বার তিনটী কথা মনের উপর আসিয়া চাপিয়াছে।

১। আমরা যাকে সত্য বলিয়া মনে করি তাহা আমাদের পক্ষে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু আমাদের এই সত্যই শেষ কথা নহে। শেষ কথা—ভগবানের প্রকট ঐতিহাসিক বিধান—ব্যক্তির এবং জাতির জীবনে বাহিরের ঘটনাবলী। ভগবানের এই বিধান আমাদের ক্ষুদ্র সত্যাসত্য কল্পনা জল্পনা ও বাদবিতণ্ডাকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার অনাদি-নির্দ্দিষ্ট পথে আপনাকে পরিপূর্ণ করে। ইহাই শেষ কথা,—এর উপরে আর কোনও কথা নাই।

২। বিশ্বটা একটা বিরাট যন্ত্রস্বরূপ; ভগবান যন্ত্রীরূপে এই যন্ত্রের কেন্দ্রে বসিয়া আছেন, ও এই যন্ত্রের অগণ্যকোটী যন্ত্রগুলিকে নিজ নিজ পথে চালাইয়া বিশ্বকে তাঁহার ঈপ্সিত পথে লইয়া যাইতেছেন। এ যদি সত্য হয়,—আমার চাকা বাঁদিকে ঘোরে; আর একজনের চাকা আমার পাশেই ডানদিকে ঘোরে; আমি এ আব্দার করিব কেন, তার চাকাও আমার মত বাঁ দিকেই ঘুরুক; তাহা হইলে তো যন্ত্র চলিবে না। আমার চাকা আমার দিকে ঘুরুক, অপরের চাকা তাঁদের নিজের নিজের দিকে ঘুরুক; এ লইয়া বাগবিতণ্ডা করা মূর্খতা।

৩। আমাদের দেশের সাধুসন্তেরা এ সকল সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াই মতামত লইয়া কাহারও সঙ্গে কখনও বিতর্ক বা বিরোধ করেন না। তাঁদের জীবনে উপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত মহাবাক্য প্রত্যক্ষ হয়—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।"

যখন দ্রষ্টা অর্থাৎ জ্ঞানী স্বর্ণবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় কর্ত্তা এবং অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি স্থান পরমপুরুষ ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তখন তিনি পাপপুণ্য অর্থাৎ বন্ধনভূত সকাম উভয়বিধ কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মল হইয়া পরম সমতা লাভ করেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ক্রমবিকাশ।

প্রার্থনার কান্না হইতে আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে সহকারিতা বর্জ্জন, তদনন্তর নির্ব্বিরোধ বাধা প্রদান, দেখিতে দেখিতে এতগুলি পরিবর্ত্তন বৃদ্ধের প্রাণে কেমন করিয়া সহ্য হয়। কিন্তু এ সকল পরিবর্ত্তন যে হবেই হবে, নতুবা একটা দেশ একটা জাতি যে অধঃপাতে যাবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহামান্য সার সুরেন্দ্রনাথের সহিত আমার কথা হইল, রাউলাট আইন পাশের সময়, আমি বলিলাম যুদ্ধে ভারত নিজের রক্ত দিয়া, অর্থ দিয়া প্রাণপণে ইংরাজের সাহায্য করিল, কোথায় কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়া ইংরাজ ভারতের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে, না চরম বন্ধুদ্রোহিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন, এ কি রীতি? তিনি বলিলেন, ব্যাটারা বোকা। তাহার পরে ওডায়ার ও ডায়ারের, অস্ত্রহীন সভাস্থলে মিলিত হংসরাজ কর্ত্তৃক আহূত ও আশ্বাসিত দেড় সহস্রাধিক লোকের প্রতি গুলি, নিহত নিগারগণের শাস্তিতে আনন্দ প্রকাশ, এবং সেই ডায়ারের স্তুতি ও সাহায্য এ সকলে যদি একটুও শোণিত উত্তেজিত না করে, তবে মৃত্যু অনিবার্য্য। অথচ আমাদের শোণিত উষ্ণ হইলে আমরা কি করিব? জর্ম্মণীর দর্পচূর্ণ করিবার অহঙ্কারে যে ইংরাজ জলে স্থলে শূন্যে বজ্র প্রহার করিতেছে, আমাদের কি আছে, যে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইব। আমরা অস্ত্র থাকিলে অস্ত্র ধরিতাম, কিন্তু তাহা নাই বলিয়াই আমরা সহযোগিতাবর্জ্জন নীতি লইলাম।

ছাত্রগণের প্রতি বেদান্তের ঋষি বলিতেছেন, জগৎ মিথ্যা, সুতরাং চক্ষু মুদিয়া পড়াশুনা কর। কিন্তু জগৎ মিথ্যা হইলে তো পড়াশুনাও মিথ্যা, তজ্জন্য এত মমতা কেন? যে শিক্ষার তিনি এত পক্ষপাতী, সে শিক্ষায় কি দাসত্বপ্রীতি প্রশ্রয় পায় নাই, তিনি বলিতে পারেন। বেদব্যাসের মত সুলেখক হইলেও শিক্ষা বিভাগের লোক ভিন্ন অপরের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু তোমরা কি শিক্ষা দিতেছ? এক স্কুলে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইংরাজরাজত্বে তোমরা সুখী না দুঃখী, তাহারা বলিল, ইংরাজ রাজত্বে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হইতেছে, ধনাগম প্রচুর হইতেছে। হায়! নিত্য দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে এই প্রকাণ্ড মিথ্যা যাহারা শিক্ষা দেয়, অথচ যাহারা বলে বাঙ্গালীরা মনুমেণ্টের মত মিথ্যাবাদী, আমরা কি বলিব না, হে ইউনিভারসিটী, তোমার নিকটে আমরা এই পর্ব্বতোপম মিথ্যা শিখিতেছি; তোমাদের ইতিহাস, ভূগোল দাসত্বের সোপান, তোমাদের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, মিথ্যার অবতার।

সহকারিতা করিয়া আমরা কি হইয়াছি? আমাদের বস্ত্রশিল্পসহ শিল্পীর অঙ্গুলীর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে, আমাদের জাহাজনির্ম্মাণসহ নির্ম্মাতাকুলের অন্তর্দ্ধান হইয়াছে, "প্রদীপটা

জ্বালিতে খেতে শুতে যেতে কিছুতে নয় লোক স্বাধীন।" এক মহাযজ্ঞে সহযোগিতা করিয়া অন্নহীন, বস্ত্রহীন জীর্ণকন্থাধারী হইয়া দাঁড়াইয়াছি ; ইংরেজ বলিতেছে, ঐ কন্থাখানি আমাকে দিয়া নক্ষত্র ছায়া প্রতিফলিত নীল সলিলে ডুবিয়া যাও।

এই দাসত্ব শিক্ষা আপনাদের ভাল লাগে, কিন্তু যুবকগণের ভাল লাগিবে কেন? এই ডায়ারী প্রেম অনুমোদন করিতে বড় আইন সভায় দেশ নায়ক মালব্য মহাশয়কে কতই না উপহাস কতই নির্য্যাতন করিবার জন্য কাউন্সিলের গৌরাঙ্গ কিবা ভেকধারী, কেহই ত্রুটী করেন নাই। আয়ু না কমিলে ত আর মৃত্যু হয় না, কাজেই সংকারিতা বর্জ্জন কি কম দুঃখে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সঙ্গে ভাই, চিক্কণ শোভমান বস্ত্র ছাড়, হ্যাট কোট এসেন্স পোমেটম সাহেবীআনা নবাবী ছাড়িয়া মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পর, মা'র বাগানের কলারপাতে ডাল ঘি ভাত খাও, জুতা ছেড়ে খড়ম পায়ে দাও। চেয়ার টেবিল ছেড়ে তক্তাপোষ ধর। অট্টালিকা সৌধ ছেড়ে কুটীরের আশ্রয় লও। বৎসর ৫০০০৲ টাকা ব্যয় ছাড়িয়া দিয়া বৎসরে ৬০০৲ টাকায় সংসার চালাও। আর অশন বসনের নবাবীর জন্য ইংরেজের কাছে যাইতে হইবে না। ঋষিদের দেশে আবার ঋষিগণের আচার গ্রহণ কর। দেখ তোমরা স্বাধীন হও কিনা। নিজে নিজে কি রেল, তার, ডাকঘর করিতে পার না? ৩০ কোটী লোক কি মরিয়া গিয়াছে?

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

খুকী।

কোথা হ'তে এলি খুকী?
মুখখানি তোর কনক বরণ
তুই যে মেয়ে সোণামুখী!
তোর হাওয়া লাগ্‌লে গায়
ঊষার বাতাস বয়ে যায়,
শুষ্ক প্রাণে শান্তি আনে
পেলে তোরে কতই সুখী!

২

কোথা হ'তে এলি খুকী?
এত পুণ্য পবিত্রতা
বিশ্বমাঝে নাই যে কোথা,
(তোরে) দেখলে পরে প্রাণটা ভরে
যদিও আমি হই রে দুঃখী।

৩

কোথা হ'তে এলি খুকী?
বুলবুলি, টিয়া, ময়না
তোর মত কথা কয়না,
(তোর) আধ ভাষা জাগায় আশা
তোর তুলনা আর দিব কি?
কোথা হ'তে এলি খুকী?

৪

কোথা হ'তে এলি খুকী?
তোর মুখের এম্‌নি ধারা
তুই যেন গো বিশ্বছাড়া,
এত শোভা এ সৌন্দর্য্য
বিশ্বমাঝে নাহি দেখি।
পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য ফলে
গৌরী রূপে ধরাতলে,
পেয়েছি মা! তোরে আমি
তুই যে মেয়ে সোণামুখী!
কোথা হ'তে এলি খুকী?

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

সন্ধান।

গৃহ বন মরুভূমি পৃথিবী খুঁজিয়া,
না পাই সন্ধান যবে, ক্লান্ত প্রাণ নিয়া
বসেছি বিরাম লাগি অনন্তের পথে,
হৃদয়-দুয়ার খুলি অঙ্গুলি সঙ্কেতে,
কে যেন বিশ্বের পথে দিল দেখাইয়া,
তুমি বিশ্বে, তুমি সর্ব্ব হৃদয় ভরিয়া।

শ্রীবরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

সঙ্কলিকা।

কোন প্রবন্ধের বা মতের নিরপেক্ষ সমালোচনা পত্রস্থ করাই নব্যভারতের চিরন্তন ধারা। কাহাকেও ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ বা মত লইয়া উপহাসাদি করা ইহার আদর্শবিরুদ্ধ। ইহার পুরাতন লেখকগণ প্রায় সকলেই স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠাতার বন্ধু। তাঁহারা নব্যভারতকে বিশেষ ভাবে স্মরণ ও অনুগ্রহ করিয়া যে সকল রচনা পাঠাইয়া থাকেন তাহা তাঁহাদের স্নেহের নিদর্শন। এই জ্ঞানে তাঁহাদের সমস্ত রচনাই সাদরে পত্রস্থ করা হইয়াছে। নব্যভারতের কোন লেখায় ইহার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর প্রতি অবিচার ও তাঁহার কষ্টের কারণ হইয়াছে। আমরা তজ্জন্য আন্তরিক দুঃখিত। আশা করি তিনি আমাদিগকে তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

* * * *

শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী প্রতিভাদেবীর অকস্মাৎ পরলোক গমনের সংবাদে আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের এই শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি নব্যভারতের বিশেষ হিতৈষী ও সাহায্যকারী বন্ধু। প্রতিভাদেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। তিনি বিদুষী মহিলা ছিলেন, নানারূপ কলাবিদ্যায় তাঁহার অনুরাগ ছিল। বিশেষতঃ সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি অতি অনুরাগিণী ও বিশেষ পারদর্শিণী ছিলেন। তিনি সঙ্গীতসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়া, এতদ্দেশীয় বালক বালিকাদিগকে ভারতীয় সঙ্গীত ও বাদ্যাদি শিখাইতে বিশেষ ভাবে যত্ন ও চেষ্টা করিতেছিলেন। এই কাজে তিনি নিজে পরিবারবর্গের সকলকে নিয়া উৎসাহের সহিত শরীর মন ও অর্থ দিয়া লাগিয়াছিলেন। হারমোনিয়াম ও অর্গান এদেশীয়

বাদ্যযন্ত্র নহে, তারের যন্ত্র ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র; সেই জন্য সঙ্গীতসঙ্ঘে হারমোনিয়াম বা অর্গান সহযোগে সঙ্গীত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন নাই। তাহাতে তাঁহাকে অনেক সময় ও সঙ্গীত সঙ্ঘের শিক্ষক ওস্তাদদিগকে অনেক বেশী বেতন দিয়া দূরদেশ হইতে আনিতে হইয়াছে। দেশ-প্রীতি ও দেশীয় সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি এইরূপ বেশী ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি আনন্দসঙ্গীতপত্রিকা নামে একটী সঙ্গীত বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি অমায়িক ছিল। সকলের সঙ্গেই সস্নেহ মধুর ব্যবহার করিতেন। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গদেশ একজন বহুগুণ সম্পন্না শিক্ষিতা মহিলা হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

* * * *

ডাক্তার গৌর ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে অসবর্ণ বিবাহবিলের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি দুইটী ভোটের জন্য হারিয়া গিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত পাটেল অসবর্ণ বিবাহের বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ফলোদয় হয় নাই। দেশে নূতন হাওয়া বহিতেছে, এই নবজাগরণের দিনে শিক্ষিতগণ ও কি এইরূপ বর্ণবৈষম্য উঠিয়া যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিবেন না?

* * * *

শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ চৌধুরী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী প্রমুখ বিশজনের স্বাক্ষরিত একখানি নিবেদন পত্র আমরা পাইয়াছি। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মেয়েদের উপযোগী হইতেছে না বলিয়া সকলের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে। কি প্রকার শিক্ষায় তাঁহাদিগকে সুমাতা সুগৃহিণী ও সুকন্যা করিয়া তোলা যায়—ইহা বিশেষ চিন্তার বিষয়। ইঁহারা সকলকে এ বিষয়ে ভাবিতে ও মতামত প্রবন্ধাকারে বা যাঁহার যে উপায়ে সম্ভব জানাইতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। আশা করি সকলেই এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিবেন ও কেহ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে তাহা দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন।

* * * *

মন্ত্রীগণের বেতন লইয়া দেশের মধ্যে একটা বেশ উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল। আমাদের দেশের প্রতিনিধিগণ ব্যবস্থাপক সভায় কিছুই করিতে পারিলেন না। সাধারণতঃ ব্যবস্থাপক সভায় যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের মতেই অধিকাংশ প্রতিনিধি মত দিয়াছেন ও মন্ত্রীদের ৫৩৩৩৲ টাকাই রহিয়া গেল। তাঁহারা তো দেশের জন্য স্ব-ইচ্ছায় বেতন ছাড়িয়া কিম্বা কমাইয়া দিতেও পারিতেন। শাসন ব্যয় সঙ্কুলনার্থ অর্থের অভাব; নূতন নূতন ট্যাক্স বসাইয়া তাহা পূরণের চেষ্টা হইতেছে। এই দরিদ্র দেশে অন্ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য অর্থের কত প্রয়োজন মন্ত্রিগণ কি একবার ও ইহা ভাবিয়া দেখিলেন না? শুনিতে পাই, কম মাহিনা হইলে তাঁহাদের প্রেষ্টিজ বা সম্মান নষ্ট হয়। ত্যাগে সম্মান কমে না বরং বাড়ে।

অদ্বৈত-বাদ।*
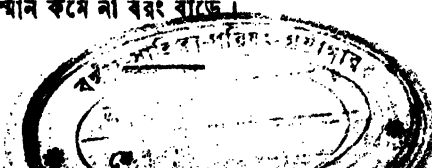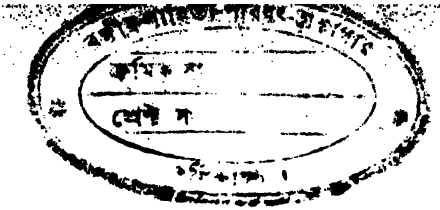
যে অদ্বৈতবাদ আমরা উপনিষদে দেখি, যে অদ্বৈতবাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাখ্যা বেদান্ত-দর্শনে প্রদত্ত হইয়াছে, এই অদ্বৈতবাদ ভারতের একটা অমূল্য সম্পত্তি। কেবল ভারতেরই বা বলি কেন? মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির যে প্রকার উন্নতি ও কর্ষণ হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে চরম ধারণা করিতে পারা যায়, এই অদ্বৈতবাদ মানববুদ্ধির তাদৃশ কর্ষণেরই ফল। কিন্তু অদ্বৈতবাদকে কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির কর্ষণ, পুষ্টি ও চরমোন্নতিজনিত আবিষ্কার বলিলে, যথেষ্ট বলা হইল না। শঙ্করাচার্য্য যাহাকে 'অনুভব' শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অদ্বৈতবাদ, মানবাত্মার সেই অনুভব-জনিত আবিষ্কারও বটে। বুদ্ধিবৃত্তির কর্ষণ এবং অনুভবের ফল—এই দুইটী মিলিত হইয়া ভারতে অদ্বৈতবাদ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ব্রহ্ম-চিন্তা-নিমগ্ন ঋষিদিগের মার্জ্জিত চিত্তে এই অদ্বৈত-তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল; ইহা তাঁহাদিগের অন্তরনুভূতি (Intuition) হইতে লব্ধ। ব্রহ্মবিষয়িনী চিন্তা ও অন্তরনুভূতি—এই দুইএর মিলনের ফলে আমরা এই মহীয়ান্ অদ্বৈত-তত্ত্বটাকে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই অদ্বৈতবাদ ইউরোপের চিন্তাশীল মনীষীবর্গের মধ্যেও শনৈঃ-শনৈঃ প্রবিষ্ট হইতেছে। এমন দিন অনতিদূরবর্ত্তী, যেদিন ইহারই মূলসূত্র গুলি সমগ্র পৃথিবীর একটা মহতী সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে। আমাদের এইরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আপনারা জানেন, শঙ্করাচার্য্য এই অদ্বৈতবাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে ও উপনিষদ্‌গুলির ভাষ্যে নানা ভাবে, নানা প্রকারে করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদ শঙ্করের নিজের আবিষ্কার নহে। যদি আবিষ্কারের গৌরব কাহাকেও দিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সে গৌরব ঋগ্বেদেরই প্রাপ্য; অপর কাহারও নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে এ কথা বড় নূতন বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। বর্ত্তমানে ঋগ্বেদের পঠন পাঠন এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। কেহই আর এখন বেদগ্রন্থগুলি যত্ন করিয়া অধ্যয়ন করে না। তাই আমাদের এই সিদ্ধান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হইতে পারে। ভিত্তিহীন বিবেচিত হইবার আরও একটী কারণ বর্ত্তমানে উপস্থিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মুখ হইতে আমরা ঋগ্বেদ সম্বন্ধে অন্য প্রকার কথা বর্ত্তমানে শুনিতে পাইতেছি। তাঁহারা ঋগ্বেদের আলোচনা করিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন যে, ঋগ্বেদে কেবলমাত্র কতকগুলি প্রাকৃতিক জড়ীয় পদার্থের প্রতি প্রযুক্ত স্তুতি-গীতি নিবদ্ধ আছে। অর্দ্ধসভ্য, আদিমযুগের আদিম মানববর্গ, ভারতে প্রবেশ করিয়া যখন এ দেশের সূর্য্য, উষা, বজ্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে, চিত্তে ভীত ও বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ঐ সকল ভয় বিস্ময়-বিমূঢ় সরল মানববর্গের মুখে ঐ সকল প্রাকৃতিক বস্তুর উদ্দেশে যে স্তুতি-গাথা উত্থিত হইয়াছিল, ঋগ্বেদে তাহাই লিপিবদ্ধ আছে। ঋগ্বেদ—কতকগুলি জড়ীয় বস্তুর স্তুতি

* গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, "রামমোহন লাইব্রেরী"তে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

প্রকাশক গ্রন্থমাত্র। বর্ত্তমানে আমরা এই প্রকার কথাই শুনিতে আরম্ভ করিয়াছি। অবশ্য, পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের প্রতি আমাদিগের কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এমন অবস্থা ভারতে একদিন উপস্থিত হইয়াছিল, যখন সমগ্র সায়ন-ভাষ্যসহ, সমগ্র ঋগ্বেদ গ্রন্থ ভারতে একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল! পাশ্চাত্য পণ্ডিত Max Muller, আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, ইউরোপের জার্ম্মাণি, রুষিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সমগ্র ঋগ্বেদ সংগ্রহ করিতে তিনি পারেন নাই। ভারতবর্ষেও কোথাও ভাষ্য-সহ সমগ্র ঋগ্বেদ তিনি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। এই মহাপ্রাণ Max Mullerএরই অনন্য সাধারণ ও একনিষ্ঠ যত্নের ফলে, আমরা বর্ত্তমানে ঋগ্বেদ গ্রন্থ, সমগ্র ভাষ্যসহ, পাইয়াছি। সে যত্ন ও পরিশ্রমের কথা তিনি আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। এই ঋগ্বেদ প্রাপ্তির জন্য ভারতের হিন্দুসমাজ, তাঁহার নিকটে চির-কৃতজ্ঞ থাকিবে। কিন্তু একটা ভয়ের কারণও বর্ত্তমানে উপস্থিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা জন্মিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা, আমাদের ঋগ্বেদাদি ধর্ম্মগ্রন্থ গুলির যে প্রকার ব্যাখ্যা দিতেছেন, সে ব্যাখ্যা আমাদের দেশের পুরুষানুক্রম-গত ব্যাখ্যা নহে। সে ব্যাখ্যা, আমাদের প্রাচীন ভাষ্যকারাদি-কৃত ব্যাখ্যার নিতান্ত বিরোধী। ঋগ্বেদ যদি, কতকগুলি জড়বস্তুত প্রতি স্তুতি-প্রকাশক গ্রন্থই হয়, তাহা হইলে ঐ গ্রন্থের মূল্য একেবারেই তুচ্ছ হইয়া উঠে। অথচ, আমাদের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম, আজিও, এই ঋগ্বেদের মন্ত্র গুলির দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত,—চূড়া, অন্নপ্রাসন, বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি তাবৎ ধর্ম্ম কার্য্য হিন্দুরা, ঋগ্বেদেরু মন্ত্র দ্বারাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। জড় বস্তুর বিবরণ প্রকাশক গ্রন্থের প্রতি এ প্রকার আদর কেন? যাহাতে ঋগ্বেদের একটী মাত্র অক্ষরও কেহ তুলিয়া লইতে না পারে; নূতন সংযোগ করিতে না পারে; স্থান চ্যুত করিতে না পারে; তজ্জন্য কেনই বা ঋগ্বেদে ভয়ানক সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল? আপনারা পদ পাঠ, জটা পাঠ প্রভৃতির কথা শুনিয়াছেন। এগুলি সেই সতর্কতারই ফল মাত্র। জড়ীয় বস্তুর স্তব প্রকাশক গ্রন্থের উপরে ঋষিরা এমন যত্ন ও সতর্কতা লইয়াছিলেন কেন? তাই বলিতেছিলাম, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে, আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই নিষ্ফল হইয়া উঠিবার আশঙ্কা উপস্থিত হইবে, এবং হইতেছেও তাহাই।

আমাদের বিশ্বাস এই যে, ঋগ্বেদের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত একটা প্রকাণ্ড 'অদ্বৈত-বাদ' উপদিষ্ট রহিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই অদ্বৈতবাদের মৌলিক তত্বগুলি তিনি, এই ঋগ্বেদের মধ্যেই পাইয়াছিলেন, এই ঋগ্বেদ হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেদান্ত দর্শনে তাহারই পুষ্টি ও প্রাঞ্জলতা সম্পাদন করিয়াছেন মাত্র। নূতন কিছু আবিষ্কার করেন নাই। কিন্তু আমরা কোন্ প্রমাণের বলে এমন কথা বলিতেছি, তাহা বলিবার অগ্রে, 'অদ্বৈতবাদের' প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

অদ্বৈতবাদ্ সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে গেলেই, আমাদের দৃষ্টি দুইটী বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। বেদান্তে প্রথমেই 'ব্যবহারিক দৃষ্টি' এবং 'পারমার্থিক দৃষ্টি'—এই দুই প্রকার দৃষ্টির কথা

আমরা দেখিতে পাই। সাধারণ অজ্ঞ লোক এই জগৎকে 'ব্যবহারিক দৃষ্টিতে' দেখিয়া থাকে। কিন্তু 'পারমার্থিক দৃষ্টি' সম্পন্ন ব্যক্তিরা এ জগৎকে অন্যরূপে অনুভব করেন। আমরা কথাটা সংক্ষেপে, বেদান্ত-কথিত একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে পরিস্ফুট করিতেছি।

কারণের সঙ্গে কার্য্যের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের উপরেই এই দুই প্রকার দৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন্:—

মৃত্তিকা হইতে ক্রমে ক্রমে মৃচ্চূর্ণ, মৃৎ-পিণ্ড, এবং ঘট উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এস্থলে মৃত্তিকাই—উহা হইতে উৎপন্ন মৃচ্চূর্ণ, মৃৎপিণ্ড এবং ঘট প্রভৃতি কার্য্যের 'কারণ'। এখন, এই মৃত্তিকারূপ 'কারণ' হইতে, যে মৃচ্চূর্ণাদি 'কার্য্যবর্গ' ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইল, এস্থলে এই কারণের সঙ্গে, উহার ঐ পর-পর-উৎপন্ন কার্য্যগুলির কি প্রকার সম্বন্ধ ?

দুই প্রকারে এই সম্বন্ধটি ব্যাখ্যাত হইতে পারে। অজ্ঞ সাধারণ লোক মনে করে যে, মৃত্তিকাই ত ক্রমে মৃচ্চূর্ণাদিরূপে পরিণত বা বিকৃত হইয়াছে। অতএব এই মৃচ্চূর্ণাদি কার্য্য-বর্গ প্রত্যেকেই এক একটী স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু। মৃত্তিকাই, সম্পূর্ণরূপে মৃচ্চূর্ণাকারে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। আবার মৃচ্চূর্ণ, সম্পূর্ণরূপে আপনাকে মৃৎ-পিণ্ডরূপে পরিণত করিয়াছে। সুতরাং মৃচ্চূর্ণ, মৃৎপিণ্ড প্রভৃতি প্রত্যেকেই এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু। ইহারা ক্রমাগত বিকৃত হয়। একটী বিনষ্ট হইয়া অপরটী উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তুটী, পর পর বস্তুগুলির 'কারণ', এবং পর পর বস্তুগুলি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তুগুলির 'কার্য্য'। 'ব্যবহারিক দৃষ্টিতে' জগতের বস্তুগুলি এই প্রকারেই প্রতীত হইয়া থাকে।

কিন্তু 'পারমার্থিক দৃষ্টিতে' এরূপে বস্তুগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তুরূপে প্রতীত হয় না। পরমার্থদর্শীগণ বুঝিতে পারেন যে, এস্থলে মৃত্তিকার যেটি প্রকৃত স্বরূপ, উহাই প্রকৃতপক্ষে 'কারণ'। এবং এই কারণ-বস্তুটীই প্রকৃত বস্তু। মৃচ্চূর্ণ, মৃৎপিণ্ড, ঘট প্রভৃতি,—সেই কারণ বস্তুটীরই অবস্থা-বিশেষ রূপান্তর মাত্র। এক মৃত্তিকাই, মৃচ্চূর্ণাদি বিবিধ অবস্থান্তর ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এবং এই সকল অবস্থান্তর, ধারণ করাতেও, মৃত্তিকার যেটি প্রকৃতস্বরূপ, সেই স্বরূপটির কোনই হানি হয় নাই। উহা যে মৃত্তিকা সেই মৃত্তিকাই রহিয়াছে। বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করিলেও, কারণ-বস্তুটি আপনাকে হারাইয়া ফেলে না। বিবিধ অবস্থান্তরের মধ্যেও, উহার স্বরূপটি একই থাকে। উহা অপর কোন বস্তু হইয়া উঠে না। পরমার্থদৃষ্টিতে এই প্রকার অনুভবই হইয়া থাকে।

আপনারা দেখিতেছেন যে, পরমার্থদৃষ্টিতে জগতের কোন বস্তুকেই, কোন বিকারকেই উড়াইয়া দিবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইতেছে না। মৃচ্চূর্ণ, ঘটাদি বিকারগুলি, অসত্য মিথ্যা বস্তু হইয়া উঠিতেছে না।

শঙ্করাচার্য্য এই দুই প্রকার বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এই উভয় প্রকার দৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। তিনি এইজন্যই বেদান্ত-ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, "পরিণামবাদকে রাখিয়াই, বিবর্ত্তবাদের প্রাধান্য স্থাপন করা যাইতে পারে।" জগতের কোন বস্তুকেই, কোন বিকারকেই উড়াইয়া দিবার কোন আবশ্যক নাই।

কিন্তু প্রাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের অনেকের ধারণা অন্যপ্রকার। ঋগ্বেদ সম্বন্ধে যেমন

তাঁহারা আমাদিগকে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা শুনাইতেছেন; শঙ্করের অদ্বৈতবাদেও তাঁহারা বলিতেছেন যে, শঙ্কর এই বিশ্বের নাম রূপাদি বিকারগুলিকে অলীক, অসত্য, মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন! কিন্তু শঙ্কর এই জগৎটাকে এভাবে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। তাঁহার ভাষ্যে জগতের মিথ্যাত্ব-সম্বন্ধে উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তিনি যে অর্থে বিকারবর্গকে মিথ্যা বলিতে চান সেটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক।

তিনি বলিয়াছেন যে,—

"জগতের এই যে অসংখ্য নাম রূপাদি বিকার পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহাদিগের অপলাপ করা আদৌ সম্ভব নহে বৃক্ষলতা, পশু-পক্ষ্যাদি বাহ্যবস্তুগুলিকে, কিংবা মন-বুদ্ধি, সুখ-দুঃখ দেহাদি আন্তর বস্তুগুলিকে কাহারই অপলাপ করিবার, উড়াইয়া দিবার অধিকার নাই। যাহা প্রকৃতই বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার কি অপলাপ সম্ভব।" ? *

এই সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়া শঙ্করাচার্য্য, বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যের একস্থলে একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন যে—

"যদি নাম-রূপাদি বিকারগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে বল, তাহা হইলে অদ্বৈত-বাদ টিকে কৈ? ব্রহ্ম ত এক ও অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম ভিন্ন ত অপর কোন বস্তুই নাই। ইহাই ত বেদান্তের সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে নাম রূপাদি বিকারগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করা ত চলে না। উহাদিগকে উড়াইয়া দিতেই ত হয়।" শঙ্কর এই আপত্তির উত্তরে বলিয়াছেন যে,—

"না; নাম রূপাদি বিকারগুলিকে উড়াইয়া দিবার কোন আবশ্যক করে না। উহারা থাকিলেও ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বের কোনই ব্যাঘাত হয় না। আমরা জল ও জল হইতে উৎপন্ন তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা এই আপাততঃ বিরোধের মীমাংসা দেখাইয়াছি মৃত্তিকা ও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন মৃচ্চূর্ণ, ঘটাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছি যে, নাম-রূপাদির অস্তিত্ব থাকিলেও ব্রহ্মের অদ্বৈততার কোন হানি হয় না।" †

শঙ্কর জল ও ফেন-তরঙ্গাদি দৃষ্টান্তে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; মৃত্তিকা ও মৃত্তিকা হইতে অভিব্যক্ত মৃচ্চূর্ণ, মৃৎপিণ্ড ঘটাদির যে প্রকার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দারাই কার্য্য কারণের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যাহা দেখাইয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এই যে,—

(ক) কার্য্যকে উহার কারণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় না। যে বস্তু যাহা হইতে ব্যক্ত হয়—উৎপন্ন—হয়; সেই বস্তু হইতে তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া, বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া যায় না। ঘটকে কি তুমি এখন উহার কারণ যে মৃত্তিকা, সেই মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পার? তরঙ্গকে কি জল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, উহাকেই একটা স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বলিয়া ভাবিতে পারা যায়?

* বেদান্ত-ভাষ্য ৩।২।২১

† বৃহদারণ্যক-ভাষ্য ৩।৪।১

(খ) কার্য্যগুলি প্রকৃতপক্ষে কারণেরই আকার বিশেষ মাত্র; অবস্থান্তর মাত্র; রূপান্তর মাত্র। কারণ বস্তুটিই—এই অবস্থান্তর ধারণ করিয়াছে। সুতরাং, কারণবস্তুটি উহার প্রত্যেক অবস্থান্তরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়া, উহাদিগকে আপনাতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং কারণবস্তু হইতে তাহার অবস্থান্তরগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবে কিরূপে? কার্য্যগুলি, উহাদের কারণের বুকেই প্রোথিত থাকে।

কারণবস্তুটি প্রত্যেক অবস্থান্তরের মধ্যেই বর্ত্তমান থাকিয়া যায়; উহা কোন অবস্থা ভেদের মধ্যেই আপনাকে হারায় না। হস্তান্দোলন, ভ্রমণ, বাক্য-কথন—এগুলি আমারই অবস্থা-ভেদমাত্র। তুমি কি ইহার কোনটিকে আমা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পার? স্বতন্ত্র করিতে গেলেই ইহাদের কোনই মূল্য থাকিবে না। ধূলিমুষ্টিবৎ বিকীর্ণ হইয়া যাইবে। কারণই কার্য্যবর্গকে বাঁধিয়া রাখে। কারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে গেলেই, কার্য্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং কার্য্যবর্গ, এক একটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু, ইহা হইতেই পারে না।

(গ) একটা বিশেষ আকার ধারণ করিল বলিয়াই যে, কারণবস্তুটি নিজে একটা কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠিল, তাহা হইতে পারে না। কেন না, প্রত্যেক আকার ভেদের মধ্যে, অবস্থান্তরের মধ্যে সেই কারণ-বস্তুটিকে চিনিতে বিলম্ব হয় না। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান্তর ধারণ করাতেও, উহা পূর্ব্বেও যে কারণবস্তু, এখনও সেই কারণবস্তু। একটি গরু যখন শুইয়া আছে, সেই শয়নাবস্থায় উহাকে গরু বলিবে; আর, ঐ গরুটি যখন চলিতে আরম্ভ করিবে সেই চলনাবস্থায় কি উহা গরু না হইয়া, অশ্ব হইয়া উঠে? যে কোন অবস্থান্তরই ধারণ করুক্ না কেন, কারণবস্তুটি আপন স্বরূপে ঠিক্-ই থাকে। অবস্থাভেদের যোগে, নিজে একটা স্বতন্ত্র বা অপর কোন বস্তু হইয়া উঠে না। শঙ্কর এই জন্যই—কার্য্যকারণের সম্বন্ধকে অনন্য শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন অর্থাৎ কার্য্যাকার ধারণ করিলেও কারণ বস্তুটী "অন্য" কোন বস্তু হইয়া উঠে না। সাধারণ অজ্ঞলোক মনে করে বটে, কারণবস্তুর সমগ্রটাই কার্য্যাকারে পরিণত হয়; সুতরাং উহা একটা 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠে। কিন্তু পরমার্থদর্শীরা এ প্রকার ভুল করেন না। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, আপনাকে না হারাইয়াই কারণবস্তুটী, বিবিধ রূপান্তর ধারণ করিতে সমর্থ!

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পরিণাম বাদকে রাখিয়াই বিবর্ত্তবাদের প্রাধান্য উদ্‌ঘোষিত করা যায়। নাম-রূপাদি বিবিধ বিকার অভিব্যক্ত হইলেও, অন্তরালবর্ত্তী কারণবস্তু বা ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপতঃ কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মের একত্ব প্রমাণ করিতে, জগৎকে উড়াইয়া দিবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। এত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সত্ত্বেও, লোকে মনে করে যে, জগৎকে অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াই শঙ্করাচার্য্য, তাঁহার ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিয়াছেন!!

এই যে আমরা কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ বর্ণনা করিলাম, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ ইহারই উপরে প্রতিষ্ঠিত। এস্থলে, এই তত্ত্বটী আর বিস্তৃত করিয়া দেখাইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না অদ্বৈতবাদের সকল তত্ত্ব বলিতে গেলে, এবং প্রমাণ প্রয়োগের উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্তগুলি

দেখাইতে গেলে, একটীমাত্র বক্তৃতাদ্বারা তাহা কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। যদি আপনারা ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, অদ্বৈতবাদের মৌলিক সিদ্ধান্তগুলির বিস্তৃত বিবরণ ধারাবাহিক বক্তৃতাদ্বারা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বক্তৃতায় আমরা, কেবলমাত্র অদ্বৈতবাদের মূল কোথায়, তাহাই দেখাইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। সুতরাং কেবল তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

অদ্বৈতবাদ কার্য্য-কারণের কিপ্রকার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা আমরা এতক্ষণ সংক্ষেপে দেখাইলাম। তদ্দ্বারা আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, জগতের কার্য্যবর্গের অন্তরালে, একটী কারণবস্তু অবস্থান করিতেছেন। সেই কারণবস্তুটী, আপনার স্বরূপকে কার্য্যবর্গের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ বিকাশিত করিতেছেন। কোন কার্য্যকেই, 'স্বতন্ত্র' বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইলেই ভুল হইল। ইহারা কেহই, অন্তরালবর্ত্তী কারণ-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। এক কারণবস্তু বা ব্রহ্মবস্তুই,—নানা আকারে আপনার স্বরূপকে বিকাশিত করিতেছেন। এই আকার বা অবস্থান্তর গুলির দ্বারা তাঁহার স্বরূপের কোন হানি হইতেছে না। তিনি এই অবস্থান্তর যোগে কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠিতেছেন না। সুতরাং অভিব্যক্ত কোন কার্য্যকেই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লওয়া যায় না; কেন না তিনিই ঐ গুলিকে ধরিয়া রাখিয়াছেন এবং উহাদের মধ্য দিয়া আপন স্বরূপের বিকাশ করিতেছেন। বেদান্তে শঙ্করাচার্য্য, কারণও কার্য্যের এই প্রকার সম্বন্ধই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আমরা ঋগ্বেদ আলোচনা দ্বারা এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছি যে, শঙ্করের এই কার্য্য-কারণের তত্ত্বটী, তিনি ঋগ্বেদ হইতেই অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। এ তত্ত্ব ঋগ্বেদের মধ্যে অতীব সুস্পষ্ট। ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ কোন জড়ীয় প্রাকৃতিক পদার্থই কেবল নহে। এক চেতন কারণ-সত্তা, এক মহান্ ব্রহ্মবস্তু—সূর্য্য, অগ্নি, মরুৎ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারূপে আপনাকে বিকাশিত করিতেছেন। সূর্য্য চন্দ্রাদি কেহই, ব্রহ্মবস্তু হইতে 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে। সূর্য্য, ইন্দ্রাদিকে, উহাদের অন্তরালবর্ত্তী কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, স্বতন্ত্র স্বাধীন পদার্থরূপে ভাবিতে পারা যায় না। অন্তরালবর্ত্তী ব্রহ্মবস্তুও, ইন্দ্র, সূর্য্যাদি আকার-বিশেষ ধারণ করিয়াও, কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠেন নাই। তিনি আপন স্বরূপে ঠিক্ রহিয়াই, ইন্দ্রাদি দেবতারূপে আপনাকে বিকাশিত করিয়াছেন। ইহারা কেহই তাঁহার সেই একত্বের হানি করিতে পারে না।

এই মহান্ তত্ত্ব, কার্য্য-কারণের এই মহান্ সম্বন্ধ—ঋগ্বেদে নানা প্রকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে কেবল একটীমাত্র প্রণালীর উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে ঋগ্বেদ কেমন কৌশলে অদ্বৈতবাদ খ্যাপন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদে অনেক প্রকার যুক্তি প্রদর্শিত আছে। কিন্তু এত অল্প সময়ে ত সকল প্রণালী বলা যায় না। তজ্জন্য আমরা আজ একটীমাত্র প্রণালী দেখাইতেছি।

কার্য্যবর্গের অন্তরালে যে একটী নিত্য, অবিকৃত কারণ সত্তা অবস্থান করিতেছেন, এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ঋগ্বেদের প্রত্যেক দেবতার আমরা একটী করিয়া 'স্থূলরূপ' এবং সঙ্গে সঙ্গে একটী সূক্ষ্মরূপের উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রত্যেক দেবতার অন্তরালে যে ব্রহ্মসত্তা বা

কারণ সত্তা অবস্থিত, তাহাই ঋগ্বেদ এই সূক্ষ্মরূপের উল্লেখ দ্বারা আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন।

ঋগ্বেদে কেমন সুন্দর করিয়া, এই মহান্ তত্ত্বটী প্রদর্শিত হইয়াছে, এখন আমরা আপনাদিগের নিকটে তাহাই উপস্থিত করিতেছি। আমাদিগের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য ইহা হইতেই পরিস্ফুট হইয়া পড়িবে।

(১)। প্রথমতঃ অগ্নি সম্বন্ধে ঋগ্বেদ বলিয়া দিতেছেন যে, স্থূল অগ্নির মধ্যে অগ্নির একটী সূক্ষ্মরূপ আছে। এই সূক্ষ্মরূপটীই অগ্নির প্রকৃত স্বরূপ। শ্মশানাগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে যে—

"যে অগ্নি এই মৃত দেহটাকে পোড়াইতেছে, আমরা সে অগ্নিকে চাই না। এই অগ্নিকে আমরা দূর করিয়া দিতেছি। এ অগ্নি মৃতের কাঁচা মাংসকে ভক্ষণ করিতেছে এবং এই অগ্নি মৃতদেহের অপবিত্র অংশগুলিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। কিন্তু এই অগ্নিরই মধ্যে অপর একটী অগ্নি রহিয়াছেন। উহাই প্রকৃত অগ্নি। ইহাই স্থূল দৃশ্যমান জড় অগ্নির মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম অগ্নি। এই সূক্ষ্ম অগ্নি কি প্রকার? ইনি "জাতবেদাঃ" এবং ইনি "প্রজানন্"। ইনি সৃষ্ট বস্তু মাত্রকেই জানেন এবং ইনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট। ইনিই যজ্ঞে প্রদত্ত হবিকে দেবতাবর্গের নিকট লইয়া যান।" এই বর্ণনা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, স্থূল অগ্নির মধ্যে অবস্থিত কারণ-সত্তা বা চেতন ব্রহ্ম-সত্তারই বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে জ্ঞানের আরোপ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের অগ্নি যদি কেবল জড় অগ্নিই হয়, তাহা হইলে এরূপ বর্ণনা সম্ভব হইতে পারিত না।

অপর একটী মন্ত্র শুনুন্—

"হে অগ্নি! তোমার দুইটী নাম। একটী স্থূল নাম; অপরটী গুহ্য নাম। তোমার যে অপর একটী নিগূঢ় নাম আছে, আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। তুমি যে "উৎস" হইতে—যে কারণ-সত্তা হইতে উদ্ভূত হইয়াছ, আমরা তাহাও জানিতে পারিয়াছি।" এই 'উৎসকে' 'যোনি' বা উৎপত্তিস্থান বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "তুমি যে 'যোনি' হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছ, আমরা তাহারই উপাসনা করি"।

(২) সোম সম্বন্ধেও দুই প্রকার রূপের উল্লেখ আছে।—

"সোম-লতাকে (হস্তাদি দ্বারা) নিপীড়িত করিয়া যখন তাহার রস বাহির করিয়া পান করা হয়, তখন লোকে মনে করে বটে যে, সোমকে পান করা হইল; কিন্তু যাঁহারা মননশীল তাঁহারা জানেন যে, যেটী প্রকৃত সোম, তাহাকে কেহ পান করিতে পারে না। পৃথিবীর কেহই সেই প্রকৃত সোমকে পান করিতে সমর্থ হয় না"। এস্থলে পাওয়া যাইতেছে যে, সোমের যেটী স্থূলাংশ, তাহাকেই লোকে পেষণ করে ও পান করে; কিন্তু সোমের যাহা সূক্ষ্মরূপ, তাহাকে পান করিবে কে?" এই সূক্ষ্মরূপটী, সোমের মধ্যগত 'কারণ-সত্তা' ছাড়া আর কি হইতে পারে? অন্য স্থানে সোমের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে,—"ধ্রুব সত্য সোমের দুই প্রকার জ্যোতিঃ আছে" এবং "অমৃতের আধার-স্বরূপ সোমের দুইটী অংশ তেজের দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইতেছে।" এ সকল স্থলেও সোমের স্থূলাংশ এবং স্থূলাংশের মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্মাংশ বা কারণ-সত্তার কথাই পাওয়া যাইতেছে। আবার—

"হে সোম! তোমার একটী নিগূঢ় ও লোক-লোচনের অগোচর স্থান আছে"। "এই সত্য স্থানটীতেই স্তবকারীগণের স্তুতি সকল কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে"। সোম যদি কেবল স্থূল উদ্ভিজ্জই হইবে, তাহা হইলে সেই সোমকে কি প্রকারে বলা যাইবে যে—

"হে সোম! তুমিই পৃথিবীর 'অব্যয় নাভি' স্বরূপ" এবং তোমারই রেতঃ (বীজ) হইতে বিশ্বের তাবৎ প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে"। সোমকে "রেতোধা" নামেও নির্দ্দেশ আছে। সোমের অন্তরালবর্ত্তী 'কারণ-সত্তাই' এতদ্দ্বারা লক্ষিত হইতেছে—

(৩) ইন্দ্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"হে ইন্দ্র দুইটী তোমার শরীর একটি শরীর স্থূল; অপরটি অতিশয় গোপনীয়; অতীব নিগূঢ়। এই গূঢ় শরীরটি বিস্তর স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং এই গূঢ় অথচ ব্যাপক শরীর দ্বারাই তুমি, ভূত ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করিয়াছ এবং জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ উৎপাদন করিয়াছ।" এই নিগূঢ় দেহটি, ইন্দ্রের স্থূলরূপের অন্তরালবর্ত্তী কারণ সত্তা ব্যতীত অপর কি হইতে পারে? ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই অন্যস্থলে বলা হইয়াছে যে,—"আমরা ইন্দ্রের সেই পরম নিগূঢ় 'পদটিকে' জানিতে পারিয়াছি। ইন্দ্রকে যাঁহারা কেবলমাত্র ভৌতিক জড় পদার্থ বলিয়াই ধরিয়া লন, তাঁহারা এই প্রকার উক্তির সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি দেখাইতে পারিবেন না। যেমন—

"ইন্দ্রই দ্যাবা পৃথিবীকে উৎপন্ন করিয়াছেন; গোস্তনে ক্ষীর দিয়াছেন; সূর্য্যের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ নিহিত করিয়াছেন।"

(৪) সূর্য্য সম্বন্ধেও, স্থূলরূপের অন্তরালে সূক্ষ্মরূপের কথা আছে। প্রথম মণ্ডলের ৫০ সূক্তের এই বর্ণনাটী গ্রহণ করুন্—

"সূর্য্যের তিন প্রকার অবস্থা বা রূপ। একটী 'উৎ'; অপরটী 'উৎ+তর'; অপরটী 'উৎ+তম'। যে সূর্য্যের জ্যোতিঃ ভূলোকে আইসে, তাহা "উৎ" সূর্য্য। যে সূর্য্য আকাশে ঊর্দ্ধে বিকীর্ণ হয়, তাহা "উত্তর" সূর্য্য। এতদ্ব্যতীত একটী "উত্তম" সূর্য্য আছেন, যাহার উদয়ও নাই, অস্তও নাই।" এই বিখ্যাত বর্ণনাদ্বারা আমরা একই সূর্য্যের কার্য্যাত্মক স্থূলরূপ, কারণাত্মক সূক্ষ্মরূপ এবং কার্য্য-কারণের অতীত অবস্থার কথা পাইতেছি।" বেদান্ত-দর্শনের ১।১।২৪ সূত্রের ভাষ্যেও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে,—

"যে সূর্য্য-জ্যোতিঃ আকাশে কিরণ বিকীর্ণ করিয়া থাকে, উহার মধ্যে অনুস্যূত "ব্রহ্ম-সত্তাই" এ স্থলের জ্যোতিঃ শব্দের লক্ষ্য"। আমরা ঋগ্বেদে উল্লিখিত সূক্ষ্মরূপের উল্লেখ দ্বারা সেই 'কারণ সত্তা'কেই বুঝিতে পারিতেছি।

(৫) বিষ্ণু সম্বন্ধেও অবিকল এই প্রকার বর্ণনা দৃষ্ট হয়।—

বিষ্ণুর তিনটী স্থূল পদ—আকাশ, অন্তরীক্ষ ও ভূলোককে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। কিন্তু বিষ্ণুর যেটী গূঢ় অমৃত-পদ, তাহা কেহই দেখিতে পায় না। সেটী 'মধুপূর্ণ'।" "যাঁহারা বিদ্বান্, যাঁহারা সতত জাগরণ-শীল, ঈদৃশ সাধকই কেবল, বিষ্ণুর সেই 'পরম-পদ' কে জানিতে পারেন। অন্যে পারে না।"

বিষ্ণুরও সুতরাং দুই অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। একটী স্থূল কার্য্যাত্মক অবস্থা। আর একটী কারণাত্মক সূক্ষ্ম অবস্থা।

বরুণেরও, বিষ্ণুর ন্যায়, দুইটী 'পদের' কথা আছে। বরুণের একটী পদ অতি নিগূঢ় ও সূক্ষ্ম, তাহাও বলা হইয়াছে। এই নিগূঢ় পদটী, স্থূলরূপের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট সূক্ষ্ম 'কারণ-সত্তা' ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না।

আজ আর আমরা অধিক কথা উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিব না। বায়ু, আকাশ সম্বন্ধেও স্পষ্ট করিয়া একটী স্থূল ও স্থূলের মধ্যগত অপর একটী সূক্ষ্মরূপের কথা আছে। সকল দেবতা সম্বন্ধেই এই প্রকার উক্তি দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঋগ্বেদ যে কেবল এই দুই প্রকার রূপের নির্দ্দেশ করিয়াই কারণসত্তার ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা নহে। ঋগ্বেদে ইহা অপেক্ষাও অন্যপ্রকার প্রণালী দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মসত্তার স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে। কিন্তু আজ মাত্র একটী প্রণালীর নির্দ্দেশ করিয়াই, আপনাদের নিকটে বিদায় লইতেছি।

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

আল-মামুন।

আব্বাস বংশীয় খালিফা হারুণ রসিদের* তিন পুত্র ছিল। হারুণ রশীদের তিন পুত্র ছিল। তন্মধ্যে মামুন তাঁহার মধ্যম পুত্র। মামুন বাল্যকাল হইতেই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার ধীশক্তি ও মেধাশক্তি অতি প্রখর ছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্ক শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে বোগদাদ নগর বিদ্যা ও জ্ঞান চর্চ্চার কেন্দ্রস্থান ছিল। দূরবর্ত্তী দেশ দেশান্তর হইতে নানাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ আসিয়া খালিফার দরবার অলঙ্কৃত করিতেন এবং খালিফাও তাঁহাদিগের সমুচিত সমাদর ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। রাজকুমার মামুন ঐ সকল বিদ্বান মণ্ডলীর নিকট অধ্যয়ন ও বিবিধ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন। কালক্রমে মামুন বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শিতা এবং তর্ক শাস্ত্রে বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। রণবিদ্যায়ও তাঁহার সম্যক জ্ঞান ও গভীর নিপুণতা ছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি শত্রুকুল দমন ও রাজ্যে সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপন করিয়া রাজ্যের সমৃদ্ধি সাধন ও প্রজাপুঞ্জের সুখ বর্দ্ধন করিতে যত্নবান হইলেন। তাঁহার অমিত উদ্যমে ও অবিশ্রান্ত যত্নে সুবিশাল ইসলাম সাম্রাজ্যে কৃষি ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইল এবং প্রজাকুল সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত দেশে শান্তি স্থাপন, প্রজাপুঞ্জের সুখ বর্দ্ধন এবং সাম্রাজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেন। দেশে দেশে সুপ্রশস্থ রাজপথ নির্ম্মাণ, পথ পার্শ্বে বহুতর পান্থশালা স্থাপন কূপ ও জলাশয় খনন, দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা, পীড়িত ও ব্যাধিগ্রস্থ লোকদিগের জন্য বাসভবন ও দাতব্য ঔষধের ব্যবস্থা করণ, মাতৃ পিতৃহীন শিশুদিগের ভরণপোষণ ও বাসস্থানের অনুষ্ঠান, সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ সদনুষ্ঠান করিয়া, তিনি অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

---

* আরবী মতে লিখিতে ও উচ্চারণ করিতে হইলে হারুন-অর-রসীদ আকারে লিখিত হইয়া থাকে কিন্তু সাধারণতঃ উর্দু ভাষায় কথোপকথন কালে হারুণ-রসীদ রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে।

কিন্তু শিক্ষা বিস্তার, বিদ্যাচর্চ্চা, বিবিধ শাস্ত্রের অবিরাম আলোচনা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব বিকাশ সাধনই মামুনকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালে চিকিৎসাবিদ্যা এবং ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি চরম সীমায় উঠিয়াছিল। মামুন মুক্ত হস্তে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া দেশ দেশান্তর হইতে অসংখ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা অনুবাদ করাইতেন। তাঁহার দরবারে তান্ত্রিক দার্শনিক ও বিজ্ঞানবিদগণ সদাসর্ব্বদা জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের পরিতোষের জন্য অনুমেয় অর্থ ব্যয় করিতেন। এবং জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর জ্ঞানীদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। গ্রীস হইতে গ্যাব্রেল, স্পেন হইতে আলকিন্দি, ভারতবর্ষ হইতে লবণ এবং পারস্য, মিসর, প্রভৃতি অন্যান্য দেশ হইতে তৎকালিন প্রসিদ্ধ বিদ্বাণ্ডলীগণ তাঁহার দরবার অলঙ্কৃত করিত।

ঈদৃশ প্রবল প্রতাপান্বিত বৈভব-গৌরবে সমুন্নত এবং শৌর্য্যবীর্য্যে বিভূষিত সম্রাটের অন্তঃকরণ কখন অহঙ্কার বা আত্মাভিমান দ্বারা কলুষিত হয় নাই। তিনি উন্নতমনা উদারচেতা জন হিতৈষী ও সরল প্রকৃতি মনস্বী ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ দয়াদাক্ষিণ্য ন্যায়পরতা ও সৌজন্যতা পূর্ণ ছিল। মামুন কিরূপ সরল প্রকৃতি ও সদ্‌গুণালঙ্কৃত ছিলেন তাহা তাঁহার লিপিবদ্ধ জীবন বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

প্রায়ই জ্ঞান বিজ্ঞানবিদ্‌গণ দরবারে নিমন্ত্রিত হইয়া রাত্রিকালে তাঁহার অতিথি হইতেন। মামুন স্বয়ং তাঁহাদের আতিথ্য সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি তাঁহাদের সহিত পরিচিত সুহৃদের ন্যায় আলাপ ও বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। আলাপান্তে মামুনের শয়ন কক্ষে তাঁহাদের শয়নের বন্দোবস্ত হইত।

কাজি এহ্‌ইয়া সে সময়ে একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান মনস্বী ও বোদদারের প্রধান বিচার-পতি ছিলেন। একদিন তিনি মামুনের আতিথ্য স্বীকার করেন। মামুনের শয়ন কক্ষে তাঁহারও শয্যা অধিষ্ঠিত ছিল। দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি পিপাসায় অধীর হইয়াছিলেন। মামুন তাঁহার অধীরতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজি সাহেব, কিরূপ অবস্থা?" কাজি সাহেব পিপাসার বিষয় জানাইলেন। মামুন স্বয়ং উঠিয়া অপর কক্ষে চলিয়া গেলেন এবং জলপূর্ণ একটী কুঁজা লইয়া আসিলেন। ইহা দেখিয়া কাজি সাহেব বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং কহিলেন, "হুজুর! আপনি কেন কষ্ট করিতেছেন, কোন ভৃত্যকে আদেশ করিলেই জল লইয়া আসিত।" মামুন প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "না, পরসেবায় রত জন জগতে প্রধান।"

এক সময়ে মামুন উদ্যানে বেড়াইতেছিলেন। কাজী এহইয়া ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মামুন তাঁহার হাত ধরিয়া বেড়াইতেছিলেন। যাইবার সময়ে সূর্য্য কাজী সাহেবের দিকে ছিল। আসিবার সময়ে দিক পরিবর্ত্তন হইল এবং সূর্য্যের কিরণ মামুনের দেহে পতিত হইল। কাজী সাহেব মামুনকে ছায়ায় রাখিবার মানসে দিক পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু মামুন তাহা পছন্দ করিলেন না। তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, "ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে, প্রথমে আমি ছায়ায় ছিলাম এবং আপনি সূর্য্য কিরণে ছিলেন; এক্ষণে ছায়ার দিকে থাকা আপনার অধিকার।"

একদা একটী নিঃসহায়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মামুনের দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিল যে "এক দুর্বৃত্ত আমার প্রতি উৎপীড়ন করিয়া আমার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে।" মামুন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এরূপ কার্য্য করিয়াছে এবং সে কোথায় আছে।" বৃদ্ধা ইঙ্গিতের দ্বারা দেখাইয়া দিল। মামুন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্বাসকে দেখাইতেছে। আব্বাস তখন পিতার নিকট বসিয়াছিলেন। মামুন তৎক্ষণাৎ প্রধান মন্ত্রিকে আদেশ করিলেন, "শাহজাদাকে অভিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় বৃদ্ধার সম্মুখে দণ্ডায়মান কর।" উভয়ের বিচার আরম্ভ হইল। মামুন দুই জনার এজেহার লইলেন। শাহজাদা আব্বাস আস্তে আস্তে থামিয়া থামিয়া এজেহার দিলেন কিন্তু বৃদ্ধা নির্ভয়ে ও উচ্চ স্বরে অভিযোগ বর্ণনা করিতে লাগিল। উজির তাহাকে ঐরূপ স্বরে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন এবং কহিলেন খালিফার সম্মুখে উচ্চ স্বরে কথা বলা ভদ্রতার পরিচায়ক নহে। ইহা শুনিয়া মামুন কহিলেন, "উহাকে নিষেধ করিও না, উহার যেমন ইচ্ছা তদ্রূপ স্বাধীনভাবে কহিতে দাও; সত্যতা উহার মুখ খুলিয়া দিয়াছে এবং আব্বাসকে মূক করিয়া তুলিয়াছে।" অবশেষে মামুন বৃদ্ধার অনুকূলে বিচার নিষ্পত্তি করিলেন এবং আব্বাসকে তাহার সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে আদেশ করিলেন।

এক সময়ে একব্যক্তি স্বয়ং মামুনের উপর ত্রিশ হাজার টাকার দাবীতে অভিযোগ আনয়ন করে; এই কারণে মামুনকে বিচারালয়ে কাজীর নিকট জবাব দিবার জন্য উপস্থিত হইতে হয়।

স্বয়ং খালিফাকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে এ বিষয় প্রকাশ হওয়ায় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কর্তৃপক্ষ ও ভৃত্যগণ শশব্যস্ত হইয়া খালিফার উপবেশন যোগ্য সাজসরঞ্জামাদি উপযুক্ত স্থানে যথা বিধি স্থাপন করিয়াছিল। মামুন বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে কাজি সাহেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এখানে আপনি এবং অভিযোগকারী দুই সমান" আপনি বিচারালয়ে খালিফা স্বরূপে আসেন নাই, প্রতিবাদী স্বরূপে আসিয়াছেন, আমি উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখাইতে পারিব না"। ইহা বলিয়া কাজিসাহেব আদেশ করিলেন যে উভয় পক্ষকে সমভাবে যথাস্থানে দণ্ডায়মান করাও। কাজি সাহেবের আদেশানুসারে উভয় ব্যক্তিকে যথা স্থানে দণ্ডায়মান করান হইল। ইহাতে মামুন কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না বরং কাজি সাহেবের ন্যায়পরায়ণতা ও মানসিক দৃঢ়তায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মাসিক বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

মামুনের মৃত্যু।

মামুন যখন মানবলীলা সংবরণ করেন তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই বিদ্রোহ দমন ও সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপনে অতিবাহিত হইয়াছিল। যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে মুক্ত হইয়া যতটুকু অবসর পাইয়াছিলেন, সেই সময়ও সুযোগ তিনি সাম্রাজ্যের উন্নতি, প্রজাপুঞ্জের সুখ বর্দ্ধন, এবং শিক্ষাবিস্তার ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধনে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁহার মহতী ইচ্ছা সমুদয় ও আন্তরিক

বাসনাগুলি কার্য্যে পরিণত হইতে দিল না। অন্তরের শত কামনা প্রস্ফুটিত হইতে না হইতেই শুকাইয়া গেল।

একদিন মামুন স্বীয় ভ্রাতা মো'তাসেম সমভিব্যহারে বাজানুজুন্ তটিনী তটে বায়ু সেবনে বহির্গত হইলেন। নদীর জল অতি নির্ম্মল ছিল। সূর্য্য কিরণে উদ্ভাসিত ঊর্ম্মিমালা নৃত্য করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছিল। মামুন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া পড়িলেন। মামুন ও মো'তাসেম তটিনী তীরে মৃত্তিকার উপরে উপবেশন করিয়া পা দুখানি জলে ডুবাইয়া দিলেন। সা'দকারী মামুনের অন্তরঙ্গ সেখানে উপস্থিত ছিল। মামুন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি এরূপ সুশীতল ও নির্ম্মল জল কখন দেখিয়াছ কি?" সা'দ অল্প জল পান করিয়া বলিল, "বাস্তবিকই এরূপ জল অনুপমেয়।"............সকলে কিছু জলযোগ করিয়া নদীর শীতল জল পান করিলেন, কিন্তু যখন ঐ স্থান হইতে উঠিলেন মামুন জরভাব অনুভব করিলেন। জর ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠিল। মামুন জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন।.........যখন মৃত্যু সন্নিকট হইল, তিনি তখন অমাত্য বর্গ, সেনাপতি সমূহ, বিদ্বান্ মণ্ডলী ও আত্মীয় স্বজনকে একত্রিত করিয়া মর্ম্মস্পর্শী বাক্যে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করিলেন।

"ঈশ্বরই কেবল প্রশংসার পাত্র যিনি সকলের অদৃষ্টে মৃত্যু লিখিয়াছেন, তিনিই অনন্তকাল বর্ত্তমান থাকিবেন। দেখ, আমি কিরূপ প্রতাপান্বিত সম্রাট ছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিবার কোনই ক্ষমতা আমার নাই বরং রাজত্ব আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে অধিকতর ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। অহো! আমি জন্ম গ্রহণ না করিলে ভাল হইত। হে আবু এসহাক, (তাঁহার ভ্রাতা, যাঁহাকে তাঁহার মৃত্যুর পর খালিফা পদের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন) আমার সম্মুখে এস। আমার অবস্থা দেখিয়া শিক্ষা লাভ কর। ঈশ্বর খেলাফতের মালা তোমার গলায় দিয়াছেন। যে ঈশ্বরের শেষ বিচারকে সর্ব্বদা ভয় করে, ঐ ব্যক্তির ন্যায় তোমার জীবন যাপন করা উচিত। প্রজা পুঞ্জের মঙ্গলের জন্য যে কার্য্য তোমার গোচরীভূত করা হইবে তাহা সর্ব্বপ্রথমে সম্পন্ন করিবে। বলবান হীনবলদিগকে যেন উৎপীড়ন না করে; বয়োবৃদ্ধদিগের সহিত সর্ব্বদা সমাদর ও প্রীতির সহিত ব্যবহার করিবে; যাঁহারা তোমার সহায় তাঁহাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবে এবং সকলের বৃত্তি ও মাহিয়ানা বজায় রাখিবে।"

অতঃপর তিনি কোরাণ শরিফের কয়েক পদ পড়িতে পড়িতে মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়িলেন; ধীরে ধীরে প্রাণ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তে মিলাইয়া গেল।

মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন।

যীশুর পবিত্রাত্মা লাভ।

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মুখের কথায় ব্যক্ত করা কঠিন। ভাবুক যে কথাটা ভাবের ভাষায় বলেন, অভাবুক সে কথাটা আপনার স্থূল বুদ্ধিতে কেমন করিয়া বুঝিবে? যীশুর পবিত্রাত্মা লাভ একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার; যর্দ্দনতীরে ঐ রহস্য বুঝিয়াছিলেন তিনি, আর তাঁহার দীক্ষাদাতা যোহন।

সেকালে সে দেশে একদল ভাবুক লোক ছিলেন, তাঁহাদের নাম ছিল "এসেনী" (Essenes), এসেনীদের পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া গেলে সুসমাচারের অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। কিন্তু সে ইতিহাস প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। যতটা এসেনীদের সম্বন্ধে জানা গিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা যে ভারতীয় ভাবুকদের মতনই একটা দল ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারত হিন্দুকুশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হিমালয়ের এপারে চুপ করিয়া ধ্যানমগ্ন বসিয়া ছিলেন, এ কালের ঐতিহাসিক আলোকে একথাটা সাহস করিয়া বলা যায় না। সে দিন একখানা পুস্তকে পড়িতেছিলাম, সলোমনের জাহাজ যে অফির বন্দর হইতে সোণা লইয়া যাইত, তাহা সৌরাষ্ট্র দেশে অবস্থিত ছিল।

শুধু ভারতের সোণার ডেলাই ওদেশে পৌছিত না। আমাদের বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের অনেক আধ্যাত্মিক তত্ত্বও ঐ সকল সোণার ডেলার সঙ্গে ঐ সকল দেশে রপ্তানি হইত। ওদিকের ভাবুকেরা এদিকে আসিতেন না, বা এদিকের ভাবুকেরা ওদিকে যাইতেন না, তাহা বলা কঠিন। রশ্মিকে কে কাঠা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে পারে? যে প্রাণ ব্রহ্ম-জ্যোতিতে পরিপূর্ণ, সে প্রাণের সে জ্যোতি কোন দেশ বিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

এসেনীদের সম্বন্ধে যতটা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা যে আমাদের ধর্ম্মভ্রাতা ছিলেন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। দীক্ষা দাতা যোহনকে অনেক খ্রীষ্টিয়ান পণ্ডিতও এসেনী দলভুক্ত বলিয়া মনে করেন। খ্রীষ্টের জীবন ও শিক্ষার পাশ্চাত্য পর্দ্দা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিলে অনেক কথা আমরা আমাদেরই মতন দেখিতে পাই! ইহার কারণ কি! তবে তিনিও কি এসেনীদের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখিতেন? পাঠক, এই কথাটা মনে রাখিয়া আমাদের সঙ্গে একবার যর্দ্দনতীরে চলুন।

এ যুগের সমালোচকেরা মার্ক লিখিত সুসমাচারকে প্রথম সুসমাচার বলিয়া মনে করেন। মার্ক যীশুর পবিত্রাত্মা লাভ সম্বন্ধে লিখিতেছেন "যেমন তিনি জল মধ্য হইতে উঠিলেন, তেমনি তিনি দেখিতে পাইলেন, স্বর্গ বিদীর্ণ হইতেছে এবং আত্মা কপোতের ন্যায় তাঁহার উপর (বা তাঁহাতে) নামিয়া আসিতেছেন।"

মার্কের বর্ণনানুসারে এই ঘটনার দ্রষ্টা যীশু। আর কেহ পবিত্রাত্মাকে তাঁহার উপর অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছিলেন কিনা, মার্ক তাহা খুলিয়া লেখেন নাই। মার্ক স্বর্গ শব্দটাকে বহু বচনে ব্যবহার করিয়াছেন। যীশু "স্বর্গসমূহ" বিদীর্ণ হইতে দেখিলেন। মার্কের এক

পাঠ অনুসারে আত্মা কপোতের ন্যায় তাঁহার "উপর" (গ্রীক্ Ep' auton) অবতীর্ণ হইলেন ; কিন্তু আর এক পাঠ অনুসারে (Eis auton = into him) তাঁহার "অভ্যন্তরে" অবতীর্ণ হইলেন।

মার্কের ভিত্তিতে লিখিত মথির সুসমাচারে কথাটা একটু খুলিয়া লেখা হইয়াছে মাত্র, মূল ঘটনার বর্ণনে ভিন্নতা নাই। বহু অনুসন্ধানে লিখিত লুকের সুসমাচারে ঐ সময় যীশুর প্রার্থনা করিবার কথা আছে, স্বর্গ শব্দটা এক বচনে ব্যবহৃত হইয়াছে, আর পবিত্রাত্মার দৈহিক আকারে কপোতের ন্যায়" অবতরণের উল্লেখ আছে।

চতুর্থ সুসমাচার যোহনের নামে পরিচিত। (দীক্ষাদাতা যোহন নহেন, সিবদিয়ের পুত্র যোহন।) কিন্তু এই সুসমাচার খানির আসল লেখক কে ছিলেন, তদ্বিষয়ে সমালোচক মহলে মহা মহা বাদানুবাদ চলিতেছে। তবে সুসমাচার খানা যে অনেক পরবর্ত্তী কালের রচনা তৎ-সম্বন্ধে গোঁড়া ও অগোঁড়া উভয় দলে বিশেষ বৈষম্য নাই—সময় নিরূপণে দুদশ বৎসরের তারতম্য আছে মাত্র। এই নবীন সুসমাচারে যীশুর দীক্ষার বর্ণনা নাই ; কেবল যীশুর উপর স্বর্গ হইতে কপোতের ন্যায় পবিত্রাত্মার অবতরণ সম্বন্ধে দীক্ষাদাতা যোহনের সাক্ষ্য আছে—দীক্ষা দাতা যোহন আপনাকে ঐ ব্যাপারের দ্রষ্টা বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

সুসমাচার চতুষ্টয়ের লেখকগণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঘটনাটী জানিতেন না। সম্ভবতঃ দীক্ষাদাতা যোহনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কথাটী প্রাথমিক মণ্ডলীর খ্রীষ্টিয়ানেরা অবগত হন। দীক্ষাদাতা যোহন ভাবুক লোক ছিলেন। ভাবের ভাষায় তিনি বলিয়াছিলেন "আমি আত্মাকে কপোতের ন্যায় স্বর্গ হইতে নামিতে দেখিয়াছি ; তিনি তাঁহার উপরে অবস্থিতি করিলেন।"

ভাবুক দীক্ষাদাতা কি অর্থে স্বর্গ, কি অর্থে কপোত, ও কি অর্থে সেই কপোতের অবতরণ বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারই ন্যায় ভাবুক না হইলে বোধগম্য করা অসম্ভব। এ কারণ সাধারণ খৃষ্টিয়ানদের বিশ্বাস, যীশু যখন দীক্ষাপ্রাপ্তান্তে জল হইতে উঠিয়া আসিতেছিলেন, তখন আমাদের মাথার উপর যে দৃশ্যমান নীল আকাশ বিস্তারিত রহিয়াছে, তাহাই ফাটিয়া গেল, আর ঐ ছিদ্রদিয়া পবিত্রাত্মা কপোত-দেহ ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিলেন, ও যীশুর মাথার উপর উপবেশন করিলেন। যীশু স্বয়ং এই ব্যাপার চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াছিলেন দীক্ষাদাতা যোহনও এই ব্যাপার চর্ম্মচক্ষে দেখিয়াছিলেন।

অতঃপর যে স্বর্গীয় বাণীর উল্লেখ আছে—"ইনি আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত"—সে বাণীটাকেও খ্রীষ্টিয়ানেরা দৃশ্যমান আকাশ-বাণী ও এই চর্ম্ম কর্ণে শোনা বাণী মনে করেন—যদিও এখানেও স্বর্গ শব্দটা মূল গ্রীকে বহু বচনেই দেখিতে পাই।

খৃষ্ট ও খৃষ্টিয়ধর্ম্মের এই প্রকার mythological ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে এ যুগে পাশ্চাত্য জগতে অনেকেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছেন। এদিকে এরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা ভারতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারও একটা মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিরক্ষর জেলে, মুচিদের যা ইচ্ছা শিখাইয়া বপ্তিস্মের সংখ্যা বাড়াইতে পার, কিন্তু তাহাতেই ভারত তরিয়া যাইবে, এমন মনে করিও না। "ভারতবাসীদের হৃদয়ে খ্রীষ্টের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের আর এক প্রকার ব্যাখ্যা চাই। নতুবা বর্ত্তমান শিক্ষার আলোকে

যাঁহারা নিজ ধর্ম্মের উপকথা গুলি পরিত্যাগ করিতেছেন, তাঁহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উপকথা গুলি কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন?

বাধ্য হইয়া অবান্তর কথা অনেক বলিলাম, পাঠক ক্ষমা করিবেন। এখন এসব কথা ছাড়িয়া যীশুর পবিত্রাত্মা প্রাপ্তিরূপ আধ্যাত্মিক রহস্যের একটুকু মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করি। এ চেষ্টায় আমাদের ভারতীয় প্রাচীন ঋষিদের সহায়তা লইতে হইবে—যদি পূজ্যপাদ এসেনীদের কোন ধর্ম্ম শাস্ত্র বিদ্যমান থাকিত, তবে তাহা হইতেও আমরা যথেষ্ট সহায়তা পাইতাম।

প্রথমতঃ জল-দীক্ষা বা জলে দীক্ষা। খ্রীষ্টীয় জগৎ সাধারণতঃ জল দীক্ষার যে সাঙ্কেতিক (symbolic) ব্যাখ্যা করেন, তাহা যীশুর সম্বন্ধে খাটেনা। সাধারণ খ্রীষ্টীয় ব্যাখ্যানুসারে, জলে যেমন শরীর ধৌত হয়, যীশুর রক্তে তেমনি মানুষের পাপ ধৌত হয়—জল-দীক্ষা ঐ পাপ ধৌতের সঙ্কেত বা নিদর্শন। যীশু পাপ রহিত; তবে তাঁহার জল দীক্ষার অর্থ কি! এই ব্যাপার লইয়া খ্রীষ্টীয় বিদ্যাবাগীশেরা যথেষ্ট বিদ্যা-চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন। সে সকল কথার এ স্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই।

পাপ ও পাপমুক্তি অবশ্য ধর্ম্ম বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। যে আত্মা ঈশ্বরের কৃপায় সজাগ হইয়াছে, সে আত্মা পাপ হইতে মুক্তি চায়। তবু কেবল পাপ মুক্তিই সাধক জীবনের লক্ষ্য নহে। পাপরূপ প্রেত স্কন্ধ হইতে নামিয়া গেলে প্রাণটা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। ইঁহারই নাম খৃষ্টিয়ানের ভাষায় মুক্তি। কিন্তু এ মুক্তি একটা অভাবাত্মক (negative) সাধন—পাপাভাব বা পাপের দণ্ডাভাব মাত্র। মুক্তির একটা ভাবাত্মক সাধন আছে। সে সাধন ব্রহ্মে অবগাহন। "জলে দীক্ষা" এই ব্রহ্মে অবগাহনের নিদর্শন বা symbol.

আত্মার ব্রহ্মাবগাহন দুই প্রকারে ঘটে। বহিঃপ্রকৃতির সংস্পর্শে প্রকৃতিতে পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মের অনুভূতি। দ্বিতীয়তঃ "হিরণ্ময়ে পরে কোষে"—অর্থাৎ আত্ম-সম্বিৎ নাম জ্যোতির্ম্ময় শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে পরমাত্মার অনুভূতি। এদেশের সাধকেরা ওতপ্রোত ভাবে ব্রহ্মকে সমগ্র বিশ্বে অনুভব করিতেন, আবার আত্ম সম্বিদে ডুবিয়া তাঁহার মহাসম্বিদে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। এ তত্ত্ব ভারত হইতে ও দেশে যায় নাই, বা ও দেশের এসেনী ও ভাবুকেরা এ তত্ত্ব জানিতেন না, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

জল বাহ্য প্রকৃতির একটা জিনিষ মাত্র। সাধক একটা জিনিষের দ্বারাও সর্ব্ব জিনিষের সার তত্ত্বে পৌছিতে পারেন। কথাটা সাধন-সাপেক্ষ। বিনা সাধনে কথাটা কেহ বুঝিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না।

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২।১৭।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি সমুদয় জগতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

"যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে"—যীশু জলে অবগাহন পূর্ব্বক ঐ জলে ব্যাপ্ত ব্রহ্মে অবগাহন করিলেন। তুমি যখন জলে অবগাহন কর, তখন কি জলব্যাপ্ত ব্রহ্মের [illegible]

অনুভব কর? শরীর জল স্পর্শ করিবে, কিন্তু আত্মা ব্রহ্ম স্পর্শ করিবে। এ তত্ত্ব গভীর, কিন্তু এ তত্ত্ব সাধকের অনুভূত—উপলব্ধির বিষয়।

আমি তীর্থ স্নানের বিরোধী নহি, যদি তীর্থজলে স্নাতক ব্রহ্মানুভূতি করেন। প্রাচীন ভারত নদীজলে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি দেখিত—"যো অপ্সু"—নদীজলে অবগাহন পূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে ডুবিত। পৌরাণিক ভারত (সম্ভবতঃ মুসলমান বা তৎপূর্ব্ব যুগের খ্রীষ্টীয় শিক্ষার অনুকরণে) বিশেষ বিশেষ নদীর পাপ প্রক্ষালন শক্তি উদ্ভাবন পূর্ব্বক তীর্থ স্নানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ঋষিরা নদী জলের পাপ প্রক্ষালন শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা প্রকৃতিতে দেবদর্শন করিতেন। পরবর্ত্তীকালে উপনিষদের ঋষিগণ প্রকৃতিতে ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছিলেন—"যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু।" নাসরতের যীশুও যর্দ্দনের জলে ব্রহ্মদর্শন পূর্ব্বক ঐ জলে অবগাহন করিলেন—ব্রহ্মে ডুবিয়া গেলেন—ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহাই যীশুর জলদীক্ষার ভারতীয় ব্যাখ্যা। ইহাতে পাপ ক্ষালনের কথা নাই।

দ্বিতীয়তঃ স্বর্গসমূহের উদ্ঘাটন বা বিদারণ। মাথার উপর ঐ যে নীলিমা দেখা যাইতেছে, তাহাই কি স্বর্গ? অল্প বুদ্ধি মানুষ এরূপ বিবেচনা করিতে পারে। যত্র ব্রহ্ম ব্যাপকরূপে অবস্থিত, তত্র জ্ঞানীর স্বর্গ। স্বর্গ বহু, স্বর্গ অসংখ্য, স্বর্গ অনন্ত। স্বর্গে যাইতে হইলে ঐ নীলিমার পরপারে যাইবার আবশ্যক নাই। যে মানুষটা একবার প্রকৃতির একটা জিনিসের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মস্পর্শন লাভ করিয়াছে, প্রকৃতির প্রতি পদার্থ ঘোমটা খুলিয়া তাহাকে ডাকিতেছে, আয়! আমি তোকে স্বর্গ দেখাইব—আমি তোকে স্বর্গে লইয়া যাইব!

পত্র, পুষ্প, ফলে, সরিৎ, সিন্ধু, জলে সর্ব্বত্র স্বর্গ। প্রস্তরে, ভূস্তরে, যাবৎ চরাচরে, সর্ব্বত্র স্বর্গ। অনলে, অনিলে, ঐ পাখীটার গানে, সর্ব্বত্র স্বর্গ। তোমার ঐ সরল শিশুর হাসিতে, মধুময়ী স্ত্রীর মাধুর্য্যে স্বর্গ। যা দেখিবে, তাই স্বর্গ; যা ছুঁইবে, তাই স্বর্গ। ইহারই নাম স্বর্গ সমূহের উদ্ঘাটন বা স্বর্গসমূহের বিদারণ। প্রকৃতির প্রতি পদার্থের মধ্য হইতে কে যেন সাধককে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে—সে যেন কার আধ ঢাকা, আধ খোলা মুখ দেখিয়া মোহিত হইয়া রহিয়াছে!

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।
কেনোপনিষৎ ১৩।

ধীর (অর্থাৎ জ্ঞানীগণ) ভূতে ভূতে (অর্থাৎ সমুদায় বস্তুতে) পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমর হয়েন।

ঈশ্বর নরক সৃষ্টি করেন নাই। পুণ্যময় ঈশ্বরের পক্ষে নরক সৃষ্টি করা অসম্ভব। তাঁহার সমুদায় সৃষ্টি স্বর্গ। নরক তোমার আমার সৃষ্ট। যখন আমরা কুনয়নে পবিত্রতম বস্তু দর্শন করি—যখন কুবাসনায় পবিত্রতম বস্তু বুকে চাপিয়া ধরি, তখন স্বয়ং আমরা নিজ আত্মায় নরকের সৃষ্টি করি।

যীশু জলে অবগাহন পূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবগাহন করিলেন। জল হইতে উঠিয়া [illegible]

মেলিয়া দেখিলেন, সমগ্র বিশ্বই ব্রহ্মস্বরূপে পরিপূর্ণ। সমগ্র বিশ্ব পুণ্যময়ে বিভাসিত হইয়া পুণ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সমগ্র বিশ্ব স্বর্গ। অতএব তাঁহার সম্মুখে স্বর্গসমূহ খুলিয়া গেল —বিশ্ব বিদীর্ণ করিয়া বিশ্বেশ্বর দেখা দিলেন।

তাই তাঁহার প্রচার মন্ত্র ছিল "অনুতাপ কর, স্বর্গসমূহের রাজ্য নিকটে।" যে জিনিসটা তোমাকে স্বর্গসমূহ দেখিতে দিতেছেনা—স্বর্গসমূহে প্রবেশ করিতে দিতেছেনা, সে জিনিসটা পাপ—বাসনার বশে সান্তকে অনন্ত বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরা। সান্তে অনন্তের দর্শন পাপ নহে। সান্তকে অনন্ত ভাবা পাপ। ঐ পাপ ছাড়—বাসনা কাট—সর্ব্বত্র স্বর্গ পাইবে।

তৃতীয়তঃ কপোতরূপে পবিত্রাত্মার অবতরণ। যখন স্বর্গসমূহ খুলিয়া গেল—প্রকৃতির প্রতি পদার্থ পুণ্যময় বুক উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান হইল, তখন ঐ প্রতি পদার্থের অন্তরালে আত্মারূপী ভগবানের সাক্ষাৎলাভ ঘটিল। এখন ঐ আত্মারূপী ভগবান কি কেবল "ভূতেষু ভূতেষু" থাকিবেন? তাহা নহে। তিনি দ্রষ্টার প্রাণেও আসিবেন। মার্কের পাঠান্তরে *epi* "উপর" শব্দের পরিবর্ত্তে *eis* (into) বা "অভ্যন্তর" শব্দ দেখিতে পাই। আত্মারূপী ভগবান ঐ বহিঃ প্রকৃতির অসংখ্য বস্তুর মধ্য হইতে তাঁহার আত্ম-সম্বিদের অভ্যন্তরে অবতীর্ণ হইলেন। অবতীর্ণ হওয়া সাধারণ ভাষা, স্ফূর্ত্তিমান হওয়া ভাবের ভাষা। সাধকের অন্তরাত্মায় অস্ফূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি। যিনি বাহিরে, তিনিই অন্তরে। যিনি স্বর্গসমূহে, তিনিই প্রাণের কন্দরে। এই অভিজ্ঞতার নাম পবিত্রাত্মার অবতরণ। পবিত্রাত্মা আসেনও না, যানও না, চড়েনও না, নাবেনও না। তিনি সর্ব্বব্যাপী ভগবান। তিনি সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিমান। তাঁহার স্ফূর্ত্তি ও অস্ফূর্ত্তি প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের জ্ঞান বা অনুভূতির স্ফূর্ত্তি ও অস্ফূর্ত্তি। আমাদের অন্তশ্চক্ষু যখন অন্ধ তখন ব্রহ্ম অস্ফূর্ত্তিমান বলিয়া বোধ হন। আমাদের অন্তশ্চক্ষু যখন ফুটিয়া যায়, অমনি প্রাণের ভিতর "প্রাণস্য প্রাণম্" স্ফূর্ত্তিমান ব্রহ্মকে দেখিতে পাই। যীশু যর্দ্দনের জলে ও বাহ্য প্রকৃতিতে যাঁহাকে দেখিতেছিলেন, এখন প্রাণের ভিতর আত্ম সম্বিদে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৯।

হিরণ্ময় (অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়) (আত্মসম্বিদরূপ) শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে রজ রহিত, কলা রহিত ব্রহ্ম (প্রকাশিত আছেন।) তিনি শুদ্ধ, জ্যোতিষ্মদ্ বস্তু সমূহের জ্যোতি। তিনি সেই, যাঁহাকে আত্মবিদেরা জানেন।

কপোতের ন্যায়। লূক লিখিতেছেন দৈহিক আকারে কপোতের ন্যায়। দৈহিক বলিলে যে দৈহিকই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। ভাষার অলঙ্কার আছে। অনেক সময় ভাবের গাঢ়তা দেখাইবার জন্য দেহ শব্দের ব্যবহার হয়। সুতরাং এখানেও যদি মহাত্মা লূক "দৈহিক" শব্দটাকে আলঙ্কারিকভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে? অথবা যদি লূক "দৈহিক" শব্দটাকে নিরবচ্ছিন্ন "দৈহিক" বুঝিয়াই প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে কি আসে যায়?

বর্দ্দনের ঐ ঘাটে কেহ ক্যামেরা লইয়া সেই স্বর্গীয় কপোতটার ছবি তুলিয়া রাখেন নাই। মুখের কথা মুখে মুখে উড়িতে উড়িতে অনেক সময় পক্ষপ্রাপ্ত হইয়া পাখীর আকারই ধারণ করে। লুক যীশুর সম সাময়িক নন, পরবর্ত্তী কালের লোক। দীক্ষাদাতা যোহন যে কথাটা ভাবের ভাষায় বলিয়াছিলেন, লুকের কর্ণ পর্য্যন্ত পৌছিতে পৌছিতে সে কথাটার বাচ্য যদি দৈহিকভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে তাহাতেই বা আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কি আছে?

আত্মা অজড়, অরূপ। সেই অজড় ও অরূপের দৈহিক আকার ধারণ অসম্ভব। ইহা অবতার বাদের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা। অসীম সসীম হবেন, অজড় জড় হবেন, অরূপ রূপ হবেন, তাহা কি সম্ভব? যদি তাহা সম্ভব হয়, তবে ঈশ্বর ঈশ্বর থাকেন না—ঈশ্বর স্ববিরোধ দোষে দুষ্ট হন।

তবে কপোতরূপে পবিত্রাত্মার অবতরণের অর্থ কি? ইহার অনেক অর্থ থাকিতে পারে। একটা অর্থ, প্রাচ্য দেশে পাখী আত্মার symbol বা নিদর্শন। পার্সীদের ধর্ম্মে এই symbol বা নিদর্শন দেখিতে পাই—বৈদিক ধর্ম্মে এই symbol বা নিদর্শন দেখিতে পাই।

প্রাচীন পার্সিপলিস নগরের ভগ্নাবশেষের চিত্রাবলীর মধ্যে দারা বাদশাহের একটা চিত্র দেখিয়াছি। বাদশাহ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, অহুর মজদা (অর্থাৎ ঈশ্বর) পক্ষীরূপে পক্ষপুট বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছেন। ঐ পক্ষী অহুর মজদার নিদর্শন মাত্র। কোন পার্সীই একথা বিশ্বাস করেন না, যে অহুর মজদা কোন কালে পক্ষীরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত ঋক্‌টী দেখিতে পাই। উহা উপনিষদে ও উদ্ধৃত হইয়াছে।

দ্বা সুপর্ণা স যুজা সখায়া সমানং বৃক্ষে পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্ন ন্যোঽভিচাকশীতি॥
ঋগ্বেদ ১।১৬৪।২০। মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।১।

দুই পরস্পর সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন পক্ষী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মিষ্টফল ভক্ষণ করেন, আর একজন অনশন থাকিয়া (কেবল) দর্শন করেন।

ঋগ্বেদে এই দুই পক্ষীর যে অর্থই হউক না কেন, উপনিষদে ঐ দুই পক্ষীর একটী জীবাত্মা ও অপরটী পরমাত্মা। জীবাত্মা সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিতেছেন, পরমাত্মা স্বয়ং অনশনে থাকিয়া তাহা দর্শন করিতেছেন।

কপোতরূপী পবিত্রাত্মা ঐ দ্বিতীয় পক্ষী। যেমন পক্ষীরূপী অহুর মজদা দারা বাদশাহের মাথার উপর পক্ষ পুট বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার সংরক্ষণ করিতেছেন, কপোতরূপী পবিত্রাত্মা সেইরূপে যীশুর মাথার উপর আপনার পক্ষপুট বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহার সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এটা মার্কের প্রথম পাঠের অনুরূপ ব্যাখ্যা।

আবার উপনিষদের সখারূপী দুই পক্ষী:—পবিত্রাত্মা কপোত, যীশুর পবিত্র আত্মাও কপোত। দুই কপোতে মিতালি—দুই কপোতের অন্তর্যোগ। যে ফলটা "যীশু কপোত" খাবেন, সেটা কি মিষ্ট ফল? বৈদিক ঋষি ফলটাকে মিষ্ট অনুমান করিয়াছিলেন, সন্দেহ

নাই। কিন্তু ও ফলটা যে ক্রুশ-ফল। ও গাছে কি মিষ্ট ফল ধরে? পিত্তমিশ্র সির্কা ও ফলের রস—পাপ ক্লিষ্ট জগতের তিক্ততা ও ফলের আস্বাদ! কপোতরূপী পবিত্রাত্মা তাঁহার প্রাণের ডালে বসিয়া তাঁহাকে ঐ ফল আস্বাদন করিতে বলিতেছেন। পবিত্রাত্মার পক্ষ-পুটের অন্তরালে আপনাকে লুকাইয়া, পবিত্রাত্মায় মণ্ডিত হইয়া পবিত্র যীশু ঐ ফল আস্বাদন করিতে যর্দ্দনতীর্থ হইতে ক্যালবরী তীর্থে * যাত্রা করিতেছেন!

আমাদের প্রাচ্য বুদ্ধিতে কপোতরূপী পবিত্রাত্মার এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এসেনী ভাবুক যোহন ঋষিও বোধ করি এই অর্থেই কপোতরূপী পবিত্রাত্মার অবতরণ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। এ কপোত চর্ম্মচক্ষে-দৃষ্ট দেহধারী কপোত নহেন। এ কপোত অচর্ম্ম চক্ষে দৃষ্ট অদেহী পরমাত্মা। সূক্ষ্ম বুদ্ধির অভাবে মানুষ কথাটা জড় ভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

ধ্রুব।

ওরে সংসারী ওরে সুরুচির ক্রীতদাস
চলিলেন ধ্রুব সংসার ছাড়ি
সিংহাসনের আশ।
উজ্জল রত্ন মণি মাণিক্য শত বাসনার ধন,
সুরুচির দুটি পেলব বাহুর মদির আলিঙ্গন;
স্বস্তির আশা শান্তির সাধ, তৃপ্তির মোহ ছাড়ি
চির অজ্ঞাত জ্ঞানের সাগরে দিলেন অভয় পাড়ি
সংসারে যাহা রয়; নহে শাশ্বত নহে অমৃত
নহে তাহা ধ্রুব নয়।
একটী স্বপ্ন একটী মোহন অবুঝ মরিচীতৃষা
বাসনা মুক্ত মনের মাঝারে লাগায়ে দিয়াছে দিশা
ও নহে দীপ্তি, ও নহে তৃপ্তি নহেক ও ধ্রুব সুধা;
সুরুচির মায়া জ্বালিয়া শুধুই জ্বালায় অনল ক্ষুধা।
চলিলেন ধ্রুব বন;
রচিতে অমর অমৃতময় অচল সিংহাসন।
তপের সৃষ্টি—ত্যাগের রচনা নহে ও হিরন্ময়
নাহিক মুহ্য মনের দৈন্য চিরজ্যোতি অক্ষয়।

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

---

* যেরুশিলেমের বাহিরে যেখানে খ্রীষ্ট ক্রুশ প্রাপ্ত হন, সেই স্থানটার নাম ক্যালবরী পাহাড়।

শিক্ষা জগতের যৎকিঞ্চিৎ (৪)

যাঁদের মনের বৈচিত্র্য আমাদের একঘেয়ে জীবনকে সুরে তালে মণ্ডিত করে, বিদ্যাদান ব্যাপারটাকে সরস করে তোলে, সেই ছাত্র ছাত্রীদের সম্বন্ধে আমার যে স্বল্প অভিজ্ঞতা আছে এবার তাই কিছু বলা যাক্। এঁদের সকলেরই মনের পাত্র একই ধাতুতে গঠিত নয়, আকারে ওজনেও সমান নয়, তাই ঠিক সমান পরিমাণে একই রকমের জ্ঞান এঁদের সমান ভাবে পরিবেশন করা চলে না, এবং এঁদের কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্য যা, তা আদায় করার ব্যবহার বিধি ও একপ্রকার হ'লে সবসময়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। এ সব কথা আমরা ভুলে যাই—বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে অন্ততঃ খানিকটা ভুলে না গেলে চলেও না—এবং সেই জন্যই সমান দিয়েছি মনে করে সমান ফলের প্রত্যাশা করে যখন নিরাশ হই, তখন সমান ফলটা জোর করে আদায় করতে গিয়ে দেখি, মন্থন দণ্ডের মুখে অমৃতের বদলে গরলও সময় সময়ে উঠে আসে।

জন্মগত এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈচিত্রের ফলে বিচিত্রমনা এই যাঁরা আমাদের হাতে এসে পড়েন, তাঁদের আমরা মনের কতকগুলি মোটামুটি গুণানুসারে বিশেষ পর্য্যায়ভুক্ত করি এবং সেই অনুসারে চালাতে চেষ্টা করি। সরকারী এবং অর্দ্ধসরকারী শিক্ষাপীঠগুলিকে শিক্ষা বিভাগের বাঁধা গৎ সাধতে এতই ব্যস্ত থাকতে হয় যে এই পর্য্যায়গুলির দিকেও যথোচিত দৃষ্টি রাখা যায় না।

কোন কোনও শিশু থাকে যে স্বাভাবতঃই কল্পনাপ্রবণ। সে নিজের মনে অনেক রকম কাল্পনিক অবস্থা চিন্তা করে এবং শিশু বলেই কল্পনা এবং বাস্তবের তফাৎটা ধরতে পারে না ও কল্পনাটাকেই সত্য বলে মনে করে নেয়। এ সকল শিশুর সঙ্গে খুব সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। এই কল্পনা প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিলে, বাস্তব এবং কল্পনার প্রভেদ শিশুচিত্তের কাছে পরিস্ফুট না করে দিলে এ সকল শিশু অতি সহজেই অতি-রঞ্জন বাদী হয়ে ওঠে এবং উত্তর কালে লোকের মুখে এই ই শোনা যায় "ওর শতকরা ৯৯টা বাদ দিলে বাকীটুকু সত্য।" আমি একটী শিশুর আত্মীয়ের মুখে শুনেছি যে তাঁরা এই শিশুটির শৈশবে তার কল্পনা প্রবণতার তারিফ করে এখন এর বয়সকালে খুব ভুগছেন। সে সত্যকথা বলতে এখন পারে না। অনেক সময় এদের কল্পনা প্রবণতাকে সংযত করবার জন্য খুব কঠিন উপায় অবলম্বন করা হয়। এতে যে খুব সুফল উৎপন্ন হয় আমার তা মনে হয় না। অন্ততঃ আমি নিজে দেখি নাই।

আমি জানি একটি শিশুকে যে কল্পনা এবং বাস্তবের প্রভেদ বুঝতে না পেরে রাত্রে যা স্বপ্ন দেখেছিল তা সত্য মনে করে সেটাকে প্রচার করে। তার চেয়ে বড় যারা তাঁরা তাকে এই জন্য "মিথ্যাবাদী" ইত্যাদি বলে তার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে। শিশুটী এতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়। কিন্তু তার সৌভাগ্যক্রমে তার এমন একজন বয়স্ক বন্ধু ছিলেন যিনি তাকে বুঝিয়ে

বলেন যে "হাঁ, তোমার কাছে এটা সত্যি কারণ তুমি এটা দেখেছ, কিন্তু ওদের কাছে এটা সত্যি নয় কারণ ওরা এটা দেখেনি আর দেখ্‌তেও পার্‌ছে না।" শিশু সবকথা বুঝতে পারে নাই—গুলিয়ে বুঝবার তার সামর্থ্য ছিল না কিন্তু মিথ্যাবাদী হওয়ার লজ্জা থেকে সে নিস্তার পেয়েছিল। আর যারা তাকে ঘৃণা করেছিল তারা যে ইচ্ছা করেই তার উপর একটা অন্যায় করেছিল এও নয়, এটা বুঝতে পেরে তাদের প্রতি মনে একটা খারাপ ভাব পোষণ করে নাই।

এই পর্য্যায় ভুক্ত শিশুরা অনেক সময় কোন ও একটা কাল্পনিক অবস্থাতে সুখ পায় বলে সেই অবস্থাটাকে বাস্তব বলে প্রচার করে। সে যে ইচ্ছা করেই মিথ্যা বলে তা নয়। এ ক্ষেত্রে তাকে শাস্তি দিলে বা তার প্রতি কোনও মনোযোগ না কর্‌লে দুয়েরই ফল বোধ হয়, এক হয়। এই রকম মন প্রায় দুর্ব্বল-স্নায়ু (hysteric এবং nervous) শিশুদের মধ্যেই দেখা যায়। একেবারে অবহেলা কর্‌লে বা গুরুদণ্ড বিধান কর্‌লে এরা hysteria গ্রস্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আমারই একটী ছোট ছাত্রী একদিন স্কুলে এসে খুব কান্না জুড়ে দিয়েছিল, তার সঙ্গিনীদের কাছে এই বলে, যে তার সৎমা তার প্রতি খুবই অত্যাচার করেন এবং সেই দিনে বিশেষ করে তাকে কষ্ট দিয়েছেন, শুধু এই কারণে যে তার স্বর্গগতা মায়ের কাপড় পরে তার মায়ের কথা মনে এসেছিল। সঙ্গিনীর দল ত অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তেই তাকে সমবেদনা জানাচ্ছিল, এমন সময় আমি সেখানে গিয়ে পড়াতে সমস্ত জিনিস-টাই মাটি হয়ে গেল। আমি মেয়েটীকে ভাল করেই জানতুম তার মা আমার বন্ধু, আর তার বাবার দুবার বিয়েই হয় নি। তার সঙ্গিনীরা আমায় যখন তার কান্নার কারণটা দিল, আমি তখন রাগব কি হাসব তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে প্রশ্ন করে যা টের পেলাম তা এই, Ceinderellaর গল্প পড়ে অবধি তার ভারী ইচ্ছা যে তার একটী সৎমা হন এবং তিনি তাকে এত কষ্ট দেন যেন সারা দুনিয়া তার প্রতি অনুকম্পায় ভরে ওঠে। আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে তার মনের তৃপ্তির জন্য বেচারী বাবা মায়ের ঘাড়ে মিথ্যা করে এতখানি দোষ চাপিয়ে দিলে তাঁরা খুব খুসী হবেন না।

কত সময়ে দেখা যায় যে শিশুর ব্যবহারে কোনও সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; গুরুজনদের কত সময়ে বল্‌তে শোনা যায় যে ছেলেটার ঘাড়ে ভূত চেপেছে বা ছেলেটাকে মাবে পেয়েছে। লাঠৌষধি দানেই যে ঘাড়ের ভূত শায়েস্তা হয়ে যায় তা নয়, বরং এর বিপরীত ফলই অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়। শিশু মনও যে Consistencyর কদর বুঝে। ভূতের আসাটা যতই inconsistent হউক না কেন, সে এসে যে এমন বে-কায়দায় চলে যাবে তা হয় না। এই আমার ঘাড়ে ভূত চেপেছিল, তার জন্য এত কাণ্ড হয়ে গেল আর এখ্‌খুনি দুটো বেতের বাড়ীতেই যদি ভূতটা নেমে গেল তবে ভূত চাপার সার্থকতা রৈল কৈ? বেতের বাড়ি বা বকুনি কখনো কখনো ভূতকে আরো শক্ত করেই ঘাড়ে বসিয়ে দেয়। অনেক সময় ভূত চেপেছে দেখেও ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যদি গুরুমশায় সন্দিহান হয়ে পড়েন ত দেখা যায় যে ছাত্রও সন্দেহ করতে আরম্ভ করে, যে তার ঘাড়ে ভূত চেপেছে।

যারা আদুরে গোপাল, অহংজ্ঞান যাদের একটু বেশী তাদের ভূতের অস্তিত্বটা স্বীকার করে একটু তোয়াজ করলেই ভূত শীঘ্র নেমে যায়।

কলাম্বোতে থাকতে একদিন সকালবেলা কিণ্ডারগার্টেন ক্লাশে ঢুকেই দেখি হুলস্থূল ব্যাপার। ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর একটা ছোট্ট চেয়ার উলটিয়ে পড়ে আছে, ছোট্ট ২ ছাত্র ছাত্রীরা সব বড় ২ চোখ করে ব্যস্ত হয়ে তাদের দৃষ্টি মেলে ধরেছেন শিক্ষয়িত্রী এবং একটী ছোট্ট মহিলার উপর। শিক্ষয়িত্রী নানারকমে চেষ্টা করছেন এই মহিলাটীকে দিয়ে চেয়ারটী তোলাতে, সে কিছুই শুনছে না কেবল পা দাপাচ্ছে আর বলছে "আমি কখখনো চেয়ার তুলব না, ও ত ঝিতে করে।" ঝি ছাড়া, যে মেয়ে চেয়ার ফেলে দেয় সেও যে করে এটা শিক্ষয়িত্রী তাকে কোনও রকমে বুঝিয়ে উঠতে পারছেন না। শিক্ষয়িত্রী আমার হাতে ক্রোধান্বিতাকে সমর্পণ করে দিতে আমি তাকে আমার অফিস-রুমে নিয়ে এলাম। বিদ্যালয়ে এর মত ভয়ঙ্কর স্থান আর নাই—এ যে ফৌজদারী আদালত, যত অপরাধীর দণ্ডবিধান তো এখান থেকেই হয়। আমি তাকে একটা কোণ দেখিয়ে বললুম "তুমি তবে ঐ কোণটায় দাঁড়িয়ে চেঁচাও; আমার তো এখন তোমার কথা শুনবার অবসর নাই। তোমার যখন চেঁচান হয়ে যাবে আর তারপর যদি চেয়ার ওঠাবার মর্জ্জী তোমার হয়, তা হলে আমায় জানিয়ো তখন হয়ত আমার তোমার দিকে মন দেবার অবসর হবে।" প্রায় কুড়ি ত্রিশ মিনিট পরে মেয়েটীর ঘাড়ের ভূত নামলো এবং সে নিজেই আমায় জানালো যে সে চেয়ার তুলবে।

আমার ছাত্রাবস্থায় আমায় অতি সহজেই এ রকম ভূতে পেয়ে যেতো। আমার নিজের বিষয় আমি এটা জানি যে আমায় যতই তাড়না করা হ'ত, ভূত ও ততই শক্ত হয়ে ঘাড়ে চাপ্‌তো কিন্তু কিছুক্ষণ তার দিকে বড়রা যদি খেয়াল না করতেন তো সে আপনিই নেমে যেতো। কিন্তু নাম্‌বার পর যদি তার আসার সম্বন্ধে পুনরুল্লেখ কেউ ভুলে করে ফেল্‌তেন তা হ'লে অনেক সময় তার স্থলে মামদো ভূতের আবির্ভাব হয়ে যেতো।

অনেকে থাকে যাদের কোন'ও বিশেষ বিষয়, বিশেষ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী বা বিশেষ প্রণালীর উপর একটা বিতৃষ্ণা থাকে যার জন্য সেই বিশেষ সময়টায়ই শুধু তার ঘাড়ে ভূত চাপে। বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের বিষয় আমাদের সকলেরই জানা আছে যে বিশেষ শিক্ষকের উপর বিতৃষ্ণার দরুণ সেই শিক্ষকের ঘণ্টায় তাঁর ঘাড়ে কি রকম ভূত চাপ্‌তো যে রোজ তাঁকে রোদে এক পায় দাঁড় করিয়েও ভূত নামানো যায় নি।

আমার একটী ছাত্র লিখ্‌তে ভারী নারাজ ছিল। যখনি তাকে লিখ্‌তে বলা হ'ত, হয় সে ছবি আঁকতো, নৈলে দোয়াতের মধ্যে পাঁচটা আঙ্গুল ডুবিয়ে কাপড়, জামা, ডেস্ক, খাতা বই সব কালীময় করে তুলতো। বেচারাকে এইজন্য অত্যন্ত শাস্তিভোগ করতে হ'তো। ক্লাশ-শিক্ষয়িত্রী যখন না পেরে তাকে আমার কাছে নিয়ে এলেন তখন সে অত্যন্ত কাতর ভাবেই আমাকে জানালো যে লেখা কাজটা তাকে দিয়ে হতে পারে না। সে বেচারা লেখার হাত এড়াবার জন্য অসভ্য চেষ্টা পর্য্যন্ত হ'তে রাজী ছিল। অথচ মৌখিক প্রশ্নোত্তরে সে বেশ ভালই ছিল, ছবিও আঁকতো ভাল।

এই পর্য্যায় ভুক্তরা কি কারণে সেই বিশেষ ব্যক্তি, বিষয় বা প্রণালীর উপর বিরক্ত হৌয়া

বার করে সেই কারণটা দূর করলেই সব গোল চুকে যায়। শৈশবেই অঙ্কের শিক্ষয়িত্রীর কাছে শাস্তি পেয়ে অঙ্কশাস্ত্রের উপরই আমার বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। কিন্তু উঁচু ক্লাশে এসে সহৃদয় অধ্যাপকের কাছে পড়্‌তে গিয়ে সে বিতৃষ্ণা দূর হয়ে গিয়েছিল। আমার ভাইপোটী কোনও বিশেষ শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়্‌তে অত্যন্ত নারাজ ছিল। তাঁর কারণ খুঁজ্‌তে গিয়ে দেখ্‌লাম শিক্ষয়িত্রীর কোনই দোষ নাই—দোষ তাঁর কাজটার। তাঁর ক্লাশে, শোনা গল্প শিশুদের ফিরে বলবার নিয়ম; সে অত্যন্ত লাজুক (nervous), সে দশজনের সাম্‌নে কিছুতেই গল্প বল্‌তে পারে না, কাজেই সে সেই শিক্ষয়িত্রীর কাছেই পড়্‌বে না। প্রকৃতির অলসতার দরুণ যারা কিছুই কর্‌তে চায় না তাদেরকে যদি এটাই বারবার বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তার দিক থেকেও নিজের কৌতূহল মিটাবার উপায় জানবার চেষ্টা না হলে আমরাও তার কৌতূহল সর্ব্বদাই মিটাবার জন্য যত্ন কর্ব্ব না, তা হ'লে সে পড়াশুনার দিকে মন দেয়—কারণ শিশুচিত্ত যে স্বভাবতঃই কৌতূহলী এবং কৌতূহল মিটাবার চাবীকাঠি যে লেখাপড়া শেখা এটা জান্‌লে সে আপনিই লেখাপড়ার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়্‌বে।

অনেক শিশু থাকে যারা অত্যন্ত সপ্রতিভ; এরা কোনও একটা জিনিস জানে না এটা স্বীকার কর্‌তে লজ্জা পায়। যেখানে নিজের কর্ম্মবিমুখতার দরুণ এই না জানাটার উৎপত্তি সেখানে এই লজ্জা ত্রিগুণ কিন্তু এই লজ্জা স্বীকার করার মত পাপও বুঝি আর নাই তাই তাঁরা সবই জানেন। এই সবজান্তা শিশুগুলিকে এত জানার জন্য যদি বেত্রদণ্ড বা বকুনি দেওয়া যায় তা হলে শিশুর বর্ত্তমানে যতটা না অশ্রুবিসর্জ্জন ঘটে, ভবিষ্যতে, বোধ হয়, তার চেয়ে বেশী ঘটে; ফলে মানবসমাজ যে বিশেষ লাভবান হয়ে ওঠেন তাও নয়।

বঙ্গ সাহিত্যের তরুণ লেখকদের মধ্যে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ একজন বাল্যকালে আমার সহপাঠী ছিলেন। পড়ার চেয়ে খেলারদিকেই যে তাঁর মন বেশী ছিল তা আমি হলপ করে বল্‌তে পারি, কারণ অনেক সময়েই তার খেলার সঙ্গিনী আমি থাক্‌তাম। কিন্তু তিনি ছিলেন একটী প্রকৃতি-বাদ অভিধানবিশেষ। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই তাঁর জানা ছিল—কোন প্রশ্নেই তাঁকে ঠকান যেতো না। Wit এর প্রাচুর্য্য তাঁর ছেলেবেলাতেই ছিল—তাঁর উত্তরগুলো হতো বেশ সরেস। পাখার বাড়ি তাঁর মাঝে ২ লাভ হতো—কারো ২ কাছ থেকে। কিন্তু আমার আজ এটা অনেক সময়েই মনে হয় আমাদের ক্লাশের ভার যাঁর হাতে ছিল তিনি যদি সদা-প্রফুল্ল-সুরসিকচিত্ত না হতেন তো বঙ্গসাহিত্য আজ হয়তো এঁর লেখার স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত থাক্‌তেন।

অনেকে আবার থাকেন বাস্তবিক অলস প্রকৃতির; তার উপর বুদ্ধির মাত্রাটাও তাঁর পাত্রে জন্ম থেকেই কম পড়ে আছে। এমন লোকে যদি নিজেকে সব-জান্তা বিবেচনা করে না জেনেই উত্তর দিতে যায় ত তাঁদের উত্তর আমার পূর্ব্বোল্লিখিত বন্ধুটীর মত সরেশ না হয়ে হয়, হয় বাসী পচা, নয় একেবারে নিঃসার। এঁদেরকে পাখার বাড়ি দিয়ে থামানো যদিও আজকালকার দিনের চিন্তা এবং আদর্শের বিরোধী, তবুও শিক্ষা বিভাগের পিনাল কোডের অন্তর্গত একটা দণ্ডবিধি হয়ে যায় বলে মনটা যেন চাইতে থাকে, কারণ তাদের সেই অতিরিক্ত কথা বলার ঝুঁকীটা যে বইতে হয় আমাদেরই, আর

সে সময়ে মনস্থির রেখে নৈতিক বল প্রয়োগ করা যে কি আয়াসসাধ্য তা ভুক্তভোগীই বোঝেন।

আমি জানি, একটী ছোট মেয়েকে যে ঐ রকম অর্থহীন উত্তর দিত, কিন্তু কিছুতেই উত্তর দেওয়া ছাড়ত না। তাকে নিয়ে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরাই যে শুধু মজা দেখ্‌তেন তা নয়, আমরা ছাত্রীরাও দেখ্‌তাম। আমাদের এক উগ্রমূর্ত্তি পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে কঠিন রকমের দুই ধমক খেয়ে কিন্তু মেয়েটীর এই ব্যারাম সেরে গিয়েছিল।

প্রায় প্রত্যেক শিক্ষাপীঠেই এমন এক জনকে পাওয়া যায় যে অপরকে বেদনা দিতেই ভালবাসে, আঘাতের উপর আঘাত সে দিয়ে যায় যাকেই সামনে পায় তাকে, সে সমপাঠীই হোক আর শিক্ষাদাতাই হো'ন্। জলন্ত অগ্নিশিখা সে, দুর্দ্দম ঝড় সে, সে বিদ্রোহী; নিয়ম কানুন সে জানে না। একে লক্ষ্য করে দেখ্‌তে হয় কারণ এর মধ্যেও দুটী প্রকৃতি লক্ষিত হয়ে থাকে। এক প্রকৃতি থাকে যে আঘাত দেয় অপরকে, দিয়ে আনন্দ পায় কিন্তু নিজে আঘাত পেতে চায় না; বেদনাকে বড়ই ডরায়। এ হ'ল ইংরাজীতে যাকে বলে bully এ হ'ল moral coward, এর নিজের বেদনার ভয়ই একে নির্ম্মম করে তোলে। পাখীর ঠ্যাং ছিড়ে, ব্যাঙকে খোঁচা মেরে, রোগা ছেলে বা মেয়েটিকে মেরে ধরে কাঁদিয়ে এর আনন্দ। একে ধরে নিয়ে এসে "ছিঃ বাবা, এ বড় অন্যায়" বল্লে, বা ঘরে বন্ধ করে সঙ্গে বসে চোখের জলে ভেসে তিন ঘণ্টা উপাসনা কর্‌লে বিশেষ কোনও ফল লাভ হয় না। এর উপর সেই সনাতন নিয়ম প্রয়োগ করতে হয় "অপরের নিকট হইতে তুমি যেরূপ প্রত্যাশা কর, অপরের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার কর।"

আমি একজনকে জানি যে এই রকম নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল, সে নির্ব্বাক জন্তু আর দুর্ব্বল শিশুদের নানারকমে কষ্ট দিত। একদিন সে একটা ব্যাঙের পিছনের পা দুটা ধরে তাকে জরাসন্ধের মত চিরে ফেল্‌ছিল দেখে, তার চেয়ে শক্তিশালী এবং বড় দুতিন জন যখন তাকে ধরে ঐরকম চিরে ফেল্‌বার ভয় দেখালেন তখন তার ভয় জনিত যে ভীষণ আর্ত্তনাদ শুনেছিলাম তা মনে হ'লে আজও তার উপর আমার মনে অবজ্ঞার ভাব জেগে ওঠে। কিন্তু এই ভয় দেখানোর পর সে আর অন্যের উপর অত্যাচার করে নাই।

যে শিশু অপরকে বেদনা দিয়ে নিজে বেদনা পায় তবুও অপরকে বেদনা দিতে ছাড়ে না—সে নিজের বেদনা পাবার লোভেই অমন করে থাকে কারণ বেদনাতেই তার আনন্দ। এরা হ'ল প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহী বার্ণাড শ'এর পুরুষ চরিত্র—নীটসের অতিমানুষ। এদেরকে গড়ে তোলা সাধারণ শিক্ষাপীঠের, অতি সাধারণ আমাদের কাজ নয় বলেই আমার মনে হয়, এদের জন্য আলাদা শিক্ষার বন্দোবস্ত হ'লেই যেন ভাল হয়।

যারা অপরকে বেদনা দিতে চায় না অথচ না বুঝে বেদনা দেয়, তাদেরকে নিয়ে চোখের জলে ভেসে উপাসনা কর্‌লে খুবই সুফল দেখা যায়, তাতে সন্দেহ নাই। প্রেমেতে জগাই মাধাই উদ্ধার হয়েছিলেন, মায়ের অশ্রুজলে সেণ্ট অগষ্টীন বনেছিলেন ছোট শিশু কোন ছার।

অনেক শিশু আছে যারা বেদনা দিতে এবং বেদনা পেতে চায় না তারা দুটোকেই ভয় পায়। এরা প্রায়ই দুর্ব্বল দেহ, ক্ষীণ ধাতুর। এদেরকে সামান্য অপরাধ বা ত্রুটির

জন্য কঠিন শাস্তি দিলে এরা অনেক সময়ে এত ভীরু প্রকৃতির হয়ে ওঠে যে মিথ্যা দ্বারা সামান্য ত্রুটি বা বড় সব কিছুকেই গোপন কর্‌তে চায়। তার ভুলের চেয়ে তার মিথ্যা আচরণটাই যে আমাকে বেশী পীড়া দিচ্ছে এইটাই তার কাছে পরিস্ফুট করে দেওয়া দরকার। এদের কাছে আমার চোখের জলের উপকারিতা আছে বলে যে সকলের কাছেই থাক্‌বে এই বিবেচনাটাই ভুল।

দুর্ব্বল দেহ হলেই যে মন দুর্ব্বল হবে এটা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নয়। রোগা দেহের মধ্যেও এমন সতেজ মন হয় যে রকমটা সুগঠিত দেহের মধ্যেও অনেক সময় দেখা যায় না। স্মুর জানি জীবনচরিতে পড়েছিলুম তিনি ছিলেন খুব রোগা, ছোট্ট খাট্ট, পাৎলা ছেলেটী। তাঁর স্কুলের একটী মাংসল, পেশীবহুল বড় ছেলে আরেকটী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ছোট ছেলেকে মেরে ধরে তার খাবার না খেলার সরঞ্জাম কি যেন একটা কেড়ে নিচ্ছিলেন। তিনি এ অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে না পেরে বড় ছেলেটিকে এমন দমাদম মার দিয়ে ছিলেন যে বড় ছেলেটী অবাক হয়ে গিয়েছিল। বড় ছেলেটীর কাছে মার খেয়ে তাঁর নাক মুখ ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি তাতে দমেন নাই, বলেছিলেন "এর পরও যদি তুমি এমনি কর তো তোমার হাড় গোড় ভেঙ্গে দিব।" এ প্রকৃতির শিশুর কাছে অশ্রুপাতে লাভ হয় না, দুঃখ সহন কর্‌বার শক্তি আমার আছে এইটা দেখানোতেই ফল পাওয়া যায়। অশ্রুপাতকে এরা মনে মনে অবজ্ঞা করে থাকে, এরা কারোও দ্বারে ভিখারী হতে চায় না; এরা জিনে নিতে চায়, সাহস ও শৌর্য্য দিয়ে, এরা চায় যে অপরেও এদের কাছ থেকে জয় করে নেয় এদের চিত্তখানি।

এই প্রকৃতির শিশুরাই সবল দেহ হোক দুর্ব্বলদেহ হোক্‌, অন্যায় করে দণ্ডকে নিতে ভয় পায় না বরং দণ্ড চায় এবং না পেলে মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এদের ভুল ত্রুটির ও ফল ও অবশ্যম্ভাবী মনে করেই এরা তাকে প্রত্যাশা করে থাকে এবং পার্‌লে জোর করেই তাকে ঘাড়ে পেতে নেয়।

আমি জানি একজনকে যিনি পরীক্ষায় প্রশ্নোত্তর দেবার সময় পারছিলেন না বলে নিরীক্ষক (guard)দের অজ্ঞাত সারে বই দেখে প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমস্ত উত্তরই কিছু তিনি বই দেখে লেখেন নাই; একটু খানি দেখে তার মনে এসেছিল জিনিষটা। তখন তিনি কিছু বলেন নাই। কিন্তু অন্যবেলায় তিনি প্রশ্ন পত্রের জবাব না দিয়েই উঠে এসেছিলেন, এই বলেই যে, "সকাল বেলা আমি বই না দেখ্‌লে উত্তর পত্র লিখ্‌তে পারতাম না। আমি বই দেখেছিলাম, তাই আমি এ বেলার উত্তর লিখ্‌ব না। আমার পাশ হওয়া তো ঠিক নয়।"

আর একটি ছোট মেয়ের কথা শুনেছি যে ছেলে বেলায় কালী ফেলে দিয়ে, মার সেলাই এর বাক্স ভেকে ছুঁচ বা কাঁচি বিনানুমতিতে নিয়ে কোনও অনিষ্ট ঘটালে সে কেউ জেনে তাকে শাস্তি দেবার আগেই কোণে দাঁড়িয়ে শাস্তি নিত। সে নিজেকে শাস্তি দিতে খুবই রাজী ছিল।

এতো বিচিত্র মন নিয়ে যাদের কারবার তাদের যে মনতত্ত্ব জানাই চাই একথা

জগতের সমস্ত platform থেকেই সকলকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। শুধু মনস্তত্ব জান্‌লেই হবে না, শরীরের সঙ্গে মনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকার দরুণ, স্বাস্থ্যের উপর, ইন্দ্রিয় শক্তির উপর, মনন ও ধ্যানের, স্মৃতির ও কল্পনার নির্ভর থাকার দরুণ যে ছাত্রমন অলস বা কর্ম্মপটু হয় এটা জানিয়ে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও শারীর তত্বেরও মোটামুটী জ্ঞান শিক্ষকতা ব্রত গ্রহণ করার পূর্ব্বে ব্রত-গ্রহণাকাঙ্ক্ষীকে দেওয়া উচিত।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

আমিত্ব।

ভুলে যাই পরমার্থে, ভুলি হিত,হিত
যাহার প্রতিষ্ঠা লাগি দ্বন্দ্ব করে মরি
(সে) আমিত্বের আদি কোথা, কোথা পরিণাম?
কিনারা কিছু না হয় যত চিন্তা করি।

এ বিশ্বজগৎ বাঁধা শক্তিসূত্রে তব
তোমার নিয়মে চলে এই চরাচর;
তোমার জগতে থেকে তোমারে ভুলিয়ে
আমার আমিত্ব লয়ে করি গণ্ডগোল!

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট পুষ্ট তব প্রেমে
নগণ্য মানব আমি কেবা তার মাঝে?
তবু সে আমিত্ব মোরে রাখে যে ভুলায়ে
পাই না তোমারে ভ্রান্তি মুগ্ধ-চিত্ত মাঝে।

চাহি নাক সে আমিত্ব মিশে যাই আমি
অনন্ত বিস্তীর্ণ তব প্রেমের সাগরে।

বালুকণা তার কাজ আছে এ জগতে,
বারিবিন্দু কত প্রাণ বাঁচায় সংসারে।

আত্ম-অভিমান লয়ে ফিরিয়া দাঁড়াই।
তোমার সন্তান এবং তোমা হতে দূরে।
এই কি আমিত্ব? যাহা রোধে তব পথ?
তোমার সন্তান এত হীন হ'তে পারে?

অসম্ভব। এ যে শুধু বাহ্য আবরণ
অন্ধতা তিমির ইহা, পলকের ভ্রম,
আমিত্বের বিকৃতি এ কলুষতা মাখা;
আমি নহি, 'আমি' কিগো এতই অধম?

ক্ষুদ্র হই তুচ্ছ হই, তোমারি সন্তান
একথা যেন না ভুলি জীবনে মরণে;
ছোট প্রাণ বড় হবে গ্লানি দূরে যাবে
আমার সর্ব্বস্ব তুমি জাগিবে পরাণে।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

সাহিত্য ও তাহার বিচার।*

ছেলেবেলা থেকেই আমাদের কিছু কিছু ভাব থাকে, অতি অল্প বয়সেও আমরা ছবি দেখে সুখ পাই, মা'র কাছে থেকে আনন্দ পাই ও নানা রকমে আমাদের মধ্যে যে ভাব আছে, তাহা জানাবার চেষ্টা করি। শিশু যখন একটু বড় হয় তখন তার ভাব অনেক রকম করে নিজের পরিচয় দেবার চেষ্টা করে ও শিশু তখন ভূত পরীর দেশের রাজপুত্র খোক্কসদের সঙ্গে খেলা করতে ভাল বাসে। তার কল্পনা জগতের এই জিনিষ গুলার মধ্যে একটু নূতনত্ব খুঁজে বেড়ায়, সত্যের বাঁধ ভেঙ্গে তার হৃদয় সেইজন্য অচিন দেশের তেপান্তর মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় ও তার হৃদয় সৌন্দর্য্য তৃষ্ণায় আকৃষ্ট হইয়া নানা রকমে নানা অদ্ভুত খেয়ালের মধ্য দিয়া নিজের পিপাসা নিবৃত্ত করে। শিশুর এই যে আনন্দ তার মধ্যে সত্য উপলব্ধি করার প্রয়াস মোটে নাই, তার মধ্যে আছে তার কল্পনার অবাধস্ফুরণ ও তার হৃদয়ের উদ্দাম আবেগ।

শিশু যখন বড় হয় তখনও তার এ প্রবৃত্তি যায় না। তার কল্পনা পৃথিবীর কঠোর সত্যের সঙ্গে অনেক দিন ধরে লড়াই করে; তার ভাবগুলি পৃথিবীর জড় সত্যের কাছে অনেক বার ধাক্কা খায়, তবুও তাহার হৃদয় অনেক প্রকারে নিজের আবেগ রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়! একদিকে জড় সত্য, অন্যদিকে জ্ঞান তাহার মনের কল্পনা ও প্রাণের ইচ্ছা এ দুয়ের মধ্যে খালি ক'দিন ধরে খুব যুদ্ধ চলে কিন্তু দুইই প্রবল, সেইজন্য কেউ কাহাকেও একে বারে বিনাশ করতে সক্ষম হয় না। তখন দু'য়ের মধ্যে একটা রফা হয় ও যে কল্পনা তাহার ছেলেবেলায় সত্যের কোন ধার ধারত না, যা নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীকে লঙ্ঘন করে অক্লেশে পরীরাজ্যে পৌঁছে যেত, তা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হয়ে জড় সত্যকে আশ্রয় করে জড় বস্তুর মধ্যে দিয়ে, জড় জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে, বিজ্ঞানের নিয়ম রক্ষা করে জ্ঞাতর মধ্য দিয়ে অজ্ঞাতকে জানার চেষ্টা করে, রূপের মধ্য দিয়ে অরূপকে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টা করে ও জড়ের মধ্য দিয়ে নানা প্রকার ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। যে পরীর বিষয় ভাবতে শিশু আনন্দে আত্মহারা হ'ত তার ডানা কেটে তাকে তখন উপন্যাসের কল্প চিত্র আয়েষা রোহিণী ক'রে খাড়া করে।

এই কল্পনাই বিকাশ লাভ করে রস সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের একটা হৃদয় আছে, আমরা কেবল মাত্র নীরস কঠোর বিজ্ঞানের দ্বারা আনন্দ পাই না, আমরা জড় বস্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি; সেই জন্য এই বাস্তব জগত থেকে বেরিয়ে, জড় বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস ভুলে নিজের কল্পনাবশে কিছু আনন্দ পেতে চেষ্টা করি। নিজের জীবনগত রসকে বুঝতে প্রয়াসী হই ও আমাদের অন্তরস্থ আনন্দ ধারার চরিতার্থতার চেষ্টা করি। মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা আছে বলেই সে সাহিত্য সৃজন করে ও সাহিত্যের রসধারায় বিভোর হয়। সাহিত্যে আমরা বৈজ্ঞানিক সত্যকে খুঁজি না, স্বরূপের চিন্তা করি না,

---

* কটক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত।

ভূয়োদর্শনের যথাযথ বিন্যাস করি না, আমরা কল্পনার দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করতে চেষ্টা করি, মানব জীবনের লক্ষ্য বিচার না করে তাহার সহস্র বিভিন্ন আকার দেখতে চেষ্টা করি ও নানা প্রকার ঘটনাস্রোতের মধ্যে মানবজীবনকে দেখতে প্রয়াস পাই। এই কল্পনা ছাড়া সাহিত্য থাকতে পারে না। ইহাই সাহিত্যের প্রাণ। কিন্তু এই কল্পনা সত্যকে আশ্রয় করে চলে। মানুষ নিজে জ্ঞানের গরিমা করে, নিজের বুদ্ধির উপরে তাহার অগাধ বিশ্বাস, সেইজন্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে সে কোন জিনিষকে ভালবাসতে পারে না।

অট্টালিকা যত মনোহর হউক, তার মধ্যে যত সাজ সরঞ্জাম থাকুক, নানা রকম রং দিয়ে তাকে যত সুন্দর করবার চেষ্টা হউক তার ভিত্তি থাকবে কঠোর পাথরের উপর, তা না হলে অট্টালিকা পড়ে যাবে, তার সাজসরঞ্জামগুলি ধুলায় লুটিয়ে, নিজের সৌন্দর্য্য হারিয়ে, পরের উপহাসাস্পদ হবে। সাহিত্য ক্ষেত্রেও ঠিক এই কথা খাটে। কল্পনা যত মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস এ সকলের সিদ্ধান্ত গুলির বিপক্ষে দাঁড়ায়, তাহা এ জগতের লোকের কাছে আদরণীয় হয় না। আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সেইজন্য সাহিত্যের বিপর্য্যয় ঘটছে। গাছ পালার মধ্যে পুরাতন গ্রীকেরা বনদেবিগণের ক্রীড়া দেখত ও প্রকৃতির সর্ব্বত্র দেবদেবীগণের সত্তা কল্পনা করত, সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে জলের অজ্ঞাত ক্ষমতায় সশঙ্ক হয়ে তাহাদের পূজা করত, সে কাল আর নাই।

আজকাল খুব ঘন জঙ্গল না হলে দৈত্যের কল্পনা চলে না, নদীকূলের শ্যামল তরুরাজির ঘন সন্নিবেশের মধ্যে পুষ্পবীথির কল্পনা না করে তার মধ্যে জলদেবীকে আসন দেওয়া অসম্ভব হয়।

ক্রমে ক্রমে যতই জ্ঞান বাড়ছে, কল্পনা রাজ্য একধার থেকে সঙ্কুচিত হচ্ছে ও তার রাজ্য অন্য ধারে বিস্তৃত হইলেও আগেকার সর্ব্বব্যাপী শক্তি আর তার নাই। যুগবিপর্য্যয়ে নববিভাসিত সত্যকে আশ্রয় করে তাকে চলতে হবে ও জ্ঞান রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলেও তার নিয়ম লঙ্ঘন করে চলতে পারবে না।

সাহিত্য, আনন্দের উপর, সৌন্দর্য্য তৃষ্ণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যের ক্ষমতা অসীম, মানব জীবনের উপর তার প্রভাব খুব বেশী; আনন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই, উপভোগের বস্তু বলিয়াই তার এতখানি প্রভাব ও এতখানি মন্মোহিনী শক্তি। এই শক্তি যদি পাপমার্গে পরিচালিত হয় তাহলে সমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়, সমাজ ক্রমশঃ অবশ হয়ে পড়ে। সেই জন্য সাহিত্যের বিচার আবশ্যক হয়।

পাছে সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, সেইজন্য বিচারকেরা সাহিত্যের প্রভাবকে সমাজের হিতসাধনে, মানব জীবনের পরিপূর্ণতা সম্পাদনে নিযুক্ত করবার চেষ্টা করেন ও যে সাহিত্যের মধ্যে সমাজের অহিতকর কিছু থাকে তাকে লাঞ্ছনা করে দমন করবার চেষ্টা করেন। সেইজন্য সাহিত্যের বিচার সমাজের আবশ্যক হয়ে ওঠে ও বিচারকের আসন সমাজে পুজনীয় হয়।

কিন্তু বিচারকেরা সব সময়ে সমাজের মঙ্গলের উপর লক্ষ্য রেখে বিচারে প্রবৃত্ত হন না। বিচারকেরা অনেক সময় নিজের খেয়ালে নিজে মাপ কাঠি গড়ে নিয়ে সাহিত্যের বিচারে প্রবৃত্ত হন। সেই জন্য সাহিত্যের নানাপ্রকার বিচার আমরা দেখতে পাই ও এই সব বিচার সাহিত্যকে অনেক সময় ম্লান করে ফেলে।

একদল বিচারক আছেন তাঁরা দেশ কাল পাত্র বিচার করে সাহিত্যের আদর্শ নির্ণয় করেন, আর একদল কেবল ভাষার বিচার করেন, কেউ কেউ বা কোন পুস্তকের ভাবের সত্যাসত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন আর কোন্ কোন্ কবি কোথা থেকে কোন্ ভাব চুরী করেছে ও তার ভাবের মূল কোথায় এই সব দেখেন। কোন কোন বিচারক সাহিত্যিকদের মধ্যে কবির স্থান কোথায় তাই নির্দ্দেশ করতে প্রবৃত্ত হন ও অপর একদল পরবর্ত্তী সাহিত্যিকদের উপরে কবির প্রভাব কতটা বিস্তৃত তা ছাড়া আর কিছু দেখেন না। এই রকম নানা প্রকারের মাপকাঠি আছে ও বিচারকেরা সাহিত্যকে নানা রকমে বিচার কর্ত্তে প্রবৃত্ত হন। যাঁরা দেশ কাল পাত্র অনুসারে বিচার করেন তাঁরা ভাবের চির সৌন্দর্য্য ভাষার সুঠাম লালিত্য প্রভৃতি আনন্দের উপাদান বিস্মৃত হয়ে সমাজের অভাব ও ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্যকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্যের বিচারে প্রবৃত্ত হন ও তাহাদের উদ্দেশ্য ভাল হলেও এবং এই রকম বিচারে সাহিত্যের উন্নতি সাধন হলেও এ রকম বিচারকে শেষ বিচার বলে কখনও গ্রহণ করা যেতে পারে না। যখন এদেশে সাহিত্য ছিল না তখন টেকচাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" ও "আপনার মুখ আপনি দেখ" প্রভৃতি খুব আদরণীয় হয়েছিল ও তারা সমাজের উন্নতিকল্পে ও সমাজের দোষ নিরাকরণের জন্য যে সাহায্য করেছিল তা নিতান্ত অল্প নয়। কিন্তু আজকাল তারা বিস্মৃতির গর্ভে লীন ও বঙ্গ সাহিত্যের এই উন্নতির দিনে কেউ আর তাদের আদর করে না।

আজকে যেটা ভাল সেটা যে চিরকালই ভাল থাকবে, আজকে যেটা আমার প্রয়োজন সেটা যে আমি কখনও লাভ করতে পারব না, আজকে সমাজে যে সব কুরীতিগুলি বর্ত্তমান সে গুলো যে অনন্তকাল সমাজের বক্ষে তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকবে সে কথা আমরা বলতে পারি না। সেই জন্য সাহিত্যের যে বিভাগের অভাব ছিল সমাজের যাহা প্রয়োজন, তাহা পূরণ কর্ত্তে যে মহাত্মা অগ্রসর হয়েছেন তাঁকে আমরা পূজা ভক্তি শ্রদ্ধা করতে পারি সাহিত্যের ও সমাজের হিতকারী বলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকতে পারি কিন্তু তাঁর রচিত পুস্তককে কেবল সেইজন্য সাহিত্যের উচ্চ আসনে বসাতে অক্ষম, সেইজন্যে এ প্রকার বিচার সাহিত্য ক্ষেত্রে চলে না। সৌন্দর্য সৃষ্টি যার উদ্দেশ্য, অনন্ত আনন্দ দান যার লক্ষ্য, বিশ্ব মানবের হৃদয়ের স্পন্দন অভিব্যক্ত করা যার আদর্শ, তার সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণ বিচার করা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য।

যাঁরা সাহিত্যে কেবল ভাষার বিচার করেন ও ভাবের সত্যাসত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাঁদের বিচারও শেষ বিচার বলা যেতে পারে না। আমরা সাহিত্য পাঠে যে আনন্দ পাই তা কি কেবল ভাষার লালিত্য, রচনার সৌষ্ঠব অথবা ভাবের সত্যাসত্যের উপর নির্ভর করে? চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ভাষা কঠিন, বাউলদের ভাষা অবোধ্য; তাই বলে কি তা

থেকে আমরা আনন্দ পাই না? যাহা কল্পনার বস্তু যাহা হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে নিজের প্রভাব বিস্তার করে তার বিচার কেবল বাইরের সৌষ্ঠব থেকে হয় না। এই বাইরের সৌষ্ঠবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই (Augustan) অগষ্টান যুগের সাহিত্যিকেরা নিজের কবিতাকে প্রাণহীন করে ফেলেছিল। ও এই ভাবের সত্যাসত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল বলেই (Cowley) কাউলির কবিতাগুলি আজকাল অপাঠ্য। সত্যাসত্য বিজ্ঞানের জিনিষ, আনন্দের বা কল্পনার জিনিষ নয় সেইজন্য সাহিত্যকে এদিক থেকে বিচার করা চলে না। অবশ্য কবির ভাব থাকা চাই ও সেই ভাব প্রাণস্পর্শী ভাষায় নিজের আবেগ ব্যক্ত করে পাঠকের চিত্তবৃত্তিকে আন্দোলিত কর্ত্তে সক্ষম হওয়া চাই। কিন্তু তাই বলে ভাবটা সত্য কি অসত্য ও ভাষা কোমল কি কঠিন কেবল সেইটুকু লক্ষ্য রেখে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা। তা না হলে বিচারকের এক কথায় ছেলেদের পরীরাজ্য ভূমিসাৎ হয়ে যাবে ও রবিবাবুর "গীতাঞ্জলি" অপাঠ্য হয়ে উঠবে।

কেউ কেউ সাহিত্যের মধ্যে চুরী ধরতে বড় মজবুত। আর এই চুরী ধরাও বড় বিশেষ শক্ত কাজ নয়। কিছুদিন আগে বাংলার কোন্ কোন্ কবি ইংরাজী সাহিত্যের কি কি চুরি করেছেন সেই নিয়ে মহা আন্দোলন হয়ে ছিল ও Keats, Shellyর কবিতার ছড়াছড়ি বাংলার প্রত্যেক মাসিক পত্রিকায় দেখা যেত। যখন যখন শোকহীন হৃদিহীন সুখস্বর্গ ভূমি ছেড়ে ধূলিমাখা অশ্রুময়ী ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলির প্রতি ধাবিত হ'ল দুঃখাতুরা মাতৃভূমি মর্ত্ত্যভূমিকে নিজের নন্দন বনে পরিণত করতে ছুটল, তখন বিচারকেরা তার মহান্ ভাবের প্রতি লক্ষ্য না রেখে প্রাণস্পর্শী গম্ভীর মানবিকতার প্রভাবে অভিভূত না হয়ে রায় দিলেন এটা (Browning) ব্রাউনিং থেকে চুরি; আর ব্রাউনিং তার ভাবটা "হেগেল" থেকে নিয়েছেন ও এই ভাব Goldsmith এর Vision of Asemতে বর্ত্তমান। কিন্তু এরকম সমালোচনার দোষ হচ্ছে এই যে, ইহাতে বিচারক সাহিত্যকে উপভোগের বস্তু বলে মনে করেন না, কল্পনার সৌন্দর্য্যের আনন্দ পান না, কলাবিদ্যার সৌষ্ঠবে মুগ্ধ হন না। তিনি চান নিজের জ্ঞান দেখাতে ও লোকদিগকে নিজের জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে তাদের কাছ থেকে বাহবা আদায় কর্ত্তে। তার হৃদয়ে সাহিত্য উপভোগ করবার ক্ষমতা নাই, সরস সুন্দর বস্তু তাতে প্রতিফলিত হয় না, কল্পনার আনন্দ তাতে পৌছে না, সেইজন্য বিশ্বমানবের কাছে তার বিচারের কোন মূল্য নাই। পৃথিবীর কাছে সাহিত্য রসিক বলে তার গর্ব্ব করা অসম্ভব।

সাহিত্য ভোগের জিনিষ; আনন্দ থেকে তার জন্ম, আবেগ তার প্রাণ, ও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিতে তার পরিণতি! এ হেন সাহিত্যকে বিচার করা অরসিকের কর্ম্ম নয়, কোন বাঁধা মাপকাঠির দ্বারা তার বিচার চলে না, তার সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যেতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার ভাবে তার স্ফূরণ, সেইজন্যে আর সম্বন্ধে কোন বিশেষ নিয়ম জারি করা মোটেই সম্ভব নয়।

সহিত শব্দ থেকে সাহিত্যের উৎপত্তি। প্রাণের সহিত, বিশ্ব মানবের সহিত, গাছ পাথর লতা পাতা বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের সহিত যার প্রাণের যোগ আছে, প্রাণের সহিত ও জগন্নিয়ন্তার সহিত যার সংস্পর্শ আছে, তাহাই সাহিত্য। সেই জন্য সাহিত্যের মধ্যে

বিশ্ব মানবের পরিচয় পাওয়া চাই, কোনও সমাজ কোনও ব্যক্তি কোনও ক্ষুদ্র দেশের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে তাকে বিশ্ব মানবের বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত ভাবরাশি পরিস্ফুট ভাবে প্রতিফলিত করতে হবে, তা না হ'লে তার নিজের উদ্দেশ্য সে কখনও সাধন করতে পারবে না। এই যে অনন্ত সুন্দরের বিকাশ সাহিত্যের মধ্যে তার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, সাহিত্যকে বিচার কোর্ত্তে গেলে এই জিনিষটার উপরেই প্রথম লক্ষ্য দিতে হবে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাহিত্যিক নিজে বিশ্ব জগতকে বুঝতে না পেরে তার ছোট ছোট খণ্ডগুলি নিয়ে খেলা করে ততক্ষণ তার লেখা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হয়ে উঠে না ও তা পড়ে মানুষের আশা মেটে না। মোট কথা এই যে, সাহিত্যিক নিজের যে আবেগ পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করচে, যে ভাবের অভিব্যক্তি দ্বারা নিজে আনন্দ পেয়ে পরকে আনন্দিত করতে চেষ্টা করছে, তাকে বিচার কোর্ত্তে হবে সেই ভাবের উপর দিয়ে ও তাকে বুঝতে হবে সেই অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে। সেইজন্য যতক্ষণ কবি নিজে ক্ষুদ্র থেকে সঙ্কীর্ণ ভাবের মধ্য দিয়ে নিজের অসম্পূর্ণতাকে জগতের সামনে ধরে, ততক্ষণ দেশ কাল পাত্র ইত্যাদি বিচারে উচ্চ স্থান পেলেও বিশ্ব মানবের কাছে তার স্থান উচ্চ নয়, ও সময়ের গতি তাকে কখনও অনন্তকাল বাঁচিয়ে রাখবে না। সাহিত্য যখন পর্য্যন্ত নিজেকে এই সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে তখন পর্য্যন্ত সে কবি হয় না কিন্তু যখনই অনন্ত আবেগের উদ্দাম উচ্ছ্বাসে নিজের ভাবগুলিকে সর্ব্বব্যাপী সনাতন করে তোলে তখনই তাহার কবি হওয়া সার্থক। সেইজন্যই Shellyর মতে কবি ভবিষ্যত বক্তা ও বিশ্বজগতের পুরোহিত।

ভাবের বিচার করতে গেলে তাহার সার্ব্বজনীনতার উপরেই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কিন্তু সাহিত্যের ভাবকে আরও দুই এক প্রকারে বিচার করা হয়ে থাকে, সাহিত্য মানুষের কাছে মানবজীবনের অথবা প্রকৃতি জগতের একটি নিখুঁত চিত্র ধরে। সেই জন্যে কেউ কেউ এই চিত্রকে আসলের সঙ্গে মিলিয়ে, কল্পনার বিচার করতে চায়। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে বস্তু সত্য নয়, সত্য হচ্ছে ভাব। সেইজন্যে কেবল আসলের সঙ্গে তুলনা করে বিচার করা চলে না। কিন্তু কবির ভাব জীবনকে বা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে কতটা সত্যভাবে বুঝেছে ও তাহার ভাবের মধ্যে এই সত্য কতখানি পরিস্ফুট, তার বিচার সাহিত্যে চলে। কারণ সাহিত্যিক যদি কোন এক বিশেষ সময়ের উত্তেজনায় পৃথিবীকে ভাল করে না জেনে, পৃথিবীর সমগ্র ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম না করে, জীবনের প্রহেলিকার বিষয় না ভেবে সত্যজ্ঞান উপলব্ধি না করে, নিজের খেয়ালকে আবেগের ও উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সত্য বলে প্রকাশিত করে, তবে সে সাহিত্য মানব সমাজের চির আনন্দকর হ'তে পারে না। কোনটা একেবারে সত্য আমরা জানি না, জীবনের সমস্যার আজ পর্য্যন্ত কেউ যথাযথ ভাবে নিঃসন্দেহ ভাবে সমাধান করতে পারে নি, সেই জন্য কোনটা চিরসত্য কোনটা মিথ্যা সেটা না জানলেও জীবনের কোন ভাবটা আমাদের কাছে প্রীতিকর, শোক তাপ ক্লিষ্ট মানব জীবনের কোন্ ভাবটা সুখকর, কোন ভাব হৃদয় মনের বিকাশকর, সে বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকের কিছু কিছু জ্ঞান আছে ও সেই জ্ঞান আছে বলেই আমরা সাহিত্যের মধ্যে আনন্দ

...জি ও সাহিত্য পড়ে শোক তাপ কষ্ট ভুলে সান্ত্বনা পেতে চাই, নিজের মনের প্রসার লাভ করতে চাই। যে কবি এই সান্ত্বনা দিতে পারে না, মনকে প্রসারিত করে তুলতে পারে না তাঁর লেখা কখনই উচ্চ নয় ও বিচারে তাকে আমরা উচ্চ আসন দিতে পারি না। অর্থাৎ সাহিত্যে সুন্দরটাই সত্য; সুন্দরের বাইরে যা কিছু, আনন্দের বাইরে যার সত্তা, সাহিত্যে তার স্থান নাই।

সাহিত্যের ভাবের মধ্যে আমরা আরও চাই ধর্ম্ম, কিন্তু সাহিত্যের যে ধর্ম্ম সেটা সমাজের বাঁধন নয়, সেটা হৃদয়ের ধর্ম্ম। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিচার সামাজিক নিয়মের মধ্যদিয়া চলে না। হৃদয়ের যাহা ধর্ম্ম প্রাণের যাহা আবেগ তারি অভিব্যক্তি সাহিত্যে থাকে; সেই জন্যই সাহিত্যিক প্রেমের কাছে, ভক্তির কাছে, স্বদেশ প্রেমের কাছে, করুণার কাছে সমাজকে বলিদান দেয় ও সমাজের বাঁধন গুলি একে একে ছিন্ন করতে দ্বিধা মাত্র করে না। অবশ্য যে সাহিত্যিক মোহকে বড় আসন দেন, আমার ক্ষণিক আবেগকে বড় করে তোলেন, তাকে কখনও সমাজে উচ্চ আসন দেওয়া যেতে পারে না; কিন্তু ব্রাউনিংএর youth and artএর মত যাহারা সমাজ বন্ধনকে লঙ্ঘন করে, হৃদয়ের আবেগকে উঁচু করে তোলে, তারাই বাস্তবিক উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক। তাঁদের চিত্রগুলি সময়ের অপ্রতিহত প্রভাবকে পরাস্ত করে, অনন্তকাল মানব জীবনের, মানব হৃদয়ের আশা আবেগ আনন্দ বহন করে ধন্য হয়। সেইজন্য সাহিত্যের বিচার করতে গেলে conventional moralityর বিচার করা চলে না ও এই খানেই সাহিত্যিক নূতন moral standard সৃজন করিয়া সমাজের উপরে নিজের আসন স্থাপন করেন কলা বিদ্যার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যান করেন।

কিন্তু সাহিত্যের বিচারে ভাষার বিচারও চাই। সাহিত্যিক যে ছবি আঁকেন তাহা জগৎকে পাঠকের হৃদয়ে। সঙ্গে আনন্দের মধ্য দিয়ে পরিচিত করতে চেষ্টা করে, সেই জন্য বাস্তব জগতে যা সত্য, বিজ্ঞান যার নাগাল পায়, সেই জড় বস্তু সাহিত্যের অঙ্গীভূত নয়। সেই জন্য সাহিত্যের ভাষা ভাবের ভাষা, কল্পনার অভিব্যক্তি ও সেই জন্য সাহিত্যিক নানা কল্পনাবলে সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়ে বস্তুর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়। সমুদ্র কত গভীর, তার তরঙ্গ কত ফীট উঁচু, তার বিস্তৃতি কতখানি, সাহিত্যে এসব নীরস সত্য থাকে না, সেইজন্য সাহিত্যিক সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে যে বিরাট মূর্ত্তির কল্পনা করেন, তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে যে তাণ্ডব নৃত্যের আভাস পান, নীল সাগর জলের শুভ্র ফেনখণ্ড গুলির মধ্যে যে অপ্সরী দেখেন, তার বর্ণনা সাহিত্যের মধ্যে দিতে চেষ্টা করেন। সেইজন্যই সাহিত্যের ভাষা কল্পনায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিজ্ঞানের ভাষার চেয়ে ভিন্ন আকার ধারণ করে। সমুদ্র দেখে তার হৃদয়ে যে ভাব জাত হয়েছে, সেই ভাবকে অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করাতেই সাহিত্যের সার্থকতা ও সেই ভাবকে অন্যের কাছে উপস্থিত করে তাকে সমুদ্রের সেই বিরাটরূপ দেখানই সাহিত্যিকের কার্য্য। এইটুকু করতে গেলে সাহিত্যিককে কল্পনার আশ্রয় নিতে হবে ও নিজের ভাবকে কল্পনার দ্বারা বড় করে সাহিত্যের ভাষায় ব্যক্ত করতে হবে, সেইজন্য ভাষার বিচারে কল্পনার বিচার প্রয়োজন। যে সাহিত্যিকের ভাষা নিজের ভাবকে অন্যের কাছে যতখানি পরিস্ফুট করে তোলে নিজের আবেগকে অন্যের আবেগের উপাদান করতে পারে তার ভাষাই সাহিত্যে ততখানি উচ্চ আসন পাবার যোগ্য।

সেইজন্য অনেকে সাহিত্যকে বিচার কর্ত্তে কলম ধরলেন। সাহিত্যের প্রথম মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াল সত্য। এই মাপকাঠি দিয়ে বিচার আরম্ভ হওয়ার পর কল্পনার আর সে অবাধ গতি নাই, সেই জন্য কোন জিনিস দেখলেই মানুষ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করে এটা ঠিক কি না, অর্থাৎ মানুষের সাধারণ জীবনের সঙ্গে তার দৈনন্দিন কার্য্য কলাপের সঙ্গে এর কতখানি সম্বন্ধ আছে? এরূপ বিচার করা শক্ত নয়, কারণ জড় বস্তু ও জড় সত্য এদুটো প্রত্যেকেরই ভাল রকম জানা আছে ও এ দুটো নিয়ে বিচার আমরা জীবনে প্রায় সদা সর্ব্বদাই করে থাকি। সেইজন্য বিচারকের দল ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগল ও সত্যের দোহাই দিয়ে তারা কল্পনাকে একেবারে কেটে ছেঁটে খাটো করে সাধারণ জীবনের নিত্য ঘটনার মধ্যে আবদ্ধ কোর্ত্তে চেষ্টা করল।

কিন্তু কল্পনা ত সত্য নয়। সত্যকে আশ্রয় করে দাঁড়ালেও সেটা একটা আলাদা পদার্থ। সেইজন্য সত্যের মাপকাঠি নিয়ে কল্পনাকে বিচার করা চলে না। মানুষ চায় কল্পনা, সে চায় জড় পদার্থকে ছাড়িয়ে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করতে, সেইজন্য নিছক সত্য কথা সে চায় না ও তাহাতে তাহার প্রাণের আনন্দ হয় না। সেইজন্য বিচারকদের এই মাপকাঠি এখন ভেঙ্গে গেছে; সত্যর দোহাই দিয়ে কল্পনাকে আবদ্ধ করার প্রয়াস তাদের ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু সাহিত্য যদি কল্পনারই জিনিস হয় ও কল্পনাতেই যদি আমরা আনন্দ পাই তাহলে সাহিত্য উপভোগের জিনিস, বিচারের জিনিস নয়। আমরা সাহিত্য পড়ি, আনন্দ পেতে অন্যের কল্পনাকে আশ্রয় করে, অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করে, অভূত পূর্ব্ব সুখ পেতে জীবনের কঠোর সত্যগুলি ভুলে গিয়ে, মানব জীবনের লক্ষ্য ও গতির চিন্তা না করে, কেবল জীবনের বিকাশ দেখে ও প্রকৃতির সঙ্গে কল্পনা বলে নিজের ভাবের আদান প্রদান করে বিমল আনন্দ উপভোগ করতে। তাহলে সাহিত্যে মোটের উপর বিচারের বাইরে, সত্যাসত্যের বাইরে জড় বিজ্ঞানের বাইরে সাহিত্য ভাষার বিচারও চাই, এইজন্য যে কবি যে রস সৃজন করিতে চাহিতেছেন তাহার প্রকাশ হয় ভাষায়! যে রস মূর্ত্তি হইতে চাহিতেছে তাহার প্রকাশ কিরূপ সহজ হইয়াছে তাহাই ভাষা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি।

সাহিত্য কল্পনার উপর অধিষ্ঠিত বলিয়াই তার বিচার করা অত শক্ত ও আবেগের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়াই কোনও আইন কানুন তার বেলায় খাটে না। আমরা বিচার করতে বসি আমাদের শিক্ষার গুণে ও আমরা আইন কানুন বাঁধি হৃদয়ের প্রবৃত্তি গুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে। আমরা প্রকৃতির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করি না, মানবের হৃদয়কে বুঝাবার আকাঙ্ক্ষা রাখি না, বিশ্বজগতের অংশ বলে, জগন্নিয়ন্তার সৃষ্টি বলে, নিজের পরিচয় দিতে পারি না; সেই জন্য ভাবরাজ্যের যা কিছু উঁচু, আনন্দের মধ্য দিয়ে, সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়ে, তাকে গ্রহণ করতে আমরা পারি না, সেই জন্য সাহিত্যকে বেঁধে, তাকে নিয়ম কানুনের অধীন করে, ছোট করে, আমরা দেখতে চাই ও তার মধ্যে যা কিছু মহান যা কিছু অনন্ত তার পরিচয় আমরা পাই না। সাহিত্যকে বিচার কোর্ত্তে হবে হৃদয়ের মধ্য দিয়ে, ভাবের মধ্যদিয়ে ও বিশ্বমানবিকতার মধ্য দিয়ে; সাহিত্যের অন্যপ্রকার বিচার অসম্ভব ও যাহা উপভোগের বস্তু, আনন্দের আধার, সৌন্দর্য্যের আকর, তাকে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে আইন

কানুনের কঠোর নিয়মের ভিতর দিয়ে বিচার করতে গেলে পদে পদে ঠকতে হবে ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

জীবন।

আমাদের এই দুঃখ-দারিদ্র্য নিপীড়িত দেশে "জীবন" বল্‌তেই খুব একটা মনোরম ছবি চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে না, এটা ঠিক। তবু আজ আমার এই জীবন সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বল্‌বার ভারি ইচ্ছে হয়েছে।

আমরা সকলেই একটু মনোযোগ করে ইতিহাসের পাতা ওল্‌টালে, কিংবা সেকালের সাহিত্যের দিকে নজর দিলে বুঝ্‌তে পারি যে, ভারতবর্ষের জীবন ধারার মধ্যে এমন একটা বিশিষ্টতা ছিল এবং এখনও আছে, যা পাশ্চাত্য জীবনে মোটে নেই। আমাদের এই প্রাচ্য জীবন-ধারা খুব শান্তভাবে বয়ে গেছে, অতি ধীরে, অতি গম্ভীর তানে গান গেয়ে চলেছে কিন্তু তার মধ্যে কোথাও তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত নেই, উদ্দাম উচ্ছ্বাসে বাঁকা পথে ছোটা নেই, জোয়ারের ফেনার সৃষ্টি নেই। তাই দেখতে পাই, যখন আবর্জ্জনা এসে এই জীবন পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে, তখন সে স্তূপ অটল হয়েই গেছে, তাকে স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দেবার শক্তি এ জীবন-নদীর জলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেনি। তাই বুঝি ভারতের জীবন-ধারা নদী হয়ে বয়ে না গিয়ে ক্রমশঃ নানা আবর্জ্জনার বাঁধে বাঁধা পড়ে এখন যেন শেওলা পানা ঢাকা পুকুর হয়ে পড়েছে। বিশ্ব-সাগরের দিকে প্রাণনদী ছোটেনি বলেই বোধ হয় এই দুর্দ্দশা। আমরা চির দিনই নিজেদের নিয়ে গণ্ডী কেটে ঘরের কোণে বসে থাক্‌তে ভালবাসি বলেই জীবনের চঞ্চলতা আমাদের প্রাণে কোন মোহ জাগায়নি। সবই মিথ্যা সবই মায়া বলে আমাদের জীবন যেন জন্মাবধি মরণের দিকেই মুখ করে বসে আছে।

এক একবার দেখ্‌তে পাই, বিশ্বমায়ের এই শান্ত শিশু ভারতবর্ষ যেন দুর্দ্দান্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। কারণ খুঁজলেই দেখি, সেথা বিদেশ ও বিদেশীর সংস্পর্শে এসে হয়েছে। মোগলদের সময়কার শিখ ও মহারাষ্ট্র জাতির উত্থানের কথা, এই অশান্তির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠ্‌বার চেষ্টার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এখন যে আমরা কিছু কিছু অধীর হয়ে পড়েছি, সুবোধ বালকের জীবন যে অনেকের কাছেই আর বাঞ্ছনীয় নয় বলে মনে হচ্ছে, এ ভাব ও আমাদের মধ্যে বিদেশ থেকে এসেছে। বিদেশের ঝড়ো হাওয়া আমাদের ঘুমের চাদর খানা উড়িয়ে ফেলে দিচ্ছে। আমি তাই বিদেশের এনে দেওয়া এই অশান্তির উপর রাগ না করে মনে মনে তাকে প্রণাম করি। অশান্তির ভিতর দিয়েই জীবনের অনুভূতি বিকশিত হয়ে উঠবে, নির্জ্জীব শান্তির মধ্যে নয়।

জীবনের অনুভূতি আমাদের মধ্যে নেই বললেও হয়। বেঁচে থাকার যে আনন্দ, আমরা ক'জন তা অনুভব করি? এখানে Browningএর একটা কবিতা না তুলে পারলাম না :—

Oh, our manhood's prime vigour!
no spirit feels waste,
Not a muscle is stopped in its playing,
nor sinew unbraced.
Oh, the wild joys of living! the
leaping from rock to rock—
The strong rending of boughs from
the fir tree;—the cool silver shock
Of the plunge in a pool's living water,
—the hunt of the bear,
And the sultriness showing the lion is
couched in his lair.
And the meal—the rich dates yellowed over
with gold-dust divine,
And the locust's-flesh steeped in the pitcher,
the full draught of wine,
And the sleep in the dried river-channel
where bulrushes tell
That the water was wont to go warbling
so softly and well
How good is man's life, the mere living!
how fit to employ
All the heart and the soul and the senses,
for ever in joy!

আমাদের অধ্যাত্মবাদীরা হয়ত বলবেন যে the mere livingএর মধ্যে যে এত আনন্দ এটা পাশ্চাত্য জগতের জড় বাদীদেরই সাজে। কিন্তু এই কবিতা পড়তে পড়তে তার প্রতি ছত্রে যে অপরূপ জীবনের ছবি ফুটে ওঠে, তা কি আমাদের রক্তকে আনন্দে চঞ্চল করে তোলে না? জীবনের অতি সামান্য অনুষ্ঠান গুলি—ওঠা, বসা, ছোটা, শোওয়া, খাওয়া,—সবই যেন আনন্দে আর বাঁচবার জন্য ব্যগ্রতায় পরিপূর্ণ। এমন করে কেন আমরা অনুভব করব না? আমরা কেন অন্ধকারে চোখ বুঁজে পেঁচার দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করব?

কথাবার্ত্তা গল্প গুজবের মধ্যেও আমাদের প্রাণহীনতা যেন পদে পদে ধরা পড়ে। বাজে গল্প ত বাজেই কিন্তু আমাদের গুরু গম্ভীর সার ও কাজের কথার মধ্যেও যে সবটা অনেক

সময় বাজে হয়ে পড়ে না, তা জোর করে বলতে পারি না। কেবল সার করতে গিয়ে, অসারকে বাদ দিতে গিয়ে, প্রাণের খেলা বন্ধ করে সবটাই দুর্ব্বোধ্য দুষ্পাচ্য করে তুলি। একবার একটা পাড়াগাঁর মতন জায়গায়ও সেখানকার কয়েকজন ইউরোপীয় বাসিন্দা নানারকম আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা রেখেছিলেন বলে একজন বিজ্ঞ দার্শনিক মাথা নেড়ে বললেন—বেটাদের আমোদ ছাড়া কিছু নেই। যেখানে ওদের অন্ততঃ দুটোও একত্র হবে, সেখানেই যত বাজে আড্ডার ব্যবস্থা করে ছাড়বে—তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে তাদের প্রাণ জিনিষটা প্রচুর পরিমাণে আছে বলেই সেটার বাজে খরচ তারা করতে পারে, আমাদের মত নাকেমুখে ছিপি এঁটে থাকতে হয় না।

জাতিগত জীবনে এই প্রাণহীনতা কতখানি অনিষ্টকর, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা নিজেরাই। তাই যে দিকে তাকাই, দেখি নিরাশায় নিষ্প্রভ মুখ, আর শুনি কেবল কান্না। এই কাঁদুনি গান আমাদের একেবারে মেরে রেখেছে। সাহিত্যে ও চিত্রকলায় ও অনেক সময় আমাদের এই কান্নার রূপ ধরা পড়ে। কান্না জিনিষটা মিথ্যা নয়, কিন্তু কেবলই কান্না মানুষকে বিশেষতঃ আমাদের মত দুঃখভারে অবনত জাতিকে—বড় অবসাদগ্রস্ত করে তোলে, আমাদের দুঃখ-ব্যথা, আমাদের পতিত অবস্থার কাহিনী, এসব কেঁদে গাইলে চলবে না ত, এ সব আগুনের অক্ষরে বুকে দেগে দিতে হবে, অশান্তির ছন্দে গেঁথে সে কাহিনী শুনিয়ে সবাইকে অশান্ত করে তুলতে হবে, কর্ম্মের তালে জীবনের গান বেঁধে নিয়ে চলতে হবে—রুদ্ধ কান্নায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকলে চলবে না।

দুঃখকে অনেকে অস্বীকার করেন দেখেছি। সেটার মানে আমি ঠিক্ বুঝে উঠতে পারি না। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে যে দুঃখের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, এ ত মিথ্যা হতে পারে না, মন গড়া হতে পারে না। থাক্ না দুঃখ সেটা নেই বললেই কি চুকে গেল? দুঃখকে অস্বীকার করবার কোন কারণ ত দেখতে পাই না। দুঃখের মধ্যে দিয়ে সত্যকে লাভ করা দুঃখকে এড়িয়ে নয়। দুঃখ সাগরের বুক ছেঁচে তবে ত আনন্দ মাণিক পাওয়া গেছে। কেন তবে দুঃখকে ভুলব? কেন তাকে অস্বীকার করব? সে যে আমার বড় আপন, সে যে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা, সে যে আমার রক্তের প্রতি বিন্দুতে মিশিয়ে গেছে। যে যাই বলুব আমি বলব যে, আমার কান্না, আমার হাহাকার, আমার বেদনা, এ সব সত্য,—ভগবান যেমন সত্য। এগুলো মায়া নয়, মোহ নয়। কান্নার মধ্যেই যে হাসির ইন্দ্রধনুর রূপ ফুটবে ভাল। কিন্তু এই কান্নার মধ্যেও আমি চাই অশান্তি, আমি চাই ঝড়, আমি চাই হাহাকারে ঘরের কোণ ছেড়ে বিশ্বের মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে পড়া। আমাদের শরীরে প্রতি অণুতে অণুতে যে জীবনের চঞ্চলতা আছে, সেটা নিজে অনুভব করা, আর অন্যকে বুঝিয়ে দেওয়া, এই যেন পারি।

দুঃখকে অস্বীকার করা যায় না, তা বুঝলাম, কিন্তু দুঃখ-জয়ী হতে পারা যায় কেমন করে যুগে যুগে মহাত্মারা দুঃখ নির্ব্বাণের পথ খুঁজেছেন। কিন্তু এক জনের কাছে যা ঠিক মনে হয়েছে, তা হয়ত সবাই মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই এর পথ বলে দেওয়া স চেয়ে শক্ত।

তবে মনে হয় যে দুঃখের মধ্য দিয়ে গিয়েই সবাই দুঃখ জয়ী হতে পেরেছেন। জীবনের গতির দিক্ দিয়ে দেখ্‌লে বোধ হয় যে, নিভৃত গুহার নির্জ্জনে যোগাসনে বসে দুঃখ নির্ব্বাণের সাধনা না করে জীবনের সব শোকতাপের ভিতর দিয়ে, সব বাধা-বিঘ্ন প্রলোভনের মধ্যখান দিয়ে চলে যে দুঃখ জয়ের আনন্দ, সেইটাই অতি উপভোগ্য। সকলের মতে তা না হ'তে পারে। কিন্তু আমি যখন দেখি যে একজন নিজের স্বার্থপরতার প্রাচীরে ঘিরে নিজেকে বাঁচিয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে ব্যগ্র, আবার অন্য দিকে দেখি যে একজন নিজের মোক্ষলাভ ভুলে দশ জনের সঙ্গে কর্ম্মজগতে ছুটে চলেছে, শতবার উঠা পড়ায় তার দেহমন ক্ষতবিক্ষত, সংসারের অনেক ধূলা তার গায়ে মাখান, তবু সে তার কল্যাণ হাত দুটি বাড়িয়ে রেখেছে তার আরও সব ধূলা-কাদা মাখা ভাই বোন গুলিকে বুকে টেনে নেবার জন্য, তখন ঐ নির্ব্বিকার যোগীকে ছেড়ে, এই শত শ্রান্তিপূর্ণ মহৎপ্রাণ কর্ম্মীর ধূলা মাখা পায়েই আমার মাথা লুটিয়ে পড়তে চায়, কেন না তাঁর পায়ের ধূলা প্রমাণ দেয় যে তিনি তাঁর মাটির পৃথিবীর ভাই বোনদের সঙ্গে সমানে পথ হেঁটেছেন, অলসের মত লুকিয়ে একা নিজের উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করতে ব্যস্ত হন নি, তাঁর ব্যথা ক্ষত দেহটি প্রমাণ দেয় যে তিনি ছুটতে গিয়ে অনেক বার পড়েছেন, আর পড়েছেন বলেই আবার উঠে অনেক পতিতকে সঙ্গে তুলে নিতে পেরেছেন, বীরমন্ত্রে দীক্ষা তাঁর সার্থক হয়েছে।

যে নিজে যেটা অনুভব না করে, সে যেমন অন্যকে সে বিষয় বোঝাতে পারে না, তেমনই যার নিজের জীবন জীবন্ত নয়, সেও অন্যকে জাগিয়ে তুলতে পারে না। আমরা কত বক্তৃতা করি, কত লোকের সঙ্গে মিশি, কিন্তু কৈ, ক'জনের প্রাণে আগুন জ্বাল্‌তে পারি? আমার জীবন প্রদীপের শিখাটিতে আলো না জ্বাল্‌লে সেখান থেকে অন্যে তার প্রদীপ-শিখাটিতে আলো জ্বালাবে কেমন করে? আমাদের মধ্যে চাই প্রাণ-স্পন্দন। যে কাছে আসবে, সে যেন জীবন্ত আত্মার সংস্পর্শে এসে একেবারে জাগ্রত জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যেক কথায় প্রত্যেক কাজে চাই প্রাণ। এই প্রাণ স্পন্দনে যখন আমাদের জীবন স্পন্দিত হয়ে উঠবে, তখনই আমরা দুঃখজয়ী বীর হতে পারব। তখনই আমাদের জীবন জীবন্ত আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠবে। রুদ্রের আঘাত যতই প্রবল হোক্, তখন আমরা দুঃখকে অস্বীকার না করেও বলতে পারব—

দুঃখখানি দিলে মোর তপ্তভালে থুয়ে,
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে।

শ্রীসুনীতিদেবী।
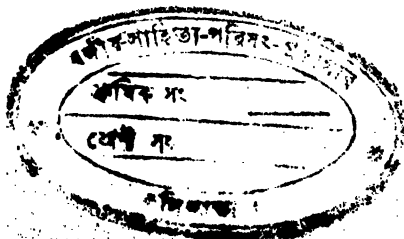
বনপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতের তপোবন।

সুবিশাল কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের এক প্রান্ত দেশ দিয়া ক্ষুদ্রা সরস্বতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। শুভ্র সৈকতে শরীর ঢাকিয়া ধীরে ধীরে নীরবে, যেন সলজ্জভাবে চলিয়া যাইতেছে। সমীরণ কত চেষ্টা করিতেছে, তথাপি দরিদ্রের হৃদয়ে উচ্চ আশার ন্যায়, তাহার বক্ষে তরঙ্গ তুলিতে পারিতেছে না। নদী তীরেই কাম্যক তপোবন, বন ও উপবনের সুন্দর সম্মিলন। তথায় কত বন্য বৃক্ষের সহিত একত্রে কত পুষ্পবৃক্ষ, কত ফলবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। গাছে গাছে কত ফল ধরিয়া রহিয়াছে, কত ফুল ফুটিয়া আছে। কুসুমগন্ধে তপোবন আমোদিত হইতেছে। পুষ্প পল্লব ভারে অবনত কত লতা বৃক্ষের গলায় মালাকারে ঝুলিতেছে, আর বায়ু ভরে দুলিতেছে। বসন্তের সহিত প্রকৃতির পরিণয়ে পাদপ সকল উত্তম বেশ ভূষা করিয়া যেন বিবাহের বরযাত্রী সাজিয়াছে। কোথাও আবার প্রকৃতি সুন্দরী পুষ্প পল্লব শোভিত, লতাগুল্ম জড়িত মনোহর নিকুঞ্জ করিয়া তাহার মধ্যে বসন্তকে লইয়া বসিয়া হাসিতেছে। তাহা দেখিয়া বিহগকুল আনন্দে বিভোর হইয়া উড়িতেছে, বসিতেছে আর হুলুধ্বনি দিতেছে। ঘুঘু, কোকিল, পাপিয়া প্রভৃতি এ উৎসবে যোগদান করিয়াছে। পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ক্রমোচ্চ স্বরে এই শুভসংবাদ সুদূরে বহন করিতেছে। মধুপকুল আকুল হইয়া গুণ গুণ স্বরে বিবাহ গীত গাইতেছে। ময়ূর ময়ূরীগণ আনন্দে নৃত্য করিয়া ফিরিতেছে। কোথাও আনন্দোৎফুল্ল মুনিকন্যাগণের হাত হইতে খাদ্য খাইতেছে। মৃগসকল নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। কোথাও মুনিপত্নীগণকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিতেছে তাঁহারা ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া তাহাদের গায় হাত বুলাইয়া চলিয়া যাইতেছেন। আর তাহারা নাচিতে নাচিতে তাঁহাদের পাছে পাছে ছুটিতেছে। কোথাও মৃগশিশু মুনিপত্নীর ক্রোড়ে সন্তান দেখিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, মস্তক দ্বারা তাঁহার গায় ঘর্ষণ করিতেছে, কোলে উঠিবার জন্য আবদার করিতেছে। তপস্বিনী হাসিয়া স্বীয় সন্তান নামাইয়া দিতেছেন, আর মৃগশিশুকে ক্রোড়ে লইতেছেন, মুখ চুম্বন করিতেছেন। আর সেই বালক? সে হাসিয়া দুই হাত তুলিয়া সাগ্রহে বলিতেছে, "মা, আমার কোলে দাও, আমার কোলে দাও।"

এই কাম্যক তপোবনে নদীর অদূরে পর্ণকুটীর শ্রেণী—কত মুনির কত আশ্রম। এখানে কত ঋষি স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া বাস করিতেছেন। সেই বনজাত ফল ও মূল, অনায়াস জাত নিবার ধান্যের চাউল, গৃহ পালিত গাভীর গৃহজাত বিশুদ্ধ অপর্য্যাপ্ত দধি দুগ্ধ ঘৃত, ক্ষীর সর নবনী আর বহুবিধ মাংস তাঁহাদের শরীরের পুষ্টি সাধন করিতেছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও মুনিঋষিগণ বহুপ্রকার মাংস ভক্ষণ করিতেন। মোটা কার্পাসবস্ত্র, বৃক্ষের ছাল ও চর্ম্ম ঋষিগণের পরিধেয়। তাঁহারা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হন, ব্রহ্মনাম কীর্ত্তনে তপোবন পবিত্র করেন। পরে সরস্বতী নদীতে প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়া যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন, সমস্বরে সামগান করিয়া তপোবন মুখরিত করিয়া তুলেন। অনন্তর কোন মুনি কোন বৃহৎ বৃক্ষের ছায়াতলে

কুশাসনে বসিয়া নূতন ছাত্র ও ছাত্রীগণকে অধ্যয়ন করান। কেহ অন্য বৃক্ষ বেদীকায় অপরের সহিত তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। কেহ আবার নির্জ্জনে বসিয়া নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়া ভারতে নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করেন। যে সংস্কৃত গ্রন্থ-রত্ন রাজী আজ জগতের বিস্ময় উদ্দীপন করিতেছে, তাহা এই তপোবনেই রচিত হইয়াছিল, এই তপস্বীগণই রচনা করিয়াছিলেন। কেহ আবার দূরদেশে পর্য্যটন করিয়া তথাকার জ্ঞান স্বদেশে আনিয়া সকলের মধ্যে বিতরণ করেন। সকলে সকল শুনিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হন। এই তপস্বীগণ বিভিন্ন মতাবলম্বী, তথাপি একই তপোবনে সকলে সুখে ও সানন্দে বাস করিতেছেন কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ নাই। মতান্তরের জন্য সৌহার্দ্দের অভাব হয় নাই। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বিরোধ ও বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করিয়া, কেবল জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুশীলনে জীবন যাপন করিতেছেন। পরোপকার দেশোপকার ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন লক্ষ্য নাই। প্রবল নরপতিগণ পর্য্যন্ত প্রজাপীড়ন করিলে, অন্যায় অত্যাচার করিলে, এই নিঃস্বার্থপর তপস্বীরা তাঁহাদের সভায় গিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করেন, ন্যায় অনুসারে রাজ্যশাসন করিতে উপদেশ দেন কত রাজা ও রাণী আবার কত সময় এই সকল তপোবনে গিয়া শান্তিসুখ উপভোগ করেন, এই অগাধ জ্ঞানান্বিত মুনিগণের সহিত রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সম্বন্ধেও পরামর্শ করেন। ভারতবর্ষ চিরদিনই ত্যাগের দেশ। এই মুনি ঋষিরা ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া, দিনরাত কেবল জ্ঞান আহরণে ও বিতরণে নিযুক্ত, দেশোপকারে আত্মোৎসর্গীকৃত, কেন না সমস্ত দেশ, সমুদয় রাজা ও রাণী তাঁহাদের পদতলে মস্তক অবনত করিবে? এইরূপ জ্ঞান কর্ম্ম ও ধর্ম্মময় জীবন, মহাত্যাগী মহর্ষিগণ সমাজের শীর্ষদেশে আছেন বলিয়াই সমাজ এমন সুন্দর ভাবে চলিতেছে, দেশ এত উন্নত হইতেছে।

তাঁহারা বহু ছাত্র ও ছাত্রীগণকে নিজের নিকটে রাখেন, দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ অন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা প্রতিপালন করিয়া অধ্যয়ন করান। আর বিবিধ সদুপদেশ দিয়া, ততোধিক স্বীয় আদর্শ চরিত্র দ্বারা মহাসঙ্কটময় যৌবনে সংযমী হইতে সহায়তা করেন। এই ছাত্র ও ছাত্রীগণ গুরুদেবের সহিত একত্র বাস করিয়া তাঁহার আদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া, এমন জিতেন্দ্রিয় হয় যে শেষে সংসারের কোন প্রলোভনই তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। মহর্ষিরা যে একমাত্র ব্রাহ্মণ-তনয়কেই নিজের নিকট রাখিয়া অধ্যয়ন করান, তাহা নহে। শূদ্র বালকও পড়িতে চাহিলে তাহাকেও পুত্র নির্ব্বিশেষে লালন পালন করেন ও বেদাদি সকলই অধ্যয়ন করান *। আবার রমণীগণকেও শিক্ষা দেন। বিদুষী আত্রেয়ী প্রথমে বাল্মীকির নিকট, পরে মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট শিক্ষা লাভ করেন, রমণীরত্ন গার্গী ব্রহ্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে স্ত্রী স্বাধীনতা ছিল, স্ত্রী জাতির সম্মান ছিল, জ্ঞানের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। সাধে কি ভারতবর্ষ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল?

তখনকার ছাত্রজীবন বর্ত্তমানের বিলাস সর্ব্বস্ব ছাত্রজীবনের আদর্শ। তপোবনের ছাত্রগণের মাথায় জটা, পরিধানে ক্ষুদ্র ও মোটা কাষায় বস্ত্র। শরীর তৈল হীন। কোথাও তাহারা

* এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ অধ্যায়ে 'মাংস' দ্রষ্টব্য।

মুনির ধেনু চরাইতেছে, কোথাও তাঁহার জমির আইল বাঁধিতেছে, কোথাও তাঁহার জন্ত রোপন করিতেছে। কোন ছাত্র বনে গিয়া কুড়ালী দিয়া কাঠ কাটিতেছে, কেহ তাহা মস্তকে করিয়া দূরবর্ত্তী আশ্রমে চলিয়াছে *। কেহ কাঠ আনিতে দূরবর্ত্তী গভীর বনে প্রবেশ করিয়া প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইয়া অন্ধকার রজনী হিংস্রপশুময় সেই বনেই অতি-বাহিত করিতেছে। কোন ছাত্র পর্ণকুটীর পরিষ্কার করিতেছে, কেহ হোমের অগ্নি জ্বালিতেছে, কেহ বন হইতে ফলমূল ও কুশের ভার মস্তকে করিয়া আনিতেছে। তাহারা মহর্ষিগণের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিতেছে। কোন কর্ম্মকেই নীচকর্ম্ম, অপমানের কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছে না। তাহাতে একদিকে তাহাদের শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতেছে, পরিশ্রম করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে, তাহারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকরিতে অভ্যস্ত হইতেছে, শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারিতেছে; অন্য দিকে তাহাদের মনের উন্নতি হইতেছে, অহঙ্কার দূরে যাইতেছে, বিনয়ী হইতেছে, 'কর্ম্মই ঈশ্বর' ইহা বুঝিতেছে। এইরূপ কঠোর জীবন যাপন করে বলিয়া তাহারা আনন্দ বিহীন নহে। তাহারা সদানন্দ পুরুষ। তাহারা ঘোর সংযমী, মহাত্যাগী, সকলেই ব্রহ্মচারী। পূর্ব্বে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া গুরুর নিকট থাকিয়া সংযম শিক্ষা করিতে হইত। অধ্যয়ন শেষে ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হইত। তখন বিবাহ করিয়া গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশের নিয়ম ছিল। তপোবনের ছাত্রগণ কিরূপ সংযমী ছিল, তাহা কচ ও দেবযানীর মনোহর গল্পে জানা যায়।

সুরগণের সহিত অসুরগণের চিরবিবাদ, চিরদিন ঘোর যুদ্ধ। সুরগুরু বৃহস্পতি ও অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য স্ব স্ব পক্ষ পরিচালন করিতেছেন। উভয়ের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুক্রাচার্য্য মৃতকেও জীবিত করিতে জানেন। বৃহস্পতি তাহা জানেন না। তিনি তাহা শিখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিরূপে শিখিবেন? শেষে অনেক ভাবিয়া স্বীয়পুত্র কচকে শুক্রাচার্য্যের নিকট পাঠাইলেন। কচ শুক্রাচার্য্যের শিষ্য হইতে চাহিলেন। আচার্য্য বলিলেন, "সেত উত্তম কথা। তাহাকে তোমার পিতার উপরেও আমার শ্রদ্ধা দেখান হইবে।" আচার্য্য তাঁহাকে নিজের আশ্রমে, নিজের নিকট রাখিয়া অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন।

দেবযানী নামে শুক্রাচার্য্যের এক অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী যুবতী কন্যা ছিল। কচও অতি সুন্দর যুবা পুরুষ। তিনি নিয়মিত সময়ে অধ্যয়ন করেন, আর অন্য সময়ে আশ্রমের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি দয়া, সাধুতা, মধুর ব্যবহার ও সংযম দ্বারা দেবযানীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। বন হইতে সুন্দর ও সুগন্ধ পুষ্প, সুপক্ব ও সুমিষ্ট ফল আনয়ন করিয়া দেব-যানীর হস্তে দেন। অবসর সময়ে নৃত্যগীতবাদ্য দ্বারা তাঁহাকে মোহিত করেন। দেবযানীও গীত ও মধুর ব্যবহার দ্বারা কচকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন †। পূর্ব্বে হিন্দু সমাজে নৃত্যগীতবাদ্য নিন্দনীয় ছিল না ‡।

* আদিপর্ব্ব ৭০ অধ্যায়।

† আদিপর্ব্ব ৭৬—২৪—২৫—২৭।

‡ এসম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তি পর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে 'কলাবিদ্যা' দ্রষ্টব্য।

একদিন সন্ধ্যা হইয়াছে, কচ মস্তকে কুশ ও কাঠের বোঝা লইয়া আচার্য্যের গাভীসহ বন হইতে আশ্রমে আসিতেছেন। অসুরগণ তাঁহাকে বৃহস্পতির পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া খুব প্রহার করিল ও মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়া গেল। মুনির গাভী যখন গৃহে আসিল কচ আসিলেন না। তাহাতে দেবযানী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পিতার নিকট গমন করিলেন, বলিলেন, "বাবা, গাভী সকল আসিয়াছে, কচ আসে নাই। নিশ্চয়ই কেহ তাহাকে নিহত করিয়াছে। কচ বিনা আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না।" মুনি তাহা শুনিয়া বনে গমন করিলেন। কচকে সঞ্জীবিত করিয়া লইয়া আসিলেন। আর একদিন অসুরগণ কচের ততোধিক দুর্দ্দশা করিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, তথাপি কচ আসিলেন না। তখন দেবযানী ব্যথিত হৃদয়ে পিতাকে বলিলেন, "বাবা, নিশ্চয়ই কচের কোন বিপদ হইয়াছে। তাহার কোন বিপদ হইয়াছে। তাহার কোন বিপদ হইয়া থাকিলে, আমিও প্রাণত্যাগ করিব।" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শুক্রাচার্য্য বলিলেন, "দেবযানি, তোমার ন্যায় রমণীর কোন নশ্বর ব্যক্তির জন্য শোক করা উচিত নহে।" কন্যা উত্তর করিলেন, "বৃদ্ধ অঙ্গিরা ঋষি যাঁহার পিতামহ, তপোধন বৃহস্পতি যাঁহার পিতা, কর্ম্মে যিনি সতত উৎসাহশীল ও দক্ষ, এইরূপ ব্রহ্মচারী তপোনিধির জন্য কেন আমি শোক করিব না? কেনই বা রোদন করিব না? আমি আর আহার করিব না। কচ যে পথে গিয়াছে, আমিও সেই পথে যাইব।" শুক্রাচার্য্য বলিলেন, "তনয়ে, তুমিও কচকে ভালবাস, সেও তোমাকে ভাল বাসে। কিন্তু তাহার উপকার করিতে গিয়া যদি আমার বিপদ ঘটে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে?" দেবযানী উত্তর করিলেন, "বাবা, আপনার বিপদ হইলেও জীবিত থাকিতে পারিব না। অগ্নি তুল্য যে কোন শোকেই দগ্ধ হইব।" তখন শুক্রাচার্য্য কচকে আবার জীবিত করিলেন। দেবযানীর আনন্দের অবধি রহিল না।

ক্রমে কচ শুক্রাচার্য্যের নিকট মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতি সমুদয় বিদ্যা শিখিলেন। পরে পিতার নিকট গমন করিবার জন্য তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন। এখন দেবযানীর নিকট বিদায় লইতে উপস্থিত হইলেন।

দেবযানী। কচ, আমি তোমায় কত ভালবাসি, তাহা কি তুমি জান?

কচ। দেবযানি, আমি তোমায় কত ভালবাসি, তাহা কি তুমি জান?

দেবযানী। তবে তোমার ব্রত শেষ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ, এখন আমায় বিবাহ কর।

কচ। দেবযানি, তুমি আমার গুরুর কন্যা, সহোদরা তুল্যা। তোমায় সহোদরার ন্যায় ভাল বাসিয়াছি। বিবাহের প্রস্তাব করা তোমার উচিত নহে।

দেবযানী। কেন? তুমি ত আমার পিতার পুত্র নহ, বিবাহ করায় দোষ কি? আমি ত কোন অন্যায় কার্য্য করি নাই, কোন অপরাধও করি নাই। তবে কেন আমাকে পরিত্যাগ করিবে? এই বলিয়া দেবযানী অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

---

* এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বে ৫ম অধ্যায়ে 'জন-শিক্ষা' দ্রষ্টব্য।

† এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বে ৫ম অধ্যায়ে 'নারীজাতি,' 'অবরোধ প্রথা' ও 'স্ত্রী-শিক্ষা' দ্রষ্টব্য।

‡ আদিপর্ব্ব ৩ অধ্যায়।

§ [illegible] ১০—৮০—৩৫ [illegible] ৩২। ইহা কৃষ্ণের বিদ্যার্থীজীবনের ঘটনা।

কচ। ভগিনি, তুমি কোন অপরাধ কর নাই, কোন দোষও কর নাই। তুমি রূপগুণে-শ্বরী, তাহা আমি জানি। তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবাস, তাহাও জানি। আমি তোমার নিকটে পরম সুখে ছিলাম। কোনদিন কোনরূপ মনে কষ্ট পাই নাই। তুমি আমার গুরুর কন্যা, কেবল এইজন্যই বিবাহ করিতে অসম্মত হইতেছি। তুমি আমাকে যেরূপ সহোদরের ন্যায় এতদিন ভাল বাসিয়াছ, এখনও সেইরূপ ভাল বাসিও, আর অবসর সময়ে আমার কথা মনে করিও। আমি চলিয়া গেলে আমার গুরুদেবের যেন কোন কষ্ট না হয়, তাহা দেখিও। প্রিয় ভগিনি, এখন বিদায় দাও, পিতার নিকট গমন করি।

দেবযানী অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তথাপি কচ বিচলিত হইলেন না। মুনি কন্যা-গণের স্বভাব কিরূপ সরল ও স্বাভাবিক ছিল, তাহাও এই গল্পে জানা যায়।

পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী স্বদেশ, স্বরাজ্য, ইন্দ্রপ্রস্থের অতুল ঐশ্বর্য্য অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়া দীন হীন বেশে কাম্যক বনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পুত্রগণ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতেই স্ব স্ব মাতুলালয়ে গমন করিলেন। তাঁহাদের রাজ্য, রাজধানী ও ঐশ্বর্য্য সকলই দুর্য্যোধন অধিকার করিয়া বসিলেন। পাণ্ডবেরা কাম্যক তপোবন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। এখানেই পর্ণ কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মৃগয়া করেন, আর দ্রৌপদী সেই মাংস ও নিবার ধান্যের চাউল প্রস্তুত করিয়া অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করেন। অগ্রে ব্রাহ্মণ ও স্বামীগণকে আহার করাইয়া পরে নিজে ভোজন করেন*। মধ্যে মধ্যে মুনি ও মুনিপত্নীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আহার করান। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতেন। তাঁহারা কোন কোন স্থলে শূদ্রের অন্নও ভক্ষণ করিতেন। পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর সৌজন্য ও সদ্ব্যব-হারে সেই তপোবনের সকলেই মুগ্ধ হইলেন। সেই তপোবনের সুখ ও শান্তি, শোভা ও সম্পদ্ দেখিয়া অনেক সময় তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল, ধনৈশ্বর্য্যের সুখ অপেক্ষা এই তপো-বনের শান্তি সুখ কি স্পৃহনীয় নহে?

এইরূপ কত তপোবন একদিন ভারতবক্ষে বিরাজ করিত। সে সকলই চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইয়াছে। মহাজ্ঞানী, মহাত্যাগী, মহাকর্ম্মী মহর্ষিগণও চিরদিনের জন্য ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। সে দিন হইতে ভারত সন্তান এই মুনিঋষিদের ন্যায় সাধারণভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ও উচ্চচিন্তা ও দেশহিত সাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে বিরত হইয়াছে, সেই দিন হইতে ভারত অধঃপতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। জানিনা কবে তাহার বিরাম হইবে!

মায়া।

স্পর্শ মোরে রসের নেশায় অধীর করে।
হয়ত সুধা নয়ত গরল,
ঢেউ খেলে যায় তপ্ত তরল;
ঢেউএর গানের মৃদুল তানে বধির করে।
ফুলের দলের দোলে জাগা,
ছায়ার তলে আলস-লাগা
বাতাস আসে ভেসে ভেসে গন্ধ ভরে।
ফুটে উঠে রূপের মায়া;
নয় সে আলো নয় সে ছায়া;
চমক্ ভরে চাইয়ে মোরে অন্ধ করে।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

---

* বনপর্ব্ব ৫০—১০। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৩৭ অধ্যায়ে 'অন্ন' ও 'পানীয়' দ্রষ্টব্য।

তক্ষশিলা-তত্ত্ব—বন্ধুর পত্রে।

রাওয়ালপিণ্ডী
১০।১০।১৯২০

ম—

তোমাকে কিছু বলিয়া সুখ নাই। বিনা বিচারে বন্ধুবাক্য বিশ্বাস করা তোমার ধাতে নাই। বন্ধুদের কথামত কাজ ত করিবেই না। ভাগ্যি, সামান্য কিছু প্রজ্ঞা ভগবান্ তোমাকে দিয়াছিলেন, নতুবা তোমার যে কি দশা হইত ভাবিয়া দেখ। শাস্ত্রে আছে—"যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা মিত্রোক্তং ন করোতি যঃ। স এব নিধর্নং যাতি যথা মন্থরঃ কৌলিকঃ॥" ও সামান্য প্রজ্ঞায় তোমাকে বেশী দিন সামলাইতে পারিবে না। এখনও সময় আছে সাবধান।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন দেশের ছেলে মেয়েরা ভারতের সরকার-সংস্পৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে পারিবে না। ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় য়ুরোপ হইতে, নয় চীনদেশ হইতে ছাত্রেরা আসিয়া পড়িবে। আর তাও যদি কলিকাতার "শুঁফো সরস্বতী"র অদৃষ্টে না থাকে—তবে "দরোয়াজা বন্ধ্"! বন্ধুবান্ধবদের ছেলেপিলের পড়া বন্ধ হইয়া যায়। স্বদেশ সেবক নন্দলাল করেন কি? নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। দেশের জন্য, দশের জন্য, প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইয়া ছেলেদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করিতে গান্ধার রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ধান নিতে আসিয়াছি। বিশ্বাস হইতেছে না? হায়রে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত সংশয়বাদী পাষণ্ড! হা হতভাগ্য দেশ!

কাল সারাদিন তক্ষশিলায় ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের খোঁজ করিতে গিয়া যে কয়টি ঐতিহাসিক সত্য জানিতে পারিয়াছি লিখিয়া দিলাম। রাজা জন্মেজয় তক্ষশিলা জয় করেন। দ্রৌপদীর বিবাহের কিছুদিন পরেই টের পাওয়া গেল যে রাজকুমারী তেমন সুশিক্ষিতা নহেন। শ্রীমতী গান্ধারী তখন দ্রৌপদীকে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহকর্ম্ম (Domestic Economy) ও শিল্পকলা (Fine arts) বিভাগে রাজা অম্ভির (Omphis) দ্বিপঞ্চাশত্তম পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত Post-nuptial course এ উচ্চতর শিক্ষা ও উপাধি লাভের জন্য পাঠান। উপাধি লাভ করিয়া দ্রৌপদী পুনরায় পঞ্চস্বামীর ঘর করিতে হস্তিনাপুরে ফিরিয়া যান। ইতিমধ্যে শ্রীমান্ অর্জ্জুনও বিদেশে যুদ্ধবিদ্যা ও শিল্পসৌন্দর্য্যজ্ঞান ও "ফ্যাশানে" ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া হস্তিনাপুরে ফিরিয়াছেন। সে সময় অনাবৃষ্টিতে ও ম্যালেরিয়াতে দেশের লোক বড় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। দ্রৌপদীর তাহাতেও মনে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। যে কারণেই হউক, দ্রৌপদী হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিয়া সাজ সজ্জার প্রতি উদাসীন হইলেন। অর্জ্জুন তাহাতে মনোক্ষুণ্ণ ছিলেন। একদিন বৈকালে দ্রৌপদী তক্ষশীলার আটপৌরে পোষাকে—অর্থাৎ ঢোলা ইজের, লম্বা

কামিজ বা সার্ট, ও মাথায় ওড়না পরিয়া—বাগানে একটি আসনে বসিয়া বৌদ্ধজাতক হইতে একটি অবদান পড়িতেছিলেন। অর্জ্জুন আসিয়া তাঁহার পাঠের বিঘ্ন জন্মাইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। দ্রৌপদী তাহাতে একটু বিরক্ত হন। অর্জ্জুন বলিলেন যে রন্ধন ব্যাপারে দ্রৌপদীর সুনিপুণতা দেখিয়া তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহকর্ম্মবিভাগের উপাধি ও শিক্ষার প্রশংসা করিতেই হয়। কিন্তু পত্নীর সাজসজ্জা দেখিয়া তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলা বিভাগের নিন্দা না করিয়া থাকা যায় না। তক্ষশিলার অন্যান্য ছাত্রীগণও কি এইরূপ সাজসজ্জা করেন? পাঁচ স্বামী নিয়া দ্রৌপদী ইতিমধ্যেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহাতে সেদিন নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আন্তরিক ক্লেশ অনুভব করিলেন। বাস-ব্যবস্থা-বিধায়ক (Residential) বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষিতা দ্রৌপদীর তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মাতৃভক্তি জাগিয়া উঠিল। তক্ষশিলার সহপাঠিনী সখিগণের প্রতি ঐ শ্লেষোক্তি শুনিবামাত্র Esprit de corps বা সঙ্ঘ সৌহার্দ্দ্যও জাগিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাদিষ্ট পতিভক্তি উদিত হইয়া দ্রৌপদীকে বুঝাইয়া দিল যে পঞ্চ পতির অন্যতম হইলেও পতি দেবতা, পতির প্রতি রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। অর্জ্জুন যবনসংসর্গে আসিয়া শিল্পসৌন্দর্য্যের মায়াতে মুগ্ধ হইয়া বাসনানুগামী ও প্রবৃত্তি-পথবর্ত্তী হইয়াছেন বটে, তাঁহাকে নিবৃত্তিমার্গে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কিন্তু অনিষ্টকারী যবনের প্রতিও হিংসা ত বৌদ্ধধর্ম্ম বিরুদ্ধ। নিমেষের মধ্যে নিজেকে সংযত করিয়া দ্রৌপদী বলিলেন—"প্রাণনাথ, আপনার যাবনিক শিক্ষা দীক্ষা আপনাকে নির্ব্বাণ পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া বাসনানুগামী করিতে পারে। সত্য বটে, যাবনিক সভ্যতা আপনার মনে শিল্পসৌন্দর্য্যানুভূতি জাগাইয়াছে। তাহাতে প্রবৃত্তি মার্গে চলিবার কালেও ধর্ম্মানুগামী থাকিবার সহায়তা হয়। কিন্তু যদিও অশিক্ষিত ইতর রমণীর মায়া সহজেই কাটাইতে পারেন, "সুভদ্র" রমণীর মায়া কাটান যাবনিক শিক্ষায় তত সহজ হইবে না। আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা, "সুভদ্র" রমণীর মায়ায় আকৃষ্ট হইলে আমাকে তখন সঙ্গে থাকিতে দিতে হইবে। আর যে যবন সভ্যতার সংসর্গে আসিয়া আমাকে আজ আপনি মনোকষ্ট দিলেন তাহাকেও অহিংসা আমার ধর্ম্মাদিষ্ট। সেই জন্য আমার এই সংকল্প—সর্ব্ববুদ্ধের পূজার জন্য, সকল অর্হতের পূজার জন্য, সকল বোধি সত্বের পূজার জন্য, মাতাপিতার পূজার জন্য, আমার পঞ্চপতির কল্যাণের জন্য, আমার মিত্রবর্গের কল্যাণের জন্য ও সর্ব্বসত্বের কল্যাণের জন্য—আমার এই সংকল্প যে যদি কোনও দিন যবন তাহার প্রবৃত্তি মার্গানুবর্ত্তিনী সভ্যতা লইয়া তক্ষশিলায় উপস্থিত হয় তবে তক্ষশিলার ছাত্রছাত্রীগণ যেন যবনের সংকারিতা বর্জ্জন করেন।"

ইতিহাসে জানা যায় যে এই ঘটনার পরে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যাবনিক পারস্য সাম্রাজ্য তক্ষশিলা পর্য্যন্ত বা অধিকার করিয়াছিল, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩২৬ সালে যবন সম্রাট সেকন্দর তক্ষশিলাকে পদানত করিয়াছিলেন, খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ব্যাক্ট্রিয়ার যবন গ্রীকগণ ডিমেট্রিয়াসের নেতৃত্বে তক্ষশিলা পার হইয়া পঞ্চনদকুল জয় করিয়াছিলেন, এমন কি অদ্যও যবন আজও পর্য্যন্ত তক্ষশিলা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যা-

লয়ের বৌদ্ধ ছাত্রী দ্রৌপদীর সংকল্প—সেই সহকারিতা বর্জ্জন সংকল্প—আজও অটুট রহিয়াছে। ফলে সর্ব্বপ্রথম যবনাধিকার কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত তক্ষশিলায় বিশ্ববিদ্যালয় আর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই সহকারিতা-বর্জ্জন-সংকল্পের এমন হাতে হাতে ফল ইতিহাসে আর একটা পাওয়া সহজ নয়।

যাহা হউক, তোমার বাড়ীর ছেলেরা যেন তক্ষশিলায় পড়িতে না আসে। বন্ধুবাক্য অন্ততঃ একবার হইলেও মানিও। আমি অন্যত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ধান করিতে যাইব। সন্ধান পাইলে জানাইব। ইতি—

স্বদেশ সেবক নন্দলাল
শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

বিশ্ব-ভরা।

নিত্য তোমার মুক্ত খেলা
অমৃত আমার ঘরে,
হাস্যে তোমার ঝর্‌ঝরিয়ে
পড়ত মাণিক ঝরে।
নৃত্যে তব নাচ্‌ত সাগর
লহর তুলে অঙ্গনে,
বুক জড়িয়ে ধর্‌তে মোরে
হিয়ার গাঢ় বন্ধনে।
নয়ন মণি! আজকে আমার
নওতো একা আর,
নিখিল মাঝে ছড়িয়ে দেছ
হর্ষ আপনার।

সবার ঘরে আজকে তুমি
বাঁধলে খেলাঘর,
সবার বুকের পরশ লুটে
লইছ হিয়া 'পর।
আকাশ বায়ু আলোয় জাগে
তোমার হাসি খেলা,
বিশ্ব ভরে নৃত্য সোহাগ
তোমার হেলাফেলা।
আপনারে আজ বিলিয়ে দিলে
এম্‌নি ভূমণ্ডলে,
ভাবতে যেয়ে স্বার্থ-ব্যথা
সকল যে যাই ভুলে।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

সঙ্গণিকা।

আগামী ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসে নব্যভারত উনচল্লিশ বৎসর পূর্ণ করিয়া চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিবে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও পরবর্ত্তী সম্পাদকের স্মৃতি রক্ষার জন্ত এই কাগজখানি ভাল করিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। ভরসা আছে ইহার হিতৈষীগণ কার্য্যতঃ সহানুভূতি প্রকাশের দ্বারা এই চেষ্টা সফল করিতে সাহায্য করিবেন।

নব্যভারত কখন ও কোন দল বা সম্প্রদায়ের মুখপত্র ছিল না। স্বাধীন ভাবে মতের আলোচনা মঙ্গল জনক মনে করিয়া নব্যভারতের দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত ছিল। সকল শ্রেণীর চিন্তাশীল সুলেখকের প্রবন্ধই ইহাতে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল। এখনও তাহা সেই ভাবে চালাইবার চেষ্টা হইবে। স্বাধীন, নিরপেক্ষ সমালোচনা ভিন্ন সমাজ বা সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে না। এই আদর্শ আমাদেরও লক্ষ্য থাকিবে।

অনেক গ্রাহক এই পত্রের দেয় মূল্য পরিশোধ করেন নাই। আশা করি এই বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা তাঁহাদের দেয় মূল্য পরিশোধ করিয়া ইহার উন্নতি সাধনে সাহায্য করিবেন। বিনামূল্যে "নব্যভারত" বিতরণ করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে, নব্যভারত প্রেরণ করা সুকঠিন। ভি পি করিলে অনর্থক ব্যয় বাহুল্য হয়। ইহা সকলে ভাবিয়া দেখিবেন।

আশা করি, গ্রাহক পাঠক ও লেখকগণ আমাদের সংকল্প সাধনের সহায় হইবেন।

* * * * * *

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাস চন্দ্র বসু ও বীরেন্দ্র নাথশাসমল এই কয়জনের বিচার স্থগিত রাখিয়া রাখিয়া এত দিনে শেষ হইয়াছে। প্রত্যেকের ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় তাঁহার কারাদণ্ডের পরে সাধারণের নিকট যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বোঝা যায় যে এই বিচার বে-আইনী হইয়াছে। তিনি বিচক্ষণ আইনজ্ঞ ব্যক্তি সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। তাঁহার মত আইনজ্ঞ ব্যক্তির মত উপেক্ষনীয় নহে। লর্ড রেডিং এ দেশে রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া আসিবার পর নানারূপে আশ্বাস দিয়াছেন যে তিনি আইনের অমর্য্যাদা করিবেন না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের নানারূপ অত্যাচার অবিচারের অভিযোগ ও বিশেষ রূপে এই ব্যাপারে আইন অনুসারে গুরুতর অবিচার হইয়াছে বলিয়া প্রজা সাধারণের মনে শাসক বর্গের প্রতিশ্রুতি রক্ষা সম্বন্ধে যে সন্দেহের প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। লর্ড রেডিং ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। অতি বিচক্ষণ আইনজ্ঞ বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে। তিনি আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিলে তাঁহার সুনাম ও গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিত।

* * * * * *

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দমন নীতি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। কিন্তু মণ্টেগু শাসন সংস্কার (Reform Scheme) অনুসারে প্রস্তাব পাশ হইলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করা না করা গবর্ণরের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। কেননা গবর্ণর ইচ্ছা করিলে তাহা বিফল করিয়া দিতে পারেন অথবা কিছু না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। (যদিও গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী সভাসমিতি বন্ধ করিবার নোটিশের তারিখ শেষ হইয়াছে কিন্তু আর কোন নূতন নোটিশ জারী করা হয় নাই ও কয়েকদিন ধর পাকড় বন্ধ আছে।)

ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন সভ্যের ও দেশের লোকের একান্ত আগ্রহ সত্ত্বে ও মন্ত্রীর বেতন কমান হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা না থাকিলে কোন প্রস্তাব পাশ করা কিম্বা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্সীতে কোন প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহা রদ করা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। এরূপ স্থলে, গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দমন নীতি প্রত্যাহারের প্রস্তাব পাশ হওয়ায়, এই দমন নীতির বিরুদ্ধে দেশের মতের তীব্রতা কত বেশী তাহা বোঝা যায়। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে সুবিবেচনার পরিচয় দিবেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*

মহাত্মা গান্ধি বরদৌলিতে আইন ভঙ্গ করিবার জন্য যে সকল বন্দোবস্ত করিতেছিলেন তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মনোভাব এই যে, গোরক্ষপুরের অন্তর্গত চৌরি-চৌরায় যে ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে বোঝা যায় যে, এখন ও জন সাধারণের মন অহিংস ভাবে বা নির্ব্বিবাদে আইন ভঙ্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। এত বড় একটা আন্দোলন আরম্ভ করিয়া নিষ্ফল হওয়া অপেক্ষা লোকের মন তৈরীর প্রতীক্ষা করা ভাল এই তাঁহার মত। তিনি যখন মনে করেন নিজের ভ্রম প্রমাদ বা ক্রটি হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বাক্যে প্রকাশ করিতে একটুও পশ্চাৎপদ হন না। ব্যাপক ভাবে আইন-ভঙ্গনীতি (mass civil disobedience) প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টকে নীতি পরিবর্ত্তন করিবার সুযোগ দিবার জন্য ৭ দিনের সময় দিয়া লর্ড রেডিংকে যে খোলা চিঠি লেখেন তাহার পর এইরূপ সিদ্ধান্তে (বরদৌলি সিদ্ধান্তে) উপনীত হওয়া সহজ কথা নয়। কিন্তু তাঁহার সত্যনিষ্ঠা অনুপমেয়। সত্যের জন্য আপনাকে লোক চক্ষে ছোট করিতে, আপনার প্রেষ্টিজ বলি দিতে, নিজেকে কুণ্ঠিত মনে করেন না। গবর্ণমেণ্ট যদি প্রেষ্টিজ রক্ষার জন্য অনেক অন্যায়কে ঢাকা দিবার চেষ্টা না করিতেন তবে এ দেশের জন সাধারণের দুঃখের অনেকটা লাঘব হইত।

*　　*　　*　　*　　*　　*

ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের বিগত অধিবেশনে বোম্বাই ও মান্দ্রাজের মহিলারা নিজ নিজ প্রদেশ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা নারীর ভোট দানের অধিকার এক প্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে এই অধিকার সকল প্রদেশের নারীদিগকে না দেওয়ার একটু কারণ আছে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল প্রদেশ নারীদিগকে এ অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছেন সেই সকল দেশের নারীদিগকে এই

উচ্চতর অধিকার দেওয়া যেন অসঙ্গতিদোষ দুষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই এই অধিকারটী তাঁহারা (ইচ্ছা থাকিলেও) ব্যাপক ভাবে প্রদান করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য বশতঃ এখানে এ প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াও পাশ হয় নাই। সুতরাং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সিদ্ধান্তটী বাঙ্গালায় প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয় নাই। বাংলা দেশেই স্ত্রী শিক্ষা (University education) প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও বাঙ্গালার মহিলারা বহুপূর্ব্বেই নিজের আসন করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা প্রায় সমস্ত বিষয়েই পূর্ব্বের মতন আর অগ্রসর নাই। এ বিষয়েও বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতির নিকট পরাস্ত হইয়াছে। তথাপি বাংলার যোগ্যতা অস্বীকার করা যায় না। বাংলার নারীদিগকে অধিকার দিলে সুফল ফলিত না একথা কেহ বোধ হয় বলিবেন না।

* * * * * *

নব্যভারতের অকৃত্রিম হিতৈষী, সুহৃদ ও লেখক ডাঃ প্যারী শঙ্কর দাস গুপ্ত ও বঙ্গবাসীর প্রাণ-স্বরূপ বিহারীলাল সরকার মহাশয়দ্বয়ের পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া আমরা অতীব দুঃখিত হইয়াছি। প্যারীশঙ্করবাবু বহুদিন যাবৎ নব্যভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত ছিলেন। মাঘ মাসের নব্যভারতেও তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি মেডিক্যাল কলেজ হইতে বহু পূর্ব্বে এল এম এস্ পাশ করেন। তিনি পরে এলোপ্যাথী চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাতে বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি বগুড়ার সর্ব্বজন প্রিয় লোক ছিলেন; তিনি তথাকার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে নব্যভারত একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ৺বিহারীলাল সরকার মহাশয় বঙ্গবাসীতে মাত্র ৩০ টাকা বেতনে কেরাণীর কাজে প্রবেশ করিয়া শেষে ইহার কর্ণধার স্বরূপ হইয়াছিলেন। ইঁহার অনেক পুস্তক আছে। ইনি অনেক সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন ও বিদ্যাসাগরের এক বৃহৎ জীবনী রচনা করেন। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাইতেছি।

* * * * * *
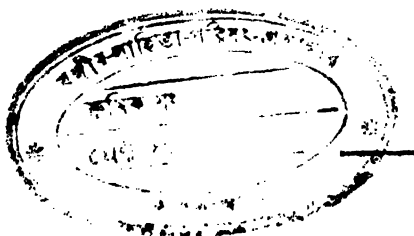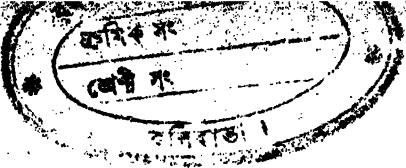
আহার ও চরিত্র।

সভ্য দেশে আহারের সহিত চরিত্রের কোন সংশ্রব থাকা স্বীকৃত হয় না। সে সকল দেশে সুপাচ্য, পুষ্টিকর এবং স্বাদু যে পদার্থই হউক না কেন তাহাই লোকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও বলে যাহা মুখ হইতে বাহির হয় তাহা অপবিত্র কিন্তু যাহা মুখের মধ্যে প্রবেশ করে তাহা অপবিত্র নহে।" সুতরাং লোকে যাহা ইচ্ছা তাহাই ভোজন করিয়া থাকে। আহারের সহিত চরিত্রের সংশ্রব থাকা তাহারা বুঝে না এবং স্বীকারও করে না। চির দিন এই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। এখন কিন্তু সে সকল দেশেও পণ্ডিতগণের মতের পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিখ্যাত পণ্ডিত রেল্যাঙ্কেষ্টার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, বহুলোক একত্রিত হইয়া এক টেবিলে বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প সল্প করিতে করিতে ভোজন করিবার যে প্রথা আছে তাহা বর্ব্বরোচিত। কিন্তু তিনি আহার্য্য পদার্থের সহিত চরিত্রের সংশ্রব থাকা না থাকার বিষয় কিছুই বলেন নাই। পণ্ডিত প্রবর পানেট সম্প্রতি এতদুভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু প্রায় সকল দেশেই পণ্ডিতগণের উপদেশ গ্রহণ করিবার পথে অনেক বাধা উপস্থিত হয়।

প্রাচীন কাল হইতেই এতদ্দেশীয় সংস্কার অন্যরূপ। এতদ্দেশে আহারের সহিত চরিত্র গঠনের বিশেষ সম্বন্ধ থাকা বহুকাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। আহার্য্য পদার্থকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা এতদ্দেশীয় নিয়ম। শ্রুতি ও পুরাণ শাস্ত্রে ভক্ষ্যাভক্ষ্য পদার্থের বর্ণনা বহুস্থানেই দৃষ্ট হয়। মাস ভেদে, তিথি ভেদে ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্ণীত হইয়া থাকে। কোন পদার্থ নিত্যই অভক্ষ্য এবং কোন পদার্থ নিত্য ভক্ষ্য, এরূপ বিধি নিষেধও দেখা যায়। এ সকল বিধি নিষেধ কেবল যে শারীরিক কারণের উপরই প্রতিষ্ঠিত তাহা বোধ হয় না; মানসিক ইষ্টানিষ্টের সহিত ও ইহার সম্বন্ধ থাকা বিবেচনা হয়।

আহারের সহিত চরিত্রের সম্বন্ধ থাকা নানারূপে প্রতীয়মান হয়। তন্মধ্যে আমরা কেবল বর্ণের কথাই আলোচনা করিব। আহার (দৈহিক) বর্ণের নিয়ামক, বর্ণ চরিত্রের পরিচায়ক। এইরূপে আহারের সহিত চরিত্রের সম্বন্ধ থাকা প্রতিপন্ন হয়।

ব্যক্তির বর্ণ কতিপয় পদার্থের উপর নির্ভর করে। সে সকলকে বর্ণোপকরণ বলিব। পুংকোষ এবং স্ত্রীকোষের মধ্যে বর্ণের বীজ * নিহিত থাকে, সেই বীজই বর্ণোপকরণের সুতরাং বর্ণের নিয়ামক। বর্ণোপকরণ মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, অঙ্গার, ফস্‌ফরাস, গন্ধক ইত্যাদি পদার্থ থাকে। এ সকল পদার্থ আহার্য্য বস্তু হইতে দেহ মধ্যে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ আহার্য্য বস্তু বিশ্লিষ্ট, হইয়া এই সকল পদার্থ জাত হয়। ইহারা মিশ্রিত হইয়া বর্ণোপকরণ § গঠিত করে। বর্ণোপকরণ দেহের বাহ্যত্বকের নীচে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে ত্বকের

* মেণ্ডেলিয়ান ভাষায় ইহাকে Factor বলে।

§ Pigment রক্ত এবং লালবর্ণ রক্তকীট উভয়কেই বুঝিতে হইবে।

রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হইয়া যায়। আহার্য্য পদার্থের কিয়দংশ দেহ পোষণে ব্যবহৃত হয় এবং কিয়দংশ স্বভাবতঃই পরিত্যক্ত হইয়া যায়। বর্ণোপকরণ এই শেষোক্ত শ্রেণীর পদার্থ। নিত্য আহার দ্বারা নিত্যই বর্ণোপকরণ প্রস্তুত হইতেছে এবং নিত্যই কিছু কিছু পরিত্যক্ত হইতেছে। বাহ্যত্বকের নিম্নস্থ সঞ্চিত বর্ণোপকরণের দ্বারাই ব্যক্তির বর্ণ নির্ণীত হইয়া থাকে।

ব্যক্তির বর্ণ প্রতিদিন সকল সময় এক প্রকার থাকে না, সকল বয়সেও একরূপ থাকে না স্বাস্থ্যে এবং পীড়ায় বর্ণের প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। আরসেনিক প্রভৃতি কতিপয় পদার্থ সেবন করিলেও বর্ণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। হর্ষ বিষাদ ক্রোধ ইত্যাদি হইলেও বর্ণের পার্থক্য হয়। এ সকল সর্ব্বজনবিদিত কথা। ঈদৃশ স্থলে বর্ণোপকরণের গঠনের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, অথবা রক্তাধিক্য কিম্বা রক্ত হীনতা হয়।

এইরূপ অবস্থা অস্থায়ী কিন্তু স্থায়ী বর্ণ বর্ণোপকরণের স্থায়ী গঠনের উপর নির্ভর করে। তাহা উপরের লিখিত "বীজ" পদার্থের ফল।

পিতামাতা সাদা ও কাল বর্ণের হইলে তাহাদিগের সন্তান কাল অথবা প্রায় কাল হয়। ঐ সন্তান দিগের সন্তান সন্ততি সাদা এবং কাল উভয় প্রকারই হইয়া থাকে। যে বিধান অনুসারে এইরূপ হয় তাহা বিখ্যাত মেণ্ডালের বিধানের একাংশ। সাদা কালোর সন্তান কাল হওয়ায় সাদা অপেক্ষা কালকে প্রবল বর্ণ বলা হইয়া থাকে। কাল প্রবল বর্ণ, সাদা দুর্ব্বল বর্ণ। কাল হইতে কোন পদার্থ বাদ পড়িলে সাদা বর্ণ উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক কাল বর্ণেই সাদা বর্ণ আছে এবং আরও কিছু আছে। এই প্রভেদ বশতঃই সম্ভবতঃ মনোবৃত্তির সুতরাং চরিত্রেরও পার্থক্য হয়। কিন্তু এক কারণে কিছুই হয় না; নানা কারণ বশতঃই একটী ফল উৎপন্ন হয়। চরিত্রের যত প্রকার কারণ আছে তন্মধ্যে বর্ণবীজ সুতরাং বর্ণোপকরণ একটী উল্লেখ যোগ্য কারণ। চরিত্র কিম্বা স্বভাবের বাহ্যিক কারণও আছে, আভ্যন্তরিক কারণও আছে। উভয় শ্রেণীরই নানাবিধ কারণ আছে। আভ্যন্তরিক কারণ সকল মধ্যে আমরা বর্ণবীজের কথাই এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

দেখিলাম, আহার হইতে বর্ণবীজ, বর্ণবীজ হইতে বর্ণোপকরণ, তাহা হইতে ব্যক্তির বর্ণ উৎপন্ন হয়।* একণে বর্ণের সহিত চরিত্রের সম্বন্ধ দেখাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

পণ্ডিত প্রবর পানেট্ মহোদয়ের মেণ্ডেলিজম গ্রন্থের (১৯১৯ খৃঃ) ২০৭ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে লণ্ডনস্থ জাতীয় চিত্রশালায় যে সকল বিখ্যাত নরনারীর চিত্র রক্ষিত রহিয়াছে তাহার মধ্যে সৈনিক ও নাবিকগণের চক্ষু প্রায়শঃ ব্লু-বর্ণের; এবং ধর্ম্ম প্রচারক, বাগ্মী ও নটদিগের অধিকাংশের চক্ষু কাল বর্ণের। পণ্ডিত প্রবর বলিতেছেন "The facts are suggsetive" প্রকৃত পক্ষেও কাল বর্ণের সহিত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবিধ সদ্‌গুণের যোগ থাকা দেখা যায় এবং সাদা বর্ণের সহিত প্রায়শঃ নিষ্ঠুরতা হঠকারিতা লোভাদির যোগ থাকা প্রতীয়মান হয়। পানেট্ মহোদয় সন্দেহ

---

* স্থায়ীবর্ণ শীতাতপ বশতঃ হয় না। গ্রীনল্যাণ্ড ল্যাপল্যাণ্ড দেশের এস্কুইমো অথবা এস্কুইমস্ জাতি সাদা নহে; সাহারা মরুভূমির নিকটস্থ টুরেগ জাতিও কাল নহে। বংশানুক্রমে টুরেগরা সাদা বর্ণের এবং এস্কুইমো-গণ আজকাল (brown) বর্ণের। গরম দেশেও সাদাবর্ণ, শীতের দেশেও প্রায় কালবর্ণ বংশানুক্রমে সর্ব্বত্রই জাত হইতেছে।

করিয়াছেন যে বর্ণোপকরণের* সহিত মনোভাবের† মনে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিতেও পারে। আমার হয়, যাঁহারা দীর্ঘকাল সাদাবর্ণের‡ ব্যক্তিগণের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়া থাকিবেন যে ঐ সকল ব্যক্তিগণের মনে সত্ত্বগুণের অনেক অভাব থাকে; অন্ততঃ কালোর সহিত তুলনায় অপেক্ষাকৃত সত্ত্বগুণের অভাব অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। আমি একবার দেখিয়াছি একজন সাদাবর্ণের ব্যক্তি একজন কালবর্ণের বালককে বেত মারিতে মারিতে বালকটি অজ্ঞান হইয়া গেল, তাহার উপরও প্রহার চলিতে লাগিল। আমার স্মরণ হয় ঐ ক্ষেত্রে ক্রোধেরও বিশেষ কারণ ছিল না। সাদা ব্যক্তির সমক্ষে কালো ব্যক্তি ছাতা মাথায় দিলে, ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে না নামিলে, সেলাম না করিলে—এই সকল তুচ্ছ কারণে অনেক সময় সাদা যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারেন, কাল ব্যক্তি প্রায়শঃ তাহা পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অথবা বিজ্ঞান বিষয়ক মতভেদ হেতু সাদা ব্যক্তিগণ জীবিত মনুষ্যকে খুঁটায় বাঁধিয়া আগুণে পোড়াইয়াছে, আজীবন অন্ধকূপে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং নানারূপে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে। কালবর্ণ জাতি ঈদৃশ মতভেদ হেতু এরূপ ভীষণ ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবে না। দাসপ্রথা যখন স্পষ্টভাবে নগ্নমূর্ত্তিতে প্রচলিত ছিল তখন ইক্ষু আবাদ করিবার জমি সংগ্রহের নিমিত্ত নানা-দেশীয় নানাজাতীয় সাদা ব্যক্তিগণ নরশিকার করিয়াছে। মহাত্মা দারুইন এ বৃত্তান্ত সংযতভাবে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হন নাই। জগতের ইতিহাসে কালোর বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ প্রায় শুনা যায় না, বলিলেই হয়। সকলজাতি মধ্যেই সাদা ব্যক্তি প্রায়শঃ কঠোর হয়, বীর হয়, নির্ভীক হয়, অধ্যবসায়ী হয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় কিন্তু কাল ব্যক্তিগণ অধিকতর ন্যায়পরায়ণ হয়, অধিকতর ধর্ম্মপরায়ণ হয়। বিনয়, নম্রতা, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি কোমল গুণ সকল অধিকমাত্রায় কালবর্ণের সহিত প্রায়শঃ যুক্ত থাকে। কয়েকমাস পূর্ব্বে একটি ধর্ম্মপরায়ণ সাদা ব্যক্তি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি সাদা কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। এ বৃত্তান্ত কালোরা স্তম্ভিত হইয়া শুনিয়াছে। কিন্তু সাদারা ইহাতে বিশেষ কিছু দোষ দেখিতে পায় নাই। প্রাচীন আর্য্যগণ হইতে বর্ত্তমান যুগের সাদা ব্যক্তিগণ কালোর উপর যুগ যুগান্তর হইতে পীড়ন করিয়া আসিতেছে। কালো অন্যায়পূর্ব্বক কাহারও দেশ অধিকার করে না, সুতরাং ঐ কার্য্যের নিত্যসহচর যে অত্যাচার তাহাও তাহাদিগের করিতে হয় না। করিলেও বিশেষ উত্তেজক কারণ না থাকিলে কেবল প্রতিপত্তি অথবা অর্থ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অধিকাংশ স্থলেই ঐ প্রকার ব্যবহার করে না। যাঁহারা লাল অথবা পীতবর্ণের পিপীলিকার সহিত কাল পিপীলিকার তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারাও বোধ হয় উভয়ের ব্যবহারে উল্লেখিত প্রকার পার্থক্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ডাক্তার ওয়ার (Weir) তদীয় গ্রন্থে § এতদুভয় বর্ণের দুই দল পিপীলিকার যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন; তাহা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। বর্ত্তমান যুগে সাদা ব্যক্তিগণ পরস্পর কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না। পরস্পর সকলেই জানে,

---

* Pigmantation

† Peculiarities of mind—এই ভাবা তিনি ব্যবহার করিয়াছেন।

‡ যে জাতিরই হউক।

§ Dawn of reason

তাহারা আবশ্যক হইলে কতদূর পর্য্যন্ত গর্হিত আচরণ করিতে পারিবে। সুতরাং কেহ কাহাকে আস্থা করিতে পারে না। কাল ব্যক্তিগণও এই বিষয়ে প্রায় তদ্রূপ, কিন্তু ঠিক তদ্রূপ নহে। তথাপি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সাদাবর্ণও কতিপয় উচ্চশ্রেণীর সদ্‌গুণের সহিত যুক্ত থাকিতে দেখা যায়, এবং কাল বর্ণও কতিপয় নিকৃষ্ট অসদ্‌গুণের সহিত কখন কখন সংযুক্ত থাকে। চর্ম্মের বর্ণ, চক্ষুর বর্ণ, দন্তের বর্ণ, হস্তপদের তলভাগের বর্ণ, ওষ্ঠের বর্ণ ইত্যাদি নানাস্থানের বর্ণের সহিত মানব চরিত্রের কিরূপ সংস্রব তাহা অদ্যাপি যথাযোগ্যভাবে আলোচিত হয় নাই। হওয়া অত্যাবশ্যক। কেবলমাত্র বিজ্ঞান আলোচনার নিমিত্ত আবশ্যক তাহা নহে, সমাজ তত্ত্বের একটী গুরুতর অংশ এ আলোচনার উপর সম্ভবতঃ নির্ভর করিবে। কোন একটী জাতি সম্বন্ধে এক্ষণে বিশেষ কিছু বলা যাইতেছে না। সকল জাতিতেই সাদা কালো আছে। মানব এবং মানবেতর প্রাণী—উভয়ই আলোচিত হওয়া উচিত। আমি নানাস্থানে যাহা দেখিয়াছি এবং পাঠ করিয়াছি তাহাই উপরে বিবৃত করিলাম। প্রত্যেকেই আপন আপন অভিজ্ঞতার সহিত মিল করিয়া লইতে পারেন। আমার ধারণা হইয়াছে যে কালো অপেক্ষা সাদা সত্ত্বগুণে হীন। এমন যে আত্মরক্ষা বৃত্তি, যাহা সার্ব্বজনীন, তাহাও যেন সাদার তুলনায় কালোর কিছু কম। একথা সত্য হইলে পরিণাম ভয়াবহ হইয়া উঠে।

শ্রীশশধর রায়।

হাফিজ।

তন্বী নারী ছিল যে এক—
দর্পণেতে তার
ফেল্‌লে এসে সর্ব্বনাশা
উজল রূপের ভার;
রুমালখানি রাখ্‌তে পারে
ব'ল্‌লে মোরে হেসে—
স্মৃতির পারে ছিলে বঁধু
কোন্ ধেয়ানের দেশে।

* * *

চোখের জলে ভিজিয়ে দিনু
প্রিয়ার অলক্ রাশ
ঘুচিয়ে সেকি দেবে আমার
ভবিষ্যতের ত্রাস?
ছাড়িয়ে অলক, ব'ল্‌লে প্রিয়া—
লওগো মোরে বুকে
কাল হারাবার ভয়টা ছেড়ে
আজ ক্ষণিকের সুখে।

* * *

মূর্খ যারা—নিজের কথা
ভেবেই মরে শোকে,
বিরাট মহান সৃষ্টি এটা
প'ড়ছে নাকো চোখে;
চোখের তারা দিচ্ছে নাকি
চোখটা খুলে তোর?
অন্ধ তা'রা নিজের পানে
পরের রূপেই ভোর।

* * *

তোমার দেওয়া একটী দুখে
ভুলিয়ে দেছ কত
দীর্ণ হিয়ার জালা শতেক
যন্ত্রণারি ক্ষত;
হৃদয়টী মোর দেখ্‌ছ প্রিয়া
দুখের আগুন জেলে—
ভিতরটী মোর হচ্ছে বাহির
সোণার বরণ মেলে।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

চট্টগ্রাম ও বাঙ্গলানগরী।

বাঙ্গলানগরী বঙ্গ ইতিহাসে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও ইহার বিষয় অনেকেই পরিজ্ঞাত নহেন। তজ্জন্যই ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করি।

পর্টুগীজদিগের লিখিত বিবরণেই প্রথম "বাঙ্গলা" নগরীর উল্লেখ দেখা যায়। পর্টুগীজেরা বঙ্গদেশে প্রথম চট্টগ্রামেই বাণিজ্যার্থ অবতীর্ণ হন। তাঁহারা ইহার বাণিজ্য উপযোগিতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহাকে Porto Grande অর্থাৎ "বৃহৎ বন্দর" আখ্যা প্রদান করেন। পর্টুগীজেরা চট্টগ্রামে অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই চট্টগ্রাম বঙ্গদেশের প্রধান বন্দর ছিল। এবং ইহা বঙ্গদেশের প্রধান দ্বার স্বরূপও ছিল। বঙ্গে পর্টুগীজ ইতিহাসের গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে লিখিতেছেন :--

When the Portuguese came to Bengal, Chittagong was its chief port, the main gateway to the royal capital Gowe. Its geographical position lent it importance", History of the Portuguese in Bengal by J. J. A. Campas p. 21

পর্টুগীজদিগের বিবরণে যেমন আমরা Porto Grande বলিয়া প্রধান বন্দরের উল্লেখ প্রাপ্ত হই তেমনই Cidade de Bengala 'City of Bengala', বাঙ্গলা নগরী বলিয়া একটী প্রধান নগরীরও উল্লেখ প্রাপ্ত হই। এই নগরী সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও ইহার প্রকৃত সংস্থান বিশেষ বিতর্কিত বিষয় হইয়া রহিয়াছে। এই বিতর্কের কিরূপ মীমাংসা হইতে পারে এক্ষণে তাহাই আমাদের বিশেষ বিচার্য্য হইতেছে।

"বঙ্গের পর্টুগীজ ইতিহাস" গ্রন্থে "বাঙ্গলা নগরীর" প্রথম বিবরণ এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে :—

"Duarte de Barbosa, who was one of the earliest Portuguese to write a geographical account of the African and Indian coasts says, * "......this sea (Bay of Bengal) is a gulf which enters towards the north and at its inner extremity there is a very great city inhabited by moors which is called Bengala with a very good harbour Ibid p. p 75-76

পর্টুগীজদিগের বঙ্গের বাণিজ্যে চট্টগ্রামের সহিতই যে প্রথম সম্বন্ধ সংঘটিত হয় তাহার স্পষ্ট ইতিহাসই পাওয়া যায়—

The earliest commercial relations of the Portuguese in Bengal were with Chittagong (Porto Grande), De Barros writes in 1532 "Chittagong is the most famous and wealthy city of the Kingdom of Bengal on account of its port, at which meets the traffic of that eastern region" Ibid p. 113.

---

* The coasts of East Africa and Malabour Hakl Ed p. 178—9.

পরবর্ত্তীকালে চট্টগ্রামের বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে প্রাধান্য হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও ইহা পর্টুগীজদিগের অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য উভয় বাণিজ্যেরই দ্বারস্বরূপই বর্ত্তমান ছিল। বঙ্গে পর্টুগীজদিগের ইতিহাস লেখক বলিতেছেন :—

Portuguese ships used to go to Chittagong with their goods, though Hoogly was a more frequented port. In 1567 Caesarde Federica found more than eighteen ships anchored in Chittagong and he writes that from this port the trader carried to the Indies "great store of rice, very great quantities of bombast cloth of every sort, sugar, corn, and money with other merchandise' * Ibid p. 113

এস্থলে চট্টগ্রাম যেরূপ বন্দর ও পোতাশ্রয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তৎসহ পর্টুগীজ ভৌগোলিক বারবোসার বাঙ্গালা নগরীর সম্বন্ধে উদ্ধৃত বর্ণনার তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে এরূপই সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় যে উভয়কে অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করিতে আমাদের কোন দ্বিধা বোধ হয় না।

বঙ্গের পর্টুগীজ ইতিহাস লেখক কেম্পস, চট্টগ্রাম বঙ্গে যখন পর্টুগীজদিগের প্রধান বন্দর ছিল—তখন বঙ্গের প্রধান বাণিজ্য স্থান "বাঙ্গলা নগর" চট্টগ্রামই হইবে—এই যুক্তিতেই চট্টগ্রামের সহিত বাঙ্গলা নগরের অভিন্নতা প্রতিপাদিত করিয়াছেন—

"As Chittagong was the great port of Bengal it was more likely the Great city of Bengala' Ibid. p. 77

এক্ষণে বাঙ্গলা নগরের সংস্থান সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তৎসমস্ত দ্বারা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহাই আমরা বিচার করিয়া দেখিব। পাশ্চাত্য ভৌগলিকেরা বিভিন্ন মানচিত্র অঙ্কন দ্বারা বাঙ্গালা নগরের স্থান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎসমস্ত কোন কোন ভৌগোলিক চট্টগ্রামেরই সহিত বাঙ্গালা নগরের একই অবস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন, কেহবা চট্টগ্রামেরই বিপরীতদিকে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমরা "বঙ্গে পর্টুগীজদিগের ইতিহাস "হইতে বাঙ্গলা নগরের সংস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্তব্য সকল নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

Lord Stanley of Alderly understands this city of Bengala to have been Chittagong and in a note says that where *Ortelins* places Bengala Hornmans places Chatigam or Chittagong. Considering a chart of 1743 in Dalrymple, Chittagong as Yule remarks † seems to have been the city of Bengala. Obington in giving the boundaries of the Kingdom of Arakan remarks "Teixeira and generally the Portuguese writers reckon that (Chittagong) as a city of Bengala ; and not only so, but place the City of Bengala itself upon the same coast more south than Chatigam.

* Hobson—Jobson S. V. Bengal.

† Purchas, His pilgrims, C. Frederick Vol. 5. p. 138.

"In Bleiv's map which is not generally accurate, the City of Bengala is placed in the southern bank of the Karnaphuli more or less where Van den Broncke places D'ainga. Vignola in a map of 1683 assigns the same position to the city of Bengala. But in a old Partuguse map in Thevenot the city of Bengala is placed above Katigam (Chittagong) or it is meant to be Chittagong itself. Ibid. p. p. 76—77

এই সমস্ত মন্তব্যের আলোচনা করিলে চট্টগ্রামকেই বাঙ্গলা নগর বলিয়া বুঝিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। কারণ বাঙ্গলা নগরকে চট্টগ্রাম বলিয়া স্বীকার করা হউক বা না হউক বাঙ্গলা নগর যে চট্টগ্রামের বিশেষ সন্নিকট ছিল তৎসম্বন্ধে কোন মত দ্বৈধই থাকিবার কথা নয়। যখন বাঙ্গলা নগর চট্টগ্রামের সন্নিহিত বলিয়াই স্বীকৃত হইতেছে; অথচ চট্টগ্রামের সন্নিহিত বাঙ্গলা নগর বলিয়া কোন স্থানের সন্ধান পাওয়া যাইতেছেনা বা কোন স্থান সম্বন্ধে বাঙ্গলা নগরীর ন্যায় বাণিজ্য খ্যাতির কথাও জানা যাইতেছে না, তখন স্বভাবতঃ চট্টগ্রামকেই যে বাঙ্গলা নগরী বলিয়া মনে করিতে ইচ্ছা হয় তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। ইতিহাস লেখক কেম্পস্ ও এই সিদ্ধান্তেরই পক্ষপাতী হইয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন :—

"Without at all enquiring into the relative accuracy of these maps, it may be safely asserted that all evidence points to the conclusion that Chittagong was the real city of Bengal, spoken of, by the early writers" Ibid p. 77.

এক্ষণে বাঙ্গলা নগরের নামকরণ কিরূপে হয় তাহাই প্রশ্ন হইতেছে। ঐতিহাসিক কেম্পস্ সাহেবের মতানুসারে এই নামকরণটী পর্টুগীজদিগের দ্বারাই হয় এবং তাঁহারা ইহাতে আরবদিগের মধ্যে প্রচলিত রীতিরই অনুকরণ করে। দেশের নামানুসারে বৈদেশিক নগরের বা বন্দরের নাম প্রদান করা ইহাই আরবদিগের প্রথা ছিল। কেম্পস্ লিখিয়াছেন :—

"The Arabs and later on the Portuguese generally named a foreign important city or a seaport after the country in which it was situated" Ibid. p. 77.

ঐতিহাসিক কেম্পস্ আরও সারগর্ভ যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা চট্টগ্রামের সহিত বাঙ্গলা নগরীর অভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা তদীয় সুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্য এস্থলে উদ্ধৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি :—

All the Portuguese commanders that came to Bengal first entered Chittagong. In fact to go to Bengal meant to go to Chittagong. It is the "City of Bengala" referred to in the early portuguese writings Ibid p. 21.

"যে সকল পর্টুগীজ সেনাপতি বাঙ্গলাদেশে আগমন করিতেন তাঁহারা প্রথমে চট্টগ্রামে প্রবেশ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালায় যাওয়া বলিতে চট্টগ্রামে যাওয়াই বুঝাইত। ইহাই প্রাচীন পর্টুগীজ লেখাদিতে বাঙ্গালী নগরী বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে॥"

ইহা হইতে বাঙ্গালার মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া বাঙ্গালার আদর্শ বলিয়া মনে করাতেই যে পর্টুগীজগণ চট্টগ্রামকে বাঙ্গলা নগর আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাই আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

পর্টুগীজদিগের লিখিত "Cidade de Bengala" নাম হইতেও এই নামটী তাঁহাদের প্রদত্ত বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। "বাঙ্গলা নগর" নামটী যে পর্টুগীজদিগের প্রদত্ত কেবল তাহাই নহে পরন্তু ইহা স্থধু তাহাদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইত বলিয়াও অনুমিত হয়। তাহাতেই পর্টুগীজদিগের কাগজপত্রেও ইতিহাসে ইহার উল্লেখ থাকিলেও, চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত বা কিম্বদন্তিতে এই নামটীর কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। এই প্রকারে নামটীর সহিত স্থানিক সংস্রব না থাকায় ইহা এমন কি পাশ্চাত্য ভৌগলিক দিগের দ্বারাই কাল্পনিক নগরী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে :—

Though I confess a late French geographer has put Bengala in his catalogue of imaginary cities Ovington (1690) A voyage to Surat p. 554

স্থতরাং চট্টগ্রামের Porto grande নাম যেমন পর্টুগীজদিগের প্রদত্ত বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নাম, বাঙ্গলা নগরী নামটীও ইহার তেমনই বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নাম। তাহাতেই ইহাদের কোন নামেরই কোন স্থানীয় নিদর্শন বর্ত্তমান নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সমগ্র বাঙ্গলা দেশের নামে যে চট্টগ্রাম ইউরোপীয় প্রথম বণিকদিগের নিকট হইতে বাঙ্গলা নগরী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই নামে ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রথম সূচনায় চট্টগ্রামের অসাধারণ প্রতিপত্তির অক্ষয় স্মৃতি চিহ্ন চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে। পাশ্চাত্য কবিও যে চট্টগ্রামের এই প্রতিপত্তি কীর্ত্তন করিয়া ইহাকে সাহিত্য জগতে অমরত্ব প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহা চট্টগ্রামের পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নয়। আমরা সেই কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়া আমাদের প্রবন্ধটীকে শেষ সৌষ্ঠব প্রদান করিতেছি।

"See Chattigam, amid the highest high
In Bengal province, proud of varied store
Abundant, but behold how placed the Post
Where sweeps the shore line towards the southing coast.

Lusiadas, Canto xs. cxxi by Camões Berton's Trans. quoted in the History of the Portuguese in Bengal by J. J. A. Campos p. 66.
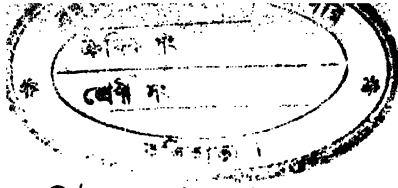
কৃষিকৈবর্ত্ত-মাহিষ্য।

বঙ্গের কৃষিকৈবর্ত্তজাতির প্রকৃত তত্ত্ব এখনও সাধারণের অবগতিতে আইসে নাই। তজ্জন্য এই জাতির প্রতি হিন্দু সমাজের ব্যবহার সকল স্থানে সমান নহে। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ এই জাতির প্রতি অযথা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। এই অবজ্ঞার কারণ অলীক জনশ্রুতি-জাত কুসংস্কার। অধিকন্তু কতকগুলি আধুনিক গ্রন্থকারের ভ্রম-প্রমাদ ও নিন্দাতেও কাহার কাহার এই কুসংস্কার ও সামাজিক ব্যাধি বদ্ধমূল হইতেছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে বিশ্বকোষ অভিধান সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। বিশ্বকোষকে অনেকেই ঐতিহাসিক অভিধান মনে করেন। তজ্জন্য তল্লিখিত মতামতে সাধারণের মতামত গঠিত হইয়া থাকে। এজন্য আমরা বিশ্বকোষ লিখিত মতামতগুলির প্রকৃত তত্ত্ব সাধারণের গোচরে আনয়ন করিতেছি।

প্রথমেই বিশ্বকোষে কৈবর্ত্তশব্দের যে বুৎপত্তি লিখিত হইয়াছে তাহা ব্যাকরণ বিরুদ্ধ। বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে কে জলে বর্ত্ততে=কেবর্ত্তঃ ততঃ স্বার্থে অণ যোগে কৈবর্ত্তপদ সিদ্ধ। এই প্রকার ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হয় না। কারণ সোপপদ ধাতুর উত্তর পচাদ্যচ্ হইবার বিধি নাই।

আবার কে শব্দ সহ বর্ত্তঃ শব্দের অলুক্ সমাসও হইতে পারে না। অলুক অধ্যায়ে কৃদন্ত বিধির নিয়ম এই যে কৃৎসূত্র দ্বারা সপ্তম্যন্ত উপপদের পরস্থ ধাতুর উত্তর প্রত্যয় বিহিত হইলেই সেই উপপদের সপ্তমীরই অলুক হয়। যথা কৃৎসূত্রে আছে সপ্তম্যাংজনের্ড্ঃ এই সূত্রে মনসিজঃ পদ সিদ্ধ হয়। যখন "কে—বৃত+অচ্ হইবার কোনই কৃৎসূত্র বর্ত্তমান নাই তখন সপ্তমীই বা কোথায়? তাহার অলুকই বা কিরূপে হইবে? অতএব কে জলে বর্ত্ততে ব্যুৎপত্তি অসিদ্ধ।

প্রকৃত প্রস্তাবে কিম্‌শব্দসহ অজন্ত বর্ত্ত শব্দের সমানাধিকরণ সমাস হইবার পর অণ্ যোগে কৈবর্ত্তপদ হইয়াছে। অতএব বৃৎ ধাতু অচ্=বর্ত্তঃ, কিম্ বর্ত্তঃ=কিম্বর্ত্তঃ, কিম্বর্ত্তঃ+ অণ্=কৈবর্ত্তঃ। জগৎ বিখ্যাত সংস্কৃত জর্ম্মাণ অভিধান ১৭২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য (বটলিঙ্গ ডিক্সনারী দ্রষ্টব্য।)

তারপর বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে কৈবর্ত্তজাতি চলিত ভাষায় কেওত্ বা ক্যায়োট্ নামে পরিচিত। বঙ্গদেশে কেওত্ ক্যাওট্ চলিত ভাষা নহে, বঙ্গদেশে কেহ কৈবর্ত্তকে ক্যায়োট্ বলে না। ক্যায়োট্ জাতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করে তাহারা বঙ্গীয় মাহিষ্যাপরনামা কৃষিকৈবর্ত্ত হইতে স্বতন্ত্র জাতি।

বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে—"কৈবর্ত্তগণ আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জন্য বৃহৎ ব্যাস বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।" শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জন্য কোথাও বৃহৎ ব্যাস বচন উদ্ধৃত হয় নাই। মেদিনাপুরে প্রাপ্ত বৃহৎ ব্যাস সংহিতা যদি অপ্রামাণিক বলিয়া

পরিত্যক্ত হয় আমরা স্বচ্ছন্দে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। কিন্তু মেদিনীপুরের বৃহৎ ব্যাস সংহিতার অনুরূপ গ্রন্থ কাশী ইত্যাদি স্থানে নাই। উহা পুরাণের ন্যায় বৃহৎ গ্রন্থ। বঙ্গদেশেও কাশ্যাদি স্থানে কোথাও বৃহৎ ব্যাসসংহিতা নামধেয় গ্রন্থ নাই। প্রচলিত বিংশ সংহিতার অন্তর্গত ব্যাসসংহিতা আছে মাত্র।

বিশ্বকোষে—

ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌতীবর সংসর্গাদ্ধীবরঃ পতিতো ভুবি॥

শ্লোকের অর্থ লিখিত হইয়াছে "ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যে জাতি জন্মে তাহাকে কৈবর্ত্ত (ধীবর) বলে। কলিকালে ধীবর (কৈবর্ত্ত) পতিত হইয়াছে।" বিশ্বকোষ কর্ত্তা ঐ শ্লোকের কৈবর্ত্ত অর্থ ধীবর এবং ধীবর অর্থ কৈবর্ত্ত করিয়াছেন। উহা প্রকৃত অর্থ নহে) ঐ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ "ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে যে জাতি জন্মে তাহাকে কৈবর্ত্ত বলে। কলিকালে তীবর সংসর্গে ধীবর জাতি পতিত। উদ্ধৃত শ্লোকের পূর্ব্বপংক্তির কৈবর্ত্তের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় পংক্তির ধীবর বসিতে পারে না। এরূপ বসিলে প্রয়োগে দোষ পড়ে। যেমন রাম উপাস্য রাঘবকে ভজ বলিলে রাঘব, রামেতর ব্যক্তি বলিয়া সন্দেহ আসে, তদ্রূপ কৈবর্ত্ত উৎপন্ন, ধীবর পতিত বলিলে প্রয়োগে দোষ পড়ে। মহামুনি ব্যাসদেবের এইরূপ প্রয়োগ জ্ঞান না থাকা অসম্ভব। এই কারণে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত কৈবর্ত্ত শব্দের সহিত ধীবর শব্দের কোন সম্পর্ক নাই। শ্লোক পাঠে বুঝিতে পারা যায় এই ধীবর সত্যাদি যুগে পতিত ছিল না কলিকালে তীবর সংসর্গে পতিত হইয়াছে। এই প্রকার ধীবরের উৎপত্তি গৌতম সংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতি বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়া গর্ভে উৎপন্ন প্রতিলোম জাতি। এই জাতি শাস্ত্রানুসারে স্পর্শাদি যোগ্য জাতি। এই জাতিরই তীবর সংসর্গে কলিতে পাতিত্য লিখিত হইয়াছে। যদি বলেন গৌতম সংহিতায় যার উৎপত্তি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে তাহার পাতিত্য লিখিত হইবে কেন? তদুত্তরে দেখা যায় বৌধায়নে মদ্গু ও চুঞ্চু জাতির কথা লিখিত আছে। মনুতে এই দুই জাতির উৎপত্তির উল্লেখ নাই অথচ মনুতে মদ্গু ও চুঞ্চু জাতির বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা—চুঞ্চুমদ্গুনামারণ্য-পশুহিংসনম্। ইহাতেই দেখা গেল কেবল অমরকোষ লইয়া শাস্ত্রার্থের বিচার চলে না। অমরসিংহ কৈবর্ত্ত শব্দের সকল পর্য্যায় লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি মনুপ্রোক্ত মার্গব শব্দকেও কৈবর্ত্তের পর্য্যায়রূপে গ্রহণ করেন নাই। যেমন দ্বিবিধ বৈদ্য, দ্বিবিধ করণ, তেমনি দ্বিবিধ কৈবর্ত্ত শাস্ত্রে ও ব্যবহারে বিদ্যমান আছে। মনূক্ত নৌকর্ম্মজীবী কৈবর্ত্ত অনাচরনীয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত কৈবর্ত্ত দ্বিজাতির আচরণীয়। সুতরাং মাহিষ্য কৈবর্ত্ত সহ জালজীবী কৈবর্ত্তের গোল পাকান কর্ত্তব্য নহে।

অত্রি ও যম সংহিতায় কৈবর্ত্ত জাতি অন্ত্যজজাতির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইলেও তাহাতে মাহিষ্য কৈবর্ত্তের কোন ক্ষতি নাই। কারণ কৈবর্ত্ত মাত্রই একজাতি নহে। এরূপ হইলে প্রসিদ্ধ কায়স্থ জাতিও অন্ত্যজ জাতি হইয়া পড়ে। ব্যাস সংহিতায়——

বর্দ্ধকানাপিতো গোপঃ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।

ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। কল্পভেদে এক নামের জাতির মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ থাকাতেই এইরূপ হয়।

বিশ্বকোষকার নানা কথা কাটাকাটির পর বলিয়াছেন ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের কথা প্রকৃত হইলে এই কৈবর্ত্ত জাতি যাজ্ঞবল্ক্যের মাহিষ্য জাতি হইয়া পড়ে। এক্ষণে তিনি বিতণ্ডা উপস্থিত করিয়া বলিতেছেন "ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের জাতি প্রকরণ প্রকৃত কি না?" তিনি ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত অপ্রামাণিক বলিবার জন্য বলিয়াছেন "ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডে অতি নীচ জাতির বর্ণনা স্থলেই কৈবর্ত্ত জাতির কথা, তৎপর জোলা প্রভৃতি নীচ মুসলমান জাতির কথা আছে। জোলা কথাটি ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই। মুসলমানগণ এদেশে আসিলে মুসলমান ও হিন্দু তাঁতির সম্মিলনে এই জোলা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এরূপ স্থলে ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের যে অধ্যায়ে জাতি নির্ণয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রাচীন পুরাণের অংশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।"

এক্ষণে কোষকারের উদ্ধৃত কথাগুলির সমালোচনা করা যাউক। ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে উচ্চ নীচ সকল জাতির উৎপত্তি বর্ণিত আছে। একবার উচ্চ জাতি, তৎপরে নিম্ন জাতি বা মধ্য জাতি, আবার উচ্চ জাতি আবার নিম্ন জাতি বর্ণিত হইয়াছে। ভিল্ল স্বর্ণ-কারাদির পর করণ ও অম্বষ্ঠ জাতির উল্লেখ থাকায় ভিল্ল ও স্বর্ণকার অপেক্ষা করণ ও অম্বষ্ঠ নীচ জাতি হইবে কি? আবার কতকগুলি নীচ জাতির উল্লেখের পর রাজপুত্র, আগারি জাতির উল্লেখ করিয়া কৈবর্ত্ত জাতির উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। আবার কয়েকটী নীচ জাতির উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার অশ্বিনী কুমার জাত বৈদ্যজাতির উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। এইরূপ উচ্চ নীচ জাতির উৎপত্তি একসঙ্গে লিখিত থাকায় উচ্চ জাতিগুলি নীচ জাতি হইয়া যাইতে পারে না।

তৎপরে জোলা শব্দ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে—ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দ কন্যায়াং জোল জাতি বভূবহ। ম্লেচ্ছ অতি প্রাচীন জাতি। ম্লেচ্ছের উৎপত্তিও ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে ও গরুড় পুরাণে আছে। ম্লেচ্ছ জাতির ভারতে বসবাস মহাভারতের সময় হইতে দেখা যায়। কুবিন্দ জাতিও অতি প্রাচীন জাতি। মিশ্রবর্ণের উৎপত্তিকালে উক্ত ম্লেচ্ছ ও কুবিন্দের সম্মিলনে জোল জাতির উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। বিশ্বকোষ কর্ত্তা ম্লেচ্ছ অর্থে মুসলমান ধরিয়া গোলযোগ করিয়াছেন। মুসলমানের সহিত হিন্দু তাঁতির সম্মিলনে জোলা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে ইহা নগেন্দ্রবাবুর অনুমান বা কল্পনা মাত্র। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের উক্ত জোল জাতি হিন্দু জাতি। ইহাদের বসতি এক্ষণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আছে।* শাস্ত্র অনুসারে ম্লেচ্ছ ও কুবিন্দ উভয়ই হিন্দু জাতি। তাহাদের সন্তানও হিন্দুজাতি। সম্ভবতঃ বঙ্গের জোলা জাতির কতকাংশ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে কতকাংশ অনাচরণীয় হিন্দু তাঁতিরূপে বর্ত্তমান আছে। আমাদের এই অঞ্চলে দুই জাতি তাঁতি বর্ত্তমান আছে, এক জাতির জল আচরণীয়

* মুরাদাবাদে উক্ত তন্তুবায়কে জুলাহে বলে, মুরাদাবাদ নিবাসী পণ্ডিত জ্বালা প্রসাদ মিশ্র প্রণীত জাতিনির্ণয় নামক পুস্তকের ৭০পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। জৌনপুরে হিন্দু জোলাকে "জরিয়া" বলে।

অন্য জাতির জল অব্যবহার্য্য। অনাচরণীয় তাঁতিগণই সম্ভবতঃ জোলা তাঁতি। আবার বঙ্গের তন্তুবায় মধ্যে যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় ব্যবসায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে তাহাদিগকে মুসলমানগণ তাঁহাদের উর্দ্দু ভাষায় ব্যবহৃত "জোলহী" নামে ডাকিতেছেন। যেমন কোলও কোলা শব্দ সংস্কৃত তেমনি জোলও জোলা শব্দও সংস্কৃত। জোলা শব্দ জুল ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। জুল্‌ধাতুর অর্থ পেষণ। সংস্কৃত জোল শব্দের অপভ্রংশে হিন্দি বা পারসী জোল্‌হা হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার উন্নতির সময়ে বহুভাষায় এই ভাষার শব্দ গৃহীত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে আবেস্তা ভাষা, আরবী প্রভৃতি বহু অনার্য্য ভাষা হইতেও সংস্কৃতের শব্দ সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছিল। সেই সকল শব্দের মূল নির্ণয়, কাল নির্ণয় ক্ষমতা বহুভাষাবিদ্ ভিন্ন অন্যের অসাধ্য। পিক শব্দ কোকিল অর্থে সংস্কৃতে ব্যবহার, অথচ ঐ শব্দটী আর্য্যভাষার শব্দ নহে। ঐরূপ তামরস শব্দটিও ম্লেচ্ছভাষা হইতে গৃহীত। পণ্ডিতগণ 'হোরা' শব্দটী গ্রীকভাষার শব্দ বলেন। অথচ প্রাচীন সংস্কৃত জ্যোতিষশাস্ত্রে হোরা শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে, পিক তামরসাদি শব্দ যে ম্লেচ্ছ প্রসিদ্ধ তাহা জৈমিনি প্রণীত মীমাংসা দর্শনের "ম্লেচ্ছ প্রসিদ্ধ্যধিকরণ" নামক অধ্যায়ে আছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস সঙ্কলিত বাঙ্গালা ভাষার অভিধানের পিক, তামরস ও হোরা শব্দ দ্রষ্টব্য।

মুসলমান জাতির সংসর্গে হিন্দু তন্তুবায় রমণীর গর্ভে যদি জোলা জাতি হইত এবং বঙ্গদেশের জাতির দিকে লক্ষ্য করিয়াই যদি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের জাতিপ্রকরণ লিখিত হইত তাহা হইলে বোম্বে দ্রাবিড়, পঞ্জাব, কাশী, পুরী প্রভৃতি স্থানের ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের হস্তলিপিতে অবশ্য পাঠান্তর দৃষ্ট হইত। এবং ঐ ঐ স্থানের ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ঐ জেলে জাতির বিবরণ থাকিত না। মুসলমান ত এ দেশে সেদিন আসিয়াছে।

পারসীতে বস্ত্র বয়নকারীর নাম বাফেন্দা, নুরবাক, আরবীতে হায়েক। যদি বস্ত্রবয়ন কারীর মুসলমানী নাম রাখা প্রয়োজন হইত তবে তাহার নাম বাফেন্দা, নুরবাক্ বা হায়েক হইত। জোল্‌হা শব্দ পারসীতে ব্যবহার হইলেও ঐ শব্দটী সংস্কৃত মূলক। পারসী ও সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দই একই মূল ধাতু হইতে উৎপন্ন। যেমন পিতৃ—পিতর, মাতৃ—মাদর, জোল—জোল্‌হা। পারসীতে পিতর, মাদর শব্দ থাকায় সংস্কৃত গ্রন্থগুলি যেমন মুসলমান আমলের হয় নাই তদ্রূপ জোল্‌হা শব্দ পারসী বা হিন্দিতে ব্যবহার হওয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তের জাতি প্রকরণ মুসলমান আমলের বা আধুনিক হইতে পারে না। সদৃশ শব্দের জন্য শাস্ত্র আধুনিক হয় না। মনুসংহিতায় "শৈখ" জাতির (মনু ১০।২১) উল্লেখ আছে। আবার এতদ্দেশে বিপুল সংখ্যক "শেখ" সম্প্রদায়ের মুসলমান আছে। শেখ আরবী শব্দ, শৈখ সংস্কৃত শব্দ সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয়ের যুক্তি অবলম্বন করিলে মনুসংহিতাকেও মুসলমান আমলের বলিতে হয়।

নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন কোন কোন পণ্ডিতের মতে মনুপ্রোক্ত দাস নামক জাতি মূল কৈবর্ত্ত জাতি নহে। ইহারা গৌণ কৈবর্ত্ত মাত্র। এই মত অপনোদনের জন্য প্রাচ্য বিদ্যা-মহার্ণব সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয় বলিতেছেন যে "এখনও কৈবর্ত্ত জাতির মধ্যে অনেকে দাস-কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।" এই দাস উক্তি মার্গব বোধক নহে। মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণ কেন আপনাদিগকে দাস বলেন তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। পাণিনি সূত্রে আছে—

দাস গোপ্লৌ সম্প্রদানে।

৩।৪।৪৩

অর্থাৎ সম্প্রদান কারকে দাশ ও গোপ্ন শব্দ নিষ্পন্ন হয়। দাশ অর্থে যাহাকে দেওয়া যায় অর্থাৎ যে জাতিকে করস্বরূপ কিছু না দিলে দেশে থাকা অসম্ভব হইত সেই জাতি দাশ-পদবাচ্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ। এই জন্যই যদুরাজগণ "দাশ" বলিয়া কথিত। এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাশার্হ অর্থাৎ দাশদিগের শ্রেষ্ঠ। মাহিষ্য দাশগণ পিতৃকুল স্মরণে আপনাদিগকে দাশ বলেন। ইহাদের দাশোক্তি বা দাসোক্তি ক্ষত্রিয়ত্ব সূচক, ধীবরবাচক নহে।

বিশ্বকোষকার মাহিষ্যের কৃষিবৃত্তি খুঁজিয়া পান নাই। বিষ্ণুসংহিতায় অনুলোমজাতি মাতৃবর্ণে নিবিষ্ট হইয়াছে। অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ (বিষ্ণুসংহিতা) এই শাস্ত্র বাক্যে মাহিষ্য বৈশ্যজাতি হইতেছেন। বৈশ্যের ব্যবসায় কৃষি গোরক্ষা, বাণিজ্য, এ অবস্থায় মাহিষ্য মুখবৃত্তি কৃষ্যাদি করিতে পারিবেন না কেন? কাজেই কুল্লুকভট্টের টীকায় শস্যরক্ষা অর্থ কৃষিপরিগৃহীত হইয়াছে।

আবার ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে—

নৃপাজ্জাতোহথো বৈশ্যায়াং গৃহ্যায়াং বিধিনাসুতঃ।
বৈশ্যবৃত্ত্যাতু জীবেত ক্ষাত্রধর্ম্মং নচাচরেৎ॥
কাশীধামস্থ মহাদেব শাস্ত্রী প্রকাশিত
অষ্টাবিংশতিস্মৃতি ৩২৩ পৃষ্ঠা, তথা
বাচস্পত্যভিধান ৩০৯৭ পৃষ্ঠা জাতি শব্দ দ্রষ্টব্য।

ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীর সন্তান বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, ক্ষত্রধর্ম্ম আচরণ করিবে না। এই উশনার নির্দেশ মতে মাহিষ্যগণ বৈশ্যবৃত্তি অর্থাৎ কৃষি গোরক্ষা, বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। সুতরাং মাহিষ্য ও ব্রহ্মপুরাণোক্ত কৈবর্ত্ত পিতামাতা ও বৃত্তি সাম্যে এক জাতি বটে। তবে স্কন্দ পুরাণে মাহিষ্যের জ্যোতিষ, শাকুন শাস্ত্র, স্বরশাস্ত্র প্রভৃতি জীবিকা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল বৃত্তি সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বৈকল্পিক বৃত্তি বটে।

হালিক কৈবর্ত্তগণ যে মিশ্রক্ষত্রিয় এবং ইহাদিগের মধ্যে যে বহুতর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অনুপ্রবিষ্ট তাহা নিম্নলিখিত শাস্ত্র বচনে প্রমাণিত হইতেছে।

১। মাগধায়াং বিশ্বস্ফটিক সংজ্ঞঃ অন্যান্ বর্ণান করিষ্যতি।
কৈবর্ত্ত-বটু-পুলিন্দ সংজ্ঞান্ ব্রহ্মণান্ রাজ্যে
স্থাপয়িষ্যত্যুৎ সাদ্যাখিল ক্ষত্রজাতিম্।
বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।

২। মাগধানাং মহাবীর্য্যো বিশ্বস্ফানি র্ভবিষ্যতি।
উৎসাদ্যপার্থিবান্ সর্ব্বান্ সোহন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি।
কৈবর্ত্তান্ পঞ্চকাং শ্চৈব পুলিন্দান্ ব্রাহ্মণাংস্তথা।
স্থাপয়িষ্যতি রাজানঃ নানাদেশেষু তেজসা।
বায়ু পুরাণ। ৩৭ অঃ

৩। বিশ্ব স্ফানিন রপতিঃ ক্লীবাকৃতি রিবোচ্যতে।
উৎসাদয়িত্বা ক্ষত্র বৈ ক্ষত্রমন্তং করিষ্যতি॥
বায়ু পুরাণ।

৪। মাগধানান্তু ভবিতা বিশ্ব স্ফূর্জ্জিঃ পুরঞ্জয়ঃ।
করিষ্যতি পরোবর্ণান্ পুলিন্দ যদু মদ্রকান্॥
ভাগবত ১২।১।৩৪-৩৫।

এই সমস্ত শ্লোকে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে কৈবর্ত্ত জাতি মিশ্র ক্ষত্রিয়। এবং পরবর্ণ অর্থাৎ দ্বিজবর্ণ। এবং কৈবর্ত্তের আর একটী নাম যদু। রাজপুতনাতে এই শাস্ত্রোক্ত কৈবর্ত্তগণ যদুনামে পরিচিত।

বিশ্বকোষ কর্ত্তা যবদ্বীপে মাহিষ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে মাহিষ্য নাম পাইয়াছেন। কিন্তু ঐ মাহিষ্য নামের পার্শ্বেই যে "কে'বো" নাম আছে তাহাতে তিনি মন দেন নাই। ঐ প্রমাণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে মাহিষ্য জাতিই কে'বো অর্থাৎ কৈবর্ত্ত। পাঠকগণের অবগতির জন্য ঐ স্থানটী অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর ৯ম খণ্ডে (১৮৭৭—৭৮) যবদ্বীপের বিবরণে লিখিত আছে—

"The largest Kingdom in Java did not contain many Xatry-as; they are called Mahisha or K'bo (Buffalo to indicate their strength)"

যদি মাহিষ্যের কে'বো বা কৈবর্ত্ত নাম যবদ্বীপ হইতে পাওয়া যায় তবে আর কৈবর্ত্তের মাহিষ্যত্বে বিতণ্ডা কেন? তমলুকের মাহিষ্য কৈবর্ত্তগণই যবদ্বীপে মাহিষ্য ক্ষত্রিয়রূপে উপনিবিষ্ট। বাঙ্গালী কৈবর্ত্ত বিদেশে যাইয়া মাহিষ্য নাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন তজ্জন্য বাঙ্গালী গৌরব বোধ করিতেছেন কিন্তু স্বদেশে তাঁহাদের প্রতি সেই সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? আমরা অতঃপর নগেন্দ্রবাবু তদীয় বিশ্বকোষে মাহিষ্য শব্দে মাহিষ্য জাতি ও তৎ-পুরোহিতের প্রতি যেরূপ সাহিত্যিক অত্যাচার করিয়াছেন তাহাই প্রদর্শন ও খণ্ডন করিব। অলমিতি।

শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস।

করুণা।

ভিজিয়ে দিয়ে বৃষ্টিধারে, কুঁচকে দিলে পাখা গো!
এযে গো করুণার কণা কনকনে।
কেনই মোরে আকুল করে ওপার-পারে ডাকাগো?
শূন্যে কেন ধেয়ান করাও ওমনে?
শুকিয়ে ডানা রুদ্র রোদে, ঊর্দ্ধ পথের সুদূরে,
পালকেতে আলোক-রেখা ঝলিয়ে,
নীলের তীরের উদাস পুরে, বিশ্ব যেথা ধু-ধু-রে,
আমায় সেথা ভাসিয়ে দিব গলিয়ে।
বনের কোণের বাসাখানি থাকগে ডালে পাতা সে।
গাছের পাতায় গাথা আমি তনুবনা
ডাক মোরে! পাখা ঝেড়ে ভর করে যাই বাতাসে
করুণা গো! আমায় কর উন্মনা।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

গয়ার ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গয়াক্ষেত্র এবং তাহার একক্রোশের মধ্যে "গয়াশীর" অবস্থিত। অক্ষয় বটতীর্থের সন্নিকট প্রপিতামহেশ্বর শিবস্থান প্রভৃতি কতকগুলি তীর্থস্থান আছে; ফলকথা গয়াভূমি তীর্থ ময় হইতেছে। গয়া শ্রাদ্ধ করিয়া গয়ালীর নিকট হইতে সুফল লইয়া গয়াতীর্থের মধ্যেই ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। গৃহে গিয়া পুনশ্চ শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হয়। ইহার পরই হউক বা তীর্থে ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বে "দেহরী" বাঁটিতে হয়, অর্থাৎ যজমান সাধ্যমত দক্ষিণা, ভোজন সামগ্রী পাত্রে দিয়া পৈতা চন্দন সিন্দুরাদি সহ তীর্থ-কল্পিত গয়ালীকে দান করিয়া গয়াপালগণের দ্বারে দ্বারে গিয়া ঐরূপ দান করিলে গয়াকার্য্য সর্ব্বাঙ্গীন সুসিদ্ধি লাভ করে।

গয়ার ভূতপূর্ব্ব সবজজ ৺বরদা প্রসাদ সোম মহাশয়ের "Old Gya and the Gayawals" নামক পুস্তক পাঠে গয়ালীদের সম্বন্ধে যথেষ্ট জানা যাইবে।

গয়াশ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিচার মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন এবং অতুল বাবুর "গয়া কাহিনী" গ্রন্থে বিশেষ ভাবে করিয়াছেন। অত্রিসংহিতা ৫৫-৫৮ শ্লোক, কল্যাণস্মৃতি ২৬খণ্ড, শঙ্খস্মৃতি ১৪ অধ্যায়, লিখিত স্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, মহাভারত বনপর্ব্ব. বাল্মীকি রামায়ণ, লিঙ্গ পুরাণ ৯৫ অধ্যায়, বামণপুরাণ ৯০ অঃ, বরাহপুরাণ ১৮৩ অঃ, মৎস্য পুরাণ ২২ অঃ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ কৃষ্ণজন্ম খণ্ড, পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড, বায়ুপুরাণ ৪৩-৫০ অঃ অগ্নি পুরাণ ১১৫ অঃ, প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে আমরা গয়াতীর্থ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারি। অগ্নিপুরাণের ১১৫ অধ্যায় পাঠে আমরা জানিতে পারি যে কোন কোন তিথি ও দিনে পিতৃপিণ্ড দান গয়াক্ষেত্রে করিলে কি ফল লাভ হয়। শ্বেত বরাহ কল্পে ব্রহ্মা গয়ায় আসিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি চৌদ্দজন আচার্য্য ব্রাহ্মণ উৎপন্ন করিয়া গয়াকার্য্য শেষ করেন। এই চৌদ্দজন ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান গয়াবাল বা গয়াপালগণের আদিপুরুষ হইতেছেন। ইঁহাদের নাম যথাক্রমে :—

নাম	গোত্র	বেদ	উপ	শাখা	সূত্র
গৌতম	গৌতম	যজুর্ব্বেদ	ধনুর্ব্বেদ	মাধ্যন্দিনী	কাত্যায়ণ
কশ্যপ	কাশ্যপ	সাম	গান্ধর্ব্ব	কৌথুমী	গোভিল
কৌৎস	কৌৎস	যজুঃ	ধনুঃ	মাধ্যন্দিনী	কাত্যায়ন
কৌশিক	কৌশিক	„	„	„	„
কয়াব	কয়াব	„	„	„	„
ভারদ্বাজ	ভারদ্বাজ	„	„	„	„
ঔশনস	ঔশনস	„	„	„	„
বাৎস্য	বাৎস্য	„	„	„	„
পারাশর	পারাশর	যজুঃ	ধনু	মাধ্যন্দিনী	কাত্যায়ন
হরিৎকুমার	হরিৎকুমার	„	„	„	

মাণ্ডব্য	মাণ্ডব্য	যজু	ধনু	মাধ্যন্দিনী	কাত্যায়ন
লৌগাক্ষি	লৌগাক্ষি	ঋক্	অথর্ব্ব	আশ্বলায়ন	আশ্বলায়ন
বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ	যজু	ধনু	মাধ্যন্দিনী	কাত্যায়ন
আত্রেয়	আত্রেয়	„	„	„	„

এই চৌদ্দ গোত্রীয় গয়াপাল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেবল কাশ্যপ, বাৎস্য এবং লৌগাক্ষি গোত্রীয়গণের শিখা এবং পাদ "বাম" হইতেছে এবং তাহাদের দেবতা "বিষ্ণু" হইতেছেন। ব্রহ্মার সময় হইতে অদ্যাবধি গয়াপালগণ গয়াশীরে অর্থাৎ বিষ্ণুপদী মন্দিরের এক ক্রোশের মধ্যেই বাস করিতেছেন। আজ হইতে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গয়ায় চৌদ্দশত গৃহ গয়াপাল বাস করিতেন অথবা তাহারা চৌদ্দগোত্রীয় ব্রহ্মা কল্পিত ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা "চৌদ্দ সাহিয়া" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ যখন গয়ায় আসিয়া তিন চান্দ্রমাস বাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে তিনি স্বচক্ষে গয়ায় একসহস্র ঘর গয়ালীর বাস দেখিয়াছিলেন। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে গয়া তুর্কী সৈন্যদের হাতে থাকে। তাহারা স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীগণের উপর খুবই অত্যাচার করে। তাহাদের অত্যাচারে গয়াপালগণ বসবাস ছাড়িয়া কুর্কীহার, মনকোসী, পরেবা, ভুভ্হুল্, মহাবোধ, পুরোরিয়া প্রভৃতি গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মুসলমান ও তুর্কী সৈন্যদের অত্যাচারে গয়া মানবের বাস হীন হইয়া দাঁড়াইল এবং কোন যাত্রী এখানে ভয়ে আইসা যাওয়া করিত না। ১৪৪৬ সম্বৎ অর্থাৎ খৃষ্টিয় ১৩৮৯।৯০ সালে মহারাণা লক্ষণসিংহ উদয়পুরের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তাতার ও তুর্কীগণের হস্ত হইতে গয়া নগরকে উদ্ধার করিবার জন্য সসৈন্যে আসিয়া গয়া অবরোধ করেন। দুইবৎসর অবরোধের পর সম্মুখ সংগ্রামে বীরোচিত ধর্ম্মপালন করিয়া মহারাণা ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলে তাহার অধস্তন পঞ্চ পুরুষ পর্য্যন্ত বংশধরগণ হিন্দুর পরম তীর্থস্থান গয়া নগরকে উদ্ধারের চেষ্টা করিতে থাকেন কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই; অবশেষে তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠ বংশধর রাণাসঙ্গ ১৫০৯ হইতে ১৫২৮ সাল পর্য্যন্ত উদয়পুরের শাসন দণ্ড পরিচালন কালে গয়া নগরীকে তাতারীয়গণের কবল হইতে উদ্ধার করেন। এই ব্যাপার খানা আমাদের ভারতীয় "ক্রুসেড্" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যে হেতু গয়াতীর্থ উদ্ধারের জন্য প্রায় এক শতাব্দী কাল হিন্দুগণ তাতারীয়গণের সহিত ঘোর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকেন। ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে গয়ার অবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তিনি ভারত ইতিহাসে আলমগীর বাদসাহ রূপে বিশেষ পরিচিত! তাঁহার ৫০ বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ রাজত্ব কালে গয়ার গয়াপাল শ্রেষ্ঠ সীতারাম চৌধুরীর দুইপুত্র শোহর চন্দ্র এবং মোহর চন্দ্র চৌধুরীর মধ্যে জ্যেষ্ঠ শোহর চন্দ্র চৌধুরী দিল্লীতে বাদসাহের দরবারে গিয়া বহুদিন বাস করিয়া বাদশাহের কোন বেগমের প্রিয় পাত্র ও কৃপার দাস হইয়া সুযোগ পাইলে গয়াপালগণের উপর তুর্কী সৈন্যদের অত্যাচার কাহিনী জ্ঞাপন করিয়া কৃপাভিক্ষা করিলেন। তাহার সুযোগ এই রূপে ঘটে। বহুদিন চৌধুরীজী বাদসাহের দর্শন মানসে দিল্লীতে বসিয়া থাকেন, কোন মতেই রাজ সন্দর্শন ঘটে না। অবশেষে কোন

রূপ সুযোগ ক্রমে চৌধুরী শোহরচন্দ্র সম্রাটের প্রিয় বেগমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শোহর চন্দ্র যেমন দেখিতে সুপুরুষ যুবা তেমনি গুণালঙ্কৃত এবং যোদ্ধা পুরুষ। বেগম তাহাকে ডাকাইলে, তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই চৌধুরীজি অভিবাদন করিয়া মাতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহার আমূল কাহিনী বর্ণন করিলেন। বেগম সাহেবা চৌধুরীজির ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

একদা চৌধুরীজি বেগম সাহেবার সম্মুখে বসিয়া আছেন এমন সময়ে সম্রাট স্বয়ং সেইখানে আসিয়া পড়িলেন এবং অপরিচিত ব্যক্তিকে নিভৃত বেগমাবাসে দেখিয়া বেগমকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ ব্যক্তি কে? বেগম বলিলেন যে ইনি আমার সম্পর্কে পুত্র হন। বাদসাহ বলিলেন যে আমি উহাকে কিছু খাইতে দিলে খাইবে কি! বেগম বলিলেন জাঁহাপনা, আপনি ভারতের একচ্ছত্রী সম্রাট, সকলকেই ভোজন দিতেছেন। আমিও আপনার অন্নে পালিতা হইতেছি; আমার পুত্র আপনার দত্ত ভোজন গ্রহণ করিবে না কেন? নিশ্চয়ই সে খাইবে। বাদসাহ কিছু মিষ্টান্ন স্বহস্তে শোহরচন্দ্রকে দিলে তিনি ভোজন করিলেন। বাদসা-হের মনের সন্দেহ ঘুচিল, সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, পুত্র শোহরচন্দ্র কিছু যাচঞা কর, আমি তাহা দিব, আমি তোমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। চৌধুরীজি কহিলেন জাঁহাপানা, যদি দীনের উপর এতই সন্তুষ্ট হইয়াছেন তবে এমন জিনিষ দিতে আজ্ঞা হউক যাহার দ্বারায় আমার পুত্র পৌত্রাদিগণ বংশানুক্রমে তাহার উপসত্ব ভোগ করিতে পারে। বাদসাহ বলিলেন, শোহরচন্দ্র তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাকে আমি চারি হাজার বিঘা জমি নিষ্কর জাইগীর গয়া সহরে দিলাম। এই সনন্দের নকল যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। বাদসাহ ফরমাস দিয়া ঐ জাইগার চৌধুরীজিকে দখল করাইয়া দিলেন। প্রদত্ত জমীর চৌহদ্দী দক্ষিণে বৈতরণী পুষ্করিণী উত্তরে নাত্রাগঞ্জের পোল, পূর্ব্বে ফল্গু নদীর পূর্ব্বস্থ তীর এবং পশ্চিমে চিরাইঞা টাঁড়। চৌধুরী মহাশয় গয়ায় ফিরিয়া আসিয়া অপর গয়ালীগণকে গয়ায় তাঁহার প্রদত্ত জাইগীর ভূমিতে প্রজাস্বরূপ আনাইয়া প্রজাস্বরূপ বাস স্থাপন করাইয়াছিলেন। চৌধুরী মহাশয় প্রাচীন গয়া নগরটীকে চারিটি তোরণ সংযুক্ত করিয়া নগরের চতুর্দ্দিকে খাই খনন করাইয়া দিয়া সুরক্ষিত করেন। চৌধুরী মহাশয় মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তিনি স্বজাতিগণের নিকট হইতে পৃথক থাকিতেন; কিন্তু অপর গয়ালীগণ সর্ব্বদেশ হইতে যাত্রী সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং চৌধুরী মহাশয়ের মালিকানা অংশ দিয়া বক্রীর দ্বারায় নিজেদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।* কিছুকাল পরে শোহরচন্দ্র চৌধুরী পরলোক গমন করিলে "ধৌত পদ" বেদীর সন্নিকটে তাঁহার "কবর" বা "সমাধি" নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়া হয়। শোহরচন্দ্র মুশলমান হইবার পূর্ব্বে তাঁহার এক বংশধর পুত্র শঙ্কর লাল চৌধুরী এবং তাহার পরে বীরমা বা বীরমাতা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। শঙ্করলাল স্বজাতীয় উচ্চ গৃহের কন্যা পূর্ণাদাইকে বিবাহ করেন। ইনিই পরে পূর্ণা চৌধুরাণী নামে গয়ায় প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। পরোখিয়া গ্রামের "গড়ের" গয়ালী গৃহে বিরমার বিবাহ হয়। পূর্ণা চৌধুরাণী খুব সাহসী এবং স্বামীত্ব (masterful) সম্পন্না ও স্বাধীনচেতা স্ত্রীলোক ছিলেন; তিনি স্বয়ং সদা সর্ব্বদা রক্ষি গণে পরিবৃতা এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া থাকিতেন। তাঁহার অধীনে সাতশত পাঠান

রক্ষি সৈন্য সদা সর্ব্বদা আদায় তহশীল জন্য নিযুক্ত থাকিত। এই সময়ে বাদসাহের পক্ষ হইতে পাটনায় নবাব সাহ সুজা বজীর খাঁ শাসনকর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চৌধুরাণী মহাশয়া গয়ার সীমার মধ্যে মুসলমান থানার অবস্থিতি নিবারণ জন্য পাটনায় আবেদন করিলে শাসনকর্ত্তার পরামর্শক্রমে তাহা অগ্রাহ্য হইলে চৌধুরাণী মহাশয়-সমস্ত গয়াপালগণের সমবেত পরামর্শক্রমে, বাদসাহের গয়ার থানা জোরে উক্ত নগরের সীমার মধ্য হইতে উঠাইয়া দিলে বাদসাহের আদেশে উক্ত নবাব সুজাউজীর বাহাদুর চারিহাজার অশ্বারোহী এবং দুই হাজার পদাতী সৈন্যসহ চৌধুরাণীকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং আসিয়া গয়া অবরোধ করিলেন। নবাব সুজাউজীর বাহাদুর নগরীটিকে পরিখা ও তোরণের উপর রক্ষির দ্বারা সুদৃঢ়রূপে রক্ষিত অবলোকন করিয়া গয়ার পূর্ব্বপ্রবাহী ফল্গুনদীর পরপারে "লক্ষ্মীবাগে" বাদসাহী থানার সন্নিকটে সৈন্য সমাবেশ করিয়া গয়াপালগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া নগর পালগণ এবং গয়াপালগণের প্রধান সেনানায়ক ভৈয়া গয়া সেন, চন্দন আহার, জোহর হল্, মিহির হল্, কর্পূরা বারিক্ প্রভৃতি যোদ্ধাগণ নবাব বাহাদুরের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যেকে দশটাকা সিক্কাবাদসাহী টাকায় নজর দিয়া করজোড়ে হাজির থাকিলেন। নবাব গয়াপাল যোদ্ধাগণের দিকে দৃষ্টি করিয়া ভ্রাতা সম্বোধনে বলিলেন যে আপনারা কেন বাদসাহের থানা উঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে অবমাননা করিয়াছেন! তাহাতে গয়াপালগণ বলিলেন যে আমরা বাদসাহের রাজভক্ত প্রজা, আমরা বিদ্রোহী নহি, আমাদের নিবাসস্থল গয়া-শীরের মধ্যে মুশলমান থানা প্রতিষ্ঠিত থাকা আমাদের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, ইহার প্রতিকার করিতে আজ্ঞা হউক। সুবেদার বলিলেন যে তাহাই হইবে এবং তদনুসারে বাদসাহী থানা গয়া হইতে উঠাইয়া লইয়া লক্ষ্মীবাগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। এই ঘটনার অল্পদিন পর গয়ালীগণ একযোট হইয়া চক্রান্ত করিলেন যে চৌধুরাণীজিকে আমাদের বহু কষ্টে অর্জ্জিত টাকার অধিকাংশ ভাগ দিতে হয়, অতএব চৌধুরাণীকে হত্যা করাই মত এবং তাহাই শ্রেয়ঃ। সকল গয়াপাল সমবেত হইয়া দেওনাপুরের বৈঠকে ঐ মর্ম্মে গুপ্ত মন্ত্রণা করিলেন। সকল গয়ালী মিলিত হইয়া চৌধুরাণীকে আমন্ত্রণ করিলেন। চৌধুরাণী অনেক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় বৈবাহিক নাগর চামরের বাটীতে যাইতে প্রতিশ্রুতা হইলেন। অবশেষে এক শুভদিনে চৌধুরাণী স্বীয় দেহ রক্ষিগণকে এবং সীতানাম্নী পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া চতুর্দ্দোলায় আরোহণ করিয়া বৈবাহিক গৃহে গমন করিলেন। তিনি দোলা হইতে নামিবামাত্র বিশ্বাসঘাতী গয়ালীগণ চৌধুরাণীকে আক্রমণ করিয়া হত করিলে সীতাদাসী পলাইয়া গিয়া বীরমাকে খবর দিলে তিনি বহু বাছা সৈন্য লইয়া, স্বয়ং অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে গয়ালীগণকে স্বীয় মাতা চৌধুরাণীজির পাঠান সৈন্য সহ গয়াপালগণকে অবরোধ করিলেন। দেওনাপুর, উত্তর মানস, দক্ষিণ দরোজা, মুর্চ্চা, দেবঘাট, পাঁচ মহল্লা প্রভৃতি স্থানে খুব বড় বড় কয়টি উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়; তাহাতে বহু গয়ালী চমূ হতাহত হন; দক্ষিণ দরোয়াজার যুদ্ধে বিরমা নিজে বাম হস্তে আঘাত প্রাপ্তা হইলে মূর্চ্ছিতা হইয়া অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিতা হইলেন। তাঁহার বিশ্বাসী সৈন্যদের যত্নে চৈতন্য

সম্পাদিত হইলে তিনি সুস্থ হইয়া তিন দিন পরে পুনশ্চ প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া সমস্ত গয়ালী সৈন্যকে পরাজিত করিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিলে, গয়ালীগণ পরাজয় স্বীকার করিয়া বীররমণী বিরমাকে পিতাম্বর দিয়া সন্ধি ক্রয় করিলেন। উভয়পক্ষের সন্ধির সর্ত্ত অক্ষয়বট তীর্থে লিখিত হয়; বিরমা অক্ষয়বট স্ব আয়ত্বে আনিয়া দখল করিয়া লইলেন। সন্ধির সর্ত্তমতে গয়াপালগণ চৌধুরাণীর পক্ষীয় পাঠান ও তুর্কী সৈন্যগণের কবর গয়ার মধ্যে নির্ম্মাণ করাইয়া দিলে বিরমা আদেশ করিলেন যে ইহার পর গয়ার সীমা মধ্যে কোন মুসলমান থাকিতে পারিবে না এবং কোন মুসলমান গয়ার মধ্যে "আজান" দিতে পারিবে না। এই আদেশ আজও প্রতিপালিত হইতেছে। পূর্ণা চৌধুরাণীর হত্যার পর বিরমা তাঁহার স্থানে উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন যে গয়ালীগণ যে যাত্রী গয়ায় আনয়ন করিবেন তাহার মধ্যে সাতজন আনয়নকারীর হইবে; তাহার উর্দ্ধ যাত্রীর অর্দ্ধেক বৃত্তি চৌধুরাণী এবং অর্দ্ধেক রোজগারী গয়ালীর হইবে। কিছুদিন পরে এই বন্দোবস্ত থাকিল না, কারণ অপরাপর গয়ালীগণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন এবং চৌধুরী বংশে অপর কোন তেজস্বী লোক থাকিল না যিনি বাদসাহদত্ত নিজের স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন। চৌধুরাণী বংশের শেষ অধিকারিণী পূর্ণাচৌধুরাণী হইতেছেন। ইনি অপুত্রক পরলোকগমন করিলে, তাঁহার দৌহিত্র ননকুমৌয়ার তাঁহার গদীর অধিকারী হন। পূর্ণা চৌধুরাণীর মৃত্যুর পর তাঁহার নিকটস্থ আত্মীয়গণ সমুদয় "চৌধুরাইয়ানা" দখল করিয়া বসেন; নানকু বাবুর নিকট কোনরূপ কাগজপত্র ও সহায় সম্পত্তি ছিল না যে তিনি স্বীয় মাতামহের গদী উদ্ধার করেন। কোন উপায় না দেখিয়া তিনি গয়ার খ্যাতনামা ভূতপূর্ব্ব সরকার উকীল বাবু উমেশচন্দ্র সরকারের শরণ লইলেন। উমেশ বাবু অত্যন্ত কষ্ট ও অমানুষী পরিশ্রম করিয়া তাঁহার যাবতীয় কাগজ পত্র উদ্ধার করিয়া তাঁহার মকর্দ্দমা গয়া আদালতে রুজু করেন। ননকু মৌয়ার বাবু কিশন লাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা রুজু করিলে উমেশ বাবুর চেষ্টা এবং তদ্বিরে তিনি এই মোকর্দ্দমা জেলা হইতে বিলাত প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত লড়িয়া জয় করিয়া মাতামহের গদী উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মকর্দ্দমা জয়ের পর ননকু মৌয়ার পারিশ্রমিক লইয়া উমেশচন্দ্র বাবুর সহিত তঞ্চকতা করিয়াছিলেন। ননকু মৌয়ারের পুত্র কানাই লাল মৌয়ার বহু দেনা পত্র করেন এবং নাচ, গান, বেশ্যাদিতে বহু অর্থ নষ্ট করেন। তাঁহার মত বিলাসী গয়ালী কম দৃষ্ট হয়। তাঁহার দেনায় তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র শ্যামজী ও রামজী মৌয়ার তাহার সম্বন্ধে গয়ার অন্যতম বিশিষ্ট গয়ালী রায় বাহাদুর বলদেব লাল নাক্ ফোফোর সহিত বাঁকীপুর হাইকোর্টে মকর্দ্দমা লড়িতেছেন। মৌয়ার ভ্রাতাদ্বয় গয়ার অন্তর্গত মহল্লা বত্তপিণ্ডায় বাস করেন।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

বড়দিনের অবকাশে।'

বড় দিনের ছুটী উপলক্ষে কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৯২১ রবিবার বেলা ১০টার সময় ভারতের পুণ্য তীর্থ রাজপুতনার কয়েকটি স্থান পরিভ্রমণে বহির্গত হইলাম। "আমেদাবাদের কংগ্রেসের" জন্য গাড়ীতে বড়ই ভীড়; কোনরকমে আমরা একটী কামরায় উঠিলাম—দেখিতে দেখিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল—"বন্দেমাতরম্ ও গান্ধীমহারাজকী জয়" শব্দে ষ্টেশন মুখরিত হইতে লাগিল! গাড়ীর অধিকাংশ যাত্রীই আহমদাবাদের কংগ্রেসে যাইতেছেন। উহাদিগকে দেখিয়া মনে হইতেছিল কি যেন একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া উহারা পুণ্যতীর্থ "আমেদাবাদে" যাইতেছেন। প্রায় সকলের মুখেই 'স্বরাজ' ও স্বদেশী আন্দোলনের কথা। দেখিতে দেখিতে বাষ্পীয় যান দিল্লী আসিয়া উপস্থিত হইল।

জয়পুর যাইবার গাড়ী রাত্রি আটটার সময় সুতরাং আমরা আমাদের জিনিষগুলি রাখিতে জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে গেলাম। জিনিষগুলি রাখিয়া "চাঁদনীর" বাজারের দিকে পদব্রজেই রওনা হইলাম। 'চাঁদনীর বাজার' কলিকাতার বড়বাজারের ন্যায়—নানাবিধ রমণীয় দোকানে সুসজ্জিত! বাজার দিয়া আসিতে আসিতে দেখিলাম রাস্তার দুইধারের 'ফুটপাথে' দুইদল লোক 'খদ্দর' হাতে করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে "হিন্দুমুসলমান ভাঁইয়ো 'খদ্দর' খরিদো গাড়া পাহিনো—খদ্দর পহিনো। মনে মনে ভাবিলাম—ধন্য মহাত্মা গান্ধী তোমারি ভেরীতে আজ হিন্দুমুসলমান অনুপ্রাণিত!

চাঁদনীর বাজার দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র দিল্লীর ফোর্ট দেখাইবার জন্য আবদার ধরিল। দিল্লীর 'ফোর্ট' ও অন্যান্য স্থান অনেকবার আমি দেখিয়াছি, তবু নিত্যই তাহা নূতন বলিয়া মনে হয়! উহার "দেওয়ান আম" "দেওয়ান খাস্" ও "মতি মসজিদ্" দেখিলে যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখের উদয় হয়। মনে হয়,—ভারত, তুমি কি সেই ভারত যে ভারতের শিল্পীগণ এই কারুকার্য্য-খচিত হর্ম্ম্যগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিল!—এখন তোমার সে গৌরব কোথায় গেল?—কি পাপে তুমি এহেন সম্পদ হারাইয়াছ!

"ফোর্ট" দেখা শেষ করিয়া আমরা রাত্রির আহারের জন্য "পাঞ্জাব হিন্দু হোটেলে" উপস্থিত হইলাম—বন্ধুরা আমিষ ভোজন একরূপ মন্দ করিলেন না, কিন্তু আমি হোটেলের নিরামিষ খাদ্য কোনরূপে গলাধঃকরণ করিলাম, এরূপ "ঝালে পোড়া" খাদ্য আমি আর কোন দিন আহার করি নাই! যাহা হউক, আমরা জিনিষগুলি লইয়া ষ্টেশনে পুনরাগমন করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটার সময় গাড়ী জয়পুরে আসিয়া থামিল। অবশিষ্ট কয়েকঘণ্টা "ওয়েটিংরুমে" অপেক্ষা করিয়া প্রাতঃকালে ষ্টেশনের সন্নিকটে জয়পুর-মহারাজ কলেজের "প্রিন্সিপাল" শিক্ষাবিভাগের অধিনায়ক আমার বন্ধুবর মান্যবর শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায়, বিএ, এফ, আর্, এস্, এল, (লণ্ডন) মহোদয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা ও সৌজন্যে আমরা নিজেকে সৌভগ্যবান্ বলিয়া মনে করিলাম।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম্ভালাপের পর তিনি আমাকে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—মীরাট শাখার" কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—"দেখুন আপনি এখানে (জয়পুর) চলিয়া আসা অবধি সাহিত্য পরিষৎ বড়ই মন্থর গতিতে চলিতেছে।" তিনি বলিলেন কেন, আপনারা সকলে মিলিয়া মিশিয়া ইহাকে রক্ষা করিবেন, উহাকে প্রবাসী বাঙ্গালীর একটি কীর্ত্তি বলিয়া মনে করিতে হইবে।"

আমরা জলযোগ সমাপন করিয়া জয়পুর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম—গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বেই নবকৃষ্ণ বাবু আমায় একখানি পত্রও চাপ্রাসী দিয়া বলিলেন, জয়পুরে যাহা দেখিবার স্থান আছে সে তাহা দেখাইয়া দিবে; আর এই চিঠিখানি চাপ্রাসীকে দিয়া "রাজবাটি", হইতে 'আমের দুর্গ' দেখিবার জন্য 'পাশ' লইয়া যাইবেন।" জয়পুরের শোভা সমৃদ্ধি অতুলনীয়, এ স্থান পর্ব্বতবহুল ও অতীব রমণীয়! এখানকার রাস্তা ও সৌধ নিচয় এরূপ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ যে উহাকে আদর্শ মহানগরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই নগরে গ্যাসের আলোক আছে। আলোক লণ্ঠনের বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রত্যেকটির উপরেই এক একটি ময়ূর মূর্ত্তি বিরাজমান। ইহা নাকি জয় পুরের রাজ চিহ্ন। নগরের প্রায় অর্দ্ধেক স্থান লইয়া বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ বিরাজমান। ইহার 'দেওয়ান আম' দেওয়ান খাস' এবং নানান্ বৃক্ষলতাদি পরিশোভিত পুষ্পোদ্যান বড়ই রমণীয়, কিন্তু বাগানের একটি স্থান দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। শুনিলাম, রাজা এই স্থানের মধ্য দিয়া চলিয়া যান আর নর্ত্তকীবৃন্দ দুইধারে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে চলে! বর্ত্তমান বিংশশতাব্দীর মহালোকের যুগে এই বাদসাহী অনুকরণ কি আর শোভা পায়?

"গোবিন্দজীর মন্দির" রাজ বাটীতেই। মোগল সম্রাটের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই বিগ্রহ বৃন্দাবন হইতে আনীত হইয়াছিল! রাজ বাটীর মধ্যে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী বিদ্যমান উহাতে কয়েকটি বৃহৎ বৃহৎ কুম্ভীর আছে, খাদ্য দিলে উহারা উপরে আসিয়া খাদ্য খাইয়া যায়! দুইটি চাকর আমাদিগকে বলিল যে আপনারা উহাদের খাদ্যের জন্য [illegible] আনা পয়সা দিন এখুনি কুম্ভীরগণকে ডাকিয়া খাওয়াইয়া দিই। আমরা পয়সা দিলাম, উহারা মাংস আনিয়া কুম্ভীরগণকে ডাক দিল; আর অমনি সাত আটটী কুম্ভীর আসিয়া উহাদের নিকট হইতে মাংস খাইতে লাগিল! ভাবিলাম, এ হেন হিংস্র জন্তুও পোষ মানিয়াছে। হিংসা ত্যাগ করিয়া ভাল বাসিতে পারিলে সকলকেই বশীভূত করিতে পারা যায়।

যাহা হউক আমরা রাজপ্রাসাদ দেখা শেষ করিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ "আমের দুর্গ" দেখিতে গাড়ীতে উঠিলাম—আমের যাইবার পথে দুই পার্শ্বে প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। আমের দুর্গ পর্ব্বোতপরি সংস্থিত; আরাবলি পর্ব্বতের গিরি শ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া "আমের দুর্গের" উপরে উঠিলাম—দুর্গের মধ্যে "দেওয়ান আম" "দেওয়ান খাস্" "সীশ মহল" প্রভৃতি স্থান গুলি মোগল দিগের অনুকরণে রচিত। প্রাসাদের প্রায় সমুদয় অংশই শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। বঙ্গদেশ বিজয় করিয়া মহারাজ মানসিংহ "যে যশোরেশ্বরী" দেবীমূর্ত্তি লইয়া আসিয়াছিলেন তাহাও বিরাজমানা। দেবীর নিকটে একটি খড়্গ দেখিলাম। শুনিলাম ঐ খড়্গদ্বারা নিত্য একটি করিয়া অজমুণ্ড বলি দেওয়া

হয়! হায় বাঙ্গালা, নিরীহ জীবের প্রতি তোমার এই অমানুষিক অত্যাচার সুদূর রাজপুতানায়ও বর্ত্তমান !!

শুনিলাম, পূর্ব্বে মহারাজ এ দুর্গে মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিতেন। এখন দশবৎসর যাবৎ আর আসেন নাই। আরাবলি পর্ব্বতবেষ্টিত এই দুর্গম ও দুর্ভেদ্য দুর্গ দেখিয়া মনে হইল "ওহো কাল তুমি কি কুটিল! তোমার নিকট সকলেই পরাস্ত! এই আমের দুর্গ যাহা এক সময়ে মোগল সম্রাটের ও চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা জন মানব বিহীন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না!! হায় মান সিংহ! পাদ্‌শাহ আকবরের পক্ষ সমর্থন করিয়া কত নগর নগরী তুমি ধ্বংশ করিয়াছিলে —আর আজ তোমারই সাধের আমের দুর্গের এরূপ শোচনীয় অবস্থা! স্বদেশ ও স্বজাতিদ্রোহিতার ফল যে কিরূপ ভীষণ তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্যই কি আমের দুর্গ এই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে?

আমরা ক্ষুণ্ণ মনে সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এখানকার 'মহারাজ কলেজ' সংস্কৃত কলেজ 'ডাক্তারখানা' 'হাওয়াই মহল' 'কাউনসিল হাউস' প্রসিদ্ধ 'রামবাগস' ও 'আজবঘর' দেখিলাম। যখন রামবাগে প্রবেশ করি এই সময় মনে হইতেছিল, যেন আমরা স্বপ্নের দেশে প্রবেশ করিতেছি! ভারতের অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু "রামবাগের" ন্যায় পুষ্পোদ্যান আর দেখি নাই! সহর দেখিয়া মনে হইল যে মিউনিসিপ্যালিটির সুবন্দোবস্ত আছে। জয়পুরের বাড়ীগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে উহা প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং জানালাগুলি খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। সহর পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার সময় আমরা ফিরিয়া আসিয় নবকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় সমাপন করিয়া রাত্রি আট্টার গাড়ীতে আজমীঢ় রওনা হইলাম। নবকৃষ্ণ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার আদর যত্ন ও অভ্যর্থনা আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না!

আজমীঢ় রাত্রি ১২টার সময় পঁহুছিয়া আমরা শেঠদিগের হিন্দু হোটেলে আশ্রয় লইলাম। পরদিন প্রাতঃকালে হিন্দুর মহাতীর্থ পুস্কর রওনা হইলাম। আজমীঢ় হইতে পুষ্কর প্রায় ৭॥০ মাইল পথ। আরাবলী পর্ব্বতের মধ্য দিয়া যাতায়াতের পথ। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ রাজ প্রায় এক মাইল পাহাড় কাটিয়া নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে যাতায়াতের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। এ কারণ ইংরাজরাজ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র আমরা টঙ্গা করিয়া প্রায় দুই মাইল গিয়াছি এমন সময়ে ঘোড়া দুইটি বিগড়াইয়া গেল। সুতরাং বাধ্য হইয়া "টঙ্গা" ছাড়িয়া দিয়া আমরা পদব্রজেই এই পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম— কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! কোথাও অতি উচ্চ, কুত্রাপি বা অতি নিম্ন! কোন স্থানের গিরি কন্দর এত গভীর যে তাহা ধারণাই করা যায় না। কোথাও মৃণ্ময় প্রস্তর পুঞ্জ স্তূপাকার, আবার কোথাও কঠিন কৃষ্ণকায় প্রস্তর সমূহ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া যেন পথিকদিগের মনে ভীতি প্রদর্শন করিতেছে! কুত্রাপি বা উপত্যকা, কোথাও মনোহর অধিত্যকারাজী তদুপরি গো, গর্দ্দভ, মহিষ, হরিণ ও হনুমানগণ চরিয়া বেড়াইতেছে। এখানকার বন্য ময়ূরগণ নিঃশঙ্ক চিত্তে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে! কারণ কেহই উহাদিগকে হিংসা করে না। প্রায় দুই মাইল

পথ অতিক্রম করিয়া আমরা উপত্যকার ভিতর দিয়া সোজা রাস্তায় চলিতে লাগিলাম—, চতুর্দ্দিকেই সুন্দর প্রসারিত আরাবলী পর্ব্বত শ্রেণী, যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই পুষ্কর যাইতেছে! আমরা এই ভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে মহাতীর্থে উপনীত হইলাম। পুষ্করের শোভা বর্ণনা করা অসাধ্য!! এখানে একটি হ্রদ আছে এবং ইহাতে কয়েকটী বৃহৎ বৃহৎ কুম্ভীর ও বাস করে। যাঁহারা পুষ্করে যান তাঁহারা এই হ্রদেই স্নান করেন। জল বড়ই অপরিষ্কার, উহাতে স্নান করিতে আমার ন্যায় মহা পাপীরও প্রবৃত্তি হইল না; কিন্তু, কি করি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছি, শরীর ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্নান করিব বলিয়া স্থির করিলাম! প্রথমে, বন্ধুবর্গ স্নান করিলেন। পাণ্ডা মহাশয় 'স্নানের-মন্ত্র' পাঠ করাইলেন—আমি নিকটে দাঁড়াইয়া শ্রবণ করিতেছিলাম। পাণ্ডা মহাশয় এরূপ পণ্ডিত যে, "স্নানের মন্ত্র" পাঠ করাইতে গিয়া দুইটি ভুল করিয়া বসিলেন! অহো! কি অধঃপতন! ইহাদের হাতেই আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম! বন্ধুদের স্নান হইলে, আমি স্নানে নামিলাম, পাণ্ডা মহাশয়কে বলিলাম যে আমাকে মন্ত্রপাঠ করাইতে হইবে না, আমি নিজেই পাঠ করিতেছি। ইচ্ছা ছিল, মহাতীর্থ পুষ্করে পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষদিগের নামে ভক্তির ও শ্রদ্ধাঞ্জলির চিহ্ন স্বরূপ একটি পিণ্ডদান করি; কিন্তু, এরূপ মূর্খ পাণ্ডাদিগের দ্বারা কার্য্য করাইতে প্রবৃত্তি হইল না। প্রায় সকল তীর্থের পাণ্ডাদিগের এই দুর্দ্দশা অথচ ইহা সংস্কারের চেষ্টা সনাতনী হিন্দু ভ্রাতাদিগের নাই! এই সকল মূর্খ পাণ্ডাদিগকে শিক্ষা দীক্ষায় সমুন্নত করা কি হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দের কর্ত্তব্য নহে? আমরা স্নানান্তে কিছু জলযোগ করিয়া 'সাবিত্রী' দর্শনাভিলাষে বহির্গত হইলাম। "সাবিত্রী পাহাড়" পুষ্কর হইতে প্রায় ৩ মাইল পথ—।০ মাইল বালুকাময় পথ অতিকষ্টে অতিক্রম করিয়া আমরা সাবিত্রী পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম! প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল 'খাড়াই' উঠিয়া গলদ্‌বর্ম্ম হইতে হইতে উপরে উঠিলাম। সাবিত্রীদেবী দর্শন করিয়া, উপর হইতে পুষ্করের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে টঙ্গা আসিল। আমরা দুই ধারে পর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে আজমীঢ়ে ফিরিলাম। প্রায় সাড়ে পাঁচটায় আমরা আজমীঢ়ে 'পীরের দরগায়' উপস্থিত হইলাম। একজন প্রদর্শক আমাদিগকে লইয়া উহার অভ্যন্তরের স্থানগুলি দেখাইতে লাগিল—'গেটের' পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ কটাহ—শুনিলাম এই দুই কটাহে পর্ব্বদিনে সময়ে সময়ে অন্ন প্রস্তুত হয়। একটিতে ১২০ মণ আর একটিতে ৬০ মণ চাউলের অন্ন প্রস্তুত হয়!! লোকেরা উহা যথেচ্ছভাবে আহার করে। তৎপর "পীরের মসজিদের" নিকট উপনীত হইলাম। প্রদর্শক বলিল এখানে "পীরের সিন্নি" দিতে হইবে, উহা না দিলে মসজিদের ভিতর প্রবেশ করিতে পারা যাইবে না। কি করি অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাঁচ সিকার সিন্নি দিলাম। মস্‌জিদের মধ্যভাগ স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্য খচিত বহুমূল্য দ্রব্যে সুশোভিত। আমাদের ঠাকুরের মন্দিরের ন্যায় ধূপ, ধূনা, গুগ্‌গুল নানান্ পুষ্পসৌরভে ঘরটি আমোদিত ও সুবাসিত! বহুসংখ্যক মুসলমান করযোড়ে হাঁটু গাড়িয়া পীরের কবর স্থানটিতে প্রণাম করিতেছে। প্রদর্শক বলিল, "তোমরা এখানে হাঁটু গাড়িয়া উঁহাকে প্রণাম কর এবং কিছু "দর্শনী দাও, ইনি সাক্ষাৎ দেবতা! দেখিয়া

আমি 'হতভম্ব' হইয়া গেলাম !! ভাবিলাম "হে মহাত্মা মহম্মদ তুমি না একদিন পৌত্তলিকার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলে?—আর আজ তোমারি মসজিদে এ কি দেখিতেছি! ইহা কি পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় নহে? তোমার মসজিদের মধ্যে "দর্শনী" না দিয়া প্রবেশ করিতে পারা যায় না। জীবনে এই প্রথম দেখিলাম! হিন্দুর কালীঘাটে যেমন "দর্শনী" ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ এই পীরের 'দরগায়'ও সেই অবস্থা !! পরদিন প্রাতঃকালে আমরা আজমীঢ়ের অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণে বহির্গত হইলাম। আজমীঢ় ইংরাজের খাস দখলে। ইহা অতি সুরম্য নগর। নগরটিকে আরাবলী পর্ব্বতমালা যেন ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে পর্ব্বতোপরি মহারাজ পৃথিরাজের কেল্লা। স্বনাম ধন্য মহারাজ অজামীল এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা এবং মহারাজ পৃথিদেব এখানে বহুকাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। রামপুরের মুসলমান নবাব আড়াই দিন ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া ইহা হিন্দুদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এখানে মহাত্মা বাদসাহ আকবরের সময়ের বহু প্রস্তর নির্ম্মিত সৌধ বর্ত্তমান। তন্মধ্যে 'আনাসাগর' তীরবর্ত্তী 'বারদরিয়া' গৃহাবলী উল্লেখযোগ্য।

এখানকার "জৈন মন্দির" ও "রাজকুমার কলেজ" দেখিবার জিনিষ। "রাজকুমার কলেজ" শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত, এরূপ সুরম্য ভবন ভারতে অতি বিরল! শুনিয়া সুখী হইলাম যে "দেশীয় রাজ্যের" ন্যায় আজমীঢ়ে গো হত্যা হয় না। আমরা আজমীঢ় দেখিয়া ঐ দিবসেই রাত্রি দশটার ট্রেনে রাজপুতানার গৌরব—ভারতের গৌরব-'চিতোর গড়' যাত্রা করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা 'চিতোর গড়' ষ্টেশনে পহুছিলাম, ও নিকটস্থ একটি সরাইয়ে আশ্রয় লইলাম। সরাইয়ের মালিক রেলের সামান্য চাপরাসী মাত্র। শুনিলাম, ষ্টেশন হইতে তিন মাইল পথ যাইলে তবে আমরা চিতোর দুর্গ আরোহণ করিতে পারিব। চাপরাসী আমাদের সঙ্গে একটি লোক দিল। উহাকে লইয়া দুর্গের পথে চলিলাম। আরাবলী পর্ব্বতের একটি স্বতন্ত্র শাখার উপরে চিতোর দুর্গ বর্ত্তমান। একটি ক্ষুদ্র নদী উহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে আমরা ছয়টি সিংহদ্বার পার হইয়া প্রায় এক ঘণ্টা পরে দুর্গের উপরে উঠিলাম। উঠিয়াই পুণ্যতীর্থ চিতোরের ধূলিকণা মস্তকে ধারণ করিলাম। প্রথমেই অন্নপূর্ণার মন্দির দেখিয়া 'চারভূজ' (চতুর্ভুজ) দর্শন করিলাম। তৎপরে মীরাবাইয়ের নির্ম্মিত মন্দির ও তাহাতে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া "কালকা দেবীর" সমীপে উপনীত হইলাম। মূর্ত্তিটি শ্বেত প্রস্তরের, এই খানেই চিতোরের সহস্র সহস্র বীরগণ মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া মার চরণে পূজা দিতে আসিতেন। হায়! সেই একদিন আর এই একদিন! এখন মার সেই বীর পুত্রগণ চিরদিনের জন্য কাল কবলে কবলিত হইয়াছেন আর শক্তিরূপিণী মাও অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। এখন কেবল প্রস্তর মূর্ত্তি বিরাজমানা। তারপর, আমরা "কুম্ভরাণার স্তম্ভ" দর্শন করি; দিল্লীশ্বরকে উপর্য্যুপরি পরাজিত করিয়া ভারতভূষণ বীরেন্দ্রকেশরী কুম্ভরাণা এ স্তম্ভটি নির্ম্মাণ করেন। স্তম্ভটি নয়টি প্রকোষ্ঠ দ্বারায় নির্ম্মিত। স্তম্ভের গাত্রে দেব, দেবীর অসংখ্য মূর্ত্তি খোদিত; কিন্তু অধিকাংশ মূর্ত্তি বিকৃত অবস্থা, দেখিলেই মনে হয় দুষ্টেরা দুর্গজয়কালে ঐরূপ বিকৃত অবস্থা করিয়া

দিয়াছে। তৎপর, আমরা একটি পরম রমণীয় স্থানে উপস্থিত হইলাম স্থানটির নাম 'গোমুখী' —একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সরোবর—একটি নির্ঝর ধারা প্রবাহিত হইয়া সরোবরে পড়িতেছে। পূর্ব্বে আর একটি নির্ঝর ধারা ছিল তাহা এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্থানটী যেমন মনোহর তেমনি সুশীতল। রাজপুরী হইতে একটী গুপ্ত পথ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া এইখানে আসিয়াছে। রাজমহিষীরা এই সুরঙ্গ পথ দিয়া এখানে স্নান করিতে ও দেব দেবীর পূজা করিতে আসিতেন। শুনিলাম এই পথের সঙ্গে আর একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে; সেইখানে সহস্র সহস্র বীর রাজপুত রমণীরা তাঁহাদের অমূল্যনিধি সতীত্ব রক্ষার জন্য জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছেন! ভক্তিভরে ঐ স্থানটীর উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। এইবার আমরা ললনাকুল ললামভূতা আমাদের ভারত ললনার আদর্শ স্থানীয়া মাতা পদ্মিনীদেবীর আবাসস্থানে উপস্থিত হইলাম। যে সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব মাত্র দর্শন করিয়া দিল্লী উন্মত্ত হইয়া চিতোর ধ্বংশ করিয়াছিল এ সেই মার মন্দির! মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উহার ধূলিকণা মস্তকে ধারণ করিলাম। অট্টালিকাটী খুব বৃহৎ না হইলেও যেন ছবির মত; উহার শিরোদেশে চারিটি স্ফটীকের নক্ষত্র—সূর্য্য কিরণে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। শুনিলাম, ঐগুলি সতীত্বের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ! এই অট্টালিকার পার্শ্বে একটী সুন্দর সরোবর—মধ্যে একটি দ্বিতল গৃহ। এইখানেই পদ্মিনীদেবী ক্রীড়া করিতেন। চিতোর দুর্গ উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৩৷৷৹ মাইল দীর্ঘ এবং এক মাইল সমতল ভূমি; স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় রহিয়াছে। চিতোরের ধ্বংশাবশেষ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া ভাবিলাম—এই পূণ্য তীর্থ যদি ইংরাজ বা অন্য কোন পাশ্চাত্য জাতির হইত তাহা হইলে আজ এই ধ্বংশাবশেষের চিহ্নগুলি কিরূপ সুরক্ষিত থাকিতে দেখিলাম! যে চিতোরের রাণা প্রতাপসিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যতদিন না দিল্লী জয় করিয়া আবার চিতোর অধিকার করিতে পারেন ততদিন তৃণ ভিন্ন অন্য শয্যায় শয়ন করিবেন না, পত্র ভিন্ন অন্য কোন পাত্রে আহার করিবেন না, আজ তাঁহারই বংশ প্রসূত রাণাগণ জীবিত থাকিতেও চিতোর অরণ্যানীতে পরিণত—শৃগাল কুক্কুরের আবাসভূমি! পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিগুলি সযত্নে রক্ষা করিতেও ইহারা পরাঙ্মুখ! ধন্য দেশীয় রাজা! রাজপুতনার শেষ গৌরব ভারতের শেষ সূর্য্য চিতোর গড় দেখিয়া ভগ্নহৃদয়ে সেই দিবসেই আমরা মীরাটে ফিরিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

শ্রীললিতমোহন রায়।

মরণ-পুলক।*

মরণ তোর দুয়ারে এসে
　দিচ্ছে হানা,
ফুটবে আলো আঁধার শেষে
　যাচ্ছে জানা!

ওরে ও মন! নাচরে আজি
　পুলকে—
প্রাণের মেলা বসবে বুঝি
　দ্যুলোকে!

* কবিতাটি প্রেসে দেওয়ার পর কবি অকালে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

ধরার খেলা অনেক হ'ল
অনেক মতে,
দীর্ঘ-নিশা কাট্‌ল শুধু
অচিন্-পথে !
কোথায় ছায়া একটুখানি
জুড়া'তে,—
বিরাম কোথা একটুখানি
ঘুমা'তে !

বিরাট ছায়া আস্‌ছে নামি
আজকে অই,—
ইচ্ছা-সুখে ঘুমাবি তুই
নিঝুম হই' !

সকল দুখ-বিষাদ-ব্যথা
পাশরি'
বাজ্‌বে চিতে নব জীবন-
বাঁশরী !

মরণ-সুখে সুধীরে তুই
নাচ্ রে মন !
তরুণ ঊষা উঠ্‌ছে হাসি'
কর্ বরণ !
এবার নয় ছলনা শুধু
স্বপনে,—
অশ্রু যে গো শুকিয়ে এল
নয়নে !

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত

মহাভারত মঞ্জরী।

বনপর্ব্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও মহাত্মা বিদুর।

পাণ্ডবেরা* বনে গিয়াছেন, তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, সকলই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের হস্তগত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার প্রাণে শান্তি নাই, রজনীতে নিদ্রা নাই। শুধু ঐশ্বর্য্যই কি লোককে সুখী করিতে পারে? একদিন তিনি সভামধ্যে বিদুরকে বলিলেন, "তুমি মহাপ্রাজ্ঞ, যাহাতে কুরুপাণ্ডবের হিত হয়, তাহাই বল।"

বিদুর উত্তর করিলেন, "রাজন্, আপনি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হউন, লোভের বশবর্ত্তী হইবেন না। কারণ লোভ হইলে অতি বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধির লোপ হয়। পাণ্ডবদিগের রাজ্য ফিরাইয়া দিন, নচেৎ নিশ্চয়ই যুদ্ধ বাধিবে, নিশ্চয়ই কুরুকুল বিনষ্ট হইবে।

তাহা শুনিবামাত্র অন্ধরাজ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন "যাহাতে পাণ্ডবগণের হিত হয়, আর আমার অহিত হয়, তাহাই তুমি সর্ব্বদা বল। অসতী স্ত্রী যেমন বহু মান প্রাপ্ত হইলেও স্বামীর বশীভূত হয় না, তুমিও তেমনি আমার বশীভূত হইলে না। তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর, অথবা থাক, অথবা যেখানে ইচ্ছা গমন কর। আমি আর তোমার মুখ দেখিতে চাহি না।" এই বলিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। †

---

* বনপর্ব্ব ৪—৯।

† বনপর্ব্ব ৫ অধ্যায়।

বিদুর ভাবিলেন, আর এখানে থাকার আবশ্যক? দিন রাত যাহাদের হিতচিন্তা করি, তাহারাই আমাকে শত্রু ভাবে! হায়! কুরুকুল রক্ষা করা আমার সাধ্যাতীত! তিনি অনেক ভাবিয়া শেষে হস্তিনাপুর পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় যাইবেন? প্রথমে কাম্যকবনে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির মহা সমাদরে পিতৃব্যকে গ্রহণ করিলেন। বিদুর বলিলেন "আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে আসিয়াছি। শত্রুরা অশেষ দুঃখ দিলেও যিনি তাহা সহ্য করিয়া সুসময়ের অপেক্ষা করিতে পারেন, আর তাবৎকাল উপায় সংগ্রহ করেন, তিনিই স্বরাজ্য উদ্ধার করিতে পারেন। সহায় পাইলেই উপায় হয়, সহায় পাইলেই পৃথিবী অধিকার করা যায়। সহায়গণের সহিত সতত সত্য ব্যবহার করিবে, তাহাদের মঙ্গলকে নিজ মঙ্গল মনে করিবে। তাহাদের সহিত একই অন্ন ভোজন করিবে, একতায় সকল উপভোগ করিবে। তাহাদিগের নিকট কদাচ আত্মশ্লাঘা করিবে না। তাহা হইলেই তাহারা তোমার দুঃখের ভার বহন করিবে। মনে রাখিবে, ত্যাগী না হইলে, ক্ষতি স্বীকার না করিলে, একতায় আবদ্ধ হওয়া যায় না, সহায়ও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একতা না থাকিলে সহায় না পাইলে প্রবলের গ্রাস হইতে স্বরাজ্য উদ্ধার করা যায় না।"

রাজা যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য।"

এদিকে ধৃতরাষ্ট্র জানিতে পারিয়াছেন, বিদুর পাণ্ডবগণের নিকট গিয়াছেন। তাহাতে ভাবিলেন, বুদ্ধি যার বল তার, এখন আবার স্বয়ং বুদ্ধি সাক্ষাৎ বলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এখন উপায়? সমস্ত রজনী জাগিয়া কাটাইলেন, আর উপায় স্থির করিলেন।

প্রভাত হইয়াছে। কৌরবেরা সভায় গিয়া বসিয়াছেন। এমন সময় অন্ধরাজ সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া "হা বিদুর! হা বিদুর!" বলিতে বলিতে সভাতলে নিপতিত হইলেন। পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া সিংহাসনে গিয়া বসিলেন, আর অতি বিষাদে বলিতে লাগিলেন, "সঞ্জয়, সঞ্জয়, আমার ভ্রাতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে! তাহার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ, তাহার ন্যায় প্রাজ্ঞ, তাহার ন্যায় সুহৃদ্, তাহার ন্যায় ভাই, আর কোথায় পাইব? তাহার শোকে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। সে কখনও আমার অপ্রিয় আচরণ করে নাই, আমিই তাহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। তুমি শীঘ্র যাও, শীঘ্র তাহাকে লইয়া আইস। নতুবা আমি শোকে প্রাণত্যাগ করিব।" ‡

সঞ্জয় অবিলম্বে, রথারোহণে, অতি দ্রুতবেগে কাম্যকবনে উপনীত হইলেন। বিদুরকে বলিলেন, "তোমার দাদা তোমার শোকে প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

মহাত্মা বিদুর তখনই যাইতে উদ্যত হইলেন। পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় লইয়া হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। § বলিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি আসিয়াছ। আমি ক্রুদ্ধ হইয়া কটূক্তি করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর।" বিদুর উত্তর করিলেন "রাজন্,

---

‡ বনপর্ব্ব ৬ অধ্যায়।

§ বনপর্ব্ব ৬ অধ্যায়।

আপনি আমার পরমগুরু ও প্রতিপালক। আমি যখন পুনরায় আসিয়াছি, তখনই পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়াছি। আর তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। আমার নিকট আপনার পুত্রগণ যেরূপ, পঞ্চ পাণ্ডবও সেইরূপ। তবে পাণ্ডবেরা দুঃখ দুর্দ্দশায় নিপতিত, এই জন্যই আমার মন তাহাদের পক্ষপাতী।"

বিদুরের আগমনে দুর্য্যোধন চিন্তিত হইলেন। শকুনি বলিলেন "তোমার কোন চিন্তা নাই। পাণ্ডবেরা সত্যপরায়ণ। ত্রয়োদশবর্ষ অতীত না হইলে তাহারা কিছুতেই আসিবে না। এমন কি, তোমার পিতা তাহাদিগের রাজ্য তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেও তাহারা লইবে না।" *

তখন দুর্য্যোধনেরা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে পাণ্ডবেরা এখন মিত্রহীন, সহায় বিহীন, এই সময় তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অনায়াসে নিহত করিবেন। তদনুসারে দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি সকলে বহু রথে আরোহণ করিয়া পাণ্ডব বিনাশার্থ নির্গত হইলেন †। এমন সময় বেদব্যাস আসিলেন। তিনি সকলকে নিবারিত করিয়া কৌরব সভায় প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধরাজকে বলিলেন "কেন দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে সতত বিনষ্ট করিতে চায়? সে অতিশয় মন্দবুদ্ধি ও পাপাত্মা। তাহাকে তুমি নিবারণ কর। নতুবা পাণ্ডবগণকে বনে বিনষ্ট করিতে চাহিলে সে বিনষ্ট হইবে। বিশেষ আত্মদ্রোহ অতি গর্হিত, অধর্ম্মকর ও অযশস্কর।" ‡

অন্ধরাজ বলিলেন, "মহাত্মন্ আমি সকলই বুঝিতেছি। দুর্য্যোধন যে পাপাত্মা তাহাও জানি। কিন্তু কি করিব, পুত্রস্নেহবশতঃই আমি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। পুত্রস্নেহবশতঃই আমি তাহার অধীন হইয়া পড়িয়াছি। আমি অনুপায়।" ব্যাসদেব ক্ষুণ্নমনে প্রস্থান করিলেন। দুর্য্যোধন ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার পিতা ও পিতামহ ব্যাসদেব উভয়ই তাঁহার শত্রু।

এমন সময় মৈত্রেয় ঋষি আসিলেন। তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "তুমি পাণ্ডবগণের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহা দস্যুর আচরণ তুল্য।" পরে দুর্য্যোধনকে বলিলেন "তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি-সৌহার্দ্দ্যে আবদ্ধ হও তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে, কুরুকুলের মঙ্গল হইবে। কৃষ্ণ যাহাদের সহায়, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী যাহাদের আত্মীয়, তাহাদের সহিত কে যুদ্ধ করিতে পারে?" § ঋষিও অকৃতকার্য্য হইয়া প্রস্থান করিলেন। যে দুর্য্যোধনকে সৎ পরামর্শ দিতে লাগিল, তাহাকেই তিনি শত্রু বলিয়া স্থির করিতে লাগিলেন। আর যে কুপরামর্শ দিতে লাগিল, তাহাকেই তিনি পরম মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। হায়, এইরূপ বিপরীত বুদ্ধির জন্যই ত সুখের সংসার ছারখার হয়; বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়! প্রবল জাতি অধঃপাতে যায়! মোহই এই বিপরীত বুদ্ধির মূল।

---

* বনপর্ব্ব ৭—৮।
† বনপর্ব্ব ৭—২২।
‡ বনপর্ব্ব ৮ অধ্যায়।
§ বনপর্ব্ব ১০—২৬।২৭।
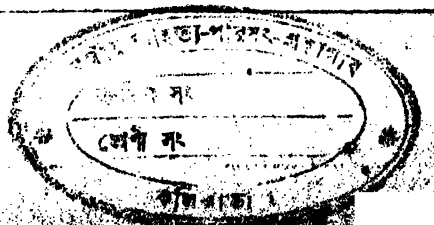
পাণ্ডবগণ বনবাসে গিয়াছেন শুনিয়া তাহাদিগকে দেখিবার জন্য কৃষ্ণ, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন কাম্যক বনে আসিয়াছেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "পাশাখেলা অতি অন্যায় কার্য্য। পাশাখেলা, রতি, মদ্যপান, দিবা নিদ্রা ও মৃগয়া পঞ্চ ব্যসন বা পতনের কারণ বলিয়া সতত নিন্দিত। সে সকলই পরিত্যজ্য। তবে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন আমরাই যুদ্ধ করিয়া পাপাত্মা দুর্য্যোধন ও তাহার সহকারী দিগকে নিহত করিব, আর আপনার সিংহাসন আপনাকে দিব।' *

ধর্ম্মরাজ উত্তর করিলেন, "ত্রয়োদশ বর্ষ পরে তোমরা সাহায্য করিও, এখন নহে। তাহার পূর্ব্বে আমি কোন মতেই রাজ্য গ্রহণ করিতে পারিব না। আমি যখন সত্য করিয়াছি যে দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিব ও আর এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিব, তখন সেই সত্য অবশ্য পালন করিব। † সত্য গেলে ধর্ম্মও যায়। বিশেষ যাহার কথার মূল্য নাই, তাহার নিজের মূল্য কি ?'

তৃতীয় অধ্যায়।

দ্রৌপদীর উদ্দীপনা।

একবনে অধিক দিন বাসকরা সুখকর নহে। বিশেষ তাহাতে সে বনের মৃগকুল একেবারে ধ্বংস হয়। এজন্য পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে লইয়া মনোহর দ্বৈতবনে আসিয়াছেন। তাহার মধ্যস্থলে বৃহৎ সরোবর। তাহার তীরে তপস্বী ও তপস্বিনী গণের আশ্রম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। পঞ্চপাণ্ডব ও বিদুষী দ্রৌপদী তাহাদের পর্ণ কুটীরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। পূর্ব্বে ভারতে বিদুষীর অভাব ছিল না।* কিছুকাল পরে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "রাজন্, তোমাকে একদিন রাজসভায় রত্নখচিত গজদন্তের সিংহাসনে দর্শন করিয়াছি, আর আজ এই বনে কুশাসনে দেখিতেছি। তোমার শরীর সতত চন্দন চর্চ্চিত থাকিত, আর আজ ধূলিধূসরিত দেখিতেছি। তোমার অনুজগণ কতসুখ ভোগ করিত, আর আজ এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাতে আমার পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তোমার কোমল হৃদয় কি দুঃখিত হইতেছেনা ? একটুকুও ক্রোধের উদয় হইতেছে না ? একদা মহাবল বলি তাঁহার পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ক্ষমা ও ক্রোধ প্রদর্শনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি ? প্রহ্লাদ উত্তর করিয়াছিলেন, 'সর্ব্বদা ক্ষমা করাও ভাল নহে, সর্ব্বদা ক্রোধ প্রদর্শনও উচিত নহে। যিনি সর্ব্বদা ক্ষমা করেন, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, শত্রু ও মিত্র, সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করে। দুষ্টেরা প্রশ্রয় পায়, শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। আবার যিনি সতত ক্রোধ প্রদর্শন করেন তিনি সতত ক্রোধের অধীন থাকেন, সতত কটুবাক্য বলেন, সকলের অবমাননা করেন। সকলেই তাঁহাকে ভৎর্সনা করে, অপমান করে। তিনি উপকারককে অসন্তুষ্ট করেন, মিত্রকে শত্রু করিয়া তুলেন, সকলেই তাঁহার অনিষ্টাচরণ করে। অতএব মনুষ্য সর্ব্বদা ক্রোধ করিবে না, সর্ব্বদা ক্ষমাও করিবে না। কখন্ ক্ষমা ও কখন্ তেজ প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহাও

---

* বনপর্ব্ব ১২—৩।৭ † বনপর্ব্ব ১২০ অধ্যায়।

* পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে 'স্ত্রীশিক্ষা' দ্রষ্টব্য।

বলিতেছি। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ফল হয় না। সে সকল পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়া, নিজের বলাবল বুঝিয়া ক্ষমা বা তেজ প্রকাশ করিবে। স্থল বিশেষে অপরাধীকেও লোকভয়ে ক্ষমা করিবে। পূর্ব্ব উপকারক পরে অনিষ্ট করিলে ক্ষমার পাত্র। সকলেরই প্রথম অপরাধ ক্ষমার যোগ্য। অজ্ঞান কৃত অপরাধ সতত ক্ষমা করিবে। এই সকলের বিপরীত স্থলে তেজ প্রকাশ করিবে। মুখে মধু কিন্তু হৃদয় কুটিল, এইরূপ মৃদু ব্যক্তিকে কদাচ ক্ষমা করিবে না। রাজন্, এই সকল সার কথা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? দুর্য্যোধনেরা সতত তোমাদের অনিষ্ট করিতেছে, সতত দুঃখ দিতেছে, সতত কত জ্ঞানকৃত অপরাধ করিতেছে, তথাপি তোমার ক্রোধের উদয় হইতেছে না?"

যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "দেবি, ক্রোধই মানুষের সর্ব্বপ্রধান শত্রু। ক্রোধই মানুষের সর্ব্বনাশ করে। লোকে ক্রুদ্ধ হইলে তাহার হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়। কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বিচার বুদ্ধি বিনষ্ট হয়, কার্য্যদক্ষতার শেষ হয়। ক্রোধী ব্যক্তি করিতে না পারে, এমন কোন কুকার্য্য নাই। বলিতে না পারে এমন কোন কুকথা নাই। সে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অপমান করে, গুরুজনকে নিহত করে। রাজা ক্রুদ্ধ হইলে তাহার অত্যাচারের সীমা থাকে না। শেষে সেই উৎপীড়ন বশতঃই প্রজাগণ একতায় আবদ্ধ হয়; একতাবদ্ধ হইয়া উত্থান করিয়া রাজার সর্ব্বনাশ করে। জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্ষমাশীল। যিনি বলবান ও ক্ষমতাশালী হইয়াও অপকারকের প্রতি কখনও ক্রোধ প্রকাশ করেন না, তিনিই বিজ্ঞ, আবার যিনি দুর্ব্বল ও ক্ষমতাহীন, তিনি নিজ মঙ্গলের জন্য ক্রোধকে অবশ্য দমন করিবেন। তেজস্বী পুরুষ কখনও ক্রোধের বশীভূত হন না। কেহ অনিষ্ট করিয়াছে বলিয়া যদি তাহার অনিষ্ট করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথম অনিষ্টকারী ব্যক্তি আবার নূতন অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। সে স্থলে তাহার প্রতি আবার নূতন প্রতিহিংসার প্রয়োজন হয়। এইরূপ হইলে হিংসা ও প্রতিহিংসা অবিরাম চলিতে থাকে। পৃথিবী বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে, জগতে ক্ষমা আছে বলিয়াই এত সৌহার্দ্দ্য, এত সখ্যতা। মহামুনি কাশ্যপের সুন্দর গাথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? 'যিনি ক্ষমাকে ধর্ম্ম, ক্ষমাকে যজ্ঞ, ক্ষমাকে বেদ বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনিই সকল সময়ে ক্ষমা করিতে সমর্থ। ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই তপস্যা, ক্ষমাই মঙ্গল, ক্ষমাই ব্রহ্ম, ক্ষমার জন্যই সংসার চলিতেছে।' ঋষিরা যে অনুপম গাথা গাহিয়া চিত্তসংযমে অভ্যস্ত হন, আমি সেই গাথা গান করিয়া কিরূপে ক্রোধকে প্রশ্রয় দিতে পারি? মিথ্যা অপেক্ষা সত্য, হিংসা অপেক্ষা অহিংসা, ক্রোধী অপেক্ষা অক্রোধী, অসহিষ্ণু অপেক্ষা সহিষ্ণু, মূর্খ অপেক্ষা পণ্ডিত চিরদিনই শ্রেষ্ঠ। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, ক্ষমা পরম বল।"

বিদুষী উত্তর করিলেন, "রাজন্, বিজ্ঞলোকে পুরুষকার দ্বারা স্বদেশের উদ্ধার সাধন করে। উদ্যোগ দ্বারা সকলেই অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়, বিপুল বিত্ত উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। দৈবের কোন ক্ষমতা নাই। কর্ম্ম না করিলে দৈব কিছুই দিতে পারে না। যদি বলা যায় যে মনুষ্যের কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতা নাই, সে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া নিরুপায় হইয়া সকল করে, তাহা হইলে ঈশ্বরই কার্য্যের ফলাফলের জন্য দায়ী হন, পাপ পুণ্যের ভাগী হন। মনুষ্য দায়িত্ববিহীন হইয়া পড়ে। যদি তাহা সত্য না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়,

মনুষ্য স্বাধীনভাবে কার্য্য করে ও কার্য্যের অনুরূপ ফলভোগ করে। তুমি কোন কার্য্য করিবে না, অলসভাবে বসিয়া থাকিবে, কিরূপে প্রবলের গ্রাস হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবে? চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা যে অসাধ্য সাধিত হয়, তাহা তুমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ। হায়, মনুষ্য কখনও নিজশক্তিতে বিশ্বাসবিহীন হইবে না। তবে যে চেষ্টা সত্ত্বেও সকল কার্য্যই সফল হয় না, তাহার কারণ আছে। বহু কারণের সমবায় হইলে তবে কর্ম্ম ফলপ্রদ হয়। ধীরভাবে, বুদ্ধি ও বল অনুসারে, দেশ কাল পাত্রের বিচার করিয়া, সামদান ভেদ দণ্ড এই নীতি অনুসারে পুরুষকার প্রয়োগ করিলে কেন না কার্য্য ফলবান হইবে? কেন না স্বদেশের উদ্ধার হইবে?

ভীমও অনেক বুঝাইলেন, তথাপি যুধিষ্ঠির বিচলিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "প্রতিপক্ষ প্রবল, আমরা দুর্ব্বল। কোন্ সময় প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের বিবাদ করা উচিত? যখন প্রবল বিপদাপন্ন বা আত্মদ্রোহ নিমগ্ন হয়। অথবা যখন দুর্ব্বল সহায় পায়, ধনবল ও জ্ঞানবলে বলীয়ান হয়। এখন এরূপ অবস্থা আসে নাই। সুতরাং এখনও আমাদের পুরুষকার প্রদর্শনের সময় উপস্থিত হয় নাই। দেখিতেছ না পিতামহ, আচার্য্য, কর্ণ প্রভৃতি প্রবল যোদ্ধাগণ সকলেই দুর্য্যোধনের পক্ষে? বিশেষ আমি কোন কারণেই সত্য ভঙ্গ করিতে পারিব না। কাজেই আমাদিগকে ত্রয়োদশ বর্ষ অপেক্ষা করিতে হইবে। •রাজ্য, পুত্র, যশ ও ঐশ্বর্য্য, এ সমস্তও সত্যের ষোড়শ অংশের একাংশেরও সমান নহে।•

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

ফুলের প্রতি মূল।

যবে তুমি বিকাশিবে পূর্ণ আঢ্য যৌবনের সুখে
ভর দিয়া বৃন্তের উপরে,
মনে রেখো, ছিলে তুমি সুপ্ত লুপ্ত আমারি এবুকে
মৃত্তিকার সূতিকার ঘরে॥

ফাটিল সে স্তব্ধ বুক, ফাটিল সে মৌন মূঢ় মাটি,
হল নব অঙ্কুর উদ্গম,
যোগাতে তাহারি রস আমাদের দিন গেল কাটি
আমাদের সার্থক জনম॥

• বনপর্ব্ব ৩৪—২২।

দিনে দিনে বাড়িল সে, কচি তার ডাল পালা মেলি
খুলি দিয়া পাতার বাহার,
আকাশের আলো খেয়ে, বাতাসের সাথে দোল 'খেলি
কাটি গেল কৈশোর তাহার॥

শেষে বিধাতার বরে, একদিন প্রসন্ন প্রভাতে,
পত্র ফুটে দেখা দিলে তুমি,
কৃতার্থ হলাম দোঁহে সেই তব আসন্ন শোভাতে
—জননী তোমার, জন্মভূমি॥

সমীরণ সখা এবে, দেবতার তুমি সহচরী,
মধুলোভে ফিরে মত্ত অলি,
নারীর স্বজাতি তুমি, স্থান তব তার শিরোপরি,
স্তুতি গান গাহিছে সকলি॥

তবু মনে রেখো তুমি, একদিন ম্লান সন্ধ্যাবেলা
দু'দিনের লীলা সাঙ্গ হ'লে,
ঝরিয়া পড়িবে পুনঃ, ছিন্নবৃন্ত, মলিন, একেলা,
দীন ধাত্রী ধরিত্রীর কোলে॥

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

নারীর কথা।*

আজকাল অনেকেই দেখ্‌ছি—মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখে, সভায় বক্তৃতা করে, ম্যাজিক আলোর ছবি দেখিয়ে, শিশু প্রদর্শনী করে মাদের মেয়েদের অজ্ঞান চক্ষে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা প্রয়োগ করবার চেষ্টা করে দেশের আর দশের হিত সাধনের জন্য স্থির সংকল্প হয়েছেন—বাস্তবিক এটা যে বড় আহ্লাদের বিষয় তা' আমরা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছি আর নিচ্ছি। আবার ঐ উদ্দেশ্যেই যেন দু'একখানা প্রসিদ্ধ 'মাসিকে' আলাদা করে নাম দিয়ে মেয়েদের বিভাগ নির্দ্দেশ করে দেওয়া হয়েছে, পাছে, সেটা কোন 'অ-নারী' পড়ে ফেলেন।

---

* লেখিকা যে প্রশ্নটী তুলিয়াছেন তাহা ভাবিবার বিষয়। সংসার ও সন্তান প্রতিপালন সম্বন্ধে আমাদের যে উদাসীনতা আছে তাহা নিবারণ করিতে হইলে কি পুরুষ কি স্ত্রী লোক সকলেরই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত। অর্দ্ধ শিক্ষা যে অনেক সময় ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয় যে লেখিকা একটা বিষয়ে ভুল করিয়াছেন। মহিলা মজলিস ও মাতৃমঙ্গলের প্রবর্ত্তকেরা পুরুষের দায়িত্ব কোথাও অস্বীকার করেন না। আমাদের দেশে পুরুষদিগের জানিবার অনেক ব্যবস্থা আছে কিন্তু অন্তঃপুরিকা নারীদিগের সেইরূপ শিক্ষার কোন প্রকার সুব্যবস্থা না থাকায় মাসিক পত্রিকাগুলি তাঁহাদের শিক্ষার একরূপ উপায় বলা যাইতে পারে। তাই, অন্ততঃ ইহাতে তাঁহারা যতটা জ্ঞান লাভ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ইহা করিয়া তাঁহারা সহৃদয়তারই পরিচয় দিয়াছেন। আর ইহাও বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না যে সাধারণ নারীদিগের শিক্ষা পুরুষদিগের অপেক্ষা কম এই জন্য তাঁহাদের শিক্ষার অতিরিক্ত কোন ব্যবস্থা করিলে অসঙ্গত হয় না। নঃ সঃ।

আমার মনে এই সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন জাগ্‌ছে, হয় ত সেটা নির্ভয়ে কর্‌লে কোন অপরাধ হবে না। এই যে 'মাতৃমঙ্গল' 'মহিলা মজলিস্‌' প্রভৃতি বিভাগীয় নামকরণ করা হয়েছে তার সঙ্গে 'পুরুষ-পারিষদ' 'জনক-কল্যাণ' নামে কোন বিভাগ কেন করা হয়নি? তাঁদের কি ও সব বিষয়ে শেখবার কিছু নেই? যত শিক্ষণীয় বিষয় আছে সবই কি মা'দের আর স্ত্রীদের ভাগে পড়ে? না জানার জন্য যত দোষ ঘটে তার জন্য লজ্জিত তাঁদেরই হতে হবে? আর ভবিষ্যতে যাতে সে সব না ঘটে সেটার জন্য অবহিত হতে হবে? এখনো কি সেই যুগ আছে যে যুগের সব বিষয়ের মূল কারণ নারী ছিল?

পুরুষের ভগবৎ সাধনার অক্ষমতার কারণ কি? 'নারী', পুরুষ কেন অলস? 'নারীর জন্য' পুরুষ কেন চঞ্চল? 'রমণীর জন্য', পুরুষ কেন স্বাস্থ্যহীন? 'স্ত্রীজাতির জন্য', দেশে কেন শিশু মৃত্যু? জননীদের জন্য', দেশে কেন অকাল মৃত্যু 'পত্নীদের জন্য', দেশ কেন বিলাসী 'রমণীর জন্য', দেশ কেন দুর্ব্বল? 'মেয়েদের জন্য', শেষটা দেশে কেন অসার সাহিত্য বাড়ছে, তাও সেই আমাদেরই জন্য!

ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছে গল্প শুনে শেষ হয়ে গেলে, "আমার কথাটি ফুরোলো নটে গাছটি মুড়োলো, কেনরে নটে মুড়োলি? রাখাল কেন জল দেয় না" ইত্যাদি করে শেষে আছে "কেনরে ছেলে কাঁদিস্‌? পিঁপড়ে কেন কামড়ায়? কেনরে পিঁপড়ে কামড়াস? কুটুস্‌ কুটুস্‌ কামড়াবো, গর্ত্তের মধ্যে সেঁদুবো" এই যে ছড়াটি শুন্‌তাম এর যেমন সব ঘটনার মূল কারণ ঐ পিঁপড়ে, এ দেশেও তেমনি সব ঘটনার মূল কারণ সকলেই প্রকারান্তরে আমাদের স্ত্রীজাতিকেই নির্দ্দেশ করেন। এখন তাঁদেরও যদি ঐ পিঁপড়ের মতন "বেশ্‌ করবো" ভাব হয় তা হলে হয় ভালো; কিন্তু তাঁদের এখনো অত ভরসা হয় নি। কাজেই সেটা কারুর মুখে শোনা যায় না। তবু মাঝে মাঝে দুঃসাহসিকতা করে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে দেশের অশিক্ষা, অসংযম, বিলাস, অকাল মৃত্যু ইত্যাদি সব বিষয়ের মূল কারণ কি বাস্তবিকই আমরা? আর যদিই আমরা হই (অবশ্য আমরা সেটা মান্‌তে প্রস্তুত হই) তা হলে কাদের দোষে সেটা ঘটেছে?

আমাদের বল্‌তে লজ্জা করে আর দুঃখও হয় যে পুরুষেরা এমন অদূর-দৃষ্টি সম্পন্ন, যে তাঁরা সব জিনিষের মূল কারণটা দেখতে পান না, (কিম্বা দেখতে চান না) অথচ প্রতিকার করতে চান। কিম্বা মূল বিষয়ের প্রতিকার করতে গেলে পাছে স্বার্থসিদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটে, বোধ হয় সেই ভয়ে তাকে এড়িয়ে চলেন! আমাদের বিশ্বাস, আসলে সকলেই জানেন প্রতিকারের জন্য কি করা উচিত, অথচ যে ঠিক নিয়মানুযায়ী কর্‌তে চান না, তার মানে তাঁরা তাঁদের অবাধ অত্যাচার বা যথেচ্ছাচারের পথ বন্ধ করতে চা'ন না।

এই সব জিনিষের প্রতিকার করতে গেলে মেয়েদের ভালো করে শিক্ষা পাওয়া দরকার; আর তাই করতে গেলেই বেশী বয়সে বিবাহ হবে; সে বয়সে বিবাহ হলে তাঁরা সন্তানের জননী হলে সন্তানও ঠিক প্রতিপালন করতে পারবেন; আর লজ্জার কথা, পুরুষের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে দিতে পারবেন। কেন না মা'রা জানে, অজানে 'যেন তেন প্রকারেন' তার

কর্ত্তব্য করে থাকেন, কিন্তু পিতারা কতখানি পিতার কর্ত্তব্য পালন করেন? অবশ্য কেউ মনে করবেন না আমি সকলকে বল্‌ছি।

যখন অপরিণত বুদ্ধি ও দেহ নিয়ে একটা ১৩।১৪ বছরের মেয়ে প্রথম 'মা' হয়, আর পর পর বহু সন্তানের জননী হয়; তার স্বাস্থ্য, তার সন্তানগুলির স্বাস্থ্য কি রকম ভাবে আছে, গড়ে উঠছে, ছেলেমেয়েগুলির বুদ্ধি, চরিত্র, শিক্ষা যা কিছু সবই কি মা'র কর্ত্তব্যের ভাগে পড়ে? সবই কি মহিলা মজলিস্ মাতৃমঙ্গল দ্বারা প্রতিকৃত হবে? এর জন্যে কোথাও পিতার কর্ত্তব্য নেই? আমরা বাস্তব জগতে যা' দেখতে পাই (মাসিকপত্রের পাতায় বা সভায় নয়) তা'তে ধনীরা স্বাস্থ্যহীনা প্রসূতিদের ডাক্তার দেখিয়ে, আর শিশুগুলিকে দাসদাসীর হাতে সমর্পণ করে ও স্কুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কর্ত্তব্যের শেষ করেন, মধ্যবিত্তেরা ঐ একটু কমজমে করেন, দরিদ্রের কথা ত কারুর অবিদিত নেই। অথচ এঁরা যে শিক্ষিত ন'ন, তা' নয়। অনেকেই বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাধিধারী, বিদ্বান ত বল্‌তেই হবে। এই সব অপকার থেকে উদ্ধার পাবার মত বিদ্যা বুদ্ধি প্রায় এঁদের সকলেরই আছে, অন্ততঃ থাকা ত উচিত, অনেকে চিকিৎসকও! কিন্তু এঁরা এই সমস্ত দোষই আমদের প্রতি আরোপ করেন, আর প্রতিকারের জন্যে ওজন করে, মেপে, হিসাব করে, আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চান!

সব বিষয়েরই ক্ষতি বা অনিষ্ট হওয়ার মূল কারণ, সে বিষয়ে অজ্ঞতা। যে অজ্ঞ হবে সে ভুল করবেই, ফলে অনিষ্ট হবেই। এর প্রতিকার হচ্ছে সেই বিষয়টী ভালো করে জানা; এ' নয়, যে, প্রতিকারের নিয়ম অভ্যাস করা! কিন্তু এদেশের অভিভাবক বা আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তাদের এমন লেখাপড়া আতঙ্ক আছে, যাকে আমরা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েরা ও কুসংস্কার বল্‌তে পারি। তাঁরা এমনি অবিশ্বাসী ও দুর্ব্বলচিত্ত যে পাছে বাইরের খবর মেয়েদের কানে প্রবেশ করে, পাছে তারা দেখতে পায় যে অন্য দেশের মেয়েরা শুধু কর্ত্তব্য দিয়ে গঠিত দেহবিশিষ্ট জীব মাত্র নয়, কতকগুলো মানুষোচিত বৃত্তিও তাদের আছে, যা'তে তারা কর্ত্তব্য করছে স্বাভাবিক ভাবে, অভ্যাসগত ভাবে নয়; তাই শিশুপ্রদর্শনী, ম্যাজিক আলো বক্তৃতা ও মাতৃমঙ্গল মহিলা-মজলিস্ প্রভৃতি দেখিয়ে শুনিয়ে পড়িয়ে পুরো শিক্ষা না দিয়ে আংশিকভাবে শিক্ষা দিতে চা'ন।

এটা যে কালে আমাদের অসংখ্য কুসংস্কারের আর গোটাকতক সংখ্যা না বাড়াবে তারই বা কি ঠিক? কোন জিনিষ গোড়া থেকে না শিখিয়ে শুধু অভ্যাস করলে যে কি দোষ হয় তা কি এখনও কারুর হৃদয়ঙ্গম হয় নি? আমাদের 'হাঁচি, টিক্‌টিকি, শুচিতা যাত্রা, অযাত্রা, আঁতুড় ঘর, নজর লাগা, মাদুলী, তাগা, ভাদ্র, চৈত্র, পৌষ এমন কি সমুদ্র যাত্রা সব জিনিষের মূলেই কি অভ্যাস নেই?

এই শিশু প্রদর্শনী দেখে বা ছবি দেখে সাধারণ মেয়েরা কি মন্তব্য বা অভিমত দেয় তাকি পুরুষেরা জানেন? সেবার দিল্লীতে শিশু প্রদর্শনীর পর জন কয়েক হিন্দুস্থানী ভদ্র মহিলা বলেছিলেন যে ঐ রকম লোমের জামা আর এনামেলের বাটী, খাট, বিছানা, কম্বল, তোয়ালে, ফিডিং বটল পেলে তাঁরাও ছেলেকে মানুষ করতে ভাল করেই পারেন, পরিষ্কার

রাখাও পারেন; তাঁদের ত মেয়েদের মতন ও সব নেই তাঁরা আর মিছামিছি তবে ওসব দেখে কি করবেন। তাঁরা এটা কেউ বুঝতেই পারেন নি, স্বাস্থ্যের জন্যই পরিচ্ছন্নতা দরকার, আর তা কাঁসার বাটী ও ছেঁড়া নেকড়াতেও রাখা যায়। আর মজা হচ্ছে এই পুরুষেরা রোগ কোথায় জেনেও প্রতিকার করতে সাহস করেন না, আমাদের চোখ ফোটার ভয়ে! কিন্তু এত আড়াল করেও কি তাঁরা সফল হয়েছেন ?

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা-পদ্ধতি।

তৃতীয় প্রস্তাব।

আমরা বিগত কয়েকটি প্রস্তাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপদ্ধতির যে বিবরণ প্রদান করিয়াছি, তাহা হইতে পাঠক দেখিতে পাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশের মত একটা প্রকাণ্ড দেশের ছাত্রবর্গের শিক্ষণীয় প্রায় তাবৎ প্রয়োজনীয় বিষয়েরই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে কোনটিই পরিত্যাগ করা যায় না। পরিত্যাগ করিলেই শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আমরা, যে যে বিষয় নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রায় তাবৎ বিষয়েরই, সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি। একটা এত বড় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়কে Teaching University রূপে পরিণত করিতে হইলেই, শিক্ষণীয় বিষয়ের বাহুল্য অনিবার্য্য হইয়া পড়িবেই। কিন্তু এই বিষয় বাহুল্য দর্শনে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে দোষারোপ করিতে ক্রটি করিতেছেন না। তাঁহারা বলিতেছেন যে, এত বিষয় বাহুল্য করিতে গেলেই, ব্যয় বাহুল্য ও সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এত অর্থ পাইবে কোথা হইতে ? তাঁহারা বলিতেছেন এই যে, অর্থ সংস্থানের দিকে দৃষ্টি না দিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ, নিতান্ত অদূরদর্শীর মত, শিক্ষণীয় বিষয় গুলির বাহুল্য প্রবর্ত্তিত করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় টীকে 'দেউলিয়া' অবস্থায় উপনীত করিয়াছেন। এই সেদিন ও শিক্ষা সচিব স্বয়ংও বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত এই বিষয় বাহুল্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়া, ইহাকে "Thoughtless expansion" আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন! কিন্তু এই প্রকার দোষারোপ কতদূর সঙ্গত, আমরা এস্থলে সর্ব্বপ্রথমে সেইটাই বিশ্লেষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি এবং পাঠকবর্গ ও বঙ্গদেশীয় অভিভাবক বর্গের দৃষ্টি আমরা দুইটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি আকর্ষিত করিতে চাই।

প্রথম কথা এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষণীয় বিষয় গুলির বাহুল্য সম্পাদন করিয়া ব্যয়-বাহুল্য ঘটাইয়াছেন কি না? আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্ট হইতেই দেখিতে পাইতেছি যে, এই সকল বিষয়ের শিক্ষা দিবার ভার বিশ্ববিদ্যালয় আপন হস্তে লওয়ায়, তাহার জন্য বার্ষিক

কিঞ্চিদধিক পাঁচ লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় করিতে হইতেছে। কিন্তু, আমরা সসম্ভ্রমে বাঙ্গলাদেশের অভিভাবক বর্গকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, প্রকৃতই কি এই পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় বড়ই অমার্জ্জনীয় অপরাধ করা হইতেছে? এত বড় একটা প্রকাণ্ড মহাদেশের অগণিত অধিবাসীর বিদ্যাগ্রহণেচ্ছু ছাত্রবর্গের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ও বিধানের জন্য, এই পাঁচ লক্ষ টাকা কি বড়ই অধিক ব্যয় বলিয়া প্রকৃতই বিবেচিত হইবার যোগ্য? এই প্রকাণ্ড মহাদেশের গভর্ণমেণ্ট কি এ দেশবাসী ছাত্রবর্গের উন্নত শিক্ষার নিমিত্ত বৎসরে পাঁচটী লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে অসমর্থ? ইউরোপের কোন সভ্য প্রদেশের কোন গভর্ণমেণ্টকেই ত তত্তদ্দেশবাসীর শিক্ষা সৌকয্যার্থ এতৎ পরিমিত অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায় না।

তবে বাঙ্গলাদেশের সুসভ্য, শিক্ষা-গৌরব-কারী গভর্ণমেণ্টই বা এই স্বল্প পরিমিত ব্যয় করিতে কেন কাতরতা প্রকাশ করিবেন? আমরা একথাটা আদৌ বুঝিয়া উঠিতে পারি না। নব প্রতিষ্ঠিত "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়", কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায়, সীমায় ও সংখ্যায় নিতান্তই নগণ্য।

কিন্তু তথাপি সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গভর্ণমেণ্ট বার্ষিক সাত লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র বঙ্গদেশের ন্যায় একটা প্রকাণ্ড মহাদেশের অগণিত অধিবাসীর ছাত্রবর্গের শিক্ষা বিধান করিতে গিয়া, গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একরূপ কিছুই সাহায্য পাইতেছে না, ইহা কি নিতান্তই বিস্ময়জনক নহে? অথচ, আমরা, পুলিশ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টকে মুক্ত হস্তে যদৃচ্ছারূপে ব্যয় করিতে অকুণ্ঠিত চিত্ত দেখিতে পাইতেছি! দেশবাসীর শিক্ষা-বিধানের জন্য গভর্ণমেণ্টের স্কন্ধে যে গুরুতর দায়িত্ব অর্পিত রহিয়াছে, সেই দায়িত্ব গভর্ণমেণ্ট কি এই প্রকারেই উদ্‌যাপিত করিতে প্রকৃতই অধিকারী? আমরা সবিনয়ে গভর্ণমেণ্টকেই এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। যে শিক্ষা-সচিবের মুক্ত-হস্ত হইতে, ঢাকার জন্য সাত লক্ষ টাকা ব্যয় অনায়াসে বাহির হইল, সেই শিক্ষাসচিব কোন্ প্রকার কর্ত্তব্যের বলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একরূপ কিছুমাত্র সাহায্য না করিয়াই, "thoughtless expansion" বলিয়া অভিযোগ করিতে উদ্যত হইলেন, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।* আমরা আর একটা কথা ও বাঙ্গলাদেশের অভিভাবক বর্গকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এই মহাদেশে একরূপ অগণিত অর্থ-শালী ভাগ্যবান্ পুরুষ রহিয়াছেন। ইঁহারা বৎসরে এরূপ কত পাঁচলক্ষ টাকা নিতান্ত তুচ্ছ বিলাস বিষয়ে অকাতরে ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু এই যে তাঁহাদেরই দেশে, তাঁহাদেরই দ্বারের নিকটে তাঁহাদেরই দেশবাসী বিদ্যা-লাভার্থী অসংখ্য ছাত্রবর্গের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় করিয়া দিয়া, অর্থ সাহায্যের আশায় দণ্ডায়মান হইয়াছেন; কিন্তু হায়! আজ পর্য্যন্ত কয়টি অর্থশালী ধনী সন্তান, ইউরোপের ন্যায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া—অযাচিত ভাবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসারিত হস্তে অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন? ইচ্ছা করিলে

---

* অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে ব্যয় নূতন বজেটে নির্দ্দেশিত করিয়াছেন, সে গুলিকে শিক্ষাসচিব কেন Thoughtless expansion বলিতেছেন না? এই সকল বিষয়ে ব্যয়বাহুল্য ঘটানের জন্যই ত গভর্ণমেণ্ট দেউলিয়া হইয়াছেন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন!!!

এবং স্বদেশ-প্রেম প্রকৃতই থাকিলে, এত দিন কত ধনী সন্তানকে আমরা এই মহোচ্চ সাধু কার্য্যের জন্য অগ্রসর দেখিতে পাইতাম! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে যে গুরু ভার গভর্ণমেন্ট এবং দেশের লোক ন্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই গুরু-ভার বিশ্ববিদ্যালয় উত্তমরূপে উদ্‌যাপিত করিয়াছেন। যে সকল বিষয়-বিশেষে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা না করিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে এবং ভারতের অগৌরব হয়, সেই সকল বিষয়ের সর্ব্বতোমুখী শিক্ষাদানের যথাযথ ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় করিয়া দিয়াছেন। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে যথাযোগ্য অধ্যাপক লইয়া আসিয়া, অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর বেতন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত অধ্যাপকগণের বেতনের তুলনায়) দিয়া, তাঁহাদিগকে বিবিধ বিষয়ে শিক্ষাদান ব্রতে নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হইবে যে,—বিশ্ববিদ্যালয়কে Teaching University রূপে পরিণত করিবার জন্য, দেশের লোক ও গভর্ণমেন্ট যে ভার দিয়াছিলেন;—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সার্ আশুতোষের একনিষ্ঠ অধ্যবসায় ও কার্য্যকুশলতার বলে, সেই গুরু-ভার উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত করিয়াছেন। Teaching University হইতে গেলেই অর্থ ব্যয় ত হইবেই; ইহা ত একরূপ জানা কথাই। সুতরাং বার্ষিক পাঁচ ছয় লক্ষ অর্থের প্রয়োজন পড়িতেছে দেখিয়া, এখন চমকিত হইয়া উঠিলে চলিবে কেন? যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় কেবল মাত্র ছাত্রবর্গের পরীক্ষা গ্রহণ কার্য্যেই ব্যাপৃত ছিলেন, সে সময়ে আমরা দেশব্যাপী আন্দোলন শুনিতে পাইতাম যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গদেশের ছাত্রবর্গের শিক্ষার ভার না লইয়া, কেবল পরীক্ষামাত্র লইয়াই, আপন কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন! কিন্তু এখন যদি সেই শিক্ষাদানরূপ মহাব্রত উদ্‌যাপন করিবার উদ্যোগ বিশ্ববিদ্যালয় করিতে সমুদ্যত হইলেন, তাহাতে যখনই বার্ষিক অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা উপস্থিত হইল,—অমনি চারি দিক্ হইতে এই প্রকার রব উত্থিত হইল যে—'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের অযথা বাহুল্য ঘটাইয়া অর্থব্যয়ের 'আদ্যশ্রাদ্ধ' করিতেছেন' !!!

এখন আমরা আমাদের দেশবাসীর নিকটে আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্যটী উত্থাপিত করিতে চাই। বক্তব্যটী এই যে—প্রকৃতই কি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষণীয় বিষয়গুলির অযথা বাহুল্য ঘটাইয়াছেন?

আমাদের ধারণা এই যে, যে সকল চিন্তাশীল পাঠক আমাদের পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রথম দুইটী প্রস্তাব মনঃসংযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই একথা স্বীকার করিবেন যে, শিক্ষণীয় বিষয়ের অযথা বাহুল্য একেবারেই করা হয় নাই। যাহা না হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়কে Teaching Uuiversity বলা সঙ্গত হইতে পারে না; যাহা না হইলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, কেবল তাদৃশ বিষয়েই শিক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে আমরা আর একটী বিষয়ের দিকে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষিত করিতে চাই। তাঁহাদিগকে এই কথাটীও বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এটী ভাবিলে বিষয় বাহুল্যের কথা আদৌ উত্থিত হইতে পারিবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কে না জানেন যে, ভারতবর্ষ অন্য দেশের মত নহে। ইহা মহা প্রাচীন দেশ এবং ইহার প্রাচীন সভ্যতা বিবিধ দিগন্তমুখিনী ছিল। এক ভারতেরই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপে যে সকল বিবিধমুখী বিষয় রহিয়াছে, কেবল সেইগুলির মোটামুটী জ্ঞান লাভ করিতে গেলেই

কতগুলি বিষয় বিভাগের আবশ্যক হয়! অন্যান্য নবীন দেশের ন্যায়, ভারতবর্ষ নহে। এই মহাদেশের লিপি-বিদ্যা, মুদ্রা-বিদ্যা, স্থপত্য বিদ্যা; ইহার ভৌগলিক-সন্নিবেশ বিদ্যা, শিল্প-বিদ্যা, কলা বিদ্যা; ইহার প্রশস্তি বিদ্যা, অর্থ-নীতি, রাজ-নীতি; ইহার ইতিহাস, সাহিত্য, নাটক; ইহার গণিত, জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা—প্রভৃতির কথা চিন্তা করিয়া দেখুন্। এক একটী বিষয়—এক একটী বৃহৎ বিভাগ। ইহার এক দর্শন-শাস্ত্রের কথাটীও ভাবিয়া দেখুন্ ত। এক একটী দর্শন এক একটী প্রকাণ্ড বিভাগ। কাহাকে ছাঁটিয়া কাহাকে রাখিবেন? অন্য দেশের মত, এই মহাদেশের কথা ভাবিলে চলিবে না। এই মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতা ও বিবিধ বিষয়ক চিন্তা স্রোতের প্রণালীর কথা বিবেচনা করিতে গেলেই, নানামুখী বিষয় বিভাগ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। বরং এই কথা ভাবিয়াই আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেমন সুন্দর কৌশলে অতি সংক্ষেপে বিষয় নির্ব্বাচনের কৃতিত্ব দেখাইয়া, আবশ্যকীয় তাবৎ শিক্ষনীয় বিষয়ই গুছাইয়া দিতে পারিয়াছেন। ইহা দেখিয়াও যাঁহারা অযথা বিষয় বাহুল্যের কথা পাড়িয়া, বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষ দেন, তাঁহারা নিতান্তই অযথা দোষের আরোপ করেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিয়া প্রস্তাব বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। শিক্ষনীয় বিষয়-গুলির আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি, তাহা যাঁহারা পড়িয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদিগের সঙ্গে একমত না হইয়া পারিবেন না যে, বিষয় নির্ব্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয় কোন প্রকারেই বিবেচনার অভাব বা বিচার বুদ্ধির অভাব দেখান নাই। আবশ্যকীয় ব্যয় দেখিয়াই আজ এই বিষয় বাহুল্যের কথাটা উঠিয়াছে *। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে Teaching University হইতে হইবে, অথচ এক পয়সাও যেন ব্যয় না হয়—এ প্রকার অসাধ্য সাধনের আশা কি কখন সম্ভবপর হয়?

"গুরুকুল", "ঋষিকুল"—প্রভৃতিতে যাহা এখনও সম্ভবপর হয় নাই; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগটীতে তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল। ভারতের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্য্যন্ত যাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা রচিত হইয়াছিল। অথচ এই শিক্ষা নিতান্তই 'স্বদেশী' বিষয়-বহুল করিয়া, একেবারে পূর্ব্বপুরুষানুমোদিত প্রণালীরই কতকটা ছাঁচে ঢালিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়োপযোগী শিক্ষার সহিত, ভারতীয় প্রাচীন বিদ্যাগুলির সহিত পরিচিত হইবার সর্ব্বপ্রকার সুযোগের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই শিক্ষা-বিতানটীকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ইহার ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, কেবল মাত্র আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ এতাদৃশ বিপুল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটী উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে! উচ্চশিক্ষার দিকে গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্যই ইহার একটী প্রধান কারণ। আর একটী কারণ—আমাদের দেশবাসীর শিক্ষা বিষয়ে উদাসীনতা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপ বিপুল উদ্যমে এবং একনিষ্ঠ যত্নে এই মহোপকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটী পূর্ণ-কলেবর করিয়া তুলিতেছিলেন—তদ্বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টিহীনতা! এই প্রতিষ্ঠানটী অর্থাভাবে একবার ভাঙ্গিয়া

* গবর্ণমেণ্ট নিজে 'দেউলিয়া' হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়াও, আজ এই বিষয় বাহুল্যের কথাটা উঠিয়াছে।

পড়িলে, আর ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে গড়িয়া তোলা কদাপি সম্ভব হইবে না! একবার ইহা ভাঙ্গিয়া পড়িলে, শিক্ষা-সচিবের শত কথাতেও ইহা পুনর্নির্ম্মিত হইয়া উঠিবে না? তাই বলিতে ছিলাম যে, বাঙ্গলা দেশের দ্বারদেশে, এই বিপুল দেশের ছাত্রবর্গের উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযোগী এই শিক্ষা-পদ্ধতিটী অর্থাভাবে নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; ইহাতে গভর্ণমেণ্টের সুনাম হইবে না। শিক্ষা-সচিবের প্রথমবৎসরের কার্য্য-ভার গ্রহণের মুখেই যদি এই বিপুল প্রতিষ্ঠানটী, তাঁহারই অবহেলায়, তাঁহারই সম্মুখে, বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্দ্বারা তাঁহারও যশ কীর্ত্তিত হইবে না! তাই বলি, এখনও সময় আছে। অর্থ-সাহায্য পাইলে এখনও এই প্রতিষ্ঠানটী দেশের গৌরব ও সম্মান রক্ষা করিতে পারে। এ সম্বন্ধে আমাদের আরো কয়েকটী কথা বলিবার আছে। তাহা বারান্তরে বলিব।

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

পোলাও।

দশম উচ্ছ্বাস।

ছায়া হইতেছে দীর্ঘ শরীর দুর্ব্বল
স্থবিরতা বেড়িয়াছে জীবনের মূল
শ্লথ গ্রন্থী শিথিল ধমনী অবসাদে
কোথা শক্তি এস নেমে কিছুদিন তরে
উদ্যমে প্রবুদ্ধ করি রাখ রাখ দেবি,
ফুকারি উঠুক আজ হৃদয় বাঁশরী।
Kartophilos ওই দেখ নির্ম্মম হইয়া
যীশুরে আমার করে দারুণ প্রহার।
জগতে শান্তির রাজ্য করিতে স্থাপন
যে তেজস্বী নরসিংহ মহাসাধনায়
সিদ্ধকাম হয়েছেন; তাঁরি বুকে আজ
নিষ্ঠুরতা করিতেছে বাণ প্রক্ষেপণ।
মনুষ্যের শক্তি আভিজাত্যের গরিমা
চূর্ণীকৃত একদিন হইবে নিশ্চয়।
ভগবান করেছেন সত্যেরে সুন্দর,
ভগবান করেছেন ন্যায়েরে অটুট।
মঙ্গলময়ের রাজ্য হইবে মধুর
অত্যাচার উৎপীড়ন পালাইবে দূর।
বিদেশের হাতে লাঞ্ছিত হতেছে দেশ
জন্মজাত অধিকার ভারতের নাই—
কোটি কোটি নরনারী—হয়েছে ভিক্ষুক
শ্রীমন্তেরা তোষামোদ কণ্ঠে বাঁধিয়াছে,
পদসেবা জীবনের হইয়াছে সার।
ভারতের অন্তরীক্ষে ভ্রূকুটি সদাই
repression সাথে লয়ে রহিছে অটল,
সত্য সহ সাহচর্য্য করেছি বর্জ্জন
সত্য আসে বুকে তার করি পদাঘাত
পদাঘাত করে যথা নির্ম্মম সার্জ্জেণ্ট
শান্তি সেনানীর বক্ষে প্রভুত্বে মাতিয়া।
ভারতের সিংহাসনে সমাসীন বীর

ঘোষিছেন চণ্ডনীতি রণরঙ্গে মাতি—
Englandএর prestige করিতে রক্ষণ
একশত চুয়াল্লিস—বৈদ্যুতিক পট—
গ্রামে গ্রামে জনপদে হয়েছে দোদুল
একশত চব্বিশেতে ঐ পট খানি
কে বলিবে পরিবর্ত্ত না হবে অচিরে।
শিরায় শিরায় দাসত্বের নির্ম্মম গরল
প্রবাহিত কার নাহি হইতেছে আজ ?
স্বাধীনতা সাধনার পূত পীঠস্থান
ইংলণ্ডের কদ্রবপু, জনশক্তি সেথা
John এর মুকুট হতে লয়েছিল কাড়ি'
প্রজাসত্ব, প্রজার অবাধ অধিকার।
ভারতের জনশক্তি চাহে নাক magna carta
বিধাতার রাজ্য মধ্যে চায় তারা শুধু
বাধাশূন্য নৈসর্গিক বসন্ত-বর্দ্ধন
মানুষের কাছে চায় মানুষের দাওয়া
আত্মসম্মানের দেহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে
ভারতের নব-শক্তি করিছে হুঙ্কার।
চায় ইহা জড়বাদী জগতের বুকে
তপোবন সমুত্থিত ভূমা হর্ষ রাশি
ঢেলে দিয়া সুশীতল করিতে ধরণী।
পতঙ্গের পক্ষচ্ছেদি নিষ্ঠুর যেমন
উড্ডীন প্রয়াস তা'র ব্যর্থতায় ভগ্ন
নিরখিয়া মনে মনে হেসে সুখী হয়
সেইরূপ অলোলুপ শান্তি সেনা দলে
বদ্ধ করি কারাগারে শাসকের বল
মহানন্দ উপভোগ করিতেছে মনে।
গরিষ্ঠ বিধান মান শৃঙ্খলার হায়
রক্ষণ করিতে আজ ন্যায়-রস-পায়ী
মহামতি রেডিং এর হৃদয় চঞ্চল।
ভারতের শান্তি সেনা চায়না রুধির
প্রেম দিয়ে চায় এরা কিনিতে উৎকট
করাল দানব শক্তি পাশব পিপাসা
মনুষ্যত্ব দেব ভাবে সতত উঙ্কিত।

হায় ইংলণ্ড দেবভূমি, তোমার উদার
ন্যায়বাদী ভারতের বুরক্রেশী দলে
কেন ঠাঁই দিয়াছিলে কলঙ্ক কিনিতে—
এ যে বিধাতার রাজ্য যিনি পরাৎপর
যাঁর চক্ষে ধূলি দিতে নন্দনেরা তোর
কত যত্ন করিতেছে। পৃথিবীর কাছে
ন্যায়ের কনক তুলা ধারণ করিয়া
ঘোষিছে মা উচ্চকণ্ঠে কাঁপায়ে ভুবন
'বিধির বিধান হতে ইংলণ্ড বিধান
উচ্চ যদি নাহি হয়—সমান সমান।'
পশ্চিমের প্রাণ নাই নাহিক শ্রবণ
বুভুক্ষিত স্বার্থতার চায় উপভোগ
পীড়ন যে করে তার হৃদয় ছাড়িয়া
মনুষ্যত্ব কোন দূরে যায় পালাইয়া।
একে একে নিভিছে অম্বরে নভঃশোভা
শালিপিষ্ট সম দীপ্ত নক্ষত্র নিকর।
সেবকের শ্যাম * আজ কারার গুহায়
প্রভাত কি হবে নাকো স্বপনের মাঝে ?
শুনি সদা সিংহনাদ শার্দ্দূল গর্জ্জন।
করি নাকো রাজ্য লোভ, হে ক্ষাত্রইংরাজ,
রোষোন্মেষ চিত্তে তব প্রাচ্য শান্তিরাশি
ঢেলে দিয়ে ঋষিকল্প করিতে তোমায়
ভারতের বীরগণ উঠেছেন জাগি।
তব রুষ্ট নেত্র মাঝে দেখিবারে পাই
সেই মূর্ত্তি, যে সময় কাননে কাননে
রঙ মেখে নগ্নভাবে করিতে অটতি
বাহ্য সভ্যতার ধার ধারি না আমরা
আধ্যাত্মিকঅমরতা উপলব্ধি করি
সারাৎসারে পেতে প্রাণ সতত আকুল,
আত্মশুদ্ধি আত্মজয় মুক্তির কারণ।
পশ্চিম কি সে শুচিতা করিবে গ্রহণ ?
পুলিশ আকাশে কভু উঠে নাই চাঁদ
উজ্জ্বল নক্ষত্র কভু দেয় নাই দেখা

* শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী।

আজ ঐ নভোপরে অভিনব শশী
আনন্দে ভরিতে মন হল সমাসীন।
শরতের চাঁদ হারায়েছে কান্তি তার
হে তেজস্বি পূর্ণচন্দ্র তোমার আলোকে
শত সহকর্ম্মি চিত্ত উঠিবে ফুটিয়া।
দেশের গৌরব বৃন্দ প্রফুল্ল ও আজ
গ্রামে গ্রামে চরকার গুণ বাখানিয়া
গান্ধীজির শিববাক্য করিছে ঘোষণা,
A day, an hour of virtuous liberty
Is worth a whole eternity of bondage
স্নেহে ধন্য আছিলাম সুরেন্দ্র তোমার
সিসিরোর কণ্ঠ হারী বাগ্মী শির শোভা!
আত্মহত্যা মহাপাপ এ কথা জানিয়া
কেন ভদ্র হেন কার্য্য করিলে সাধন ?
আজ তুমি রোটারীর ভূষিত ভবনে
তাহাদেরই সঙ্গে রঙ্গে ভুঞ্জিছ হরষ
উদ্দাম যৌবনে যারা তোমা সর্প ভাবি
ভস্ম করে দিয়েছিল পীন কটিখানি
সেই আঘাতেতে তুমি বিক্ষুব্ধ হইয়া
সিন্ধু গরজন করি উঠেছিলে বলি'
Lo in liberty's unclouded blaze
We lift our heads, be what it may
আশার সহস্রদীপ একটী ফুৎকারে
নির্ব্বাপিত করেছিল বল দেখি কারা ?
দিবসের ছাদ ভরা সুখের আলোক
ক্ষমতার ব্যগ্রগতি উদগ্র প্রভুত্বে
দল বেঁধে লয়েছিল কারা বল কাড়ি ?
মনে হয় সেইদিন গোরাগত প্রাণ
পরম বৈষ্ণব সাধু শিশিরকুমার
তোমাতরে জান নাকি কাঁপায়ে কানন
কাঁপায়ে নিখিল বঙ্গ তুলেছিল রোল
গঙ্গা গোবিন্দের তেজ ফুটুক তোমাতে
Repression tank ঐ চালাইছে Jehu
বুক দিয়ে আরও তুমি ঠেলে দেও সখা
চণ্ডনীতি সদা প্রসূ নিমেষে নিমেষে
বিদ্রোহ প্রসব করে কেনা জানে উহা ?
(হে সচিব) ম্যালেরিয়া পুতনার বালকৃষ্ণ তুমি
দেখিতেছ জনসিন্ধু সদা অচঞ্চল
প্রতিহিংসা পোড়ায়েছে ভালবাসা দিয়া
প্রাচী নহে রুধিরের উদ্দাম পিপাসু
এ যে তপস্বীর গেহ ঐ দেখ দূরে
মহা সাধনায়, ত্রাতা সিদ্ধি লাভ করি
করিছেন জনস্থানে পীযূষ প্রদান।
কোথা হতে এল বল নির্ম্মম অভাব
তোমার এ নিদারুণ স্বর্ণে পিপাসা
দেশ্যু দৈন্য নিষ্পেষিত করিছে কাঙ্গালী
শাসকের শুষ্ক চক্ষু সাহারা হৃদয়।

***

ছিল না সংযম তাই সহস্র যুবক
ভেবেছিল গুপ্ত হত্যা প্রাণের উপায়
তাই তারা বিপ্লবের জ্বালিয়া আগুন
ক্ষমতার তীব্রানলে মরেছিল পুড়ি।
এ জগতে বীর ব'লে কারে আখ্যা দেও
নিষ্ঠুরতা দিয়ে গড়া ঐ যে জেঙ্কিন্স
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী পতিত কাইজার
বীর যদি হ'ন ভবে অবীর কে তবে ?
হে সুরেন্দ্র সেই দিন মনে কিহে হয়
শালগ্রাম শিলামান অক্ষুন্ন রাখিতে
জষ্টিস নরিস মুখে দেখেছিলে তুমি
নির্দ্দয়তা ভরা সেই জেফিরির ছবি!
সুহৃদ অম্বিকা কুঞ্জ ঐ ফরিদপুর
গ্রাজুয়েট তুমি ভদ্র, দেখহ নিতম্ব
বেতের আঘাতে উহা জর্জ্জরিত কি না ?
ভারত আপন ধৈর্য্য কাঙ্গাল সন্তানে
দান করেছেন, তাই শত অপমানে
ধৈর্য্যচ্যুত কোন দিন হইবে না এরা
তুমি মাতৃহীন দাদা আমি ওগো তাই
চেয়ে দেখ ঐ মূর্ত্তি নারীর গৌরব
যার চক্ষে জ্বল জ্বল জ্বলিছে অনল
যার বপু হতে ঝরে মর্য্যাদার ধারা
যার প্রাণ বিমণ্ডিত অটুট বিশ্বাসে
ধর্ম্মের রাখিতে মান যে মহিলা আজ
যুগল তনয়ে দেয় সিংহের কবলে
ওই ওই ওই দেবী ওই দেবতায়
মা বলে বারেক ডাক প্রাণের সুরেন
দূরে যাবে দুখ, হবে উজ্জ্বল সুন্দর।
নির্জ্জনে বসিয়া আমি উদ্দেশে দেবীরে
মা, মা, মা, মা, ডাকি কতবার
যতবার ডাকি প্রাণে নব বল আসি
আমার প্রাণেরে করে তারুণ্য প্রদান
ওই কেশরিণী দুগ্ধে পুষ্ট যে শাবক
তার বীর্য্য দেখিলে কি দাদাটী আমার

Prestige prestige how many crimes
Are committed in thy name ?
নূতন আদেশ বহি নব বুদ্ধদেব
মুক্তির বারতা আজ এনেছেন হেথা
নবীভূত হয়ে বিশ্ব উঠিছে হাসিয়া
প্রদোষে উষার রাগ আকাশের গায়।
নিষ্ঠুরতা কেশরীর ক্ষুধা হলে দূর
শান্তির হৃদয়ে সে গো পড়িবে ঢলিয়া।
বিশ্ব হ'তে মনুষ্যত্ব গিয়াছে যে দূরে
অবীচির অধিপতি Molach. mamon
অধিকার করিয়াছে নিখিল জগৎ
অদিতির সনে আজি দিতির আহব
এ আহবে রক্ত নাই প্রাণীর নিধন
নাহি দ্বেষ, প্রতিহিংসা। আছে প্রেমদান
দৈত্যকে অমৃত দানে করিছেন দেব
ভারতের নবীভূত দ্রোণাচার্য্য বীর
সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া দৈন্য বিনয় বৈষ্ণব
ধরেছেন স্বর্গচিত্তে জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতি
ঐ জ্যোতি কাঙ্গালের ক্ষুধা কেড়ে লয়
শিশুদের বুকে ঢালে সরলতারাশি
জাগাইয়া তোলে প্রাণ মাতৃমমতায়
সত্যের হোমাগ্নি শিখা চিত্তমাঝে জাগে
আজ বঙ্গ কবিকুঞ্জে উদ্দীপনা নাই
সেফালি কর্ণিকা রসে সিক্ত সিচয়ায় *
প্রসাধিতা প্রমোদায় গীতিতে বসিয়া
"কিরণ" উজ্জ্বল রসে দিতেছে সাঁতার
মরালের কলধ্বনি করিয়া শ্রবণ
মনে ভাবে প্রেয়সীর যাবক রঞ্জিত
কঞ্জ চরণের হবে নূপুর নিক্কণ।
সূক্ষ্মদর্শী প্রিয়ভাষী ঠাকুর সুধীন
তালীবন অন্তরালে শেলী ও কীট্‌সের
অপরূপ সমবায় নিরীক্ষণ করি
বুকে নিয়ে করুণার আবিষ্কার কথা
জানাইল গৌড় জনে, সেইদিন হতে
হর্ষে মকরন্দ ধারা এই গৌড়বাসী
পান করি চরিতার্থ হয়েছিল সব।
এই আদরের কবি আমার করুণা
প্রকৃতির রস পায়ী সোহাগের নিধি

* বস্ত্র।

আজ কিনা শুভ্র পদ্ম তড়াগে নামিয়া
পরাগে মাখিয়া হাত আহরণ করি
য়ুনিভার্সিটির যিনি বিধাতাপুরুষ
বিধাতার বলে যিনি Equityর রাজা
অমিত বিক্রমশালী তেজস্বী পুরুষ
সেই আশুতোষে অর্ঘ্য করিছেন দান।
হোথায় রাজেন্দ্র দেব ললাটে যাহার
ভাগ্য দেবী দিয়াছেন প্রাচুর্য্যের টীপ
ঐ বসে কালিদাস কাব্য কামধেনু
ঐ বসে রসময় রসিক প্রবর
ওকে ওকে ঐ বুঝি জীবেন্দ্রকুমার
আরও কত পাত্র মিত্র রয়েছেন বসি
হায় সখি কেমনে বর্ণিব এ সভা গৌরব।
ইচ্ছা করে তোষামোদ হাঁড়ি বেঁধে গলে
অমন মরীচি মাখা ভাগ্য সরোবরে
ঝাঁপ দিয়ে দৈন্য হাত লভি পরিত্রাণ।
শুভক্ষণ উপস্থিত মুক্তি সন্নিকট
বাঙ্গালার কবিবৃন্দ হায়রে কপাল
প্রোষিতার মনোভাব মনের আকুতি
চাঁদের শীতল বুকে আছে যেন লেখা
নিথর নয়নে তাই শশী পানে চেয়ে
সুধার আখরে লেখা প্রিয়ার মানস
বিরহ বেদনা রেখা করি অধ্যয়ন
মন্ত্রীভূত করিছেন সন্তাপ অনল।
বাঙ্গালার কবিকুঞ্জে নাহি কি "রসেন"
উদ্দীপনা অগ্নি জ্বালি দেশে জ্বালে আলো
শিখির অটল কবি "সত্যেন" সুন্দর
পল্লবিত বাক্ অট "চটুল কুমুদ"
উচ্ছ্বসিত রশ্মি সুধী সুধীর কুমার
লাবণ্য স্ফুরিত ভাব মধুর সুরেশ *
এত কবি কাব্যে কেন উদ্দীপনা নাই ?
নব্যভারতের কবি প্রাণের গোবিন্দ
তাঁরে স্মরি আজ আঁখি আসিছে ভিজিয়ে
'স্বদেশ স্বদেশ করিস্ তোরা এ দেশ তোদের নয়'
নিশীথে মানস পাখী ওই গীত খানি
ভারতের আকাশেতে কেঁদে কেঁদে গায়।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

* উদীয়মান কবি। ইহার প্রতি প্রবন্ধই লাবণ্য মাখা—লেখক।

সঙ্গণিকা।

বৎসর শেষ হইতে চলিল। বৎসরটা যেন সর্ব্বরকমেই দুর্ব্বৎসর। দেশের প্রায় সব নেতাই কারাগারে। মহাত্মা গান্ধী এতদিন বাহিরে ছিলেন। এবার তিনিও ধৃত হইয়াছেন। রাজদ্রোহিতার অপরাধে তাঁহার ছয় বৎসর বিনাশ্রমে কারাবাসের হুকুম হইয়াছে। যে অপরাধে তাঁহাকে ধরা হইয়াছে সম্প্রতি তাহার কোন নূতন কারণ উপস্থিত হয় নাই বা বাড়িয়া। যায় নাই বরং কমিয়া গিয়াছিল। কেন না বরদোলি সিদ্ধান্তের পর তিনি তাহার ব্যাপক ভাবে আইন অমান্য করার সমস্ত সংকল্প ও ব্যবস্থা উঠাইয়া শান্তির প্রচারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই সময় কেন যে তাঁহাকে ধরা হইল কেহ তাহার কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

মহাত্মা গান্ধী প্রতিক্ষণই জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া বা প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে ইহা কষ্টকর হয় নাই। তাঁহার বিরোধী ইংরাজ সংবাদপত্রগুলিও তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র ও ব্যবহার সম্বন্ধে নির্দ্দোষ ও একান্ত খাঁটি বলিয়া প্রশংসা করিতে বিরত হয় নাই এবং এই সময়ে তাঁহাকে ধরিবার কোন কারণ তাহারাও বুঝিতেছেন না বলিয়া ও এ সময় ধরাটা সমীচীন হয় নাই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক আইনের বিচারে তাঁহার অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে। তিনি বিচারকালে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, আইনের চক্ষে তিনি দোষী কিন্তু মুক্তি পাইলে আবারও তিনি এইরূপ অপরাধ করিবেন। কারণ মানুষের স্বাধীনতাকে যে সব আইন খর্ব্ব করিয়াছে সেই সকল আইনকে অমান্য করিতে শিক্ষা দেওয়া তিনি তাঁহার ব্রত বলিয়া মনে করেন তাই তাহা অমান্য করিতে তিনি কুণ্ঠিত নহেন। এবং এই সকল আইনের প্রতি তাঁহার কোন প্রীতি নাই কাজেই এইগুলির প্রতি অপ্রীতি জাগাইতে তিনি সর্ব্বদাই প্রয়াস পান। সুতরাং বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের প্রতি অপ্রীতি জাগাইতে চেষ্টা করার অভিযোগ তিনি সত্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং তজ্জন্য রাজ নিগ্রহ অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিতেও তিনি স্বীকৃত আছেন। এই স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিচারক মহাত্মাকে ৬ বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক রেভারেণ্ড হোমস্ বলেন যে, আমি যখন রোঁলার কথা স্মরণ করি তখন আমার ঋষি টলষ্টয়ের কথা মনে পড়ে, লেনিনের কথা যখন মনে করি তখন নেপোলিয়নের কথা মনে পড়ে কিন্তু যখন মহাত্মা গান্ধীর কথা মনে করি যীশু খ্রীষ্টের কথা মনে পড়ে। যীশুর মতনই এই মহাত্মা জগতের মঙ্গলের জন্য আত্মদান করিয়াছেন। কর্ম্মক্ষমতা ও ভাবুকতার এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় জগতে আর বড় দেখা যায় না। গান্ধীই বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ।" মহাত্মার কর্ম্মপদ্ধতির সহিত সকলের মতের মিল না হইতে পারে; অনেকে তাহার প্রতিবাদও করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার জীবনের মহত্বের কথা তাঁহার বিরোধীরা ও অস্বীকার করেন না। তাঁহার বিচার ফল বাহির হইবার দিন একজন রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত ইউরোপীয় মহিলা (nun) তাঁহার অল্প বয়স্ক বাঙ্গালী ছাত্রীকে অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন গান্ধীর কোন খবর তাহারা জানে কি না? তিনি তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে "Do you know anything about Mr. Gandhi? I am very anxious about him; he is a very good man. I like him very much. He cannot do wrong and I hope he will be set free." তাঁহার খবরের জন্য আমি খুব উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি। তিনি অতি মহৎ লোক আমি তাঁহাকে খুব পছন্দ করি। তিনি অন্যায় করিতে পারেন আমি মনে করি না। আশা করি তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এই সামান্য কথাটা উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার

ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর সকল লোকের কতখানি শ্রদ্ধা আছে ইহাতে বুঝা যায়।

মহাত্মাগান্ধীর বিচার করিতে গিয়া বিচারক বলিয়াছেন "Nevertheless it will be impossible to ignore the fact that you are in a different category form any person I have ever tried or am ever likely to have to try. Also it would be impossible to ignore the fact that in the eyes of millions of your countrymen you are a great patriot and a great leader or that even those who differ from you in politics look up to you as a man of high ideals and leading a noble and even a saintly life. "আমি জীবনে যত লোকের বিচার করিয়াছি বা পরে করিব আপনি তাহাদের সকলের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধাতুর (শ্রেণীর) লোক। এবং ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব যে আপনি আপনার দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের চক্ষে খুব বড় একজন নেতা ও দেশহিতৈষী এমন কি যাহারা রাজনীতিতে আপনার সঙ্গে একমত নহেন তাঁহারা ও আপনাকে খুব উচ্চদরের মনোভাব সম্পন্ন লোক এবং আপনারা জীবনকে মহৎ এমন কি সাধুর জীবন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।" এবং আরও বলিয়াছেন যে লোকমান্য তিলকের প্রতি যে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল তাহার অনুসরণে যদিও এই গুরুদণ্ডে তাঁহাকে দণ্ডিত করা হইল তথাপি দেশের অবস্থা অনুরূপ হইলে শাস্তির মেয়াদ ফুরাইবার পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতে পারে। এবং তাহা হইলে তিনি (বিচারক) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী হইবেন।

কিন্তু আমলাতন্ত্রের শাসন পদ্ধতির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যে আইন কানুনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা যন্ত্রের মত চলে, ব্যক্তি বিশেষের জন্য তাহার ব্যতিক্রম হয় না। কর্ম্মের ফল দেখিয়া কর্ম্মকর্ত্তার বিচার করাই তাহার রীতি। কর্ম্মকর্ত্তার শুভ আকাঙ্ক্ষার কোনও মূল্য তাহার নিকটে নাই। কর্ম্মফল যদি আমলাতন্ত্রের মতের অনুকূল না হয় তাহা হইলে আইনের উদ্যত প্রহরণ তাহাকে আঘাত করিবেই।

তাঁহাকে ধৃত করিলে পর দেশবাসীর কি করা উচিত হইবে তাহা মহাত্মাগান্ধী প্রায় একমাস পূর্ব্বে বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ ভাবে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন কার্য্যক্ষেত্র হইতে অন্তরালে থাকিবেন তখনও যদি জনসাধারণ অহিংসভাবে অসহযোগ আন্দোলন চালাইতে পারে তবেই তাহাদের অহিংসভাব শিক্ষা হইয়াছে কি না বুঝা যাইবে। তাঁহাকে একজন ভগবান বা ভগবানের অবতার ভাবিয়া তাঁহার কথা পালন করিলে তাহার সার্থকতা হইবে না। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতেও যদি তাহা পালন করিতে পারা যায় তবেই তাহা জীবন গত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইবে ও জীবন গত হইলেই তাহার সার্থকতা হইবে।

বরদোলি সিদ্ধান্তের পর ব্যাপকভাবে আইন অমান্য ব্যাপার তুলিয়া লওয়াতে কেহ কেহ তাঁহার উপর দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যেরূপ সত্যনিষ্ঠা ও খাঁটি জীবন যাপন প্রণালী, আমরা যদি প্রত্যেকে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রতি খুঁটিনাটিতে সেইরূপ খাঁটি হইয়া চলিতে পারি তবে আমরা যে তাঁহার প্রদর্শিত স্বরাজ লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারিব তাহা স্বতঃই মনে হয়।

অনেকে মনে করেন তিনি স্বরাজ যতটা চাহিয়াছেন তাহা অপেক্ষা পৃথিবীতে সত্য ও শান্তি স্থাপন বেশী ভাবে চাহিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা অপেক্ষা সত্য তাঁহার নিকট বেশী বড়। তাঁহার মত মহাত্মার ইহাই শোভা পায়। এ কথা না বলিয়া, যে ভাবেই হউক দেশের স্বাধীনতাই মাত্র আমাদের প্রার্থনীয় সামগ্রী, ইহা বলিলে তাঁহার উপযুক্ত

কথা হইত না। আজ যে শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে, জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে সম্মান দিতেছে ও শ্রদ্ধা প্রকাশ (প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে) করিতেছে ইহা তাঁহার সত্যানুরাগ ও সত্য-জীবনের জন্যই নহে কি? যাঁহার ব্যক্তিগত জীবন খাঁটি তাঁহার অন্য সব দিকের জীবন ও যে খাঁটিই হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না অকৃত্রিমতাই তাঁহার ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিগত জীবন খাঁটি না হইলে বেশী দিন লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকা সম্ভবপর নয় একদিন না একদিন উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমরা প্রত্যেকে যদি এইরূপ ভাবে সকল বিষয়ে সকল রকমে ও সকলের সম্বন্ধে খাঁটি হইতে পারি আমাদের উন্নতিতে বাধা দিবে সাধ্য কার?

* * * *

মিঃ মণ্টেগুর পদত্যাগ। বিগত যুদ্ধের পরে ফ্রান্সে যে সন্ধিপত্র হইয়াছিল তাহাতে তুরস্কের প্রতি অত্যন্ত অবিচার হইয়াছিল এবং মুসলমানদের খলিফা, তুরস্কের সুলতানের ক্ষমতা কার্য্যশক্তি ইত্যাদি কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাতে ভারতবর্ষের মুসলমানেরা অসন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। ভারতগবর্ণমেণ্ট বোধ হয় শান্তিস্থাপনে খানিক প্রয়াসী হইয়া) মুসলমান দিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ও ভারত সচিবের সম্মতি লইয়া ইংরাজ মন্ত্রিসভাকে ঐ সন্ধির বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুমতি না লইয়া এই বিষয় প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা তাঁহার পদত্যাগের উপলক্ষ্য বা মুখ্য কারণ হইলেও গৌণ কারণ আরও আছে। উদারনৈতিক দল, যাহাতে পার্লেমেণ্টে প্রভুত্ব করিতে না পান রক্ষণশীল দলের দিক হইতে তাহার খুব চেষ্টা হইতেছিল। লয়েডজর্জ্জ রক্ষণশীল দলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন বোধ হয়। এবং মণ্টেগুর কার্য্যাবলী রক্ষণশীল দলের মনঃপূত ছিল না। শোনা যায় মহাত্মা গান্ধিকে অবরুদ্ধ না করাতে তাঁহারা মণ্টেগুর প্রতি বিশেষ ভাবে বিরক্ত ছিলেন। এই সব নানা কারণে মণ্টেগুর ক্ষমতা অনেকদিন হইতেই টলিতেছিল। বর্ত্তমান ব্যাপারটাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে কার্য্য হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যদিও বর্ত্তমান শাসনসংস্কারে তিনি অনেক গোলের সৃজন করিয়া ফেলিয়াছেন তথাপি তিনি ভারতের অকৃত্রিম হিতৈষী এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। তাঁহার এই অপসারণে ভারতবাসী মাত্রেই দুঃখিত হইয়াছে।

* * *

ধর্ম্মঘট। আজকাল চারিদিকেই ধর্ম্মঘট হইতেছে। আর্থিক অবস্থাই প্রধানতঃ ধর্ম্মঘটের কারণ। বর্ণ ও জাতীয় বৈষম্য এবং তজ্জনিত অসন্তোষ ও অনেক স্থলে এই সকল ধর্ম্মঘটের কারণ। দেশীয় কর্ম্মচারীদের উপর ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের কুব্যবহার, দেশী বিদেশীর বেতনের তারতম্য প্রভৃতি দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়া তুলে। E. I. Ryএর ধর্ম্মঘট এইরূপ অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে ঘটিয়াছে বলিয়া ধর্ম্মঘটিরা প্রকাশ করিয়াছেন। রেলে ইউরোপীয়েরা অনেক স্থলে দেশীয়দের প্রতি কুব্যবহার করেন ইহা অমূলক নহে। কৃষ্ণ ও শ্বেতকায় কর্ম্মচারীর বেতনের তারতম্য ও কম নহে। এই সকলে প্রতিকার না হইলে বর্ত্তমান ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া গেলেও অদূর ভবিষ্যতে আবার বিশৃঙ্খলা ঘটিবেই। Indian mining associationএর বার্ষিক সভায় মিঃ পাটিনসন ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা অতীব সত্য। তিনি বলেন "There have been several cases reported to us of assaults on the labour by those in authority at the collieries, and the committee have issued circulars asking members to warn their colliery staff that the labour must not be assaulted. No one has the right to assault any of his labour. If the labour

is assaulted and the assault causes a strike then you can only blame yourselves."

ধনীর শ্রমীর আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানকে ক্ষুণ্ণ করিবার কোনই অধিকার নাই। যদি কোনও ধনী শ্রমীর আত্মমর্য্যাদা হরণের প্রয়াস পান এবং শ্রমী দল বাঁধিয়া ধর্ম্মঘট করে তজ্জন্য ধনীই দায়ী। এই কথা স্মরণ রাখিয়া যদি রেল কর্ত্তৃপক্ষ বিচার করিতেন তাহা হইলে E. I. Ryএতে ধর্ম্মঘট হইয়া জনসাধারণের অসুবিধা হইত না। ধর্ম্মঘটীদের অভিযোগ যে রামলাল নামক একজন কর্ম্মচারীকে দুইজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী প্রহার করায় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহারা প্রতিকার প্রার্থনা করে। প্রথমে রেল কর্ত্তৃপক্ষ রামলালের প্রতি অত্যাচারের কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন। এখন লোকো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ যে, 'প্রহার অতি সামান্যই হইয়াছিল তজ্জন্য ধর্ম্মঘট অনুচিত'। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগকে প্রহার করিবার অধিকার কি ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর আছে? কর্ত্তৃপক্ষের ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত।

* * *

মাদ্রাজের হাঙ্গামায় পুলিসের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে তদন্ত হইয়াছিল তাহার ফল সরকার পক্ষ বাহির করিয়াছেন। তাহাতে কতকগুলি পুলিশ কর্ম্মচারীর বিচার বিভ্রম (error of judgment) হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। আজকালerror of judgment যেন পুলিশের মধ্যে সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে এবং ফলে অনেক স্থলে ভারতবাসী প্রাণ হারাইয়াছে। কালিঘাট, হাওড়া, মাটিয়ারি ও মাদ্রাজে এইরূপ ঘটনা ঘটিল। অনেক স্থলে শোনা যায় যে গুলি চলিয়াছে কিন্তু কাহার হুকুমে তাহা জানা যায় না এমন কি এতদূরও শোনা যায় যে বিনা হুকুমেও নাকি কোথাও কোথাও গুলি চলিয়াছে। ইহার কি কোনও প্রতিবিধান নাই? ব্যবস্থাপক মণ্ডলী হইতে এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে গুলি চলা বা error of judgment এত সুলভ না হইতে পারে।

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় আয়ব্যয়ের তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে। তর্ক বিতর্ক ভিন্ন কার্য্যে যে কিছু হইবে সে আশা নাই। এই দরিদ্র দেশে ব্যয়সংকোচ না করিয়া শুধু ট্যাক্স বৃদ্ধির দ্বারাই কি দেশ সুশাসিত হইতে পারে? প্রস্তাব হইয়াছে লবণ দিয়াশলাই ও কেরাসিনের উপর শুল্ক বসিবে, ট্রেনভাড়া ও ডাক মাশুল বৃদ্ধি হইবে। এদেশে যেরূপ দারিদ্র্য বেশীভাগ দরিদ্রলোক শুধু "নূন ভাত বা নূনছাতু" খাইয়া দিন গুজরাণ করে। দিয়াশলাই লবণ ও কাপড় কি ধনী কি দরিদ্র কাহারও না হইলে চলে না, এইগুলি নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের অতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। এই সব জিনিসের উপর শুল্ক বসাইলে দরিদ্রদের অত্যন্ত ক্লেশ হইবে। যে শুল্কে ধনীর বিশেষ কষ্ট হয় না কিন্তু দরিদ্রকে বিশেষ ভাবে আঘাত করে, এমন কি দিন গুজরান কষ্টকর হয় তাহা করিলে প্রজা পালন না হইয়া শোষণই হয়। অন্নহীন দেশে, ক্ষুধার্ত্তের অন্নের অতি সামান্য অথচ অতি প্রয়োজনীয়—না হইলে চলে না—এমন উপকরণ মহার্ঘ করা উচিত নয়। *

ঐক্য মণ্ডলী।

অযোধ্যার শাণ্ডিলা তহশিলে মাদারী পাশি নামক এক ব্যক্তি "ঐক্য" নামে এক দল গঠন করিয়াছেন। তাহাদের ১১টী সর্ত্ত আছে। সর্ত্তগুলি এই

* পরে সংবাদ আসিয়াছে যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক মণ্ডলী মিঃ যোশির প্রস্তাবে [illegible] উপর কর বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কাপড়ের শুল্ক বৃদ্ধি প্রস্তাবও [illegible] সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে [illegible] (Democratic) গণতান্ত্রিক দল দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

১। জমিদার বে-আইনি ভাবে জমি হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে প্রজারা তাহাদের জমি ছাড়িয়া দিবে না।

২। কেবল মাত্র আইন সঙ্গত নির্দ্ধারিত খাজানা দিবে।

৩। খারিফ ও রবি এই দুই কিস্তিতে নিয়ম মত ভাবে দেয় খাজানা দিবে।

৪। রসিদ না লইয়া খাজানা দিবে না।

৫। জমিদারদের নিকট (পয়সা না লইয়া) অতিরিক্ত বেগার খাটিবে না।

৬। হরি এবং ভূশা নামক অতিরিক্ত খাজানা দিবে না।

৭। পুষ্করণীর জল চাষের জন্য জলকর না দিয়া ব্যবহার করিবে।

৮। বিনা করে জঙ্গলে ও গোচারণ মাঠে গৃহ পালিত পশুদের চরাইবে।

৯। গ্রামে অন্যায়কারী বা অপরাধীর সাহায্য করিবে না।

১০। জমিদারদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিবে।

১১। আদালতে না যাইয়া পঞ্চায়েতের সকল সালিশী মানিবে।

এই সর্ত্তে আবদ্ধ হওয়ার সময় প্রত্যেকে চারি আনা করিয়া চাঁদা দেয়। অনেকে ইহাকে রাজনীতি সংক্রান্ত বা অসহযোগ আন্দোলনের সহিত ইহার সংস্রব আছে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেলেন কিন্তু উপরোক্ত এগারটী সর্ত্তে পরিষ্কার প্রকাশ পায় যে ইহার সহিত রাজনীতির কোন সংস্রব নাই। মাদারীপাশি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোক কিন্তু তাহার গুণে সকল লোক তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। হরদইএর ডেপুটী-কমিশনার সম্প্রতি এক রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐক্য আন্দোলন এখনও সম্পূর্ণ বৈধভাবে চলিতেছে। ইহাদের সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ শোনা গিয়াছে তাহার অধিকাংশই অতিরঞ্জিত। এই আন্দোলন প্রধানতঃ অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেই আরম্ভ হইয়া সেইখানেই আবদ্ধ আছে। এই যে জন মনের জাগরণ ইহা দেশের পক্ষে অতি শুভ লক্ষণ ও আশার পরিচায়ক। যাহাতে ইহা সত্য ও ন্যায়ের পথে চলিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষিত লোকের সহানুভূতি ও সহযোগ বাঞ্ছনীয়।

* * * *

নব্যভারতের কি যে দুর্ব্বৎসর! আবার এক অকৃত্রিম সুহৃদ ও লেখককে অকালে হারাইতে হইল! চট্টলার কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত অল্প বয়সে সকলকে শোকাবদ্ধ করিয়া মহা-প্রস্থান করিয়াছেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহার এক কবিতা প্রেসে যাওয়ার পর অকস্মাৎ এ দুর্ঘটনার সংবাদ আসে। কবিতাটীতে তিনি যেন মহাপ্রয়াণের আভাস পাইয়াছিলেন। নব্যভারতে তাঁহার প্রথম হাতেখড়ি হয় বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। শেষ কবিতাটীও নিজে হাতে পাঠাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার কবিতা প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা মাসিকপত্রিকাতেই প্রকাশিত হইত। নিজ জন্মভূমি চট্টগ্রামের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। নবীনচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর জীবেন্দ্রকুমার ধীরে ধীরে কাব্যজগতে উচ্চাসন গ্রহণ করিতেছিলেন। আশা হইতেছিল, চট্টলার যে সুমধুর বীণা নীরব হইয়া গিয়াছিল, সুরে তালে সেইরূপ না হইলেও জীবেন্দ্রকুমারের কাব্য আবার তাঁহার সাধের চট্টলাকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিবে। চট্টলার দুর্ভাগ্য! তাঁহার বাঁশরী বাজিতে না বাজিতে অকালে থামিয়া গেল। নব্যভারতের দুর্ভাগ্য! ইহার বর্ত্তমান অসহায় অবস্থায় তিনি নব্যভারতের সেবার জন্য তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে, এমন কি, সাধের চট্টলা ছাড়িয়া আসিতেও ব্যগ্র হইয়াছিলেন। নব্যভারত এমন অকৃত্রিম সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমরাও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনাগ্রস্ত হইয়াছি। বিধাতা শোক-সন্তপ্ত পরিবারে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

নানারূপ দুঃখশোক হর্ষ বিষাদ বহন করিয়া বৎসর শেষ হইতেছে। নব্যভারত আগামী বৎসরে চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে নব্যভারত এই সময়ে তাহার প্রতিষ্ঠাতার ঐকান্তিক সেবা ও তৎপরবর্ত্তী সম্পাদকের সযত্ন প্রচেষ্টা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু এই দুঃসময়ে আশার কথা এই যে অনেক অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী ইহাকে সাহায্য করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া বক্ষে আশ্রয় দিয়াছেন। তাই সহায়হীন, উদ্যমহীন ও নিরাশ হইয়াও নব্যভারত আবার নববর্ষের জন্য বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হইতেছে। নব্যভারতের যাঁহারা পুরাতন লেখক ও বন্ধু তাঁহাদের ভিতর অনেকেই নব্যভারতের এই দুর্দ্দিনে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন। সার আশুতোষ চৌধুরী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রাধিকামোহন লাহিড়ী, ইন্দুভূষণ সেন প্রভৃতি পুরাতন হিতৈষীগণ ইহার সেবায় বিশেষরূপে আপনাদের নিয়োজিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। নব্যভারত সেইজন্য তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আছে।

আগামী বৎসরের প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ লেখক লেখিকাগণের লেখা থাকিবে। যথাসাধ্য ইহার সৌষ্ঠব সাধনার প্রচেষ্টা হইবে। আশাকরি পাঠক পাঠিকা ও গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গ সকলে ইহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে সাহায্য করিবেন। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী বৎসরের মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। চিঠিপত্র বা টাকাকড়ি পাঠাইবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর লিখিবেন। নতুবা বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হয়।

দোল।

দে দোল দে দোল ;
আজ হৃদয় দোলায়
দোল দিয়ে যায়
দখিনা হিল্লোল ;
দে দোল দে দোল।

দোল খেয়ে তুই জাগ,
ওরে পরবশ
ওরে ও অলস
হাতে তুলে নে রে ফাগ,
পুলক রঙ্গে শোণিত অঙ্গে
বহুক, মাখিয়া ফাগ।
ভিতরে বাহিরে লাল হয়ে ওরে
জাগুক অনুরাগ,
কর্দ্দম-কালিমা, আলস জড়িমা
ঝেড়ে ফেলে তুই জাগ।

উঠুক নামের রোল,
রাজুক সঘনে খোল,
আকাশে বাতাসে শ্বাসে প্রশ্বাসে
ধ্বনুক হরিবোল,
শত চোখে মুখে দীন দুখী মুখে
ফাগ দিয়ে দেরে কোল ;
আপনার করি নেরে বুকে ধরি
দেরে এক সাথে দোল।
ভারতে আবার জাগুক এবার
ঘরে ঘরে সেই দোল,
প্রেম-তরঙ্গে ডাকিয়া রঙ্গে
সবে দেরে সবে কোল
মরুতে গগনে বিপিনে গহনে
উঠুক নামের রোল।
দে দোল দে দোল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু।